



উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৬৫-তম বর্ষ

(১৩৬৯-মাঘ হইতে ১৩৭০-পৌষ)



'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

বার্ষিক মূল্য ৫·৫০ প্রতি সংখ্যা ৫০ ন. প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ—১৩৬৯ হইতে পৌষ—১৩৭০)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত !



বিবেকানন্দ-আবির্ভাব সঙ্গীত*

স্বামী সারদানন্দ

স্থর : বাগেশ্রী (আড়া)

স্তিমিত চিৎ-সিন্ধু ভেদি উঠিল কি জ্যোতি-ঘন,
কোটি সূর্য গলাইয়ে ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন।
মায়া-খণ্ডিত অখণ্ড বারি, বুঝে লীলা কেবা হেন ॥

উজল বালক-বেশে, অখণ্ড ঘর প্রবেশে,
প্রেমঘন বাহু পাশে কাহারে করে ধারণ ॥
উঠ বীর ! আঁখি মেলি, ছাড় ধ্যান চল চলি,
ধরণী ডুবালো বুঝি অবিছা কাম-কাঞ্চন ॥

সুধীর ধীর পরশে, যোগী চায় সহরষে,
কণ্টকিত তনুমন, নীরবে ভাসে বয়ান ;
তারা জ্বলি' ছায়াপথে স্পর্শে ধরা আচম্বিতে,
পুণ্যভূমে উদে আজি পুনঃ নর-নারায়ণ !

---

* এই প্রসঙ্গে লেখকের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ"—৫ম খণ্ড (দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ) ৯১-৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের বাণী

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম শতবার্ষিক জন্মজয়ন্তীরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা উপলক্ষে তোমাদের সকলকে আমার সহৃদয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। তাঁহার পার্থিব কর্মজীবন স্বল্পকালব্যাপী হইলেও উহা যুগপ্রবর্তনকারী আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পূর্ণ ছিল এবং ঐ অল্প সময়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সমভাবে—উহা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল।

সকল দেশের সকল যুগের মানুষের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা-স্বরূপ তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া যৌবনে দক্ষিণেশ্বরে তিনি মানুষের মধ্যে দেবত্ব অনুভব করিয়া বিশ্বব্যাপী উদার ভাব লাভ করেন। যদিও তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর, এবং তাঁহার উপর ভারতবর্ষ একা কোন বিশেষ দাবি করিতে পারে না। নরনারীকে তাহাদের দিব্যভাব সম্বন্ধে সচেতন করা—মানব-জাতির ঐক্য সম্বন্ধে সকলকে জাগ্রত করাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তাঁহার প্রচারের উদ্দেশ্য। একমাত্র এই ভাবের দ্বারাই হিংসাদ্বন্দ্ব-জর্জরিত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে।

তাঁহার নিজের ভাষায়ঃ ভারতকে আমি নিশ্চয়ই ভালবাসি, কিন্তু দিন দিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে, আমার কাছে ভারতই বা কি, ইংলণ্ড আমেরিকাই বা কি? আমরা সেই ঈশ্বরের দাস, অজ্ঞতাবশতঃ লোকে তাঁহাকেই 'মানুষ' বলিয়া মনে করে।

'সামাজিক, রাজনীতিক, আধ্যাত্মিক—সর্ববিধ কল্যাণের একটি মাত্র ভিত্তি, এইটুকু জানা যে আমি ও আমার ভ্রাতা একই। সকল দেশের সকল মানুষের পক্ষে এ-কথা সত্য।'

তাঁহার বহু ব্যাপক বাণীর মধ্যে বিজ্ঞান ও ধর্ম, যুক্তি ও বিশ্বাস, লৌকিক ও আধ্যাত্মিক, আধুনিক ও পুরাতন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিলিত হইয়াছে; তিনি ছিলেন সেই মিলনের মূর্তবিগ্রহ। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নূতন যুগ প্রবর্তনের জন্য যে শক্তি প্রয়োজন, তাঁহার জীবন ও বাণী সেই শক্তি সঞ্চার করিয়াছে।

তূর্যনিনাদে তিনি তাঁহার দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন: 'কাজ কর, কাজ কর, কর্মের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।' তুচ্ছ ঈর্ষা দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার—'বহুত্বে একত্ব'-রূপ আদর্শের পতাকাতলে সমবেত হইতে বলিয়াছেন। এই নীতির উপর নির্ভর করিয়া ভারতের বিবিধ ও ভিন্নমুখী জাতি, ভাষা ও রীতিনীতির মধ্য হইতে একটি মহাজাতি গড়িয়া তুলিতে তিনি দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়াছেন; এই প্রক্রিয়ার গতি যদিও মন্থর, তথাপি ইহার ফল দীর্ঘস্থায়ী; দ্রুত ও চমকপ্রদ ফলপ্রাপ্তির আশায় বলপ্রয়োগ হইতে তাহারা যেন বিরত থাকে, ঐরূপ কার্যের ফল অল্পকালস্থায়ী। তিনি বলিয়াছেন, কিছুই ধ্বংস না করিয়া বহুকে একত্বে সংহত কর; ঐরূপ ধ্বংসক্রিয়া জাতিকে দুর্বল করিবে, দীন দরিদ্র করিবে।

তিনি তাঁহার দেশবাসীকে বলিতেন, অতীতে অর্জিত এই জাতির সম্পদের দিকে সগর্বে তাকাও এবং মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ মহিমায় বিশ্বাসী হও। তিনি বলিয়াছেন, 'পৃথিবীতে যত গর্বিত মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহাদের অন্যতম; গর্ব আমার নিজের জন্য নয়, আমার পূর্বপুরুষদের জন্য। এই গর্ব আমাকে শক্তি দিয়াছে, পথের ধূলি হইতে আমাকে তুলিয়া ধরিয়াছে। তোমাদেরও মধ্যে এই গর্ব সঞ্চারিত হউক!'

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন: 'বিধাতৃনির্দিষ্ট তাঁহার গৌরবময় ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণ করিবার জন্য ঐ আমার মাতৃভূমি রানীর মতো ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন; পৃথিবীতে কোন শক্তির সাধ্য নাই, তাঁহার গতি রোধ করে।'

'ওঠ, ওঠ, দীর্ঘ রজনী ঐ কাটিয়া যায়! প্রভাত হইতেছে, তরঙ্গ উঠিয়াছে, কোন কিছুই এ বন্যার দুর্বার বেগ রোধ করিতে পারিবে না।' 'মা আর ঘুমাইবেন না। বাহিরের কোন শক্তি আর তাঁহার অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারিবে না, প্রচণ্ড শক্তি লইয়া তিনি স্বীয় পদভরে উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন।'

দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন—তাহারা যেন নিজেদের উপর বিশ্বাসী হয়, আলস্য পরিত্যাগ করে, এবং ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। তিনি বলিতেন: 'আত্মবিশ্বাসী হও, অন্যথা কোন মুক্তি সম্ভব নয়। বিশ্বাসী হও, শক্ত সবল হও,—একমাত্র ইহাই আমাদের প্রয়োজন।' 'নিদ্রিত আত্মাকে আহ্বান কর, দেখ—কিভাবে উহা জাগিয়া উঠে! শক্তি আসিবে, গৌরব আসিবে, যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহাই আসিবে।' 'ত্যাগ বিনা কোন মহৎ কাজ হয় না…আরাম, সুখ, নাম-যশ, পদমর্যাদা—এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দাও।'

'আজ আমাদের দেশের প্রয়োজন—লৌহদৃঢ় পেশী, ইস্পাতসদৃশ স্নায়ু এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি, যাহা যে-কোন উপায়ে হউক, কার্য সিদ্ধ করিবেই; এজন্য যদি মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয়—তাহাতেও প্রস্তুত!' 'হে বীর, সদর্পে বলো, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই…ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ! আর বলো দিনরাত: হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমায় মানুষ কর!'

এই বল, বিশ্বাস, শক্তি ও সংহতির বাণীই আমাদের বর্তমান সঙ্কটে বিশেষ প্রয়োজন।

এই শতবার্ষিকী-বৎসরে স্বামীজীর চিন্তা দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইবে, এবং মানুষের গঠনমূলক আধ্যাত্মিক শিক্ষার চিরন্তন উৎস হইয়া থাকিবে। এগুলি হইতে মানুষ লাভ করিবে এক দিব্য দৃষ্টি, আরও লাভ করিবে মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে একত্ব, সমন্বয় ও সহোযোগিতা আনয়ন করিবার সঙ্কল্প।

স্বামীজীর যে বিরাট ভাব ভারতকে জাগ্রত করিয়াছিল এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলিত করিয়াছিল, সেই ভাব আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক; 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজের মুক্তির জন্য ও জগতের কল্যাণের জন্য—এই জীবনপ্রদ নীতির আলোকে আমরাও যেন ঐ উদ্দেশ্যে জীবনব্যাপী কার্য করিতে পারি।

স্বামী মাধবানন্দ
অধ্যক্ষ,
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

বেলুড় মঠ
১৭ই জানুআরি, ১৯৬৩

শ্রীমৎস্বামিবিবেকানন্দ-প্রশস্তিঃ

'গৌতম'

আজন্মশুদ্ধচরিতঃ সহজাং বরেণ্যা
ধ্যানাবদাতমনসা প্রতিভাং দধানঃ।
স্বামী পরৈর্গুণশতৈঃ সততং বিবেকা-
নন্দো যতির্বিজয়তাং ভুবি রাজমানঃ ॥১॥

বঙ্গে প্রসিদ্ধনগরী কৃতসৌধমালা
ভাগীরথীতটগতা ধনিভোগিজুষ্টা।
দত্তাখ্যবংশনিলয়া স্বগৃহে নরেন্দ্রং
প্রীতা সতী বৃতবতী বহুভাগ্যযুক্তা ॥২॥

ত্যাগৈকমন্ত্রপরতামবলম্ব্য বাল্যে
যো জীবনং নিয়মিতং বিদধৌ বিবেকী।
শ্রীরামকৃষ্ণ বচনামৃত-বারিসেকাদ্
বৃদ্ধিং গতঃ স মহতীমপবর্গদাত্রীম্ ॥৩॥

দারিদ্র্য-দোষজড়তাং পররাজপীড়াং
সংবীক্ষ্য'নীচজনতামভিজাতহেয়াম্।
লোকে স ভারতভুবঃ প্রতিকারকামো
মুক্তেঃ সুখায় চ তথা শ্রমণো বভূব ॥৪॥

শাস্ত্রীয়বোধকলয়া ন তুতোষ যোঽসৌ
সাক্ষাদ্দদর্শ পরমং ভগবন্তমেকম্।
সেবাদিকর্মবহুলৈঃ পরমাত্মবুদ্ধ্যা
সিদ্ধঃ স মানবজনুঃ সফলং চকার ॥৫॥ *

শ্রীরামকৃষ্ণবচনান্নরকায়ধারা
নারায়ণাংশ ইতি যঃ করুণানিধানম্।
ভূতোপকারনিরতঃ স নরেন্দ্রসংজ্ঞঃ
কীর্তিং নিধায় জগতি প্রযযৌ স্বমিষ্টম্ ॥৬॥

যস্যেচ্ছয়া ক্ষিতিতলে প্রহিতেশবুদ্ধ্যা
সর্বত্র দেহবিভৃতাং যুগধর্মসেবা।
নিদ্রা গতা স্ববিষয়ে পরিদৃশ্য যস্য
ক্লেশং স এব বিবুধঃ স চ সত্যসন্ধঃ ॥৭॥

জেতা স ধর্মসমরে সমিতৌ চ নেতা
ধ্যাতা পরাত্মনি জনেঽপি পাতা
শাস্তা বিনেয়বিষয়ে প্রণবে চ বোদ্ধা
যোগে স সিদ্ধপুরুষো জগতো নমস্যঃ ॥৮॥

অনুপমতনুযষ্টিং দিব্যদৃষ্টিং মহর্ষি-
মভয়বরদবেষং লোকনাথং শরণ্যম্।
যতিগণবরণীয়ং যোগিরাজং কৃশানুং
নিখিলভুবনবন্ধুং যুক্তবন্ধং নমামি ॥৯॥

কথাপ্রসঙ্গে

জয়তু স্বামীজী

স্বামীজীর শতবার্ষিক জন্মোৎসবের লগ্নে আজ 'উদ্বোধনে'র ৬৫তম বর্ষের সূত্রপাত। আজ আমরা স্মরণ করি যুগাবতারের প্রধান লীলা-সহায়ক সেই পুরুষসিংহকে—সেই বেদান্তকেশরীকে যিনি তাঁহার 'অভীঃ'মন্ত্রের পাঞ্চজন্যরূপে এই 'উদ্বোধনে'র উদ্বোধন করিয়া যান। নবযুগের নবতম ভাবধারায় দেশকে প্লাবিত করিবার জন্য— বহুযুগের তামসিক নিদ্রা ভাঙিবার জন্যই তাঁহার এই 'উদ্বোধন' পত্রিকার পরিকল্পনা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক মিলন ও উভয়ের উন্নতির মধ্য দিয়াই নবতম মানব-সভ্যতা দেখা দিবে- ইহাই তাঁহার অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি। এই সংঘাতে একের তমোভাব দূরীভূত হইবে, অপরের রাজসিক চঞ্চলতা শান্ত হইবে! সত্ত্বগুণের সামঞ্জস্যের ভিত্তির উপরই এক উদার মহান্ পরস্পর প্রীতিপূর্ণ সমন্বয়মূলক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহারই অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য স্মৃতিতে আজ আমরা পরস্পরকে প্রীতির অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

এক সংকটময় যুগসন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়া আমরা চলিয়াছি, তাহার একদিকে নৈরাশ্যের গভীর গহ্বর—অন্যদিকে উঠিয়াছে আশা-আকাঙ্ক্ষার উচ্চ শিখর। অতি সন্তর্পণে আমাদের চলিতে হইবে। একদিকে জড়বাদের ভোগময় প্রলোভন; অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতার শান্ত আদর্শ। এই বিশ্বব্যাপী ভাব-সংঘর্ষের দুর্যোগে বর্তমানে আমাদের প্রয়োজন এমন একজন দৈশিক, যাঁহার চক্ষে অতীত ও ভবিষ্যৎ সমভাবে সমুদ্‌ভাসিত। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা এমনই একজন দিশারী পাইয়াছি, তিনি অতীতের ঐতিহ্যকে স্বীকার করিয়া ভবিষ্যতের ভিত্তি রচনা করেন, জাতিকে স্বীকার করিয়া যিনি আন্তর্জাতিকতার কথা বলেন, যাঁহার চোখে দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম ভগবৎ-প্রেমেরই স্তরানুযায়ী বিকাশমাত্র।

আজ এই শতবার্ষিকী পুণ্যলগ্নে স্বামীজীর স্বরূপ সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ স্বতই সকলের মনে জাগিতেছে। নানাভাবে তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন—নানা ভাষায় তিনি কথা বলিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে দেখেন শুধু দেশপ্রেমিক রূপে, অধঃপতিত ভারতকে তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন; কেহ দেখেন তাঁহাকে মানবপ্রেমিকরূপে, শুধু ভারতবাসীর নয়, বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য তিনি চিন্তা করিয়াছেন, বিশ্বব্যাপী কর্মের সূচনা করিয়া গিয়াছেন; কাহারও চোখে তিনি ঈশ্বরপ্রেমিক সাধুসন্তের শিরোমণি; আবার কেহ বলিবেন, তিনি আত্মজ্ঞানী মায়াবাদী বেদান্তপ্রচারক।

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ঐসব গুণগুলি কিভাবে সমন্বিত হইয়াছিল, ইহা সাধারণ মানুষের কাছে, তথা মনোবিজ্ঞানীদের কাছে চিরবিস্ময় হইয়া থাকিবে। তিনি ছিলেন একাধারে শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, তিনি আজন্ম ধ্যানসিদ্ধ আবার আজীবন কর্মনিষ্ঠ। চরম আদর্শ উপলব্ধির জন্য ভক্তি, জ্ঞান, ধ্যান ও কর্ম-রূপ যে চারিটি যোগের কথা তিনি বলিয়াছেন, তিনি নিজে ছিলেন সেগুলির প্রত্যেকটিতে পারঙ্গম—এই একটি পরিপূর্ণ আদর্শের জন্য পৃথিবী বহুদিন প্রতীক্ষারত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের ধর্ম-সমন্বয় বিবেকানন্দ-কণ্ঠে যোগ-সমন্বয় রূপেই বিঘোষিত হইয়াছে। বহুমুখী প্রতিভার আধার বিচিত্র-ব্যক্তিত্বের সমষ্টি স্বামী বিবেকানন্দে সবগুলি আদর্শ তাহাদের পরাকাষ্ঠা—চরম পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল বলিয়াই তিনি সকল ভাবের মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাদের উপযোগী পথ নির্দেশ করিয়া দিতে পারিতেন। সাধারণ মানুষ আজীবন সাধ্য-সাধনা করিয়া যদি একটি পথ ঠিক ঠিক ভাবে ধরিতে পারে, তাহা হইলেই তাহাদের জীবন সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সকলের আত্মচৈতন্যের উদ্বোধক ; তাঁহার এই শুভ শতবার্ষিক জন্মদিনে আমরা প্রার্থনা করি, সকলের আত্মচৈতন্য উদ্বুদ্ধ হউক—সকলের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব জাগ্রত হউক !

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর পূর্ব মুহূর্তে আমরা আজ স্মরণ করি, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথা—যে-কথায় তিনি বলিয়াছেন, কিভাবে তিনি নরঋষি নরেন্দ্রনাথকে আহ্বান করিয়া, আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন অখণ্ড জ্যোতির্লোক হইতে এই ধূলির ধরণীতে—শোকতাপদগ্ধ, কামকাঞ্চনমুগ্ধ, ভ্রাতৃবিদ্বেষ-জর্জরিত এই পৃথিবীতে। দক্ষিণেশ্বরে প্রথমদর্শন-দিনেই ভাবে বিভোর হইয়া নরেন্দ্রের সম্মুখে করজোড়ে বলিয়াছিলেন, 'আমি জানি, তুমি সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি নররূপী নারায়ণ, জীবের কল্যাণ-কামনায় দেহধারণ করিয়াছ।' শ্রীরামকৃষ্ণই জানিতেন, কে স্বামী বিবেকানন্দ, কি তাঁহার জীবন-ব্রত !

সঙ্কট-যুগের চরম মুহূর্তে আমরা স্মরণ করি, স্বামীজীর সেই কথা : শ্রীরামকৃষ্ণের কাজের জন্য আমাকে বারংবার দেহধারণ করিতে হইবে। যদি একটি মানুষের যথার্থ কল্যাণ হয়, তার জন্য আমি লাখো নরকে যাব। যতদিন না সকলের মুক্তি হয়, ততদিন আমার মুক্তি নাই।

সর্বশেষে আমরা স্মরণ করি, স্বামীজীর স্বরূপের মান-নির্ণয় ও পুনরাগমনের প্রতিশ্রুতি : যদি আর একজন বিবেকানন্দ থাকিত, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত, বিবেকানন্দ কি করিয়াছে। কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিবে। আজ আমরা মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে বিবেকানন্দ-ভাবের আবির্ভাব প্রার্থনা করিয়া সেই মহত্তর আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত হই।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামীজীর সহিত আজ আমরা স্মরণ করি, তাঁহার অন্যতম গুরুভ্রাতা ও কর্মজীবনের প্রধান সহায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দকে। স্বামীজীর কথা সকলে জানিয়াছে, কারণ শ্রীভগবান্ ঐরূপই ইচ্ছা করিয়াছিলেন। নবযুগের নূতন বার্তা জগৎকে শুনাইবার জন্য ঐ বজ্রকণ্ঠের প্রয়োজন ছিল। স্বামীজীর তিরোধানের পর শ্রীরামকৃষ্ণের মহদুদার ভাব ও গভীর সাধনা যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করিয়াছিল—তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের প্রথম সংঘনায়ক—শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র—'রাখাল', 'রাজা' বা 'মহারাজ' নামেই সমধিক পরিচিত। স্বামীজী ও তিনি একই বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন—কয়েকদিন মাত্র আগে পরে। একজনকে শ্রীরামকৃষ্ণ আনিয়াছিলেন—'অখণ্ডের ঘর' হইতে, আর একজনকে তিনি দেখিয়াছিলেন ব্রজের রাখালরূপে।

ধূলির ধরণীতে ভাবের লীলায় যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার যতটুকু ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, ততটুকুই আমরা জানি। ভাবগম্ভীর মধুর ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন: একদিন দেখলাম মা (জগন্মাতা) একটি ছেলেকে এনে কোলে বসিয়ে দিলে—বললাম, 'এ কে!' মা বললে, 'ছেলে'। আমি বললাম, 'আমার আবার ছেলে?' মা বুঝাইয়া দিলেন: 'মানসপুত্র'—সাংসারিক অর্থে পুত্র নয়, মনন হইতে সৃষ্ট, তাঁহার অপূর্ব আধ্যাত্মিক সাধনার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।

সরল বালকস্বভাব রাখালের ধীর গম্ভীর ভাব দেখিয়া কাশীপুরে যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'রাখালের রাজবুদ্ধি, ও একটা রাজ্য চালাতে পারে', সে দিনই নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিত বুঝিয়া বলিয়াছিলেন: রাখালকে আমরা 'রাজা' ব'লে ডাকব, রাখাল-রাজ ক্রমে 'রাজা-মহারাজ' নামেই পরিচিত হইলেন।

পরিব্রাজক অবস্থাতেই স্বামীজী তাঁহাকে লিখিতেছেন—বরানগর মঠে ফিরিয়া তিনি যেন সংঘের কেন্দ্রস্বরূপ হন। হরিদাস বিহারীদাসকে লিখিতেছেন 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদের নেতা'। আমেরিকা হইতে তাঁহার অধিকাংশ পত্রে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বন্ধু সহচর ও নেতা ব্রহ্মানন্দকে অকপটে লিখিতেছেন। দুজনের মধ্যে এক অপূর্ব ভাবের মিলন। একজন যদি বলেন 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু', অপরজন প্রত্যুত্তর দেন, 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা'। এ মণিকাঞ্চন-যোগ পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে বিরল। একজন দিলেন ভাব, অপরজন দিলেন—রূপ। একজন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন নবযুগের পরিকল্পনা, অপরজন ধীরে ধীরে নীরবে তাহাকে রূপায়িত করিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর দায়িত্ব দিয়া স্বামীজী নিশ্চিন্ত হন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধনায় স্বামীজী-প্রচারিত 'কর্মই উপাসনা' মহাবাণীকে রূপ দিয়াছেন। তবে জোর দিয়াছেন উপাসনার উপর, অর্থাৎ কর্ম করিতে হইবে উপাসনার ভাবে। মানুষ স্বভাব-বশতই কর্ম করিবে, এটি উপাসনার ভাবে করিলে তবেই উহা 'আত্মনো মোক্ষার্থং' এবং 'জগদ্ধিতায়' হইবে।'

বেদান্ত-দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ

[১৮৯৬ খৃঃ ২৫শে মার্চ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ফিলজফিক্যাল সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতা]

আজকাল যাহাকে সাধারণভাবে 'বেদান্ত-দর্শন' বলা হয়, ভারতের বর্তমান বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির সব সত্যই তাহার অন্তর্গত। সেজন্য নানাভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং আমার মনে হয়, ক্রমোন্নতির ধারায় তাহা হইয়াছে—দ্বৈতবাদে সেগুলির আরম্ভ এবং অদ্বৈতবাদে পরিসমাপ্তি। 'বেদান্তে'র শব্দগত অর্থ বেদের অন্ত বা শেষ,—বেদ হিন্দুদের শাস্ত্র। পাশ্চাত্যে কখন কখন 'বেদ' বলিতে উহার স্তোত্র ও আনুষ্ঠানিক অংশ-মাত্র বুঝায়। কিন্তু বর্তমানকালে বেদের এই অংশের ব্যবহার প্রায় নাই বলিলেই চলে; ভারতে এখন 'বেদ' বলিতে সাধারণতঃ বেদান্তই বুঝায়। সব ভাষ্যকারই শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করিবার সময় বেদান্ত হইতেই লইয়া থাকেন—ইহাই নিয়ম; ভাষ্যকারগণের কাছে বেদান্তের আর একটি বিশেষ নাম 'শ্রুতি'। 'বেদান্ত' নামে পরিচিত সব গ্রন্থই বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের পরে রচিত হয় নাই। যেমন 'ঈশোপনিষদ্' নামক বেদান্তগ্রন্থ যজুর্বেদের বিংশ অধ্যায়ে রহিয়াছে, ইহা বেদের প্রাচীনতম খণ্ড। বেদের ব্রাহ্মণ বা আনুষ্ঠান-মূলক অংশেও অপর কয়েকখানি উপনিষদ্ রহিয়াছে। বাকী উপনিষদ্গুলি স্বতন্ত্র, বেদের 'ব্রাহ্মণ' বা অন্য কোন অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু সেগুলি যে বেদের অন্য অংশ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এ-কথা ভাবিবার কোন হেতু নাই, কারণ আমরা জানি যে, এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং বহু ব্রাহ্মণ-অংশও লুপ্ত হইয়াছে। কাজেই ইহা খুব সম্ভব যে, এই উপনিষদ্গুলি কোন-না-কোন 'ব্রাহ্মণ'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণ-অংশগুলি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু উপনিষদ্গুলি 'আরণ্যক' নামেও অভিহিত।

কাজেই বেদান্তই কার্যতঃ হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থ, এবং ভারতীয় দর্শনে যতগুলি আস্তিক মতবাদ আছে, তাহাদের সবগুলিই বেদান্তকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এমন কি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপযোগী হইলে বৌদ্ধ এবং জৈনেরা পর্যন্ত প্রমাণরূপে বেদান্তের শ্লোক উদ্ধৃত করেন। ভারতের সব দার্শনিক মতবাদই বেদকে ভিত্তি বলিয়া দাবি করিলেও প্রত্যেক মতই ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছে। সর্বশেষ ব্যাসের মত; ইহা পরবর্তী অন্যান্য দার্শনিক মতগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বেদনিষ্ঠ এবং ইহা সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি পূর্ববর্তী দর্শনগুলির সঙ্গে বেদান্তের উক্তির সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করিয়াছে। সেইজন্য বিশেষ-ভাবে ইহাকেই 'বেদান্ত-দর্শন' বলা হয়; বর্তমান ভারতে 'ব্যাসসূত্র'গুলিই বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি। বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ আবার এই ব্যাসসূত্রগুলির বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাধারণতঃ ভারতে এখন তিন শ্রেণীর ভাষ্যকার রহিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা অবলম্বনে তিনটি দার্শনিক মত ও সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে—প্রথমটি দ্বৈত, দ্বিতীয়টি বিশিষ্টাদ্বৈত এবং তৃতীয়টি অদ্বৈত। ইঁহাদের মধ্যে দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈত-

বাদীদের সংখ্যাই ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশী; তাঁহাদের তুলনায় অদ্বৈতবাদীদের সংখ্যা অতি অল্প। এই তিনটি মতবাদেরই ভাবধারা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব; তবে আরম্ভ করিবার পূর্বে একটি কথা বলিয়া রাখি—সাংখ্যদর্শনের মনোবিজ্ঞানই এই তিনটি মতবাদের সাধারণ মনোবিজ্ঞান। সাংখ্য মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ন্যায় ও বৈশেষিক মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে, বিরোধ শুধু কয়েকটি অপ্রধান খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া।

তিনটি বিষয়ে সব বেদান্তবাদীই একমত; সকলেই ঈশ্বরে, বেদে এবং কল্পে বিশ্বাসী। বেদের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 'কল্প' সম্বন্ধে বিশ্বাস এইরূপ: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যা-কিছু জড়পদার্থ আছে, সে-সকলই 'আকাশ' নামক একটি মূল পদার্থ হইতে সৃষ্ট; এবং সব শক্তিই—মাধ্যাকর্ষণ, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ, জীবনীশক্তি বা যে-কোন শক্তি হউক না কেন—সবই 'প্রাণ' নামক একটি মূল শক্তি হইতে উদ্ভূত। আকাশের উপর প্রাণের ক্রিয়ার ফলেই এই বিশ্ব সৃষ্ট বা অধ্যস্ত হইয়াছে। কল্পারম্ভে আকাশ গতিহীন, অনভিব্যক্ত থাকে। তারপর উহার উপর প্রাণের ক্রিয়া শুরু হয়, আর প্রাণ যতই ক্রিয়াশীল হয়, আকাশ হইতে ততই গ্রহ প্রাণী মানুষ নক্ষত্র প্রভৃতি স্থূল ও স্থূলতর পদার্থের সৃষ্টি হইতে থাকে। গণনাতীত কালের পর এই অভিব্যক্তি থামিয়া যায়, এবং বিলয় শুরু হয়; প্রত্যেক বস্তুই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বস্তুতে বিলীন হইতে হইতে পুনরায় মূল আকাশ ও প্রাণে পরিণত হয়। তখন নূতন 'কল্প' আরম্ভ হয়। প্রাণ এবং আকাশের পরেও কিছু আছে; উভয়কে বিরাট মন বা 'মহৎ' নামক তৃতীয় সত্তায় বিলীন করা যাইতে পারে। বিরাট মন—আকাশ বা প্রাণ সৃষ্টি করে না, নিজেকেই প্রাণ ও আকাশে রূপায়িত করে।

এখন মন, আত্মা ও ঈশ্বর-বিষয়ে বিশ্বাস লইয়া আমরা আলোচনা করিব। সর্বজনগ্রাহ্য সাংখ্য মনস্তত্ত্ব অনুসারে অনুভূতির ক্ষেত্রে—যেমন কোন-কিছু দেখার সময়—প্রথমেই থাকে দেখিবার যন্ত্র বা করণ—চক্ষু। চক্ষুর পিছনে দর্শনের ইন্দ্রিয়-চক্ষুর স্নায়ু ও স্নায়ুকেন্দ্র রহিয়াছে; এগুলি বাহিরের যন্ত্র নয়, কিন্তু এগুলি ছাড়া চক্ষু দেখিতে পাইবে না। অনুভূতির জন্য আরও কিছুর প্রয়োজন। মন থাকা চাই, এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগও চাই। এ ছাড়াও বেদনাকে বুদ্ধির বা মনের প্রতিক্রিয়াশীল নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই; বুদ্ধির নিকট হইতে প্রতিক্রিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগৎ প্রতিভাত হয় এবং অহংবোধও জাগ্রত হয়। তারপর আসে ইচ্ছা; কিন্তু তবুও সব হইল না। যেমন পরপর বিচ্ছুরিত আলোর স্পন্দনে প্রস্ফুট কয়েকটি চিত্রকে লইয়া একটি সম্পূর্ণ চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে হইলে সেগুলির প্রত্যেকটিকে কোন একটি স্থির বস্তুর উপর ফেলিতে হয়, সেইরূপ মনের প্রত্যেকটি ভাবকেও একত্র করিয়া দেহ ও মনের তুলনায় যাহা স্থির, সেরূপ কোন একটি পদার্থের উপর প্রক্ষেপ করিতেই হইবে; এই স্থির পদার্থটি জীবাত্মা—পুরুষ বা আত্মা।

সাংখ্যদর্শনের মতে 'বুদ্ধি' নামক মনের প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থাটি 'মহৎ' বা বিরাট মনের পরিণাম, রূপান্তর বা একটি বিশেষ অভিব্যক্তি। মহৎ-ই স্পন্দনশীল চিন্তায় রূপান্তরিত হয়; এবং উহা এক অংশে পরিবর্তিত হইয়া ইন্দ্রিয় হয়, অপর অংশে হয় সূক্ষ্ম ভূত (তন্মাত্র)।

এই সব-কিছুর সমবায়ে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্ট হয়। সাংখ্যদর্শনের মতে এই মহৎ-এরও পরে আর একটি অবস্থা আছে, যাহার নাম 'অব্যক্ত' বা অপ্রকাশিত; সেখানে মনেরও প্রকাশ নাই, শুধু কারণগুলি থাকে। এই অবস্থার আর একটি নাম 'প্রকৃতি'। এই প্রকৃতির পারে প্রকৃতি হইতে চির-স্বতন্ত্র পুরুষ রহিয়াছেন; ইনিই সাংখ্যের নির্গুণ সর্বব্যাপী আত্মা। পুরুষ কর্তা নন, সাক্ষী মাত্র। পুরুষকে বুঝাইতে উদাহরণ দেওয়া হয়। পুরুষ বর্ণহীন স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো; উহার সম্মুখে বিভিন্ন বর্ণ রাখিলে উহাকে সেই-সব বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্ফটিক তাহাতে রঞ্জিত হয় না।

বেদান্তবাদীরা সাংখ্যের 'আত্মা ও প্রকৃতি'-বিষয়ক মত নাকচ করিয়া দেন। তাঁহাদের মতে এ দুটির মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে, সংযোগ-সেতুর সাহায্যে সে ব্যবধান ঘুচাইতে হইবে। একদিকে সাংখ্য-মত প্রকৃতিতে পৌঁছায়, এবং পৌঁছিয়াই প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আত্মার কাছে আসিবার জন্য তাহাকে তৎক্ষণাৎ একলাফে অন্য প্রান্তে যাইতে হয়। সাংখ্য বলে বটে, কিন্তু বিভিন্ন বর্ণগুলি স্বরূপতঃ বর্ণহীন আত্মার উপর ক্রিয়াশীল হইতে সমর্থ হয় কি করিয়া? সেজন্য বেদান্তবাদীরা প্রথম হইতেই নিশ্চয় করিয়া বলেন যে, এই আত্মা ও প্রকৃতি এক।

এমন কি দ্বৈতবেদান্তবাদীরাও স্বীকার করেন, আত্মা বা ঈশ্বর বিশ্বের শুধু নিমিত্ত-কারণই নন, তিনি উপাদানকারণও। কিন্তু তাঁহাদের কাছে ইহা কথার কথা মাত্র, প্রাণের কথা নয়; কারণ তাঁহারা নিজ সিদ্ধান্তকে এইভাবে এড়াইতে চান: তাঁহারা বলেন, বিশ্বে তিনটি সত্তা আছে—ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি। প্রকৃতি ও জীব যেন ঈশ্বরের দেহ; এই অর্থেই বলা চলে যে, ঈশ্বর ও সমগ্র বিশ্ব এক। কিন্তু চিরকাল ধরিয়া প্রকৃতি ও বিভিন্ন জীব পরস্পর স্বতন্ত্রই থাকিয়া যায়। কেবল কল্পারম্ভে তাহারা অভিব্যক্ত হয়, এবং কল্পান্তে সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বীজাকারে থাকে।

অদ্বৈতবেদান্তবাদীরা জীব বা আত্মা সম্বন্ধে এই মতবাদ অগ্রাহ্য করেন: এবং উপনিষদের প্রায় সমগ্র অংশ স্বপক্ষে পাইয়া তাহারই উপর নিজেদের মত সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া তুলেন। সব উপনিষদেরই একমাত্র কাজ এই বিষয়টি প্রমাণ করা—'যেমন একখণ্ড মৃত্তিকা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলে বিশ্বের সমস্ত মৃত্তিকাই জানা যায়, তেমনি এমন কি আছে, যাহা জানিলে বিশ্বের সব-কিছুই জানা যায়?' অদ্বৈতবাদীর ভাব হইল সমগ্র বিশ্বকে এমন একটি সাধারণ তত্ত্বে লইয়া যাওয়া, যে তত্ত্বটি যথার্থই বিশ্বের সামগ্রিক সত্তা। তাঁহারা দাবি করেন—সমগ্র বিশ্বে একত্ব রহিয়াছে, এবং একটি সত্তাই নিজেকে এই-সব বিভিন্ন রূপে ব্যক্ত করিতেছেন। সাংখ্য যাহাকে প্রকৃতি বলেন, তাঁহারা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু বলেন যে, প্রকৃতিই ঈশ্বর। এই অস্তিত্বই—এই সৎ-ই বিশ্ব, মানুষ, জীব এবং যাহা-কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাহাতে রূপায়িত হইয়াছেন। মন ও মহৎ সেই এক সৎ-এরই অভিব্যক্তি মাত্র। তবে ইহাতে অসুবিধা এই যে, ইহা সর্বেশ্বরবাদ হইয়া দাঁড়ায়। যে বস্তুকে তাঁহারা অপরিবর্তনীয় সৎ বলিয়া স্বীকার করেন—কারণ যাহা চরম সত্য তাহার পরিবর্তন নাই—তাহা এই পরিবর্তনীয় ও বিনাশশীল পদার্থে রূপায়িত হয় কেমন করিয়া?

এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদীদের বিবর্তবাদ বা আপাতপরিবর্তনবাদ বলিয়া একটি মত আছে।

দ্বৈতবাদী ও সাংখ্যবাদীদের মতে এই বিশ্বের সব-কিছুই মূল প্রকৃতির অভিব্যক্তি। একদল অদ্বৈতবাদী ও একদল দ্বৈতবাদীর মতে সমগ্র বিশ্বই ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। শঙ্করপন্থী খাঁটি অদ্বৈতবাদীদের মতে সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। ঈশ্বর বিশ্বের উপাদান-কারণ, কিন্তু সত্যই তাহা নন, উপাদান বলিয়া প্রতীত হন মাত্র। এ-বিষয়ে রজ্জুতে সর্পভ্রমের উদাহরণ প্রসিদ্ধ। রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হইয়াছিল মাত্র, রজ্জু কখনও সর্পে পরিণত হয় নাই। ঠিক তেমনি এই প্রকাশমান সমগ্র বিশ্বই সেই সৎ-স্বরূপ; ইহাতে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, আমরা যে-সব পরিবর্তন ইহাতে দেখি, সেগুলি আপাত-প্রতীয়মান। দেশ, কাল ও নিমিত্ত এই পরিবর্তন ঘটায়; অথবা মনোবিজ্ঞানের উচ্চতর সামান্যীকরণ অনুসারে বলা যায় যে, নাম ও রূপের দ্বারাই ইহা ঘটে। নাম ও রূপ দিয়াই আমরা একটি পদার্থকে অপরটি হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝি। নাম এবং রূপ-ই পার্থক্যের সৃষ্টি করে; আসলে সবই এক ও অভেদ।

আবার বেদান্তবাদীরা বলেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ বলিয়া কিছু নাই এবং সৃষ্টির মূলে একটি সত্তা আছে, শুধু বুদ্ধির দ্বারা অধিগম্য জগৎ বলিয়াও কিছু নাই। রজ্জু সর্পে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় মাত্র, ইহা সত্য পরিবর্তন নহে; যখন ভুল ভাঙিয়া যায়, তখন সর্প শূন্যে লীন হয়; মানুষ যখন অজ্ঞানের মধ্যে থাকে, তখন সে সৃষ্ট জগৎ-ই দেখে, ঈশ্বরকে দেখে না। যখন সে ঈশ্বরকে দেখিতে পায়, তখন তাহার কাছে জগৎ একেবারে লোপ পায়। এই ভ্রমকে 'অবিদ্যা' বা 'মায়া' বলা যায়; ইহাই এই সৃষ্টির কারণ, ইহারই প্রভাবে চরম সত্যকে, অপরিবর্তনীয়কে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বলিয়া আমরা মনে করি। এই মায়া মহাশূন্য বা অস্তিত্বহীন কিছু নয়। সৎ-ও নয়, অসৎ-ও নয়—ইহাই হইল মায়ার সংজ্ঞা: অর্থাৎ মায়া আছে—এ-কথাও বলা চলে না, আবার নাই—এ-কথাও বলা যায় না। একমাত্র চরম সত্যকে 'সৎ' বলা যাইতে পারে: সেদিক দিয়া দেখিলে মায়া অসৎ, মায়ার অস্তিত্ব নাই। আবার মায়া অসৎ—এ-কথাও বলা যায় না; কারণ তাহা যদি হইত, তবে ইহা কখনও জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিত না। কাজেই ইহা এমন একটা কিছু, যাহা সৎ বা অসৎ কোনটিই নয়; এজন্য বেদান্তদর্শনে ইহাকে 'অনির্বচনীয়' অর্থাৎ বাক্যদ্বারা প্রকাশের অযোগ্য বলা হইয়াছে।

মায়া-ই এই বিশ্বের আসল কারণ। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যাহাতে উপাদান দেন, মায়া তাহাতে নাম ও রূপ দেয়; এবং উপাদানই এই সব-কিছুতে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। কাজেই অদ্বৈতবাদীর কাছে জীবাত্মার কোন স্থান নাই। তাহাদের মতে জীবাত্মা মায়ার সৃষ্টি; আসলে জীবাত্মার কোন (পৃথক্) অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যদি সর্বব্যাপী একটি মাত্র সত্তা থাকে, তবে আমি একটি সত্তা, তুমি একটি সত্তা, সে আর একটি সত্তা—ইত্যাদি কিরূপে সম্ভব? আমরা সকলেই এক; দ্বৈতজ্ঞানই অনর্থের মূল। বিশ্ব হইতে আমি পৃথক্—এই বোধ যখনই জাগিতে শুরু করে, তখনই প্রথমে আসে ভয়, এবং তারপর আসে দুঃখ। 'যেখানে একে অপরে কথা শোনে, একে অপরকে দেখে, তাহা অল্প। যেখানে একে অপরকে দেখে না, একে অপরের কথা শোনে না—তাহাই ভূমা, তাহাই ব্রহ্ম। সেই ভূমাতেই পরম সুখ, অল্পে সুখ নাই।'

কাজেই অদ্বৈত-দর্শনের মতে বস্তুর এই পৃথক্করণ, এই সৃষ্টি যেন সাময়িকভাবে মানুষের যথার্থ স্বরূপ ঢাকিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বরূপের পরিবর্তন মোটেই ঘটে নাই। নিম্নতম কীট এবং উচ্চতম মানুষের মধ্যে সেই একই ঈশ্বরীয় সত্তা বিদ্যমান। কীটের দেহই নিম্নতম রূপ, যেখানে দেবত্ব মায়া দ্বারা অনেক বেশী পরিমাণে আবৃত রহিয়াছে; যেখানে দেবত্বের উপর আবরণ ক্ষীণতম, তাহাই উচ্চতম রূপ বা দেহ। সব-কিছুর পিছনে সেই এক দেবত্বই বিরাজমান; এই সত্য অবলম্বন করিয়াই নীতির ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। অপরের অনিষ্ট করিও না। প্রত্যেককে নিজের মতো ভালবাসো, কারণ সমগ্র বিশ্বই এক। অপরের অনিষ্ট করিলে নিজেরই অনিষ্ট করা হয়; অপরকে ভালবাসিলে নিজেকেই ভালবাসা হয়। এই সত্য হইতেই অদ্বৈত-নীতির মূলতত্ত্বের উদ্ভব; ইহাকেই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে—আত্মত্যাগ।

অদ্বৈতবাদী বলেন, এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ববোধই আমাদের সব অনর্থের মূল কারণ। এই অহং-বোধই আমাকে অপর হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই ঘৃণা, দ্বেষ, দুঃখ, সংগ্রাম এবং আরও সব অনর্থের সৃষ্টি করে। এই বোধ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়, সব দুঃখ চলিয়া যায়। কাজেই এই পৃথক্ আমিত্ব-বোধ ত্যাগ করিতে হইবে। নিম্নতম জীবের জন্যও প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যখন যখন কেহ একটি ক্ষুদ্র কীটের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হন, বুঝিতে হইবে তিনি তখন অদ্বৈতবাদীর ঈপ্সিত পূর্ণত্বে পৌঁছিয়াছেন; যে মুহূর্তে সে এভাবে প্রস্তুত হয়, সেই মুহূর্তেই তাহার সম্মুখ হইতে মায়ার আবরণ অপসৃত হয়, সে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে। এই জীবনেই সে অনুভব করিবে, সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সে এক। কিছুক্ষণের জন্য এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যেন তাহার কাছে লুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং সে নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিবে। কিন্তু যতক্ষণ দেহের কর্ম—প্রারব্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে দেহধারণ করিয়া থাকিতে হইবে।

এই অবস্থাকে—যে-অবস্থায় মায়ার আবরণ অপসৃত হইয়াছে, অথচ শরীরটা কিছুদিন থাকিয়া যায়, তাহাকে বেদান্তবাদীরা 'জীবন্মুক্তি' বলেন। কেহ যদি মরীচিকা দেখিয়া কিছুকাল বিভ্রান্ত হয়—কিন্তু একদিন সে মরীচিকা অদৃশ্য হয়—তাহা হইলে পরদিন বা কিছুদিন পরে সম্মুখে আবার মরীচিকার আবির্ভাব হইলেও উহা দেখিয়া সে তখন আর ভুল করিবে না। মরীচিকা-ভ্রম প্রথম বার দূর হইবার পূর্বে সে ব্যক্তি বাস্তব ও ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য ধরিতে পারিত না। কিন্তু মরীচিকা একবার অদৃশ্য হইলে, ভুল একবার ভাঙিলে চক্ষু ও ইন্দ্রিয় যতক্ষণ কর্মক্ষম থাকিবে, ততক্ষণ সে আবার মরীচিকা দেখিবে বটে, কিন্তু উহাকে বাস্তব বলিয়া আর কখনও ভুল করিবে না। বাস্তব জগৎ ও মরীচিকার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা সে ধরিয়া ফেলিয়াছে, মরীচিকা আর কখনও তাহার ভ্রান্তি জন্মাইতে পারিবে না। তেমনি বেদান্তবাদী যখন নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার নিকট সমগ্র জগৎ লুপ্ত হয়। জগৎ আবার ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু পূর্বের সেই দুঃখময় জগৎ-রূপে নয়। দুঃখের কারাগার তখন সচ্চিদানন্দে—নিত্য সত্তায়, নিত্য জ্ঞানে, নিত্য আনন্দে পর্যবসিত হইয়া গিয়াছে; এই অবস্থা লাভ করাই অদ্বৈত-বেদান্তের লক্ষ্য।

ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে

স্বামী নির্বাণানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু শুনিবার জন্য একদিন আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের মঠবাটীর পূর্ব দিকের উপরের বারান্দায় মহারাজকে বলিলাম, 'মহারাজ, ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন।'

শুনিয়া মহারাজ চুপ করিয়া রহিলেন; একটু পরে বলিলেন, 'তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।' বলিতে বলিতে অন্তর্মুখী হইয়া গেলেন, আরও কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 'আমি তোমাদের জন্য প্রার্থনা করছি, তোমরাও তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তিনিই বুঝিয়ে দেবেন।'

* * *

মঠবাটীর পূর্ব দিকের উপরের বারান্দায় কথাবার্তা হইতেছিল, মহারাজ ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন, আশে-পাশে ৮।৯ জন সাধু ব্রহ্মচারী বসিয়া। তাঁহাদের মধ্যে একজন নির্জনে শুধু ধ্যানধারণা করিবার জন্য তপস্যায় যাইতে চায়, মহারাজের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করায় তিনি বলিলেন, 'এ-রকম করতে পারলে তো ভাল, তা ক-জনে পারে? যদি একান্তই ইচ্ছা হয়, তবে দু-চার-ছ-মাস এভাবে কাটাতে পারো, তোমাদের শরীর-মন তপস্যার নয়; কর্ম ও উপাসনা এক সঙ্গে অভ্যাস করতে হবে।

* * *

কাশী থেকে মহারাজকে চিঠি লিখেছি, তাতে একটি প্রশ্ন করেছিলাম, 'ঠাকুর কি সত্যই আছেন?' কিছুদিন পরে পত্রোত্তরে তিনি লিখলেন, 'পত্রপাঠ মঠে চলে এস।' মঠে এসে দোতলায় তদানীন্তন অফিস-ঘরে (স্বামীজীর ঘরের পাশে) মহারাজকে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই বললেন, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? তিনি সত্যি আছেন, তা নইলে আমরা আজীবন কি নিয়ে পড়ে আছি?'

* * *

মহারাজের দৃষ্টি সব দিকেই ছিল, তরকারি কোটা হচ্ছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, আর বলছেন, 'বিভিন্ন তরকারির কুটনো কোটা আলাদা। সুক্তোর কুটনো, ঝোলের কুটনো, চচ্চড়ির কুটনো—সব আলাদা। কোটা তরকারি দেখেই রাঁধুনিরা বুঝে নেবে কি কি রাঁধতে হবে।'

* * *

ভুবনেশ্বরের মঠে ছাদে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া রামলাল-দাদা মহারাজকে একটু দুঃখিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা যখন ঠাকুরের কাছে ছিলেন, তখন তো কত সাধন ভজন করেছিলেন, তারপরও ধ্যান-ধারণা কি ভীষণ ভাবে চলেছিল, কই, আজ-কাল ছেলেদের তো সেই রকম কিছু দেখতে পাই না।

মহারাজ এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'দেখ রামলাল-দাদা, তুমি জানো না, এই সব ছেলে সৎ হবার জন্য কত চেষ্টা করছে। অন্তরে যারা সৎ হবার যত চেষ্টা করে, সাধনা করে, বাইরের জগৎ থেকে তাদের তত বেশী ধাক্কা আসে; শুধু তাই নয়, সূক্ষ্ম জগৎ থেকেও অসদ্‌বৃত্তিসম্পন্ন সূক্ষ্ম শরীর তাদের মনের ভেতরে প্রবেশ করে। তুমি কি জানো দাদা, এরা কে কি করছে, না করছে? এরা যদি ঠাকুরের নাম নিয়ে পড়ে থাকতে পারে তো গুরুকৃপায় সব হয়ে যাবে!

ভুবনেশ্বর মঠে হল-ঘরে মহারাজ বসে আছেন; রামলাল-দাদা উপস্থিত, মহারাজ জনৈক সাধুকে বলছেন, 'দেখ্, গুরুকৃপায় তোদের সব হয়ে যাবে। তবে এ জীবনে যদি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে সম্ভোগ করতে চাস্, তবে দীন হীন কাঙাল হয়ে, অকিঞ্চন হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে।

* * *

বলরাম-মন্দির, ১৯১৮ খৃঃ। মঠ হইতে জনৈক সাধু আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিলেন, মহারাজও তাঁহার ও মঠের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে তাহার বেশ-ভূষার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ্—একটু চেপে চুপে থাক্! ঠাকুর যুগাবতার হয়ে এসেছেন, তাঁর নামে কত মঠ-মন্দির হবে, কত টাকা-পয়সা আসবে, তার ইয়ত্তা নেই, তোদের যদি ত্যাগ-সংযম না থাকে, তা হ'লে তোরা আসল জিনিস হারিয়ে ফেলবি।'

* * *

বলরাম-মন্দিরে ছোট ঘরে—অন্তর্ধানের কয়েকদিন পূর্বে। মাস্টার মশাই (শ্রীম) আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কেমন আছেন? একটু ভাল বোধ করছেন?'

মহারাজ এ-কথার কোন জবাব না দিয়া বলিলেন, 'মাস্টার মশাই, ঠাকুর এবার এসে জীবলোক আর শিবলোকের মাঝে একটি ব্রীজ (bridge=সেতু) তৈরী ক'রে গেছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে ভগবানের কাছে যাবার কত সুবিধা হয়েছে।'

কিছুক্ষণ পরে মাস্টার মশাইকে আবার বলিলেন, 'যখন যুগাবতার আসেন, তখন প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হয়, তাতেই মানুষের সহজে চৈতন্যের উদয় হয়।'

কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মহারাজ ছিলেন আমাদের পরিচালক, কিন্তু মঠের অধ্যক্ষ-পদের কর্তৃত্ব দ্বারা নয়, তিনি আমাদের পরিচালনা করতেন—তাঁর প্রেমের বশীকরণ-শক্তি দ্বারা।'

জগতের দিক দিয়ে দেখলে সব দিকে সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না;
ভগবানের দিক দিয়ে দেখলে তবে সব দিকে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

বিবেকানন্দ-বন্দনা

(স্বামীজীর শততম জন্মস্মৃতিবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে)

[দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র' স্তবটির সুরে গেয়]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দেবতার লীলাভূমি ভারতের প্রাণের প্রতিভূ, হে চিরদীপ্ত
অলোক-লোকের অশোক দুলাল, পুণ্য শুভ্র, ধর্ম নিত্য!
দহি' বিলাসের মায়াবিনী কায়া ওগো নিষ্কাম অমলকান্তি!
কত দিশাহারা জনে দিলে দিশা, ভীরু অশান্তে—ভরসা, শান্তি!
অন্নের পথ ঘুচায়ে, বাজায়ে ত্যাগের শঙ্খ বিবেকানন্দ
দিলে তাহাদের দিব্য নয়ন—ছিল যারা মোহবাসনা-অন্ধ!
তামসিকতার ক্লিন্ন নিগড়ে শৃঙ্খলিতের দুঃখদৈন্য
ঘুচাতে হে মহা-সেনানী, তোমার গড়িয়া তুলিলে ত্যাগীর সৈন্য!
হীন লোকাচারে মিথ্যাবিহারে ছিল যারা চির-পথভ্রান্ত,
তোমার অভ্যুদয়ে হ'ল নব-অরুণোজ্জ্বল পথের পান্থ।
অন্নের পথ···অন্ধ!
হে অপরাজেয়! বরি' দেবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
জানিলে তাঁহার বরে—তুমি চিরজীবন্মুক্ত, শিবের অংশ।
পরশে তোমার তাই তো ঘটিল অঘটন—যারা ছিল নগণ্য
তোমার বীর্য জ্ঞানের পরশমণির ছোঁয়ায় হ'ল হিরণ্য!
অন্নের পথ···অন্ধ।
প্রাচী প্রতীচীর-মাঝে সেতু বাঁধি, সিন্ধুর বাধা করিলে লুপ্ত,
ঐন্দ্রজালিক! জাগালে—যাহারা পরাধীনতায় ছিল নিষুপ্ত।
গীতা ও পুরাণ, ন্যায় বিজ্ঞান, দর্শন উপনিষদ্ তন্ত্র
কণ্ঠে তোমার ঝঙ্কৃল হয়ে জগন্মাতার অভয়মন্ত্র।
অন্নের পথ···অন্ধ!
ব্রহ্মচারী যে স্বাধিকারে তার, শুধুই জপিল অমৃত-তৃষ্ণা
প্রেমের মুকুট দেখি' শিরে যার লাজে মুখ ঢাকে কামনা কৃষ্ণা,
সে-তুমি বিলালে দুহাতে তোমার সাধনালব্ধ মণিকারত্ন
স্বার্থ ভুলিয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবায় রহিয়া মগ্ন!
অন্নের পথ···অন্ধ!

সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

ইতিহাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

বলা বাহুল্য বিবেকানন্দের 'Spiritual Interpretation of History' তত্ত্বকে কোন মতেই ইতিহাসে যা 'Idealistic Interpretation of History' নামে আখ্যা পেয়েছে, তার সমপর্যায়ভুক্ত করা চলে না। আধ্যাত্মিক কোন কিছুকেই 'idealistic' আখ্যা দেওয়া আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। কারণ হেগেলের 'Idea'র বিবর্তন-তত্ত্বই 'Idealistic Interpretation of History' নামে খ্যাত। আমরা হেগেলের উক্ত মতকে খণ্ডন করেছি। বিবেকানন্দের মতবাদ একটি মৌলিক মতবাদ এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। বিবেকানন্দের 'Spiritual Interpretation of History' তিনটি মূলসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত :

(১) 'All progress is in successive rise and falls'.—উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই সব অগ্রগতি।

(২) 'Civilisation means manifestation of divinity of man'.—সভ্যতার অর্থ মানুষের দেবত্ব-প্রকাশ

(৩) 'Materialism and spirituality in turn prevail in society'.—জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ ক্রমান্বয়ে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে।

এই সূত্র-তিনটির ব্যাখ্যা তাঁর রচনাবলীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। প্রথমতঃ তাঁর প্রথম সূত্রটি আলোচনা করলে দেখা যায়, মার্ক্স যে সরলরেখা-পদ্ধতিতে সমাজ-বিকাশের ধারা ব্যাখ্যা করেছেন, বিবেকানন্দ তা বলছেন না। তিনি বলছেন—সমাজের বিবর্তন উত্থান-পতনের ধারায় সঙ্ঘটিত হয়। সোরোকিন (Sorokin) প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানী মার্ক্স-এর 'principle of linear progress'কে অবৈজ্ঞানিক বলেছেন। কারণ উন্নতি থাকলে অবনতি থাকবেই, অনুবর্তন (evolution) থাকলে পুনর্গুপ্তি (involution) থাকবেই। এ উভয় মার্ক্স-এর দ্বান্দ্বিকবাদ-এর 'thesis', 'anti-thesis'-এর মতো অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত। ইতিপূর্বে বিবেকানন্দের এই 'Theory of Rhythm' সম্পর্কে বর্তমান পত্রিকায় বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।[১] সেইজন্য এখানে তার পুনরুক্তি হ'তে বিরত হলাম। বর্তমানকালের সমাজ-বিজ্ঞানীরা যে 'Linear Progress' তত্ত্বকে অবৈজ্ঞানিক ব'লে প্রমাণিত করেছেন, উক্ত আলোচনায় এ-কথা প্রর্দি করা হয়েছে। সোরোকিন প্রভৃতির মতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হ'ল 'Theory of Rhythm' অর্থাৎ উত্থান-পতনের ধারায় সমাজ-বিবর্তন।[২] অতএব অতি-সম্প্রতি যে-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক ব'লে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিবেকানন্দ সেই পদ্ধতিতে ইতিহাসের বিবর্তন ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তাতে দেখাচ্ছেন—সভ্যতার বিকাশ ঘটছে আধ্যাত্মিকতার বিকাশেই, যদিও

১ লেখিকা-রচিত 'বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন' ১৩৬৬, উদ্বোধন

২ Sorokin তাঁর 'Social and Cultural Dynamics' গ্রন্থে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সে বিকাশ সরল রেখায় ঘটছে না, একবার আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটছে, আবার তা মালিন্য প্রাপ্ত হচ্ছে, আবার জড়বাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যখনই আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটছে, তখনই সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে। চিন্তায়, শিল্প-কলায় ধন-সম্পদে দেশ উন্নত হচ্ছে। আবার যখন জড়বাদের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে, তখন ধীরে ধীরে প্রতিভার অবনতি ঘটছে, সৃজনী শক্তির মৌলিকতা লুপ্ত হচ্ছে।

ইতিহাসে আমরা দেখি, বৈদিক যুগের আদিতে যখন আধ্যাত্মিকতার প্লাবন এসেছিল, তখন চিন্তার যে উৎকর্ষ ঘটেছিল, তা হয়তো আজও আমরা অতিক্রম করতে পারিনি। কিন্তু সে-যুগেরও শেষভাগে জড়বাদের প্রভাব ভারতবর্ষে বিশেষ প্রকট হয়েছিল। তখন 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'—এই আদর্শ প্রসার লাভ করেছিল। কিন্তু ভারতে সভ্যতার ইতিহাসে পরবর্তী যুগই উন্নতির যুগ, যখন শ্রীবুদ্ধ আবির্ভূত হয়ে পুনর্বার ভারতকে প্লাবিত করেছিলেন অধ্যাত্ম-ভাবধারায়। তখনই আমরা ভারতবর্ষকে স্থাপত্যে, শিল্পে, আর্থিক জীবনে উন্নতির স্বর্ণচূড়ায় অধিষ্ঠিত দেখেছি। বুদ্ধের পর পুনরায় ভারতবর্ষ জড়বাদের কবলিত হয়। তখন আবির্ভূত হন শ্রীশঙ্কর এবং বেদান্তধর্মের প্রসার ঘটিয়ে ভারতীয় সভ্যতার প্রাণশক্তির পুনরুদ্ধার করেন। বিবেকানন্দ বলছেন : 'The Advaita has twice saved India from materialism. By the coming of Buddha, who appeared in a time of most hideous and wide-spread materialism......By the coming of Shankara, who when materialism had reconquered India in the form of the demoralisation of the ruling classes and of superstition in the lower orders, put fresh life into Vedanta, by making a rational philosophy emerge from it.'

অতএব বার বার ভারতবর্ষে দেখা গেছে, চক্রাকারে আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের আবির্ভাব এবং আধ্যাত্মিকতার প্রাদুর্ভাবে সভ্যতার উন্নতি। ইতিহাসের এই শিক্ষা থেকেই বিবেকানন্দ এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, 'প্রত্যেক জাতির প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিহিত, আধ্যাত্মিকতা বিলীন হইয়া বস্তুবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে এই প্রাণশক্তি শুকাইতে থাকে।' আধ্যাত্মিকতার মালিন্যে সমাজের পতন ঘটে, আর তার বিকাশেই উন্নতি ঘটে। ইতিহাস এই আধ্যাত্মিকতার শক্তি-বিকাশের কাহিনী। আমরা দেখছি—বিবেকানন্দের সঙ্গে এ-বিষয়ে ফুয়ারবাক্ (Fuerbach)-এর পূর্বোল্লিখিত মতের ঐক্য আছে যে, 'The periods of human history are distinguished by changes in religion'।

ফুয়ারবাক্ ছাড়া বিবেকানন্দের এই 'Spiritual Interpretation of History'র সমর্থন পাই আমরা সোরোকিনের সমাজ-বিবর্তনের ব্যাখ্যায় ও টয়েনবীর[৩] ইতিহাসের গতি-ক্রম বিস্তারের মধ্যে। আরও কিছু কিছু লেখকের চিন্তাধারায় আমরা এই ভাবধারা পাই, তাঁরা হলেন Northrop, Schubert, Schwitzer প্রভৃতি এঁদের মধ্যে সোরোকিনের মতের সঙ্গে বিবেকানন্দের মতের বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সোরোকিন

৩ Toynbee—Study of History দ্রষ্টব্য।

৪ Cowel-এর 'History civilisation and culture' এবং Sorokin-এর 'Social Philosophies of an age of crisis' গ্রন্থে এঁদের মতের আলোচনা পাওয়া যাবে।

বলেন, সমাজ-সংস্কৃতি বিকাশের তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম 'Ideational' (অধ্যাত্মপ্রধান), দ্বিতীয় 'Idealistic' (আধ্যাত্মিকতা ও ইন্দ্রিয়ানুগতার মধ্যবর্তী), তৃতীয় 'Sensate' (ইন্দ্রিয়ানুগ)। এই পর্যায় তিনটি বিশ্লেষণ করলে আমরা স্বামীজীর মতেরই সমর্থন পাই যে, ক্রমান্বয়ে আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য ও জড়বাদের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ইতিহাসের গতিচক্র আবর্তিত হয়। সোরোকিন তাঁর মত-প্রতিষ্ঠায় প্রচুর তথ্য ব্যবহার করেছেন, সে-সকল এখানে স্থানাভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই সকল তথ্য উদ্ঘাটন ক'রে তিনি তাঁর মত বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।[৫] সুতরাং বিবেকানন্দের ইতিহাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যে বৈজ্ঞানিক, এ-কথা বললে অসঙ্গত হয় না।

এদিক থেকেই কার্ল মার্ক্স-এর সঙ্গে বিবেকানন্দের বিপুল পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং ডক্টর দত্তের সিদ্ধান্তের[৬] বিপরীত প্রমাণই আমরা পাচ্ছি এবং স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি বিবেকানন্দ মার্ক্স-এর সমগোষ্ঠীভুক্ত সমাজ-তন্ত্রবাদী নন। ইতিহাসকে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেছেন।

৫ লেখিকা-রচিত পূর্বোল্লিখিত 'বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন' প্রবন্ধত্রয় দ্রষ্টব্য।

৬ গত আশ্বিন সংখ্যায় এই প্রবন্ধাবলীর সূত্রপাত দ্রষ্টব্য—(৬৪ তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)।

আপনার জন

শ্রীকালিদাস রায়

দুর্গতদীন অশুচিদের মাঝে
শ্রীভগবান দুঃস্বরূপেই রাজে।
এই কথাটা শাস্ত্রাদিতে পড়ি,
মনে মনে স্বীকারও তা করি।
তবু তাদের আপনার জন ব'লে,
পারিনাতো টেনে নিতে কোলে।

আপনার জন যদিই নাহি ভাবি
মানি যেন মানবতার দাবি।
কোলে তাদের টানিই বা না টানি
ঘৃণার যোগ্য নয় যেন তা মানি।
পোষণ যদি করতে নাই-ই চাই
শোষণ যেন করতে না আগাই।

সোহাগ যদি করতে নাই-ই পারি
শাসনেরও নইতো অধিকারী।
সমান তাদের যদিই নাহি ভাবি,
নেইক মোদের জুলুম করার দাবি।

মিটাই যেন তাদের হকের ধন
কৃপা করার কীই বা প্রয়োজন!
জানি যেন এক ভগবান পিতা,
পর তারা নয়, তারা গুহক-মিতা।

শঙ্কর-মতে আত্মা, বন্ধ ও মোক্ষ

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন

শঙ্কর কেবলাদ্বৈতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ, বিষয় ও বিষয়ীর অর্থাৎ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ এবং বিষয় ও বিষয়ান্তরের ভেদ—সর্বপ্রকার ভেদই মায়াকল্পিত ও মিথ্যা। তিনি সর্বপ্রকারভেদ-বর্জিত একত্বে বিশ্বাস করিতেন। উপনিষদে পুনঃ পুনঃ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব-বিষয়ে উপদেশ করা হইয়াছে। শঙ্করও জীবাত্মা ও ব্রহ্মের একত্বে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে জীবাত্মা ও ব্রহ্ম এক—অভিন্ন।

'তৎ-ত্বম্-অসি' বাক্যের অর্থ

আপাত-দৃষ্টিতে মানুষ দেহ ও আত্মার সমষ্টি। কিন্তু মানুষের দেহ অন্যান্য জড়দ্রব্যের ন্যায় মিথ্যা অবভাসমাত্র। দেহ সদ্বস্তু নয়—ইহা উপলব্ধি করিলে দেহাত্মজ্ঞান চলিয়া যায় এবং কেবল আত্মাই থাকে। দেহব্যতিরিক্ত আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মা ও ব্রহ্মের কোন ভেদ নাই। উপনিষদুক্ত 'তৎ-ত্বম্-অসি' মহাবাক্যে আত্মা ও ব্রহ্মের একান্ত অভেদের কথা বলা হইয়াছে। অবশ্য যদি এখানে 'ত্বম্' অর্থাৎ 'তুমি' শব্দদ্বারা দেহবিশিষ্ট ও দেহদ্বারা পরিচ্ছিন্ন জীবকে বুঝা যায় এবং 'তৎ' অর্থাৎ 'সেই' শব্দদ্বারা বিশ্বাতীত ব্রহ্মকে বুঝা যায়, তবে 'ত্বম্' ও 'তৎ' এক বা অভিন্ন হইতে পারে না। অতএব 'ত্বম্' বলিতে মানুষের অন্তর্নিহিত শুদ্ধচৈতন্যকে বুঝিতে হইবে এবং 'তৎ' বলিতে ব্রহ্মের শুদ্ধজ্ঞান বা চৈতন্যসত্তাকে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহাদের একতা বা অভেদ প্রতিপন্ন হইবে এবং বেদান্তে বা উপনিষদে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। অখণ্ডার্থক বাক্যদ্বারা বিষয়টি বুঝানো যায়। একত্ব-বিষয়ক বাক্যকে (identity judgment) অখণ্ডার্থক বাক্য বলে, যেমন 'এই সেই দেবদত্ত'—এই বাক্য। এখানে এই দেশে ও কালে দৃষ্ট দেবদত্ত যে, পূর্বকালে ও ভিন্ন দেশে দৃষ্ট দেবদত্ত হইতে অভিন্ন, অথবা একই দেবদত্ত যে পূর্বে ও বর্তমানে দৃষ্ট হইল, তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু দেবদত্তের অতীত ও বর্তমান দেশিক ও কালিক অবস্থা ভিন্ন, অতএব ভিন্ন অবস্থাপন্ন দেবদত্ত ভিন্ন হইবে, এক হইতে পারে না। তথাপি দেশ-কাল-সম্বন্ধ-বর্জিত দেবদত্ত যে এক, তাহা স্বীকার্য। এইভাবে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ভেদক অবস্থা ব্যতিরেকে এবং শুদ্ধ চৈতন্যরূপে জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন বুঝিতে হইবে। জীবাত্মা দেহ-মন-সম্বন্ধদ্বারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ব্রহ্মও স্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি গুণদ্বারা জীবাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হন। কিন্তু এ-সব ভেদক গুণধর্ম বাস্তবিক নয়, ইহারা মায়িক ও প্রাতিভাসিক। অতএব জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন বলিয়া অবভাসিত হইলেও, বস্তুতঃ ইহারা এক ও অভিন্ন। ইহাই প্রতিপাদন করা 'তৎ-ত্বম্-অসি' বাক্যের গূঢ়ার্থ। জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মই, অপর কিছু নয়, ইহা ব্রহ্মভূত ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। অজ্ঞানজন্য দেহসম্বন্ধদ্বারা ইহা ক্ষুদ্র ও পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর মায়ার কার্য

দেহ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি। স্থূল শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ ও অন্তঃকরণের (মন,

বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত) সমষ্টি। মৃত্যুকালে স্থূল শরীর বিনষ্ট হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর বিদ্যমান থাকে এবং আত্মার সহিত দেহান্তরে গমন করে। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়প্রকার শরীরই মায়ার কার্য এবং প্রাতিভাসিকমাত্র।

অজ্ঞানজন্য দেহসম্বন্ধই আত্মার বন্ধন

অনাদি অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃ আত্মার দেহের সহিত ভ্রান্ত সম্বন্ধবোধ হয়। দেহসম্বন্ধ-বোধই আত্মার বন্ধ। বন্ধাবস্থায় আত্মা তাহার ব্রহ্মরূপত্ব বিস্মৃত হইয়া নিজেকে ক্ষুদ্র, পরিচ্ছিন্ন ও দুঃস্থ জীব বলিয়া ভাবে এবং মনে করে যে, সে প্রিয় বস্তু পাইলে সুখী হয়, না পাইলে দুঃখী হয়। সে নিজেকে দেহ-মনের সহিত অভিন্ন বোধ করে। ইহা হইতেই তাহার অহংজ্ঞান বা আমিত্ব-বোধ জন্মে এবং অন্য বস্তুর সঙ্গে তাহার পার্থক্য ও বিরোধের সৃষ্টি হয়। অহং বা আমি বাস্তবিক আত্মা নয়, ইহা আত্মার এক প্রাতিভাসিক পরিচ্ছিন্ন রূপমাত্র।

বন্ধাবস্থায় আত্মার জ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়

দেহসম্বন্ধদ্বারা আত্মার জ্ঞানও সীমাবদ্ধ ও পরিচ্ছিন্ন হয়। ইহা ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের মাধ্যমে বিষয়ের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান লাভ করে। এরূপ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান দুইপ্রকার - প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। যেমন জল কোন নালী দিয়া কোন জমিতে পড়িলে জমির আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ কোন ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বহির্বিষয়ে গমন করিয়া তদাকারে পরিণত হয় এবং তাহা হইলেই প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। পরোক্ষ-জ্ঞান পাঁচপ্রকার—অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। এই সব প্রমাণ-বিষয়ে অদ্বৈতমত ভাট্টমীমাংসা-মতের অনুরূপ। ভাট্টমত অন্যত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। 5702।

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—সাধারণ জ্ঞানের তিনটি স্তর

আমাদের সাধারণ জ্ঞানের তিনটি স্তর বা ভূমি আছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রদ-বস্থায় মানুষ নিজেকে স্থূল-শরীর এবং বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সহিত অভিন্ন মনে করে। স্বপ্নাবস্থায় মানুষের পূর্ব-প্রত্যক্ষের সংস্কারজন্য বিষয়সকলের জ্ঞান হয়। এ অবস্থায় সে জ্ঞাতারূপে বিষয়গুলি জানে এবং বিষয়দ্বারা তাহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ হয়। সুষুপ্তিকালে তাহার কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না। বিষয় না থাকায় সেও নিজেকে বিষয়ী বলিয়া জানে না। এমত অবস্থায় বিষয়ী ও বিষয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এরূপ ভেদজ্ঞান বা দ্বৈতবোধও থাকে না। তখন সে নিজেকে দেহদ্বারা সীমাবদ্ধ বোধ করে না। কিন্তু তখন যে কোন জ্ঞান থাকে না, তাহা নয়। জ্ঞান না থাকিলে নিদ্রাভঙ্গের পর কেহ সুষুপ্তির কথা স্মরণ করিতে পারিত না, কেহ বলিতে পারিত না যে, সে সুখে ও শান্তিতে নিদ্রা গিয়াছিল। অতএব সুষুপ্তিকালে জ্ঞান থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

সুষুপ্তিকালে আত্মার দেহসম্বন্ধবোধ থাকে না। ইহা হইতে আত্মার স্বরূপের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। আত্মা স্বরূপতঃ ক্ষুদ্র ও দুঃস্থ জীব নয়। ইহা অহং বা 'আমি' নয় এবং 'তুমি' বা অন্য বস্তু হইতে পৃথক্‌ও নয়। ইহার বিষয়-বাসনাও নাই এবং তজ্জন্য শোক ও দুঃখ নাই। ইহা বাস্তবিক অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ।

কিভাবে শুদ্ধ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, শঙ্কর ও তাঁহার অনুগামিগণ তাহার পথ-নির্দেশ করিয়াছেন। সুষুপ্তি শান্তি ও আনন্দের অবস্থা বটে, কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় না। নিদ্রা-ভঙ্গের পর মানুষের আবার ভ্রান্ত দেহসম্বন্ধের

ও দুঃখের অনুভূতি হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সুষুপ্তিকালেও মানুষের পূর্বসঞ্চিত কর্ম বা অবিদ্যার লেশ থাকে এবং তাহাই মানুষকে পুনরায় জগদ্‌ভ্রমে পাতিত করে। যতদিন পূর্বসঞ্চিত কর্ম বিনষ্ট না হয়, ততদিন মানুষের দুঃখবন্ধন হইতে মুক্তি হয় না।

বেদান্তপাঠের জন্য মীমাংসা-বিচার অনাবশ্যক

বেদান্তবিচারে অবিদ্যা-নিবৃত্তির সহায়তা হয়। কিন্তু বেদান্তের উপদেশ পাঠ করিলেই অভীষ্ট ফললাভ হয় না। এজন্য বেদান্তপাঠের অধিকার অর্জন করিতে হয়। রামানুজের মতে বেদান্ত পাঠ করিবার পূর্বে 'মীমাংসাসূত্র' পাঠ করা আবশ্যক। কিন্তু শঙ্করের মতে মীমাংসা-বিচার বেদান্ত-বিচারের অনুকূল নয়, বরং প্রতিকূল। মীমাংসায় দেবতাদের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের উপদেশ করা হইয়াছে। ইহাতে পূজ্য, পূজক প্রভৃতি নানা বস্তুর ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে! অতএব ইহা অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী। ইহাতে অদ্বৈত-জ্ঞানের উন্মেষ না হইয়া দ্বৈত ও নানাত্ব-ভ্রান্তি দৃঢ়মূল হয়।

কিন্তু সাধন-চতুষ্টয় আবশ্যক

বেদান্তবিচারের জন্য বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি ও মুমুক্ষুত্ব—এই সাধন-চতুষ্টয় অর্জন করা আবশ্যক। প্রথমে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক অর্থাৎ ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য—এরূপ জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। তৎপরে ইহলোক ও পরলোকের সকল বস্তুর ভোগ-বাসনা ত্যাগ করা আবশ্যক। তারপর শম (অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম), দম (বহিরিন্দ্রিয়-সংযম), উপরতি (বিহিত কর্মের যথাবিধি ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস-গ্রহণ), তিতিক্ষা (শীতগ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা), সমাধি (চিত্তের একাগ্রতা) ও শ্রদ্ধা (শাস্ত্র ও আচার্য-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস) —এই ষট্‌সম্পত্তি অর্জন করিতে হইবে। তারপর মোক্ষলাভের আন্তরিক ইচ্ছা থাকাও প্রয়োজন।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—বেদান্তপাঠের তিন অঙ্গ

এই সাধনচতুষ্টয়-সমন্বিত ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিকট বেদান্তপাঠ আরম্ভ করিবেন। বেদান্তপাঠ বা বিচারের তিনটি অঙ্গ হইল—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। প্রথমে আচার্যের নিকট বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিতে হইবে। তৎপরে নিজে যুক্তিতর্ক করিয়া আচার্যের উপদেশের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে হইবে—ইহার নাম মনন। পরিশেষে আচার্যোপদিষ্ট সত্য বা তত্ত্বগুলির নিরন্তর ধ্যান বা ভাবনা করিতে হইবে—ইহাকেই নিদিধ্যাসন বলে।

আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব-উপলব্ধিই বন্ধন-মুক্তি

বেদান্তোপদিষ্ট তত্ত্বগুলির জ্ঞান হইলেই পূর্বেকার দৃঢ়মূল ভ্রান্ত ধারণাগুলি বিনষ্ট হয় না। কেবল তত্ত্বগুলি নিরন্তর ধ্যান করিলে এবং তদনুসারে জীবনযাপন করিলে সেগুলি ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। সেগুলি দূরীভূত হইলে এবং বেদান্তবাক্যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিলে আচার্য মুক্তিকামী ব্যক্তিকে 'তৎ-ত্বম্-অসি' এই মহাবাক্যের উপদেশ করেন। তিনি তখন এই মহাবাক্যনিহিত তত্ত্বের নিরন্তর ধ্যান করেন এবং পরিশেষে 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপে সেই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করেন। এইরূপে আত্মা ও ব্রহ্মের অপারমার্থিক ভেদদর্শনের নিবৃত্তি হয়। ভেদদর্শনই বন্ধের মূল। অতএব ভেদদর্শনের নিবৃত্তি হইলে বন্ধনিবৃত্তি হয় এবং তাহাই মুক্তি।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি

মুক্তির পরেও মুক্ত পুরুষের দেহ প্রারব্ধ-কর্মবশে কিছুকাল থাকিতে পারে। কিন্তু

মুক্তপুরুষের আর দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না এবং তিনি সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হন না। তিনি সংসারের সব বস্তু দর্শন করেন বটে, কিন্তু তাহাতে আকৃষ্ট হন না। তিনি সংসারে নির্লিপ্তভাবে বাস করেন। জীবদ্দশায় এইরূপ মুক্তির নাম 'জীবন্মুক্তি'। বৌদ্ধ, সাংখ্য, জৈন এবং অন্য কোন কোন ভারতীয় দর্শনের মতো শাঙ্কর দর্শনেও জীবন্মুক্তির সম্ভাব্যতা স্বীকৃত। মুক্তপুরুষের পূর্বজন্মের সঞ্চিত কর্ম নষ্ট হইয়া যায় এবং বর্তমানের ক্রিয়মাণ বা সঞ্চিত কর্ম নিষ্কাম বলিয়া কোন ফল প্রসব করে না। প্রারব্ধকর্ম ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তিনি বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

মুক্তিতে নূতন কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না

মুক্তিতে নূতন কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না, অথবা কোন পূর্বতন অবস্থার সংস্কার-সাধনও করা হয় না। মুক্তির অবস্থা নিত্য সত্য, এমন কি বন্ধাবস্থাতেও তাহার অপগম হয় না। ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বই মুক্তি এবং ইহা সর্বকালেই সত্য। এই সত্য বিস্মৃত হইয়া আত্মা ও ব্রহ্মের মিথ্যা ভেদ দর্শন করিলে বন্ধন হয়; আর এই সত্যের উপলব্ধি বা সাক্ষাৎ-প্রতীতি হইলে মুক্তি হয়। অতএব যাহা চিরসত্য, তাহার উপলব্ধিই মুক্তি। এ যেন কেহ নিজের গলার হার বিস্মৃত হইয়া এখানে ওখানে খুঁজিয়া বেড়ায় এবং পরে চমক ভাঙিলে দেখে যে, তাহার গলদেশেই হার রহিয়াছে।

মুক্তি আনন্দের অনুভূতি

মুক্তি আত্মা ও ব্রহ্মের মিথ্যা ভেদদর্শনজন্য দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিমাত্র নয়। ইহা এক দিব্য আনন্দের অনুভূতির অবস্থা, কারণ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ এবং মুক্তি ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বের উপলব্ধি।

মুক্তির সহিত নিষ্কাম কর্মের বিরোধ নাই

যদিও মুক্তপুরুষের কাম্য বা প্রাপ্তব্য কোন বস্তু নাই, তথাপি তিনি নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কর্মবন্ধন হয় না। ভগবদ্গীতার উপদেশ অনুসারে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, সকাম কর্মই বন্ধনের হেতু। কিন্তু মুক্ত পুরুষের কোন কামনা-বাসনা থাকে না। তিনি কোন ফলের আশা না করিয়া কর্ম করিতে পারেন। অতএব কর্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে তিনি উল্লসিত বা ব্যথিত হন না। শঙ্কর নিষ্কাম কর্মের বিশেষ উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা মোক্ষপথের পথিক, কিন্তু এখনও মোক্ষলাভ করেন নাই, নিষ্কাম কর্মদ্বারা তাঁহাদের আত্মশুদ্ধি হয়। অহঙ্কার ও স্বার্থবুদ্ধি নিষ্কাম কর্মদ্বারাই নিবৃত্ত হয়, কর্মত্যাগদ্বারা তাহা হয় না। যাঁহারা পূর্ণজ্ঞান বা মোক্ষের অধিকারী, তাঁহাদের পক্ষেও নিষ্কাম কর্ম অজ্ঞ ও বদ্ধ জীবগণের হিতার্থে প্রয়োজন। মুক্ত পুরুষ জনসমাজের আদর্শস্থানীয়। তাঁহার আচরণ দেখিয়াই লোকে শিখিবে। তাঁহার কর্ম বা অকর্ম যেন জনসাধারণকে বিভ্রান্ত না করে। শঙ্করের মতে পূর্ণ জ্ঞানের সহিত সমাজ-সেবার বিরোধ নাই, বরং সামঞ্জস্যই আছে। ইহা তাঁহার জীবনেই দেখা যায়। জগদ্বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ, লোকমান্য বালগঙ্গধর তিলক প্রভৃতি আধুনিক যুগের বেদান্তিগণ জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ের আদর্শই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

সৎ ও অসৎ কর্মের ভেদ বেদান্তে অস্বীকৃত নয়

অদ্বৈতবেদান্তের সমালোচকগণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, যখন অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং সকল প্রকার ভেদ অসত্য

বা মিথ্যা, তখন সৎ ও অসৎ পুণ্য ও পাপ কর্মের ভেদও মিথ্যা হইবে। এরূপ হইলে অদ্বৈতমতকে সমাজের অহিতকারী বলিতে হইবে। কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক দৃষ্টিভেদের অপলাপ করিয়া এইরূপ আপত্তি করা হয়। ব্যাবহারিক-দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ, পুণ্য ও পাপ কর্মের ভেদ, তথা অন্যান্য ভেদ যথার্থ। বদ্ধ পুরুষের পক্ষে যে-কর্ম ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বোপলব্ধির সহায়ক, তাহা সৎ, যেমন সত্যনিষ্ঠা, দয়া, দান, সংযম ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, যে-সব কর্ম সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ইহার বিঘাতক বা বিঘ্নকারী, তাহা অসৎ, যেমন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, হিংসা ইত্যাদি। মুক্তপুরুষের পক্ষে সৎ ও অসৎ এবং পুণ্য ও পাপ কর্মের ভেদ ব্যাবহারিক, পারমার্থিক নয়। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অসৎ বা পাপকর্ম করেন না। আত্মা ও ব্রহ্মের একত্বের উপলব্ধি হইলে দেহাত্মবুদ্ধি অপগত হয় এবং তাহার অপগমে স্বার্থপরতা, হিংসা, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতিও দূরীভূত হয়। রাগ-দ্বেষ হইতেই অসৎ বা পাপকর্মের উৎপত্তি হয়। অতএব মুক্তপুরুষের পাপ বা অসৎ কর্মে প্রবৃত্তির হেতুই থাকে না এবং তিনি কেবল সৎ কর্মই করেন।

উপসংহার

অদ্বৈতবেদান্তের সর্বসম্ভাব্য দোষ-গুণ সত্ত্বেও ইহাকে সর্বসত্তার একত্ববিষয়ে উপনিষদের উপদেশের সর্বাধিক সঙ্গত ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উইলিয়াম জেমস বেদান্তকে সর্বোৎকৃষ্ট একত্ববাদ বলিয়া সমাদর করিয়াছেন! কিন্তু ইহা সকল ব্যক্তির উপযোগী নয়। যে-সব ব্যক্তির নিকট সংসারই সারবস্তু এবং ঐহিক সুখভোগই জীবনের চরম উদ্দেশ্য, তাঁহারা অদ্বৈতবেদান্তের সমাদর করিতে পারিবেন না। কিন্তু যে কতিপয় সুকৃতিসম্পন্ন, ধীমান্ ও বৈরাগ্যবান্ পুরুষ জগতের অনিত্যতা ও অসারতা উপলব্ধি করিয়া নিত্য, অজর ও অমর আত্মা বা ব্রহ্মলাভে দৃঢ়সংকল্প, তাঁহাদের নিকট অদ্বৈত-বেদান্তের অতুলনীয় মহিমা সুপ্রকাশিত।

Vivekananda on Sankara

The marvellous Sankaracharya arose. The writings of this boy of sixteen are the wonders of the modern world, and so was the boy. He wanted to bring back the Indian world to its pristine purity, but think of the amount of the task before him.

—From 'Sages of India'—a lecture delivered in 1897.

স্বামীজীর স্মৃতিকথা

ভক্ত ৺মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বামীজীর সব কথাই ছিল দীক্ষা

স্বামীজী অতি সাধারণ কথা সাধারণ ভাবে আলোচনা করতে করতে অতি গভীর কথা ব'লে যেতেন অনর্গল। মন্ত্র-দীক্ষা না পেলেও এভাবে অন্তরের দীক্ষা যে কত লোক পেয়েছেন, তার ইয়ত্তা হয় না। একবার দুই বন্ধু এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কাশীতে। কথা পেড়েছেন যেমন লোকে ব'লে থাকে—'শরীর কেমন?'

'আ—র শরীর! বাঙালীর শরীর হেগে হেগেই গেল।' এই ভূমিকা থেকে বাঙালীর স্বাস্থ্য ও পশ্চিমে লোকের স্বাস্থ্যের একটা তুলনামূলক আলোচনা করলেন। ক্রমশঃ দুনিয়ার সব জাতের খাওয়া-দাওয়া আর শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ তুললেন। প্রসঙ্গ শেষ করলেন 'অন্নই ব্রহ্ম'—এই কথায়। যে যেমন অন্ন খায়, তার দেহ মন সেই রকম গঠিত হয়—তদনুযায়ী ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্যতা হয়।

যে ভদ্রলোক কথা পেড়েছিলেন, তিনি প্রায় চল্লিশ মিনিট ধ'রে এই বক্তৃতা শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন; পরে বলেছিলেন, 'এমন অদ্ভুত কথা আমি জীবনে শুনিনি। এই সামান্য আহার—তার মধ্যে এত গুরুত্ব!'

বেলুড় মঠে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি কেরানী। কেরানীর কাজ কেমন ক'রে করতে হয়,—কেমন ক'রে ফাইল্ (files) রাখতে হয়, হাতের লেখা কেমন গোটা গোটা ও স্পষ্ট হওয়া উচিত, ইত্যাদি খুঁটিয়ে বলতে থাকলেন প্রায় পঁচিশ মিনিট ধ'রে। এই কাজ শুধু যে অন্নের জন্য তা নয়, দেশের দশের কাজ—ক্রমে 'কর্মই ব্রহ্ম' এই ভাবে সকলের মনটা তুলে দিলেন, এ একটা অনুভূতি! যাঁরা শুনতেন, তাঁরা যে শুধু কথাগুলি শুনতেন, তা নয়—সেই বাণীর পিছনে একটা শক্তি কাজ ক'রত, কিছুক্ষণে মন আচ্ছন্ন হয়ে যেত একটা সমগ্রতার চেতনায়। সেই ভাবটিই সারা জীবনের পাথেয় ও সাধনাস্বরূপ হয়ে উঠত। এই যে ব্যাপারটি, তা যে শুধু স্বামীজীর মধ্যেই দেখা যেত, তা নয়। মহারাজদের (স্বামীজীর গুরু-ভাইদের) অনেকেরই এই গুণটি ছিল। তবে স্বামীজার স্বভাব ছিল সব বিষয়ে একটা জোর দিয়ে বলা এবং তাঁর কথার মধ্যে আশ্চর্য এক শক্তি থাকত, তা মনকে অনুভব করিয়ে দিত।

স্বামীজীর 'লেকচার' যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের কাছে আমি শুনেছি—তাঁর বক্তৃতার সঙ্গে সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর মনকে ধাপে ধাপে তুলে নিয়ে যেতেন এবং শেষে এক 'ব্রহ্মই আছেন সর্বসত্তাময়'—এই ভাবটি সকলের ভিতরে ঢুকে যেত।

অনেক সময় হাসি-তামাসার মধ্যেও স্বামীজী 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই ভাবটি ভিতরে ঢুকিয়ে ছাড়তেন। ভক্তরাজ মহারাজ একবার তাঁর অট্টহাস্য দেখেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ পর্যন্ত তটস্থ! অট্ট অট্ট হাসি। সেই শব্দের ধ্বনি-তরঙ্গ ধাপে ধাপে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে উঠছে—মনও সেই সঙ্গে উপরে উঠে যাচ্ছে। এক বিরাটের মহিমায় সব ছেয়ে গেল!

আমরা যে-সব আধ্যাত্মিক অবস্থাগুলিকে

জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করি, তাঁদের কাছে সে-সব যেন ছেলেখেলা! হাসতে হাসতেই মনটাকে নিরোধ ক'রে দিলেন। একটা হাসি বা ঠাট্টার মধ্যেই অন্তরে এমন ইঙ্গিত ও স্পর্শ দিয়ে দিতেন যে, ওইতেই সব কাজ হয়ে যেত। এ-সব কথা কাউকে বলবার নয়, কারণ কে বুঝতে যাচ্ছে ও-কথা! কিন্তু যারা তাঁদের কাছে গিয়েছে, দেখেছে—তাদের কাছে এ-সব কথা নূতন নয়।

রাজনীতি-সম্পর্কে স্বামীজীর মনোভাব

রাজনীতি বলতে আমরা তখন বুঝতাম—দেশের স্বাধীনতা। ইংরেজদের অধীন ছিল দেশ; অনেক যুবকের মনেই সেজন্য দুঃখ ছিল। স্বামীজী নিজেও ভারতবাসী হিসাবে এই পরাধীনতার গ্লানি অতি গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। কোন কোন ব্যক্তির কাছে তিনি ইংরেজদের সম্বন্ধে অতি কঠিন মন্তব্যও করেছেন। কিন্তু ওইটাই তাঁর একমাত্র ভাব মনে করলে ভুল হবে। ইংরেজদের গুণের কথাও আবার বলেছেন। ইওরোপের লোকেদের কর্মশক্তির প্রশংসা বার বার করেছেন। কিন্তু অত্যাচার বা মনুষ্যত্বের অবমাননা যে কেউ করুক, তার বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়েছেন। একবার একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক তাঁকে ইংরেজদের অনাচার ও অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। স্বামীজী কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর তাঁকেই প্রতিপ্রশ্ন করলেন, 'তবে এত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য ক'রছ কেন?' তিনি বললেন, 'কি ক'রব?' স্বামীজী উচ্চস্বরে বললেন, 'কেন? ওদের গলা টিপে সাগরে ভাসিয়ে দাও।' এ শুধু তাঁর কথার কথা ছিল না। অপমান সহ্য করা তাঁর কোষ্ঠীতে লেখেনি। ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টে মিলিটারী ইংরেজদের দ্বারা অপমানিত হ'য়ে তাদের দুটিকে বগলদাবাই ক'রে বলেছিলেন, 'দরজা থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।' এটা হ'ল—তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি অসম্মান করলে তার প্রতিক্রিয়া। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম হোক—তাও তিনি চাইতেন। তবে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি গুরুভাইদের এবং মঠকে রাজনীতিক ব্যাপার থেকে আলাদা রেখেছিলেন। কোন ইংরেজ উচ্চপদস্থ রাজ-পুরুষ মঠে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল—স্বামীজী স্বয়ং বড়লাট বা তাঁর কোন সচিবের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু 'সন্ন্যাসীর রাজদর্শন নিষেধ'—এই কথা তিনি অক্ষরতঃ পালন করেছিলেন। মঠের প্রতি তদানীন্তন সরকারী দপ্তর বিশেষ ক'রে 'সি. আই. ডি.'র বড় সাহেব বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু ঐ ইংরেজ মহোদয় স্বামীজীকে যে কি চোখে দেখলেন, তা তিনিই জানেন! কিন্তু তাঁর মুখ থেকে আপনিই এই কথাগুলি বেরিয়ে এল—'তুমি আমার ঈশ্বর—তুমিই যিশু।' তাঁর প্রভাবে পরে লাট-দপ্তরের মনোভাব অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছিল।

স্বামীজী ভবিষ্যতের উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তখনই দেখেছিলেন মঠের ভবিষ্যৎ। সকলকে নিয়ে—সর্ব জাতি ও সম্প্রদায়কে নিয়ে, সর্ব ভাবের মানুষকে নিয়ে সঙ্ঘকে চলতে হবে, তা তিনি জানতেন। রাজনীতিক আন্দোলনে ছিলেন, এমন অনেক লোক যদিও মঠে স্থান পেয়েছিলেন, তবু মঠকে সাক্ষাৎ রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হ'তে তিনি প্রবলভাবে নিষেধ করেছিলেন।

ভূপেনবাবুকে বলতে শুনেছি—'স্বামীজী আর কিছুদিন পরে এলে রাজনীতিক আন্দোলন চালাতেন।' তাঁকে তিনি যুগ-পরিবর্তনকারী

শক্তি বলেই দেখেছেন। তবে তাঁর ভাবকে রাজনীতির মধ্যে সীমিতই দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু স্বামীজী সব গণ্ডির বাইরে ছিলেন। মহামানবতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি সর্বদেশের মঙ্গল কামনা ক'রে গেছেন। আমাদের নিজেদের দেশের আত্মচেতনা জাগুক—এ ইচ্ছা তো হওয়া স্বাভাবিক। সেই জন্যে ত্যাগী একদল সন্ন্যাসী গঠন ক'রে গেছেন, যাঁরা তাঁর সেই ভাবকে জীবনে জাগ্রত ক'রে রাখবে আর বাইরের জগতে কর্মের মধ্যে তাকে রূপ দেবে।

সিস্টার নিবেদিতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা

সিস্টার নিবেদিতা সম্পর্কেও কিছু লোকের ধারণা আছে : তিনি রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বামীজীর সায় না থাকলে তা সম্ভব ছিল না। প্রকারান্তরে স্বামীজী রাজনীতিক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন—এই কথাই তাঁরা বলতে চান। কিন্তু স্বামীজী নিজে এবং সন্ন্যাসী-সঙ্ঘকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন, তাতে সন্দেহ-মাত্র নেই। কাশীতে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাজনীতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনাও হয়েছিল। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলনের তুলনামূলক দোষগুণ বিচার করেছিলেন ও নিজের স্পষ্ট মতামতও জানিয়েছিলেন। সেই সময় ধর্মের স্থান রাজনীতির ঊর্ধ্বে, তাও অতি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন।

সিস্টার ছিলেন আইরিশ দুহিতা। তখনও আয়ার্ল্যাণ্ড স্বাধীন হয়নি। তাঁর মনে ভারতের বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক ছিল। অন্যপক্ষে স্বামীজী কারও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিস্টার নিবেদিতা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হারিয়ে রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েন, তাও তিনি চাইতেন না। তাই তাঁকে ভারতের ভাবধারা বুঝে সেবা করতে বলেছিলেন। গুপ্ত মহারাজ তাঁকে বাংলা শেখাতে যেতেন। অন্যান্য ব্রহ্মচারীরাও তাঁর খোঁজখবর নিতেন। কিন্তু তাঁকে মঠ থেকে আলাদা থেকেই নিজের ইচ্ছা ও ভাব অনুযায়ী কাজ বেছে নিতে বলেছিলেন। ভারতের পুরাণ ও উপনিষদ্ সিস্টার খুব ভালভাবে জেনেছিলেন। এবং তিনিও মনেপ্রাণে ভারতের একটি মেয়ে হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অজস্র স্নেহ ছিল তাঁর উপর ; এবং তিনি শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শেই নিজেকে সম্পূর্ণ রকমে ভারতের কল্যাণে বিলীন করেছিলেন।

একটি মেয়ে-ইস্কুল খুলে মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে তাদের জীবন গঠন করতে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এটা ছিল তাঁর আত্মবিলুপ্তি। তাঁর মতো প্রতিভা ও বাগ্মিতার শক্তি নিয়ে একজন রাজনীতিক নেত্রী হওয়া তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু তিনি একটি ছোট্ট ক্ষেত্রে নিজেকে সীমিত ক'রে যে-কাজ ক'রে গেছেন, বাহিরে তার প্রকাশ বেশী বোঝা না গেলেও অন্তর্জগতে মেয়েদের মধ্যে অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারিত করেছে।

'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'—এই মহাবাক্য সিস্টারের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল। স্কুলের সামনের গলিটি অপরিষ্কার থাকায় বহুবার নিজের হাতে সমস্ত পথটি সম্মার্জনী দিয়ে পরিষ্কার করেছেন। পাড়ার সব বাড়িতেই মহিলারা নিজেদের মেয়েদের সাবধান ক'রে দিতেন—'ওরে! রাস্তায় কিছু ফেলিস্ না, ফেলিস্ না। এখুনি 'মেম সায়েব' ঝাঁটা-হাতে নিজে পরিষ্কার করতে আসবে।'

মেমসাহেবকে সকলেই ভালবেসেছিলেন, তাই তো তাঁকে এত ভয় ছিল! ছেঁড়া কাগজ

বা পাতা, খেলনা-ভাঙা—কিছুই ফেলবার জো ছিল না। সেদিন সিস্টারকে যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন। তাঁরাই এখনও বলতে পারেন—সিস্টার ও শ্রীশ্রীমায়ের শিক্ষা কি প্রকার ছিল। মানুষ-গঠন করাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। সিস্টার স্বামীজীর শিষ্যা ছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীশ্রীমায়েরও অজস্র স্নেহ তিনি পেয়েছিলেন এবং মেয়েদের শিক্ষাও এই দেশেরই ভাবধারা অনুযায়ী দিতে চেয়েছিলেন। এই জন্যই সিস্টারও রাজনীতিকে প্রাধান্য দেননি। যদি রাজনীতিকে সিস্টার নিজ কর্মক্ষেত্ররূপে বরণ করতেন, তা হ'লে তাঁর ন্যায় গুণবতী ও ওজস্বিনী মহিলা সেদিকেও বড় কিছু ক'রে যেতেন। ইচ্ছা করেই তা তিনি নেননি। তবে সম্পূর্ণ এড়িয়েও যাননি। হয়তো এই জন্যই বাহ্য-সন্ন্যাসও তিনি নেননি। তবে তাঁকে হালকা রঙের গেরুয়া পরতে দেখেছি এবং গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরতেন। তা থেকেই তাঁর অন্তঃসন্ন্যাসের ভাবটি স্পষ্ট বোঝা যেত। এই রাজনীতির জন্যই সম্ভবতঃ তিনি মঠের থেকেও আলাদাভাবেই ছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর জীবনের লক্ষ্য এই কর্মজগতের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। বেদান্তের চরম অনুভূতিই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। স্বামীজীর ইচ্ছায় কর্মকে তিনি স্বীকার করেছিলেন এবং ছোট ছোট কাজে 'সেবার আদর্শ' নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। সেজন্য নানা প্রকার সাধনার কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। স্বামীজীও সংক্ষেপে রাজযোগের উপর অধিক ঝোঁক দিয়েছেন মনে হয়। তবে ভক্তি কর্ম ও জ্ঞান—এই তিনটির সামঞ্জস্য করতে বলেছেন বারে বারে। এই সাধনার ভিত্তি একজন সৎ মানুষের গুণাবলী। অধ্যাত্ম-রাজ্যের দর্শনাদি বা 'ভাব'সমূহকে তিনি প্রধান বলতেন না। সমগ্র জীবনটাই সাত্ত্বিক ও সুন্দর হ'তে হবে—এইটাই হ'ল মূল কথা। এরই নাম হ'ল কর্মযোগ।

সকল কর্মই কর্মযোগের উপায়

স্বামীজী যে-কোন কর্মকেই কর্মযোগে পরিণত করতে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে গুরুর বা গুরুতুল্য ব্যক্তির প্রতি অটুট শ্রদ্ধা ও আজ্ঞানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। যে-কোন ব্যক্তির জীবনে ধর্মলাভের পিপাসা যতই প্রবল হোক, 'বেহেড্' হওয়া পছন্দ করতেন না। বুদ্ধি ও যুক্তি সহায়ে ধীরে ধীরে উন্নতি হওয়া বেশী ভাল; কিন্তু ভাব-বিহ্বলতা, বিচার-বিমুখতা—এ সকল গুণকে অধিক প্রশ্রয় দিতেন না। 'মেনিমুখো হ'স্‌নি', 'বীর হ তোরা', 'কাজে লেগে যা'—এই সব ছিল তাঁর কথা। এইগুলি আমরাও বলি, কিন্তু তাতে শক্তি নেই। স্বামীজীর এই সব অতি সাধারণ কথাও শুধু কথা নয়—'মন্ত্র' বলা যেতে পারে। শুধু কথা দিয়ে যে এ-সব ভাব তিনি বুঝিয়ে দিতেন, তা নয়। ঐ কথার পিছনে একটা প্রচণ্ড শক্তি ছিল—একবার শুনলে মনে গেঁথে যেত। ওইগুলি পালন করতে গিয়ে সারা জীবনটাই পালটে যেত। স্বামীজী বা তাঁর গুরুভাইদের কাছে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা সকলেই সুচারুরূপে কর্ম করার শিক্ষা পেয়েছেন। কর্ম করতে করতে 'যোগ' হবে বা ভগবান লাভ হবে—এই রকম একটা ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু ভগবদ্‌ভাবটি কি, তা তাঁদের কাছে গেলে মনে কেমন ভাবে যেন তা মুদ্রিত হয়ে যেত। আমি আমার জীবনে পরবর্তীকালে নানা সাধুসন্ন্যাসী দেখেছি, কিন্তু এই আধ্যাত্মিক সম্পদ্ নিঃশ্বাসে

প্রশ্বাসে বাতাসে ও অন্তরীক্ষে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়তে কোন দিন উপলব্ধি করিনি। ভগবান সর্বত্র বিরাজিত, সব কাজই 'তাঁর কাজ', কাজের ছোট বা বড় নেই। চিন্তা-ভাবনা, লেখা-পড়া ধ্যান-ধারণা—সবই কাজ। যখন যে কাজটি করতে হবে, সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে, যেন একমাত্র ঐ কাজটি ঠিকমত করার উপরই জীবন-মরণ সমস্ত সমস্যা নির্ভর করছে।—এই রকম ঐকান্তিক অনুরাগ ও চেষ্টার নাম 'শ্রদ্ধা'। কর্ম এই শ্রদ্ধা-সহযোগে 'যোগে' পরিণত হয়। মন ও বুদ্ধি যেখানে নিরুদ্ধ, ভগবান শুধু সেখানেই আছেন তা নয়। সমস্ত বিশ্বে সমস্ত কিছুই তিনি। এমন কোন কাজ নেই, যা 'পূজা' নয়। ঘরটি মোছা, বাজারটি করা, হিসেব রাখা—সব কাজেই সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি ও উপলব্ধি থাকা চাই। তবে তো কাজ ক'রে আনন্দ পাওয়া যাবে। আর তবেই যেখানে সেখানে বসেও তাঁর ধ্যান হওয়া সম্ভব হয়। এত কর্মের কথা যিনি বলতেন, সেই স্বামীজী কিন্তু কর্মজগতের মানুষ ছিলেন না। তাঁর সমস্ত বৃত্তি ছিল অন্তর্মুখী, এমন এক ভাবরাজ্যের—যা আমাদের চোখে ধরা দিত, কিন্তু যেন সদা সর্বদা নাগালের বাহিরে থেকে যেত। তাঁর কথা, তাঁর মুখ মনে পড়লেও সেই অপূর্ব ভাবজগতের কথাই মনে ওঠে, কর্ম জ্ঞান ভক্তি—এ-সব কিছুই মনে থাকে না। 'আচার্যকোটী'রা আসেন এই এই ভাবে মানুষকে ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দিতে—তার জন্য কোন যোগ বা সাধনার প্রয়োজন হয় না। তবে সেই ভাবটুকু রক্ষা করার জন্য সমগ্র জীবনটাই লেগে যায়, আর তারই নাম 'কর্মযোগ'।

রাখাল মহারাজ—কর্মযোগের আদর্শ

রাখাল মহারাজকে প্রায়ই দেখেছি কোন এক অতল ভাবরাজ্যে ডুবে যেতেন। আমরা শুনতাম, তিনি ছিলেন ঠাকুরের মানস-পুত্র। এ-কথাও শুনেছি, তাঁর দেহের গঠনও ছিল কতকাংশে ঠাকুরেরই মতন। তাছাড়া তাঁর মন মুহুর্মুহুঃ সমাধিমগ্ন হ'ত, তা তো তাঁর সেবক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা দেখেছেন। এমন মানুষকে মঠের অধ্যক্ষ নির্বাচন করলেন স্বয়ং স্বামীজী। প্রেসিডেন্ট হওয়ার কত দায়িত্ব, কত বহুমুখী কাজ! এই কর্মের বোঝা তো রাখাল মহারাজ নিতেই চাননি। কিন্তু গুরু-ভাইদের ভিতর এমনই প্রেম ছিল যে, রাখাল মহারাজের মতো অন্তর্মুখী বৃত্তির মানুষও এই কর্মের শৃঙ্খল স্বেচ্ছায় বরণ করলেন। স্বামীজীর অমোঘ ঔষধ ছিল—মিনতি। 'তা হ'লে কি ভাই, আমি একাই খেটে খেটে ম'রব?'—এর পর হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দ) মতো ধ্যাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর পক্ষেও 'না'-বলা অসম্ভব হয়েছিল। তিনি যেমন স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকা যেতে স্বীকৃত হলেন, ঠিক সেই ভাবেই স্বামীজী রাখাল মহারাজকেও মঠের প্রথম অধ্যক্ষ হ'তে স্বীকৃত করেছিলেন।

ঈশ্বর-দর্শন করলে সর্বভূতে প্রেম হয়—এই কথা আমরা শাস্ত্রমুখে শুনি। কিন্তু সেই প্রেম নিয়ে কিভাবে কর্ম করা যায়—তার নির্দেশ পাওয়া সুকঠিন। বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের জীবন ও তাঁদের শিক্ষা থেকে আমরা কতকটা বুঝতে পারি কর্ম করার সূত্রটি কি! রাখাল মহারাজকে বলা যায় এ-বিষয়ে আদর্শ। তাঁর কাছে যাঁরা (সেবকরূপে) থেকেছেন, তাঁরা খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে আজও আমাদের আদর্শ-স্বরূপ। পাতাটি কি ক'রে পাততে হয়, এমন কি লবণ পরিবেশন কিভাবে করতে হয়, তাও তিনি শিখিয়েছেন। এমন ছোটখাট ব্যাপারে তাঁর মতন আত্মভোলা অন্তর্জগতের পুরুষ কি

ক'রে লক্ষ্য রাখতেন—এইটাই আশ্চর্য লাগে।

স্বামীজী ও এই সব মহান্ পুরুষদের দেখে একটি কথা নিশ্চিত রূপে বোঝা যায়—আমরা যাকে বলি ধর্ম, ভগবান, মনুষ্যত্ব—এগুলি আলাদা আলাদা কিছু নয়, একই নিত্য চিরন্তন ভাবেরই—এইগুলি শাশ্বত প্রকাশ। স্বামীজীর শিক্ষা বলতে বোঝায়—সেই মূল ভাবটিকে ধরা। সেই ভাবে ভাবিত হয়ে মানুষ নিজ নিজ পথ ও কর্তব্য নিজেই স্থির ক'রে চলবে। তিনি একদিকে সঙ্ঘের প্রতি বিনা-প্রতিবাদে আজ্ঞানুবর্তিতা শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু অন্য দিকে ব্যক্তিকে দিয়েছেন পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু স্বামীজী কর্মের কোন একটি নির্দিষ্ট মার্গকে কখনও একমাত্র প্রাধান্য দেননি। শাস্ত্রে যাকে বলে 'বিরাট'—সেই প্রাণ-পুরুষকে তিনি নিজের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই চেতনা থেকেই তিনি 'জনতা-জনার্দনে'র ভিতর যে প্রাণ-পুরুষের সত্তা ছড়িয়ে আছে, তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কর্মের সূত্রটি বুঝতে হ'লে এই চৈতন্যময় পুরুষকে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে হবে। তবেই বুঝতে পারা যাবে—আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম শিখরের সঙ্গে কর্মজগতের স্থূলতম কর্মক্ষেত্রের নিগূঢ় সম্পর্ক কি। তখন আমরা আংশিকভাবে বুঝি—স্বামীজীর বেদান্তবোধ সত্ত্বেও কর্মের জন্য কেন এই আহ্বান। রাখাল মহারাজের মতো সমাধিমান্ ব্যক্তিও তুচ্ছাতি-তুচ্ছ কার্যকে কেন এত মহত্ত্ব দিয়েছেন। এবং এই সূত্রটি না বুঝলে 'নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা' কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা অতি দুরূহ।

কর্মই উপাসনা

ইংরেজীতেও এই রকম একটি প্রবাদ আছে —'Work is worship.' কিন্তু স্বামীজীর কর্মযোগ কি—বুঝতে হ'লে তাঁরই কথিত একটি সূত্র ধ'রে বুঝলে ভাল হয়। তিনি বলতেন— 'কর্ম উপাসনা, উপাসনা কর্ম'। আমরা জীবনে ঠিক উলটোটাই বেশীর ভাগ লোকে করি। কর্মকে উপাসনার চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করি। উপাসনার সময় যে একাগ্রতা ও শ্রদ্ধা থাকা উচিত, সেই শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা হ'লে তবে কর্ম সুষ্ঠুভাবে করা যায়। শুধু তাই নয়, উপাসনা-রূপ কর্মটিকেই ভগবৎকার্য ব'লে মনে করি— কর্মমাত্রই যে ঈশ্বর-উপলব্ধির সোপান, তা মনে করি না। সেই ভাবটি রাখাই হ'ল উপাসনা-বোধে কর্ম করা। কিন্তু এইটিও মনের ক্ষেত্রের আংশিক পরিণতি। এর পরি-পূরক ভাবটি হ'ল উপাসনারূপ কর্মে নৈষ্কর্ম্য-বৃত্তি নিয়ে আসা। এইবার এই দুইটি ভাবের সামঞ্জস্য করলে কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান বা ভক্তি —সবই কর্মও বটে, উপাসনাও বটে। জাগ্রত মনকেই বলে কর্ম -সেই মনের উপরে যে ভাব-জগৎ, তাকেই বলা হয় উপাসনার ক্ষেত্র। এই উভয় ক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে মন যেতে চায় না। নানা রকম সাধনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—এই কর্ম ও উপাসনার ঊর্ধ্বে যে বোধ, সেইখানে স্থিতি যাতে হ'তে পারে। স্বামীজী সর্ব-সাধারণের জন্যে এই একটা সহজ সাধনার পথ ব'লে গিয়েছেন। সব কাজই ভগবানের কাজ ভাবলে মনের উপাসনার ভাব-জগৎ খুলে যায়। সেই ভাব রাজ্যেও নিস্পৃহ হ'তে হবে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ স্বাভাবিক ভাবে যখন ভগবদ্‌বোধ প্রত্যেক কার্যে থাকে, তখনই উপাসনাও কার্যে পরিণত হ'তে পারে, তার পূর্বে নয়। এক কথায় বেদান্ত-ভাবের চরম অবস্থায় 'কর্ম উপাসনা ও উপাসনা কর্ম' রূপে—অনুভূতি হ'তে পারে। স্বামীজীর ছোট ছোট এক একটি কথার তাৎপর্য এই রকম অতি নিগূঢ়। (ক্রমশঃ)

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃত

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

(১)

স্বামীজীর দৃঢ় অভিমত এই ছিল যে, হিন্দুধর্মের উচ্চ তত্ত্বসমূহ লোকের মজ্জাগত করাতে হ'লে দেশের ভিতরে ব্যাপকভাবে সংস্কৃতভাষার অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজন। মাদ্রাজে প্রদত্ত 'ভারতের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি এ-বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সংস্কৃত অত্যন্ত দুরূহ ভাষা, এবং সারাজীবন চর্চা করেও ঐ ভাষা আয়ত্তাধীনে আনা খুবই কঠিন। সাধারণ লোকের পক্ষে মূল সংস্কৃত বই থেকে ধর্মের তত্ত্ব আহরণ করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং বেদবেদান্তে নিহিত তত্ত্বসমূহ জনসাধারণকে শেখাতে গেলে চলতি ভাষায় ব্যাখ্যা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বুদ্ধ, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য—এঁরা চলতি ভাষায় ধর্মব্যাখ্যা করতেন বলেই জনসাধারণ এঁদের প্রতি এত আকৃষ্ট হয়েছিল। চলতি ভাষায় শাস্ত্র-ব্যাখ্যানের এরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর স্বামীজী বলেছেন যে, এটা কিন্তু শেষ কথা নয়। প্রাচীন ঋষিগণ সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে মহান্ তত্ত্বসমূহ গ্রথিত ক'রে গিয়েছেন। এই সূত্রসমূহের একটি প্রধান গুণ এই যে, এগুলো খুব সহজেই মুখস্থ করা যায় এবং যার সংস্কৃতে যৎসামান্য জ্ঞানও আছে, সে যদি এগুলো ক্রমাগত মনের মধ্যে আওড়ায়, তবে দিন দিন সূত্রের অর্থ তার নিকট অধিকতর পরিস্ফুট হয় এবং তার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই স্বামীজী বলেছেন :

জনসাধারণকে অবশ্যই চলতি ভাষায় এ-সকল তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত-শিক্ষাও চলবে, যেহেতু সংস্কৃত-শব্দরাশির উচ্চারণমাত্র জাতির মধ্যে একটা গৌরববোধ জাগিয়ে তোলে, শক্তি সঞ্চার করে। রামানুজ, চৈতন্য ও কবীর ভারতের নিম্নজাতিদের তোলবার চেষ্টা করেছিলেন, আর সেই চেষ্টার ফলে তাঁদের জীবিতকালে অদ্ভুত ফলোদয় হয়েছিল। কিন্তু সে ফল কেন স্থায়ী হ'ল না, তাঁদের তিরোধানের পর এক-শ' বছর যেতে না যেতেই কেন শিক্ষার ফল বিনষ্ট হয়ে গেল—এ-সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে, নিম্নজাতির প্রভূত উন্নতি-সাধন যদিও তাঁরা করেছিলেন, তাঁরা মনেপ্রাণে যদিও চেয়েছিলেন যে নিম্নজাতির উন্নতি হোক, তথাপি জনসাধারণকে সংস্কৃত শেখাবার কোন ব্যবস্থা তাঁরা করেননি। এমন কি, ভগবান্ বুদ্ধ পর্যন্ত ভুল পথে পা বাড়িয়েছিলেন—জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতচর্চা তিনি বন্ধ ক'রে দিলেন। তিনি হাতে হাতে ফললাভ চেয়েছিলেন। তাই সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে নিহিত ভাবসমূহ তখনকার চলতি ভাষা পালিতে ব্যাখ্যা ক'রে তিনি জনসাধারণকে উপদেশ দিতেন। এটা যে খুব মহৎ কাজ হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। জনসাধারণের নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করাতে বুদ্ধদেবের কথা তারা অনায়াসেই বুঝতে পারত। সেটা খুবই মহৎ প্রচেষ্টা বলতে হবে, এর ফলে বুদ্ধের শিক্ষা দ্রুতগতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু উচিত ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের প্রসার

বৃদ্ধি করা। জ্ঞান দ্বারে দ্বারে পৌঁছাল বটে, কিন্তু তার গাম্ভীর্য ও মর্যাদা খোয়া গেল, সেই জ্ঞান সংস্কারে পরিণত হ'ল না। জ্ঞান যতক্ষণ না সংস্কারে পরিণত হয়, ততক্ষণ তা বাইরের কোন আঘাত সামলাতে পারে না। দুনিয়াতে রাশি রাশি জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে পারো, কিন্তু তাতে দুনিয়ার উপকার বিশেষ কিছুই হবে না। জ্ঞান হজম হয়ে রক্তস্রোতে মিশে যাওয়া চাই, অর্থাৎ স্বভাবে পরিণত হওয়া চাই।

আমরা জানি যে, বর্তমান যুগে অনেক জাতি কিংবা সমাজ আছে, যাদের মধ্যে বিদ্যার কোন অভাব নেই; কিন্তু তার ফল কি দেখা যাচ্ছে? আচরণে তারা বাঘের মতো হিংস্র, কিংবা বর্বরের ন্যায় নিষ্ঠুর,—যেহেতু তাদের জ্ঞান সংস্কারে পরিণত হয়নি। * * * জনসাধারণকে তাদের মাতৃভাষা শেখাও,—মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চভাব, উচ্চচিন্তা তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও; তা হ'লে তারা অনেক কিছু জানবে। কিন্তু শুধু জানা যথেষ্ট নয়—শুভ সংস্কার তাদের মধ্যে জন্মাতে হবে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ যত মানসিক উন্নতিই তাদের হোক, সেই উন্নতি কিছুতেই স্থায়ী হবে না। যারা সংস্কৃত জানে, তারা আপনা হতেই একটি পৃথক্ জাতিতে পরিণত হবে, অল্পকালের মধ্যেই তারা সংস্কৃত জানার দরুন অপর সকলকে দাবিয়ে তাদের উপর প্রভুত্ব করবে। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে আমি বলছি, তোমরা যদি নিজেদের উন্নত করতে চাও, তার একমাত্র উপায় হচ্ছে—সংস্কৃত শেখা। উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে চেঁচামেচি, লেখালেখি, এবং খিটিমিটি করা বৃথা, এতে লাভ কিছুই হবে না, উপরন্তু ঝগড়াবিবাদ বাড়তেই থাকবে। আমাদের ভাগ্যদোষে এই জাতি বহুধাবিভক্ত তো আছেই, বিবাদ-বিসংবাদের ফলে আরও শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। উচ্চনীচের ভেদ মেটাতে হ'লে তার একমাত্র উপায়, নিম্নবর্ণদের পক্ষে উচ্চবর্ণের শিক্ষাদীক্ষা এবং সংস্কার অধিগত করা। ঐটুকু করতে পারলে তোমরা (নিম্নবর্ণেরা) ঠিক যা চাও, তাই পাবে।

যে উঁচুতে আছে, তাকে নীচে নামিয়ে উচ্চনীচকে সমান করার পক্ষপাতী স্বামীজী ছিলেন না। স্বামীজীর পরামর্শ এই যে, যারা অনুন্নত, তাদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে, তাদের মধ্যে উত্তম সংস্কার গড়ে তুলে উচ্চবর্ণের সামিল ক'রে দিতে হবে। আপামর সাধারণ সবাইকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্বের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, এটাই হ'ল, স্বামীজীর মতে ভারতবর্ষের আদর্শ। স্বামীজী বলেছেন যে, একমাত্র সংস্কৃতের সাহায্যেই শুভ সংস্কার জন্মানো সম্ভবপর। সংস্কৃত-শ্লোকের মধ্যে উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা ও নীতিবাক্য অতি সংক্ষেপে, সুললিত ছন্দে, নিপুণভাবে বিন্যস্ত রয়েছে। যৎসামান্য সংস্কৃত জ্ঞান থাকলেই সেগুলোর অর্থবোধ হয়, এবং সংস্কৃতভাষার এমনি গুণ যে আপনা থেকেই সেগুলো কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। তখন সেগুলো সর্বদা মনের উপর ক্রিয়াশীল থেকে স্বভাবে ও সংস্কারে পরিণত হয়। যত দিন গ্রামে গ্রামে টোল ছিল এবং শাস্ত্রচর্চা ছিল, তত দিন এই ভাবেই মনু-সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি, ভর্তৃহরির বহু শ্লোক, এবং চাণক্য বিষ্ণুশর্মার বহু নীতিবাক্য মুখে মুখে প্রচলিত ও সমাজজীবনের উপর সতত ক্রিয়াশীল ছিল। হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির এগুলো ছিল ভিত্তি। এজন্যই স্বামীজী সমস্ত চলতি ভাষার চর্চার সঙ্গে

সঙ্গে সংস্কৃত-চর্চার জন্যেও এত আগ্রহান্বিত ছিলেন।

(২)

উনবিংশ শতকের প্রথমভাগেই বাংলাদেশে ইংরেজী-শিক্ষার প্রবর্তন হয়, কিন্তু তার ফলে সংস্কৃতের আদর হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেক সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন এবং হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র জানবার জন্যে কোম্পানী বাহাদুরও সংস্কৃত-চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কৃত আলোচনার ফলেই বস্তুতঃ হিন্দুশাস্ত্রের মহিমা এবং প্রাচীনভারতের জ্ঞানগরিমা জগদ্বাসীর নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়। এই সমস্ত কারণে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীদেরও মনোযোগ সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর ইংরেজ শাসনের ফলে ব্রাহ্মণদেরও ক্ষমতা ছিল না 'অব্রাহ্মণ'দের পক্ষে শাস্ত্রচর্চা বন্ধ রাখেন।

কিন্তু কেবল আগ্রহ থাকলেই হয় না, সংস্কৃত-শিক্ষার সহজ প্রণালী চাই। এই প্রণালীর উদ্ভাবন করেন প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। টোলে যে অধ্যাপনা-রীতি প্রচলিত ছিল, তাতে সংস্কৃত-শিক্ষা ছিল এক দারুণ ভীতিজনক ব্যাপার। 'দ্বাদশভির্বর্ষৈর্ব্যাকরণং শ্রূয়তে' এই ছিল শেখবার ও শেখাবার ব্যবস্থা। এহেন দুরূহ ও দুরধিগম্য শাস্ত্রের সহজপাচ্য নির্যাস বিদ্যাসাগর মহাশয় সহজ বাংলায় এবং বাংলা অক্ষরে একশত পৃষ্ঠার একখানি চটি বইয়ের মধ্যে ঢেলে নূতন শিক্ষার্থীদের মুখের সামনে ধরলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের সবটুকু যে নিলেন, কিংবা বিস্তর পরিমাণে নিলেন, তা নয়; কিশোর বুদ্ধি যতটুকু অল্পায়াসে হজম করতে পারবে, যতটুকুতে সংস্কৃত-ভাষাপরিচয়ের বুনিয়াদ গড়ে উঠবে ততটুকুই নিলেন। পুস্তিকার নাম দিলেন 'উপক্রমণিকা'। এমন সার্থক ও সিদ্ধিপ্রদ রচনা খুব কমই হয়েছে।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি; ঈশ্বরচন্দ্র পাঠ সাঙ্গ ক'রে সবেমাত্র চাকরিতে ঢুকেছেন। কথিত আছে, ঐ সময়ে এক রাত্রির মধ্যে 'উপক্রমণিকা'র কাঠামো প্রস্তুত হয়েছিল। ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত বিদ্যাসাগর-চরিত থেকে উপক্রমণিকা-রচনার ইতিহাসটুকু এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে, যেহেতু এ-সব কথা আজকাল আর তেমন প্রচলিত নয়। "একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু বেশ মিষ্টস্বরে 'মেঘদূত' পড়িতেছিলেন; সেই বালকণ্ঠনিঃসৃত সুমিষ্ট কবিতা শ্রবণ করিয়া রাজকৃষ্ণবাবুর সংস্কৃত-শিক্ষার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সংস্কৃত পড়াইতে সম্মত হইলেন, কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবুর বয়োধিক্যনিবন্ধন প্রচলিত প্রথায় ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনা-ভয়ে তিনি দুর্বোধ্য ও বহুকালব্যাপী 'মুগ্ধবোধ' শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে অনায়াসসাধ্য কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করা যায় কিনা, এই চিন্তায় বিব্রত হইয়া রাজকৃষ্ণবাবুকে বলিলেন, 'তোমাকে একটা সহজ উপায়ে ব্যাকরণ শিখাইতে হইবে।' এই বলিয়া সেদিন তাঁহাকে বিদায় দিলেন। পর দিবস রাজকৃষ্ণবাবু আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা অক্ষরে বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত এক নূতন ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। সেই হস্তলিপির সাহায্যেই রাজকৃষ্ণবাবুর ব্যাকরণ শিক্ষার সূত্রপাত হইল। পরিশেষে ইহাকেই মূল ভিত্তি করিয়া 'উপক্রমণিকা'র সৃষ্টি

হইয়াছিল। 'উপক্রমণিকা' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবনী শক্তির আশ্চর্য প্রমাণ প্রদান করিতেছে, ইহার সমগ্র ব্যবস্থাই নূতন ব্যাপার, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সাহায্যে সংস্কৃত-শিক্ষার পথ সরল ও সুগম্য হইয়াছে।"

এক সময়ে বাংলাদেশে টোলের সংখ্যা এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-কথা ঠিক যে, সংস্কৃতভাষার জ্ঞান খুব মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় সংস্কৃত ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান সমস্ত ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আর এঁদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই থাকে।

প্রায় শতাব্দীকাল সংস্কৃতভাষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে পরিগণিত ছিল এবং ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক ছিল 'ব্যাকরণ-কৌমুদী'। এই দুই বইয়ের অনুকরণে আরও বই অবশ্য তৈরি হয়েছে এবং অল্পবিস্তর চালুও হয়েছে; কিন্তু মূল পদ্ধতি সেই এক।

(৩)

ইংরেজী-শিক্ষিত (স্কুলে-পড়া) ব্যক্তি মাত্রেরই কিশোর বয়সে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে এই যে পরিচয় ঘ'টত, তার কি উপকার একটু তলিয়ে দেখা যাক।

বাংলাভাষায় সংস্কৃত শব্দ বহুলভাবে প্রচলিত। শব্দের ব্যুৎপত্তিজ্ঞান ব্যতীত তার সঠিক অর্থ, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা প্রভৃতি ধরতে পারা কঠিন। ফলে রচনার সৌন্দর্য ও সাহিত্যের রস উপভোগ করতেও বাধা জন্মে। অপরদিকে দর্শন বিজ্ঞান ব্যবহারশাস্ত্র প্রভৃতিতে শব্দার্থের যথাযথ জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের তুলনায় বাংলাসাহিত্যের যে অত্যাশ্চর্য ও দ্রুত উন্নতি উনবিংশ শতকে ঘটেছিল, তার অন্যতম প্রধান কারণ, ইংরেজী-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত-জ্ঞানের প্রসার। রামমোহন রায়ের আমল থেকে যাঁরা বাংলাভাষার অনুশীলন ক'রে এসেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই সংস্কৃতভাষায় ও সংস্কৃত-সাহিত্যে অল্পাধিক অধিকার ছিল; আর ছিল বলেই রচনার মধ্যে শালীনতা ও প্রসাদগুণ এত স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এবং বাংলা রচনা-প্রণালীর ও সাহিত্যের এত দ্রুত উন্নতি হয়েছে। বাংলা কাব্য, নাটক, গল্প, প্রবন্ধাদিতে রচনার উৎকর্ষ, লালিত্য প্রভৃতির জন্যে সংস্কৃত-জ্ঞানের আবশ্যক তো বটেই, বাংলাতে দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনার জন্যে সেই জ্ঞান আরও বেশী আবশ্যক। নূতন ও স্পষ্টার্থবাচক শব্দ যোগানোর ব্যাপারে সংস্কৃতভাষা একটি অফুরন্ত রত্নখনি। অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দ সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয়-যোগে তৈরি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। অতএব মোটামুটি সংস্কৃত-জ্ঞান আমাদের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের পক্ষেও খুবই বাঞ্ছনীয় বলা যেতে পারে। য়ুরোপীয় চলতি ভাষাসমূহেও বিজ্ঞানের, দর্শনের ও আইনের পারিভাষিক শব্দরাজি প্রধানতঃ গ্রীক-লাতিন ভাষা থেকে আহৃত অথবা প্রস্তুত করা হয়েছে। অল্পকাল পূর্বেও গ্রীক-লাতিন স্কুল-কলেজে অবশ্যপাঠ্য বিষয় ছিল। ইদানীং সে ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু সেজন্য অনেক বড় বড় বিজ্ঞানাচার্য ও শিক্ষাবিদ্ খেদ প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ইংরেজীর সঙ্গে গ্রীক-লাতিনের যে সম্পর্ক, বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক তার তুলনায় অনেক বেশী গভীর, ঘনিষ্ঠ এবং ব্যাপক। সুতরাং ইংরেজেরা গ্রীক-লাতিন

ছেড়েছেন বলেই দেখাদেখি আমরা সংস্কৃত বর্জন করতে পারি না।

ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে সংস্কৃতের প্রসার যেমন হয়েছিল, উত্তর-ভারতে তার তুলনায় কিছুই হয়নি। হিন্দীভাষার অনগ্রসরতার এটা অন্যতম কারণ, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঐ অঞ্চলে উর্দু এবং ফার্সীর রেওয়াজ ছিল বেশী। কিন্তু পরিণামে তাতে বিশেষ কোন লাভ হয়নি। হিন্দীভাষাকে অগ্রসর করাবার জন্যে এখন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের উপর ঝোঁক পড়েছে। এটা ভাল জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু স্কুল-কলেজের সংস্কৃত শেখানো হয় না ব'লে সাধারণের মধ্যে ণত্ব ষত্ব কিংবা শব্দার্থের কোন জ্ঞান নেই। ফলে কিরূপ করুণ ও হাস্যরসের উদ্ভব হয়, তার দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। রাজধানী দিল্লীতে ভারত সরকারের একটি সংগ্রহশালার দরজায় নাগরী অক্ষরে লেখা দেখেছিলুম 'কৌতুকালয়' (Museum)! আরেক জায়গায় ফলকে লেখা ছিল: 'গো-বিকাশ কেন্দ্র'। ওটা যে 'Cattle-breeding station', তা ইংরেজীতে লেখা না থাকলে বোঝা অসম্ভব হ'ত।

(৪)

স্কুলে অবশ্যপাঠ্যের তালিকা থেকে সংস্কৃতকে হালে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। সাফাই হিসাবে বলা হয় যে, সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে জীবিত ভাষা এবং ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়াই বেশী লাভজনক, মৃতভাষা পড়বার বিশেষ সার্থকতা নেই। আরেকটি কারণ এই দেখানো হয় যে, পাঠ্যতালিকা এমনিই এত ভারাক্রান্ত যে সংস্কৃতকে ঢুকাবার আর স্থান নেই। উত্তরে বলা যেতে পারে (ক) সংস্কৃত মৃতভাষা হলেও (অর্থাৎ লোকমুখে প্রচলিত না থাকলেও) ভারতীয় অধিকাংশ প্রধান ভাষার জননীস্বরূপা। লাভ-লোকসানের কথা বাদ দিয়েও এঁর সঙ্গে পরিচয় বাঞ্ছনীয়। সংস্কৃত-চর্চায় কি কি লাভ, তার কতক উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে, পরে আরও করা হবে। (খ) সংস্কৃতকে ঠেলে দিয়ে হিন্দীকে স্কুলে বাধ্যতামূলক করবার বস্তুত: কোন কারণ নেই। যে প্রাপ্তবয়স্ক বাঙালী বাংলা এবং সংস্কৃত মোটামুটি জানে, সে তিন চার মাসের চেষ্টাতেই কাজ-চালানো হিন্দী শিখে নিতে পারে। রাজকার্যের, ব্যবসায়ের কিংবা শখের খাতিরে যারা হিন্দী শিখবে, তারা নিজের চেষ্টায় যথাসময়ে শিখে নেবে। তাদের সাহায্য করবার জন্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা এখনই রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়ানো যেতে পারে। (গ) সংস্কৃত ব্যাকরণ অবশ্য-পাঠ্যরূপে নির্ধারিত থাকলে বাংলা ব্যাকরণের বহর অনেক কমানো যায়। সংস্কৃতে সন্ধি, সমাস, কৃৎ, তদ্ধিত ইত্যাদি শিখলে পর বাংলা ব্যাকরণের অনেকখানি আপনা থেকেই আয়ত্ত হয়ে যায়।

পাঠ্যতালিকায় সংস্কৃতের স্থানসঙ্কুলানের অভাব, এ-যুক্তি খুব টেঁকসই নয়। পাঠ্য-তালিকার দুঃসহ বোঝা এবং আরও অনাসৃষ্টির প্রধান কারণ ইংরেজী-ভাষার স্থান-সম্পর্কে আমাদের শিক্ষাবিদ্‌গণের অদ্ভুত মনোভাব ও দুমুখো নীতি। যাই হোক ও বিষয় এখানে আমাদের আলোচ্য নয়।

ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে আদান-প্রদানের কথা এবং একে অন্যের ভাষা শিক্ষার দ্বারা বিভিন্ন আঞ্চলিক অধিবাসীদের মধ্যে সদ্ভাব-সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা অহরহ শুনতে পাচ্ছি। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, ভারতের বিভিন্ন

ভাষাকে যদি ক্রমশঃ নিকটতর করবার অভিপ্রায় আমাদের থাকে, তবে সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রকৃষ্টতম উপায় ভারতবর্ষের সর্বত্র সংস্কৃতশিক্ষার প্রবর্তন। তার ফলে সংস্কৃতের প্রভাব প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষার উপর পড়বে এবং পরোক্ষভাবে সমস্ত ভাষা যথাসম্ভব পরস্পরের নিকটবর্তী হ'তে থাকবে।

(৫)

মধ্যযুগে য়ুরোপখণ্ডে লাতিন ভাষাতেই গ্রন্থরচনা এবং পঠনপাঠন হ'ত। বিদ্বৎসমাজে আঞ্চলিক ভাষার কোন মর্যাদা ছিল না। ক্রমে ক্রমে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় গ্রন্থরচনা শুরু হয়, নূতন সাহিত্য গড়ে ওঠে এবং আঞ্চলিক ভাষায় অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু তার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত গ্রীক-লাতিন অবশ্যপাঠ্য ছিল। হাল আমলে সে-স্থান তারা হারিয়েছে। বিজ্ঞানের উপর ঝোঁক পড়াতে ভাষাশিক্ষার দিকটা সঙ্কুচিত ক'রে বিজ্ঞানের জন্য স্থান বাড়ানো হয়েছে। সম্প্রতি কোন কোন জায়গায় আবার চাকা ঘুরেছে, এবং 'Humanities' (হিউম্যানিটিজ)-এর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই শব্দটির অর্থ এখনো খুব দানা বাঁধেনি; কিন্তু মোটামুটি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা এবং সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, কলা, সঙ্গীত ইত্যাদি বুঝাবার জন্যে শব্দটি ইদানীং ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমাদের দেশে ও ইংরেজ আমলের পূর্বে সংস্কৃত ছিল বিদ্যানুশীলনের ভাষা। ইংরেজ আমলে ইংরেজী-ভাষা সরাসরি সে-স্থান দখল করে, অধিকন্তু ইংরেজী হয়ে দাঁড়ায় রাজকার্যের ও ব্যবসাবাণিজ্যের ভাষা। কিন্তু ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, সংস্কৃতের চর্চা সেজন্য ব্যাহত না হয়ে বরঞ্চ বৃদ্ধি পায়। হাল আমলে সংস্কৃত-শিক্ষাকে আমরা আবার সঙ্কুচিত করেছি। অনেকে বলেন, এটা স্বাভাবিক পরিণতি, যেহেতু য়ুরোপেও প্রাচীন-ভাষার স্থান বিদ্যালয়ে অনেক সঙ্কুচিত হয়েছে। কিন্তু এরূপ মনে করা অন্যায় হবে না যে, য়ুরোপে যা স্বাভাবিক পরিণতিতে ঘটেছে, আমাদের বেলায় তা নিছক অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, আমাদের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের যেমন নাড়ীর যোগ, ইংরেজীর সঙ্গে গ্রীক-লাতিনের যোগ তেমন ঘনিষ্ঠ কিছুতেই নয়। আমাদের ধর্ম, আমাদের ভাবধারা, আমাদের ঐতিহ্য সব কিছুর সঙ্গে সংস্কৃতের যোগ অতি গভীর। প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ এ-বিষয়ের উপর কত জোর দিয়েছেন। আমাদের দেশের অনেক মনীষীই স্বামীজীর কথার প্রতিধ্বনি করেছেন।

নিশ্চয়ই অনেকের স্মরণ আছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার অবশ্য-শিক্ষণীয় পাঠ্যতালিকা থেকে যখন সংস্কৃতকে বাদ দেবার প্রস্তাব হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই প্রতিবাদের ফলে বর্জন-প্রস্তাব কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে; কিন্তু পরে পাস হয়। ইদানীং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ-বিষয়টি গভীর ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: 'ভারতবর্ষের মানসপটে, বিশেষতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সংস্কৃতের স্থান অত্যাবশ্যক, সে-বিষয়ে শিক্ষাবিদ্ এবং চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথের মনে অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বিশ্বজগতের পরিচয় দেবার জন্যে তিনি যেমন বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ্য বই লিখেছেন, তেমনি আবার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পড়াবার জন্যে সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক রচনায় সাহায্য ও উৎসাহ

দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে, আমাদের সংস্কৃতির ও জাতির একতা বজায় রাখবার জন্যে সংস্কৃত-চর্চার খুবই প্রয়োজন। 'আধুনিকতা' ও 'প্রগতি'র ভাবে উদ্বুদ্ধ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সদস্য ১৯৪০ খৃঃ যখন সংস্কৃতকে ম্যাট্রিক পাঠ্যতালিকা থেকে তার আশী বছরেরও পুরানো আসন থেকে সরাবার উদ্দেশ্যে অতিমাত্র ব্যগ্র হয়ে উঠেন, তখন রবীন্দ্রনাথই সংস্কৃতের আসন-রক্ষার জন্যে এগিয়ে আসেন। তিনি খুব জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের পক্ষে সংস্কৃত জানা খুবই দরকার এবং এছাড়া আরও অনেক কারণেই সংস্কৃতকে পাঠ্যতালিকায় রাখা উচিত। সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখলে আমাদের আধুনিক ভারতীয় ভাষা-সমূহেরই লাভ, যেহেতু বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা, দর্শন, ইতিহাস, শিল্পকলা প্রভৃতির অনুশীলন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে নূতন শব্দসম্ভার সৃষ্টির আবশ্যক হবে, তা একমাত্র সংস্কৃত ভাষা থেকে এবং সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয়-যোগেই পাওয়া সম্ভব। বিশাল ভারতের ঐক্যভাব যদি জাগাতে হয়, তা হলেও চাই সংস্কৃত। আমরা যদি নিজেদের পরিচয় পেতে চাই, নিজেদের আত্মা-পুরুষকে জানতে চাই—তবে সংস্কৃতকে কিছুতেই বাদ দেওয়া চলে না। আজও পর্যন্ত যত বন্ধন আমাদিগকে একত্র বেঁধে রেখেছে, সংস্কৃত তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ডক্টর সি. ভি. রামন এবং ডক্টর রাধাকৃষ্ণন তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন এবং দুজনেই রবীন্দ্রনাথের মত সমর্থন করেছিলেন।'[১]

রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত ক'রে প্রবন্ধ শেষ করা যাক। 'ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃতভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। ইংরেজী-ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃতভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে; তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।'

---

১ From 'Sanskrit & Rabindranath'—a Paper read at the International Literary Seminar organised n the occasion of the Tagore Centenary by the Sahitya Akadami, New Delhi, Nov. 12, 1961.

স্বামী বিবেকানন্দ-স্মরণে

আচার্য বিনোবা ভাবে

আমার পদযাত্রায় আমি এতটা মগ্ন থাকি যে, অনেক সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা আমার স্মরণে থাকে না। তা অন্যায়ও নয়। যে কাজ হাতে নিয়েছি, যে কাজ ভগবান আমাকে দিয়ে করাচ্ছেন, তাতে পূর্ণ তন্ময় হওয়াও আমার ধর্ম বটে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্য সব প্রেরণাদায়ী ঘটনার বিষয়েও আমাদের জাগরূক থাকা কর্তব্য। তা থেকে আমাদের বল লাভ হয়।

আজ ১৪ই অগস্ট[১] স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিক উৎসব হচ্ছে। তাঁর জন্মের শত-বর্ষ পূর্ণ হল। অল্প বয়সে তাঁর দেহত্যাগ হয়; চল্লিশ বৎসরও পূর্ণ হয়নি। অল্প দিনের জীবনে বহু পরিশ্রম তিনি ক'রে গেছেন। তিনি ছিলেন জনগণের আশ্রয়; ভগবানে সব সমর্পণ ক'রে পূর্ণ নির্ভয়তা সহকারে কাজ ক'রে গেছেন। শাঙ্কর বেদান্ত-প্রচারে এ-যুগে এত বড় পরাক্রমশালা ব্যক্তিত্ব দ্বিতীয়টি আর দেখা যায় না। মহারাষ্ট্রে জ্ঞানদেব, কর্ণাটকে বিদ্যারণ্য এরূপ দুই ব্যক্তি ছিলেন, নিজ নিজ সময়ে নিজ নিজ প্রদেশে যাঁদের প্রভাব আজও কমেনি, আর জ্ঞানদেবের কথা বলা যায়, সে প্রভাব বেড়েই চলেছে। কিন্তু এই দুই দৃষ্টান্ত সেকালের। আধুনিক যুগে বেদান্তের এরূপ মহান্ আচার্য আর দেখতে পাই না, যিনি জগতের পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

অদ্বৈতের সঙ্গে উপাসনা চলতে পারে, এ তো মূল শাঙ্কর বিচারেই ছিল। শঙ্করাচার্য স্বয়ং পঞ্চায়তন (পঞ্চদেবতা) পূজা স্থাপন করেছিলেন ও উপাসনার সমন্বয় করেছিলেন। যে-যুগে তিনি এর প্রবর্তন করেছিলেন, সে-যুগের পক্ষে ঐ উপাসনা-সমন্বয় পর্যাপ্ত ছিল। কিন্তু আধুনিক কালের পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। তাই তার সঙ্গে ইসলাম, খ্রীষ্টান ইত্যাদি সাধনার সমন্বয় এ-যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস করেছেন। বিবেকানন্দ তাঁর সর্বোত্তম শিষ্য ছিলেন। এই উপাসনা-সমন্বয় নিজ গুরুর কাছ থেকেই তিনি পান। কিন্তু শাঙ্কর বিচারের কথায় এ কিছু নূতন জিনিস নয়, কেন না এর মূল আরম্ভ শঙ্করাচার্য স্বয়ংই করেছিলেন—অদ্বৈতের সঙ্গে ভক্তির যোগ-সাধন। এ অবশ্য পৃথক্ কথা যে, তাঁর পরে ভারতে কয়েকজন আচার্য এসেছিলেন, শাঙ্কর-বিচারে ভক্তি যে স্থান পেয়েছে, তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট হননি, তাঁরা ভক্তিকে উৎকট রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন; যথা বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতি। কিন্তু বেদান্তের সঙ্গে ভক্তির সমন্বয়কে পুরানো জিনিসই বলতে হবে।

বিবেকানন্দ যে বিশেষ কাজ করেছেন, তা এই: যে অদ্বৈতের মধ্যে পরমেশ্বরের বিভিন্ন উপাসনা সমাবিষ্ট, তার সঙ্গে তিনি আর্তসেবা ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা যুক্ত ক'রে দিয়েছেন। এই শব্দটাই তাঁর নিজের—'দরিদ্রনারায়ণ'। আর প্লেগের দিনে মহারাষ্ট্রে যেমন লোকমান্য তিলক, বাংলাদেশে তেমন বিবেকানন্দ সাক্ষাৎ ভাবে সেবাকর্ম করেছিলেন।

এখানে এ-কথা স্মরণ করতে মন স্বতই আনন্দে ভরে ওঠে যে, লোকমান্য ও বিবেকা-

১ গত বৎসর স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃক স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

নন্দের আধ্যাত্মিক গড়নে বিশেষ পার্থক্য ছিল না, লোকমান্য কর্মযোগের ক্ষেত্রে আর তারও অধিক রাজনীতিতে কাজ করতেন, যেটি প্রত্যক্ষতঃ বিবেকানন্দ করেননি। আমি তো বলতাম যে, দরিদ্রনারায়ণের সেবায় অদ্বৈতের বিচার জুড়ে দেন বিবেকানন্দ। তারপরে ঐ শব্দ যা লোকমান্যের বড় প্রিয় ছিল, আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যা চালু করেন, সেই শব্দকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ও সকল গঠনমূলক কর্মকে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার কাজ করেন মহাত্মা গান্ধী

বাহ্য জীবনে মহাত্মা গান্ধী লোকমান্য থেকে অধিক অন্তরনিষ্ঠ ছিলেন, আর তাই বিবেকানন্দের ভাবের খুব কাছাকাছি ছিলেন।. মহাপুরুষদের তুলনা করতে নেই, করা উচিত নয়, করার দরকারও নাই। কিন্তু যাঁদের দ্বারা ভারত অতীব উপকৃত হয়েছে, এমন ছিলেন এঁরা, যাঁদের নাম এইমাত্র করলাম।

দরিদ্রের সেবাই ঈশ্বর-উপাসনা—কথায় ও কাজে এই উপদেশ যীশু খ্রীষ্টের মতো আর কেউ জগৎকে দেননি। তার আগে মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ এর প্রেরণা আরও গভীরভাবে ভারতকে দিয়েছিলেন – করুণার প্রেরণা যার পরিধিতে মানবের সঙ্গে জন্তুজগৎও এসে গিয়েছিল। সেই প্রেরণা নিঃসংশয়ে অতীব প্রগাঢ় ছিল। কিন্তু যাকে আজকাল আমরা প্রত্যক্ষ মানবসেবা বলি, তার বিশেষ ও ব্যাপক আবির্ভাব দেখতে পাই যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষায়। আমার মনে হয় যীশু অদ্বৈতবাদী ছিলেন, যদিও যে দার্শনিক অর্থে শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ছিলেন, সে অর্থে নয়। কিন্তু 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' অমৃতের পুত্র, পরমাত্মার পুত্র পিতাপুত্রের এই অভেদ-সূচক সংজ্ঞা উপনিষদেও আছে। বেদেও এরূপ সংজ্ঞা রয়েছে। এই ভাষা যীশু খ্রীষ্ট সাক্ষাৎ বলতেন, আর সেই সময়ের লোকে এই অদ্বৈত-বিচারকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ ব'লে মনে ক'রত। তাই যীশুর ওপর তারা ক্রুদ্ধ হয়, আর 'অন্-অল্-হক্' বলার জন্য পাথরের ঘা খেয়ে খেয়ে যেমন মন্সুরকে মরতে হয়েছিল, তেমনি 'ঈশ্বরপুত্র ও ঈশ্বর অভিন্ন' বলার জন্য যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ হ'তে হয়েছিল, এ-কথা আমি মনে করি।

আমি বলেছি যে দার্শনিক তত্ত্ব ছেড়ে দিলে যীশুর ভূমিকা অদ্বৈত-বেদান্তের অত্যন্ত কাছে এসে যায়, বিশেষতঃ পলের কথা থেকে তাই মনে হয়। তা হলেও ভারতীয় বেদান্তের কথা ওঠে তো ব'লব যে, অদ্বৈতের সঙ্গে মানবসেবা যুক্ত করার কাজ বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম করেছেন, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে।. এই মস্ত বড় কাজ তিনি করেছেন, যার পরিণাম স্বরূপ অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান তৎসাধক বিভিন্ন উপাসনায় ও তৎপ্রকাশক ভূত (প্রাণী)-সেবায় তদন্তর্গত মানবসেবায় রূপ পেয়েছে, আর এইভাবে জীবনে একরস হওয়ার বিচার ভারত লাভ করেছে। মহাত্মা গান্ধী মানব-সেবার ঐ বিচারকে আরও ব্যাপক করেছেন।

এ-সব কথা যখন আমার মনে হয়, তখন নেহাত অবাক্ হয়ে ভাবি, বিচারের এত নূতন নূতন দিক খুলে গেছে, আর তা হলেও সে সবই ভগবদ্গীতায় রয়েছে! ভগবদ্গীতায় যে প্রতিভা, যে প্রজ্ঞা ও যে প্রেম এক সূত্রে গাঁথা দেখতে পাই, তা এই গ্রন্থকে জগতের সমগ্র সাহিত্যে সম্ভবতঃ অদ্বিতীয় স্থান দিচ্ছে। আর বিবেকানন্দ ছিলেন গীতার পরম উপাসক। এখানে গীতার গৌরব-গান আমি ক'রব না। গীতার দুধেই আমি পালিত। নিত্য তার স্মরণ আমি

করি। লোভ সংবরণ ক'রে এখানে সেই গৌরব-কথন শেষ ক'রব। বিবেকানন্দ ভারতকে যে দান দিয়েছেন, সে দানের কথা আমি স্মরণ করছি, তাঁর শতবার্ষিক জন্মদিনে।

একত্রিশ-বত্রিশ বয়সের যুবক, পরাধীন ভারতে জন্ম, এক বিদেশী ভাষায় পারঙ্গত হয়ে সন্ন্যাসী-রূপে শিকাগোর বিশ্বধর্ম-পরিষদে ভারতের পক্ষে দাঁড়িয়ে ভারতের বেদান্তের গর্জন শোনাচ্ছেন। ঐ ঘটনা হ'তে ভারতের ও আমাদের যে সম্মান জগতে হয়েছিল, তা পরাধীনতা-কালের মৃতপ্রায় ভারতীয় জন-সাধারণকে যারা দেখেছে, তারা ভুলতে পারে না।

বিবেকানন্দ গুরুসেবারও এক আদর্শ আমাদের সামনে ধরে গেছেন, তা অবশ্য এদেশের পক্ষে নূতন নয়। কিন্তু এই যুগে তার্কিক বৃত্তি যখন অনেক দূর গড়িয়েছিল ও ও গড়াচ্ছে, তখন তার প্রয়োজন খুবই ছিল। পূজ্যপাদ গোবিন্দ ও শঙ্করাচার্য, নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানদেব যেমন সেই যুগে, তেমন এই যুগের রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। যেমন এখানে আসামে শঙ্করদেব ও মাধবদেব, যাঁদের নাম এখানে ঘরে ঘরে লোকে স্মরণ করে, তেমনই এই আধুনিক যুগল নাম। স্কুল-কলেজে আজকাল যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের প্রায় কোন অবকাশ নেই, বলা যায়। আজকের শিক্ষক প্রায় পুস্তকের স্থানে এসে গেছে; পুস্তকের সাহায্য মেলে, তেমনি শিক্ষকের সাহায্য মেলে।

গুরু অন্য বস্তু। প্রাচীন গুরুকুলসমূহে যে গুরুশিষ্য-ভাবনা ছিল, এখন তা স্মৃতির বস্তু হয়ে গেছে। কিন্তু তার 'প্রকৃষ্ট' রূপ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের অন্যোন্য-সম্বন্ধে আমরা দেখতে পাই।

বিবেকানন্দ স্পষ্টতঃ প্রচারক ছিলেন। সেণ্ট-পলে যে আবেশ দেখা যায়, এঁতেও সেই আবেশ দেখতে পাই। কিন্তু এই আবেশ সত্ত্বেও বিবেকানন্দ সমত্ব হারাননি, অন্তস্তলে সমত্ব বজায় ছিল। অদ্বৈতীর পক্ষে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ যে সমত্ব খোয়ায়, সে অদ্বৈতই খোয়ায়। কিন্তু অদ্বৈত ভাবে আবেশও আসতে পারে, তা ওখানে দেখিয়েছেন সেণ্ট পল, এখানে দেখিয়েছেন শঙ্করাচার্য আর এই যুগে বিবেকানন্দ। এই আবেশ কেবল শব্দাবেশ নয়, একাঙ্গী কল্পনাবেশ নয়, এ ভাগবতাবেশ। এই আবেশ যার জীবনে প্রবেশ করে, তার সারা জীবন ভাবনা-ভাবিত হয়, আর কঠোর পরিশ্রমেও তার কোনরূপ ক্লান্তি হয় না। মহাপুরুষদের স্মরণে পবিত্র আনন্দ লাভ হয়। কিন্তু হৃদয়েই তা সমাবেশ করে, এখানে আর অধিক বিস্তার আমি ক'রব না।*

---

* আসামে গোয়ালপাড়া জেলায় ফাউজুরীপাড়ায় ১৪ই অগস্ট '৬২, আচার্য বিনোবা হিন্দীতে যে অর্ঘ্য নিবেদন করেন, সেটি **'ভূদান যজ্ঞ'** পত্রিকায় (৭ই সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত হয়। বঙ্গানুবাদ: শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ।

ধর্ম বলতে স্বামীজী কি বুঝতেন ?

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ-অবতারের বিশেষ উদ্দেশ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে মনীষী রলাঁ (Romain Rolland লিখেছেন :

And here is the rallying cry : All religions are true in their essence. The revelation of this universal truth was the special object of his coming upon the earth.

'যত মত তত পথ'—এই হচ্ছে সকলকে একত্র মেলাবার মন্ত্র। সকল ধর্মের মূলেই সত্য রয়েছে, এই সত্যকে সকলের কাছে উদ্ঘাটিত করবার জন্যেই পৃথিবীতে তাঁর অবতরণ।

বিবেকানন্দকে ঠাকুর সঙ্গে করেই এনেছিলেন তাঁর মর্ত্যলীলায় অনুচরদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা নেবার জন্যে। আর স্বামীজী খুব কৃতিত্বের সঙ্গেই তাঁর বিরাট দায়িত্ব পালন ক'রে গেছেন। তাঁর কম্বুকণ্ঠের জোরালো ভাষাকে আশ্রয় ক'রে ঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী দিক থেকে দিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলিতে রামকৃষ্ণের বাণীরই প্রতিধ্বনি। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে স্বামীজী যে-সব মন্তব্য করেছেন, তা যেন রামকৃষ্ণেরই ভাষা আর সেই মন্তব্যগুলির মূল সুরটি হচ্ছে :

There are differences in non-essentials, but in essentials they are all one.—যা-কিছু বিভেদ, সে বাইরের এটা ওটা নিয়ে, কিন্তু সবধর্মের মূল সত্যগুলি একই।

সব ধর্মই মূলতঃ এক, 'যত মত তত পথ'—মহাসত্যকে যুগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে রামকৃষ্ণ-অবতারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ধর্ম কি ? তারও কি সঠিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না ? রামকৃষ্ণ-অবতারে সে প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়েছে। ঠাকুর বললেন : 'দোকানে কত মণ মদ—এ-খবরে তোমার কাজ কি ? এক গেলাস হলেই তোমার হয়ে যায়।' অর্থাৎ ধর্মের প্রাণ হচ্ছে ঈশ্বরীয় আনন্দের আস্বাদনে। বাগানের গাছ গুনে লাভ কি ? দরকার আম খাওয়া। ঈশ্বরের মধ্যে আমাদের যে অনির্বচনীয় আনন্দ রয়েছে, সেই আনন্দের জীবন্ত অনুভূতিই ধর্মের প্রথম এবং শেষ কথা। বুদ্ধির কসরত তো সেই পরমানন্দ-ঘনমূর্তি ভগবানের পদপ্রান্তে কোন কালে আমাদের পৌঁছে দেবে না। ঠাকুর বলতেন : 'মানুষ তাঁর বিষয় কি ধারণা করবে ? অনন্ত কাণ্ড !'

প্রথম ঈশ্বরোপলব্ধির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে প্রাঞ্জল বর্ণনা ঠাকুর দিয়েছেন, তা পড়লে রোমাঞ্চ হয়। মার দেখা পাওয়া সম্পর্কে ঠাকুরের নৈরাশ্য যখন চরমে উপনীত হয়েছে এবং নিরাশ হৃদয়ে যখন তিনি আত্মহত্যায় উদ্যত—'এমন সময়ে সহসা মা-র অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম ! তাহার পর বাহিরে কি হইয়াছে, কোন্ দিক দিয়া সেদিন ও তৎপর দিন যে গিয়াছে, তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই ! অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূতপূর্ব জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মা-র সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।'

এই অভিজ্ঞতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে আবার বলছেন : 'ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই ! আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন

জ্যোতিঃসমুদ্র !—সেদিকে যতদুর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল। হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।'

স্বামীজী 'Soul, God and Religion' বক্তৃতায় অতি স্পষ্ট ভাষায় বলছেন: আদর্শের তফাৎ থাকতে পারে, পদ্ধতির তফাৎ থাকতে পারে, কিন্তু এমন একটি মহাকেন্দ্র আছে, যেখানে এসে সব ধর্ম মিলছে। স্বামীজী বলছেন: সেই মহাকেন্দ্রটি হচ্ছে 'the realisation of God'–উপলব্ধি, অনুভূতি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা —এ যেখানে নেই, সেখানে শাস্ত্রসম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান থাকতে পারে, চারিত্রিক মহিমা থাকতে পারে, হৃদয়ের উদারতা থাকতে পারে, উপচিকীর্ষা, নৈতিক বল—সবই থাকতে পারে, কিন্তু ধর্ম নেই। স্বামীজী বলছেন:

A man may believe in all the churches in the world, he may carry in his head all the sacred books ever written, he may baptise himself in all the rivers of the earth, still if he has no perception of God, I would class him with the rankest atheist,

—মগজের মধ্যে যতই শাস্ত্রজ্ঞান থাক, আর যত নদীর জলেই সে পুণ্যস্নান করুক, ভগবান্ যদি সে না দেখে থাকে, তবে সে নাস্তিক ছাড়া আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে একজন মানুষ যদি সারাজীবনে একবারও গির্জায় অথবা মসজিদে প্রবেশ না করে, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে সে যদি অনুভব করে ভগবান্‌কে, তবে স্বামীজীর মতে সে নিশ্চয়ই সাধু এবং পুণ্যাত্মা। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী গুরুদেবের মর্মবাণীর আবার প্রতিধ্বনি ক'রে বলছেন:

As soon as a man stands up and says, he is right or his church is right, and all others are wrong, he is himself all wrong.

—কোন মানুষ দাঁড়িয়ে উঠে যখনই বলে, সে অথবা তার ধর্ম ঠিক রাস্তায় চলেছে এবং বাকী সবাই চলেছে ভুল রাস্তায়, বুঝতে হবে তার সবটাই ভুয়ো।

ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি ক'রে বলি, স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণেরই পতাকাবাহী মহান্ সৈনিক। রামকৃষ্ণ-অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য, সব ধর্মেই মূল সত্য আছে—এইটি প্রচার করা। স্বামীজী গুরুদেবের উদারবাণীকে জগৎময় বহন ক'রে নিয়ে গেছেন। যে উদ্দেশ্যে ঠাকুর ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা সফল করবার জন্যে ঠাকুরের প্রয়োজন ছিল নরেন্দ্রনাথকে। তাই নিজের হাতে গড়ে তাঁর প্রিয়তম নরেন্দ্রকে রূপান্তরিত করলেন বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দে। আর একটি কথা। ধর্মের প্রাণ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে; ভগবানের মধ্যে যে অনির্বচনীয় আনন্দ আছে, মানুষে তার জীবন্ত অনুভূতিতেই ধর্ম। এই জীবন্ত অনুভূতির কথাই ঠাকুরের প্রথম ঈশ্বরোপলব্ধির বর্ণনাতে আছে। ঈশ্বরের উপলব্ধি যেখানে নেই, সেখানে আর সবই থাকতে পারে, কিন্তু ধর্ম নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ ও মানব-প্রেম

শ্রীমতী সুচরিতা সেনগুপ্তা

'এসো মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ—সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? দেশকে ভালবাস? তা হ'লে এসো। ভাল হবার জন্য উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর। পেছনে চেওনা, অতি প্রিয় আত্মীয় স্বজন কাঁদে কাঁদুক, তবু পেছনে চেওনা, সামনে এগিয়ে যাও।' —বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। পুরুষকারের ওজস্বিনী বাণী শুনিয়েছিলেন দেশকে। জাগাতে চেয়েছিলেন অধঃপতিত মুমূর্ষু দেশবাসীকে। মনুষ্যত্বের অবমাননা তিনি সহ্য করতে পারেননি। তাই দেশবাসীর হতচেতন মানবিকতার মূল ধরে নাড়া দিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন: হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের বিচার ক'রে শক্তিক্ষয় করেছ। শত শত যুগের সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।... দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হ'তে হবে। তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্নদান করবে। সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে আর তোমাদের পূর্বপুরুষদের অত্যাচারে যারা পশুত্বে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে।

অশিক্ষিত দুর্দশা-গ্রস্ত জনগণের জন্য এই সর্বজনীন প্রেমানুভূতি ও মমত্ববোধ স্বামীজীর মনের নিছক ভাবালুতা বা অতিশয়োক্তি নয়, এ যে সত্য তা তাঁর আমরণ নিঃস্বার্থ কর্মযোগের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে।

সর্বত্যাগী বিবেকানন্দ মুক্তপুরুষ ছিলেন সত্য, কিন্তু অসংখ্য বন্ধনের মাঝে যে সংসার, তাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। উন্মুখ হৃদয় নিয়ে বন্ধনমুক্ত আত্মোপলব্ধি দ্বারা সর্বজীবের আত্মায় পরমাত্মার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। তাই বুঝি তিনি বলেছিলেন—'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে এই পরম উচ্চ লক্ষ্যটি যদি কেউ ভুলে যায়, 'বৃথৈব তস্য জীবনম্'। স্বামীজীর সকল সাধনা ও প্রার্থনা—সর্ব জীবে সেবা ও সাম্য। একে জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতরূপে গ্রহণ ক'রে বিশ্ববাসীকে চিত্তশুদ্ধির দীক্ষা দিলেন 'জীবে প্রেম ক'রে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলেছিলেন: পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, অজ্ঞ ইতর-সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের কুসংস্কার ভেঙে দিয়ে পারমার্থিক মঙ্গল করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে এবং জ্ঞানালোকে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে —'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'।

জগতের হিতার্থে ও পরসেবার্থে ত্যাগীশ্রেষ্ঠের এই কর্মপ্রেরণা শুধু তাঁর নিজের জীবনকেই মহত্তম করেনি, সারা বিশ্ববাসীর প্রাণেও অভূতপূর্ব প্রেরণা, উৎসাহ ও কর্মক্ষমতা যুগিয়েছিল, তাই আমরা দেখতে পাই দেশে দেশে সেবাশ্রম, বিদ্যালয়, পাঠাগার ও বেদান্ত-কেন্দ্র।

সন্ন্যাসী হয়েও বিবেকানন্দ ছিলেন দেশের দুঃস্থ দুর্গতজনের বড় আপন, বড় কাছের

মানুষ। এদের দুঃখদুর্দশা তাঁকে সব কিছু ভুলিয়েছিল, সুপ্তিতে অচেতন জনগণকে বজ্রকণ্ঠে ডাক দিয়ে তিনি সচেতন করেছেন: কি করছিস সব বসে? ওঠ্ জাগ্। নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্। নরজন্ম সার্থক ক'রে চলে যা। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

নব অভ্যুদয়ের আহ্বান শুনলে দেশবাসী অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণের ক্ষয়িষ্ণু মনুষ্যত্বের পূর্ণজাগৃতির মানসে তেজোব্যঞ্জক বাণীদ্বারা উদ্দীপ্ত ক'রে স্বামীজী বললেন: যদি ভগবান্‌কে পেতে চাও, আগে মানুষের সেবা কর। যদি আধ্যাত্মিক শক্তি চাও, আগে মানুষের সর্ববিধ সেবায় দেহক্ষয় কর···যাতে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হ'তে পারে, এমন বিবেচনা বুদ্ধি লোকহিতৈষণা নিজেদের মধ্যে জাগিয়ে তোল বৃথা শান্তির লোভে ছুটো না। ওসব আলেয়া! এখন আমরা এমন ধর্ম চাই, যাতে আমাদের আত্ম-প্রত্যয় জেগে ওঠে, জাতীয় সম্মান-বোধ জাগায় আর পতিত দরিদ্রদের তোলবার ক্ষমতা ও বল ফিরে আসে।

এই পতিত ও দরিদ্র জনসাধারণই বিবেকানন্দের নরনারায়ণ। তাঁর মর্মবাণী এবং কর্মযোগের মন্ত্র ছিল: প্রকৃত মানুষ তৈরী করাই আমার ধর্ম

তাই দেখা গেছে—কপর্দকশূন্য কৌপীন-মাত্র-সম্বল নবীন সন্ন্যাসী তাঁর উদার বিশাল বক্ষে ভ্রাতৃত্বের প্রগাঢ় প্রশান্ত প্রেমানুরাগ ও মমত্ববোধ, বাহুতে বলিষ্ঠ শক্তি এবং হাতে জনসেবাভিলাষের প্রদীপ্ত বর্তিকা নিয়ে বিপুল বিশ্বে নররূপী নারায়ণের আরতি করেছেন। নিষ্ক্রিয় তন্দ্রাচ্ছন্ন দেশবাসীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ ক'রে তাদের চেতনা জাগিয়েছেন বলিষ্ঠ আহ্বান দ্বারা: হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই।···সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। আর বল দিনরাত···মা, আমায় মানুষ কর।

কর্মযোগী নবযুগের সন্ন্যাসী মুগ্ধকণ্ঠে বলে-ছিলেন: আমি জগতের সকলকে ভালবাসতে পারি, আমার নিকট সকলেই ব্রহ্মস্বরূপ। মানুষকে শ্রীভগবান্-বোধে ভালবাসতে পারলে কতটা সুখ হয়—ভাব দেখি!

সর্বপ্রেমিক স্বামীজী দেশের কোটি কোটি পতিত নির্যাতিত দরিদ্রকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করতে সদা উন্মুখ হয়ে বেদনার্ত কণ্ঠে ডাক দিয়েছেন: এসো, ভারতের এই লক্ষ লক্ষ নিম্নজাতীয় মানুষের জন্যে আমরা রাত্রি-দিন প্রার্থনা করি।···আমি দার্শনিক নই, মুনি-ঋষিও নই। আমি নিজে দরিদ্র। দরিদ্রকে তাই আমি ভালবাসি।

ভারত বলতে তিনি ভারতের জনসাধারণকেই বুঝিয়েছেন। তাদের অভাব-অভিযোগকে তিনি আপন ক'রে তার আমূল পরিবর্তন ও আর্থিক কল্যাণ-সাধনের জন্য যে বাণী শুনিয়েছেন, তা শুধু মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্যই নয়, মানুষের সামাজিক রাজনীতিক আর্থনীতিক বন্ধন-মুক্তির জন্যও বটে। কর্মযোগী এই ঋষির মতে ভারতে এমন সমাজ ব্যবস্থা পত্তন করতে হবে, সেখানে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের সুখসুবিধা থাকবে না। সে সমাজে থাকবে সকলের জন্য সমান সুবিধা ও সুযোগ। তাই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বার বার ঘোষণা করেছিলেন:

'শ্রেণী-বিশেষের সুযোগ-সুবিধার দিন গত হয়েছে। কোন দিনই আর সে ব্যবস্থা— ফিরে আসবে না।' দৃঢ় নিঃসঙ্কোচ দাবি জানালেন: সকলের জন্য সমান সুযোগ চাই। ভারতের একমাত্র ভরসাস্থল তার জনসাধারণ। তারা অভুক্ত অপবিত্র অবহেলিত হয়ে থাকলে যুগ-যুগান্তরেও দেশের মুক্তি নেই।

দেশের অজ্ঞতা ও অশিক্ষা দূরীকরণের জন্য দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের উদ্যম ও প্রচেষ্টার পরিসীমা ছিল না। বিদেশে গিয়েও তিনি সে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য ক'রে স্বদেশের অশিক্ষিত জ্ঞানহীন নিরন্নদের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন। নিয়তই সে চিন্তায় তাঁর দেশপ্রেমিক হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে, ব্যথিতকণ্ঠে বলেছেন: হায়, আমার দেশের দরিদ্রদের জন্য কে ভাবে? অথচ তারাই দেশের মেরুদণ্ড।

স্বদেশ-বিদেশ-নির্বিশেষে সমগ্র পৃথিবীর অখণ্ড এক মানব-জাতিকে তিনি যে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা হ'ল মানব-ধর্ম। বিবেকানন্দের মানব-ধর্ম উদার—ভেদজ্ঞানশূন্য। দেশ-পরিক্রমণকালে কর্মে ব্যবহারে বক্তৃতায় সর্বদা সর্বত্র তাঁর এই অখণ্ড মানব-ধর্মের তথা বিশ্বপ্রেমের স্বীকৃতি ও সাধনার পরম বিকাশ ও প্রকাশ। চিকাগোর বিখ্যাত ধর্ম-মহাসভার বক্তৃতায় তিনি পুনঃপুনঃ সেই সত্যই প্রচার করেন।

সকল ধর্মের প্রতি উদার ভাবপোষণ, সকলের সহিত মানবাত্মার কল্যাণসাধন, পরস্পরের মধ্যে যা কিছু সৎ শুভ ও পবিত্র, তার আদানপ্রদান দ্বারা সকলকেই সেই এক লক্ষ্যে উপনীত হইতে সহায়তাকরণ—এই ছিল তাঁর বক্তব্যের বিশেষত্ব।···স্নেহমধুর কণ্ঠে সকল বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি ক'রে সমগ্র মানবজাতিকে এক দৃঢ় ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করেছিলেন।

স্বামীজী বলেছেন: পবিত্রতা, উদারতা, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ কোন ধর্মেরই নিজস্ব নহে এবং প্রত্যেক ধর্মেই উন্নতচরিত্র নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছে—এই প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ স্বপ্নেও ভাবেন যে, সকল ধর্ম লোপ পাইবে, শুধু তাঁহারটিই থাকিবে, তবে আমি সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে করুণার পাত্র বলিয়া মনে করি এবং এই কথা বলি যে, শীঘ্রই দেখিবেন, আপনার বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও সকল ধর্মের পতাকাশীর্ষে লিখিত হইবে, 'যুদ্ধ নহে—সহায়তা! বিনাশ নহে—বরণ!! দ্বন্দ্ব নহে—মিলন ও শান্তি!!!'

বিবেকানন্দের বিশ্বপ্রেম তাঁর গলায় জগৎ-জয়ের যশোমাল্য পরিয়ে দিয়েছিল। প্রেমের বিনিময়ে শুধু প্রেমই নয়, বিশ্বের প্রণামে, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অভিষিক্ত হয়েছিলেন তিনি।

স্বামীজী বলেছিলেন, 'প্রকৃত মানুষ তৈরী করাই আমার ধর্ম'। বিশুদ্ধ প্রেম ও অপূর্ব প্রেরণায় উৎসারিত কর্মযোগী মহাপুরুষের সে মহাবাণী অনন্তকালের বুকে অক্ষয় অমর ক'রে রাখার প্রচেষ্টা সার্থক ক'রে তুলতে হবে তাদের, যাদের জন্য তিনি ত্যাগ ও প্রেমকে আমরণ মহাজীবনের তপস্যা ও ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

বীর সন্ন্যাসী

শ্রীশান্তশীল দাশ

ও মুখের পাশে চেয়ে কী এক ঐশ্বর্য খুঁজে পাই!
প্রাত্যহিক জীবনের দৈন্য দাহ সকলই হারাই।
নেমে আসে এ অপটু ক্ষীণ শীর্ণ দেহের ভিতরে
কা এক অদম্য শক্তি, উন্মাদনা; আর মন ভ'রে
ওঠে এক দিব্য ভাবে; সেই মন বারে বারে বলে,
'নই, আমি ক্ষুদ্র নই'; নিঃস্বতার গ্লানি চলে
যায় একেবারে। ভাবি—কে দিল, কে দিল শক্তি এত,
অমিত ঐশ্বর্য আর এই আত্ম-অনুভূতি! সে তো
তোমারি—তোমারি দান, ওই দিব্য অমর্ত্য ভাস্বর
মহাশক্তি। এ আমায় তুলে ধরে পঙ্ককুণ্ড হ'তে
দীনতার হীনতার; বিস্মৃতির অন্ধকার পথে
তিলে তিলে অপমৃত্যু সে-জীবনে। সে-জীবনে আনে
অমিত বীর্যের দ্যুতি, বিচ্ছুরিত মহাশক্তি দানে
ক'রে তোলে দীপ্তিময়, ফিরে পাই ঐশ্বর্য-সম্ভার,
হে মহাশক্তির উৎস, তোমারে প্রণাম বারংবার।

স্বামীজীর জয়গান

শ্রীনির্মল রায়

রামকৃষ্ণের বিজয়ী পুত্র, ক্ষাত্র-ব্রহ্ম-শক্তিময়—
হে যুগাচার্য বিবেকানন্দ, গাহি মোরা আজ তোমারি জয়!

বঞ্চিত আর নিপীড়িত প্রাণে আশার আলোক জ্যোতির্ময়,
নব ভারতের নবীন গগনে তুমি প্রদীপ্ত অরুণোদয়,

মাভৈঃ-মন্ত্রে বীর সন্ন্যাসী, দূর করো গ্লানি, বেদনা, ভয়—
হে যুগাচার্য বিবেকানন্দ, গাহি আজ মোরা তোমারি জয়!

স্বামীজী : আনন্দ-মূর্তি

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

ঊর্ধ্বায়িত কালের শিলায়
প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাঁর তেজোদীপ্ত রূপভঙ্গিমায় :
সত্যের আলোক-স্তবে অন্তরে সে সৌম্য স্থির,
শান্ত চোখে গৈরিক আভাস,
ধ্যানের প্রত্যয় নিয়ে ওষ্ঠপুটে প্রশান্ত আশ্বাস !

গুরুর কথায় তাঁর চিত্তাকাশ, মুক্ত ও নির্মল :
ভারতের ইতিবৃত্তে নচিকেতা জিজ্ঞাসু, উজ্জ্বল—
জীবন-জগৎ-প্রশ্নে। চিকাগোর পটভূমিকায়
অন্তরের অনুভব সত্য স্থির আধ্যাত্মিকতায়
সূর্যের সঞ্চয় হ'তে নিয়ে আসে আত্ম-পরিচয় :
আনন্দের মধুব্রতে চিরদিন প্রসন্ন চিন্ময়।
চিনিল সে ভারতেরে, চিনালো সে সকলেরে ডেকে,
প্রবুদ্ধ বিবেক-বার্তা অন্তরের দ্বারে গেল রেখে !

ঈশ্বর, নরের রূপে তাঁর কাছে বৈদান্তিক গানে
দিল সত্য পরিচয় : শাশ্বতের বিপুল বিস্তৃতি
যে-স্নিগ্ধ কান্তিতে মগ্ন, সেই কান্তি এসে তাঁর প্রাণে
শান্তির শপথ দিয়ে বুঝালো কি সত্যের আকৃতি !

সত্যের শরীরে তাই সন্ন্যাস ও কর্মের স্বাক্ষর,
সেই ক'রে দিয়ে গেছে সমুজ্জ্বল সমন্বয়ী-রীতে ;
শতাব্দীর অঙ্কে তাই চেয়ে দেখি অপূর্ব ভাস্বর :
আমারও প্রণাম রাখি বিবেকের আনন্দ-মূর্তিতে।

পুণ্য স্মরণে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রান্তপক্ষ বিহগেরা ফিরেছে কুলায়ে
আলাপিত শেষ গীতি কণ্ঠে বিহগীর।
দীপ্ত অর্চি দিবসের গিয়াছে হারায়ে
অন্ধকার নেমে আসে বক্ষে পৃথিবীর।

তমসা—তমসাঘন ঘিরে চারিধার
আপনার কায়া তাহে নাহি দেখা যায়।
ছায়ায় ছায়ায় কালো, সন্দিগ্ধ হিয়ার
প্রেমের প্রস্ফুট শিখা নির্বাপিত হায়!

আপনারে নাহি চেনে অন্ধ অবিশ্বাসে
পরশ বাঁচায়ে সবে চলে পরস্পরে।
শিহরিত হিমগিরি নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
কাঁদে কন্যা-কুমারিকা আঁকড়ি সাগরে।

বেদনায় অভিভূতা ভারত-জননী
আঁধারের মুষ্টি থেকে কে করিবে ত্রাণ?
চিন্ময় আলোর শিখা জ্বালিয়া আপনি
কে বাঁচাবে অগণিত ভারত-সন্তান?

অব্যক্ত সে অভিলাষ জলদর্চি সম
পায় রূপ অতিপূত জ্ঞানমূর্তি মাঝে।
অবতীর্ণ আশীর্বাদ সৃষ্টি শ্রেষ্ঠতম
অন্ধ যবনিকা-পটে জ্যোতির্ময় সাজে।

প্রভাসিত ধরাতল স্থাবর জঙ্গম
আনন্দ-স্পন্দনে কাঁপে রামকৃষ্ণ-হিয়া,
আলিঙ্গিয়া দিলা মন্ত্র পবিত্র উত্তম।
উদাত্ত আহ্বান এল জগৎ ব্যাপিয়া।

'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, হে ভারত-সন্তান
বরপ্রাপ্ত সুশাশ্বত দৃপ্ত যৌবনের।
ছিন্ন কর মোহসুপ্তি, আসিবে কল্যাণ
কর্মে কর্মে তোল গান পুণ্য প্রয়াসের।'

ধ্বনিত সে মহামন্ত্র দিকে দিগন্তরে,
পত্রে পত্রে, পুষ্পে পুষ্পে, আলো-আলিম্পনে।
দীক্ষা নিল নবযুগ মুক্তি-অঙ্গীকারে
বিকশিত মানবতা অমৃত-সিঞ্চনে।

কালের গহ্বরে লুপ্ত অতীতের কথা
অন্ধকার বীজে জন্মে নব ভবিষ্যৎ।
উন্মত্ত ঝঞ্ঝার বেগ তীব্র আকুলতা
বক্ষে লয়ে জেগে ওঠে নবীন ভারত।

নমোনমঃ দিব্যকান্তি মহাপ্রজ্ঞাময়
চিরোন্নত শীর্ষ স্তব্ধ বজ্রবীর্যধাম।
ধ্যানোত্থিত ঋষি তুমি পূর্ণ জ্যোতির্ময়
নরেন্দ্র বিবেকানন্দ তব পুণ্য নাম।

স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত'

[প্রথম পর্যায়]

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইতিহাস-লেখার দিকে বাংলার গদ্যশিল্পীদের প্রবল ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। তার কারণ, তখন অবধি আমাদের ইতিহাস অনেকাংশেই অনাবিষ্কৃত। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রম্'—জাতীয় গদ্যপ্রচেষ্টা থেকে আরম্ভ ক'রে বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' অবধি বিদেশী ও স্বদেশী ইতিহাস-কাহিনীর বিচ্ছিন্ন উপকরণের সমাবেশপ্রচেষ্টা বাঙালীর নবজাগ্রত ইতিহাস-কৌতূহলের উদাহরণ।

কিন্তু ইতিহাসের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণের দিক থেকে বিচার করলে ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনাকে যাঁরা প্রথম বাংলাসাহিত্যে ধ্বনিত করেছিলেন, সেই প্যারীচাঁদ, ভূদেব, রাজনারায়ণ ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ চিন্তানায়কদের কথাই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ভারতবর্ষকে আপন মাতৃভূমি জেনে হিন্দুকলেজের যে তরুণ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অধ্যাপকটি পরাধীন ভারতবর্ষের উদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন, তাঁর কথাও মনে পড়ে। কিন্তু সেই ডিরোজিও এবং ডিরোজিওর শিষ্যবৃন্দের অধিকাংশই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিটির কথা ততটা গভীরভাবে বিচার ক'রে দেখেননি। তাই প্রাচীন ও নবীনের সংঘাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নবীনের মোহ তাঁদের যতটা সমাচ্ছন্ন করেছিল, প্রাচীনের মর্যাদা ততটা আত্মস্থ করেনি।

তবু এ-কথা স্বীকার্য যে, ডিরোজিওর শিষ্যেরা উত্তর-জীবনে যখন চিন্তাজগতের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছেন, তখন ধীরে ধীরে নবীনের বিদ্রোহ প্রৌঢ়ের অভিজ্ঞতায় অনেকখানি স্বচ্ছ ও সুসমঞ্জস হয়ে এসেছে। ডিরোজিও-শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনাবলী থেকে এই সামঞ্জস্য-সাধনের একটি উদাহরণ :

বাহ্য আড়ম্বরীয় শিক্ষাতে সমাজ সুশোভন হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর-পরায়ণত্বের ব্যাঘাত, আত্মবলের হ্রাস ও প্রকৃতির প্রাবল্য। ঈশ্বরপরায়ণত্ব ও আত্মবলের জন্য এ-দেশের মহিলাগণ পূর্ব হইতেই বিখ্যাত। কোন্ দেশে পতির জন্য স্ত্রীলোক অগ্নিতে গমন করে ও সর্বত্যাগী হইয়া ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করে? সামাজিক বিবেচনায় ইহা যদিও প্রসিদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু আত্মবলের পক্ষে ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ। আর্যজাতীয় মহিলাগণ! সতী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি ঈশ্বরপরায়ণা নারীদের চরিত্র সর্বদা স্মরণ কর। তাঁহাদিগের ন্যায় শম, যম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর ও সমাহিত হইয়া উপরতিতে পূর্ণ হও।

(—এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা)

ডিরোজিও-যুগের সর্বব্যাপী পরিবর্তনের মুখেও মননের স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল ভূদেব তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধে' লিখেছেন—"যখন হিন্দু-কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব-শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতির মধ্যে স্বদেশানুরাগ নাই। কারণ, ঐ ভাবার্থ-প্রকাশক কোন বাক্যই কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় নাই। তাঁহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাস-নিবন্ধন মনে মনে বৎপরোনাস্তি দুঃখানুভব

করিয়াছিলাম। তখন 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থ হইতে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগ-সম্বন্ধায় পৌরাণিক বিবরণ জানিতাম, কিন্তু সেই বিবরণ জানিয়াও শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রকৃত উত্তর অথবা আপন মনকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়াছি যে, আর্যবংশীয়দিগের চক্ষুতে বায়ান্ন পীঠ-সমন্বিত সমুদয় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বরীদেহ।"

ভূদেব ও মধুসূদনের সহপাঠী ও বন্ধু রাজনারায়ণ তো তাঁর জীবৎকালেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম পুরোধারূপে স্বীকৃত। তাঁর সুবিখ্যাত 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতায় রাজনারায়ণ বলেছিলেন—"...আমরা নিউ-জিল্যাণ্ডবাসী নহি যে, একদিনেই হেট্ কোট্ পরিয়া সকলে সাহেব সাজিয়া উঠিব, ইহা ক্রীতদাসের কার্য, আমরা কখনই এরূপ ক্রীতদাস নহি, আমাদের আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে, হিন্দুজাতির ভিতরে এখনো এমন সার আছে যে, তাহার বলে তাহারা আপনাদিগের উন্নতি আপনারাই সাধন করিবে, হিন্দুজাতি অবশ্যই আপনা-আপনি উন্নত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতিদের সমকক্ষ হইবে, ধর্মোৎপান্ন সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা, সে সভ্যতা এখনো পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয় নাই, আবার আশা হইতেছে যে, হিন্দুজাতি পুনরায় প্রাচীনকালের ধর্মোৎপান্ন সভ্যতা, এমন কি, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ধর্মোৎপান্ন সভ্যতা লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য হইবে..."

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের চিন্তানায়কদের এই জাতীয় রচনাবলীতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধমালার পূর্বসূচনা দেখতে পাই। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উপাদানে সুসম্পূর্ণ ইতিহাস-রচনার ব্যাকুলতা বঙ্কিমসাহিত্যেই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করি। অবশ্য বঙ্কিমের ইতিহাস-চেতনা মূলতঃ বঙ্গকেন্দ্রিক—তাঁর 'বন্দে মাতরম্'-ও তো বাংলার রূপকল্পে সমগ্র ভারতের জাতীয়-সঙ্গীত। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'বাঙালার ইতিহাস-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না।"

বঙ্কিমের ইতিহাস-সচেতন দৃষ্টি বাংলা ও ভারতের ইতিহাসের পটভূমিতে সঞ্চরণ ক'রে উপন্যাসের কবিকল্পনায় যে পরিবেশ ও চরিত্র সৃষ্টি করেছে, আমাদের জাতীয় চেতনা তার দ্বারা অনেক পরিমাণে সঞ্জীবিত। এদিক থেকে বঙ্কিম-বন্ধু রমেশচন্দ্রও তাঁর উপন্যাসে, প্রবন্ধমালায় ও ঋগ্বেদের অনুবাদের মধ্য দিয়ে ভারতাত্মার সন্ধানী পথিক।

বাংলাসাহিত্যে ইতিহাস-চেতনার এই পটভূমিতে স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' আর একটি স্মরণীয় সংযোজন। রামমোহনের যুগ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতাদর্শের যে সংঘাত বাঙালীর মননভূমিতে দেখা দিয়েছিল, তার একটি সমন্বিত দার্শনিক রূপ 'বর্তমান ভারতে'র প্রবন্ধসীমায় বিধৃত। বস্তুতঃ এ প্রবন্ধপুস্তিকাটি ইতিহাস নয়, ইতিহাসের দর্শন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় স্বামী সারদানন্দজী এ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন "...ইহা একখানি দার্শনিক গ্রন্থ। ভারত সমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশি-সমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব দশসহস্র বর্ষব্যাপী কাল ধরিয়া উহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও পরিবর্তিত করিয়া দেশে সুখ-দুঃখের পরিমাণ

কিরূপে কখন হ্রাস, কখন বা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, কার্যপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত-অসম্বদ্ধ ভারতীয় জাতি-সমূহ কোন্ সূত্রেই বা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন্ দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই 'বর্তমান ভারতে'র আলোচ্য বিষয়।"

সুতরাং স্বামীজীর ভারতচিন্তা প্রধানতঃ ভারতের অন্তরের ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ভারতের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বামীজী তাঁর বক্তৃতা ও রচনা-বলীতে অসংখ্যবার আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে মানবজাতির আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতীক। সুতরাং ব্রহ্মচিন্তা ও স্বদেশচিন্তা তাঁর ভাবনালোকে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। তবু ভারতবর্ষকে তিনি বিশুদ্ধ ভাববাদের দিক থেকেই বিচার করেননি। ইতিহাসের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় চেতনার মূলসূত্র আধ্যাত্মিকতা তাঁর লক্ষ্য হলেও আধুনিক যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানে অগ্রসর পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্গে আদানপ্রদানের মধ্য দিয়েই যে ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠবে—এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। 'ভাববার কথা'র 'বর্তমান সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি এ-বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটিতে তিনি দেখিয়েছেন যে, ঘটনাপঞ্জীমূলক ইতিহাসের চেয়ে অনেক ভালোভাবে ভারতের ইতিহাস লেখা রয়েছে, "ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্য-সমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী"-র মধ্যে।

'বর্তমান ভারতে' ভারতের বর্ণাশ্রমধর্মের চার বিভাগের অনুসরণে স্বামীজী পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসকেও চারভাগে ভাগ করেছেন।

"সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য-তারতম্যে প্রসূত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সনাতন কাল হইতে সকল সভ্যসমাজে বিদ্যমান আছে। কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে ঐ চতুর্বর্ণের কোন কোনটির সংখ্যাধিক্য বা প্রবলাধিক্য ঘটিতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস-আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে। চীন, সুমের, বাবিল, মিসরি, খল্‌দে, আর্য, ইরানি, য়াহুদী, আরব—এই সমস্ত জাতির মধ্যেই সমাজনেতৃত্ব প্রথমযুগে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত-হস্তে। দ্বিতীয়যুগে ক্ষত্রিয়কুল অর্থাৎ রাজসমাজ বা একাধিকারী রাজার অভ্যুদয়।

বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী সম্প্রদায়ের সমাজনেতৃত্ব কেবল ইংলণ্ডপ্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যেই প্রথম ঘটিয়াছে।"

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে পুরোহিতশক্তি ও রাজশক্তির বহুকালব্যাপী সংঘর্ষের পর শেষ অবধি রাজশক্তিরই প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ-আমলে প্রাধান্য বৈশ্যতন্ত্রের। ইংরেজ-আমলেই বিবেকানন্দ আসন্ন শূদ্রযুগের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। আধুনিক কালে শ্রমজীবীদের কেন্দ্র ক'রে যে গণজাগরণের সূচনা পৃথিবীর সর্বত্র দেখা দিয়েছে, তারই পূর্বাভাস দেখি 'পরিব্রাজকে'* স্বামীজীর শ্রমিক-বন্দনায়। বাংলাসাহিত্যে গণচেতনার এই অভ্রান্ত স্বাক্ষর আগামী 'শূদ্রযুগে' ভবিষ্যদ্বাণীর মর্যাদা লাভ করবে। সাম্প্রতিক বৈশ্য ও শূদ্রযুগের যে যুগসন্ধিক্ষণে ভারতের তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের কর্তব্য স্বেচ্ছায় সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া।

* পরিব্রাজক : ১১শ সংস্করণ, পৃঃ ৪১-৪৩ দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষের সমাজজীবনে যে সব পরিবর্তনমুখী আন্দোলন দেখা দিয়েছে, সেগুলি একদিকে যেমন অধ্যাত্মজীবনে নূতন প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে সমাজ-চেতনার শূন্যতা পূরণ করেছে। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ—এ-সব আন্দোলন বা ব্যক্তিত্বের পিছনে তিনি ঐ এক উদ্দেশ্য দেখতে পেয়েছেন। সমাজ-জীবনে যখনই সমষ্টিকে ভুলে ব্যষ্টির আরাধনা শুরু হয়, অথবা কোন সম্প্রদায়বিশেষের আধিপত্য ঘটে, তখনই বিপ্লবের শুরু—"সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।"

বিবেকানন্দ জানতেন—"…এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব-সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য প্রকাশ করিতেছে, তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজ্‌ম্, এনার্কিজ্‌ম্, নাইহিলিজ্‌ম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।

উনিশ শতকের নবজাগৃতির সমগ্র আয়োজন যখন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত, সেই সময়ে বিবেকানন্দ যে গণ-সংযোগের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, আজকের বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ সে অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করছে। গণচেতনার অভাবেই উনিশ শতকের নবজাগরণ অসম্পূর্ণ। আজও আমরা এই অভাবের স্বরূপটি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারিনি। তাই আর্থনীতিক পরিকল্পনার ব্যাপকতার পাশাপাশি গণশিক্ষার আয়োজনের যৎসামান্য আয়োজন দেশহিতৈষীমাত্রেরই গভীর বেদনার কারণ।

মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে নেতৃত্বের উত্থান-পতন সম্বন্ধে বিবেকানন্দের এই সাবধান-বাণীটি এ-যুগের নেতৃবৃন্দের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়: "সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা, যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়।"

ইংরেজ-রাজত্বের বৈশ্যশক্তি একদিন এই ভুল করেছিল। পৃথিবীর যে-সব দেশে শূদ্র-শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে ব'লে মনে হয়, সে-সব দেশেও এই ভুলের পুনরাবৃত্তি চলেছে। ইতিহাসের এই শিক্ষা বর্তমান ভারত কতখানি গ্রহণ করবে, তারই উপর ভবিষ্যৎ ভারতের সম্ভাবনা নির্ভরশীল।

ইংরেজ-রাজত্বের মূল স্বরূপটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বামীজী 'বাস্তব ইংলণ্ডে'র পরিচয়-বিশ্লেষণে কয়েকটি উপমাত্মক চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলেছেন: "ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিমনি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্য-বীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।" ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে ভারতের স্বাধীনতা-লাভ অবধি ইংরেজের রাজদণ্ড যে আসলে বণিকের মানদণ্ডই ছিল—এ-কথা সর্বজনবিদিত। ইংরেজ-শোষণের নির্মম

ইতিহাস স্বামীজী গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। তবু এই পরাধীনতার যুগেও ইংরেজ-শাসনের দ্বারা যে কল্যাণ সাধিত হয়েছে, তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রথমতঃ, "…এ প্রকার শক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র" এদেশে এর আগে কখনো দেখা যায়নি। দ্বিতীয়তঃ, "এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসঙ্ঘর্ষে, অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে।"

এই নবজাগরণের উচ্ছ্বাসে হয়তো জাতীয় জীবনে বা ব্যক্তিগত আচার-আচরণে ভুল-ভ্রান্তি দেখা দিতে পারে, কিন্তু নির্বিবাদে পূর্ব-গামীদের অনুসরণ ক'রে যাওয়াও তো মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। সে-কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে মানবাত্মার চিরস্বাধীনতায় বিশ্বাসী বিবেকানন্দ বলেছেন: "যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না; প্রস্তর-খণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ নরকুলেই।…মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতা-লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে?''

সমকালীন ইংরেজ-শাসনের একটি দুর্বলতা স্বামীজী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন—পাছে ভারতবর্ষ হাতছাড়া হয়, এই ভয়ে সেকালের ইংরেজেরা 'ইংরেজ জাতির গৌরব' সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠেছিল। আসলে এ মনোভাব দুর্বলতারই নামান্তর।

অপরপক্ষে সমকালীন 'শিক্ষিত' ভারতীয় মানসের দ্বন্দ্ব অনুভব ক'রে স্বামীজী মন্তব্য করেছেন: "একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্যসমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা - অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ!" এই দুই সভ্যতার পারস্পরিক ভাববিনিময়ে প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যারা বিদেশীয় শিক্ষা, বিদেশীর ভাষা ও বেশভূষা অবলম্বনকেই উন্নতির চরমসীমা জেনে দরিদ্র অজ্ঞ স্বদেশবাসীকে তুচ্ছ মনে করতেন বা এখনও করেন, তাদের উদ্দেশে স্বামীজীর অসংশয় মন্তব্য: "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?"

ভারতবর্ষ এবং ইওরোপ-আমেরিকা পরিভ্রমণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বিবেকানন্দ এই ধ্রুব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, "‥ পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায়মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে।" সুতরাং অনুকরণ নয়, স্বীকরণ; আর সেই স্বীকরণের জন্য আত্মানুসন্ধান। বর্তমান ভারতের উদ্দেশে বিবেকানন্দের এই আত্মস্থতার বাণীতেই উনিশ শতকের নব-জাগরণের পরিপূর্ণতা।

বাংলাসাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি স্বদেশপ্রেমের দীপ্ত অনুভূতির উদাহরণ অজস্র। তবু 'বর্তমান'ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদে বিবেকানন্দের ভারতপ্রেম প্রজ্ঞা ও ধ্বনি-গাম্ভীর্যের মিলিত সৌন্দর্যে যে মন্ত্রোচ্চরণের মহিমা লাভ করেছে, তার অনন্যতার কথা স্মরণ ক'রে সুদীর্ঘ হলেও সেই অবিস্মরণীয় অংশটি পাঠকদের কাছে নিবেদন করি:

হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী-

জাতির আদর্শ সীতা, সা.ব্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

ভারত-ইতিহাসের প্রাণপুরুষ বিবেকানন্দের লেখনীর মধ্য দিয়ে যে স্বদেশমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, ভবিষ্যৎ ভারত সেই মহামন্ত্রের অনুধ্যানে মানবসভ্যতার কেন্দ্রতীর্থ হয়ে উঠবে—এই আশা ও বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ ক'রে শতবার্ষিকীর পুণ্যলগ্নে জাতির জীবনযুদ্ধের বীর সেনাপতিকে আমাদের অন্তরের প্রণাম নিবেদন করি। ভারতের ইতিহাস জয়যুক্ত হোক।

চিত্ত মাঝে রহ জাগরূক !

শ্রীপ্রভাত বসু

অর্জুনের ক্ষাত্রতেজ, শঙ্করের জ্ঞান,
বুদ্ধের অসীম মৈত্রী, চৈতন্যের প্রেম—
সমন্বিত মূর্তি তার দেখেছি আমরা
হে বীর সন্ন্যাসী, তব জীবন মাঝারে।

সে জীবন ছিল জানি আশীর্বাদ-পূত,
গুরু-শিষ্য মহাযোগ উদ্‌যাপিলে তুমি।
বাঙালীর বিশ্ব-জয় অপূর্ব বিস্ময় !
উদ্বোধিল মানবেরে ভারতের বাণী।

শতবর্ষ-পূর্তি আজি ; সহস্র বর্ষেও
তোমার মহিমা-সূর্য রহিবে অম্লান।
প্রাণের প্রণতি সাথে কামনা জানাই—
আমাদের চিত্ত মাঝে রহ জাগরূক !!

বিবেকানন্দ-সঙ্গীত

[মিশ্র বেহাগ—একতালা]

আদর্শ তব শঙ্কর সীতা ভুলিও না তুমি ভুলিও না।
ভুলিও না তুমি, মহাপবিত্র এই ভারতের ধূলিকণা ॥
ভারত-সন্তান দেবতা তোমার,
খুঁজিতে ঈশ্বর কোথা যাবে আর
মহা উপচারে ত্যাগ ও সেবার
কর কর তাঁর আরাধনা ॥
উচ্চ কণ্ঠে বল বল তুমি,
ভারত-সন্তান আমার ভাই
মূর্খ কাঙাল দ্বিজ চণ্ডাল
দেবতা আমার এঁরা সবাই।
প্রাণপণে তুমি বল দিনরাত,
জগত-জননি! ওগো উমানাথ!
মানুষ করিয়া দাও গো আমায়,
আর কিছু আমি চাহিব না ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি : স্বামী চণ্ডিকানন্দ।

	০			১			+			৩			
II{	র্সর্সা	র্সনা	ধা	নধা	গা	মা	পা	না	না	পনর্সর্রা	র্সা	না	I
	আ	দ	০	র্শ	ত	ব	শ	ং	ক	র	সী	তা	
	০			১			+			৩			
	গা	পা	গা	পা	ধা	পা	সা	গা	রা	সা	া	া	}I
	ভু	লি	ও	না	তু	মি	ভু	লি	ও	না	০	০	
	০			১			+			৩			
	ন্া	সা	সা	গা	গা	মা	পা	পা	গা	মা	া	গা	I
	ভু	লি	ও	না	তু	মি	ম	হা	প	বি	০	ত্র	
	০			১			+			৩			
	সা	সা	সা	গা	গা	মা	পা	পা	পা	না	ধা	না	I
	ভু	লি	ও	না	তু	মি	ম	হা	প	বি	০	ত্র	
	০			১			+			৩			
	র্সা	র্গা	র্রা	র্সা	র্সনা	ধা	পা	র্সা	না	ধপা	া	া	II
	এ	ই	ভা	র	তে	র	ধূ	লি	ক	ণা	০	০	

০			১			+			৩		
II ধা	মা	পা	না	না	না	র্সা	র্সর্গা	র্রা	র্সনা	র্রর্সা	া I
ভা	র	ত	স	ন্তা	ন	দে	ব	তা	তো	মা	র
প্রা	ণ	প	ণে	তু	মি	ব	ল	দি	ন	রা	ত

০			১			+			৩		
না	নর্রা	র্সা	না	ধপা	হ্মপা	পা	না	না	ধনা	র্সর্রা	র্সনা I
খুঁ	জি	তে	ঈ	শ্ব	র	কো	থা	যা	বে	০	আর
জ	গ	ত	জ	ন	নি	ও	গো	উ	মা	না	থ

০			১			+			৩		
ন্া	সা	সা	গা	গা	মা	পা	হ্ম	গা	মা	গা	া I
ম	হা	উ	প	চা	রে	ত্যা	০	গ	সে	বা	র

০			১			+			৩		
ন্া	সা	সা	গা	গা	মা	পা	া	পা	নধা	না	া I
ম	হা	উ	প	চা	রে	ত্যা	০	গও	সে	বা	র

০			১			+			৩		
র্সা	র্সর্গা	র্রা	র্সা	না	র্সা	পা	র্সা	না	ধপা	া	া I
ক	র	ক	র	তা	র	আ	রা	ধ	না	০	০

০			১			+			৩		
II র্সা	া	ধা	না	ধা	পা	হ্ম	পা	গা	মা	গা	গা I
উ	০	চ্চ	ক	০	ণ্ঠে	ব	ল	ব	ল	তু	মি

০			১			+			৩		
সা	গা	া	গমা	পা	পা	গা	পমা	া	গা	া	া I
ভা	র	ত	স	ন্	তান	আ	মা	র	ভা	ই	০

০			১			+			৩		
সা	গা	গা	গা	গা	মা	রা	মা	মা	মা	মগা	রা I
মূ	০	র্খ	কা	ঙা	ল	দ্বি	জ	চ	ন্	ডা	ল

০			১			+			৩		
রা	গরা	রা	পা	মগা	রা	গা	গরা	সন্া	সা	া	া I
দে	ব	তা	আ	মা	র	এ	রা	স	বা	০	ই

০			১			+			৩		
র্সা	র্সা	র্গা	র্রা	র্রা	র্সা	না	র্সরা	নধা	না	ধপা	া I
মা	নু	ষ	ক	রি	য়া	দা	ও	গো	আ	মা	য়

০			১			+			৩		
গা	পা	গা	পা	ধা	পা	সা	গা	রা	সা	া	া I
আ	র	কি	ছু	আ	মি	চা	হি	ব	না	০	০

[illegible]
[illegible] — [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

স্বামীজীর একটি অপ্রকাশিত পত্র *

(নির্বাচিত অংশ)

৫ই সেপ্টেম্বর—১৮৯৪
আমেরিকা

ভট্টাচার্য মহাশয়—আপনার প্রণয়পূর্ণ পত্রপাঠে অতিশয় প্রীত হইলাম। কাপড় বুনিবার যন্ত্র যত শীঘ্র পারি খোঁজ করিয়া আপনাকে লিখিব। এক্ষণে আমি অ্যানিস্কাম্ নামক সমুদ্রতীর গ্রামে বিশ্রাম করিতেছি—শীঘ্রই সহরে যাইয়া অনুসন্ধান করিব। গরমী কালে এই সকল সমুদ্রতীর স্থান লোক পূর্ণ হয়। কেউ নাইতে আসে, কেউ বিশ্রাম করিতে আসে—.

*   *   *

ক্রমে সব হবে শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্ কাগজপত্র সব ঠিকঠাক পৌঁছে গেছে, তাতে কোনও গোলমাল নাই, দুষমনের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। * * *

ম—বলছেন, 'ও বদ্‌মাস্' তাতে কানও পাতে না, এদের গুণ কত। কত দয়া আমার শত জন্মেও এদের ঋণ শোধ হবে না—আমি আমেরিকার মেয়েদের পুষ্যিপুত্র—এরাই যথার্থ আমার মা—এদের কল্যাণ হবে না তো কাদের হবে?

মধ্যে Greenacre ব'লে এক স্থানে কয়েক-শ মেয়েমদ্দ এদেশের মাথাওয়ালা একত্র হয়েছিল। আমি সেখানে ছিলাম প্রায় দুমাস। রোজ এক গাছের তলায় আমাদের হিঁদু ফ্যাসানে বসতুম আর আমার চারিদিকে আমার চেলা-চরিত্রি ঘাসের উপর ব'সত। রোজ সকালে—উপদেশ দিতাম কত আগ্রহ এদের দেশশুদ্ধ লোক এখন আমাকে জানে, পাদ্রীরা বড়ই চটা, সকলে নয় অবিশ্যি, এদের learned পাদ্রীর মধ্যে অনেক আমার চেলা আছে।

*   *   *

আমি হচ্ছি এদের পুষ্যি, আমায় গাল দিলে এদের মেয়ে-মহলে তার নামে ধিক্কার পড়ে যায়। কবে দেশে যাব বলতে পারি না—বোধ হয় আসছে শীতকালে যাব। সেখানেও ঘুরে বেড়ান এখানেও তাই। কিমধিকমিতি। চিঠিটা ফাঁস করবেন না—বুঝতে পেরেছেন—আমার এখন প্রত্যেক কথাটি হুঁসিয়ার হয়ে কইতে হয়—public man—সব .... ওৎ পেতে থাকে।...

বশম্বদ
বিবেকানন্দ

শীতের শেষে এদেশে খুব ইলিস মাছ, কাঁকড়া চিঙ্গড়ি মাছ অজচ্ছল তবে এদের রান্নাবান্না আর একরকম।



---

* সম্মুখে ফটোস্টাট দ্রষ্টব্য।

সমালোচনা

Holy Mother—by Swami Nikhilananda. Published by New York Ramakrishna-Vivekananda Centre. Pp. 334; Price $ 4·50.

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন সাবলাল ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইতঃপূর্বে ইংরেজী ও বাংলায় প্রকাশিত শ্রীশ্রীমায়ের প্রামাণিক জীবন-চরিত হইতে গ্রন্থখানির উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।

কয়েকটি পরিচ্ছেদের পরিচিতি: Early life; Marriage and after; First visit to Dakshineswar; Awakening of Divinity: Spiritual practices; In a domestic setting; Spiritual ministry; In the role of teacher; Divinity.

বিশ্ব-পরিপ্রেক্ষিতে রচিত অপূর্ব এক দেব-মানবীর জীবন-কাহিনী বর্ণনার পর এই গ্রন্থের শেষে আরও কয়েকটি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে; তন্মধ্যে লেখকের নিজের এবং আরও কয়েকজনের শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধে স্মৃতিকথা গ্রন্থখানিকে নৈর্ব্যক্তিক 'জীবনী' হইতে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। 'শ্রীশ্রীমা কি শিক্ষা দিয়াছেন?' বিষয়ক দুইটি অধ্যায়ে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'র একটি ঘনীভূত রূপ পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তিস্বরূপিণী সারদাদেবীকে বুঝিতে হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীশ্রীমাকে কি চোখে দেখিতেন, তাহাও বলা প্রয়োজন। শেষের অধ্যায়গুলিতে বিচক্ষণ লেখক সেই কাজ করিয়া পাঠকবর্গের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

এই গ্রন্থে ৪৩ খানি ছবি দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের ৭ খানি; অন্যগুলি তাঁহাদের, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের সহিত যাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। গ্রন্থশেষে মূল্যবান্ নির্ঘণ্ট ও সূচী সংযোজিত; মুদ্রণ-পারিপাট্য, কাগজ, বাঁধাই—সব দিক দিয়াই গ্রন্থখানি সুন্দর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় দেশের পাঠকেরই নিকট ইহা সমাদৃত হইবে।

Abhedananda Academy Annual (1961, 1962), Published by Narayan Krishna Sen on behalf of Abhedananda Academy of Culture from 73, Ahiritola Street, Calcutta 5. Pages 92, 78. Price Rs 5/- and 3/- respectively.

আমাদের দেশে পত্র-পত্রিকার অভাব নাই, কিন্তু পুরাতত্ত্ব ও কৃষ্টি-বিষয়ক গবেষণামূলক বার্ষিক পত্রিকার সংখ্যা খুবই কম। প্রথম বৎসরের সম্পাদকীয় মুখবন্ধে দুঃখ করিয়া বলা হইয়াছে: আমাদের দেশে আজও ঋগ্‌বেদ ও প্রাচীন সাহিত্যমূলক সকল আলোচনা প্রধানতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই করা হয়। সংস্কৃত ও আঞ্চলিক ভাষাগুলির উপযুক্ত অভিধানের অভাব, সম্পাদকের মতে পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে প্রধান বাধা—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দৃঢ়বদ্ধ ধারণা যে, আর্যগণ খ্রীঃ পূঃ ১৫ শতকে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সুমের সভ্যতা, মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পা ও পঞ্জাব-সিন্ধুর বৈদিক সভ্যতা বিষয়ে এখনও অনেক কিছু জানিবার আছে। মনে হয় সম্পাদক পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে এ-বিষয়ে আলোকপাত করিবেন। আলোচ্য সংখ্যা-দুটিতেও ঐ বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ রহিয়াছে। পুরাতত্ত্ব ছাড়াও বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ গভীর গবেষণার পরিচায়ক। মনে হয়—এরূপ পত্রিকাকে বহুমুখী না করিয়া একমুখী করিলেই পাঠকের পক্ষে সুবিধা হইবে।

কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রবন্ধ :

1961 : Chemistry in Mohenjodaro, Dr. Ramgopal Chatterjee. Anthropological basis of Religion, Dr. B. N. Datta. Hindus in Babylonia, Swami Sankarananda.

1962 : An introduction to Space Science, Prof. Kalyan Kumar Bose. Early Mesopotemian and Indian Civilization, Prof. S R. Das.

দ্বিতীয় বৎসরের সম্পাদকীয় 'Vivekananda Centenary' প্রবন্ধে জাতীয় উত্থানে স্বামীজীর প্রভাব, উহার গতিরোধ ও বর্তমান প্রয়োজন সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। পত্রিকাটির উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

Viveka : (The Vivekananda College Magazine) March 1962, Edited and published by Sri K. Vasudevan, Professor, Vivekananda College, Mylapore, Madras, Pages English Section : 78 + vi ; Sanskrit : 22 ; Hindi : 5 ; Tamil : 24 ; Telugu : 20.

মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত কলেজের পত্রিকা 'বিবেক' পাঁচটি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধে ও বহু চিত্রে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজী বিভাগেই প্রবন্ধের সংখ্যা অবশ্য সর্বাধিক এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যকলাপের বিবরণীও এই বিভাগে প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কৃতে ছয়টি ও হিন্দীতে চারটি প্রবন্ধ রচনা ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়।

বিবেকানন্দ-লীলাগীতি (কথিকা-সহ) স্বামী চণ্ডিকানন্দ। প্রকাশক : স্বামী সমুদ্ধানন্দ, সাধারণ সম্পাদক, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটি, ১৬৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ১৪। পৃষ্ঠা ৭৪ + ৮ ; মূল্য ১৲।

স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ-জয়ন্তীর মুখে প্রকাশিত পুস্তিকাটি সাধক ভক্ত গায়কমণ্ডলী সকলকে আকর্ষণ করিবে।

কথিকা-সহ 'সারদা-রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি' প্রকাশিত হইবার পর উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে উহা কথকতা-সহ গীত হয় এবং সর্বত্র শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। অতঃপর অনেকের অনুরোধে তিনি স্বামীজীর সম্বন্ধে ঐরূপ একটি গ্রন্থ রচনা করেন। দুই পর্বে এই গ্রন্থটি সমাপ্ত। প্রথম পর্বে—নরেন্দ্রনাথের বাল্যলীলা ও শ্রীগুরুর সহিত দিব্যলীলা। দ্বিতীয় পর্বে—পরিব্রাজক ও আচার্য বিবেকানন্দ। সঙ্গীত ও কথার টানা-পোড়েনে অপূর্ব এই রচনা! স্বামীজীর শতবার্ষিকী-বৎসরে বিভিন্ন স্থানে এই লীলাগীতির আয়োজন হউক—জনসাধারণের মধ্যে স্বামীজীর জীবন ও বাণী ছড়াইয়া পড়ুক—ইহাই প্রার্থনা করি। অধিকাংশ সঙ্গীতই স্বামী চণ্ডিকানন্দের রচিত, স্বামীজী-রচিত এবং স্বামীজীর গাওয়া কয়েকটি বিখ্যাত গানও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া পুস্তিকাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটি বিভিন্ন বয়সের উপযোগী করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের চারখানি জীবনী প্রকাশ করিতেছেন, দুইখানি প্রকাশিত :

(১) **ছোটদের বিবেকানন্দ :** স্বামী নিরাময়ানন্দ পৃষ্ঠা ৬০, মূল্য ৫০ ন.প.

(২) **স্বামী বিবেকানন্দ :** স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃষ্ঠা ১২০, মূল্য ১৲

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী-সংবাদ

উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের কার্যসূচী

১৭ই জানুআরি (৩রা মাঘ, বৃহস্পতিবার)

পূর্বাহ্নে : বেলুড় মঠে পূজা পাঠ হোম ভজন কীর্তন।

অপরাহ্নে : মঠ মিশনের অধ্যক্ষের বাণী-প্রচার। সভায় বক্তৃতা।

১৮ই জানুআরি (৪ঠা মাঘ, শুক্রবার)

অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিঃ-এ বেলুড় মঠে স্বামীজী-সম্বন্ধে পাঠ ও সঙ্গীত।

১৯শে জানুআরি (৫ই মাঘ, শনিবার)

অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিঃ-এ মঠ-মণ্ডপে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুষ্ঠান।

২০শে জানুআরি (৬ই মাঘ, রবিবার)

পূর্বাহ্নে : ভজন, বেদগীতি ও শাস্ত্রপাঠ সহযোগে স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ প্রাতে ৮ ঘটিকায় বেলুড় মঠ হইতে কাশীপুর উদ্যানবাটী পর্যন্ত শোভাযাত্রা।

অপরাহ্নে : ৩-৩০ মিঃ-এ দক্ষিণ কলিকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে জনসভায় স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব উদ্বোধন করিবেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন। মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সভায় ভাষণ দিবেন। সভাশেষে জাতীয় সঙ্গীত।

২১শে জানুআরি (৭ই মাঘ, সোমবার)

অপরাহ্নে : ৫-৩০ মিঃ-এ গোল পার্কে রামকৃষ্ণ মিশন কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের বিবেকানন্দ-হলে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পৌরোহিত্য করিবেন। বৈদিক প্রার্থনা ও সঙ্গীতের পর বক্তৃতা করিবেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ, শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী-প্রস্তুতি

কলিকাতা : ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে গত ২২শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪ টায় স্বামী বিবেকানন্দ-জন্ম-শতবার্ষিকী যুব ও ছাত্র উৎসব কমিটির উদ্যোগে ডক্টর রমা চৌধুরীর পৌরোহিত্যে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, অধ্যাপক অমিয়-কুমার মজুমদার, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট বক্তাগণ 'স্বামীজীর জাগরণের বাণী ও বর্তমান সঙ্কট' সম্বন্ধে সুচিন্তিত ভাষণ দিয়া তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেন।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেন, স্বাধীনতা লাভের জন্য যে শক্তি ও ত্যাগের প্রয়োজন, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সেইরূপই প্রয়োজন। নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, স্বামীজীর বাণীর অনুশীলনে আমাদের মধ্যে প্রকৃত শক্তি আসিবে।

ডক্টর রমা চৌধুরী বর্তমান সঙ্কটকাল বিশ্লেষণ করিয়া সারগর্ভ ভাষণ দেন। সভায় বহু ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ হয়। শ্রোতৃবৃন্দ বর্তমানে স্বামীজীর জীবন অনুধ্যানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেন। সভার প্রারম্ভে ও অন্তে স্বামীজীর সম্বন্ধে রচিত গান সুন্দরভাবে গীত হয়।

গড়বেতা (মেদিনীপুর) **:** শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের উদ্যোগে স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে শোভাযাত্রা, ধর্মসভা, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, স্কুল-কলেজে ছাত্রসভা, যাত্রা, কথকতা, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রভৃতির আয়োজন করা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠঃ গত ২রা পৌষ (১৮ই ডিসেম্বর) মঙ্গলবার শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ ১১০তম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারা-দিন-ব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মঙ্গলারতি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। ৬,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবন আলোচনা করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িঃ কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাড়িতে শ্রীশ্রীমা জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন, পুণ্য-স্মৃতি-বিজড়িত 'উদ্বোধন' ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব মহা উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ, ভজন, কালীকীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামী ঈশানানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা আলোচনা করেন। সহস্র সহস্র ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। সন্ধ্যার পরও বহু ভক্ত মাতৃ-সন্দর্শনে আসেন।

সারদানন্দ-জন্মোৎসব

'উদ্বোধন'-ভবনে গত ১লা জানুআরি স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শুভ জন্মোৎসব পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় মহা উৎসাহে ও আনন্দে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন, কালীকীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামী বোধাত্মানন্দ পূজ্যপাদ মহারাজের পুণ্য জীবন আলোচনা করেন। পূজ্যপাদ মহারাজের প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হয়। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভক্তসমাগমে উদ্বোধন-ভবন আনন্দমুখর ছিল।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীঃ যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুআরি—ভক্তবৃন্দকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া 'তোমাদের চৈতন্য হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেখানে সেই ঘটনার পুণ্য-স্মৃতিতে গত ১লা জানুআরি 'কল্পতরু-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম ও কালীকীর্তন হয়। ১৫ হাজারের বেশী নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে সঙ্গীত-সহযোগে স্বামীজীর জীবনালেখ্য অবলম্বনে কথকতা শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ আনন্দ দিয়াছিল। ভজনের পর ভাগবতের 'ধ্রুব উপাখ্যান' ব্যাখ্যাত হয়। অতঃপর অনুষ্ঠিত সভায় 'কল্পতরু ও কাশীপুর উদ্যানবাটী' কেন্দ্র করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ, শ্রীহরিপদ ভারতী, স্বামী পুণ্যানন্দ ও স্বামী গম্ভীরানন্দ (সভাপতি)। সভান্তে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী রামায়ণের 'পঞ্চবটী' পালা কথকতা করেন।

২রা জানুআরি স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক ছান্দোগ্য উপনিষদের 'ইন্দ্রবিরোচন-সংবাদ' ব্যাখ্যাত হইলে স্বামী ওঁকারানন্দ 'বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে দীর্ঘ

সারগর্ভ ভাষণ দেন। বর্তমান যুগের বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন, সকল সমস্যার সমাধান শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের মধ্যে মিলিবে। সভার পর কবিকঙ্কণ চণ্ডীর গান হয়

৩রা জানুআরি অপরাহ্নে ভজনের পর পণ্ডিত শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী 'চৈতন্যচরিতামৃত' ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। উৎসবের তিন দিন উদ্যানবাটীতে সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হয়।

কাঁকুড়গাছি ঃ যোগোদ্যানেও প্রতি বৎসরের ন্যায় 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে সারাদিন আনন্দোৎসব হয়। এতদুপলক্ষে পূজা, হোম, ভোগরাগ, কীর্তন ও ভজন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যোগোদ্যানে বহু ভক্তের সমাগম হয়।

বক্তৃতা-সূচী

গোলপার্ক (কলিকাতা) ঃ রামকৃষ্ণ মিশন কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠান (Institute of Culture)-এর উদ্যোগে 'কৃষ্টি ও মানবতা' পর্যায়ে একটি বক্তৃতাসূচী ঘোষিত হইয়াছে। ১৯শে নভেম্বর শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বিষয়টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন: বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন কৃষ্টি-সম্বন্ধে তুলনামূলক জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। অন্তরের দিক হইতে ভারত চিরদিন একটা একত্বের সাধক, বাহিরের দিক হইতে বিজ্ঞান-সহায়ে পাশ্চাত্য জগৎ একপ্রকার একত্ব স্থাপন করিতেছে। উভয়ের সমন্বয় প্রয়োজন।

প্রত্যেক কৃষ্টির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য জানিবার জন্য, আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময় দ্বারা বিশ্বশান্তির ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য, এ-যুগের প্রকৃত সমস্যা বুঝিয়া তাহার সমাধানের চেষ্টা করিবার জন্য, সর্বশেষ বিভিন্ন জাতি ও কৃষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধির জন্য এই তুলনামূলক অধ্যয়নের ব্যবস্থা।

১৯শে নভেম্বর ('৬২) হইতে ২৯শে এপ্রিল ('৬৩) পর্যন্ত মোট ১২৬টি বক্তৃতায় দেশ-বিদেশের বহু বক্তা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও সভ্যতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন, তন্মধ্যে প্রায় ৫০টি হইবে ভারত-সম্বন্ধে।

প্রতি সপ্তাহে তিন দিন (সোম, বুধ ও শুক্রবার – ছুটির দিন ছাড়া)—সন্ধ্যায় ৬-৩০ হইতে ৮ ৩০ পর্যন্ত ২টি করিয়া বক্তৃতা হইবে। বিশেষ বিবরণ প্রতিষ্ঠানের অফিসে জ্ঞাতব্য।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যানফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি) ঃ নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১ টার সময় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ এবং বুধবার রাত্রি ৮ টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বক্তৃতা দেন।

জুন, '৬২ : মানুষের কি দুইটি আত্মা? আমাদের অহংকার এবং ইহা যে সমস্যা সৃষ্টি করে; ঈশ্বর এবং অন্তরের নিরাপত্তা; ভগবান বুদ্ধের মন ও হৃদয়; মানুষ কিরূপে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়? সত্য জানো, সত্যই তোমাকে মুক্ত করিবে; যোগ এবং অন্তরের শান্তি।

জুলাই : মানুষই বিদ্রোহী; স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের ভবিষ্যৎ; অদৃশ্যকে দর্শন; 'অতএব, হে অজ্ঞ, ঈশ্বরের উপাসনা কর'; মনই প্রতিবন্ধক; কুণ্ডলিনীযোগ কি?

অগস্ট-সেপ্টেম্বর : স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম; 'ঈশ্বরকে খুঁজিও না, তাঁহাকে দর্শন কর'; আত্মা: ইহার স্বরূপ,

উৎপত্তি ও অবসান; ঈশ্বর আছেন, তার প্রমাণ; পবিত্র জীবন যাপন করিবার উপায়; নিদ্রা, মৃত্যু ও ধ্যান।

অক্টোবর: অবচেতন, চেতন ও অধিচেতন মন; মন, আত্মা ও অনন্তকাল; নূতন মন্দিরের স্মৃতি-বার্ষিকী; শ্রীকৃষ্ণের বাণী; সক্রিয় ধর্ম; আভ্যন্তরীণ বৃত্তির উন্নতিসাধন; চিন্তা ও ভয় হইতে কিরূপে মুক্ত হওয়া যায়? দয়ালু ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বরের উপাসনা; উপাসনা: তাত্ত্বিক ও আনুষ্ঠানিক।

পুরাতন মন্দিরে প্রতি রবিবার রাত্রি ৮টায় ধ্যান ও কঠোপনিষদের ক্লাস করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। নূতন মন্দিরে প্রতিদিন পূজা হয়; বেদীর সম্মুখের হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান ধারণা করিতে পারেন।

স্বামী পুরুষাত্মানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২১শে ডিসেম্বর ভোর ৪-৩৫ মিঃ সময়ে স্বামী পুরুষাত্মানন্দ (জ্ঞানেন্দ্র মহারাজ) কলিকাতা কার্নানি হাসপাতালে ৬৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অনেক দিন হইতেই তিনি অসুস্থ ছিলেন, গত জুলাই মাসে তাঁহাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত সন্তান ছিলেন, ১৯২০ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। হবিগঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রমের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৩৭ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের নিকট তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। ১৯৩৯ খৃঃ হইতে তিনি শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন।

তাঁহার দেহত্যাগের ঘটনা উদ্দীপনাপূর্ণ। যদিও তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু দেহত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্বে হঠাৎ উঠিয়া শয্যার উপর বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য নাম উচ্চারণ করিতে থাকেন। কিছু পরেই বলেন, 'ও মা, তুমি এসেছ, একটু অপেক্ষা কর, আমি যাচ্ছি।' এই কথা বলিয়া তিনি নিকটের রোগীদিগকে বলেন, 'ভাই, তোমরা কি জেগে আছ? আমার সময় হয়েছে, আমি যাচ্ছি।' ইহার পর তিনি শুইয়া পড়েন আর ওঠেন নাই। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১২ই ফাল্গুন (২৫. ২. ৬৩) সোমবার শুভ শুক্লা-দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও অন্যত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা পাঠ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার (৩.৩ ৬৩) এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে।

বিবিধ সংবাদ

শিবানন্দ-জন্মোৎসব

বারাসত : গত ২২শে হইতে ২৫শে ডিসেম্বর স্বামী শিবানন্দের ১০৭তম জন্মোৎসব তাঁহার জন্মস্থান বারাসতের রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে পূজার্চনা, চণ্ডী, শিবমহিম্নঃস্তোত্র, শিবানন্দ-বাণী ও পত্রাবলী, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও পুঁথি পাঠ, ধর্মসভায় বক্তৃতা, রামনাম-সংকীর্তন, রামায়ণগান, ভজন ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। ধর্মসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দের পৌরোহিত্যে শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, শ্রীআশু দে, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত মহাপুরুষ মহারাজের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। উৎসবের শেষ দিবস কয়েক সহস্র নরনারীর এক বিরাট শোভাযাত্রা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও শিবানন্দের সুসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ ভজন-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করে। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্রবৃন্দ, স্বামী দেবানন্দ, স্বামী সুধানন্দ, শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন।

সন্ন্যাস-সঙ্কল্প-স্মরণোৎসব

আঁটপুর : শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলা-সহচর স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজ) পুণ্য জন্মস্থান হুগলি জেলার অন্তঃপাতী আঁটপুর গ্রাম। এই গ্রামে বাবুরাম মহারাজের জননীর আহ্বানে ১৮৮৬ খৃঃ নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ৮ জন গুরুভ্রাতা গমন করেন, ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রে খৃষ্টজীবন আলোচনা করিতে করিতে তাঁহারা সংসার-ত্যাগের পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তাহারই স্মরণার্থে প্রতি বৎসরের ন্যায় গত ২৪শে ডিসেম্বর বহু ভক্তের সমাবেশে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সংকীর্তন-সহ তীর্থ-পরিক্রমা, পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, ভজন, সভা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামী জীবানন্দ প্রজ্বলিত ধুনির সম্মুখে আলোচনা করেন।

বিজ্ঞান-বার্তা

পেনিসিলিন যে-সব রোগীর দেহে কার্যকরী হয় না, তাদের ক্ষেত্রে অক্সেসিলিন নামে একটি নতুন অ্যান্টিবায়োটিক ভেষজ প্রয়োগ ক'রে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। এই ওষুধ পরীক্ষা-মূলকভাবে প্রয়োগ ক'রে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত দুটি রোগী, মস্তিষ্ক ও ঘাড়ে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত পাঁচটি রোগী এবং আগুনে পোড়া তিনটি রোগীকে সারিয়ে তোলা হয়েছে। এই কৃত্রিম পেনিসিলিন বা অক্সেসিলিন মেথিসিলিনের তুলনায় পাঁচ থেকে আটগুণ বেশী শক্তিশালী। এই ওষুধ খেতে হয় আর এতে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সামান্যই। এই সংবাদ পাওয়া গেছে সিয়াটেল-স্থিত ওয়াশিংটন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের চিকিৎসকদের কাছ থেকে। তাঁদের মতে অক্সেসিলিনের আবিষ্কার চিকিৎসা-ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতির সূচনা ক'রল। —সঙ্কলিত

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন

'ব্রিটিশ গ্লুজ অ্যাণ্ড কেমিক্যালস্'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী আই. এইচ. চায়েন বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সব্জি ও গাছ-গাছড়া হইতে উদ্ভিজ্জ (কৃত্রিম) প্রোটিন উৎপাদন করিতে পারিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, এই উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করিবে। ইহার ফলে মাত্র এক পেনিতে একজন লোকের এক দিনের প্রয়ো-জনীয় প্রোটিন জোগান দেওয়া সম্ভব হইবে।

তিনি আরও জানান যে,—ইতালি, ব্রাজিল, পর্তুগাল, নাইজিরিয়া, ঘানা, অষ্ট্রেলিয়া. ভেনি-জুয়েলা, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায়—এই উদ্ভিজ্জ প্রোটিন সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হইয়াছে। —রয়টার



'রামকৃষ্ণায় তে নমঃ'

স্থাপকায় চ ধর্মস্য
সর্বধর্ম-স্বরূপিণে।
অবতার-বরিষ্ঠায়
রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

[স্বামী বিবেকানন্দ-কৃত প্রণাম-মন্ত্র]

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে গ্রথিত এই একটি শ্লোকে। এই প্রণাম-মন্ত্রটি রচিত হইয়াছিল ১৮৯৮ খৃঃ জানুআরি মাসে মাঘী পূর্ণিমা দিবসে—ভক্তগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজা প্রতিষ্ঠা-কালে। শ্লোকটি তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই একটি শ্লোকের মাধ্যমে স্বামীজী স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহার গুরুদেবকে তিনি কি চোখে দেখিতেন।

গীতামুখে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যখন ধর্মের গ্লানি হয়, তিনি ধর্মস্থাপন করিতে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের মতো একজন 'ধর্মস্থাপক'।

পৃথিবীতে ধর্মগ্লানি বহুবার হইয়াছে। বারংবার ঈশ্বর-ভাব অবতীর্ণ হইয়া স্থান-কালের প্রয়োজন অনুসারে ধর্ম স্থাপন করিয়া যান; মানুষ না বুঝিয়া ঐ ধর্মগুলির বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান লইয়া বিরোধ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে দেখা যায়, তিনি সব ধর্মের সাধনা করিয়া প্রত্যেকটিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, প্রত্যেকটি ধর্মের স্বরূপ হইয়াছেন।

যিনি সর্ব ধর্মের স্বরূপ, তিনি অবশ্যই সর্ব ধর্মভাবের সমষ্টি; এক একটি ধর্মভাব প্রতিষ্ঠা করিয়া যান এক একজন অবতার-প্রতিম পুরুষ। তাঁহারা সেই সেই ধর্মের স্বরূপ। সর্ব ধর্মের স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ সকল অবতারের সমষ্টি, অতএব অবতার-শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে প্রণাম।

'বাউলের দল এসেছিল—'

'বাংলা দেশের হৃদয়ে একটি বাউল লুকাইয়া আছে'—মাঝে মাঝে সে আত্মপ্রকাশ করে—কখন সাধকরূপে, কখন কবিরূপে—কখন বা নররূপধারী ঈশ্বরের অবতার-রূপে।

কোথায় কখন এই ভাবের উৎপত্তি, তাহা আজ নির্ণয় করা দুরূহ, তবে মনে হয়, উপনিষদের ভাষায় ইহার আভাস পাওয়া যায়, ইতিহাসের দিক দিয়া অবশ্য বৌদ্ধ সাধনার শেষে চর্যাপদের 'সনঝা' বা সন্ধ্যা-ভাষাতেই বাউলভাব ধরা পড়ে।

একদল মানুষ—তারা না সমাজের, না সংসারের, না প্রচলিত কোন ধর্মের—অথচ মানুষের হৃদয়ের গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটিত করাই যেন তাহাদের জীবনব্রত। তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া গান গাহিয়া দেশে দেশান্তরে অধরাকে ধরিবার, অজানাকে জানিবার প্রেরণা জোগাইয়া যায়—মানুষের 'সুখে'র সংসারে আধ্যাত্মিক অশান্তির অতৃপ্তির আগুন জ্বালাইয়া যায়। তাহাদের ভাব ও ভাষা সাধারণ মানুষ বোঝে না, অথচ বোঝে; ভাষার মধ্যে কি যেন ইঙ্গিত আছে, যাহা মানুষের মনকে ঘর-সংসার হইতে টানিয়া পথে বাহির করে; মাটি হইতে টানিয়া দৃষ্টিকে উর্ধ্বমুখী করে—বাহির হইতে অন্তর্মুখী করে। দেহতত্ত্বের গানে গানে—এই বিদেহভাবই ছড়াইয়া আছে, যাহা মানুষের মনকে আগাইয়া লইয়া চলে সীমা হইতে অসীমে, রূপ হইতে অরূপে।

এইরূপ এক বাউল আসিয়াছিলেন নবদ্বীপে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে। যখন বাউলভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িল, কোথায় গেল তাঁহার ষড়্‌দর্শনের পাণ্ডিত্য, কোথায় পড়িয়া রহিল জননীর স্নেহ, নববধূর ভালবাসা? কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়া ভগবৎপ্রেম বিতরণ করিতে করিতে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইলেন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে।

শেষ দৃশ্যটি বড় করুণ! অতি অন্তরঙ্গ এক ভক্ত কোন তীর্থযাত্রীর হাতে নীলাচলে এক পত্র পাঠাইয়াছেন:

বাউলে কহিও—কহিছে বাউল,
এ হাটে আর বিকায় না চাউল!

এ সংসারের হাটে মানুষের প্রকৃত খাদ্য—ভগবৎপ্রেম আর বিকায় না। এ হাটে ভেজালেরই কারবার! অতএব আর কি হইবে? শোনা যায়, ইহারই কিছুদিন পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলাসম্বরণ করেন।

কিন্তু তাই বলিয়া কি বাউলের আসা-যাওয়া শেষ হইয়াছে? বাউলের দল আবার আসিয়াছে নানারূপে, নানাভাবে আসিয়াছে, নানা দেশে নানা ভাষায় কথা কহিতেছে। কেহ তাহাদের বুঝিয়াছে, কেহ তাহাদের বোঝে নাই, তাহাতে কি? বাউলের দল তাহাদের কাজ করিয়া চলিবে—বসন্তের বায়ু যেমন বহিয়া যায়, গাছে গাছে ফুল ফুটিয়া উঠে, ডালে ডালে পাখি ডাকিয়া উঠে। বন সুগন্ধে আমোদিত হয়, সুস্বরে মুখরিত হয়।

বাউলের এবারও আগমন ব্রাহ্মণের কুটিরে, তবে এবার পাণ্ডিত্য নাই, আছে সরল ব্যাকুলতা, সহজ 'মানুষ'-ভাব—যাহা বাউলের নিজস্ব ভাব!

বাল্যকাল হইতেই গ্রামের বাউলদের নিকট শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার কত গান মুখস্থ—

'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন···'

ডুব না দিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সে যে 'আলেখে আসে আলেখে যায়'···

সেই 'মানুষ' অলক্ষ্যে আসে যায়; ধরা দেয়

না, ছোঁয়া দেয়; অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, আবার অব্যক্ত হইয়া যায়! নানা ভাবে নানা সাধনার মধ্য দিয়া সেই এক পরমসত্তাকে উপলব্ধি করিয়া বিবদমান বিশ্ববাসীকে শ্রীরামকৃষ্ণ জানাইলেন: সব ধর্ম সত্য; যত মত তত পথ! মত পথ লইয়া ঝগড়া করিও না, বস্তু আস্বাদন কর।

তিনি যে সকল ভাবে সাধনা করিয়া জানিয়াছেন—সব ধর্মই সত্য, সব পথেই তাঁর কাছে যাওয়া যায়, এই জীবনেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। শাক্ততন্ত্র-মতে সিদ্ধ সাধক 'কৌল', বেদান্তদর্শন-মতে সিদ্ধ সাধক 'পরমহংস'—বৈষ্ণব ভাবের সিদ্ধ সাধক 'বাউল'রূপেই পরিচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সকল মতের সকল পথের সাধক ও সিদ্ধপুরুষ বিভিন্ন সময়ে সমাগত হইয়াছেন ও তাঁহাকে তাহাদের নিজের বলিয়া বোধ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন মত বা পথকে নিন্দা করেন নাই; তবে বলিয়াছেন, সব পথ সকলের জন্য নয়। একটি পথ ধরিয়া চলিলে, সরল ব্যাকুলভাবে সাধনা করিলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

পরবর্তী কালেও তাঁহার কাছে বিভিন্ন ভাবের সাধকগণ আসিয়াছেন, তাঁহারাও মনে করিতেন, 'ইনি আমাদের'। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ নানা ফুলের সাজি; নানা ভাবের সমারোহ সেখানে। সকল ভাবের মূল ভাব সহজ সুন্দর 'মানুষ'-ভাব, এ মানুষ কিন্তু আর এক মানুষ—প্রকৃত মানুষ, পরিপূর্ণ মানব—যেখানে চৈতন্য-শক্তির স্ফুরণ হইতেছে; তাই তো বাউলের ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন: 'মান হুঁস তো মানুষ'—যাহার চৈতন্য জাগ্রত হইয়াছে, সেই মানুষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচরগণ এই 'মানুষ', যাঁহাদের চৈতন্য জাগ্রত, যাঁহারা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন, যাঁহারা সাধারণ মানুষকে এ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সংসারের মানুষ ইঁহাদের দেখিয়া বিস্মিত হয়—ভাবে, এ কি! —এ জ্যোতি তো পৃথিবীর নয়, সূর্য-চন্দ্রেরও নয়—এ আলো অন্তর্জ্যোতি, সকল আলোর উৎস।

পৃথিবী তাঁহাদের দেখিয়া আশ্চর্য হয়, মুগ্ধ হয়, প্রণাম করে, স্তব রচনা করে। কিন্তু তাঁহারা কিভাবে নিজেদের দেখেন এবং কি ভাব লইয়া এ পৃথিবী হইতে চলিয়া যান? তাহার একটি করুণ কাহিনী পূর্বেই বলা হইয়াছে, 'এ হাটে বিকায় না চাউল!' আর একটি করুণ দৃশ্য ধরা পড়িয়াছিল কাশীপুর উদ্যানবাটিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গদের নিকট স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া বলিতেছেন, 'বাউলের দল এসেছিল, নেচে গেয়ে তারা চলে গেল—কেউ চিনতে তাদের পারল না।—'

পল্লীগ্রামে দেখা যায়, পূজাপ্রাঙ্গণে কোলাহল থামিলে হঠাৎ একদল বাউল—একতারা বাজাইয়া, পায়ে নুপুর বাঁধিয়া মনের আনন্দে ঘুরিয়া ফিরিয়া অপূর্ব সব ভাবের গান গাহিয়া চলিয়া গেল—কিছু চাহিল না, কাহারও সহিত কোন কথা বলিল না।

বাউলের দল চলিয়াছে দেশ হইতে দেশান্তরে, যুগ হইতে যুগান্তরে, কে তাহাদের শুনিল, কে শুনিল না, কে তাহাদের বুঝিল, কে বুঝিল না—তাহারা তাহার হিসাব রাখে না—গান গাওয়াতেই তাহাদের আনন্দ, এই আনন্দের স্রোতেই তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছে! আবার কোথায় কোন ঘাটে উঠিবে!

শ্রীরামকৃষ্ণই বলিয়াছেন: এ ঘাটে ডুব দিয়ে ও ঘাটে উঠে কৃষ্ণ—আবার সে ঘাটে ডুব দিয়ে আর এক ঘাটে আর এক রূপ! ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও বলিয়াছেন: 'দেড়-শ বছর পরে আবার শরীর হবে—বাউল বেশ!' কবে কোথায় সেই প্রকাশ? অধীর আগ্রহে মানুষ প্রতীক্ষা করিবে।

ভারতের রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতা

২০শে জানুআরি, ১৯৬৩ খৃঃ রবিবার কালকাতা দেশপ্রিয় পার্কে এক জনসভায় ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিক উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। সভায় প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে প্রদত্ত ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের ভাষণের অনুবাদ:

আমি আজ অপরাহ্নে এখানে উপস্থিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন করিয়া অতীব আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই কলিকাতা নগরীতে শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক সাধনায় শক্তিসম্পন্ন বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি এই দেশের আত্মার মূর্ত বিগ্রহ। তিনি দেশের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা এবং পরিপূর্ণতার প্রতীক। ভক্তের গানে, ঋষিদের দর্শনে, জনসাধারণের প্রার্থনায় সেই আধ্যাত্মিক ভাবেরই অভিব্যক্তি। তিনি ভারতের শাশ্বত ভাবকে ব্যক্ত করিয়াছেন—ভাষা দিয়াছেন।

তিনি যে মহত্ত্ব অর্জন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াই আমাদের মধ্যে অনেকে সন্তুষ্ট। কিন্তু কি উপায়ে তিনি সেই মহত্ত্ব অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে যে সকল কঠিন বাধার সম্মুখীন হইয়া ঐগুলি জয় করিতে হইয়াছিল, যে সকল সাধনা তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল, কি উপায়ে তিনি তাঁহার অদম্য প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করিয়া দিব্য উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, এই সকল কাহিনী অধিকতর চিত্তাকর্ষক। তীর্থযাত্রী, পর্যটক বা আধ্যাত্মিক জীবনে কোনপ্রকার শিক্ষা-গ্রহণে ইচ্ছুক কর্মীর পক্ষেও ঐগুলি প্রয়োজন।

তিনি এই শহরে জন্মগ্রহণ করিয়া এখানকারই স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করেন, তাঁহার সময়কার জনপ্রিয়—জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, ডেভিড হিউমের রচনাবলী অধ্যয়ন করেন। মনোরাজ্যে অশান্তির আলোড়ন উপস্থিত হইলে তিনি সত্যের পথ আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় এখানে ওখানে যাতায়াত করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিক্ষুব্ধ চিত্তে এদিকে ওদিকে ঘুরিতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাব, তাঁহার বিশ্বাসের আন্তরিকতা, প্রগাঢ় ভগবৎপ্রেম স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে ও কর্মে অসাধারণ পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। যখন তিনি দার্শনিক ও তার্কিকদের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত, সত্যপথের সন্ধান দিতে সমর্থ বলিয়া যে সকল সমাজ প্রচার করিত, যখন তিনি সেগুলিতে যোগ দিতেছেন, সেই সময় তিনি তাঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' উত্তর পাইলেন, 'হাঁ, আমি তাঁকে দেখেছি, যেমন তোকে দেখছি, শুধু আরও স্পষ্ট এবং গভীরভাবে।' তিনি যুক্তিতর্ক অবতারণা করিলেন না, অনুমানের উপর নির্ভর করিলেন না, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, তিনি নিজ জীবনে ঈশ্বরের সত্তা প্রাণের প্রতি স্পন্দনে অনুভব করিয়াছেন এবং সারা জীবন প্রায় সর্বক্ষণ ঈশ্বরের মুখোমুখি হইয়া রহিয়াছেন। ইহা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধন করিল।

আমাদের দেশের প্রচলিত ধারণা—ধর্ম যুক্তি বা জল্পনা মাত্র নহে। 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'—বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বা বহু গ্রন্থ অধ্যয়নে নহে, সেই পরমাত্মাকে মুখোমুখি দেখিতে

হইবে। ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন: 'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।' পশ্যন্তি—তাঁহারা সর্বদা ভগবানের সর্বোচ্চ ধাম দর্শন করেন। উপনিষদ্‌ও বলেন, 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' এই পৃথিবীর চাকচিক্যে বা ইহার অন্ধকারে ভুলিও না, ইহার পরপারে আছেন পরম দেবতা। তিনিই শ্রেষ্ঠ। ইহা অনুভূতি, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার বিষয়। ইহাই ভারতের শিক্ষা। ভারত কখনও মতবাদ ও তত্ত্ব প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল নহে। এইগুলি সর্বোচ্চ সত্য উপলব্ধির সহায়ক মাত্র। ইহা সত্য যে, আমাদের সকলের মধ্যেই সেই দিব্যভাব আছে; কিন্তু সেই ঐশ্বর্য আবৃত। বহু অস্বচ্ছ আবরণ ইহার অভিব্যক্তি ও প্রকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রকাশ করিতে হইলে বহু কঠোরতা, ধ্যান ও সাধনা প্রয়োজন। সুতরাং ইহার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। শুধু পুস্তকপাঠে ধর্ম অর্জন করা যায় না। অপরিসীম বাধার মধ্য দিয়া স্বীয় সমগ্র প্রকৃতিকে ব্যয়িত করিয়া নিজেকে রূপান্তরিত করিলে তবেই ধর্ম লাভ করা সম্ভব। বিবেকানন্দ ঐরূপ সাধনা করিয়া জগতের রহস্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

যখন আমরা জানিতে পারি যে, চরম সত্য অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বিষয়, তখন উহা লাভের জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করি না। সেগুলি গৌণ, উপায়-স্বরূপ। শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় ১৮৯৩ খৃঃ তিনি যে মহাবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা এই: সকল দেবতার উপর এক পরম-দেবতা আছেন, সকল ধর্মের উপর এক ধর্ম আছে, এমন কিছু আছে, যাহা আমাদের ধর্মের সর্ববিধ বাহ্য ধর্মাচার ও অনুষ্ঠান, অন্ধবিশ্বাস ও মতবাদ প্রভৃতির ঊর্ধ্বে এবং উহাই সেই ধর্ম, যে ভিত্তির উপর সমস্ত পৃথিবী—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলিত হইতে পারে।

সেখানে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তিনি ভগবদ্‌গীতার সেই বিখ্যাত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন:

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

—মানুষ যেভাবে আমার দিকে অগ্রসর হয়, আমিও তাহাকে সেইভাবে গ্রহণ করি। সকল মানুষই আমাকে খুঁজিতেছে, আমাকে পাইতে চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং তাহারা কোন্ পথে বা উপায়ে বা কি নামে আমাকে ডাকে, সেগুলির পার্থক্য আমি ধরি না। পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্য তাহাদের অনুসন্ধিৎসা, আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং কি প্রকার কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের পথে তাহারা অগ্রসর হইতেছে, তাহা আমি জানি। সুতরাং কোন্ পথে তাহারা আমাকে লাভ করে, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

এই কথাই তিনি বলিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম-মহাসভায় ভারতের শাশ্বত বাণী, বিশ্বজনীন ধর্মের বাণী, সকল দেবতার উপর এক পরমেশ্বরের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদ বলেন, 'দেবনাম্ আদিদেব একঃ'—ঐ শ্রুতিই বলেন, সেই এক পরম সত্যকে মানুষেরা বহুভাবে বর্ণনা করিয়াছে। অতএব আমাদের সহনশীল হইতে হইবে—পারস্পরিক বোঝাপড়া করা একান্ত আবশ্যক। যখন আমাদের দেশ ধর্মমতের বাদানুবাদে নিমগ্ন, যখন বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ধার্মিক ব্যক্তিগণ একে অন্যের সাথে কলহে প্রবৃত্ত, যখন দেশের লোক বহু

সম্প্রদায়ে বিভক্ত, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বর্জন-নীতিতে সকলে মগ্ন, তখন তিনি দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলেন: তোমরা সকলেই নির্বোধ, তোমরা জান না, পরম সত্য কি। এই সকল পূর্বার্জিত কুসংস্কার এবং মোহাচ্ছন্ন পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, এই বিশ্বজনীন পরমেশ্বর সকল ধর্মেরই নিজস্ব, সকল ধর্মেই তাঁহাকে লাভ করা যায় এবং সকলেই সেই শাশ্বত পরমাত্মার পথ অন্বেষণ করিতেছে। বুদ্ধের মতো স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও একটা সময় আসিয়াছিল, যখন তিনি ভাবিয়াছিলেন, অন্তরের আনন্দে তিনি নিমজ্জিত হইবেন, ধ্যান ও সমাধির আনন্দে মগ্ন থাকিবেন, এই সংসারে আর ফিরিবেন না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, 'ধিক্ তোকে! কেন তুই নিজের মুক্তির জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিস্?' 'শিবমাত্মনি পশ্যন্তি'—পরমাত্মা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছেন। ইহাদের সকলকেই পরমাত্মার বিগ্রহ মনে করিতে হইবে।

আমাদের বুঝিতে হইবে, তাঁহাকে যে 'নরেন্দ্রনাথ' নাম দেওয়া হইয়াছিল, উহা আকস্মিক নহে, তিনি সকল মানুষের—'নরে'র বিগ্রহ ছিলেন। 'নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে।' নর-সখাই নারায়ণ। তিনি সকল মানুষের যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি চাহিতেন, প্রত্যেকটি মানুষ সুন্দর জীবন যাপন করুক। বেশীর ভাগই আমরা জীবিত আছি বটে, কিন্তু বাঁচার মতো বাঁচিয়া নাই। আমরা প্রত্যেকে যেন শক্তি, সৌন্দর্য, ক্ষমতা ও সম্ভ্রম অর্জন করিতে পারি এবং সত্যিকারের একটি মানুষ হইতে পারি, ইহাই তিনি চাহিয়াছিলেন। আমরা তাহা নই। তিনি আমাদের দেশের দুর্দশা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। লক্ষ লক্ষ লোককে দারিদ্র্য এবং অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন: আমি দরিদ্র-নারায়ণের পূজারী, এই পৃথিবীর দরিদ্র জনগণের মধ্যে যে নারায়ণ আছেন, আমি তাঁহারই পূজারী। যতদিন তাহারা এই অবস্থায় থাকিবে, ততদিন আমি আমার নিজের মুক্তি বা শান্তি লইয়া কিভাবে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি? ইহাদের সকলের সেবা করাই আমার কর্তব্য। ঈশ্বরের নিকট যাইবার সর্বোৎকৃষ্ট পথ মানুষের সেবা।

তিনি স্বদেশপ্রেমরূপ ধর্মের কথা বারংবার বলিয়াছেন। সঙ্কীর্ণ স্বদেশপ্রেম নহে, মানব-ধর্মরূপে স্বদেশপ্রেম। তাঁহার ধর্ম আমাদিগকে শিক্ষা দেয় সকল মানুষকেই আত্মীয় জ্ঞান করিতে এবং এক পরিবারভুক্ত ভাবিতে। এইরূপ ধর্মই তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং অবলম্বনও করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'ইহা একটি মানুষ তৈরি করিবার ধর্ম' —ইহা একটি মানবভাবের ধর্ম। ধ্যাননিষ্ঠ জীবনের সহিত সমাজ-সেবার কোন বিরোধ নাই। দুইটি একই ভাবের অভিব্যক্তি। যদি আমরা পরমাত্মাকে লাভ করিয়া থাকি এবং ঈশ্বরের সত্তা আমাদের মনে ও চিন্তায় অনুভব করিয়া থাকি, তাহা হইলে পৃথিবীতে যাহারা দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহাদের উদ্ধার-কল্পে অগ্রসর হওয়া আমাদের কর্তব্য। কষ্ট বরণ করিবার এ আহ্বান অবহিতচিত্তে আমাদের শুনিতে হইবে। তাই তিনি বলিয়াছিলেন: আমি কষ্ট ভোগ করিতেছি। যখন আমি আমার দেশের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করি, যখন দেখি লক্ষ লক্ষ দরিদ্র খাদ্য ও ভরণপোষণের অভাবে মশামাছির মতো মরিতেছে, আমি তখন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করি। ভগবান পর্যন্ত করুণায় বিগলিত হন; 'ভগবান্ অনুক্রোশমনুভবতি'—ভগবান করুণা

বা কৃপা অনুভব করেন, যখন তিনি দেখেন যে মানবগণ নিজেদের অন্তর্নিহিত ঐশ্বরিক স্ফুলিঙ্গ বহ্নিশিখায় পরিণত করিতে—ঐশ্বর্য বিকশিত করিতে অসমর্থ। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। আমরা এখানে আমাদের পূর্ণতা বিকাশের জন্য আসিয়াছি; ঐ পূর্ণতা অর্জন—ধনসঞ্চয়, নাম যশ অথবা সম্পত্তি প্রভৃতির মধ্যে নাই। ইহা আছে নিজের পূর্ণতা-লাভের মধ্যে—অন্তরে যে ভগবান বাস করেন, নিজেকে তাঁহার প্রতীক বা প্রতিচ্ছবিতে পরিণত করার মধ্যে।

যখন আমরা তরুণ ছিলাম, তখন ঐ প্রকার মানবতা ও মানুষ তৈরি করার ধর্মই আমাদিগকে সাহস দিত। আমি যখন প্রবেশিকা বা ঐরূপ কোন শ্রেণীর ছাত্র, শ্রীবিবেকানন্দের পত্রাবলী হাতে লিখিয়া আমাদের মধ্যে প্রচার করা হইত। যে শিহরণ আমরা উপভোগ করিতাম, ঐ লেখাগুলিতে আমরা যে যাদুস্পর্শ অনুভব করিতাম, সর্বদিক হইতে নিন্দিত আমাদের কৃষ্টির উপর যেরূপ আস্থা ফিরিয়া পাইতাম—এই শতাব্দীর প্রথম দিকে তরুণদের মধ্যে তাঁহার রচনা এই প্রকার রূপান্তর সাধন করিত। মাদ্রাজে তো এইরূপ ঘটিয়াছিল। দেশের অন্যান্য প্রদেশেও যে ঐরূপই ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

বর্তমানে আমরা শুধু যে আমাদের দেশের ইতিহাসের এক সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে উপনীত হইয়াছি তাহা নহে, পৃথিবীর ইতিহাসেও ইহা এক সঙ্কটকাল। বহুলোক মনে করেন, আমরা অতলস্পর্শ গহ্বরের ধারে দাঁড়াইয়া আছি। চতুর্দিকে শ্রদ্ধার বিকৃতি, মানের অবনতি, ব্যাপক পলায়নী মনোবৃত্তি, প্রভূত তীব্র গণ-উত্তেজনা এবং লোকে এই সকল চিন্তা করিয়া হতাশা নৈরাশ্য ও ব্যর্থতায় ভাঙিয়া পড়ে। শুধু এইগুলির পথই আজ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত। মানবাত্মার উপর ঐরূপ আস্থাহীনতা মানুষের মহত্ত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা মানব প্রকৃতির ইহা অবমাননা। এই পৃথিবীতে যে-সকল মহা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা মানব-চরিত্র দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছে। বিবেকানন্দ যদি আমাদিগকে কোন আহ্বান জানাইয়া থাকেন, তবে তাহা আমাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক সম্পদের উপর নির্ভর করিবার আহ্বান। বলো, মানুষ অফুরন্ত আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী। মানুষের আত্মাই চরম সত্য, মানুষের উপমা নাই।

এই পৃথিবীতে অনিবার্য বলিয়া কিছুই নাই। আমরা কঠিনতম বিপদ এবং চরম অক্ষমতার সম্মুখীন হইয়াও তাহা প্রতিহত করিতে পারি। শুধু এইটুকু চাই, আমরা যেন আশা না হারাই। তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন দুঃখভোগে স্থৈর্য, দুর্দশায় আশা, হতাশায় সাহস। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন: বাহ্য রূপের দ্বারা বিভ্রান্ত হইও না। অন্তরের গভীরে দিব্য এষণা রহিয়াছে, বিশ্বজগতের একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য সহযোগিতা দ্বারা সফল করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ত্যাগ, সাহস, সেবা, নিয়মানুবর্তিতা—তাঁহার জীবন হইতে আমরা এই সকল নীতি শিক্ষা করিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে এক সময়ে নেতৃত্বের জন্য চিহ্নিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দকেই শেষ কয়েকটি কথা বলিয়া যান: 'এই সব ছেলেদের দেখিস'। অনেকে তাঁহার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন; কিন্তু দৈব আদেশ তাঁহারই উপর ছিল। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন, যাহার কেন্দ্র ভারতে এবং বিদেশেও ব্যাপ্ত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক আলোক-দানে এবং সমাজ-সেবার কর্মে উক্ত মিশন যে প্রশংসনীয় কার্য

করিতেছে, তাহা আমি জানি। উক্ত মিশনের জন্য আমরা তাঁহার দূরদৃষ্টির নিকট ঋণী ; উহা আমরা পাইয়াছি, এবং আমার সন্দেহ নাই—যে বর্তমানে স্থূল ও তুচ্ছ জড়বাদে জড়িত বিশাল সমাজের জন্য সুদূর ভবিষ্যতেও ইহা আধ্যাত্মিক সাহায্য এবং শারীরিক পুষ্টিসাধন করিতে থাকিবে।

সুতরাং এই মহান্ আত্মা কিসের প্রতীক এবং তিনি কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ রাখা আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ইহা শুধু শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে স্মরণ করার প্রশ্ন নয়, পরন্তু বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে—তিনি আমাদের কাছে কি আশা করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া জীবনে রূপায়িত করিতে হইবে, যাহাতে আমরা যে দেশে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশের উপযুক্ত নাগরিকে পরিণত হইতে পারি।

পরম পুরুষ

শ্রীজগদিন্দ্র বসু

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আলোর বার্তাবহ
গভীর ভাবের সমাধির মাঝে ডুবে ছিলে অহরহ।
অবতার-রূপে তুমি এসেছিলে যুগসন্ধি-ক্ষণে,
কুসংস্কারের কুয়াসা ছিল না অপাপবিদ্ধ মনে,
মানুষের যত জ্বালা-যন্ত্রণা, দুর্ভোগ বয়ে নিতে
সেবা ও প্রেমের মূর্ত প্রতীক এসেছিলে পৃথিবীতে।
ভাবের রাজ্যে তন্ময় তুমি অনন্ত প্রেমময়
জীবের মধ্যে শিবের অংশ দেখেছিলে চিন্ময়।
ভক্তির পথে সংগ্রাম ক'রে ভক্ত পেয়েছে পথ—
মহামুক্তির দীক্ষা দিয়েছ—জানায়েছ সব মত।
কল্যাণকামী পরমপুরুষ জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি'
তমসাবৃত অজ্ঞানতাকে দিয়েছ জলাঞ্জলি।

সর্বত্যাগী শিষ্যসেবক পৃথিবীর ঘরে ঘরে
তোমার অমৃতবাণীর ভাণ্ড ঢালিছে উজাড় ক'রে।
কামকাঞ্চনে আসক্ত মনে পরম পাথেয় দাও
প্রাণের ভক্তি-পুষ্পগুচ্ছ করপল্লবে নাও।
গভীরের চেয়ে তুমি যে গভীর নিবিড় জ্যোতিষ্মান্,
জীবজগতের মুক্তিসাধক দয়াময় ভগবান্।
বিন্দুর মাঝে তুমি যে সিন্ধু, আঁধারের পথে আলো,
পাপ-পঙ্কিল মনের গহনে প্রজ্ঞা-প্রদীপ জ্বালো।
তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার লীন হয়ে যেতে সাধ ;
প্রেমের ঠাকুর দাও শুধু দাও আলোর আশীর্বাদ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও অদ্বৈতবাদ

স্বামী ধীরেশানন্দ

'নরেন্দ্রের উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। ওর মতো একটিও নাই।'—'অন্যরা যেন দশদল শতদল পদ্ম, কিন্তু নরেন্দ্র সহস্রদল।' — 'অন্যরা কলসী, ঘটি, নরেন্দ্র জালা।' — 'নরেন্দ্র বড় দীঘি, রাঙ্গাচক্ষু রুই, বড় ফুটোওলা বাঁশ। ও আসক্তি—ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়।' — 'এরা নিত্যসিদ্ধের থাক্, সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীব-শিক্ষার জন্য।' — 'নরেন্দ্রের উঁচু ঘর, অখণ্ডের ঘর।'

নিজের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে নরেন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ—ইহা ঘোষণাকরত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রশংসায় শতমুখ। অন্তর্দ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম হইতেই তাই নরেন্দ্রকে অন্যভাবে শিক্ষাদীক্ষাদানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, নরেন্দ্র অদ্বৈতবেদান্তের অতি উত্তম অধিকারী। ধ্যানসিদ্ধ নরেন্দ্রনাথকে তাই তিনি অদ্বৈত-বেদান্তের পুস্তকসমূহ পাঠ করিতে বলিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদ রচয়িতা স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন :

নরেন্দ্রনাথকে উত্তম অধিকারী জানিয়া প্রথম দিন হইতে ঠাকুর তাঁহাকে অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসবান্ করিতে প্রযত্ন করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই তিনি তাঁহাকে অষ্টাবক্র-সংহিতাদি গ্রন্থসকল পাঠ করিতে দিতেন। নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের দ্বৈতভাবে উপাসনায় নিযুক্ত নরেন্দ্রনাথের চক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ তখন নাস্তিক্যদোষদুষ্ট বলিয়া মনে হইত। একটু পাঠ করিবার পরই তিনি স্পষ্ট বলিয়া ফেলিতেন—'ইহাতে আর নাস্তিকতাতে প্রভেদ কি? সৃষ্ট জীব আপনাকে স্রষ্টা বলিয়া ভাবিবে? ইহা অপেক্ষা অধিক পাপ আর কি হইতে পারে? তুমি ঈশ্বর, আমি ঈশ্বর, সকলই ঈশ্বর—ইহা অপেক্ষা অযৌক্তিক কথা অন্য কি হইবে? গ্রন্থকর্তা মুনি ঋষিদের নিশ্চয় মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা এরূপ কথা লিখিবেন কিরূপে?'

ঠাকুর কিন্তু প্রিয় নরেন্দ্রের ঐ কথায় হাসিতেন এবং বলিতেন, 'তা তুই এখন ঐ কথা নাই বা নিলি। তাই ব'লে ঋষিদের নিন্দা করবি কেন? ঈশ্বরীয় স্বরূপের ইতি করিস্ কেন?'

পাকা খেলোয়াড় যেমন প্রথম শিক্ষার্থীর ভ্রমচ্যুতিতে দৃক্‌পাত না করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে পারদর্শী করিয়া তোলেন, ঠাকুরও তেমনি প্রিয় নরেন্দ্রের কথায় হাসিলেন মাত্র ও ধীরে ধীরে তাহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রের মতো তেজস্বী, স্বাধীনচিন্তাশীল, বুদ্ধিমান্ শিষ্যকে তিনি অপর সকলের ন্যায় শীঘ্র বাগ মানাইতে পারেন নাই। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল ধরিয়া গুরু-শিষ্যের যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বিদ্বান্ নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরের এই নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণের চরণকমলে চিরতরে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। সহিস জানে তেজস্বী ঘোড়া বশে আনিতে সময় লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রিয় নরেন্দ্রকে যাহা শিখাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তিনি শিখিয়াছিলেন কি? অষ্টাবক্রসংহিতাদি গ্রন্থে উক্ত বেদান্তের

অদ্বৈতবাদ নরেন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন কি? এবং ঐ অদ্বৈতবাদ তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল কি?—এ-বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশগুলির মধ্যে আমরা অধিকারিবিশেষে প্রদত্ত উহাদের একটা সুস্পষ্ট ক্রম দেখিতে পাই। উত্তম গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন, সকলের জন্য এক ব্যবস্থা কার্যকরী হইতে পারে না। তিনি বলিতেন, 'যার পেটে যা সয়'। তাই উত্তম অধিকারী একমাত্র নরেন্দ্রনাথকেই তিনি অদ্বৈতবাদের উপদেশ দিতেন। অপরের জন্য অন্য ব্যবস্থা। সর্বসাধারণ ভক্তদের জন্য তিনি—**'ভক্তিযোগই যুগধর্ম'। 'ভক্তিপথই সহজ পথ'। 'কলিতে নারদীয়া ভক্তি'** অর্থাৎ ভগবন্নামগুণগান কীর্তন—ইহাই একমাত্র কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং নিজেও তদনুরূপ দ্বৈতভাবমূলক সাধনাদি আচরণকরত সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন।

আর এক শ্রেণীর লোকের জন্য তিনি **বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের** কথা বলিতেন। যথা, —'যেমন একটি বেল। খোলা, বিচি, শাঁস—সব একসঙ্গে ওজন করতে হয়। প্রথম শাঁসটিই সার পদার্থ ব'লে বোধ হয়। তারপর বিচার ক'রে দেখে—যেই বস্তুর শাঁস, সেই বস্তুর খোলা আর বিচি। আগে নেতি নেতি ক'রে যেতে হয়। ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়—যা থেকে ব্রহ্ম ব'লছ, তাই থেকেই জীবজগৎ। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তাই রামানুজ বলতেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম।' —(কথামৃত ১।১৪।৭)

আর এক আছে—যা কিছু দেখছ, সব তিনি হয়েছেন—যেমন বিচি, খোলা, শাঁস তিন জড়িয়ে এক। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। যাঁরই লীলা, তাঁরই নিত্য।'
—(ঐ ৩।২০।৩)

'প্রথমে নেতি নেতি ক'রে হরিই সত্য আর সব মিথ্যা ব'লে বোধ হয়। তারপর সেই ছাখে যে, ঈশ্বরই মায়া, জীব, জগৎ—এই সব হয়েছেন। অনুলোম হয়ে তারপর বিলোম। **এইটি পুরাণের মত**। যেমন একটি বেলের ভিতর শাঁস, বীজ আর খোলা। বেলের ওজন জানতে গেলে কোনটি বাদ দিলে চলবে না।'—(ঐ ৩।৮।১)

'পুরাণমতে ভক্ত একটি, ভগবান্ একটি, ...ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে।' —(ঐ ২।১৩।১)

শ্রীরামকৃষ্ণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে পুরাণের মত বলিয়া সুস্পষ্ট উল্লেখ করিলেন। এ মতটিও বহুলোকের উপযোগী। ত্যাগবৈরাগ্যাদি সাধনসহায়ে জগৎ ও তৎসহচারী যাবতীয় ভোগ্যবস্তুতে একান্ত মিথ্যাত্ববুদ্ধিপূর্বক তাহা ত্যাগকরত ধর্মজীবনে অগ্রসর হওয়া সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, সুতরাং তাঁহারা এইরূপ একটা মতবাদে সান্ত্বনা পাইয়া থাকেন। সবই তিনি, কাজেই সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই—এরূপ জানিয়া তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হইয়া পরম কল্যাণভাগী হন।

পুনঃ আর একজাতীয় অধিকারীর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ **শাক্তাদ্বৈতবাদ** বিধান করিয়াছেন। তাঁহার কথার মধ্যে এই মতের কথাই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 'মাতৃভাব বড় শুদ্ধভাব'। এই মাতৃভাবের উপাসনার বিশেষ প্রচারের জন্যই তাঁহার আগমন। কাম-কলুষিতবুদ্ধি জীবগণের পক্ষে ইহা মহৌষধ। শক্তিবাদবিষয়ে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন:

'জগতে একমাত্র **ব্রহ্মবস্তু** বা **শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণ ভাবই** কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নাই।'—(লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ৩য় অধ্যায়, পৃ:-১১৪)

'জগতে **বিদ্যামায়া** ও **অবিদ্যামায়া** দুই-ই আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত।'—(কথামৃত, ৩।১।৩)

'যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ। যখন নিষ্ক্রিয় ব'লে বোধ হয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। আবার যখন ভাবি, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন, তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি, কালী বলি। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি।'—(ঐ ৩।১।৬)

'জগৎ মিথ্যা কেন হবে? ও-সব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হ'লে তখন বোঝা যায় যে, তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন। আমায় মা দেখিয়ে দিলেন যে, মা-ই সব হয়েছেন। সব চিন্ময়—প্রতিমা চিন্ময়—বেদী চিন্ময়—কোশা-কুশি চিন্ময়—চৌকাঠ চিন্ময়—সব চিন্ময়।' —(ঐ ৪।৩।৩)

'বিদ্যামায়া ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। অবিদ্যামায়া মানুষকে ঈশ্বর থেকে তফাৎ ক'রে লয়ে যায়। বিদ্যার খেলা জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য।'—(ঐ ৩।৭।৩)

'যিনি ব্রহ্ম তিনি কালী, মা, আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি ব'লে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে দুলচে শক্তি বা কালীর উপমা।' —(ঐ ১।১২।৯)

'ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না। মহামায়ার পূজা করে। বলে—মা, পথ ছেড়ে দাও। তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে।'—(ঐ ৪।৩২।১)

শক্তি-উপাসনার মূল সিদ্ধান্ত এই যে, সচ্চিদানন্দময় নির্গুণ ব্রহ্ম ও তাঁহার গুণময়ী মহাশক্তিতে কাল্পনিক ভেদমাত্র, বাস্তব কোন ভেদ নাই। শক্তি যখন ব্রহ্মে অব্যক্তভাবে থাকে, তখন তাহাকে নির্গুণ বলে; পুনঃ শক্তি যখন ব্যক্ত হয়, তখন তাহাকে সগুণ বলে।

'ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥'
—(মহানির্বাণ-তন্ত্র ৪।১৫)

—স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যক্ত, অব্যক্ত, সাকার, নিরাকার—সবই তুমি। তোমায় কে জানিতে সমর্থ?

দ্বৈতপ্রপঞ্চের অবস্থাতে তাঁহার স্ব-স্বরূপের অনুভব করাইতে সহায়তাকারিণী শক্তিকে শাক্তমতে **বিদ্যাশক্তি** বলে এবং স্ব-স্বরূপ বিস্মরণকারিণী শক্তিকে **অবিদ্যাশক্তি** বলে।

'বিদ্যাবিদ্যেতি দেব্যা দ্বে রূপে জানীহি পার্থিব।
একয়া মুচ্যতে জন্তুরন্যয়া বধ্যতে পুনঃ
—(দেবী ভাঃ)

তান্ত্রিকগণ সংসারকে সত্য বলিয়া মানেন, কারণ শিব বা জগদম্বার সক্রিয় রূপটিই সংসার। শিব চেতনের অব্যক্ত রূপ ও শক্তি উহার সক্রিয় রূপ। শাংকর-বেদান্তমতে একই কালে শিবের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় রূপ স্বীকৃত হয় না এবং জগৎও সত্য বলিয়া মানা হয় না। তাঁহারা বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা বা মায়ার নাশ মানেন, কিন্তু তন্ত্রমতে মায়া ও বিদ্যা একই বস্তুর অশুদ্ধ ও শুদ্ধ অংশমাত্র। শুদ্ধ অংশ দ্বারা অশুদ্ধ অংশ সর্বাবস্থার জন্য সম্পুটিত হইলে মোক্ষ হয়। শাংকর-মতে বিদ্যার দ্বারা মায়ার নাশ ও অখণ্ডাকারা বৃত্তি অর্থাৎ ঐ বিদ্যাও তৎক্ষণে স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তন্ত্রমতে শুদ্ধরূপে মায়া নিত্যপ্রকাশসহ অভিন্ন হইয়া বর্তমান থাকে। শাংকর-বেদান্তের ন্যায় মহামায়া

চেতনস্বরূপে আরোপিত বা অধ্যস্ত অর্থাৎ মিথ্যা নহে, কিন্তু উহা নিত্য, অনপায়ী ও স্বভাবভূত। তন্ত্রে পরমাত্মা মাতৃরূপে স্বীকৃত। এই কল্পনার মূল দেবীসূক্ত—(ঋগ্বেদ, ১০।১২৫)। শাক্ততন্ত্রমতে মায়া ব্রহ্মের সমকক্ষা ও সমদেশ-বিশিষ্টা। সমকক্ষা অর্থাৎ সমসত্তাবিশিষ্টা ও সমদেশ অর্থাৎ তুল্য ব্যাপকতাবিশিষ্টা। পারমার্থিক সত্তাবিশিষ্টা মায়া ব্রহ্মসহ অভিন্ন ও তুল্য ব্যাপক। বেদান্তমতের মায়ারহিত শুদ্ধ ব্রহ্ম তন্ত্রমতে নাই। তন্ত্রের ব্রহ্ম সর্বদাই মায়া-শবলিত। শক্তি অন্তর্মুখ হইলেই শিব। শিবই বহির্মুখ হইলে শক্তি। অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ—উভয় ভাবই সনাতন। শাক্তমতে অদ্বৈতবাদসহ ভক্তি ও উপাসনার সমন্বয় সংঘটিত হইয়াছে। মায়ারূপ পরা শক্তি পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। যথা—

'শক্তিশ্চ শক্তিমদ্রূপাৎ ব্যতিরেকং ন বাঞ্ছতি।
তাদাত্ম্যমনয়োর্নিত্যং বহ্নিদাহকয়োরিব ॥'—
(শক্তিদর্শন)

—শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। যেমন বহ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি।

মোক্ষকালেও মায়ার সর্বথা উচ্ছেদ হয় না। উহা নিত্যা। বদ্ধাবস্থাতেই মায়া বহির্মুখী ও মোক্ষাবস্থায় অন্তর্মুখী। ইহাই বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থার পার্থক্য। 'মুক্তাবন্তর্মুখৈব ত্বং ভুবনেশ্বরি তিষ্ঠসি।' —(শক্তিদর্শন)

মায়ানিত্যত্ব-বিষয়ে প্রমাণ :

'মায়া নিত্যা কারণশ্চ সর্বেষাং সর্বদা কিল।'—(দেবী-ভাঃ) 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিঃ।'—(মার্কণ্ডেয় পুরাণ) 'প্রকৃতি-পুরুষশ্চেতি নিত্যৌ।'—(প্রপঞ্চসার-তন্ত্র)

শক্তিবাদ সাংখ্যের দ্বৈতবাদেরও আগে অগ্রসর হইয়াছে এবং উহা বেদান্তের অদ্বৈতবাদে পৌঁছিবার শেষ ধাপ বা সিঁড়ি। ঈশ্বর জগদতীত ও জগৎই ঈশ্বর—এই দুই সিদ্ধান্তের মূলরূপে শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত। শাংকর-বেদান্তও ব্রহ্ম এবং জগতের তাদাত্ম্য মানেন, কিন্তু উহা আধ্যাসিক। ভেদ কাল্পনিক, অভেদই পারমার্থিক সত্য। রামানুজ স্বগতভেদ স্বীকার করিয়া বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ বলেন।

শক্তিবাদী তান্ত্রিকও অদ্বৈতবাদী। ইহা বিলক্ষণ-অদ্বৈতবাদ। ইহাতে প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মভিন্ন জগন্নিদান মায়াও আছে, পরন্তু ঐ মায়া ব্রহ্মের স্বভাবভূতা, অতএব অভিন্না বলিয়া অদ্বৈতের বিরোধী হয় না। ইহাই **শাক্তাদ্বৈতবাদ**। এই মতে একই কালে ব্রহ্ম এক ও অনেক। একত্বপক্ষ লইয়া জ্ঞানদ্বারা পরমমুক্তি হইতে পারে এবং অনেকত্বপক্ষ লইয়া লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সম্ভব হয়। যথা—

'একত্বাংশেন জ্ঞানান্মোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি, নানাত্বাংশেন তু কর্মকাণ্ডাশ্রয়ৌ লৌকিকবৈদিক-ব্যবহারৌ সেৎস্যতঃ' ইতি।

এই সিদ্ধান্ত সেই তান্ত্রিকগণই বলেন, যাঁহাদের মতে ভোগ ও মোক্ষ উভয় প্রাপ্তিই ঈপ্সিত।

শাংকর-মতে সর্ব বিকার অসত্য ও ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য। আচার্য শংকর বলেন, ব্রহ্মের শক্তিও মিথ্যা এবং উহা অবিদ্যাধ্যস্ত নামরূপ হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহে। ভ্রান্তিবশতই লোকে শক্তিকে ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ শক্তি ঈশ্বরের বাস্তব স্বরূপও নহে এবং ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নহে বলিয়া উহা অনির্বচনীয়া অর্থাৎ মিথ্যা।

আচার্য শংকর নির্বিশেষ-অদ্বৈতবাদী হইয়াও মহামায়া, আদিশক্তি, জগজ্জননীরূপে ঈশ্বরোপাসনার বিধান দিয়াছেন। কারণ তাঁহার সর্বব্যাপক অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ব্যাবহারিক

দৃষ্টিতে সর্ব কর্ম, উপাসনা ও ধ্যান সমাধি-আদির যথাযথ স্থান রহিয়াছে।

শাক্তদর্শন যদিও শাংকর-সিদ্ধান্তের ন্যায় অদ্বৈতবাদী তথাপি শাক্তমতের অদ্বৈততত্ত্ব অকর্তা, অভোক্তা, নিগুর্ণ, নির্বিশেষ নহে—উহা শক্তিময় ও বিমর্শরূপ। ক্রিয়াশক্তির নাম বিমর্শ। এই ক্রিয়াশক্তি উহাতে সদা বিদ্যমান। উভয় মতেই প্রপঞ্চ কেবল প্রতীতিমাত্র। কিন্তু বেদান্তমতে এই দ্বৈত-প্রতীতি ভ্রমমূলক এবং শাক্তমতে উহা পরমার্থ-তত্ত্বের সহজ সামর্থ্য। বেদান্তমতে প্রপঞ্চের সাক্ষাৎকারণ অনাদি অনির্বচনীয়া মায়া (প্রপঞ্চ মায়ার পরিণাম ও চেতনের বিবর্ত), আর শাক্তমতে উহা পরমতত্ত্বের স্বাতন্ত্র্যমূলক সংকল্প। উভয় মতেই দৃশ্যের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

উভয় মতের সাধনেরও ভিন্নতা বিদ্যমান। অদ্বৈত বেদান্ত একমাত্র **বিচারকেই** তত্ত্বোপলব্ধির সাধন বলিয়া থাকেন। কারণ, এই মতে পরব্রহ্ম সাধকের নিত্যসিদ্ধস্বরূপ। উহা নিত্যপ্রাপ্ত এবং অবিদ্যাবশতই অপ্রাপ্তের ন্যায় ভ্রম হইয়া থাকে মাত্র। অতএব বিচারপ্রভব সম্যগ্‌জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তি হইলে নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপস্থিতি স্বয়ংই সাধিত হয় এবং এই জন্য গুরুমুখে বেদান্তোক্ত মহাবাক্যার্থ শ্রবণের আবশ্যকতা আছে। কারণ যেস্থলে বস্তু অতি সন্নিহিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ—সম্মুখে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞানবশতঃ অপ্রাপ্তিভ্রম হয়, সেস্থলে সেই বস্তুর পরিচয় কোন আপ্ত পুরুষের কথন বিনা অন্য কোন প্রকারে হইতে পারে না। যে শুদ্ধচিত্ত জিজ্ঞাসুর মল-বিক্ষেপাদি কোন দোষ নাই, গুরুর উপদেশ শ্রবণমাত্রই তাঁহার অপ্রতিবদ্ধ দৃঢ় জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। চিত্তগত মলিনতাবশতঃ যাহার সংশয়-বিপর্যয় দোষ বিদ্যমান, তাহার পক্ষে শ্রবণান্তর মনন ও নিদিধ্যাসন কর্তব্য। উহা পরিপক্ব হইলে অখণ্ডাকারা বৃত্তির উদয়ে সাধকের অপ্রতিবদ্ধ সম্যক্ জ্ঞান হইয়া থাকে। এই প্রকারে অদ্বৈত-বেদান্তমতে মহাবাক্যার্থ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই ব্রহ্মজ্ঞানের মুখ্য সাধন। বিচার অর্থাৎ মননাসমর্থ পুরুষের জন্য যোগাভ্যাস এবং উপাসনাদিরও ব্যবস্থা এই মতে আছে। (পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ দ্রঃ)।

শাক্তমতে কিন্তু বিচার জ্ঞানের সাধন নহে। এই মতে শাস্ত্র ও গুরূপদেশে কেবল পরোক্ষজ্ঞান-মাত্রই হইয়া থাকে এবং উহা দ্বারা মোক্ষ হয় না। মোক্ষপর্যবসায়ী অপরোক্ষ-জ্ঞান পরিপক্ব **সমাধি** দ্বারাই হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, এই সিদ্ধান্তে যদিও ব্রহ্ম নিত্যসিদ্ধ এবং সকলের স্বরূপ, তথাপি উহার তিরোধান অজ্ঞান বা অবিচারজনিত নহে, কিন্তু চৈতন্যের ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রতিভাসিত দৃশ্যবর্গই উহার কারণ। দৃশ্য সত্য, অতএব উহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার সমাধি-ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সুতরাং একমাত্র নির্বিকল্প সমাধিতে স্থিত হইলেই পরমতত্ত্বের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া ষট্‌চক্র-ভেদপূর্বক সহস্রারে মন উঠিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন সাধিত হইয়া থাকে। ইহাই এই মতের বৈশিষ্ট্য।

বেদান্তমতে ষট্‌চক্রের কোন ব্যাপার নাই। শাক্তগণ এই বিষয়ে যোগমার্গের অনুগমন করিয়া থাকেন, **উভয়েই দ্বৈতসত্যত্ববাদী।** কাজেই তাঁহাদের মতে সমাধি ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কোন সাধন নাই। বেদান্তীরাও অনুকূল বিবেচনাকরত এই সাধনাটি অর্থাৎ যোগাভ্যাস বিচারমার্গসহ মিলিত করিয়া লন বটে, কিন্তু

সে-ক্ষেত্রেও বিচারই মুখ্য সাধনরূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন। যোগাভ্যাস চিত্তৈকাগ্র্যের সহায়ক হইয়া থাকে মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :

'জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। দুটি লক্ষণ—প্রথম অনুরাগ। শুধু জ্ঞান বিচার করছি, অনুরাগ নাই, সে মিছে। আর একটি লক্ষণ—কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিতা থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ হ'লে তার ভক্তি প্রেম - এই-সব হয়। এরই নাম **ভক্তিযোগ।** —(কথামৃত ২।১৭।৪)

কুণ্ডলিনী-জাগরণাদি—এই সবই যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের কথা। তন্ত্রে মহাশক্তির উপাসনার পূর্ণ বিকাশ। **উহার অন্তিম পরিণতি বেদান্তের নির্বিশেষ অদ্বয় ব্রহ্মবাদ।**

শক্তিবাদের মূল সিদ্ধান্তগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত বচনসমূহ মিলাইয়া দেখিলেই তাহাদের তাৎপর্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। আচার্য শংকর যেমন শুদ্ধ নির্বিশেষ অদ্বৈতের ভিত্তিতে কর্ম, বিবিধ উপাসনা ও **সর্ব বৈদিক মতবাদের সমন্বয়** করিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণও তদ্রূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদাবলম্বনেই **সর্ব বৈদিক ও অবৈদিক** ধর্মসমূহের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার লিখিয়াছেন :

'ইসলামধর্ম-সাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট, সুগম্ভীর, জ্যোতির্ময় পুরুষ-প্রবরের দিব্য দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। পরে সগুণ বিরাট্ ব্রহ্মের উপলব্ধিপূর্বক **তৃতীয় নির্গুণব্রহ্মে** তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছিল।' —(সাধকভাব)

এইরূপ তাঁহার সর্বধর্ম সাধন বিষয়েই বোদ্ধব্য। তাই তিনি বলিয়াছেন :

'বেদান্ত-বিচারের কাছে রূপ-টুপ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ আমি ভক্ত—এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে ভক্তের 'আমি' অভিমান ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে।' —(কথামৃত ১।৩।৫)

'দেখ, **অষ্টাবক্রসংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে।** আত্মজ্ঞানীরা বলে—সোঽহম্—অর্থাৎ আমি সেই পরমাত্মা। এ-সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীদের মত, সংসারীর পক্ষে এ-মত ঠিক নয়।……' —(কথামৃত ১।৭।১)

'লীলাই শেষ নয়। এ সব ভাবে বিচ্ছেদ আছে। যার বিচ্ছেদ নাই, এমন অবস্থা ক'রে দাও। তাই কতদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—এই ভাবে রইলুম।' —(ঐ ২।২২।৩)

'জ্ঞানী রূপও চায় না, অবতারও চায় না। ……উঃ, আমার কি অবস্থা গেছে! মন অখণ্ডে লয় হয়ে যেত। সব ভক্তি-ভক্ত ত্যাগ করলুম।' —(ঐ ২।২৪।৬)

'মা আমায় জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।'

'বিচারে সংসার মায়াময়—স্বপ্নের মতো, সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, তিন অবস্থারই সাক্ষি-স্বরূপ। স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য।' —(ঐ ১।১৩।৬)

'চাষা জ্ঞানী, তাই দেখছিল, স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা, এক নিত্য বস্তু সেই আত্মা।' —(ঐ)

'ব্রহ্ম আকাশবৎ। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই। ব্রহ্ম তিন গুণের অতীত। নেতি নেতি ক'রে যা বাকি থাকে, আর যেখানে আনন্দ—তাই ব্রহ্ম।' —(ঐ ৩।৫।১)

'যে বলে—আমি নেই. তার পক্ষে জগৎ স্বপ্নবৎ।' — (ঐ ৩।৭।২)

'আমায় তিনি দেখিয়েছিলেন—পরমাত্মা, যাঁকে বেদে শুদ্ধ আত্মা বলে, তিনিই কেবল একমাত্র অটল—সুমেরুবৎ। নির্লিপ্ত—আর সুখদুঃখের অতীত।' —(ঐ ৩।৮।২)

'আমি আর পরব্রহ্ম এক। মায়ার দরুণ জানতে দেয় না।' —(ঐ ৩।১০।২)

'রাম বুঝালেন-লক্ষ্মণ, এ যা কিছু দেখছ, এ-সবও স্বপ্নবৎ অনিত্য—সমুদ্রও অনিত্য—তোমারও রাগও অনিত্য। মিথ্যাকে মিথ্যাদ্বারা বধ করা সেটাও মিথ্যা।'

—(ঐ ৩।১৬।১)

'কি জানো— জীবজগৎ-বাড়ি-ঘরদোর-ছেলেপিলে—এ-সব বাজীকরের ভেল্কি। বাজীকরই সত্য আর সব অনিত্য। এই আছে, এই নাই। জন্ম মৃত্যু—এ-সব ভেল্কির মতো। ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য।'

—(ঐ ৩।১৭।২)

'বেদান্তমতে **'ব্রহ্মই বস্তু, আর সব মায়া, স্বপ্নবৎ অবস্তু।'** —(ঐ ২।১৩।১)

'জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়। মায়া আবরণ-স্বরূপ।' —(ঐ ৪।৩২ ১)

'বিচার করতে গেলে এ-সব স্বপ্নবৎ। ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। **শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু।'** —(ঐ ১ ২।৪)

অদ্বৈত-বেদান্তের উপদেশ এইরূপে ঠাকুর স্থানে স্থানে দিলেও পরক্ষণেই আবার সকলকে এই বলিয়া সাবধান করিয়াছেন :

'কিন্তু যারা সংসারে আছে, যাদের দেহ-বুদ্ধি আছে, তাদের সোঽহম্—এই ভাবটি ভাল নয়। সংসারীর পক্ষে যোগবাশিষ্ঠ, বেদান্ত ভাল নয়। বড় খারাপ। সংসারীরা সেব্য-সেবক-ভাবে থাকবে।—হে ঈশ্বর, তুমি সেব্য, প্রভু—আমি সেবক, তোমার দাস।'

সর্বসাধারণের জন্য ঠাকুর ভগবন্নামগুণগান-কীর্তন, সাধুসঙ্গ, ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা—এই সবেরই বিধান দিয়াছেন। তাহাদের জন্য জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ—এই ভাব নয়। বড় জোর—তিনিই সব, জীব জগৎ সবই তিনি—এই ভাব লইয়া তাহাদের উপাসনা করা কর্তব্য। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা তন্ত্রের শাক্তাদ্বৈতবাদ পর্যন্ত তাহাদের জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। পরবর্তী জীবনে স্বামীজী নিজেও এই কথা স্বীকার-করত বলিয়াছেন :

'He (Sri Ramakrishna) used generally to teach dualism. As a rule he never taught Advaitism. But he taught it to me'. (C. W. VII. P. 400.)

স্বামীজীর ন্যায় বিরল উত্তম অধিকারীর জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের অদ্বৈত উপদেশ করিয়াছেন। স্বামীজীকে প্রথম হইতেই ঠাকুর অষ্টাবক্রসংহিতাদি বেদান্ত-গ্রন্থ পড়িতে দিয়াছেন। **অষ্টাবক্রসংহিতায় বেদান্তের অজাতবাদ ও দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ** সুস্পষ্ট। ইহাতে শিষ্য রাজর্ষি জনক ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ গুরু অষ্টাবক্রের সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়টি আমরা এখানে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শিষ্য প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'হে প্রভো! জ্ঞানলাভ কি করিয়া হয়, মুক্তির উপায় কি এবং বৈরাগ্যই বা কি প্রকারে লাভ হয়, তাহা বলুন।'

গুরু বলিতেছেন :

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ।
ক্ষমার্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ ভজ॥ ১।২

—হে বৎস! যদি আত্যন্তিক মুক্তি কামনা করিয়া থাক, তবে বিষয়সমূহ বিষজ্ঞানে

পরিত্যাগ কর এবং অমৃতজ্ঞানে **ক্ষমা, সরলতা, সন্তোষ** ও সত্যাদি সাধন অভ্যাস কর।—তীব্র বৈরাগ্যবান্ স্বামীজীর ন্যায় মুমুক্ষু ব্যতীত এইরূপ উপদেশ আর কে পালন করিতে সমর্থ?

গুরু বলিতেছেন:

যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ।
আনন্দ পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখং চর॥ ১।১০
নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি॥ ১।১৫
ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্॥ ১।১৬

—হে শিষ্য! তুমি পরমানন্দজ্ঞানস্বরূপ, **রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় তোমাতে এই বিশ্ব প্রতিভাসিত হইতেছে।** তুমি নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানাদি সর্বমলিনতারহিত। তুমি সদামুক্ত, সমাধি অবলম্বনে তুমি মুক্ত হইবার ইচ্ছা করিতেছ—ইহাই তোমার ভ্রান্তি। **তুমি স্বরূপতঃ বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া আছ,** তুমি শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপ, কেন নিজেকে ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন জীব বলিয়া ভাবিতেছ?

প্রত্যক্ষমপ্যবস্তুত্বাদ্বিশ্বং নাস্ত্যমলে ত্বয়ি।
রজ্জুসর্প ইব ব্যক্তমেবমেব লয়ং ব্রজ॥ ৫।৩
স্বপ্নেন্দ্রজালবৎ পশ্য দিনানি ত্রীণি পঞ্চ বা।
মিত্রক্ষেত্রধনাগারদারদায়াদিসম্পদঃ॥' ১০।২
যত্র যত্র ভবেত্তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তত্র বৈ।
প্রৌঢ়বৈরাগ্যমাশ্রিত্য বীততৃষ্ণঃ সুখী ভব॥১০।৩

—অবস্তুভূত এই জগৎ প্রত্যক্ষগোচর হইলেও ইহা শুদ্ধস্বরূপ তোমাতে কোনকালেই নাই। জগৎ রজ্জুসর্পের ন্যায় প্রতিভাসমাত্র—ইহা জানিয়া শান্ত হও। কতিপয় দিবসমাত্র স্থায়ী মিত্র, ক্ষেত্র, ধন, গৃহাদি **পদার্থ স্বপ্নসম ও ইন্দ্রজাল-সদৃশ বলিয়া জানো।** তৃষ্ণাই সংসারের কারণ, তীব্রবৈরাগ্য-সহায়ে তুমি তৃষ্ণারহিত হইয়া সুখী হও।

যত্ত্বং পশ্যসি তত্রৈকস্ত্বমেব প্রতিভাসসে।
কিং পৃথক্ ভাসতে স্বর্ণাৎ কটকাঙ্গদনূপুরম্॥
১৫।১৪
ন কদাচিজ্জগত্যস্মিংস্তত্ত্বজ্ঞো হন্ত খিদ্যতি।
যত একেন তেনেদং পূর্ণং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্॥'
১৭।২

—হে শিষ্য! **যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, তাহা তোমারই রূপ।** ভূষণ কি কখনও সুবর্ণ হইতে পৃথক্ প্রতিভাত হয়? **স্ব-স্বরূপ দ্বারাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ,** ইহা জানিয়া তত্ত্বজ্ঞ আর এ সংসারে কখনও কোনও খেদ প্রাপ্ত হন না।

সুযোগ্য শিষ্য রাজর্ষি জনকের প্রতি তত্ত্বজ্ঞ গুরু শ্রীঅষ্টাবক্রের একবিধ সুন্দর উপদেশেই গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। উপদেশলাভের পর শিষ্য জনকও আপন কৃতকৃত্যতা জ্ঞাপনকরত বলিতেছেন:

তন্তুমাত্রো ভবেদেব পটো যদ্বদ্বিচারিতঃ।
আত্মতন্মাত্রমেবেদং তদ্বদ্বিশ্বং বিচারিতম্॥ ২।৫
প্রকাশো মে নিজং রূপং
নাতিরিক্তোঽস্ম্যহং ততঃ।
যদা প্রকাশতে বিশ্বং তদাহং ভাস এব হি॥
অহো বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানান্ময়ি ভাসতে।
রূপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌ বারি সূর্যকরে যথা॥
মত্তো বিনির্গতং মষ্যেব লয়মেষ্যতি।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা॥
২।৮—১০

—পট যেরূপ তন্তুমাত্রই, বিচারদ্বারা বিশ্বও তদ্রূপ আত্মরূপেই নিশ্চিত হইয়া থাকে। আমি প্রকাশস্বরূপ, তাঁহা হইতে ভিন্ন নহি। **বিশ্বে যাহা কিছু প্রকাশিত হইতেছে, আমিই সেইরূপে প্রকাশিত হইতেছি।** অহো!

শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্প ও সূর্যরশ্মিতে জলভ্রমের ন্যায় অজ্ঞানবশতই আমাতে এই বিশ্ব কল্পিত হইয়াছে। যেরূপ কুম্ভ মৃত্তিকা হইতে, তরঙ্গ জল হইতে এবং ভূষণ স্বর্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়া স্বস্ব কারণেই লয়প্রাপ্ত হয়, এই বিশ্বও সেইরূপ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও আমাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে।

অহো চিন্মাত্রমেবাহমিন্দ্রজালোপমং জগৎ।
অতো মম কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা॥ ৭।৫
কৃতং কিমপি নৈব স্যাদিতি সংচিন্ত্য তত্ত্বতঃ।
যথা যৎ কর্তুমায়াতি তৎ কৃত্বাসে যথাসুখং॥
—১৩।৩

—অহো! আমি চৈতন্যমাত্রস্বরূপ, **ইন্দ্রজালতুল্য এই জগৎ আমাতে প্রতিভাস-মাত্র।** এখন আর আমার কোন ত্যাজ্য-গ্রাহ্য কল্পনা নাই, তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে ইহা আমি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি। যখন যে কর্ম আসিয়া উপস্থিত হয়, (প্রারব্ধচালিত) আমি তাহাই অনুষ্ঠানকরত পরমসুখে বাস করিতেছি।

অষ্টাবক্রসংহিতার সিদ্ধান্ত এই যে, এক নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই পরমার্থতঃ সৎ ও চির-বিদ্যমান, জীব জগৎ উহাতে স্বতন্ত্র সত্তাহীন প্রতিভাসমাত্র। দ্বৈত একান্ত মিথ্যা, উহার কিঞ্চিন্মাত্রও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অবিদ্যা-প্রভাবে এক সদ্ ব্রহ্মই দৃশ্যরূপে প্রতীত হইতেছেন মাত্র। স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালসদৃশ এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রতীতিকাল ভিন্ন বিদ্যমান থাকে না। চেতনরূপ অধিষ্ঠানেই এই দৃশ্যপ্রতীতির উদ্ভব ও তাহাতেই বিলয় হইয়া থাকে। এক অখণ্ড চিৎসমুদ্রে তরঙ্গ ফেন বুদ্বুদাদির ন্যায় বিবিধ দৃশ্যবর্গ পরিদৃশ্যমান। তরঙ্গাদির মিথ্যা নামরূপ পরিত্যাগ করিলে যেমন এক সমুদ্রই অবশেষ থাকে, তেমনি দৃশ্যবর্গও নামরূপবিরহিত হইয়া এক চিৎসমুদ্রেই মিলিয়া যায়। স্ব-স্বরূপভূত সর্বব্যাপক এই চেতনকে বেদান্ত-বিচারদ্বারা জানার নামই জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানলাভ হইলেই সর্বানর্থ, সর্বসংসারদুঃখ চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায় ও পরমানন্দ লাভ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ—ব্রাহ্মসমাজের দ্বৈতভাবমূলক সগুণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় বিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথ—কিন্তু প্রথমে গুরুসমীপে এই সিদ্ধান্ত মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই, ইহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। জগতের সব কিছুই ব্রহ্ম, সৃষ্ট জীব কিনা ব্রহ্ম! ঋষিদের মাথা খারাপ হওয়াতে তাঁহারা এরূপ লিখিয়াছেন - এই সব বলিয়া তিনি কটাক্ষও করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে এইরূপ বলিলেও তাঁহার পরবর্তী জীবনে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, তিনিও ঋষিদের সুরেই সুর মিলাইয়া বলিতেছেন:

'আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ রচনা
জড় জীব আদি যত
আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে,
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।'

(ক্রমশঃ)

স্বামীজীর মানবতাবাদ

ডক্টর রমা চৌধুরী

সত্যই পৃথিবীতে এক অপূর্ব বস্তু এই মানব। কারণ, মানবে আপাত-দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ-ধর্মী নানাবিধ উপাদানের এরূপ একটি অত্যাশ্চর্য সমন্বয় দৃষ্ট হয়, যার দ্বিতীয় উদাহরণ জগতে নেই। এরূপে প্রথমতঃ মানব জড়-দেহধারী, এবং সেইদিক্ থেকে সাধারণ জড় বস্তুর ন্যায়ই প্রাকৃতিক নিয়মাধীন। যথা, একটি জড় বস্তু যেরূপ মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির অধীন, এবং শূন্যে নিক্ষিপ্ত হ'লে তৎক্ষণাৎ শক্তির বলে ভূমিতে পড়ে যায়, মানবও ঠিক তাই। দ্বিতীয়তঃ মানব প্রাণবিশিষ্ট এবং সেইদিক্ থেকে প্রাণিজগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গাদির ন্যায়ই ক্ষুধাতৃষ্ণাকুল ও জন্ম-মরণশীল। তৃতীয়তঃ মানব মন-সম্পন্ন, এবং সেইদিক্ থেকে প্রাণিজগতের মধ্যে একক ও অতুলনীয়। চতুর্থতঃ মানব আত্মবান্, এবং সেইদিক্ থেকে অজড় ও নিত্য। তা হ'লে এস্থলে আমরা 'মানব' বলতে কি বুঝব? তার দেহকে বুঝব, না তার প্রাণকে; তার মনকে বুঝব, না তার আত্মাকে? কে কার অধীন, কে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও প্রণিধান-যোগ্য? এই সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন মতবাদ বিভিন্ন দর্শন-শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

সাধারণ মতবাদ এই যে, মানব যতই জড়বস্তু ও প্রাণিজগৎ থেকে উচ্চতর হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সে পৃথিবীর ধূলামাটি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না সম্পূর্ণভাবে। সেজন্যই সে পাপী, তাপী, অশুদ্ধ, অসুখী, অপূর্ণ, অযোগ্য, অশক্ত, অসহায়। এই কারণে, পাশ্চাত্য মানবতাবাদে (Humanism) মানবের প্রতি প্রীতি আছে, কিন্তু বিশ্বাস নেই। মানব দুর্বল ও নিঃসহায়, পতিত ও পাপপূর্ণ, অশুদ্ধ ও অপূর্ণ; সেজন্য তাকে আমরা যেন সাহায্যের জন্য হস্ত প্রসারণ করি; তাকে আমরা যেন অসত্য থেকে সত্যে, পাপ থেকে পুণ্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাই—এইটিই হ'ল সাধারণ মানবতাবাদের মর্মের কথা।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মানবতাবাদ হ'ল একটি বিশেষ প্রকারের মানবতাবাদ। কারণ এতে মানবে গভীর প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে আছে মানবে সমপরিমাণ অগাধ বিশ্বাস। মানব দুর্বল নয়, নিঃসহায়ও নয়; পতিত নয়, পাপপূর্ণও নয়; অশুদ্ধ নয়, অপূর্ণও নয়; কারণ মানবই যে স্বয়ং ঈশ্বর এবং সেজন্য শাশ্বত শক্তিমান্, শাশ্বত পবিত্র, শাশ্বত পূর্ণ। সুতরাং সমাজসেবক অথবা ধর্মগুরুরা তাকে অসত্য থেকে সত্যে, পাপ থেকে পুণ্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যেতে কোনদিনও—কোনক্রমেই কোন অবস্থাতেই পারেন না, যেহেতু—

'মানব কদাপি অসত্য থেকে সত্যে উপনীত হ'তে পারে না। তার যাত্রা সর্বদাই সত্য থেকে সত্যে; হয়তো বা নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে; কিন্তু কদাপি অসত্য থেকে সত্যে নয়।' —এই কথা স্বামীজী বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন।

এরূপে এক্ষেত্রে স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, তিনি—যাকে বলা হয় 'আদিম পাপবাদ' (Doctrine of Original Sin) তা

গ্রহণে চিরকাল পরাঙ্মুখ ছিলেন। বহুদেশের দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রেরই আরম্ভ এই পাপবাদ নিয়েই। এক্ষেত্রে পাপী তাপী মানব কিরূপে পাপ-তাপ থেকে উদ্ধার এবং উচ্চতর পবিত্রতর পূর্ণতর জীবন লাভ করতে পারে, সেই পন্থা নির্দেশ করাই হ'ল দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতীয় দর্শনেই পাপ-তাপের কোনরূপ প্রকৃত ও শাশ্বত স্থান নেই। এই মতানুসারে মানব চিরকাল ব্রহ্মস্বরূপ, এবং মুহূর্তের জন্যও তার সেই স্বরূপের চ্যুতি হয় না, যেহেতু স্বরূপ-বিচ্যুতি এক অসম্ভব কথা। সূর্য কি মুহূর্তের জন্যও আলো-তাপহীন হয়ে যেতে পারে? সেজন্য বন্ধ-মোক্ষ—সকল অবস্থাতেই মানব ব্রহ্মস্বরূপ; মুহূর্তের জন্যও সে সত্যই অব্রহ্ম হয়ে পড়ে না, সেজন্য মুহূর্তের জন্যও তার মধ্যে সত্যই পাপ-তাপ প্রবেশ করতে পারে না। তা হ'লে 'বন্ধ' বা সংসারাবস্থা ও 'মোক্ষের' মধ্যে প্রভেদ কি কিছুই নেই? তা হ'লে 'মোক্ষলাভ' কথাটির প্রকৃত অর্থই বা কি? তা হ'লে সাধনাবলীর প্রয়োজনই বা কোথায়?

এর উত্তর হ'ল এই যে, বন্ধ ও মোক্ষের মধ্যে প্রভেদ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বদ্ধাবস্থায় জীব সত্যই অব্রহ্ম হয়ে পড়ে ও পরে পুনরায় মোক্ষাবস্থায় ব্রহ্ম হয়ে যায়। পূর্বেই যা বলা হয়েছে, বস্তুর স্বরূপ, স্বভাব বা সত্তা নিত্য; তার কোন অবস্থাতেই কোনরূপ পরিবর্তন বা চ্যুতি অসম্ভব। সেজন্য বন্ধ ও মোক্ষের মধ্যে কেবল এইমাত্র অর্থ যে, বদ্ধাবস্থায় জীব অজ্ঞানবশতঃ তার এই নিত্য-ব্রহ্ম স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না; মোক্ষাবস্থায় অজ্ঞানাবরণ বিনষ্ট হয়ে গেলে কেবল তখনই সে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ নিজের ব্রহ্ম-স্বরূপ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। এরূপে বন্ধ ও মোক্ষের মধ্যে প্রভেদ স্বরূপের দিক্ থেকে একেবারেই নয়; কেবল স্বরূপের উপলব্ধির দিক্ থেকেই মাত্র। সেজন্য বন্ধ ও মোক্ষ উভয়াবস্থাতেই সেই একই নিত্য অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মস্বরূপ বিরাজমান থাকে। কেবল বন্ধকালে তার উপলব্ধি থাকে না; মোক্ষকালে থাকে। তাই যদি হয়, তা হ'লে পাপ-তাপ কোন সত্য বস্তুই নয়, কেবল মিথ্যা প্রতীতি মাত্র। কারণ বদ্ধাবস্থায় আমরা অজ্ঞানবশতঃ মনে করি যে, আমরা সাংসারিক জীব মাত্র, পাপী-তাপী মাত্র, অব্রহ্ম মাত্র। কিন্তু আমরা মনে যাই করি না কেন, আমরা মুহূর্তের জন্য সাংসারিক জীবও হয়ে পড়ি না, পাপী তাপীও হয়ে পড়ি না, অব্রহ্মও হয়ে পড়ি না—সর্বদাই সেই এক সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই থাকি। এরূপে ভারতীয় মতে মুক্তি বা মোক্ষ নিত্য; কারণ মুক্তি বা মোক্ষই জীবের একমাত্র লক্ষ্য, এবং যা জীবনের অর্থ, যা জীবনের প্রাণ, যা জীবনের সর্বস্ব, তা অনিত্য হবে কি ক'রে? সেজন্যই মুক্তি বা মোক্ষ নিত্য। সুতরাং বদ্ধাবস্থা কোন সত্য বস্তুই নয়, মিথ্যা প্রতীতি মাত্র; এবং বদ্ধাবস্থার পাপ-তাপ, অপূর্ণতা-অপবিত্রতা, দীনতা-হীনতা প্রভৃতি নিশ্চয়ই তাই, যা পূর্বেই বলা হয়েছে।

ভারতবর্ষের এই মহান্ মধুর বেদান্ত-দর্শনের মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ সেজন্য বারংবার কম্বুকণ্ঠে অম্বুদ-নিনাদে ঘোষণা করেছেন:

তোমরাই ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতানন্দের অংশী, পবিত্র ও পূর্ণ। তোমরাই এই মর্ত্যভূমির দেবতা। তোমরা পাপী! মানুষকে পাপী

বলাই পাপ! মানবের বিরুদ্ধে এ একটি শাশ্বত অপবাদ। হে সিংহগণ! এসো! তোমরা যে মেষশাবক মাত্র, সেই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ কর। তোমরা অমৃত আত্মা, মুক্ত আত্মা, ধন্য ও নিত্য। তোমরা জড়পদার্থ নও, তোমরা দেহমাত্র নও; জড় পৃথিবী তোমাদের দাস, তোমরা তার দাস নও।'[১]

তাঁর সমস্ত অগ্নিগর্ভ ভাষণ, রচনা, কথোপকথন প্রভৃতিতে স্বামীজী এই ভাবে বারংবার মানবের অনন্ত মহিমা, অসীম গরিমা, অতুলনীয় সৌন্দর্য, অনির্বচনীয় মাধুর্য, অপরিসীম ঐশ্বর্যের কথা ঘোষণা করেছেন উদাত্ত কণ্ঠে। বস্তুতঃ স্বামীজীর ন্যায় অন্য কোন দার্শনিক ধর্মগুরু, অথবা চিন্তানায়কই মানবের মর্যাদা এরূপ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেননি। স্বামীজীর অভিনব মানবতাবাদের এইটিই হ'ল সুন্দরতম বৈশিষ্ট্য।

সাধারণ মানবতাবাদ এবং স্বামীজীর মানবতাবাদের মধ্যে আরও দুটি প্রধান মূলীভূত প্রভেদ হ'ল এই :

সাধারণ মানবতাবাদ অনুসারে আমাদের স্বীয় কর্তব্যানুরোধে, আমাদের স্বীয় বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী আমরা অন্যদের সাহায্য করি। এস্থলে 'অন্যদের' এবং 'সাহায্য'—এই দুটি কথাতেই স্বামীজীর ঘোরতর আপত্তি।

প্রথমতঃ আমরা এস্থলে 'সাহায্য' ক'রব কাকে? কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানবই ঈশ্বরস্বরূপ। ঈশ্বরকে সাহায্য করবার আমরা কে? আমরা কেবল তাঁকে সেবাই করতে পারি মাত্র, পূজাই করতে পারি মাত্র। সেজন্য স্বামীজী বারংবার বলছেন :

প্রত্যেক নর-নারী, প্রত্যেককেই ঈশ্বর-রূপেই দর্শন কর। তুমি কাউকে 'সাহায্য' করতে পার না; তুমি কেবল 'সেবাই' করতে পারো। 'সাহায্য' এই কথাটি তোমার মন থেকে মুছে ফেল। তুমি কাউকে 'সাহায্য' করতে পার না—এ তো কেবল ঈশ্বর-নিন্দাই মাত্র। তুমি কেবল 'সেবা'ই কর।

কি মহিমময় আদর্শ এটি! দ্বিতীয়তঃ আমরা প্রকৃতপক্ষে 'অন্যদের' সাহায্য করি না, করি নিজেদেরই কেবল। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, আমরা যেন উচ্চতর স্তর থেকে নিম্নতর স্তরগতদের অশেষ কৃপাভরে সাহায্য ক'রে তাঁদেরই কৃতকৃতার্থ পরমধন্য করি। কিন্তু প্রত্যেক মানবই স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁর এই কেন্দ্রীভূত তত্ত্বানুসারে, স্বামীজী বলেছেন ঠিক এর বিপরীত কথা। সেজন্য তাঁর মতে ঈশ্বরকে সেবা করতে পারলে যেমন ঈশ্বর কৃতকৃতার্থ বা ধন্য হন না, হই কেবল আমরা নিজেরাই, ঠিক তেমনি—মানব অর্থাৎ মানবরূপী ঈশ্বরকে সেবা করতে পারলেও সেব্য কৃতকৃতার্থ বা ধন্য হন না, হই কেবল সেবক আমরাই। বারংবার স্থিরবিশ্বাস ভরে, অসীম সাহস-সহকারে, গভীর আবেগ-মাধ্যমে স্বামীজী এই মধুর মহিমময় তত্ত্বটিকে প্রপঞ্চিত করেছেন :

আমরা পৃথিবীর ভাল ক'রব কেন? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, পৃথিবীকে সাহায্য করবার জন্যই কেবল। কিন্তু প্রকৃতকল্পে, আমাদের নিজেদের সাহায্য করবার জন্যই কেবল।

এরূপে স্বামীজীর দর্শন ধর্ম ও নীতিতত্ত্ব সাধারণ দর্শন ধর্ম ও নীতিতত্ত্ব অপেক্ষা বহুল পরিমাণে ভিন্ন; কেবল তাই নয়, বহুল পরিমাণে উচ্চতর মহত্তর মধুরতর। দর্শন ধর্ম ও নীতিতত্ত্ব থেকে মানবের তথা-

১ চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩।

কথিত সর্বজন-গৃহীত পাপ-তাপ, ক্ষুদ্রত্ব, ক্ষীণত্ব, দুর্বলতা ও অযোগ্যতা প্রভৃতিকে চিরতরে সমূলে বিসর্জন দিয়ে তিনি ভারতীয় দর্শন ধর্ম নীতিতত্ত্বের আলোকে যে স্বীয় অপূর্ব অভিনব দর্শন ধর্ম ও নীতিতত্ত্ব প্রপঞ্চিত করেছেন, তার মহিমা ও মধুরিমার অন্ত কোথায়? কারণ উচ্চকে নীচে অবনমিত করা সহজ, কিন্তু নীচকে উচ্চে উত্তোলিত করা দুঃসাধ্য। সেই অতি কঠিন কাজই স্বামীজী অনায়াসেই সিদ্ধ করতে পেরেছিলেন, যেহেতু যা তিনি তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে নিজেই বলেছিলেন—তাঁর মধ্যে ঘটেছিল শ্রীশঙ্করাচার্যের মস্তিষ্ক ও শ্রীচৈতন্যদেবের হৃদয়ের এক অপূর্ব সমন্বয়।

বিবেকানন্দ-বন্দনা

(গান—আড়ানা মিশ্র)

শ্রীঅমূল্য সেন

জয় জয় বিবেকানন্দ।
কর্মযোগী মহাবীর তুমি, সাগর-মেখলা পৃথিবী ভ্রমি
বেদান্ত-নির্ঘোষে প্রচারিলে নব বিশ্ব-শান্তি-সনন্দ।
জ্ঞানে শংকর, রূপে কামদেব,
সাহসে অর্জুন, ধ্যানে শুকদেব,
তব প্রাণবীণে যুগযুগান্তের সাধনা লভিল ছন্দ।
অবনত ভারতের দুঃখ-বেদনা
রাঙিয়েছ তায় তব কল্পনা
সন্ন্যাসী তুমি সর্বত্যাগী,
তোমার কর্ম তোমার ভাবনা রচিল জাতির মুক্তিমন্ত্র ॥
ঈশ্বরে তুমি বহুরূপে পেলে
'আর্তের সেবা' বাণী তুমি দিলে
জীবে প্রেম সে তো দেবতার পূজা, পড়ে থাক্ পুঁথিতন্ত্র ॥
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা
ফোটালে কাজে সে অমৃত-গাথা
ত্যাগে ও সেবায় দীক্ষা দানে
প্রাণবান্ ক'রে গড়ে তোলো তুমি ভারতমানবমানবীবৃন্দ ॥

'ধর্মসংস্থাপনার্থায়'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি গ্রীসের তরুণদের চরিত্র খারাপ ক'রে দিচ্ছেন ; 'he corrupts the young'. স্বামী বিজ্ঞানানন্দের মায়ের চোখেও ঠাকুর ছিলেন 'corruptor of youth'. পুত্র হরিপ্রসন্ন ঠাকুরের ওখানে যাতায়াত করেন—এ তিনি পছন্দ করতেন না। হরিপ্রসন্ন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন জানতে পেরে ক্রুদ্ধা জননী পুত্রকে বলেছিলেন, 'সেই পাগলা বামুনের ওখানে গিয়েছিলি? যে ৩৫০টি ছেলের মাথা গরম ক'রে দিয়েছে?'

এই ক্রোধ স্বাভাবিক। মায়ের কামনা, ছেলে বিয়ে ক'রে সংসারী হবে, অর্থ উপার্জন করবে, ঘর নাতি-নাতনীতে ভরে যাবে। সেই মনস্কামনা পূর্ণ হবার পথে কেউ অন্তরায় হ'লে তাকে সুনজরে দেখা সাধারণ মায়ের পক্ষে কঠিন। এমনি অনেক অভিভাবিকা ও অভিভাবক তখনকার দিনে দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনের দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাইতেন।

সংসারে প্রবেশ করলে মানুষ ভগবান্‌কে পায় না—এমন কথা ঠাকুর বলেননি। ত্রৈলোক্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'মহাশয়, সংসারে কি যথার্থ জ্ঞান হয়? —ঈশ্বর লাভ হয়?' হাসতে হাসতে ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন : কেন গো তুমি তো সারে মাতে আছো। ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে আছো তো। সংসারে হবে না কেন? অবশ্য হবে। আসল কথা হ'ল, ঈশ্বরে মন রাখা।

'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।' কেবল পরিবারদের পুঁটুলি বইতে বইতে প্রাণ যায়, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে, গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত, নিজের আর পরিবারদের পেটের জন্য দাসত্ব করে, আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ ক'রে ধন উপার্জন করে, মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা না ক'রে বিকারের খেয়ালে 'হলুদ, পাঁচফোড়ন, তেজপাত ব'লে চেঁচিয়ে ওঠে'—এই ধরনের বদ্ধজীবের অবিদ্যার সংসার করা ঠাকুরের আদৌ মনঃপূত ছিল না। ঠাকুর যে সংসার করার কথা বলেছেন, সে বিদ্যার সংসার। সেই সংসারের কেন্দ্রে ঈশ্বর।

ঠাকুর বলতেন, 'মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত।' ব্রাহ্ম ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন : মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'সত্য বলছি, তোমরা সংসার ক'রছ, এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হ'লে হবে না। এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধ'রে থাকো! কর্ম শেষ হ'লে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।'

ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে, 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর'—এই কথাই হ'ল কথা। ঈশ্বরকে অনুক্ষণ স্মরণে রাখার কথা কত রকম উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। বড় মানুষের বাড়ির দাসী—যার মন প'ড়ে আছে দেশে নিজের বাড়ির দিকে, জলে বিচরণশীল কচ্ছপ—যার মন রয়েছে ডিমগুলিতে, নষ্টা স্ত্রী —যার মনে নিরন্তর পরপুরুষের চিন্তা। ঠাকুর যখন সংসার ত্যাগ করতে বলেননি, তখন হরিপ্রসন্নের মায়ের পাগলা বামুনকে এতটা ভয়,

করবার কি ছিল? ভয় করবার কারণ ছিল বৈকি! তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছিলেন লোকশিক্ষার জন্য। সারে মাতে থাকতে বলেছেন—ঠিক কথা। সংসারে ঈশ্বরলাভ হবে—কেবল এ-কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি। বলেছেন, 'অবশ্য হবে।' আরও একটা কথা এই সঙ্গে বলেছেন, 'তাঁকে লাভ ক'রে তবে সংসারে থাকা যায়। যেমন মাখন্ তুলে জলে ফেলে রাখা। জনক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে তবে সংসারে ছিলেন।' ঠাকুর তো শুধু 'রসে বশে বেশ আছ' বলেননি। সারে মাতে থাকার কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি। বলেননি শুধু 'কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল।' সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, নির্লিপ্ত হয়ে সংসার করতে। কিন্তু নির্লিপ্ত হওয়া কি এতই সহজ? মুখে বললেই কি জনক রাজা হওয়া যায়? জনক রাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে আগে নির্জনে বসে কত তপস্যা করেছিল! ঠাকুর তাই বললেন, 'তোমরা কিছু করো, তবে তো জনকরাজা হবে।' বললেন, দিন কতক ঠাঁইনাড়া হয়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার-তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই।' বললেন, 'যে ঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার-তেঁতুল আর জলের জালা!' বারংবার শোনালেন, 'ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাকলে হবে না। জো-সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর—দেখা দাও ব'লে।'

তোমরা কিছু কর—এই তো ছিল ঠাকুরের কথা। শুধু সংসারী লোকদের আশার কথা শুনিয়ে গেছেন তিনি? বলেননি কি, 'দিন কতক না হয় সব ত্যাগ ক'রে তাঁকে একলা ডাকো?' বলেননি কি সাধনের কথা? নির্জনবাসের কথা? বলেননি কি, কয়েকটি ছেলেপুলে হয়ে গেলে ভাইভগ্নীর মতো থাকতে?' বলেন নি কি, 'তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙো, হাতে আঠা জড়াবে না?'

কিন্তু ত্যাগের রাস্তা যে দুর্গম? সংসারী লোকদের নির্জনে যাবার সাহস আসবে কোথা থেকে? ঠাকুর বললেন, 'সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে তবে তো লোকের সাহস হবে! তবেই তো তারা কমিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে সাহস করবে! এ ত্যাগ শিক্ষা যদি সন্ন্যাসী না দেয়, তবে কে দেবে?'

তাই ঠাকুরের প্রয়োজন ছিল এমন কতকগুলি যুবককে যারা হবে সর্বত্যাগী, উপার্জন করবে না অর্থ, মুগ্ধ হবে না নারীমায়ায়, যাদের জীবনের আকাশে ধ্রুবতারার মতো সর্বদা জলজল করবে একটি মাত্র লক্ষ্য—ঈশ্বরলাভ। ঠাকুর আরতির সময় কুঠির উপর থেকে ডাকতেন, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, আয়!' সাধুর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে তবে না অন্য লোকে ত্যাগ করতে শিখবে! ঠাকুরের প্রয়োজন ছিল একদল ত্যাগী সাধুকে।

ক্রমে ক্রমে ভক্তেরা এসে জুটল। এল লাটু, রাখাল, নরেন; এল তারক, যোগেন, শশী; এল শরৎ, কালীপ্রসাদ, হরিপ্রসন্ন; এল গঙ্গাধর, গিরিশ, পূর্ণ। 'কলায়ের ডালের খদ্দের' কেউ নয়। প্রত্যেকে শ্যাওলার মধ্যে শতদল। কেশবের মতো যাকে তাকে তিনি চেলা করলেন না দলপুষ্টির জন্য। লক্ষণ দেখে দেখে যাদের তিনি বেছে নিলেন, তারা আর সংসারে মন দিতে পারলো না, জীবনকে তারা উজাড় ক'রে সঁপে দিল গুরুদেবের চরণমূলে, অকিঞ্চন হয়ে বরণ ক'রে নিল বৈরাগ্যের পাষাণ-কঠিন পথকে। ঠাকুর বলতেন, 'যদি সদ্‌গুরু হয়, জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়।' তুলনা দিতেন জাত-সাপের সঙ্গে। জাত-সাপে কোলা ব্যাঙকে ধরলে তিন ডাকে

ব্যাঙটা চুপ হয়ে যায়। ঠাকুর ছিলেন জাত-সাপ। যাদের ধরলেন তাদের ভববন্ধন মোচন হয়ে গেল।

ঠাকুর তো একঘেয়ে ছিলেন না। একঘেয়ে মানুষকে লোকে পছন্দ করে না। মাকে বলেছিলেন, আমি শুকনো সাধু হবো না। তাঁর দুটি সাধ ছিল। প্রথম ভক্তের রাজা হবো; দ্বিতীয় শুকনো সাধু হবো না। মা তাঁর দুটি মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করেছিলেন। একদিকে তিনি ছিলেন বজ্রের মতোই কঠোর। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ যেমন প্রচার করতেন, তেমনি আচরণেও তার ব্যতিক্রম হ'তে দিতেন না। লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ী ঠাকুরের বিছানা ময়লা দেখে দশ হাজার টাকা লিখে দিতে চেয়েছিলেন। যাই ও-কথা বলা, অমনি ঠাকুর অজ্ঞান হয়ে গেলেন। চৈতন্য হবার পর ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণকে বলেছিলেন, 'অমন কথা যদি আর মুখে বলো, তা হ'লে এখানে আর এস না।' বেদান্তবাদী মারোয়াড়ী তখন ভাগ্নে হৃদের কাছে টাকাটা দেবার প্রস্তাব করলেন। ঠাকুর সে প্রস্তাবেও সম্মতি দিলেন না। বললেন, 'টাকা কাছে থাকাই খারাপ! সে-সব হবে না!'

কিন্তু যিনি একদিকে এমন বজ্রকঠোর ছিলেন আর একদিকে তাঁর হৃদয়টি কি কুসুমের চেয়েও কোমল ছিল না? কত ভালোবাসতেন মাকে! 'কথামৃতের' প্রথম খণ্ডে আছে:

'মাকে কষ্ট দিয়ে কি ঈশ্বর-সাধনা হয়? আমি বৃন্দাবনে রয়ে যাচ্ছিলাম, তখন মাকে মনে প'ড়ল, ভাবলুম—মা যে কাঁদবে; তখন আবার সেজোবাবুর সঙ্গে চলে এলুম।'

রাখাল তখন বৃন্দাবনে বলরামের সঙ্গে পত্রে সংবাদ এসেছে রাখালের অসুখ অসুখের সংবাদে ঠাকুর এত চিন্তিত যে, হাজরার কাছে বালকের মতো কেঁদেছিলেন। হৃদয় যাঁর নিরন্তর ঈশ্বরের পাদপদ্মে লগ্ন থাকত, মায়াকে যিনি অতিক্রম করেছিলেন, কাপড়ের ঠিক থাকতো না যাঁর মানুষের প্রতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি, ভক্তদের প্রতি কিন্তু তাঁর প্রেমের অবধি ছিল না। যে সব যুবক তাঁর কাছে এসেছিল, এই প্রেমের বলেই তাদের হৃদয়কে তিনি সম্পূর্ণ জয় করেছিলেন। যারা তাঁর কাছে এল, তারা আর ঘরে ফিরে যেতে পারলো না।

'না রাখো তার ঘরের আড়াল,
না রাখো তার ধন।
পথে এনে নিঃশেষে তায় কর অকিঞ্চন।'
(গীতাঞ্জলি)

রুদ্রসন্ন্যাসী তাদের ক'রে দিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অনাগারিক'। ঘর ব'লে, সংসার ব'লে তাদের আর কিছু রইল না। হরিপ্রসন্নের মা ছেলের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়াটাকে ভয়ের চক্ষে দেখতেন। সে ভয় কি অমূলক ছিল? ঠাকুর মাস্টারকে বলছেন, 'তুমি নারাণকে গাড়ি ক'রে এনো।' নারাণকে গাড়ি ক'রে আনার কথা কেবল মাস্টারকেই বললেন না। মুখুজ্যেকেও ব'লে রাখলেন, 'সে এলে কিছু খাওয়াব। ওদের খাওয়ানোর অনেক মানে আছে।' এ প্রেমে বনের বাঘ বশ হয়; নির্মল হৃদয় অকপট তরুণেরা বশ হবে না?

আর সত্যিই তো তিনি শুকনো সাধু ছিলেন না। তিনি ছিলেন রসিকের চূড়ামণি। ছেলেদের সঙ্গে কত ফষ্টিনষ্টি করতেন। হরিপ্রসন্নের সঙ্গে সেই কুস্তি লড়ার কথা কখনও ভোলা যায়? মাস্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'তোমরা দুজন

ইংরেজীতে কথা কও ও বিচার করো, আমি শুনবো। নিজে কিন্তু ইংরেজী জানতেন না। তবে নরেন্দ্রের মুখে Philosophy ও ধর্মের কথা শুনে সহাস্যে বলেছিলেন, 'Thank you! Thank you!' এই ফষ্টি-নষ্টি, হাসি-তামাসার মাঝখান দিয়ে চলতে লাগলো গুরুর শিক্ষাদানের কাজ। প্রতিটি শিষ্যের জীবন-তরীর হাল শক্ত ক'রে ধরে রাখলেন নিজের হাতে, আর সেই তরীগুলিকে পরিচালিত করতে লাগলেন নবজীবনের উপকূলের দিকে, যেখানে গঙ্গায় মুক্তির মধ্যে হাঁড়ির মাছের অনির্বচনীয় আনন্দ, যেখানে ঈশ্বরলাভের মধ্যে মানবজন্ম চিরকালের জন্যে ধন্য হয়ে গেছে। আচার্যের আসনে বসে সম্মুখে উপবিষ্ট শিষ্যদের তিনি উপদেশ দিচ্ছেন, গম্ভীর গুরুদেবের সামনে মৌনী শিষ্যেরা সসম্ভ্রমে চুপটি ক'রে বসে আছে—এই রকমের একটা পটভূমির সঙ্গে ঠাকুরকে আমরা খাপ খাওয়াতে পারিনে। পাদ্রী সাহেবের ভূমিকা নিয়ে তিনি যদি শিষ্যদের উপদেশ দিতেন, হাসি-ঠাট্টা ফষ্টি-নষ্টি বাদ দিয়ে শুধু ঘরে বসে নিজেদের পাপের কথা ভাবতে বলতেন—তবে কি ছেলেরা তাঁকে এমন গভীর ভাবে ভালবাসতে পারত? নট ও নাট্যকার মদ্যপায়ী গিরিশ ঘোষকেও তিনি বিধি-নিষেধের মধ্যে কখনও বাঁধবার চেষ্টা করেননি।

অদ্ভুত ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সেই গুরুদেবটি, আর অদ্ভুত ছিল তাঁর শিক্ষার ধরন। লেকচার দিয়ে কি মানুষকে সত্যনিষ্ঠ, প্রেমিক ও জিতেন্দ্রিয় করা যায়? ঈশ্বরতত্ত্ব কি অঙ্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, যে পরকে বুঝানো যায় উপদেশের দ্বারা? আবহাওয়ায় যদি নির্মলতা থাকে, মানুষের চরিত্র আপনা থেকেই নির্মল হয়। দক্ষিণেশ্বরের আবহাওয়াতে ছিল ত্যাগ, সংযম, পরমতসহিষ্ণুতা। ঠাকুরের নিজের জীবন ছিল গীতার জীবন্ত ভাষ্য। সেই অনুপম নিষ্কলঙ্ক শুচিশুভ্র জীবনের আলোকে কত যে জীবনপ্রদীপ জ্বলে উঠেছিল! 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও।' ঠাকুর লেকচারে বিশ্বাস করতেন না। মাষ্টার যখন বললেন, পৌত্তলিকদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, তখন বিরক্ত হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া!' ধর্ম তো ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে। এই অনুভূতির স্বর্গলোকে কেউ কি কাউকে লেকচারের দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে? নিজে যদি নির্জনে সাধনের দ্বারা তাঁকে পাই তো পাবো। কেউ কাউকে লেকচার বা কানে মন্ত্র দিয়ে ঈশ্বর পাইয়ে দিতে পারে না! ঠাকুর বলতেন, 'ভালো বালাই, মাছ ধ'রে হাতে তুলে দাও!' বলতেন, 'ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ ক'রে বসে থাকবেন!' হুইটম্যানের সেই অমর লাইনদুইটির কথা মনে পড়ে যায়—

Not I, not any one else can travel
　　that road for you,
You must travel it for yourself.

ঠাকুর বলতেন, 'গুরু, বাবা ও কর্তা, এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে।' আচার্যগিরি করাকে তিনি বক্রনয়নেই দেখতেন।

কিন্তু কি কথা বলতে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গে এসে গিয়েছি! বলছিলাম, তাঁর শিক্ষার ধরনের কথা! তিনি জানতেন, স্বাধীনতা সমস্ত কল্যাণের শর্ত, স্বাধীনতা সমস্ত কল্যাণের উৎস। গুরুর আসনে বসবার যোগ্য একমাত্র তিনিই, যিনি স্বাধীনতার আদর্শে মনেপ্রাণে বিশ্বাসী। ঠাকুর বিশ্বাস করতেন

অধিকারী-ভেদে, বিশ্বাস করতেন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে, বিশ্বাস করতেন সৃষ্টির বিচিত্রতায়, বিশ্বাস করতেন, 'নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করছেন।' তিনি বলতেন, 'আমি—যার যা ভাব, তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটাই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব।' বিজয়ের শাশুড়ী যখন তাঁকে বললে, 'তুমি বলরামদের ব'লে দাও না, সাকার পূজোর কি দরকার?' তখন সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর শুনিয়ে দিলেন, 'অমন কথা আমিই বা বলতে যাবো কেন—আর তারাই বা শুনবে কেন?'

স্বাধীনতার প্রতি এই জলন্ত অনুরাগ ছিল বলেই যারা তাঁর কাছে এসেছিল, তাদের স্বকীয়তাকে কখনও তিনি ক্ষুণ্ণ করবার চেষ্টা করেননি। যার যা ভাব, তার সেই ভাবকে তিনি রক্ষা ক'রে চলতেন। একটা বিশেষ মতবাদ যদি সকলের উপরে চাপাবার চেষ্টা করতেন, তবে ছেলেদের কখনই তিনি ধ'রে রাখতে পারতেন না। আর তিনি শিষ্যদের সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁর নামে যেন আর একটি নূতন সম্প্রদায় গজিয়ে না ওঠে। 'And he warned his disciples against any kind of Ramakrishnaism.' (R. R)। বিবেকানন্দকেই তিনি বিবেকানন্দ ক'রে তৈরী করলেন, গিরিশ ঘোষকে কখনও বিবেকানন্দ করবার চেষ্টা করেননি; যোগানন্দ অথবা ব্রহ্মানন্দকেও নয়। খ্যাতনামা ফরাসী সাহিত্যিক রোমা রলাঁ ঠাকুরের জীবন-চরিতে ঠিকই লিখেছেন :

This great moulder of souls cast with his fingers of fire the bronze of Vivekananda as well as the delicate and tender wax of Yogananda or Brahmananda.

বিবেকানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ তো একই ধাতুতে তৈরী ছিলেন না। একজন ছিলেন ব্রোঞ্জের মতো কঠিন এবং আর একজন মোমের মতোই নরম। দুইজনকে এক রকম ক'রে তৈরী করতে গেলে সব 'গড়্‌বড়্‌' হয়ে যেত। এমার্সন অনুকরণকে 'আত্মহত্যা' বলেছেন। আমরা যখন নিজেকে আর একজনের মতো ক'রে তৈরী করতে যাই, তখন কি নিজেকে হত্যা করিনে? তুমি তুমিই, আর আমি চিরকালের জন্যে আমিই। তুমি আমার থেকে স্বতন্ত্র বলেই তো তোমাকে আরও ভালোবাসি, আরও সম্মান করি। তুমি আমার নকল হ'লে এই পৃথিবী কি অত্যন্ত একঘেয়ে লাগতো না? সেই নকল করার চেষ্টায় তোমার জীবন কি অবগুণ্ঠিত হয়ে থাকতো না? ঈশ্বর আমাকে তাঁর যে বিশেষ উদ্দেশ্যটি সফল করবার জন্যে তৈরী করেছেন, তোমাকেও যদি সেই একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরী করতেন, তবে তোমাকে আমাকে এমন আলাদা আলাদা ক'রে সৃষ্টি করবার কি কোন প্রয়োজন ছিল?

যে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ঠাকুরের মর্ত্যধামে আবির্ভাব, তা পূর্ণ হবার জন্যে দরকার ছিল সংঘশক্তির। তাঁর আধ্যাত্মিক সংগ্রামের পর সংগ্রাম, ঈশ্বরের মাধুর্যস্রোতে ভেসে যাওয়ার আনন্দের সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি, সেই বিচিত্র পথে পরমসত্যের উপলব্ধি—এগুলি কেবল তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ হয়ে থাকলে পৃথিবীর কি লাভ হ'ত? তিনি এসেছিলেন সমস্ত মানুষের জন্যে—একার মুক্তির জন্যে নয়। সব ধর্মই যে সত্য, ঈশ্বরকে নিরাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়, আবার সাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়, মিছরির রুটি সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও, মিষ্ট লাগবে—

এই মহাসত্যকে বিশ্বের কাছে উদ্ঘাটিত করবার জন্যেই না রামকৃষ্ণ-অবতার! আর সেই জন্যেই ঈশ্বরকে নানাভাবে উপলব্ধির বিচিত্র সাধনায় তাঁর ব্রতী হবার রহস্য! তাই ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কথায় তোতাপুরীকে ছাড়লেন না! অদ্বৈতবাদের পথে গিয়ে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করলেন। বিশ্বাস আসে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। সব ধর্মই সত্য—এ-কথা এমন জোরের সঙ্গে তাঁর বলবার শক্তি এসেছিল কোথা থেকে? এই শক্তি এসেছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি।' আগে করা, তবে মানার কথা আসে। আগে অভিজ্ঞতা, পরে বিশ্বাস। আর এই অভিজ্ঞতা-লাভের জন্যে কী সংগ্রামই না তাঁকে করতে হয়েছিল! নিরাকার ব্রহ্মের মধ্যে কিছুতেই ডুবতে পারছেন না। কেবলই মায়ের রূপ হৃদয়পটে ভেসে ভেসে উঠছে। তখন খড়্গ দিয়ে মাকে মনে মনে সেই দু-টুকরো ক'রে ফেলার রোমাঞ্চকর ঘটনা আর সঙ্গে সঙ্গে অরূপের উপলব্ধি! অধ্যাত্ম-জগতে মানবাত্মার এই দুর্জয় অভিযানের কাহিনী পড়তে পড়তে কলম্বসের সমুদ্রযাত্রার কাহিনীকে কি পানসে ব'লে মনে হয় না?

জীবনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা-প্রসূত সত্যের কথা তো জগৎকে শোনাতে হবে। শোনাতে হবে, সব ধর্মই সত্য। শুধু দরকার ব্যাকুলতা। 'ব্যাকুল হয়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও—তাঁকেই পাবে।' তাই তো 'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস, আয়'—এই ব্যাকুল আহ্বান! রাতের আকাশকে কাঁদিয়ে সেই যে কান্নাভরা ধ্বনি একদা ছড়িয়ে গিয়েছিল দিক্ থেকে দিগন্তরে—সেই ধ্বনির মধ্যে কী যে শক্তি নিহিত ছিল! সেই শক্তির দুর্বার টানে দক্ষিণেশ্বরে একে একে যুবকদের আগমন, বিবেকানন্দের নেতৃত্বে সেই যুবশক্তির সংগঠন, আর আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে ঘরছাড়া সেই সন্ন্যাসীদের আত্মাহুতি কি কাজ ক'রে যাচ্ছে না? এই নবযুগে বিজ্ঞানের সাধনাকে আশ্রয় ক'রে মানুষ যখন মানুষের অত্যন্ত নিকটে এসে পড়েছে, তখন যদি মানুষ তার প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে না পারে, তবে তো এই শারীরিক নৈকট্য মহা অনর্থের সৃষ্টি করবে। মহাকাশ-বিজয়ী মানুষের মনে আজ ক্ষমতার দুর্বার নেশা। শক্তির এই দুর্বিনীত অহঙ্কারে মানুষ যদি ধরাকে সরা জ্ঞান করে, সে যদি প্রতিবেশীর সুখ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতন না হয়, তবে বার্ট্রাণ্ড রাসেল ঠিকই বলেছেন: Thisi ntoxication is the greatest danger of our time—অর্থাৎ ক্ষমতার এই নেশা এ-যুগের বৃহত্তম ভয়ের কারণ। ঠাকুরের কণ্ঠে তাই প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করবার বাণী, আর এই জন্যেই কি রমা রলাঁ তাঁকে বলেননি, the pilot and the guide for the needs of the new age?—নবযুগের পথপ্রদর্শক—নবজীবনের দিশারী?

সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

(৭) বিবেকানন্দের শ্রেণীসংগ্রামবাদ

ধর্মচিন্তা ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবন-দর্শনের উপরই বিবেকানন্দের সমাজদর্শনের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তা 'foundation of his edifice of thought' হলেও 'the whole of edifice' নয়। বিবেকানন্দও মার্ক্স-এর মতোই দার্শনিক ভিত্তির সঙ্গে যুক্ত করেছেন সমাজের ক্রমবিকাশের বিজ্ঞানকে এবং তার দ্বারা একটি নূতন সম্পূর্ণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা হ'ল 'Historical-Scientific spirituality' (ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিকতা) যেমন মার্ক্স প্রতিষ্ঠা করেছেন 'Historical-Scientific materialism' (ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক জড়বাদ)। এবং লক্ষণীয় এই যে, মার্ক্স এক্ষেত্রে মর্গ্যান-এর গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, বিবেকানন্দ কোন পক্ষপাতিত্ব না ক'রে পুরাতাত্ত্বিক ভাষাতাত্ত্বিক ইত্যাদি বিষয়ে পৃথিবীর সমগ্র গবেষণা সংগ্রথিত ক'রে গ্রহণ করেছেন। বিশেষ কারও নামোল্লেখ তাঁর রচনাবলীতে নেই, কিন্তু তাঁর 'anthropological' ও 'sociological' (নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক) উক্তিগুলি থেকে আগ্রহশীল পাঠক বিশ্লেষণ ক'রে এর প্রমাণ পাবেন। এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিকতার ভয়ে এবং প্রবন্ধের কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে সে আলোচনা থেকে আমরা বিরত হলাম।

ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে বিবেকানন্দও উপনীত হয়েছেন 'শ্রেণীসংগ্রাম-বাদে'। এই বিষয়ে মার্ক্স-এর সঙ্গে তাঁর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মার্ক্স এবং তাঁর 'শ্রেণী-শোষণ' ও 'সমাজ-বিপ্লব' সম্পর্কে মত প্রায় এক।

বিবেকানন্দ সমাজ-জীবন বিশ্লেষণ ক'রে সব সমাজে দেখতে পেয়েছেন চারটি মৌলিক শ্রেণী। যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। একের পর এক ইতিহাসে এই চারটি শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা গিয়েছে। সর্বপ্রথম ছিল ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের যুগ। সমাজের গতি চক্রাকারে আবর্তিত হয় চারটি শ্রেণীর ক্রমান্বয়-প্রাধান্যে সেই চক্র গঠিত। ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের যুগে 'বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান্, দেবগণ তাঁহার মন্ত্রবলে আহূত হইয়া পানভোজন গ্রহণ করেন ও যজমানকে অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। মানব-বলের কেন্দ্রীভূত রাজাও পুরোহিতবর্গের অনুগ্রহ-প্রার্থী। তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টিই যথেষ্ট সাহায্য, তাঁহাদের আশীর্বাদ সর্বশ্রেষ্ঠ কর।'[১] পুরোহিত-গণের এই প্রাধান্য—যার কাছে রাজশক্তি মাথা নত ক'রে রয়েছে। রাজশক্তি কেন মাথা নত ক'রে রয়েছে—তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, 'কখনও বিভীষিকাসঙ্কুল আদেশ, কখনও সহৃদয় মন্ত্রণা, কখনও কৌশলময় নীতিজাল বিস্তার রাজশক্তিকে অনেক সময়ই পুরোহিতকুলের নির্দেশবর্তী করিয়াছে।' তা শুধু নয়, 'সকলের উপর ভয়—পিতৃপুরুষদের নাম, নিজের যশোলিপি পুরোহিতের লেখনীর

১ শ্রেণীসংগ্রামবাদের বিশ্লেষণ 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

অধীন'। এবং 'সর্বাপেক্ষা পুরোহিতকুলের তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন।' বিবেকানন্দের শ্রেণীসংগ্রামবাদের দুইটি প্রধান বক্তব্য: প্রথম—প্রত্যেক যুগে কোন না কোন শ্রেণীর প্রাধান্য; দ্বিতীয়—প্রধান শ্রেণী কর্তৃক প্রজাপুঞ্জের ও অপরাপর শ্রেণীর শোষণ। যেমন প্রথম যুগে পুরোহিত-প্রাধান্য এবং রাজন্যবর্গ-সহায়ে পুরোহিত কর্তৃক অন্যান্য শ্রেণীর শোষণ—'বৈশ্যেরা রাজার খাদ্য, তাঁহার দুগ্ধবতী গাভী।' রাজা-প্রজার যে সম্পর্ক এ-সময়ে পরিলক্ষিত হয়, তাতে দেখা যায় যে, 'কর-গ্রহণে, রাজ্য-রক্ষায় প্রজাবর্গের মতামতের বিশেষ অপেক্ষা নাই।' এবং এ-সময়ে দেখা যায় যে, 'প্রজাশক্তি আপনার ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করিতেছে। সে শক্তির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের এখনও কোন জ্ঞান হয় নাই।' কিন্তু এই শোষণ ও সংকীর্ণতা সত্ত্বেও 'এ-যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ-সময় বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ বুদ্ধি-বলে অপরকে শাসন করতে হয় ব'লে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন ক'রে থাকেন।'[২] পুরোহিত-শাসনের অবসানে ক্ষত্রিয়গণ প্রাধান্য অর্জন করেন। ভারতে বৌদ্ধপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত-শক্তির ক্ষয়—ও রাজন্যবর্গের শক্তির বিকাশ ঘটেছিল। এই 'ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ।' কিন্তু এ-যুগের গুণ হ'ল 'এ-যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।' তারপর আসে 'বৈশ্যশাসনের যুগ। এর ভেতরে ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা।' এ-যুগের সুবিধা এই যে, 'বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে।' 'ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াধিপত্যে যেমন বিদ্যা ও সভ্যতার সঞ্চয়, বৈশ্যাধিকারে সেই প্রকার ধনের।' সর্বশেষে স্বামীজীর মতে শূদ্রশাসন যুগের আবির্ভাব হবে। তিনি বলছেন, 'তাহারই পূর্বাভাস পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোশ্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।' (বর্তমান ভারত)। এ-যুগের অসুবিধা এই যে, 'হয়তো সভ্যতার অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে। (পত্রাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড—৬৫নং পত্র)।

(৮) সমাজ-বিপ্লব

স্বামী বিবেকানন্দের মতে শুধু যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাধান্য ঘটে তা নয়, তাদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষও চলছে আদিকাল হ'তে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই নিদারুণ সঙ্ঘর্ষের ইঙ্গিত রামায়ণে পরশুরামের একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করবার কাহিনীর মধ্যে নিহিত আছে। বৌদ্ধপ্লাবন-কালেও ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে এই সঙ্ঘর্ষের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। বৌদ্ধ যুগের অবসানে রাজশক্তি ও পুরোহিত-শক্তি হাত মিলিয়ে চলেছে—শূদ্র ও প্রজাপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ। এই শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষ কোন কালে লোক-ক্ষয়কারী বিপ্লবের রূপ নিয়েছিল। (বর্তমান-ভারত)

শূদ্র-যুগের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। তিনি স্পষ্টত: বলেছেন,

২ পত্রাবলীর ২য় খণ্ডে ৬৫নং পত্রে স্বামীজী এই বিভিন্ন যুগের সুবিধা-অসুবিধার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

পরবর্তী বিপ্লব রাশিয়া কিংবা চীনে। তাঁর এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হ'ল 'ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে······সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান্ শাসনকারীদের উপর সমাজের প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।' (বর্তমান ভারত)। স্বামীজীর মতে ভারতে এই বিপ্লব আদিকাল হ'তে ঘটছে, তবে তা এদেশে ধর্মের নামে সাধিত। 'পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি বহুল কর্মকাণ্ডের প্রাণনিপীড়ক ভাব হইতে সমাজকে সদাচার ও জ্ঞানমাত্রাশয়—জৈন এবং অধিকৃত জাতিদিগের নিদারুণ অত্যাচার হইতে নিম্নস্তরস্থ মনুষ্যকুলকে বৌদ্ধবিপ্লব ভিন্ন কে উদ্ধার করিত?' সকল ধর্মান্দোলনের মধ্যে এই সমাজ-বিপ্লব ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন এবং একে তিনি কঠোর ভাষায় নিন্দাও করেছিলেন। হয়তো তাঁর এ-সম্পর্কে উক্তি নাস্তিকতা-প্রিয় সমাজতন্ত্রবাদীদের উৎসাহিত করবে। তিনি বলেছেন, 'অর্থহীন শব্দনিচয়ের উচ্চারণে যদি সর্বকামনা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কে আর বাসনা-তৃপ্তির জন্য কষ্টসাধ্য পুরুষকারকে অবলম্বন করিবে?' কিন্তু তাঁর এ উক্তির উদ্দেশ্য শ্রেণী সংগ্রামের প্রকৃত রূপটি উদ্ঘাটন করা, প্রকৃত ধর্মকে অস্বীকার করা বা নিন্দা করা নয়। তাঁর 'শ্রেণী-সংগ্রামবাদ' সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রজাপুঞ্জের বা সাধারণের যে শক্তি, তাই প্রকৃত সামাজিক শক্তির আধার। যে শ্রেণী এই শক্তির সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সেই শক্তিই পরাভূত হয়েছে। (বর্তমান ভারত) [ক্রমশঃ]

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

শ্রীশান্তশীল দাশ

গুরু বললেন, যা না যার কাছে,
চেয়ে নে যা চাইবার;
অর্থ, বিত্ত, যা চাইবি পাবি,
তাই দেবে মা আমার।
দারুণ অভাব, অন্ন জোটে না,
গৃহে সবে উপবাসী,
গুরুর আদেশে মা'র সম্মুখে
দাঁড়ালো শিষ্য আসি'।
মায়ের সকাশে জানাবে অভাব,
এই ছিল মনে তার,
সব গোলমাল হয়ে গেল যবে
দাঁড়ালো সমুখে মা'র।
কী যে চাই তার, সব ভুলে গেল
চেয়ে মা'র মুখ পানে;
'শুদ্ধা ভক্তি দাও মাগো দাও'
কে শেখালো কে তা জানে!
ব'লে জোড়কর, 'দাও মা বিবেক,
দাও গো বিরাগ দাও,
আর কিছু মাগো চাই না, আমায়
ও চরণে তুলে নাও।
ফিরে এলে গুরু জিজ্ঞাসে তারে,
'চেয়েছিস্ ঠিক মতো?'
'পারিনি বিশ্বজননীর কাছে
চাইতে তুচ্ছ যত;
চেয়েছি ভক্তি, জ্ঞান বৈরাগ'—
গুরু প্রসন্ন-মন;
শিষ্য তাহার যোগ্য শিষ্য,
আশঙ্কা অকারণ।*

* শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের কথোপকথন অবলম্বনে।

স্বামীজীর বাণী

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মশতবার্ষিকী আমরা পালন করছি। তাঁর তিরোধানের পর প্রায় ৬০ বৎসর ধরে এই শুভ জন্মদিনে আমরা তাঁকে স্মরণ ক'রে এসেছি। তাঁর কথা ও উপদেশ আলোচনা করেছি। যত দিন যাচ্ছে, ততই ক্রমশঃ যুগাবতার রামকৃষ্ণের বাণী—যা প্রচার করবার জন্য স্বামীজীর আবির্ভাব, তা জগতে বহু নরনারী ক্রমশঃ গ্রহণ করছে—আমরা চোখের সামনে দেখছি। বিগত একশত বৎসরের পরিপ্রেক্ষিতে আজ স্বামীজীর বাণী এই বৎসরব্যাপী ও পৃথিবীব্যাপী শতবার্ষিক উৎসবের মাধ্যমে আরও নানা-ক্ষেত্রে সঞ্চারিত ও ব্যাপ্ত হয়ে পড়ুক ভারতের কল্যাণে ও বিশ্বের কল্যাণে—তাই আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। স্বামীজী নিজেই ব'লে গেছেন, 'যা দিয়ে গেলুম, তা দেড় হাজার বছরের খোরাক।' সুতরাং কত শতবার্ষিকীর প্রয়োজন হবে—জগৎকে তাঁর বাণী গ্রহণ করতে! তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমাদের মতো সামান্য মানুষের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁর বহুমুখী প্রতিভায় ও ভগবৎসত্তা উপলব্ধি-করা বিরাট্ মনে নানাবিষয়ে যে-সব উপদেশ-মালা ও কার্যকলাপ রেখে গেছেন, সেগুলি আজ স্মরণীয় ও পালনীয়।

স্বামীজী কি ও কে, এবং যুগাবতার রামকৃষ্ণ কি ও কে—এ প্রশ্নের উত্তর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। দু-জনেই দু-জনকে যাচাই ক'রে নিয়েছেন। ষোল বছরের তরুণ ছাত্র নরেন—পাশ্চাত্য-দর্শন ও প্রাচ্যদর্শন পড়ে তার মনে বিরাট্ জিজ্ঞাসা জেগেছে—ভগবান কে, কি, কোথায়? ছুটলেন নৌকাবক্ষে ধ্যানরত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে। 'আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?'—প্রশ্ন করলেন। মহর্ষি তাঁর তেজোদীপ্ত চক্ষু দেখে তাঁকে বললেন, 'তুমি জানবে তাঁকে।' সন্তুষ্ট হলেন না, ফিরে এলেন নরেন্দ্র। শুনলেন দক্ষিণেশ্বরে এক পাগলা বামুন নাকি ভবতারিণী কালীর পূজা করে, তাঁর সঙ্গে কথা কয়, ভগবানের নাম করতে করতে সমাধিস্থ হয়। ছুটলেন সেই দেবমানব-দর্শনে দক্ষিণেশ্বরে। তার আগে ব্রাহ্মসমাজে ঘুরেছেন মহাত্মা কেশব-চন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে। মনের ক্ষুধা মেটেনি। মনোরাজ্যে প্রচণ্ড ঝড় বইছে।

এমন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলন হ'ল নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণের। প্রথম দর্শনেই আনন্দাশ্রু বিসর্জন ক'রে হাত জোড় ক'রে বললেন, 'এতদিন পরে আসতে হয়? আমি তোর জন্যে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় আছি—তা কি একবার ভাবতে নেই? পরক্ষণেই দর-বিগলিতধারে হাত জোড় ক'রে বললেন, 'জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি দূর করতে পুনরায় শরীর ধারণ করেছ।' নরেন্দ্র অবাক্ এই অদ্ভুত আচরণে, ভাবলেন—'এ কাকে দেখতে এসেছি—এ তো একেবারে উন্মাদ!' ভগবানকে দেখা যায় কিনা—এ প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'হাঁগো, তাঁকে দেখা যায়। তোমাদের যেমন দেখছি, তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, ঈশ্বরকেও তেমনি দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়।'

বাড়ি ফিরে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভুলতে পারেন না। দিনরাত সর্বক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা তাঁকে অস্থির ক'রে তুলেছিল। অনেক চিন্তায় চঞ্চল হয়ে একদিন একাকী দক্ষিণেশ্বরে ছুটলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। আনন্দে অধীর হয়ে 'এসেছিস' ব'লে হাত ধরতেই চকিতে ঠাকুরের অদ্ভুত ভাবান্তর হ'ল।

তার পরের ঘটনা নরেন্দ্রনাথ নিজেই বিবৃত করেছেন: 'ঐ স্পর্শমাত্রই মুহূর্তে আমার এক অপূর্ব অনুভূতি হ'ল। চোখ চেয়ে আছি, দেখলুম—দেওয়াল-সমেত সব জিনিস-পত্র বেগে কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে।'

নরেন্দ্রের দম্ভের উপর প্রচণ্ড আঘাত প'ড়ল, ঐশী শক্তির কাছে তিনি কতটা অসহায় শিশু! তথাপি তিনি বিশ্লেষকের মন নিয়ে ভাল ক'রে বুঝতে চান। এইরূপ পরস্পর যাচাই করার কাজই কিছুদিন ধরে চ'লল। যত দিন যায়, নরেন ভাবেন, রামকৃষ্ণ বিশেষ শক্তিশালী মহাপুরুষ—দেবমানব। দিনের পর দিন নানা প্রসঙ্গে নরেনকে ঠাকুর প্রস্তুত করেছিলেন তাঁর যুগধর্ম-প্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্ররূপে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'নরেন লোকশিক্ষা দেবে।' আরও একদিন নরেনকে স্পর্শ ক'রে ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। নরেনের চোখের সামনে থেকে সরে গেল একখানি পর্দা। তিনি সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করতে লাগলেন। ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তি বিদ্রোহী নরেনকে বশীভূত ক'রল। তিনি ক্রমে ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণকে পথপ্রদর্শক গুরু ব'লে মেনে নিলেন। কিন্তু তথাপি ভগবান ব'লে স্থির বিশ্বাস হয়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপ্রস্থানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। দারুণ রোগযন্ত্রণায় কাতর শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ অবস্থায় পাশে বসে নরেনের মনে হ'ল, 'এখন যদি তিনি বলতে পারেন—তিনি অবতার, তবে বিশ্বাস করি।' আশ্চর্য—নরেনের মনে ঐ চিন্তা উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর তাঁকে সহজ কণ্ঠে বললেন, 'এখনও অবিশ্বাস—সত্যি বলছি—যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং একাধারে রামকৃষ্ণ।' বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত হলেন নরেন্দ্রনাথ। পার্থকে যন্ত্র ক'রে বিশ্বরূপ দেখিয়ে যেমন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ধর্ম-সংস্থাপন কার্য সুসম্পন্ন করেছিলেন, তেমনি বিবেকানন্দকে যন্ত্র করেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যুগবাণী উপস্থাপিত করেছিলেন জগতের সামনে।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তিনটি বিশেষ বাণী দিয়ে গেছেন জগৎকে তাঁর আচরণে ও উপদেশে। প্রথম—শিবজ্ঞানে জীবসেবা। দ্বিতীয়—ধর্মসমন্বয় বা যত মত তত পথ। তৃতীয়—নারীতে মাতৃবুদ্ধি। 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়।' তিনি নিজে সকল ধর্ম পালন ক'রে প্রত্যক্ষ করেছেন—ধর্মপথ। সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক—গন্তব্যস্থান এক। ভগবানকে উপলব্ধি করাই ধর্ম। নিজের সহধর্মিণী সারদাদেবীর সঙ্গে দিব্য সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে তাঁকে ষোড়শীরূপে পূজা ক'রে সাধক-জীবনের উচ্চতম স্তরে পৌঁছবার শিক্ষা দিয়ে সকল নারীর মধ্যে মাতৃশক্তির বিকাশ দেখিয়ে গেছেন। ঐ দুইটি বিষয়ে এবং 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মর্মকথা জগদ্বাসীকে শোনাবার ও বিশ্বকল্যাণে প্রচার করবার ভার দেবার জন্য ঠাকুর প্রিয় শিষ্য এবং যোগ্যপাত্র নরেন্দ্র-নাথকে প্রস্তুত করেছিলেন।

একদিন ঈশ্বরের কথা-প্রসঙ্গে ভক্তদের মধ্যে যখন বৈষ্ণব ধর্মের 'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন' বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে,

হঠাৎ সর্বজীবে দয়া বলতে বলতে ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। কিছুক্ষণ পর প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি আপন মনেই বলছেন, 'জীবে দয়া! জীবে দয়া! কীটাণুকীট তুই, জীবকে দয়া করবার তুই কে? না—না, জীবে দয়া নয়। শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' এ-কথা সেদিন সকলেই শুনেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসে সকলকে বললেন, কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় পেলুম। ঠাকুর ভাবাবেশে যা বললেন, তাতে বোঝা গেল বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায় মানুষ যা করছে, তা সবই করুক, তাতে ক্ষতি নেই—কেবল প্রাণের সঙ্গে এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করলেই হ'ল যে, ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তার সম্মুখে প্রকাশিত রয়েছেন। শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে করতে শুদ্ধচিত্ত হয়ে সে স্বল্পকালের মধ্যেই আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ ও শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব ব'লে ধারণা করতে পারবে। নরেন্দ্রনাথ সেদিন বললেন, 'ভগবান যদি কখন দিন দেন তো আজ যা শুনলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার ক'রব; পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল—সকলকে শুনিয়ে মোহিত ক'রব।'

এই বাণীর মর্মকথা প্রচার করতেই তিনি ঠাকুরের তিরোধানের পর তিন বৎসর পরিব্রাজক সন্ন্যাসী-রূপে সারা ভারত ভ্রমণ করেছেন, সাগর লঙ্ঘন ক'রে সুদূর আমেরিকায় চিকাগোর ধর্মসভায় গিয়েছিলেন—ছয় বৎসর ধ'রে আমেরিকা-ইংলণ্ডে প্রচার ক'রে বেড়িয়েছেন ভারতের শাশ্বত বাণী: সকল মানুষই ভগবানের শক্তির প্রকাশ। মানুষ অনন্ত শক্তির অধিকারী সব মানুষই এক। মানুষকে সেবা করাই ভগবানের পূজা করা।

সকলের ভিতর ব্রহ্ম-চেতনা জাগ্রত করাই ছিল—তাঁর জীবনের ব্রত। বস্তুতন্ত্রবাদের চাপে নিপীড়িত পাশ্চাত্য জগতের শান্তির বুভুক্ষা মেটাতে দান ক'রে এসেছেন ভারতের অধ্যাত্মবাদ ও বেদান্তের বাণী এবং পরাধীন ভারতের অসংখ্য পার্থিব অভাব মেটাবার জন্য গ্রহণ করেছিলেন বিজ্ঞানের কল্যাণ-হস্ত। বস্তুতন্ত্রবাদ ও অধ্যাত্মবাদের অপূর্ব সমন্বয়ে শুধু নিদ্রিত ভারতকে জাগ্রত করবার পথই প্রশস্ত করেননি, রচনা করেছেন বিশ্বপ্রেম বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তির বিশাল ভিত্তি।

এই কার্যে তাঁর অসংখ্য পত্রাবলী ও অজস্র বক্তৃতায়. সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠায় এবং তাঁর গঠনমূলক কর্মধারায় নানাবিষয়ে জাতিকে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থায় শুধু অনুপ্রাণিত ক'রে যাননি, তাঁর আদর্শে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের চিত্র ও কর্মপন্থা এঁকে গেছেন—ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে নানাবিষয়ে চিন্তা ও কর্মের উপদেশের মাধ্যমে। কর্মের সে বাণী শুধু ধর্ম ও বেদান্তের বাণী নয়—তাতে ছিল স্বাধীনতার বাণী, সংগঠনের বাণী, দুঃস্থ দলিত প্রপীড়িতদের উদ্ধার ক'রে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করার বাণী। আর ছিল দেশসেবা ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার তূর্যধ্বনি। তাঁর ভাষণ ও রচনার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—'অভী হও, নির্ভীক হও। বীর হও।'

* ১৭ই জানুআরি বেলুড় মঠে ও মহাজাতি সদনে বক্তৃতার সারমর্ম অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত 'শিক্ষাষ্টকে'র রূপায়ণ

[গত কার্ত্তিক সংখ্যার পর]

শ্রীমতী সুধা সেন

যিনি স্রষ্টা তিনিই সৃষ্টি—আবার তিনি তদতিরিক্ত, যিনি রূপকার তিনিই রূপ—আবার অরূপ, অবিচিন্ত্য এই ভেদাভেদ তত্ত্ব, এই পুরুষোত্তমের লীলা দুরবগাহ, মনবুদ্ধির অগোচর এই অমূর্ত ব্রহ্মের মূর্ত প্রকাশ!

মহাপ্রভু জীবনশিল্পী; কত কঠিন পাষাণসম জীবনে আনিয়াছেন সুষমা ও সৌকুমার্য, কত বিচিত্র বর্ণে ও রেখায় অঙ্কিত করিয়াছেন এক একটি চিত্র, কত কথায় আর কত সুরে রচনা করিয়াছেন একটি অখণ্ড সঙ্গীত; সেই সঙ্গীত ধরণীর সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে অসীম অনন্তলোকে, কাহার যেন চরণ ছুঁইবার আশায়! যিনি সাধক, যিনি রসবেত্তা—তিনিই অন্তরে এই শিল্প ও সঙ্গীতের রস উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

পথিক বাহির হইয়াছেন পথে, সম্মুখে দিগন্তবিস্তারী বহু পথরেখা, কিন্তু সমস্ত পথই দুর্গম! মহাজনেরা বিভিন্ন পথের নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন, সমস্ত নিশানাই অবশেষে পথিককে লইয়া যাইতেছে এক লক্ষ্যে—একই তীর্থমন্দিরে।

মহাপ্রভু-প্রদর্শিত পথের মাঝে মাঝেই ছায়াশীতল পান্থশালা—সেই পান্থশালায় বিশ্রাম করিয়া, অনন্ত জীবনের প্রেরণালাভ করিয়া পথিক চলিয়াছেন চিন্ময় ব্রজধামের পানে, চির প্রেমের তীর্থে!

ফুল্ল-কুসুমিত বৃন্দাবন আজ শারদ-পূর্ণিমার গলিত-শুভ্র রজত-ধারায় প্লাবিত, বাতাস সুগন্ধবহ, প্রকৃতি পুলকিত!

'ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥'

—শ্রীমদ্ভাঃ ১০।২৯।১

—ষড়ৈশ্বর্য-যুক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও শরৎ-কালীন বিকশিত মল্লিকা-পুষ্পে সুশোভিত রজনী অবলোকন করিয়া যোগমায়া অবলম্বনে (যেহেতু তিনি আত্মক্রীড়, আত্মারাম) গোপীগণের নিকটে প্রতিশ্রুত ক্রীড়া করিতে মনস্থ করিলেন।

'দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥'

—শ্রীমদ্ভাঃ ১০।২৯।৩

—নবকুঙ্কুমের ন্যায় অরুণবর্ণ, অখণ্ড মণ্ডল, কুমুদবিকাশশীল রমানন-সদৃশ চন্দ্রকে দর্শন করিয়া এবং তাহার কোমল কিরণে সুরঞ্জিত বনস্থলী দর্শন করিয়া তিনি সুনয়নাগণের মনোহর অব্যক্ত মধুর গান করিয়াছিলেন—পক্ষান্তরে জগৎচিত্ত আকর্ষণকারী বীজ 'ক্লীং' উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

পরমকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের সেই গীত শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণগৃহীতমানসা পরমসৌভাগ্যশালিনী পরম-প্রেমিকা ব্রজগোপীগণ প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্রুত আগমন করিতে লাগিলেন। গৃহকর্মরতা কোন গোপী অসমাপ্ত গৃহকর্ম ফেলিয়া রাখিয়াই ছুটিয়া চলিলেন, পতি বা গুরুজনের সেবানিরতা কোন গোপবধূ কর্তব্য ত্যাগ করিয়াই চলিলেন পরমপতির

উদ্দেশ্যে, প্রসাধনরতা কোন গোপী চরণের নূপুর মণিবন্ধে ধারণ করিয়া, অধীর চরণে ছুটিয়া চলিলেন অজানিত পথে। বহু-প্রতীক্ষিত রজনী আজ যদি আসিয়াই থাকে, শুভলগ্নের যদি উদয় হইয়াই থাকে, আজ তবে আর কিসের বাধা, কিসেরই বা বন্ধন ?

কানের ভিতর দিয়া বাঁশরির সুর মরমে প্রবেশ করিয়া প্রাণ আকুল করিলেও যে গোপী গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিলেন না, পতি কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন, নিরুপায় কৃষ্ণগত-চিন্তা সেই গোপী নয়ন নিমীলিত করিয়া কৃষ্ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন।

'দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥'
—শ্রীমদ্ভাঃ ১০।২৯।১০

—প্রিয়তমের দুঃসহ বিরহতাপে সেই গোপীর সমুদয় অশুভ বিনষ্ট হইল এবং ধ্যান-যোগে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দের উদয়ে তাঁহার সমস্ত পুণ্যও ক্ষীণ হইল এবং কৃষ্ণগত-চিন্তা হইয়া ধ্যানে সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া গোপী 'জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ' (শ্রীমদ্ভাঃ ১০।২৯।১১) সহজেই এই 'গুণময়' দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় দেহে কৃষ্ণ-সঙ্গে চিরমিলিতা হইলেন। সমাগতা গোপীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া বাগ্‌বিদগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি গোপীগণের কোন্ প্রিয়কার্য সাধন করিতে পারেন ?

গোপীগণের কুশল, ব্রজের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বৃন্দাবনের শোভা-সৌন্দর্যের কথা বলিয়া কিছুক্ষণ পরেই পরম-আকাঙ্ক্ষিত মিলনলগ্নের প্রথম অভ্যুদয়েই গোপীজন-মনোহর শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠুর বাক্যে গোপীগণকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। আর্যধর্ম, গৃহধর্ম, পতিসেবা প্রভৃতির সারবত্তা প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীগণকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ, তথা আদেশ করিতে লাগিলেন, তখন অপরিসীম বেদনা ও বিস্ময়ে গোপীগণের চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, অনাথার মতো ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্তম্ভিত মূর্ছিতপ্রায় গোপীগণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আজ বৃন্দাবনে প্রিয়তমের বাঁশরি বাজিয়াছে, যে ধ্বনি শুনিবার আশায় কত মধুযামিনীর অতন্দ্র প্রহরগুলি বৃথাই কাটিয়া গিয়াছে, পল পল গনিয়া দিবস হইয়াছে—দিবস গনিতে গনিতে মাস, মাস গনিতে গনিতে বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, তবুও যমুনা-পুলিনে বাঁশরি বাজে নাই, আজ যদি সেই ঘর-ছাড়ানো বাঁশী বাজিয়া প্রাণ আকুল করিলই, তবে আবার সেই ঘরে ফিরিব কেমন করিয়া ? অশ্রুসজল নয়নে গোপীগণ বলিলেন, 'ওগো নিষ্ঠুর দয়িত ! যে স্রোতোধারা আপন উৎসমুখ ত্যাগ করিয়া দুর্বার বেগে ছুটিয়া আসিয়াছে সাগরসঙ্গমে, সে আবার কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইবে গিরিগুহার বন্ধনে, তাহার উৎসমুখে ?'

তোমার এই বংশীধ্বনি তো শুধু আমাদেরই আকর্ষণ করিয়া আনে নাই, তুমি কি দেখিতে পাও না, এই ধ্বনি শুনিয়া আজ 'দরবহি দারু মুঞ্জরেণব পল্লব, যমুনা বহত উজান' কঠিন শিলা দ্রব হইয়া সুধাধারা নির্গত হইতেছে, শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হইতেছে, যমুনা উজান বহিতেছে, কৃষ্ণসার মৃগের বক্ষ ত্যাগ করিয়া মৃগী তোমার মুখকমল দর্শনের আশায় ছুটিয়া আসিতেছে, বৃক্ষরাজি পুলকাবলী ধারণ করিয়াছে, তাহাদের রোমাঞ্চিত দেহ হইতে মধুক্ষরণ হইতেছে, আকাশ বাতাস আজ মধুময় —'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।'

বাঁশীর সুরে অপহৃতচিত্তা মুগ্ধা বিবশা আমাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়া এখন তুমি আমাদের প্রত্যাখ্যান করিতেছ—হে কপট! ইহাই কি তোমার ধর্ম?

শুধু আমাদের ধর্ম উপদেশ দিয়া তুমি আর কি করিবে? তোমার এই বাঁশীর সুরে 'সতী ছাড়ে নিজ পতি'—তাহা কি তুমি নিজেই জানো না? তুমিই তো পতির পতি—পরম পতি, তোমাকে ছাড়িয়া আবার কোন্ পতির কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য তুমি আমাদের বলিতেছ?

ব্রহ্মবাদিনী জ্ঞানদীপ্তা মৈত্রেয়ী যেমন বলিয়াছিলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্'—গৃহবাসিনী গ্রাম্য গোপললনাগণ গলদশ্রুনয়নে তাহাই জানাইতে চাহিলেন অন্তরের আকুল ভাষায়! ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাদের হয়তো জানা ছিল না, কিন্তু অন্তরে ছিল সর্বস্ব-সমর্পণ-করা, সর্বগ্রাসী প্রেম! বৃন্দাবনের সেই অহৈতুকী নিষ্কাম প্রেমের সৌগন্ধে মাধুর্যে আপনাকে হারাইয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ—নির্গুণ নিরাসক্ত পূর্ণ ব্রহ্ম!

ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য একদিন গভীর উদাত্ত স্বরে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিয়াছিলেন:

ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো
ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।...
ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং
ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।
আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন
শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেদং সর্বং বিদিতম্।

—হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ী, পতির জন্যই যে পতি প্রিয় হন, তাহা নহে; আত্মার জন্যই পতি প্রিয় হন। সর্ব বস্তুর জন্যই যে সর্ব বস্তু প্রিয় হয়, তাহা নহে; আত্মার জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় হয়।

অতএব হে মৈত্রেয়ী, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়; হে প্রিয়ে, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার দর্শন হইলেই এই সমস্ত বিদিত হয়।

দীর্ঘকালের মনন নিদিধ্যাসন ও বংশীধ্বনি শ্রবণ এবং সমস্ত মনপ্রাণ ভরিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান দ্বারা আজ গোপীগণও সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরমাত্মার দর্শন লাভ করিলেন, তাই আর কুল শীল মান ও গৃহ-ধর্মের কোন সার্থকতাই তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন না, পরমপতির সন্ধান পাইয়া আজ আর পতিনামধারী দেহসর্বস্ব মানুষের কোন প্রয়োজনই তাঁহাদের কাছে রহিল না।

ভক্ত ভগবানের মিলন, কিন্তু তাহা কি এতই সহজলভ্য? দুঃখের নিকষ কষ্টিপাথরে সুবর্ণদ্যুতির পরীক্ষা না করিয়া জহুরী কি সহজেই সুবর্ণ গ্রহণ করেন?

শুদ্ধ গোপীপ্রেমের মাধুর্যে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনার হ্লাদিনী শক্তির সঙ্গে সহর্ষে মিলিত হইলেন। অমৃতলোক হইতে সুরধ্বনি নামিয়া আসিয়া ব্রজের আকাশ-বাতাস পূর্ণ করিয়া তুলিল, গগনের চাঁদ আজ মর্ত্যের কোটি চাঁদের জ্যোৎস্নাধারায় আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন।

পরমানন্দে মধুর সঙ্গীতধারায় বনস্থলী প্লাবিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে যখন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের মনে 'অহং-'এর উদয় হইল, ভাবিলেন জগতে নিশ্চয়ই আমরাই শ্রেষ্ঠা, নতুবা বিশ্বপতি আমাদেরই পতিরূপে আমাদের সঙ্গে অবস্থান করিবেন কেন?

আত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইয়াছেন, তথাপি যেন এখনও আছে আমিত্বের একটু আভাস—ভগবান্ সহসা অন্তর্হিত হইলেন।

ভক্ত ভগবানের লীলা—একজনকে বাদ দিলে অপর অসম্পূর্ণ। গোপীগণ ক্ষুব্ধ হইলেন, লজ্জিত হইলেন। এইবার আরম্ভ হইল 'আমি'র বিলোপ, 'তুমি'র অনুসন্ধান—'কোথায় পরমগতি, কোথায় তুমি ব্রজনাথ! দর্শন দাও।'

বনে বনে কুঞ্জে কুঞ্জে খুঁজিয়াও যখন কৃষ্ণের দর্শন মিলিল না, তখন উন্মাদিনী গোপীগণ 'পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্' (ভাঃ ১০।৩০।৪)—যিনি আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান, বৃক্ষগণের নিকট সেই পরমপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন: হে অশ্বত্থ, হে অশোক, হে কুরুবক! যিনি সপ্রেম হাস্য এবং সবিলাস অবলোকন দ্বারা আমাদের মন হরণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ?

বৃক্ষরাজি যখন গোপীগণের ব্যাকুল প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না, তখন গোপীগণ ভাবিলেন—ইহারা পুরুষ জাতি, সুতরাং কৃষ্ণপক্ষ, কাজেই ইহারা জানিয়াও হয়তো কিছুই বলিবে না, তাই আরও অধীর হইয়া নারী পরম পবিত্রা তুলসীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে তুলসি! হে কল্যাণি! হে গোবিন্দ-চরণপ্রিয়ে, যিনি ভ্রমরগণ সহ সর্বদা তোমাকে ধারণ করেন, যিনি তোমার অতিশয় প্রিয়, তুমি কি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছ?'

তুলসীও নির্বাক্ হইয়া রহিলেন, মল্লিকা মালতী যূথিকা কেহই যখন এই আকুল প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না, তখন গোপীগণ ভাবিলেন ইঁহারা কৃষ্ণদাসী, কাজেই কিছুতেই প্রভুর কথা বলিবেন না। তখন পৃথিবী, লতা গুল্ম, হরিণ-হরিণী প্রভৃতি চেতন-অচেতন সমস্ত পদার্থকেই গোপীগণ কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না।

এইবার গোপীদের চিত্তের ব্যাকুলতা এত তীব্র হইল এবং কৃষ্ণ-তন্ময়তা এত প্রগাঢ় হইল যে, গোপীগণ প্রত্যেকেই—

'ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥'

—ভাঃ ১০।৩০।১৪

—এইপ্রকার উন্মত্তবৎ প্রলাপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ নিমিত্ত এত ব্যাকুল হইলেন যে, তদাত্মিকা অর্থাৎ কৃষ্ণময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ যেরূপ ব্রহ্মই হইয়া যান, পরম প্রেমবতী গোপীগণও সেইরূপ প্রেমাস্পদই হইয়া গেলেন, ধ্যান ধ্যাতা ধ্যেয়-রস ও রসিক একীভূত হইয়া গেলেন।

কতক্ষণ এই মহাপ্রেমসমাধির মধ্যেই কাটিয়া গেল, কিন্তু সুতীব্র বিরহ-ব্যথার দহনে আবার গোপীগণ ব্যথিতা হইলেন, কিন্তু কৃষ্ণ-দর্শন মিলিল না। অধিকন্তু দেখিতে পাইলেন, একমাত্র যে গোপীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, সেই গোপীও কৃষ্ণ কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া অধীর কণ্ঠে

'হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥'

—ভাঃ ১০।৩০।৩৯

—'হা নাথ, হা রমণ, হে মহাবাহো! কোথায় তুমি? হে সখে! আমি অতি দীনা, তোমার দাসী, তুমি দেখা দাও' বলিয়া অতি করুণ স্বরে রোদন করিতেছেন, তখন গোপীযূথও আর ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না, সকলের আর্তক্রন্দনে ব্রজস্থলীও যেন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। গোপীগণ সমস্বরে কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন—হে দুঃখহর! হে ব্রজজন-আর্তিনাশন! তোমার বদন-কমলের রূপসুধা

একবার এই কিঙ্করীদের পান করাও, আমাদের বিরহতপ্ত জীবনে তোমার কথামৃত দ্বারা আমাদের সিক্ত কর। হে নাথ! কেমন করিয়া তোমার বিরহ সহ্য করিব বলো?

'অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড়
উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥'

—ভাঃ ১০।৩১।১৫

—হে নাথ, দিবসে যখন তুমি কাননে গমন কর, তখন তোমার অদর্শনে ক্ষণার্ধকালও যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং দিবাবসানে তুমি প্রত্যাগত হইলে তোমার কুঞ্চিত কুন্তলাবৃত শ্রীমুখ দর্শন করিতে চক্ষুর নিমেষমাত্র ব্যবধানও অসহ্যবোধ হওয়ায় চক্ষুর পক্ষ্ম-নির্মাণকারী বিধাতাপুরুষ মন্দ (অবিবেচক) বলিয়া আমাদের কাছে গণ্য হন—কেন বিধাতাপুরুষ তোমার রূপদর্শনের জন্য কোটি নেত্র দিলেন না—দিলেন শুধু দুই নয়ন—তাহাতে আবার নিমেষ দিলেন কেন?

'কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই,
তাহাতে নিমেষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি।'

—'হে কৃষ্ণ, হে করুণাসিন্ধু, কৃপা কর; তোমার অদর্শন আর সহ্য হইতেছে না প্রভু! তোমার অদর্শনকালের প্রতিটি নিমেষ যেন আমাদের কাছে যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে নাথ!'

ব্রজগোপীগণের বিরহের এই সুতীব্র আর্তিই আজ মহাপ্রভুর অন্তরে আসিয়া আঘাত করিল, তাই প্রভু কৃষ্ণের ক্ষণমাত্র বিরহে অধীর হইয়া প্রলাপ কহিতে লাগিলেন:

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

(শিক্ষাষ্টকের ৭ম শ্লোক)

(শ্রীরাধা বলিলেন): 'গোবিন্দ-বিরহে আমার এক নিমেষ কাল এক যুগের মতো বিলম্বিত হইয়াছে, আমার নয়ন বর্ষাধারায় পূর্ণ হইয়াছে, সমস্ত জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে'—কৃষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজেকে রাধা, রায় রামানন্দকে বিশাখা ও স্বরূপ দামোদরকে ললিতা ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন:

'এ সখি! হমারি দুখক নাহি ওর
ই-ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া
কান্ত পাহুন, বিরহ দারুণ!
সঘন খরশর হন্তিয়া।

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে, ক্যায়সে গোঁঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।'

(বিদ্যাপতি)

—'ওরে সখি! কৃষ্ণ বিনা অধন্য এ দিন রজনী আমি কেমন করিয়া কাটাই বল্? আমার এ দুঃখের যে অবধি নাই! এই ভাদ্র মাসের ভরাবাদরে সঘনে মেঘগর্জন হইতেছে, ভুবন ভরিয়া গিয়াছে ঘন বরিষণে, এখন আমার প্রিয়তম কোথায়? আমার বিশ্বভুবন যে শূন্য হইয়া গিয়াছে সখি!

ঐ দেখ্, দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে ঘন কৃষ্ণ-মেঘে, অথির-বিজুলী চমকিত হইতেছে বার-বার, হায়রে অভাগিনী! হায়রে বিরহিণী! এই ভরাবাদরে তুই হরি বিনা কেমন করিয়া তোর দিবস-যামিনী কাটাইবি বল্?'

প্রভুর বাহ্যদশা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল, ভক্ত ভাবও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া

গিয়াছে, এখন ভিতরে বাহিরে শুধুই শ্রীরাধার ভাব, শুধুই কৃষ্ণবিরহ!

এইবার রূপকার শ্রীমতী রাধারাণী, আপন অঙ্গকান্তি হইতে স্বর্ণদ্যুতি লইয়া বিলেপন করিয়াছেন নিকষ কৃষ্ণপাথরে, আপন অন্তরের ভাব দিয়া গঠন করিয়াছেন বিগ্রহের রূপ, তাই কৃষ্ণ হইয়াছেন রাধারস-জারিততনুমন গৌর। ইহাই মহাপ্রভুর তত্ত্ব!

প্রভুর অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দ একদিন মাত্র ক্ষণিক চপলাদ্যুতির মতো দর্শন করিয়াছিলেন: 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।' আর বুঝিয়াছিলেন স্বরূপ দামোদর, তাই স্বকৃত করচায় লিখিয়া গিয়াছেন:

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্॥

—চৈ: চ:

—শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিকারস্বরূপা (কৃষ্ণপ্রেমের গাঢ়তম অবস্থা মহাভাবস্বরূপা) শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, (শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ তাই) তাঁহারা একাত্মা, কিন্তু একাত্ম-স্বরূপ হইয়াও (লীলামানসে) অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন। এক্ষণে সেই দুই দেহই একত্র 'শ্রীচৈতন্য' নামে প্রকট হইয়াছেন। এই রাধাভাব-কান্তিযুক্ত কৃষ্ণ-স্বরূপ চৈতন্যকে আমি নমস্কার করি।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই মুষ্টিমেয় দু-একজন সাধক ও দ্রষ্টার ধ্যাননেত্রে রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমের স্বরূপ ধরা পড়িয়াছিল। নতুবা তৎকালীন ভারতে ঐশ্বর্য ব্যতীত মাধুর্যের ভজন প্রায় কোথাও ছিল না ষড়ৈশ্বর্যময় শ্রীবিষ্ণু ও শক্তিরূপিণী লক্ষ্মীর পূজাই অধিকাংশ বৈষ্ণবের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। তাহা ছাড়া শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও অদ্বৈতমার্গী সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানা বিকৃতি ঢুকিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে কতিপয় সিদ্ধ সাধক ছিলেন, তাঁহাদের আলোয়ার বলা হইত। তাঁহারা ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদ-রূপেই ভজনা করিতেন। পরমসাধক দাদূ, তপস্বিনী মীরাবাঈ প্রভৃতি কয়েকজনও প্রিয়তমরূপেই ভগবান্‌কে লাভ করিবার মানসে সংসার, সুখ সমস্তই বিসর্জন দিয়াছিলেন।

কিন্তু তথাপি ঠিক শ্রীমতীর ভজনের অনুরূপ তাহা ছিল না। তাঁহাদের কৃষ্ণরতি 'সমঞ্জসা', 'সমর্থা' নহে। কৃষ্ণের জন্য কুল শীল মান লজ্জা ধর্ম ত্যাগ করা, এমন কি দেহ পর্যন্ত দান করা এবং সর্বোপরি কৃষ্ণসুখেই সুখী হওয়া—এই প্রেমে একমাত্র শ্রীমতীরই অধিকার, জগতে অপর কাহারও তাহা নাই।

অন্যের কি কথা গোপীপ্রেমের অনুরূপ অহৈতুকী প্রেম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেও ছিল না। তাই রাসস্থলী হইতে অন্তর্ধানের পর গোপীগণ যখন ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহাদের সম্মুখে পুনরাবির্ভূত হইলে গোপীগণ তাঁহার বিন্দুমাত্র দোষও দর্শন করিলেন না। কৃষ্ণদর্শন পাইয়া সজলনেত্রা গোপীগণ যখন পুলকিতাঙ্গী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধারণ করিয়া বিরহতাপ শীতল করিতে লাগিলেন, তখন যেন লজ্জিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বলিলেন:

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

—ভাঃ ১০।৩২।২২

—হে সুন্দরীগণ, আমার সহিত যে তোমাদের

এই প্রেম-সংযোগ, তাহা শুদ্ধ, নির্মল এবং তোমরা যে দুর্জর গৃহশৃঙ্খল, ঐহিক পারত্রিক সুখকর লোক ধর্ম মর্যাদা ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ, আমি অমরগণের আয়ু পাইলেও তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইব না, অতএব তোমাদের সাধুকৃত্যের দ্বারাই তাহার প্রত্যুপকার হোক।

সমগ্র বিশ্বের অধীশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভাণ্ডারে ও গোপীপ্রেমের অনুরূপ সম্পদের অভাব, তাই দীনাতিদীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন : 'হে গোপীগণ! তোমাদের এই নিষ্কাম প্রেমের ঋণ আমি পরিশোধ করিতে পারিলাম না, তাই আমি তোমাদের কাছে ঋণী হইয়াই রহিলাম।'

রসিক ভক্তগণ বলেন, এই ঋণ শোধ করিবার মানসেই শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি লইয়া কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা আরও গভীরের বার্তা জানেন তাঁহারা বলেন :

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

—চৈঃ চঃ

—শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীমতী আমার যে মাধুর্য আস্বাদন করে, তাহাই বা কিরূপ এবং ঐ মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীমতী যে আনন্দ ও সুখলাভ করেন, তাহাই বা কিরূপ—এই সমস্ত বিষয়ে লুব্ধ হইয়াই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র (রাধাভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া) শচীগর্ভ-সিন্ধুতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

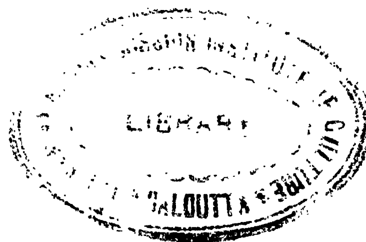
পরম সাধক, মহাকবি চণ্ডীদাস ধ্যানে যেন এইরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাই গাহিয়াছেন :

'আজু কে গো মুরলী বাজায়,
এতো কভু নহে শ্যামরায়।
ইহার গৌরবরণে করে আলো,
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল?

* * *

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে,
এরূপ হইবে কোন্ দেশে?'

ইহাই যেন গৌর-আবির্ভাবের সূচনা—কবির ধ্যানলব্ধ অস্ফুট ইঙ্গিত। (ক্রমশঃ)



স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, মহানির্বাণের অল্প কয়েকদিন পূর্বেই বুদ্ধদেব তাঁহার প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বলিয়াছিলেন, তিনি শীঘ্রই এই নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিবেন। আনন্দ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, 'প্রভু, আপনি না থাকিলে আমাদের কি দশা হইবে?' বুদ্ধ বলিলেন, 'আমি তোমাদিগকে বার বার বলিয়াছি, তোমরা আমার দিকে তাকাইও না, আমার বাণী ও উপদেশগুলি পালন করিবে। আমার অবর্তমানে আমার বাণীই যেন তোমাদিগকে পরিচালিত করে।'

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিক উৎসবে এই পুরাতন কাহিনীই মনে পড়ে। তাঁহার নশ্বর দেহ এ-জগতে নাই, কিন্তু তাঁহার বাণী ও উপদেশ আছে। আমেরিকা যাত্রা করিবার পর মাত্র দশ বৎসর তিনি এই ধরাধামে ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি যাহা বলিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, তাহা বহু গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে। গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁহার যে অসংখ্য বাণী ও উপদেশ নিহিত আছে, তাহাই বর্তমান যুগে আমাদের পথ নির্দেশ করিবে। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে ব্যক্তিগত জীবনে অথবা দেশে ও সমাজে যে-কোন সঙ্কটের অথবা সমস্যার সম্মুখীন হই না কেন, তাঁহার বাণীর মধ্যেই সেই সঙ্কট হইতে মুক্তির পথ ও সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইব। শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে তাঁহার বাণী ও উপদেশ অনুধাবন করিলে জীবনে দুঃখ ও বিপদের দিনে শান্তির পথ খুঁজিয়া পাইব; দেশের ও সমাজের সঙ্কটে—তাহা বড় বড়ই হউক না কেন—তাঁহার নির্দেশিত পথে চলিলে আমরা সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

স্বামীজীর বাণী ও উপদেশ অসংখ্য হইলেও সবগুলিই কয়েকটি মূল শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলি নূতন নহে, প্রাচীন ভারতের ঋষিরাই এই বাণীর উদ্গাতা। কিন্তু কালক্রমে আমরা এই সত্য ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাহার ফলে অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইতেছিলাম। স্বামীজী তাঁহার উদাত্ত স্বরে সেই সত্যের বাণী ঘোষণা করিয়া আমাদিগকে নবযুগের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে দেশবাসীকে ডাক দিয়া বলিয়াছেন, 'ওঠ জাগো'। মুমূর্ষু জাতিকে তিনি সঞ্জীবিত করিয়াছেন।

এই সত্যগুলির প্রথমটি—আধ্যাত্মিকতা। ইহার অর্থ এই যে, 'আমি' বলিতে এই নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর দেহকে বুঝায় না, ইহার অভ্যন্তরে যে অমর অবিনশ্বর আত্মা আছে, তাহাই প্রকৃত 'আমি'। দেহের ক্ষয় ও বিনাশ আছে, কিন্তু আত্মা অজর অমর।

দ্বিতীয় সত্যটি এই যে, আমার এই আত্মা সেই পরমাত্মারই অংশ, সৃষ্টির মূলাধার। আমরা অমৃতের পুত্র—বেদান্তের 'সোঽহম্'। সুতরাং সকল জীবই ভগবানের অংশ—সকল জীবেই ভগবান আছেন।

তৃতীয় সত্যটি এই যে, উল্লিখিত দুইটি সত্য কেবল শুনিলেই হইবে না, উপলব্ধি করিতে হইবে; জীবনের প্রতি মুহূর্তে—প্রতি কার্যে যেন এই উপলব্ধি দ্বারা আমরা পরিচালিত হই।

চতুর্থ সত্যটি এই যে, এইরূপ উপলব্ধির জন্য চাই ত্যাগ। ত্যাগ নেতিবাচক বর্জনমাত্র

নয়—ক্ষণস্থায়ী দৈহিক সুখ বর্জন করিয়া উচ্চতর স্থায়ী আনন্দ অর্জনের চেষ্টা; সেই আনন্দ-রসের সন্ধান পাইলে ঐহিক সকল আনন্দই অসার ও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে।

ব্যক্তিগত জীবনে এই সত্য-চতুষ্টয়ের প্রভাব যে কত বড়, তাহা ব্যক্তিগত অনুভূতি ও পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। এ-বিষয়ে নিজের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলিতে হইবে। তবে জীবনের নানা ক্ষেত্রে ও নানা অবস্থায় এই সত্য-প্রয়োগের বিভিন্ন পন্থার নির্দেশও স্বামীজীর বাণী ও উপদেশের মধ্যে পাওয়া যাইবে। দেশের ও সমাজের সম্বন্ধে স্বামীজী যাহা বলিয়াছেন, তাহাও ঐ সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে অভিভূত ভারতবাসী যখন নিজের অতীত গৌরব ভুলিয়াছিল এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাহীন উদ্যমহীন হইয়া পৃথিবীতে নিজেকে ধিক্কৃত ও ঘৃণিত মনে করিয়া তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সেই সময় স্বামীজী তাহাদিগকে প্রাচীন শাশ্বত সত্যের বাণী শুনাইয়াই আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। জগৎ-সভায় সেই শাশ্বত বাণীর ঘোষণা দ্বারা তিনি যেদিন হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচার করিয়া বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই দিনই এই আত্মবিস্মৃত হিন্দুজাতির মনে আত্মপ্রত্যয় জাগাইয়া তিনি এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন। 'পাশ্চাত্যের জড় শক্তি অপেক্ষা যে ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি অনেক শ্রেষ্ঠ এবং ভারতবাসীকে বাঁচিতে হইলে যে পুনরায় সেই আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে—এই সত্যই তিনি বার বার নানাভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান পুণ্যভূমি ভারত না জাগিলে জগতে ধর্মের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। আধ্যাত্মিকতা হইতেই স্বদেশ-প্রেমের উদ্ভব। পরপদদলিত পরাধীন ভারত-বাসীকে আবার উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিন্তু 'ভারতবাসী' বলিতে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোককে বুঝায় না। এ-দেশের কোটি কোটি অশিক্ষিত দরিদ্র অন্ত্যজ ঘৃণিত অবহেলিত অপমানিত নিরন্ন অধিবাসী লইয়াই ভারত। ইহাদিগের মধ্যে দৈহিক মানসিক নৈতিক শক্তি জাগাইতে হইবে, তাহার পূর্বে ইহাদের অন্ন ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা চাই। শাশ্বত সত্য অনুযায়ী সকলেই আমার ভাই—বিরাটের অংশ; সুতরাং ইহাদের সেবাই ভগবানের সেবা। এই দরিদ্র-নারায়ণের পূজার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম প্রতিষ্ঠিত। অস্পৃশ্যতা ও আনুষঙ্গিক আচার সংস্কার ও অনুষ্ঠানের ফলে ধর্মের মূল সত্য বাদ দিয়া হিন্দু ধর্ম যে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে—ইহাই তিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া-ছেন। ইহারই ফলে যে আমরা সর্বনাশা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি, পুনরায় সেই শাশ্বত সত্যের আশ্রয় না লইলে যে এ-জাতির উদ্ধার নাই এবং উদ্ধার-লাভের উপায় কি, তাহাও স্বামীজী নির্দেশ করিয়াছেন।

বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম-সম্প্রদায় ও প্রাদেশিক মনোবৃত্তি আমাদের একজাতি-গঠনের প্রধান অন্তরায়—ইহা উপলব্ধি করিয়া আমাদের নেতাগণ ঐক্য-সাধনের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। এ-বিষয়েও স্বামীজীর স্পষ্ট নির্দেশ এই যে, ভারতের ঐক্য আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যাহারা পরধর্মসহিষ্ণু এবং আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করে, তাহাদের সমবায়েই এই জাতি সংগঠিত হইবে, ধর্ম-সম্প্রদায় হিসাবে তাহারা

হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান—যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। ইহা ভিন্ন ভারতের জাতীয়তাবাদের আর কোন ভিত্তি সম্ভবপর নয়, ইহাই স্বামীজীর মত।

অনেকে জাতীয়তাবাদকে সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন এবং বিশ্বমানবতার আদর্শকেই ইহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। কিন্তু এখানেও স্বামীজীর স্পষ্ট নির্দেশ এই যে, ভারতে আধ্যাত্মিকতার বলে বলীয়ান্ এক জাতির অভ্যুত্থান হইলেই ভারত বিশ্বমানবের মুক্তির পথ নির্দেশ করিতে পারিবে। আধ্যাত্মিকতার মহৎ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই বিশ্ববাসী বুঝিতে পারিবে, তাহারা সকলেই ভাই ভাই—কেবল তখনই জগতে ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বের সংঘাত থামিবে, নচেৎ বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র জগৎ ধ্বংস করিবে। ভারতে আধ্যাত্মিকতার উপর জাতীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তবেই ভারতীয় আদর্শ ও উপদেশ বিশ্বের মানব গ্রহণ করিবে ও ত্রাণ পাইবে। নচেৎ কেহই ভারতের বাণী শুনিবে না বা তাহার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে যে নবযুগের বার্তা আনিয়াছেন ও পথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার প্রভাব আমরা সর্বত্রই দেখিতে পাই। বিংশ শতাব্দীতে ভারতের তিনজন সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী—অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী—সকলেই যে স্বামীজীর বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অরবিন্দ ও গান্ধীজী ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। গান্ধীজীর 'হরিজন' স্বামীজীর 'দরিদ্রনারায়ণে'র প্রতিধ্বনি। অস্পৃশ্যতা-বর্জনে তাঁহার জীবন-উৎসর্গ—স্বামীজীর আদর্শেরই রূপায়ণ। রবীন্দ্রনাথও যে এইভাবে কতদূর অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাঁহার কবিতায় ইহার বহু নিদর্শন আছে। দু-একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

'—ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী······
—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা·
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার—।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।'

ভারতের কোটি কোটি দীন দরিদ্র লাঞ্ছিত নরনারী সম্বন্ধে এযুগের শ্রেষ্ঠ কবি অতুলনীয় ভাষায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথমে তাহা ভারতবাসীকে শুনাইয়াছিলেন। আবার স্বামীজী 'ছুঁৎমার্গ' সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ ব্যঙ্গপূর্ণ, কিন্তু কঠোর ও মর্মন্তুদ ভাষায় অধঃপতিত হিন্দুকে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাহারও প্রতিধ্বনি পাই:

'মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
* * *
শতেক শতাব্দী ধ'রে নামে শিরে অসম্মান-ভার
মানুষের নারায়ণে তবুও করোনা নমস্কার।'

এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়; কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত নবযুগের যে-বাণী অরবিন্দের সাধনায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এবং মহাত্মা গান্ধীর জীবনে ও কর্মে জীবন্ত ও মূর্তিমন্ত হইয়া দেশের প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছে, সেই বাণীর প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিয়া আমরা তদনুসারে আমাদের জীবন পরিচালিত করিব—যদি আমরা প্রত্যেকে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলেই স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকীর এই অনুষ্ঠান সফল হইবে।[১]

---

১ স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকীর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আহূত দেশপ্রিয় পার্কে ২১শে জানুয়ারির সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম।

জয়তু স্বামীজী

শ্রীমতী বিভা সরকার

এ ভারত-ভূমে মহৎ পথিক যুগঋত্বিক লহ প্রণাম!
উদিত সূর্য সম উজ্জ্বল বাংলার ভালে তোমার নাম।
মহান্ মানব তুমি গরীয়ান্ একটি জ্যোতির শিখা
হে ঋষিপ্রতিম, পরেছিলে ভালে প্রজ্ঞার জয়টিকা।

তপস্যা তব ছিল যে কঠোর দুর্দম সৈনিক!
নীলকণ্ঠের হে বরপুত্র, তুমি চির নির্ভীক।
নিজ দেশ-মার পূজার যজ্ঞে পুরোধা পথিক তুমি.
বেদ-বেদান্ত মূর্ত প্রতীক—নব শঙ্কর নমি!

জীবনে তোমার দাহন জাগালো অজ্ঞানতার জ্বালা—
তাই তপস্বী করেছিলে পণ সাজাতে জ্ঞানের ডালা।
হিমালয়-প্রাণ ছিল অম্লান প্রেম-নির্ঝরে হারা
দুঃখী আতুর হয়নি বিমুখ দ্বারে এসেছিল যারা।

জীবে সেবা হ'তে শ্রেষ্ঠ ধর্ম পাও নাই ভোলানাথ,
তাই আর্তের সেবার লাগিয়া ক'রে গেলে প্রাণপাত।
ব্যর্থ হয়নি তোমার সে দান, সার্থক তাই তুমি,
তাই তো তোমায় ভুলিতে পারে না তোমার জন্মভূমি!

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ মনীষী দীপ্ত চেতা
স্মরণধন্য ওগো বরেণ্য দুঃখ-যুগের নেতা!
মৃত এ জাতির চেতনা জাগালে অমৃত মন্ত্র দানি,
পরাধীন দেশে বন্ধুর বেশে শোনালে সত্য বাণী।

নব ভারতের নূতন যুগের সার্থক রূপকার
তোমারই স্মরণে আজিকে আমরা জানাই নমস্কার

সমাজসেবীর পত্র

'সমাজসেবী'

সৃষ্টির প্রথম হইতে মানুষ তাহার স্বরূপ সন্ধানে এবং চরম সত্যের সন্ধানে ভাঙা-গড়া উত্থান-পতন আশা-নিরাশার মধ্য দিয়া গৌরীশঙ্কর-অভিযানের মতো সমাজ-জীবনে সত্যের পথ, শান্তির পথ আবিষ্কারে বহু গবেষণা করিয়াছে, কিন্তু আদর্শ সমাজ-গঠনের পথ ও পন্থার চরম সিদ্ধান্ত আজও আবিষ্কৃত হইল না!

গত (১৩৬৯ সালে) ১৯শে পৌষ তারিখে 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র 'করো না হেলা' সম্পাদকীয় পাঠ করিয়া এই ধারণায় আসিতে পারিলাম, কেবলমাত্র মানব-জীবনে নয়, বিশ্বের সর্বত্র মহাকালের শুভ ইচ্ছায় কোন এক মুহূর্ত বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় আঁধার রাত্রির পথচারীকে পথ দেখানোর মতো স্বর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া নিজেকে শুভ মুহূর্ত বলিয়া ঘোষণা করে।

যখন ভোগ-লালসায় মোহগ্রস্ত ভারতবর্ষ হিংসার আক্রমণে জর্জরিত ও হতাশায় হত-চকিত, তখনই মহাপুরুষের বাণী ও আদর্শের উপর বিশ্বাস স্থাপনের স্বর্ণ সুযোগরূপে উপস্থিত হইল—স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী। চিন্তাশীল মহাযোগী মহাজ্ঞানী স্বামীজীর শুভ জন্ম-শতবার্ষিক অনুষ্ঠান সর্ব-প্রকারে সার্থক করিতে হইলে, স্বামীজীর প্রতি আন্তরিক ও আদর্শ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে হইলে, জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করিতে হইলে এবং সমাজকে সুগঠিত করিতে হইলে কেবলমাত্র প্রয়োজন স্বামীজীর আদর্শ উপদেশ ও নির্দেশ; অসঙ্কোচে নিঃসন্দেহে দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত উহা গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা জাতীয় সংহতি হাজার বছরের জন্য পিছাইয়া যাইবে।

সমাজ সুগঠিত করার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার শিক্ষায় উন্নীত হইতে, সকল শিল্পচর্চায় কৃতকার্য হইতে, বীর্যবান্ এবং স্বাস্থ্যবান্ হইতে, সকল অন্তঃকরণকে শুচিশুভ্র পবিত্র করিতে, যে সকল মহান্ উপদেশ স্বামীজী দিয়াছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধে 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থ হইতে তাহার অতি অল্পমাত্র অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

ভারতকে সামাজিক রাজনীতিক বন্যায় ভাসাইতে হইলে প্রথমে এদেশে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যায় ভাসাইতে হইবে। আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্য সকল শাস্ত্রে যে-সকল অপূর্ব সত্য নিহিত আছে, ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া, মঠ-সমূহ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায়-বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র ভারত-ভূমিতে তাহা ছড়াইতে হইবে; যেন ঐ সকল মহাবাক্যের ধ্বনি উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ধ্বনিত হইতে থাকে।

ধর্মই ভারতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। সুতরাং যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, জাতীয় জীবনের জীবনীশক্তি না করিয়া রাজনীতি সমাজনীতি অথবা অপর কিছু উহার স্থলে বসাও, তবে উহার ফল এই হইবে যে, তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

বাস্তবিক পক্ষে ইংলণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা আজ যেরূপ ভাবে রাজনীতিক সামাজিক উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, অজ্ঞাতসারে তাহারা এই মহান্ তত্ত্বসমূহকে ঐ সকলের মূল ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে।

যদি রক্ত তাজা ও পরিষ্কার হয়, তবে দেহে রোগ-বীজাণু বাস করিতে পারে না। ধর্মই আমাদের শোণিত-স্বরূপ। যদি সেই রক্ত চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি উহা বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি রক্ত বিশুদ্ধ হয়, রাজনীতিক সামাজিক বা অন্য কোন প্রকার বিশ্বকল্যাণজনক কর্মের সাধনায় কোন প্রকার দোষ থাকিবে না, এমন কি আমাদের দেশের ঘোর দারিদ্র্য-দোষও দূরীভূত হইয়া যাইবে।

এই প্রকার লক্ষ লক্ষ উপদেশ ও নির্দেশ স্বামীজী দিয়াছেন। সেইহেতু প্রার্থনা করি যে, বর্তমান জরুরী অবস্থায় বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার সহিত প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের যে-কোন ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমার জন্য স্বামীজীর আদর্শ উপদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন এবং বাধ্যতামূলকভাবে তাহার প্রবর্তন করিলে এবং তাহা জাতীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, জাতির জীবনে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হইবে। তাহা হইলে মহান্ তত্ত্ব এবং মহাপুরুষের বাণীর চরম সত্য উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

স্বামীজীর আদর্শ উপদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলে ভারতের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও সকলশ্রেণীর নাগরিকগণ স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আচারে বিচারে ভদ্র ও পক্ষপাত-শূন্য, স্নেহ ভালবাসা ভক্তি প্রেমে মহান্ ও উদার, জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস এবং সর্বপ্রকার শিল্পচর্চায় উন্নত, যাবতীয় খেলাধূলায় ও সামরিক শিক্ষায় সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুগ, সৎ চিন্তার মাধ্যমে দুর্নীতি-দমন, জাতীয় সংহতি ও সমাজ-জীবন সুসংযত এবং সুদৃঢ় করিতে তাঁহারা সর্বপ্রকারে সক্ষম হইবেন। আমাদের দৃঢ় ধারণা এই প্রকার শিক্ষায় ভারতের জাতীয় গৌরব গ্লানি-মুক্ত হইবে, সনাতন আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই শুভলগ্নকে বিন্দুমাত্র উপেক্ষা অথবা অবহেলা না করিয়া স্বামীজীর আদর্শ উপদেশ ও নির্দেশ মনে প্রাণে অন্তরের সহিত যদি গ্রহণ করিতে পারি, তবেই স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিক অনুষ্ঠান সার্থক হইবে, সত্য সত্যই স্বামীজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হইবে।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে নূতন প্রকাশন

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তক ও বিশেষ পত্রিকাগুলি পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি :

১. **What Religion is**—in the words of Swami Vivekananda - With a biographical introduction by Christopher Isherwood. Edited by John Yale. Pp. 224, Price 30s. net. Publisher : Phoenix House Ltd. 10-13, Bedford Street, Strand, London, W. C. 2.

২. **বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ** (সঙ্কলন) - মোহিতলাল মজুমদার। পৃষ্ঠা ১৮৪ ; মূল্য ৫৲। সঙ্কলয়িতা—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস ; প্রকাশক : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩।

৩. **ছোটদের বিবেকানন্দ**—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃষ্ঠা ৬০ ; মূল্য ৫০ ন. প.। প্রকাশক : সেক্রেটারি, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কমিটি, ১৬৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ১৪।

৪. **স্বামী বিবেকানন্দ**—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃষ্ঠা ১২৭ ; মূল্য ১৲। প্রকাশক : ঐ।

৫. **বিবেকানন্দ-শতাব্দী জয়ন্তী গ্রন্থমালা—উপনিষৎ-সঙ্কলন** (স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সহ) : **প্রথম স্তবক**। পৃষ্ঠা ১৮৩ ; মূল্য ১৲। প্রকাশক : সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন, কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা।

৬. ঐ—**দ্বিতীয় স্তবক (হিন্দী)** পৃষ্ঠা ১৭৭ ; মূল্য ১৲। প্রকাশক : ঐ।

৭. ঐ—**তৃতীয় স্তবক** (শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ সহ) ; পৃষ্ঠা ১৯৬ ; মূল্য ১৲। প্রকাশক : ঐ।

৮. ঐ—**চতুর্থ স্তবক (হিন্দী)** ; পৃষ্ঠা ১৯৩ ; মূল্য ১৲। প্রকাশক : ঐ।

৯. ঐ—**পঞ্চম স্তবক ঃ আমাদের বিবেকানন্দ**। পৃষ্ঠা ৮৪ ; মূল্য ৬ ন. প.। প্রকাশক : ঐ।

১০. **পরিব্রাজক বিবেকানন্দ**—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা। পৃষ্ঠা ২২০ ; মূল্য ২'৭৫ প্রকাশক : শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, পোঃ আড়িয়াদহ, ২৪ পরগনা।

১১. **যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ**—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃষ্ঠা ২৭২ ; মূল্য ৩৲। প্রকাশক : অধ্যক্ষ, বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ।

১২. **স্বামী বিবেকানন্দ**—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ। পৃষ্ঠা ১৬৭ ; মূল্য ৩৲। প্রকাশক : শ্রীবিজয়কুমার সিংহ, ৫৪, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২।

১৩. **স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী**—পৃষ্ঠা ২৮ ; মূল্য ২৫ ন. প.। প্রকাশক : সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর ও পুরুলিয়া।

১৪. **সঙ্কলন**—পৃষ্ঠা ৩২ ; প্রকাশক : বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বজবজ, ২৪ পরগনা।

১৫. **বিবেকানন্দ-বাণী-সংগ্রহ**—শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা ৪৫ ; মূল্য ৫০ ন. প.। প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কুমিল্লা (পূর্ব-পাকিস্তান)।

১৬. **বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী**—পৃষ্ঠা ১৬। প্রকাশক: হাওড়া কেন্দ্রীয় বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সমিতি।

১৭. **বিশ্বসমস্যায় ভারতীয় সাম্যদর্শন**—শ্রীকরুণাসিন্ধু মজুমদার। পৃষ্ঠা ৩৬; বীরভূম প্রেস, সিউড়ি হইতে মুদ্রিত।

১৮. **স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-শতাব্দী স্মারক-পুস্তিকা** (হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরেজী ভাষায়)—পৃষ্ঠা ১২০; প্রকাশক: সর্বাঙ্গী বিকাশ সঙ্ঘ, অহমদাবাদ ১।

১৯. **যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ (হিন্দী)**—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃষ্ঠা ১০৮; প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী ১।

২০. **বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ** (ওড়িয়া ভাষায়)—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১১৪; মূল্য ১৲। প্রকাশক: শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী নিখিলোৎকল নারী-কল্যাণ সমিতি, কটক।

পত্রিকা

১. **বিবেকানন্দ-শত-দীপায়ন**—পৃষ্ঠা ৩৮৫; মূল্য ৬৲। প্রকাশক: বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বজবজ, ২৪ পরগনা।

২. **The sixth Sri Ramakrishna Mela, 1963. Vivekananda Centenary Volume.** Ramakrishna Ashrama, Narendrapur, 24 Parganas.

৩. **Vivekananda Centenary Souvenir**—1962 & 1963. দুই খণ্ড: পৃষ্ঠা ১২০ ও ৭২; প্রকাশক: শ্রীধীরাজ বসু, ১৮।১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬।

৪. **Brochure: Vivekananda Birth Centenary Exhibition.** Pp. 24. প্রকাশক: রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ-মন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া।

৫. **Anirvan.** Pp. 96. প্রকাশক: রামকৃষ্ণ মিশন S.E.O.T.C., বেলুড় মঠ, হাওড়া।

৬. **উদয়রাগ**—মাখলা, সারদা জনকল্যাণ সংসদ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮৪।

৭. **The Indian Police Journal**—Vivekananda Centenary Special feature (Jan., 1963) Pp. 116. Published from 25, Akbar Road, New Delhi

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী—আরম্ভ-সংবাদ

বেলুড় মঠে

গত ৩রা মাঘ (১৭ই জানুআরি) বৃহস্পতি-বার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি দ্বারা স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবের শুভারম্ভ হয়। বেদগীতি, ভজন-সঙ্গীত, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ. কঠোপনিষৎ-পাঠ. বিশেষ পূজা, হোম, আরাত্রিক, ভোগরাগ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর মন্দির ও স্বামীজীর ঘর পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। স্বামীজীর ঘরে ভজন, মন্দির-মণ্ডপে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'-সঙ্গীত, নাটমন্দিরে কালীকীর্তন, স্বামীজীর মন্দিরে 'বিবেকানন্দ-আবির্ভাব'-লীলাগীতি অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরগুলি, উৎসব উপলক্ষে নির্মিত নহবৎ ও গেটগুলি আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। নাটমন্দিরে স্বামীজীর বিভিন্ন রকমের ২০টি সুন্দর প্রতিকৃতি বিশেষ বিশেষ বাণীসহ স্থাপন করা হয়।

অপরাহ্ণে সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত (ইংরেজীতে) তাঁহার বাণী[১] পাঠ করেন। উহার বঙ্গানুবাদও পঠিত হয়।

সভাপতির ভাষণে শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ বলেন: স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব সারা বিশ্বব্যাপী এক বিরাট ও ব্যাপক অনুষ্ঠান। স্বামীজীর বাণী নিজেদের জীবনে অনুশীলনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া আমরা যেন আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে পারি।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া বলেন: স্বামীজী ভারতবর্ষকে এক নূতন চিন্তা ও নূতন কর্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইবার আহ্বান জানাইয়া অশিক্ষা দারিদ্র্য ও অধীনতার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করিতে বলিয়াছেন।

মাননীয় মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন: নবজাগরণের যে মন্ত্র ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীকে তিনি দিয়াছেন, তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইবে।

শ্রীতামসরঞ্জন রায়ের বক্তৃতার পর স্বামী ভাষ্যানন্দ হিন্দীতে স্বামীজী-সম্বন্ধে সুলিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সভায় উদ্বোধন সঙ্গীত ও সমাপ্তি-সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন যথাক্রমে শ্রীসত্যেশ্বর ও শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রত্যূষ হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় চার লক্ষ নরনারী বেলুড়মঠ-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া স্বামীজীর প্রতি ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। ২৫,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৪ঠা মাঘ শুক্রবার অপরাহ্ণে মন্দির-মণ্ডপে স্বামীজীর রচনা হইতে পাঠ ও সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। ৫ই মাঘ শনিবার অপরাহ্ণে মঠ-মণ্ডপে বিশিষ্ট শিল্পিগিণ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

শোভাযাত্রা

৬ই মাঘ (২০শে জানুআরি) রবিবার স্বামীজীর শতবর্ষ-জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রায় ২০,০০০ নরনারীর এক বিরাট শোভাযাত্রা বেলুড় মঠ হইতে সকাল ৮ টায় বাহির হইয়া বেলা ১১-৩০ মিঃ সময়ে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে

১ এই বাণী ও বিভিন্ন ভাষায় তাহার অনুবাদ শত-বার্ষিকী কমিটি কর্তৃক বিতরিত হয়। বাংলা অনুবাদ গত মাসে উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছে।

পৌঁছে। মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি, বেদগীতির ঝঙ্কার, স্বামীজীর অগ্নিগর্ভ বাণীর উচ্চ আবৃত্তি, সারিবদ্ধ জনগণের ভাবগম্ভীর পদযাত্রা, পুষ্পমাল্যে সজ্জিত বিভিন্ন আকারের ও ধরনের স্বামীজীর প্রতিকৃতিসমূহ শোভাযাত্রাটিকে বিশেষ সৌষ্ঠবমণ্ডিত করিয়াছিল। দীর্ঘ দুই মাইলব্যাপী শোভাযাত্রা যখন পথ অতিক্রম করিতেছিল, তখন পার্শ্ববর্তী গৃহগুলি হইতে শঙ্খের মাঙ্গলিক ধ্বনি ও পুষ্প-লাজবর্ষণ এবং শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের ও দর্শকগণের ভক্তিপ্লুত আবেগ একটি স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কলিকাতা ও শহরতলির সকল শাখা-প্রতিষ্ঠান, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন সঙ্ঘ ও সমিতি, বালক-বালিকাদের বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী এই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। শোভাযাত্রা কাশীপুর উদ্যান-বাটী পৌঁছিলে যোগদানকারী সকলকেই হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

এই শোভাযাত্রা স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হিসাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সাধারণ সভা

গত ২০শে জানুআরি রবিবার অপরাহ্ণে দক্ষিণ কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে, ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন 'স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিক উৎসবে'র সাধারণ সভার উদ্বোধন করেন।

ব্রহ্মচারীদের দ্বারা সমবেত কণ্ঠে বেদ-গীতির পর সভার শুভারম্ভ হয়। তারপর গীতি-সুধাকর শ্রীমেঘনাথ বসাক কবি নজরুল ইসলামের 'জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চীর-গৈরিকধারী' সঙ্গীতটি গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

শতবার্ষিকী কমিটির সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় স্বাগত-ভাষণে বলেন, আধুনিক যুগ বিবেকানন্দের যুগ।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণন উদাত্তকণ্ঠে স্বামীজীর উদ্দেশে তাঁহার গভীর ও গম্ভীর ভাবপূর্ণ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।[১]

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের, শ্রীনেহরুর ও চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর প্রেরিত বাণী পাঠ করেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে সভা শেষ হয়।

পরদিন—সোমবার অপরাহ্ণে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে দেশপ্রিয় পার্কে আয়োজিত দ্বিতীয় দিনের মহতী সভায় মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন। মঙ্গলা-চরণ ও উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর শ্রীগৌতম রায় 'স্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতা' হইতে ইংরেজী আবৃত্তি করে।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার ভাষণে বলেন: স্বামী বিবেকানন্দ প্রগতিবাদী ছিলেন, ধর্মকে যুগোপযোগী করাই ছিল তাঁহার সাধনা। তাঁহার বাণী নিশ্চয়ই মানুষকে যথার্থ পথে পরিচালিত করিবে। স্বামীজীর ভাবধারা প্রত্যেকের জীবনে রূপায়িত করা কর্তব্য।

ডক্টর কালিদাস নাগ প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাগত জানাইয়া এই আশা প্রকাশ করেন যে, স্বামীজীর জীবনাদর্শের

১ ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ এই সংখ্যার ৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভিত্তিতে পরিচালিত এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশে নূতন যুগের সূচনা করিবে।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ-প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের মর্ম: জীবনের এমন কোন দিক নাই, যাহা স্বামীজী আমাদের নিকট তুলিয়া ধরেন নাই, সকল সমস্যার সমাধান তাঁহার অমর বাণী ও রচনার মধ্যে মিলিবে।

অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার বলেন: স্বামীজী বলিয়াছেন, আধ্যাত্মিকতার বন্যায় দেশকে প্লাবিত করিয়া দিতে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, সমাজ-সংস্কারে, দেশসেবায় সকল কর্মই হইবে অধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে—এই ছিল স্বামীজীর মত।

স্বামী গম্ভীরানন্দ নরঋষি বিবেকানন্দের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন।

৮৪-বৎসর বয়স্ক শ্রীতারকচন্দ্র রায় স্বামীজীর সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বামীজীকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এবং নবীন যুগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে চিত্রিত করিয়া তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণে বলেন, ভারতবাসী স্বামীজীর নিকট হইতে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়াছে, জগদ্বাসীকে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ভারতের অনেক কিছু দিবার আছে।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবের প্রস্তুতি কিরূপ হইতেছে, তাহা বিবৃত করেন। তিনি আরও বলেন, ভারতের দেশনেতারা প্রায় সকলেই স্বামীজীর নিকট জাতীয়তার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। সকলকেই স্বামীজীর শৌর্য-বীর্য ও সাহসিকতার ভাব গ্রহণ করিয়া দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

সভাপতি মহোদয় বলেন: স্বামীজীর বাণী মন্ত্রের মতো শক্তিশালী। 'হে ভারত, ভুলিও না…' বলিয়া তিনি যে স্বদেশ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের সকলকে উদ্বুদ্ধ করুক।

সভায় বিশিষ্ট গায়কগণ স্বামীজী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

নানা স্থানে স্বামীজীর শতবার্ষিকী

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি:

আশুতোষ কলেজ হলে হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে, কলিকাতা মহাজাতি সদন, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট, শ্যাম স্কয়ারে বিবেকানন্দ জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে রামকৃষ্ণ ইনস্টিট্যুট, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ইণ্টালি, টালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, খিদিরপুর, স্কটিশ চার্চ কলেজ, দমদম বিমান-বন্দর, স্বামীজীর পৈতৃক ভবন (৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট), শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, হাজরা পার্কে হিন্দু মিশনের উদ্যোগে, দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ি, আন্তর্জাতিক অতিথিভবন, রামকৃষ্ণ মহামণ্ডল, সিঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ, হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, উত্তর ব্যাঁটরা শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, দ্বারহাট্টা (হুগলি), মাজদিয়া, শান্তিপুর, কামারহাটি, শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনস্টিট্যুট হল, শেওড়াফুলি, শিমুলতলা, কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, রাজগীর, খেপুত (মেদিনীপুর), ঢাকা, কুমিল্লা, গৌহাটি, শিলং, শ্রীনিকেতন (বীরভূম), ব্রহ্মানন্দ-জন্মস্থান শিকড়া-কুলীন গ্রাম, দুমকা, ভাগলপুর, পাটনা, মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটুর, বোম্বাই, ভুবনেশ্বর, হায়দ্রাবাদ, ভূপাল, পাঞ্জিম, আজমীর, বিকানীর, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, পোর্ট ব্লেয়ার।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বার্ষিক সাধারণ সভা

১৯৬১-৬২ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

গত ১৩ই জানুআরি বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সভায় সাধারণ সম্পাদকের যে বিবৃতি পঠিত হয়, নিম্নে তাহার সারানুবাদ প্রদত্ত হইল :

নূতন নির্মাণ-কার্য

রহড়া বালকাশ্রমে একটি ছাত্রাবাস উদ্বোধন এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কলেজের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা হয়। জলপাইগুড়ি আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কাটিহার আশ্রমে বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়-ভবন, ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিভাগের একটি ভবন ও বিজ্ঞান-ভবন উদ্বোধন করা হয়। কলিকাতা গোলপার্কে কৃষ্টি প্রতিষ্ঠানের (Institute of Culture) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। বৃন্দাবনে নবনির্মিত হাসপাতালের উদ্বোধন এবং মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা হয়। নরেন্দ্রপুর আশ্রমে একটি ছাত্রাবাস উদ্বোধন করা হয়। বারাণসী সেবাশ্রমে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী স্মৃতি ওয়ার্ডের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। মেদিনীপুর সেবাশ্রমে একটি ছাত্রাবাস ও একটি গ্রন্থাগার উদ্বোধন করা হয়।

প্যারিসের নিকট গ্রেজ্ কেন্দ্রটি পুনর্গৃহীত হইয়াছে এবং স্বামী ঋতজানন্দ এই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৭ জন সাধু-সদস্য ও একজন ভক্ত-সদস্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৬২, মার্চ-এর শেষে মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬৪০ (সাধু ৩২৬, ভক্ত ৩১৪)।

কেন্দ্র-সংখ্যা

বেলুড়ের মূল কেন্দ্র ধরিয়া '৬২ মার্চ মাসে মিশনের মোট কেন্দ্র-সংখ্যা[১] ছিল ৭৩ ; তন্মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানে ৮ ; ব্রহ্মদেশে ২ ; ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে ১টি করিয়া ; বাকী ৫৮টি ভারতে। ভারতের কেন্দ্রগুলি রাজ্য-হিসাবে : পশ্চিমবঙ্গে ২৩, মাদ্রাজে ৯, উত্তরপ্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, অন্ধ্রে ১, ওড়িষ্যায় ২ ; দিল্লী, রাজস্থান, পঞ্জাব, বোম্বাই, মহীশূর ও কেরলে ১টি করিয়া।

কার্যবিভাগ

মিশনের কার্যধারার প্রধানতঃ ৫টি বিভাগ : (১) রিলিফ, (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাহায্য, (৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম।

(১) রিলিফ : মাদ্রাজে তাঞ্জোর জেলা '৬১ খৃঃ বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাদ্রাজ শাখা হইতে সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়া বন্যার্তদিগকে নূতন ১,৫৬৭ ধুতি, ১,৭৩২ শাড়ি, ১,৫৬১ তোয়ালে, ৮৮৭ শিশুদের পোষাক, ৭৭৩ মাদুর এবং পুরাতন ২,০০০ জামা-কাপড় দেওয়া হয়। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৬,০০০টাকা।

কেরল-প্রদেশও বন্যায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের অর্থ-সাহায্যে ত্রিচুর আশ্রম কর্তৃক সাহায্য কেন্দ্র খোলা হয়। বন্যার্তদিগকে খাদ্য ও ঔষধাদি দেওয়া হয়। এই সেবাকার্যে ১৬,০০০ টাকা ব্যয় হয়।

১ মঠ কেন্দ্রগুলি ধরা হয় নাই।

বোম্বাই আশ্রম হইতে পুনা অঞ্চলে বন্যা-সেবাকার্যে ৪,০০০ বিদ্যার্থীকে পুস্তক ও পোষাক দিয়া সাহায্য করা হয়।

বিহারে মুঙ্গের জেলায় বন্যা-সেবাকার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৭,০০০ টাকা।

(২) চিকিৎসা: ভারত, পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশে মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রেই জাতি-ধর্মনির্বিশেষে রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করা হয়। তন্মধ্যে প্রধান—বারাণসী, বৃন্দাবন, কনখল ও রেঙ্গুন সেবাশ্রম, রাঁচির যক্ষ্মা হাসপাতাল এবং কলিকাতার 'সেবাপ্রতিষ্ঠান'। রেঙ্গুন সেবাশ্রমে রেডিয়াম ও এক্স-রে সাহায্যে ক্যান্সার-চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে মিশনের তত্ত্বাবধানে ৭টি অন্তর্বিভাগযুক্ত হাসপাতালে মোট শয্যা-সংখ্যা (bed) ছিল ৮৪৮; ১৮,০৩৮ রোগী ভরতি করা হয়। ৫০টি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে ২৫,০৫,১৫৫ (পুরাতন-সহ) রোগী চিকিৎসিত হয়। বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়গুলির মধ্যে দিল্লী ও রাঁচিতে কেবলমাত্র টি. বি. চিকিৎসা হয়; সালেম ও বোম্বাই-এ বহির্বিভাগের সহিত যথাক্রমে ৬টি ও ১২টি শয্যা আপৎকালীন ব্যবস্থা-হিসাবে রাখা হইয়াছিল।

(৩) শিক্ষা: মিশন-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মপ্রসার নিম্নলিখিত তালিকায় পরিস্ফুট:

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা	
কলেজ	মাদ্রাজ	} ১,৮১৫	
„ (আবাসিক	বেলুড়, নরেন্দ্রপুর)		
বি. টি. কলেজ	বেলুড়, তিরুপ্পারাইতুরাই ও কোয়েম্বাতুর	২৩৫	
বেসিক্ ট্রেনিং স্কুল	২	২৫২	
„ কলেজ (জুনিয়র)	৩	২৫৩	
শারীর শিক্ষা কলেজ	কোয়েম্বাতুর	৮৫	
গ্রামীণ শিক্ষা „		২১৪	
কৃষি-শিক্ষণ বিদ্যালয়			
সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র	„ ও বেলুড়	২০৮	
ইঞ্জিনিয়রিং স্কুল	৪	১,৩২৭	
জুনিয়র টেকনি. স্কুল	৭	৫১৩	৭২
ছাত্রাবাস (অনাথাশ্রম-সহ)	৭২	৬,৪৮১	৪৮১
চতুষ্পাঠী	২	৩৯	
বহুমুখী বিদ্যালয়	১২	৪,৪৪৯	৯৫২
উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭	২,৩৫২	২,২৪৬
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৬	৬,৪১৩	২,৯৩২
সিনিয়র বেসিক ও মধ্য ইংরেজী	২৪	৫,৫০৩	৩,২৪৬
জুনিয়র বেসিক ও প্রাথমিক	২৯	৪,০৯২	২,৩৬০
নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় ও অন্যান্য	৫৮	৩,৯৪০	২,০৯৮

কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে ও রেঙ্গুন সেবাশ্রমে পরিষেবিকা-শিক্ষণের (Nurses' Training Centre) ব্যবস্থা আছে, আলোচ্য বর্ষে ১৩২ শিক্ষার্থিনী শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাসে মোট ৩৮,২৩১ ছাত্র এবং ১৪,৫১৯ ছাত্রী শিক্ষা লাভ করিয়াছে

(৪) সাহায্য: প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে প্রদত্ত সাহায্য:

	পরিবার	ছাত্র	বিদ্যালয়
নিয়মিত:	১০০	১৮০	২
সাময়িক:	১৭৪	৭২	

এই জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ২৪,৭০৪ টাকা। ইহা ছাড়া কয়েকটি শাখাকেন্দ্র হইতেও দরিদ্র ছাত্র ও অভাবগ্রস্ত পরিবারকে যে সাহায্য দেওয়া হয়, তাহার পরিমাণ ৫,২৯৩ টাকা।

(৫) কৃষ্টি ও সংস্কৃতি: মিশনের কেন্দ্রগুলি ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ভাব-বিস্তারের উপর বিশেষভাবে জোর দেন, এবং

বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 'সর্ব ধর্ম সত্য' এই শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন।

জনসভা, আলোচনা-সভা, ক্লাস, পুস্তক ও পত্রিকা-প্রকাশন প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন ধর্মের সহিত সংযোগ স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগার, পাঠগৃহ ও চতুষ্পাঠীগুলি কৃষ্টিবিস্তারের সহায়ক। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের (Institute of Culture) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ও অন্যান্য দেশের বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যে কৃষ্টিগত সহযোগিতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে।

* * *

বার্ষিক সভার কার্য শেষ হইলে অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ তাঁহার ভাষণে বলেন :

আজ জাতি এক চরম দুঃখের মুহূর্তে সমবেত ; স্বভাবতই আমরা অপমানিত বোধ করিতেছি, কিন্তু দুঃখে মুহ্যমান হইলে চলিবে না। সাহস-ভরে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। স্বামীজী এরূপ নানা বিপদের কথা বলিয়া গিয়াছেন ; আবার বলিয়াছেন, ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, পৃথিবীর কোন শক্তি তাহাকে পরাভূত করিতে পারিবে না। স্বামীজী অপেক্ষা আর কেহই আমাদের দুরবস্থা ও তাহার কারণ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। তিনি বলিতেন, 'আমরা অলস, ঈর্ষাপরায়ণ, স্বার্থপর, তিনজনে এক সঙ্গে কাজ পারি না।' বর্তমানের এই বিপর্যয় আমাদের মধ্যে এক নব জাগরণ আনিতেছে, এই সময় আমাদের স্মরণ করিতে হইবে স্বামীজীর জীবনপ্রদ বাণী। শুধু অপরকে উপদেশ দিলে চলিবে না। স্বামীজীর শিক্ষা অনুসরণ করিয়া আমাদের উন্নত হইতে হইবে।

আমাদের কাজ বাড়িতেছে, কিন্তু কর্মীর সংখ্যা কম। সন্ন্যাসীদের এমন জীবন যাপন করিতে হইবে, যেন অনেকে তাঁহাদের দেখিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। গৃহস্থ ভক্তদেরও কর্তব্য তাঁহাদের অন্ততঃ একটি সন্তান ঠাকুর-স্বামীজীর কাজের জন্য উৎসর্গ করা। ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। উপাসনার ভাবে কর্ম করিয়া জাতি উন্নত হইবে—বিশ্বেরও কল্যাণ হইবে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-শতবার্ষিকী

বেলুড় মঠ : ১৩ই মাঘ (২৭শে জানু-আরি) রবিবার শুভ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসপুত্র শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সারাদিন ধরিয়া আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, ভোগরাগ, ভজন, কালী-কীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দিরটি সুন্দরভাবে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীমহারাজের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। রাত্রে সমগ্র মঠটি আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সারাদিনে প্রচুর ভক্ত-সমাগম হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি : গত ১৩ই মাঘ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, স্তোত্রপাঠ, বিশেষ ভোগরাগ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রে কালী-কীর্তন হইয়াছিল।

ভুবনেশ্বর : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীমহা-রাজের জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব বিশেষ আনন্দ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে উদ্‌যাপিত হয়।

এই উপলক্ষে পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি হইয়াছিল। ধর্মসভায় স্বামী মহানন্দ বক্তৃতা দেন।

স্বামী বিমোক্ষানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২২শে জানুআরি স্বামী বিমোক্ষানন্দ ত্রিবান্দ্রমে ৬৪ বৎসর বয়সে মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে (Cerebral thrombosis) দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৯৩১ খৃঃ তিনি তিরুভল্লা আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯৪০ খৃঃ তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাদি কার্যে তিনি নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার দয়ালু প্রকৃতি ও মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি ভক্তগণের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বামী সংশুদ্ধানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ১৩ই ফেব্রুআরি বুধবার বেলা ১১টা ২৫মিঃ সময়ে স্বামী সংশুদ্ধানন্দ (ভবতারণ মহারাজ) ৬৫ বৎসর বয়সে কলিকাতা কার্মানি হাসপাতালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ৯ই ফেব্রুআরি রাত্রি ৭-৩০মিঃ উক্ত হাসপাতালে তাঁহার মস্তিষ্কে (brain-tumour) অস্ত্রোপচার করা হয়।

১৯২৭ খৃঃ তিনি ঢাকা মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের তিনি মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯৩২ খৃঃ তাঁহার নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার সরল প্রকৃতি, মধুর ব্যবহার ও কর্মনিষ্ঠা সকলকে মুগ্ধ করিত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপার্ষদগণের জন্মস্থানে উৎসব ও ধর্মালোচনাদির অনুষ্ঠান করা তাঁহার জীবন-ব্রত ছিল। বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে তিনি উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী

নয়াদিল্লী ঃ গত ১৭ই জানুআরি রামলীলা ময়দানে এক বিরাট জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, জাতির এই সঙ্কট-মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় মহামানবের শিক্ষা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। অবস্থা যতই প্রতিকূল হউক না কেন, আমাদিগকে নির্ভীকভাবে তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে—স্বামীজী এই শিক্ষাই আমাদিগকে দিয়াছেন। আজ ভারতের প্রত্যেকটি মানুষকে স্বামীজীর জীবনাদর্শ অনুসরণ করিয়া 'অভয়' মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে এবং আত্মিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। স্বামীজীর জীবনের মূল আদর্শ ছিল—দৃঢ়তা, বিশ্বাস, শক্তি, সংহতি, দেশপ্রেম ও শৌর্য। দিল্লীর মেয়র শ্রীনুরুদ্দিন আমেদ, রাইট রেভাঃ বিশপ প্রভৃতি স্বামীজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মস্কো ঃ গত ১৭ই জানুআরি এক সভায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক সোসাইটি এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমির এশীয় ভবনের যুক্ত উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয়।

সোভিয়েট নেতা এবং বিজ্ঞানী, যাঁহারা এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন, সকলেই স্বামী বিবেকানন্দকে জাতীয় মুক্তি ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য ঔপনিবেশিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে অক্লান্ত যোদ্ধারূপে বর্ণনা করেন।

—রয়টার

বেলুড় মঠে গ্রীসের রাজা ও রানী

গত ১৩ই ফেব্রুআরি বুধবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় গ্রীসের রাজা পল, রানী ফ্রেডারিকা ও রাজকুমারী আইরিন বেলুড় মঠ দর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য সরকারের পক্ষে মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। অতিথিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির, শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির, স্বামীজীর বাসগৃহ ও সমাধি-মন্দির দর্শন করেন। রাজদম্পতি প্রধান মন্দিরের তোরণ-দ্বারে খচিত শ্রীরামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের প্রতীকের তাৎপর্য জানিতে ইচ্ছা করেন এবং স্বামীজীর মন্দিরে 'ওঁ' কার দেখিয়া উহার অর্থ জানিতে উৎসুক হন। বিদায়কালে রাজ-দম্পতিকে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী উপহার দেওয়া হয়।

স্মৃতিফলক-স্থাপন

কন্যাকুমারী ঃ গত ১৭ই জানুআরি ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্ত কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল—'বিবেকানন্দ রকে' স্মৃতিফলক-স্থাপন। এখানে স্বামীজীর আগমন ও সাধনাকে স্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য ঐ ফলক স্থাপন করা হয়। এই পাহাড়টি সমুদ্রতীর হইতে প্রায় দুই শত গজ দূরে সমুদ্রবক্ষে অবস্থিত। স্মৃতিফলকে খোদিত হইয়াছে : ১৮৯২ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ এই 'রকে' সাধনা করিয়া প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, এবং পরে আমেরিকায় যান।

ভ্রম-সংশোধন

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ৬০৬ পৃষ্ঠায় 'মায়া' কবিতার লেখকের নাম 'রমেন্দ্রকুমার' স্থলে 'রসেন্দ্রকুমার' হইবে।



বিবেকানন্দ-স্তোত্রম্

মূর্তমহেশ্বরমুজ্জ্বলভাস্করমিষ্টমমরনরবন্দ্যম্।
বন্দে বেদতনুমুজ্ঝিতগর্হিতকাঞ্চনকামিনীবন্ধম্ ॥ ১

কোটিভানুকরদীপ্তসিংহমহো কটিতটকৌপীনবন্তম্।
অভীরভীর্হুঙ্কারনাদিতদিঙ্মুখপ্রচণ্ডতাণ্ডবনৃত্যম্ ॥ ২

ভুক্তিমুক্তিকৃপাকটাক্ষাপেক্ষণমঘদলবিদলনদক্ষম্।
বালচন্দ্রধরমিন্দুবন্দ্যমিহ নৌমি গুরুবিবেকানন্দম্ ॥ ৩

(৺শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী কৃত)

স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী শিবস্বরূপ গুরুর বন্দনা করিতেছেন:

যিনি সূর্যের মতো দীপ্তিমান্ এবং দেবতা ও মানুষের পূজ্য, যিনি ঐশ্বর্য ও কামের কুৎসিত বন্ধন ত্যাগ করিয়াছেন, সেই বেদবিগ্রহ নররূপে অবতীর্ণ—ইষ্টদেব মহেশ্বরকে আমি প্রণাম করি।১

অহো! যিনি কোটি সূর্যের কিরণে উদ্ভাসিত—সিংহতুল্য, যিনি কটিদেশে কৌপীন ধারণ করিয়া আছেন, যিনি 'অভীঃ অভীঃ' রবে দিক্‌সমূহ নিনাদিত করিয়া প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করেন—২

ভোগ ও মোক্ষ যাঁহার কৃপাদৃষ্টিমাত্র অপেক্ষা করে, যিনি পাপরাশিকে বিদ্দলিত করিতে সমর্থ, যিনি তরুণশশিকলাধারী শিবস্বরূপ, 'ইন্দু'র (শরচ্চন্দ্রের) পূজ্য সেই গুরু বিবেকানন্দকে এই স্তবে প্রণাম করিতেছি।৩

কথাপ্রসঙ্গে

তথাকথিত অসঙ্গতির প্রশ্ন

দেশেবিদেশে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, শহরে গ্রামে চারিদিকে আজকাল বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর উৎসাহ ও আনন্দ শুরু হইয়া গিয়াছে। বহুস্থানে সভা প্রদর্শনী লীলাগীতি জীবনালেখ্য অভিনয় বক্তৃতা প্রভৃতি সহায়ে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, বহুস্থানে উৎসবের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে। অনেকে মনে করিয়াছিল, বোধ হয় জাতীয় সঙ্কটকালে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী আশানুরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না, কিন্তু কার্যতঃ দেখা যাইতেছে—জাতীয় সঙ্কটই জাতির দৃষ্টি এই বিস্মৃত আদর্শের প্রতি নিবদ্ধ করিয়াছে। স্বামীজীর আদর্শই এখন আমাদের জাতিকে রক্ষা করিতে পারে, উদ্বুদ্ধ করিতে পারে—অধিকাংশ চিন্তাশীল নেতাই এইরূপ মনে করেন।

স্কুলে কলেজে, অফিসে কারখানায়, সাহিত্যিকের মজলিসে, ধর্মপ্রতিষ্ঠানে—এমন কি রাজনীতিক মঞ্চেও স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা বৈঠক বসিতেছে। লক্ষ্য যে সর্বত্র এক, তা নয়। কোথাও স্বামীজীকে দেখা হইতেছে মুমূর্ষু জাতির প্রাণপুরুষ-রূপে, কোথাও বা স্বদেশ-মন্ত্রের উদ্‌গাতারূপে, কোথাও হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা-রূপে, কেহ বা স্বামীজীকে দেখিতে চান সাহিত্যের দৃষ্টি হইতে, কেহ আবার স্বামীজীর কণ্ঠে শুনিতেছেন - আগামী শূদ্রযুগের বোধন-মন্ত্র। স্বামীজী নিজে বহুমুখী প্রতিভা লইয়া জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন, কথা বলিয়াছেন; আজ তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টায় এক একজন তাঁহার এক একটি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছে, বিস্মিত হইতেছে; সমগ্রভাবে তাঁহাকে বুঝিতে পারা বা তাঁহার সকল ভাব গ্রহণ করিয়া জীবনে রূপায়িত করা সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়।

বিবেকানন্দকে বুঝিবার একটা ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা আজ দেশে নূতন করিয়া দেখা যাইতেছে, ইহা বড়ই শুভ লক্ষণ। ইহার মধ্যে নানা বিপরীত তরঙ্গও খেলা করিতেছে, ইহাই স্বাভাবিক, সেইজন্য অবিরত চর্চা ও আলোচনা প্রয়োজন। বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ ধামা চাপা দিয়া প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে পাঠাইবার সময় এখনও হয় নাই, দেরী আছে—অনেক দেরী! স্বামীজী নিজমুখে বলিয়াছেন 'দেড় হাজার বছর চলবে এই ভাব!' বেদান্ত-ভিত্তিক এই উদার সমন্বয়ের ভাব ধীরে ধীরে প্রসারিত হইবে, এবং পৃথিবীতে এক শান্তিময় নবযুগের সূচনা করিবে!

মন্ত্র- শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে হয়ঃ বিবেকানন্দ এই শান্তি-মন্ত্রের দ্রষ্টা বা ঋষি—শ্রীরামকৃষ্ণ ইহার দেবতা বা প্রাণস্বরূপ! পৃথিবীব্যাপী নবযুগের উদার ধর্মস্থাপনে ইহার. বিনিয়োগ।

অতএব বিবেকানন্দকে বুঝিতে গিয়া যদি আমরা সুবিধামত শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দিই, তবে দুটির কোনটিকে বুঝা হইবে না। অনেকের কাছে এই দুই জনের মধ্যে কোন মিল নাই বরং বহুক্ষেত্রে উভয়ের ভাব বিপরীত। কিন্তু . ইঁহাদের দুইজনের মধ্যে গভীরতম মিলন হইয়াছিল, উভয়ের মধ্যে একটি অন্তঃ-সলিলা স্রোত প্রবাহিত—এ-কথা সর্বজন-বিদিত না হইলেও সাধক-ভক্ত-বিদিত!

শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রাম্যব্যক্তি—আধুনিক শিক্ষা-বর্জিত মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণ, আর নরেন্দ্র ভারতের প্রধান নগরী কলিকাতার কলেজে পড়া পাশ্চাত্য দর্শনে শিক্ষিত নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম যুবক! এ দুয়ের মধ্যে মিল কোথায়? তথাপি যে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুপদে বরণ করিলেন, তাঁহার স্পর্শে আসিয়া তাঁহার জীবন রূপান্তরিত হইয়া গেল, ইহা তো কল্পনা নয়, গল্প নয়—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তবে নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে, শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চতর কোন শক্তির অধিকারী ছিলেন। কি সেই শক্তি যাহার বলে তিনি নরেন্দ্র-প্রমুখ যুবকগণের মন 'কাদার তালের মতো' ভাঙিয়া গড়িতে পারিতেন। সে শক্তি সত্য-দর্শনের বা ঈশ্বর-দর্শনের শক্তি—সে শক্তি আধ্যাত্মিক শক্তি। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন যথার্থ জ্ঞানপিপাসু, উন্মুক্ত মন লইয়া তিনি খুঁজিতেছিলেন এমন একজনকে যিনি তাঁহার পিপাসা মিটাইতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার সেই তৃষ্ণা—ধ্যানের জ্ঞানের তৃষ্ণা, ভক্তি ভালবাসার তৃষ্ণা মিটাইয়া দিলেন, তখন সাধক নরেন্দ্রনাথ কি করিবেন? তিনি কি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে শ্রীগুরুচরণে উৎসর্গ করিবেন না? ঘটনা এইরূপই ঘটিয়াছিল। তিনি নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে, ভাসিয়া গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-তরঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণও উপযুক্ত আধার নরেন্দ্রনাথকে সর্বস্ব দিয়া 'ফকীর' হইলেন। যে শক্তি এতদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া কাজ করিতেছিল, তাহা নরেন্দ্রনাথকে আশ্রয় করিল। 'মা তোকে দিয়ে অনেক কাজ করাবে'—ইহা শ্রীরামকৃষ্ণেরই উক্তি।

অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দের মধ্যে ভেদ-কল্পনা অজ্ঞতারই পরিচয়।

আমরা জানি লৌকিক ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু, বিবেকানন্দ শিষ্য। আমরা এমন কথাও শুনিয়া থাকি—শ্রীরামকৃষ্ণ সূত্র, বিবেকানন্দ ভাষ্য অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ সংক্ষেপে ইঙ্গিতে যে তত্ত্ব বলিয়া গিয়াছেন, বিবেকানন্দ তাহাই বিস্তার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রচারিত শিক্ষার মধ্যে অসঙ্গতি একটা নূতন কথা নয়। মিশন-প্রতিষ্ঠাকালে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন: নরেন্দ্র বিলেত আমেরিকা থেকে এই সব মত আমদানি করেছে! অন্যলোকে যে ঐরূপ মনে করিবে—ইহা আর আশ্চর্য কি?

যাই হোক, যে প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ বহু ভক্তের মনেও উঠিয়া থাকে—বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেগুলির উল্লেখমাত্র করিব। এ বিষয়ে আলোচনার যথেষ্ট অবসর রহিয়াছে।

প্রথমেই মনে হয়—মূর্তিপূজার রহস্য। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ কি একই ভাবে সাকারে ও মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করিতেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠে: কর্ম বা সেবা লইয়া। এই প্রসঙ্গে দেশসেবার কথাও উঠিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ কোথাও দেশসেবার কথা বলিয়াছেন, এমন স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও আছে কি? অবশ্য শিববোধে জীবসেবার কথা বলিয়াছেন, স্বামীজী সেই সূত্র ধরিয়াই সেবাধর্মের প্রবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু স্বামীজী এত দেশপ্রেম পাইলেন কোথা হইতে? দেশসেবা করিতে গেলে তো মন বহির্মুখী হইবে, আধ্যাত্মিক সাধনার বিঘ্ন ঘটিবে। ঈশ্বর হইতে সাধক দূরে চলিয়া যাইবে। অতএব ধর্ম-জীবনের সহিত দেশ-প্রেমের সামঞ্জস্য কোথায়?

তৃতীয় প্রশ্নটি বড়ই কঠিন! বিবেকানন্দ মুক্তকণ্ঠে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন! আর শ্রীরামকৃষ্ণ তো প্রকাশ্যে উহা নিষেধ করিয়াছেন, তবে গুরুশিষ্যের শিক্ষার সামঞ্জস্য কোথায়?

এতগুলি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন শুনিয়া শুধু একটি কথা বলিতে হয়, সামঞ্জস্য আছে—উভয়ের কথার মধ্যে আছে, উভয়ের জীবনের মধ্যে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলেন নাই 'নরেন শিক্ষে দেবে?' স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেন নাই 'যাহা বলিয়াছি, তার মধ্যে যেটুকু ভাল বলিয়াছি, যাহা সত্য বলিয়াছি, সব তাঁহার, আমার কিছু নয়?'

বুঝিতে হইবে, এই সকল অসঙ্গতি আপাত-প্রতীয়মান; বুঝিতে হইবে, যেগুলি বিরুদ্ধ বা বিপরীত বলিয়া মনে হইতেছে—প্রকৃতপক্ষে সেগুলি পরিপূরক।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে নূতন প্রকাশন

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ও পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া আমরা আনন্দিত:

Swami Vivekananda's Rousing call to Hindu Nation: Compiled by Eknath Ranade. Published by Swastik Prakashan, 27/1-B, Cornwallis Street, Calcutta-6. Pp 168; Price: Rs. 2/-

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ: পৃষ্ঠা ১৬০। প্রকাশক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন শতবার্ষিকী সমিতি, ৭।৮, নস্করপাড়া ১ম বাই লেন, কাসুন্দিয়া, হাওড়া।

বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য: শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ। প্রকাশক: করুণা প্রকাশনী, ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১৮৩; মূল্য ৫৲।

বিবেকানন্দের রাজনীতি (শতবর্ষপূর্তি স্মারক শ্রদ্ধার্ঘ্য):—শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য। ৩০ নং, ডি. ডি. মণ্ডল ঘাট রোড, দক্ষিণেশ্বর, পোঃ আড়িয়াদহ, ২৪ পরগনা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১১+৸৶০; মূল্য ২.৫০।

বাণী-সঞ্চয়ন: পৃষ্ঠা ৫৬; প্রকাশক: অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, ২৪ পরগনা।

পত্রিকা

Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture (Swami Vivekananda Memorial Number), Gol Park, Calcutta 29.

জীবন-বিকাশ (স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক জয়ন্তী বিশেষাঙ্ক)—প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, নাগপুর ১। (মারাঠী ভাষায়)

আশ্রম (বিবেকানন্দ-জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা): পৃষ্ঠা ১৫২; প্রকাশক: অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগনা।

Vikas Mela (Vivekananda Centenary Volume)—Published by Assistant Secretary, Ramakrishna Mission S. E. O. T. C., Belur Math, Howrah.

Vivekananda Centenary Souvenir (Agricultural & Industrial exhibition) P. O. Nimpith, 24 Pargs.

পরলোকে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ গত ২৭শে ফেব্রুআরি রাত্রি ১০টা ১৫মিঃ সময়ে ৭৯ বৎসর বয়সে পাটনা সদাকৎ আশ্রমে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্লুরো-নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

আধুনিক ভারতে দেশসেবার ক্ষেত্রে যাঁহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ভারতের স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য এবং কংগ্রেসের সম্মানিত নেতারূপে তিনি বার বার মুক্তি-আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। ১৯৫০ খৃঃ ২৬শে জানুআরি স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্রী সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পর তিনি রাষ্ট্রপতির পদে বৃত হন। ১২ বৎসর এই গৌরবজনক পদে আসীন থাকিয়া ১৯৬২ খৃঃ মে মাসে তিনি এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সদাকৎ আশ্রমে নিভৃত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেছিলেন। তিনি চার বার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন, এবং সংবিধান রচনাকালে পরিষদের প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারের একটি সাধারণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; গ্রাম্য মানুষের সারল্য ও আন্তরিকতা তাঁহার আচার-আচরণে ফুটিয়া উঠিত। বিহার ভূমিকম্পে রিলিফ ও সেবার সংগঠনে রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্ব আদর্শোচিত দৃষ্টান্ত হইয়া আছে।

বাংলা দেশের সঙ্গে তাঁহার গভীর যোগ ছিল। তখনকার দিনের ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তিনি অসামান্য মেধা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি যে কয়েকটি ভাষা জানিতেন, বাংলা ভাষা তাহার অন্যতম। তাঁহার লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'India Divided' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫০ বৎসর ধরিয়া ভারতের জাতীয় জীবনে সকল শুভ উদ্যোগের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারতবাসীও তাঁহাকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। পরিণত বয়সে হইলেও তাঁহার দেহত্যাগে ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ দেশসেবার যে মহান্ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যৎ দেশসেবকগণকে নিষ্ঠা ও সেবার ভাবে উদ্বুদ্ধ করিবে। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বর্তমান সঙ্কটকালে জাতির কর্তব্য

[কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ][1]

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর পনর বছরের মধ্যেই হিমালয়ের উপর চীনাদের বর্তমান ব্যাপক আক্রমণকে কেন্দ্র ক'রে ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা এবং তার যুগযুগান্তের জীবনযাত্রা এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। সমগ্রজাতি এই সঙ্কটে আশ্চর্যভাবে সাড়া দিয়ে নিজের দেশের কাছে ও সারা জগতের কাছে প্রমাণ করেছে যে, তার শান্তির নীতি শক্তিপ্রসূত—অক্ষমতাজনিত নয়। তার উপনিষদ্‌রাজির মধ্যে বহুযুগপূর্বে যে অখণ্ড মানবতা-বোধ পরিস্ফুট হয়েছিল, যা করুণাময় বুদ্ধ এবং পরবর্তীকালের সাধক ও মনীষীরা—তথা আমাদের বর্তমানকালে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত সেই সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন—সেই অখণ্ডমানবতা-বোধ থেকেই এই শান্তির নীতি উদ্ভূত হয়েছে। উইল ডুরাণ্টের ভাষায় যা 'সমগ্র মানবজাতির ঐক্য- ও শান্তি-বিধায়িনী প্রীতি'—তা এই দিব্যদৃষ্টি থেকে অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। মানবেতিহাসের দিক থেকে বলা যায়, ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সামরিক অভিযানের মনোবৃত্তি ও নীতির অভাব এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতবাসীর এই মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ ক'রে ১৮৯৬ খৃঃ নিউ ইয়র্কে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'মদীয় আচার্যদেব' শীর্ষক বক্তৃতায় বলেছেন : ঐ দেশেই (ভারতেই) বাস করে পৃথিবীর একমাত্র জাতি, যারা সারা মানব-জাতির ইতিহাসের মধ্যে কখনও অপর জাতিকে জয় করার জন্য নিজের দেশের সীমানা অতিক্রম করেনি; যারা কখনও অপরের বিষয়ে লোভ করেনি; যাদের একমাত্র অপরাধ এই যে, তাদের ভূমি বড় উর্বর, তারা তাদের কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করেছিল এবং এইভাবে অন্যান্য জাতিকে তাদের লুণ্ঠন করতে প্রলুব্ধ করেছে।

জাতিগত হিসাবে আমরা অপরের ক্ষতি করিনি, কিন্তু অন্যের দ্বারা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অনৈক্য, স্বার্থপরতা এবং আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য আমরা অনেক সময় রাজনৈতিক দিক দিয়ে নিজেদের দুর্বল ক'রে ফেলেছি, তার ফলে স্বামীজীর তীক্ষ্ণ ভাষায় বলতে গেলে—আমরা অন্য জাতিকে আমাদের লুণ্ঠন করতে প্রলুব্ধ করেছি। ভারতের বর্তমান নবজাগরণ, যা গত শতাব্দীতে বাংলাদেশ থেকে শুরু হয়েছিল, তাতে এই দুর্বলতার কথা ও শিক্ষার কথা যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং মানুষ তৈরী ক'রে জাতিকে গড়ে তোলার সঞ্জীবনী বাণী স্বামী বিবেকানন্দের মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছিল। এই ভাবে এই নব জাগরণ থেকে আবির্ভূত হয়েছিল আমাদের জাতীয় আন্দোলন—সর্বাত্মক জাতীয় ঐক্য এবং শক্তির বাণী নিয়ে। সে বাণী বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমাদের জনগণকে সমবেত কর্মে ও প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করেছিল; আর ১৯৫০ খৃঃ প্রচারিত

১ 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র সৌজন্যে

আমাদের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রচার তারই আংশিক পরিপূর্তি। ১৮৯৭ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ পশ্চিম থেকে জয়যুক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন ক'রে প্রথম যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, তারই মর্মস্পর্শী অংশে এই সর্বতোমুখী জাতীয় জাগরণের দিব্য দৃষ্টি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পেয়েছে। রামেশ্বরের নিকটে রামনাদে জনসাধারণের অভিনন্দনের উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমেই স্বামীজী বলেন :

দীর্ঘতম রজনী ঐ বুঝি কেটে যায়—দুঃসহ ব্যথার বুঝি অবসান হয়ে এল—মুমুর্ষু দেহ ঐ বুঝি জেগে উঠছে। ভারত—আমাদের এই মাতৃভূমি বুঝি তার দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে উঠছেন। আর কেউ তাঁকে রোধ করতে পারবে না; তিনি আর কখনও নিদ্রাচ্ছন্ন হবেন না; আর কোন বহিঃশক্তি তাঁর অগ্রগতি রুদ্ধ করতে পারবে না—কারণ দানবের অপরিসীম শক্তি নিয়ে তিনি নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন! স্বাধীনতা-লাভের পর থেকে মনে হয় যেন একটা আত্মতৃপ্তির ভাব, একটা আরামের ভাব, অত্যধিক অর্থ-লোলুপতা, স্বাচ্ছন্দ্য, সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামানোর এক আত্মঘাতী মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। নিজেদের স্বাধীন ব'লে ধরে নিয়ে আমরা চলতে আরম্ভ করেছিলাম, আর সেই স্বাধীনতার পবিত্র নামে, ব্যক্তিগত অথবা দলগত স্বার্থের খাতিরে—সর্ববিধ বিশৃঙ্খলার প্রশ্রয় দিয়েছিলাম এবং এরই জন্য স্বজাতির অবশিষ্ট অংশের প্রশংসাও লাভ করেছিলাম! আত্মনিয়ন্ত্রণই যে স্বাধীন মানুষের লক্ষণ—বিশৃঙ্খলা যে ক্রীতদাসের লক্ষণ, স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য সর্বদা সজাগ থাকতে হবে, সেটুকু শিক্ষা আমাদের হয়নি। আজকের জাতীয় সঙ্কটে এই শিক্ষাটিই আমাদের জাতির প্রাণে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। কোন গ্রন্থ বা উপদেশ কোন জাতিকে এই কঠোর নীতি শিক্ষা দিতে পারে না—কেবলমাত্র নিষ্ঠুর বাস্তব অভিজ্ঞতাই এ শিক্ষা দিতে পারে। বর্তমান অভিজ্ঞতার অগ্নিপরীক্ষার সুযোগে নতুন ভাবে আমাদের চরিত্র ও ভাগ্য গঠন করতে হবে। আমরা যেন প্রত্যেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, যাতে আগের বিষয় আগে ভাবি: আমাদের এই প্রাচীন দেশের ঐক্য ও স্বাধীনতা এবং কোটি কোটি জনগণের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য; চিরদিনের জন্য যেন উপলব্ধি করি যে, স্বাধীন দেশের নাগরিকতা কঠিনতর উপাদানে গঠিত। সর্বপ্রকার স্বার্থপরতা ও আরামপ্রিয়তা বিদায় ক'রে দিই এবং সর্বোপরি আমাদের বহু পুরাতন শান্তিপ্রিয়তার সঙ্গে শক্তি ও নির্ভীকতা যুক্ত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করি। অনুসরণ করি, শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী, যা গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে উচ্চারিত হয়েছে: 'যস্মাৎ নোদ্বিজতে লোকো লোকন্নোদ্বিজতে চ যঃ।'—যার থেকে জগৎ উদ্বিগ্ন হয় না এবং জগৎও যাকে উদ্বিগ্ন করতে পারে না।

আমাদের দেশ তার দীর্ঘ ইতিহাসে বহু উত্থান-পতনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কিন্তু ভারত এগিয়ে চলেছে। আমাদের নিজেদের উপর এবং আমাদের জীবন-ধারার উপর বিশ্বাসই সাময়িক পশ্চাদপসরণের আঘাতকে জয় করতে আমাদের সাহায্য করেছে। অন্যায় ও ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করার সময়েও এই বিশ্বাস বিভিন্ন জাতিকে সাহস ও শক্তি দিয়েছে। আমাদের দাবি তো ন্যায়সঙ্গত এবং আমাদের অনুসৃত নীতি অভ্রান্ত। অন্য কোন দেশের ক্ষতি করার ইচ্ছা আমাদের নেই। সর্বজাতির মঙ্গলবিধান করার যে চিরাচরিত নীতি—

স্বাধীনতা-লাভের পর থেকে আমরা সেই নীতিই অনুসরণ ক'রে চলেছি। যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য ন্যায়সঙ্গত, অতএব পরিণামে আমরা জয়লাভ করবই। 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'—যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়—এই হ'ল আমাদের মহাকাব্য মহাভারতের অপরিবর্তনীয় বিষয়বস্তু। স্বাধীন ভারতের জয়যাত্রাকে সফল করবার জন্য আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করতে হবে এবং সঙ্কল্পকে শাণিত করতে হবে—এই জয়যাত্রা অন্য কোন দেশের পরাজয় সূচনা করে না। সংগ্রাম দীর্ঘ হ'তে পারে—এমন কি, অগ্রগতি সাময়িকভাবে ব্যাহত হ'তে পারে, কিন্তু শেষে দেখা যাবে জাতির আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও ভাবের ঐক্য ঘটেছে এবং জাতি রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে সতর্ক হয়েছে।

বিবেকানন্দের অসম সাহসের ভাব আমরা অক্ষয় সম্পত্তিরূপে লাভ করেছি। ১৮৯৪ খৃঃ লেখা 'আমার বীর সন্তানদের প্রতি' নামক তাঁর পত্রখানিতে আমরা এই ভাবের স্পর্শ পাই: সংগ্রাম কর, সংগ্রাম কর—এই ছিল গত দশ বছর ধরে আমার আদর্শ। আজও আমি বলি, সংগ্রাম কর। যখন চতুর্দিক তমসাবৃত, তখনও আমি বলেছি, সংগ্রাম কর; যখন আলো আসছে, তখনও বলছি—সংগ্রাম কর।

আজ এবং অনন্ত কাল ধরে জাতিকে অসীম আশা ও অবিরাম কর্মপ্রচেষ্টার ভাবে উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে।

নমো যুগ-অবতার

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নররূপে তুমি এলে ভগবান
করুণার পারাপার!
নমো নমো নমো হে রামকৃষ্ণ,
নমো যুগ-অবতার!
যে-তুমি লক্ষ তারকা-তপনে,
যে-তুমি রয়েছ জীবনে মরণে
ধরার ধূলায় এলে সেই তুমি
পারের কর্ণধার!
আর্ত জীবেরে দিলে প্রভু চির
শান্তির সন্ধান!
হতাশের কানে শোনালে দয়াল,
নবজীবনের গান!
একের মন্ত্র করিলে ঘোষণা,
ভেদবুদ্ধির নত হ'ল ফণা,
তব কথামৃত মরুসাহারায়
জলধারা গঙ্গার!!

বিবেকানন্দ

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায়

জাতির মৃত্যুর সন্ধি, তুমি আসিবে না
সমাজ আচ্ছন্ন আঁধি—আসি নাশিবে না?
ধর্মের ক্লীবত্ব হীন ঘৃণ্য মনোভাব
মুছিবার আগে ঘটে তব তিরোভাব।
সে অভাব মর্মন্তুদ পূর্ণ করো আসি,
মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি যে সন্ন্যাসী,
সংযম, তিতিক্ষা, নিষ্ঠা, প্রেম—কিছু নাই
শুধু কাম-কাঞ্চনের দাস হ'তে চাই!
জাতির এ ঘৃণ্য কাম্য লুব্ধ অর্থ-আশ!
তোমার উদার বীর্যে মোহন প্রকাশ
হে সাধু সংযমী বীর, এস এস নামি—
সমগ্র পরাণ দিয়া যাচি তোমা আমি
সমগ্র জাতির ভাঙো ক্লীব মনোভাব
হোক পুন দেশে মম তব আবির্ভাব॥

শতবার্ষিকী-উপলক্ষে*

স্বামী যতীশ্বরানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকীতে তাঁহার গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা তমলুক আশ্রমের ও তমলুক-বাসীর পক্ষে একটি অতি শুভদিন।

শ্রীশ্রীস্বামীজীর শতবার্ষিকী সমস্ত ভারতের ও জগতের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের ও জগতের কল্যাণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার শুভাগমনে দক্ষিণেশ্বর হইতে এক বিরাট আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রবাহিত হইয়াছে। তাহাই পরে প্রধানতঃ বেলুড় মঠে কেন্দ্রীভূত হয়। সেই আধ্যাত্মিক শক্তি ঠাকুরের শিষ্যগণের বিশেষতঃ স্বামীজীর মাধ্যমে সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং অসংখ্য নরনারীর জীবনে আধ্যাত্মিক প্রেরণা আনিয়াছে ও আনিতেছে।

ভগবদিচ্ছায় আমার—ভারতে, ভারতের সন্নিকট বহুদেশে ও সুদূর পাশ্চাত্য দেশে—ইওরোপে ও আমেরিকায় তাঁহাদের মহিমা কিছু কিছু দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। তাই বলিয়াছি, তাঁহাদের জন্ম সর্বজগতের মঙ্গলের জন্য।

শ্রীশ্রীস্বামীজীকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। ১৯০২ খৃঃ তিনি তাঁহার 'অখণ্ডের ঘরে' চলিয়া যান। তাহার চার বৎসর পরে আমার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত ও স্বামীজীর গ্রন্থাদি আমরা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতাম। শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজী-প্রদর্শিত আধ্যাত্মিকতা ও সেবাধর্ম আমরা আমাদের জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করি। এই সময়ে আমাদের মহাসৌভাগ্যক্রমে, সত্য সত্যই দৈব ইচ্ছায় আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি। প্রধান যে কয়েকজনের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হই তাঁহাদের পুণ্য নাম :

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী—সমগ্র মঠ-মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ, স্বামী প্রেমানন্দজী - বেলুড় মঠের তত্ত্বাবধায়ক, স্বামী শিবানন্দজী—সমগ্র মঠ-মিশনের সহাধ্যক্ষ, স্বামী সারদানন্দজী—সমগ্র মঠ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক ও স্বামী তুরীয়ানন্দজী—শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায় 'গীতোক্ত যোগী'।

আমাদের আদর্শের কথা শুনিয়া তাঁহারা আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। তাঁহারা বলেন, সব বিষয়েই বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, নতুবা ধর্মজীবন ও সেবাকার্য ঠিকভাবে অনুসরণ করা যায় না। শ্রীশ্রীস্বামীজীর সেবা-ধর্মের উল্লেখ করায় তাঁহারা বলেন, 'তাঁহার সেবাকার্য তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির ফল। তোমরাও সাধনভজন করিয়া যতই আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবে, ততই বুঝিতে পারিবে যে, ভগবান অন্তরে ও সর্বভূতে রহিয়াছেন। তখন তোমাদের জীবসেবা শিবসেবায় পরিণত হইবে।'

স্বামীজীর গুরুভ্রাতাগণ কৃপা করিয়া আমা-দিগকে আরও বুঝাইয়া দেন, যে শাস্ত আধ্যাত্মিক ভাবধারা শ্রীশ্রীঠাকুরে বিশেষ

* গত ৩১শে জানুআরি তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে মন্দির-প্রতিষ্ঠা-দিবসে প্রদত্ত ভাষণ।

ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই আবার স্বামীজীর ওজস্বিনী বাগ্মিতা ও কর্মবহুল জীবনের ভিতর দিয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানগণ আরও বলেন যে, ঠাকুরকে বুঝিতে হইলে স্বামীজীর ভিতর দিয়া বুঝিতে হইবে।

স্বামীজীর কথায় পূজনীয় তুরীয়ানন্দ মহারাজ বলিতেন, আমেরিকা রওনা হইবার পূর্বে স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'হরি-ভাই, তোমরা ধর্ম বলিতে কি বুঝ, তাহা আমি জানি না ; কিন্তু আমি এইমাত্র জানি যে, আমার হৃদয় বিশাল হইয়াছে ও সকলের জন্য আমি অনুভব করিতে শিখিয়াছি।' ইহার কারণ স্বামীজীর শান্ত পবিত্র হৃদয় শ্রীভগবানের অনন্তপ্রেম ও করুণাপূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল, তাই তিনি সর্বভূতের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করিয়াছিলেন। আমাদিগকেও শক্তি অনুসারে নিজ নিজ ভাবে সেই পথ অনুসরণ করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়া স্বামীজী এই জ্ঞানলাভ করেন যে, 'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' তাই তিনি পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া পরে বলিয়া গিয়াছেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' তিনি আরও বলিয়াছেন, 'যতই দুঃখকষ্ট অনুভব করি না কেন, আমি আমার ভগবান—জগতের সব দুঃস্থ দরিদ্রদের সেবার জন্য সহস্র বার জন্মগ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।'

জগতে বহু প্রকারের দরিদ্র আছে। অর্থে দরিদ্র, স্বাস্থ্যে দরিদ্র, নৈতিক জীবনে দরিদ্র, আধ্যাত্মিক বিষয়ে দরিদ্র—সকলেই স্বামীজীর সহানুভূতি ও সেবার পাত্র তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, 'সকল ভাবেই নারায়ণের সেবা করিতে হইবে।' এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেবাশ্রম, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, পুস্তক-প্রকাশন-বিভাগ, গ্রন্থাগার, মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং হইতেছে।

স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম ও তাঁহার বিশ্ব-প্রেমের একটি বিশেষ প্রকাশ। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবধারায় জগতের কল্যাণ হইবে। অথচ আমরা কত দূর অধঃপতিত হইয়াছি, তাহা তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, 'আমরা অলস, কর্ম-বিমুখ, সংহতি-সাধনে অক্ষম, ভ্রাতৃপ্রেম-বর্জিত। পরস্পরকে ঘৃণা ও হিংসা করি—ইহাই আমাদের শোচনীয় অবস্থার স্বরূপ।'

ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা স্বামীজী বহু বৎসর পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন যে, চীনবাসীদের ভিতরে এক বিশাল জনজাগরণ আসিবে, আবার তাহারা ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিতেও চেষ্টা করিবে।

যিনি আমাদের অধঃপতন ও চীন দ্বারা ভারত আক্রমণের কথা বলিয়াছেন, তিনিই আবার যোগদৃষ্টিতে দেশমাতৃকার মহাজাগরণ দর্শন করিয়া ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন : আমাদের দেশ-মাতৃকা তাঁহার সুদীর্ঘ গভীর প্রসুপ্তি হইতে জাগ্রত হইতেছেন। কাহারও সাধ্য নাই এই জাগরণ রোধ করে। জাগ্রত ভারত আর নিদ্রাভিভূত হইবে না। বাহিরের কোন শক্তিই আর তাঁহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না। শ্রীভগবানের অলঙ্ঘ্য আদেশে এবার ভারতের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী ; দেশের দুর্গত জনগণের সুখসমৃদ্ধির দিন সমাগত।

তিনি শুধু ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আমাদের পুনরুদ্ধারের উপায়ও নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন :

১. প্রথমতঃ ধর্মের উপর আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

সমাজতান্ত্রিক অথবা রাজনৈতিক কোন

আন্দোলন করিবার পূর্বে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যায় দেশ ভাসাইয়া দাও। আত্মতত্ত্ব প্রচার করিবার পর লৌকিক যে কোন জ্ঞান আপনিই আসিবে।

ধর্মে সংহতি-স্থাপনই ভবিষ্যৎ ভারত গড়িবার প্রথম সোপান।

২. একমাত্র শক্তিই আমাদের প্রয়োজন। আত্মা অনন্ত সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ। উঠিয়া দাঁড়াও—নিজের স্বরূপ ব্যক্ত কর। আত্মসম্বিৎ জাগ্রত হইলে দেখিবে—ক্ষমতা, মহিমা, সততা, পবিত্রতা, যাহা কিছু বরণীয় স্বতই আসিবে। ভয়ের পরিবর্তে অভয়—নির্ভীকতা আপনিই আসিয়া যাইবে।

৩. খাঁটি দেশসেবক গড়িয়া তুলিতে হইবে। লৌহের ন্যায় দৃঢ় পেশী, ইস্পাতের মতো কঠিন স্নায়ু, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বলিষ্ঠ মানবের প্রয়োজন।

আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার যাহা দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় ও মানুষ স্বাবলম্বী হইতে পারে।

৪. পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত সর্বধর্মের মূলভিত্তি বেদান্তের সমন্বয়, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস হইবে আমাদের জাতীয় শিক্ষার মূলমন্ত্র।

৫. জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রচারকগণ দরিদ্র জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিতরণ করিবেন। যে শিক্ষা, যে সংস্কৃতি উচ্চবর্ণের ক্ষমতার উৎস, তাহা নিম্নশ্রেণীদের আত্মসাৎ করিতে হইবে। ইহাই সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায়।

৬. নারী-জাতির উন্নয়নও একান্ত আবশ্যক। সর্বাগ্রে হিন্দু-রমণীর সতীত্বের আদর্শকে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হইবে। তাহার সহিত আধুনিক শিক্ষাদিরও ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

অন্যান্য বিষয়ের সহিত ব্যায়াম, সাহস, বীরত্ব ও আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ত করাও মেয়েদের বিশেষ প্রয়োজন।

৭. স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল ভারতের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্যের জড়-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ঐক্য স্থাপন করা। ভারত হইতে আত্মজ্ঞান-পরায়ণ ব্যক্তিগণ সার্বভৌম বেদান্তধর্ম প্রচারের জন্য পাশ্চাত্যে যাইবেন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষকগণ কল্যাণমূলক শিক্ষাফল ভারতবর্ষে আনিতে সাহায্য করিবেন।

৮. ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রদর্শিত সাধন-পথ প্রচারকল্পে স্বামীজী দুইটি মঠ স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন—একটিতে আদর্শবাদী পুরুষগণ আত্মজ্ঞান লাভ ও জগতের কল্যাণের জন্য 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—ভোগসুখ ত্যাগ করিয়া পরের মঙ্গল সাধন করিয়া যাইবেন। অন্যটিতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে নারীগণ ও একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সকলের, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ব্রতী হইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে স্বামীজীর এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইয়াছে এবং আমরা এই বিশাল কর্মের সূচনামাত্র দেখিতেছি।

দেশের বর্তমান দুর্দিনে স্বামীজীর শত-বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ জড় প্রস্তর বা ইষ্টকের বিরাট গৃহাদি প্রস্তুত করা সম্ভবপর না হইতে পারে, কিন্তু বর্তমানে তাঁহার প্রাণময় ভাব প্রচার করিবার অপূর্ব সুযোগ আমরা পাইয়াছি। আমাদের

জীবনে তাঁহার আদর্শ জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে—সেই আদর্শ সর্বত্র প্রচার করিতে হইবে। ইহাই এখন স্বামীজীর স্মৃতি-রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, সাধন-ভজন করিয়া আধ্যাত্মিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। স্বামীজী ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন: 'First let us ourselves be gods, and then help others to be gods.' প্রথমে আমাদের নিজেদের দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তারপর সকলকেই দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য সাহায্য করিতে হইবে।

স্বামীজীর এই উপদেশ যেন আমরা সর্বদা স্মরণ করি এবং উহা কার্যে পরিণত করিয়া, তাঁহার স্মৃতি জীবন্তভাবে রক্ষা করিয়া, আমাদের জীবন ধন্য করিতে পারি—ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীস্বামীজীর চরণে আমার প্রার্থনা।

শতাব্দীর নমস্কার

অকিঞ্চন মুখোপাধ্যায়

তোমারে প্রণাম করি, তুমি চিরঞ্জীব ভারতের
উদার মর্মের বাণী ধরিয়াছ নিখিল লোকের
মানস সম্মুখে তুলি'। অবিকম্প তব কণ্ঠস্বরে
অবিনাশী আত্মরূপ দুর্দিনের ভয়ার্ত প্রহরে
জোগায়েছে মহাশক্তি। আত্মবিস্মৃতির মোহলাজে
নিমগ্ন মানব আত্মা তোমার প্রদীপ্ত মূর্তিমাঝে
লভেছে পৌরুষ নব। তব বিশ্বভ্রাতৃত্ব আহ্বান
উজ্জীবিত করিয়াছে দিকে দিকে লক্ষ লক্ষ প্রাণ
নবীন জীবন বেদে—হিংসা, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধহীন
দিব্যভাব রসসিক্ত, সমুজ্জ্বল, সরল, মসৃণ
শান্ত, মুক্ত, নিরুদ্বেগ।

আদর্শের সেই উচ্চ চূড়ে
নির্বিকার চিত্তে বসি' মুখোমুখী জীবন মৃত্যুরে
দেখিয়াছ একাশনে। যে অন্ধ তামসী বিভীষিকা
পঙ্গু করে জীবনেরে, তব বজ্র বহ্নি বাণী শিখা
নিঃশেষে হেনেছে তা'রে। বুঝায়ে দিয়েছ বারম্বার
মৃত্যুরে, এড়ায়ে নহে, মৃত্যুরে করিয়া অস্বীকার
প্রতিষ্ঠিত অমর জীবন; দেখায়েছ বারে বারে
জ্যোতির্ময় পুরুষের দৃপ্তরূপ তমসার পারে।
স্বরূপে সাক্ষাৎ শিব, মৃত্যুঞ্জয়ী, তুমি মহাবীর
তুমি যুগ-যুগন্ধর অনাগত শত শতাব্দীর।

সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

(৯) শূদ্র-সংস্কৃতি

স্বামী বিবেকানন্দের মতে পরবর্তী যুগ যে শূদ্রশ্রেণীর প্রাধান্যের যুগ, তা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখলাম। এই যুগের রূপ সম্বন্ধে তিনি যে সুনির্দিষ্ট অভিমত দিয়েছেন, তা পরবর্তী ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে—এ-কথা আমরা ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অভিমত আলোচনা-কালে দেখেছি। লেনিনের বহুপূর্বে তিনি 'Proletariat classless Society'-র কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে তিনি এ-সম্পর্কে বলছেন: 'ভারতের উচ্চবর্ণেরা, তোমরা ভূতকাল…। বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি ব'লে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতা-জনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতে তোমরা শূন্য। তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে অনেকগুলি রত্ন-পেটিকা আছে। এখন ইংরাজ-রাজ্যে, অবাধ-চর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পারো দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ ক'রে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান হ'তে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক কারখানা থেকে…।' তাঁর এই উক্তিটি নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু শূদ্র-অভ্যুত্থান সম্বন্ধে যে তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন এর মধ্যে, তা নয়। শূদ্র-অধ্যুষিত সমাজের সংস্কৃতির কি রূপ হবে, তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি এখানে। শূদ্রগণ তাঁদের শূদ্রত্ব-সহই বিরাজ করবে। শুধু উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির যা মহারত্ন, তা তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। লেনিনের যখন এ-বিষয়ে কোন ধারণা ছিল না, মাও সে-তুঙ্ যখন জন্মাননি, তখন বিবেকানন্দ দিচ্ছেন শূদ্র-সংস্কৃতির এই সুস্পষ্ট চিত্র।

কার্ল মার্ক্সের চিন্তাধারার সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার ঐক্য এই শ্রেণী-সংগ্রামের দিক থেকে পরিলক্ষিত হয়। মার্ক্স-এর মতে সমাজ-বিবর্তনের পাঁচটি পর্যায়,—আদিম সাম্যতন্ত্র, দাসপ্রথার যুগ, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র, সমাজতন্ত্র। শেষোক্ত পর্যায়টির আবার দুটি স্তর। প্রথম, শ্রমিক-একনায়কত্বের স্তর। দ্বিতীয়, শ্রেণীবিহীন সমাজের স্তর। এইটি হ'ল শেষ স্তর। প্রসঙ্গক্রমে বলছি যে, মার্ক্স-এর সমাজ-বিবর্তনের বিবরণ এখানে সমাপ্ত। শ্রেণী-বিহীন সমাজে পৌঁছবার পর সমাজের পরিবর্তন তো থেমে থাকবে, বিশ্ব-সৃষ্টির নিয়মই যে পরিবর্তন। কিন্তু সে পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। মার্ক্স-এর ব্যাখ্যা এই জন্যই অবৈজ্ঞানিক ও অসম্পূর্ণ ব'লে আখ্যাত হয়েছে সমালোচকদের দ্বারা। বিবেকানন্দের শ্রেণীপ্রাধান্য চক্রাকারে বিবর্তিত হয়। সে যাই হোক, মার্ক্স বলেন: শ্রেণীবিহীন সাম্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমিক-বিপ্লবের দ্বারা। আদিম সাম্য-সমাজে বর্বরোচিত সাম্য ছিল। তখন রাষ্ট্র, ধর্ম ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি শোষণের এই তিনটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। শেষ পর্যায়ের সমস্ত যন্ত্র 'will wither away'—শুষ্কপত্রের মতো ঝরে পড়বে। কারণ শ্রেণী না থাকলে শ্রেণী-শোষণের যন্ত্রের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। মধ্যবর্তী তিনটি যুগ

শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের যুগ। এই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা হ'তে দেখা যাচ্ছে শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ, সমাজ-বিপ্লব, শ্রমিক-অভ্যুত্থান ও পুরোহিত-তন্ত্রের বা মার্ক্স-এর কথিত ধর্মের শোষণকার্য সম্পর্কে বিবেকানন্দ ও কার্ল মার্ক্স-এর বিশ্বাস এক। এ-ছাড়া ঐক্যের অভাব অনেক। বিবেকানন্দ রাষ্ট্রযন্ত্রের অবসানের কথা বলেননি, আদিম সাম্য-সমাজের উল্লেখ করেননি। তা-ছাড়া, শূদ্র-শাসিত সমাজই বিবেকানন্দের মতে সমাজ-বিবর্তনের শেষ স্তর নয়। তা-ছাড়া শ্রমিক-সমাজের সংস্কৃতি-সম্বন্ধে মার্ক্সবাদীরা বিবেকানন্দের মত যা ভেবেছেন, তা ঠিক নয়। এ-সম্পর্কে এবার আমরা আলোচনা ক'রব।

সমাজতন্ত্রবাদিগণ বিবেকানন্দের 'I am a socialist' এই ঘোষণাটি যত্ন-সহকারে লক্ষ্য করেছেন, তার সঙ্গে যে তিনি আর একটি বাক্য যোজনা ক'রে দিয়েছিলেন, তা বিশেষ চিন্তা ক'রে দেখেননি। তিনি বলছেন, 'I am a socialist not because it is a perfect system, but half a loaf is better than no bread.' শূদ্র-অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী এ-কথা বিবেকানন্দ বললেও, তাতেই যে পরম কাম্যবস্তু লাভ হবে—এ-কথা তিনি একবারও বলেননি। বিশুদ্ধ শূদ্র-সংস্কৃতির উৎকর্ষ-সম্বন্ধে তাঁর গভীর সন্দেহ ছিল। আমরা ইতি-পূর্বেই দেখেছি, তিনি বলেছেন যে, শূদ্র-সংস্কৃতির প্রাধান্যকালে সভ্যতার অবনতি ঘটে। তাঁর স্বপ্নের সমাজ হ'ল সেই সমাজ, 'In which the knowledge of the priest-period, the culture of the military, and the distributive spirit of the commercial and the ideal of equality of the last can all be kept intact, minus their evils'.

যদিও তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'এমন একদিন আসিবে, যখন শূদ্রত্ব-সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে, তাহা নয়, শূদ্র-ধর্মকর্মের সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।' ('বর্তমান ভারত') কিন্তু তিনি মনে করতেন যে, একদিন চক্র ঘুরে যাবে এবং শূদ্র-সমাজ ব্রাহ্মণ-সমাজে পরিণত হবে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিতে উন্নীত হয়ে। তাঁর যে শ্রেণীবিহীন সমাজ, তার শেষ পর্যায়ে প্রজাপুঞ্জ সকলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবে—সে হবে বিশেষ সুবিধাহীন ব্রাহ্মণ-সমাজ। শূদ্র-শাসনে যে lowering of culture' ঘটে, তা পরিণামে অপসারিত হবে। অতএব, দেখা যাচ্ছে, 'শূদ্রের শূদ্রত্ব'-সহ অভ্যুত্থানের কথা তাঁর শেষ কথা নয়। এদিক দিয়ে মার্ক্সবাদের সঙ্গে তাঁর অনেক পার্থক্য।

(১০) সাম্যের ধারণা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদ

তাঁর 'সাম্যে'র ধারণাও (Concept of equality) মার্ক্সে-এর সাম্যের ধারণা হ'তে বহুল পরিমাণে পৃথক্। তিনি বলেছেন, 'We preach neither social equality nor ineqality, but that every being has the same rights, and insist upon freedom of thought and action in every way'.

এই উক্তির মধ্যে দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষণীয়। প্রথমতঃ এতে প্রতিপাদন করা হয়েছে এই কথা যে, প্রত্যেকের অধিকার এক, তার দ্বারা সামাজিক ঐক্য স্থাপিত হোক বা না হোক। শক্তির তারতম্য যদি চিরন্তন হয়, তা হলেও বেদান্তের যুক্তি অনুসারে—সকলকে একই অধিকার দিতে হবে। কিন্তু এই 'একই' বলতে বিবেকানন্দ প্রচলিত অর্থে 'same'

বোঝেননি। অনুন্নতের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধা বুঝেছেন। পত্রাবলীতে তিনি বলছেন, 'If there is inequality in nature, still there must be equal chances for all—...the weaker should be given more chance than the strong ...'। সম্পূর্ণ অভিনব এই সাম্যের ধারণা।

দ্বিতীয়ত: অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই কথাটি যে 'and insist upon freedom of thought and action in every way'—প্রত্যেককে বিশেষ ক'রে চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতা দিতেই হবে (insist upon)। কেন? না 'Liberty of thought and action is the only condition of life, of growth and well-being'. (Letters P. 73)। চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতা হ'ল জীবনের লক্ষণ, উন্নতির উপায় ও মঙ্গলের কারণ। তা শুধু নয়, 'where it does not exist, the man, the race, the nation must go down'. (Letters). যেখানে এই স্বাধীনতার অভাব আছে, সেখানে সমাজ সামগ্রিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়।

মার্ক্স-গোষ্ঠীভুক্ত যাবতীয় সমাজতন্ত্রবাদে চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা অত্যন্ত গৌণ স্থান পেয়েছে, প্রধান স্থান পেয়েছে অর্থনীতিক অধিকার। বর্তমান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শাসনতন্ত্রে ব্যক্তির বাক্য ও চিন্তার স্বাধীনতার কোন স্থান নেই। কিন্তু স্বামীজী এইরূপ ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বলছেন, 'the only condition of growth and well-being'। মানুষ যতই আর্থিক সম্পদ্ পাক, চিন্তার ও বাক্যের স্বাধীনতা ব্যতীত সে একটি যন্ত্র-মাত্র। যন্ত্রের মতো নিয়ন্ত্রিত হ'লে কিভাবে সে তার সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করবে? এ-বিষয়ে চরম সত্য কথা John Stuart Mill বলেছেন, Good government is no substitute for self-government'. এ-কথা রাষ্ট্রীয় জীবনে যেমন সত্য, সামগ্রিক সমাজ-জীবনে তেমন সত্য। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদে এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। মার্ক্সবাদে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বাদকে অস্বীকার করা হয়েছে।

(১১) বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী

বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রে যে কর্মপন্থা বা 'plan of action' নির্দেশিত হয়েছে, তা মার্ক্সীয় কর্মপন্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর স্পষ্ট motto হ'ল এ-বিষয়ে 'Elevation of masses without injuring religion'। তিনি বলেছেন বার বার 'Can you give them back their lost individuality without making them lose their innate spiritual nature?' জনগণকে উন্নত করতে হবে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁদের অধ্যাত্ম-প্রবণতা নষ্ট করা চলবে না। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, স্বামীজী একবারও জনসাধারণকে একটি বৈপ্লবিক কোন কিছুর মধ্যে জোর ক'রে অন্ধের মতো তাড়িয়ে নিতে চাইছেন না। তাঁর কথা হ'ল—তাদের উন্নত কর, মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে দাও। কিভাবে করতে হবে? - শিক্ষার দ্বারা। 'Educate the masses'—এই হ'ল তাঁর কর্মপন্থার প্রধান কথা। শিক্ষার দ্বারা জনগণকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে তাদের অন্তর্নিহিত ধর্ম-চেতনার কোন প্রকার ক্ষতি সাধন না ক'রে।

মার্ক্সবাদীরা বিবেকানন্দের নির্দেশিত এই কর্মপন্থার যখন সমালোচনা ক'রে থাকেন, তখন তাঁরা বলেন, একটি একটি ক'রে জনগণকে শিক্ষিত করতে অনন্ত কাল প্রয়োজন হবে। তা হ'লে জনগণকে কোন দিনই তাদের অধিকার ফিরে পেতে হবে না। এদের দিয়ে নেতৃবর্গের পরিচালনায় রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার

করিয়ে নিতে হবে সর্বপ্রথম। অন্ধের মতো হলেও বিরাট অশিক্ষিত জনসমাজকে উত্তেজিত ক'রে সেই লক্ষ্য পথে নিয়ে যেতে হবে। এবং বিবেকানন্দের কর্মপন্থাকে তাঁরা 'প্রতিক্রিয়াশীল' এবং 'ইউটোপিয়ান' ব'লে অভিহিত ক'রে থাকেন। কিন্তু বিপ্লবও শিক্ষা ব্যতীত সাধিত হয় না। জনগণকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে বহু আয়াসের প্রয়োজন, দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার প্রয়োজন হয়। প্রকারান্তরে তা হ'লে পথ একই—শিক্ষা, কেবল শিক্ষা-বিষয়ের পার্থক্য।

বিবেকানন্দ বিপ্লব-সংগঠনের পদ্ধতিতেই গণশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন: 'I am born to organise these youngmen ....and I shall want to send them irresistible waves over India bringing comfort, morality, religion, education to the doors of the meanest and the most down-trodden. And this I shall do or die'. (Letters Pp. 79-80)।

সহস্র সহস্র যুবককে তিনি সংগঠিত করবেন, যাঁরা সমুদ্র-তরঙ্গের মতো এই সুবিশাল ভারতবর্ষের বিপুল বক্ষে ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র—দীনতমের কুটীর পর্যন্ত এবং শিক্ষা দেবে তাদের—নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান, কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি। কাজটি খুবই দুরূহ, খুবই শক্ত। কিন্তু এ-কাজ সম্পন্ন করতেই হবে। 'The problem seems hopeless. I have found a way out. It is this. If the mountains does not come to Mahomet, Mahomet must go to the mountains. If the poor cannot come to education, education must come to reach them at the plough, in the factory, everywhere.' রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন, এইভাবে চাষীর ছোট্ট চাষক্ষেত্রে, কারখানায় সর্বত্র বিপ্লবের বাণী শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

স্বামীজীর মত—সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে; তাদের positive ideas দিতে হবে। 'spiritual, mental, physical' সর্ববিষয়েই positive ideas দিতে হবে। তারপর কি হবে, তা তিনি বলতে স্বীকৃত হননি। শুধু বলেছেন, 'we are to put the chemicals together, the crystalisation will be done by nature'. —তারপর রাসায়নিক দুটি মৌলিক পদার্থ সংযোজিত ক'রে দিলে আপনা থেকে যেভাবে যৌগিক পদার্থ আবির্ভূত হয়, তেমনি করেই যা বাঞ্ছিত ফল, তা আসবে। বাঞ্ছিত ফলের কথা আগেই বলেছেন 'প্রজ্ঞাপুঞ্জ-গঠিত ব্রাহ্মণ-সমাজ'। এবং স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে, এ-ভাবে যে পরিবর্তন ঘটবে, তা হবে সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক—'we shall be throwing the whole world to convulsion'।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে স্বামীজী এই বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দেশ করেছেন ধর্মের। 'Before flooding India with socialistic or political ideas, first deluge the land with spiritual ideas. This is the line of life, this is the line of growth and this is the line of well-being for India.' ভারতবর্ষে জাতীয় সত্তা বজায় রেখে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস করতে হবে। অবশ্য আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, তাঁর মতে পৃথিবীর সব সমাজকেই মানুষের দেবসত্তার স্বীকৃতির উপর দাঁড়াতে হবে এবং মানুষের সব স্বার্থকে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সব রাষ্ট্রকে। (ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দ ও অদ্বৈতবাদ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী ধীরেশানন্দ

আমরা স্বামীজীর দিব্য অনুভূতি-সমুজ্জ্বল বাণী, যাহা তিনি নিজ হস্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেই সংগ্রহ করিয়া বিচার করিব।

'সন্ন্যাসীর গীতি'তেও তিনি বলিতেছেন :

'............but far beyond
Both name and form in Atman ever free
Know Thou art That. Sannyasin bold
say—Om Tat Sat Om.'
'*The Self is all in all none else exists* ;
And Thou art That............'
'There is but One—the Free
the knower Self !
Without a name, without a form or stain.
In Him is Maya dreaming all this dream.
The Witness, He appears as nature, soul.
Know Thou art That............
'Release the soul for ever.
No more is birth,
Nor I, nor Thou, nor God nor man.
The 'I'
Became the All, the All is 'I' and Bliss.
Know Thou art That............'.

১৮৯৮ খৃঃ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জন্য লিখিত তাঁহার উদ্বোধন-বাণীতে দেখিতে পাই স্বামীজীর বজ্রনির্ঘোষে বলিতেছেন :

Awake, arise and *dream no more* !
This is the land of dreams, where Karma
Weaves unthreaded garlands
with our thought.
Of flowers sweet or noxious, and none
Has root or stem, being born
in naught, which
The softest breath of Truth drives back to
Primal nothingness. *Be bold and face*
The Truth ! Be one with it.
Let visions cease.
Or, if you cannot, dream then
truer dreams.
Which are Eternal Love and Service Free.

স্বামীজীর এই বাণীগুলির মধ্যে আমরা অষ্টাবক্রসংহিতার সুরেরই ঝঙ্কার শুনিতে পাইতেছি নাকি ? দক্ষিণেশ্বরে তিনিই একদিন ঠাকুরকে কটাক্ষ করিয়াছিলেন, 'ঘটিটা ব্রহ্ম, বাটিটা ব্রহ্ম—সব ব্রহ্ম, একি কখনও হ'তে পারে ? স্বষ্ট জীব—ব্রহ্ম, এরূপ মনে করাও পাপ।' তুল্য সন্দেহে পতিত জনৈক শিষ্যকে স্বামীজীই পরবর্তী জীবনে অন্যরূপ বলিয়াছেন। তখন তিনি অধ্যাত্মমার্গে সংশয়াকুল সাধক নরেন্দ্রনাথ নন, লোকোত্তর সাধনপ্রভাবে গুরুকৃপায় তখন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুভূতির অধিকারী—সিদ্ধ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। অদ্বৈত-জ্ঞানের বিমল প্রভায় তখন তাঁহার হৃদয়াকাশ সমুজ্জ্বল। সংশয়ের লেশমাত্র তখন নাই। স্বামীজী শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন :

I never taught *Such queer thought*
That all was God unmeaning talking !
But this I say Remember pray,
That *God is true, all else is nothing* !
The world is a dream, Though true it seem.
And only Truth is He, the Living !
The real me is none but He—
And never never matter changing !'

'জীবন্মুক্তের গীতি'তেই স্বামীজী আপন অনুভব অনন্যসুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন :

'Before even Time has had its birth,
I was, I am and I will be.
'I am beyond all sense, all thought,
The Witness of the Universe !
'*From dreams awake*, from bonds be free.
Be not afraid—this mystery,
My shadow cannot frighten me !
Know once for all that I am He !'

নিজের দিব্য অনুভূতির অনুপম পরিচয় স্বামীজী তাঁহার রচিত কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্বৈত অনুভূতির চরম শিখরেই তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন এবং সেই বাণীই তিনি দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জীব-কল্যাণার্থ অকাতরে সকলকে বিলাইয়া গিয়াছেন। স্বীয় গুরুর নিকট হইতে যেমন তিনি এই অলৌকিক বিদ্যা মুক্তভাবেই লাভ করিয়াছিলেন তেমনি মুক্তভাবেই তাহা সকলকে দান করিতেও তিনি কোন কার্পণ্য করেন নাই।

বেদান্তোক্ত অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি-লাভে কৃতার্থ হইলেও স্বামীজী কিন্তু জগতের প্রতি উদাসীন থাকেন নাই। সর্বভূতে এক ব্রহ্মদর্শনকরত তিনি তাঁহারই সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন :

ব্রহ্ম হ'তে কীটপরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়॥

ঈশ্বরে ফলার্পণ-বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনাদ্বারা চিত্তশুদ্ধ না হইলে এবং আত্ম-জিজ্ঞাসা না জাগিলে বেদান্ততত্ত্ব সাধকহৃদয়ে স্ফুরিত হয় না—ইহা বেদান্তের সুস্পষ্ট নির্দেশ। পূর্ব পূর্ব যুগে চিত্তশুদ্ধির জন্য আচার্যেরা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম সন্ধ্যাবন্দনা, অগ্নিহোত্রাদির বিধান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত। এখন অগ্নিহোত্রাদি করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিবার সুযোগ ও অবসর কোথায়? তাই স্বামীজী যুগোপযোগী সাধন বিধান করিলেন :

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

জীব-শিব, শিববুদ্ধিতে জীবের সেবাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি কর—ইহাই যুগাচার্যের অভিনব বাণী। ঈশ্বরেচ্ছায় এই সুমহান্ আদর্শটিই তাঁহার জীবনে নিষ্কাম সেবাদ্বারা ধন্য হইবার সুযোগ প্রদান করত বিভিন্ন জীবরূপে স্বীয় ইষ্টই সাধকসমক্ষে উপস্থিত—এই জ্ঞানে জনতা-জনার্দনের সেবা করিতে পারিলে সেই কর্ম ও উপাসনায় আর কোন পার্থক্য থাকে না। কর্ম তখন উপাসনায় পরিণত হয়। এইরূপে সেবা করিতে করিতে হৃদ্‌গত সমস্ত পাপ, ভোগবাসনাদি ও চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইয়া যায় ও সাধকের চিত্ত ক্রমে সত্ত্বগুণের উদয়ে শান্ত, অন্তর্মুখ ও আত্মনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। ইহাই নিষ্কাম কর্মযোগের **'কসৌটি'** অর্থাৎ **'কষ্টিপাথর'**। তখন বেদান্তবিদ্যা সেই শুদ্ধ-সত্ত্বগুণ-প্রধান চিত্তে সত্বর অতি অল্প আয়াসেই বিকশিত হয়। শ্রীগুরুমুখে লব্ধ এই সাধন-রহস্যটিও তিনি সকলের কল্যাণার্থ প্রকট করিয়া গিয়াছেন। ইহা স্বামীজীর একটি বিশেষ অবদান।

স্বামীজীর বেদান্তপ্রচার বিষয়ে একটি শঙ্কা হইয়া থাকে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ কত অধিকারী বিচার করিয়া তবে এই অদ্বৈত বেদান্ত উপদেশ দিতেন। একমাত্র প্রিয় নরেন্দ্রনাথকেই তিনি বিশেষভাবে অদ্বৈততত্ত্বের শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজী অধিকারিনির্বিশেষে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সকলকে এই উপদেশ দিলেন কেন? ইহাতে শ্রীগুরুপ্রদর্শিত পন্থার বিরুদ্ধে আচরণ করা হইল না কি? শুনিয়াছি সংঘের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণের অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন :

'ঠাকুর লোক দেখিয়াই কে কিরূপ অধিকারী, তাহা বুঝিতে পারিতেন। আমাদের তো সেরূপ ক্ষমতা নাই? আমি

অকাতরে রত্ন বিলিয়ে গেলুম, যে অধিকারী, সে গ্রহণ ক'রে ধন্য হবে। —কি সুন্দর সরল কথা! কি অপূর্ব হৃদয়বত্তা ও নিরভিমানতা! তত্ত্বজ্ঞ আচার্য ব্যতীত আর কে এরূপ কথা বলিতে পারেন?

স্বামীজীর অদ্বৈত বেদান্তনির্ঘোষ ব্যর্থ হয় নাই। উহা পাশ্চাত্য চিন্তাজগতে একটি সুদূরপ্রসারী আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। জগতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই এখন এই তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন এবং নবযুগের উদ্‌গাতা স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিতেছেন। ব্যক্তিগতভাবে ও তাঁহার শিক্ষা বহু ব্যক্তির জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছে ও বহুভাগ্যবান্ পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এখানে একটি ঘটনা লিখিলে মন্দ হইবে না। স্বামীজীর সাহচর্যে তাঁহার প্রিয় ইংরেজ শিষ্য মিঃ সেভিয়ার অদ্বৈত বেদান্তের একনিষ্ঠ অনুরাগী এবং অদ্বৈত ভাবের চিন্তাতেই একান্ত অনুপ্রাণিত ছিলেন। শ্রীগুরুর ইচ্ছানুযায়ী অদ্বৈত ভাবের সাধনের অনুকূল একটি কেন্দ্র তিনি নির্মাণ করিলেন। উহাই মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম। অসীম পরিশ্রম সহকারে এই প্রতিষ্ঠানটি তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধি-কবলিত হইয়া স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই তিনি হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে সেই আশ্রমেই দেহত্যাগ করিলেন। শুনিতে পাই, মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন,

'After my death, please cremate the body and throw the ashes into the wind. Never raise any monument on that spot of cremation. I don't like to be remembered as an individual soul. I am one with the Universal Spirit.' —

—ফলীভূত অদ্বৈতবেদান্ত-নিষ্ঠার কি সুন্দর অভিব্যক্তি! বলা বাহুল্য সেভিয়ার সাহেবের শেষ অনুরোধ যথাযথ রক্ষিত হইয়াছিল।

সর্ব পরিচ্ছিন্ন বস্তু (ঘটি, বাটি) কিরূপে ব্রহ্ম হইতে পারে, এই শঙ্কা একদিন যুবক নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরু-সমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বেদান্ত যখন বলেন, 'সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম', তখন বস্তুতঃ অধিষ্ঠান-তত্ত্বের জ্ঞানে যখন সর্ব নামরূপ বাধিত হইয়া যায়, তখনই সর্ব জগৎ ব্রহ্মাভিন্ন-রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। পুরুষের যখন স্থাণু ভ্রম হয়, তখন পুরুষবুদ্ধিদ্বারা স্থাণুত্ব-বুদ্ধি যেরূপ বাধিত বা নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ। ইহাকেই বেদান্তে **'বাধসামানাধিকরণ্য'** বলা হইয়া থাকে। উত্তরকালে স্বামীজী সর্ব নামরূপ বাধপূর্বকই ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়াছিলেন ও তাহাই তিনি স্বীয় লেখনীমুখে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহা আমরা পূর্বে তাঁহার রচিত কবিতা-সঞ্চয় 'বীরবাণী' হইতে উদ্ধৃতিসমূহে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছি।

নরেন্দ্রনাথ একদিন স্বীয় গুরুর নিকট সদা নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া থাকিবার বাসনা অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ নরেন্দ্রনাথের পক্ষে এই কামনা স্বাভাবিক। কিন্তু গুরু উত্তর দিয়াছিলেন:

'তুই অত বড় আধার, কালে কত লোকের আশ্রয় হবি। কেবল সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মানুভব করবি কেন? তার চেয়েও বড় অবস্থা তোর হবে, ইত্যাদি।'

নির্বিকল্প সমাধিই সর্বোচ্চ অবস্থা, ইহাই অনেকের ধারণা। কিন্তু ঠাকুর এখানে তার চেয়েও বড় অবস্থার কথা বলিয়া কি সূচনা করিলেন? বিচারাদি সাধনসহায়ে যখন এক অখণ্ডাকারা বৃত্তি অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উদয় হয়, তখন সর্ব দ্বৈতপ্রতীতি ও ভাবনারহিত হইয়া চিত্ত নির্বিকল্প অবস্থাতে সমাহিত হইয়া

পড়ে, ইহা সত্য কথা। অখণ্ডাকারা বৃত্তিদ্বারাই **ব্রহ্মস্বরূপাবরক** অজ্ঞান (**আবরণশক্তি**) নানা হইয়া গেলেও প্রারব্ধপ্রতিবন্ধবশতঃ অজ্ঞানের **বিক্ষেপশক্তি** ও তাহার কার্য (দেহেন্দ্রিয়াদি ও বাহ্য পদার্থ) বাধিত ভাবে প্রারব্ধভোগশেষ পর্যন্ত অবস্থান করে, উহার জ্ঞানকালেই নাশ হয় না। অতএব জ্ঞানের পরও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের ব্যবহার দেখা যায়। তাঁহার এই ব্যবহারের নিয়ামক তাঁহার প্রারব্ধ বা ঈশ্বরেচ্ছা। জ্ঞানী ব্যবহারকালে কি স্ব-স্বরূপ-বোধ ভুলিয়া যান? অর্থাৎ কেবল সমাধি-কালেই কি তাঁহার ঐ অনুভব হইয়া থাকে? —এই শঙ্কার উত্তরে **বেদান্ত বলেন যে, জ্ঞানী ব্যবহারকালেও সদাসমাধিস্থই থাকেন**। তাঁহার স্বরূপের বিচ্যুতি আর কখনই হয় না। উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে **সর্বাবস্থাতেই জ্ঞানী স্বরূপস্থ**। ইহা এক অপূর্ব স্থিতি। ইহা সাধারণের বোধগম্য নয়। তত্তুল্য জ্ঞানীই ইহা জানিতে বা বুঝিতে পারেন।

অন্তর্বিকল্পশূন্যস্থ বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ।
ভ্রান্তস্যেব দশাস্তাস্তাস্তাদৃশা এব জানতে॥

—অন্তরে আত্মদৃষ্টিসহায়ে নির্বিকল্প নিশ্চয়, কিন্তু বাহিরে যেন অজ্ঞানী-তুল্য স্বচ্ছন্দ ব্যবহার —জীবন্মুক্ত পুরুষের এই অপূর্ব অবস্থা তত্তুল্য অন্য জ্ঞানিগণই জানিয়া থাকেন।

তখন আর তাঁহার নিজের কোন কর্তব্যই থাকে না। ধ্যান, সমাধি, বিক্ষেপ—এই সকলই চিত্তধর্ম, ইহা নিশ্চিতরূপে জানিয়া তিনি স্বরূপস্থিতি লাভ করেন। তখন সর্ব-ব্যবহার করিয়াও তাঁহার সর্বদা **ব্রাহ্মীস্থিতি। ইহাকেই** আচার্যগণ—**'জ্ঞানসমাধি' 'সবোধ সমাধি'** বা **'সহজাবস্থা'** বলিয়াছেন। এই সমাধি হইতে জ্ঞানীর আর ব্যুত্থান হয় না।

অন্য আয়াসসাধ্য নির্বিকল্প সমাধি হইতে যোগীর কোন না কোন সময়ে ব্যুত্থান ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের আর ব্যুত্থান নাই। এই স্থিতি লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার ভগবান্ শ্রীশংকরাচার্য বলিয়াছেন (বাক্যসুধা ৩০):

দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি।
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ॥

—পরমাত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যখন দেহাভিমান নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তখন যে যে বিষয়েই মন ব্যাপৃত হউক না কেন, সেখানেই জ্ঞানীর সমাধি অবস্থা। অর্থাৎ **বিষয় ব্যবহার-কালেও জ্ঞানী 'জ্ঞানসমাধি' হইতে বিচ্যুত হন না**। এই অবস্থা সূচনা করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রিয়শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে বলিয়া-ছিলেন, 'তুই কেবল সমাধিকালে কেন ব্রহ্মানু-ভব করিতে চাস্, উঠতে বসতে সর্বব্যবহারেই তোর ব্রহ্মানুভব হবে।' —ইহাই বেদান্তোক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মানুভব। বলা বাহুল্য এই অবস্থাই লাভ করত স্বামীজী কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন।

কেবল সমাধিকালে অদ্বৈতানুভব, ইহা শাক্ত-অদ্বৈতবাদের মত। সে মতে মন ষট্‌চক্র ভেদ পূর্বক সহস্রারে উঠিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব ঘটিয়া থাকে এবং অভেদ জ্ঞান হয়। নিম্ন চক্রে মন নামিলে দ্বৈত প্রতীতি উপস্থিত হওয়াতে সেই অভেদ জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু **বেদান্তের মতে জ্ঞান হইলে দ্বৈতসত্তার একান্ত অভাব ঘটিয়া থাকে,** অর্থাৎ স্বসত্তাতিরিক্ত সত্তা কোন কালেই নাই। সুতরাং **দ্বৈতপ্রতীতি দ্বারা অদ্বৈতানুভবের কোন হানি হয় না। কারণ ঐ দ্বৈতপ্রতীতি একান্ত মিথ্যা। শাক্ত-মতে দ্বৈতপ্রতীতি সত্য, আর বেদান্ত-মতে উহা মিথ্যা প্রতিভাস মাত্র—ইহাই রহস্য**। এই রহস্যের বোধ না থাকাতেই অনেকে এই ভ্রমে পতিত হইয়া

থাকেন যে, কেবল একমাত্র নির্বিকল্প সমাধি-কালেই ব্রহ্মানুভব হয়, অন্য কালে নয়। জ্ঞানী সমাধিকালেও যেরূপ অদ্বয় ব্রহ্মানুভব করিয়া থাকেন, ব্যবহারকালেও তদ্রূপ অদ্বয় ব্রহ্মানুভবই করেন। ব্যবহারকালে দ্বৈত-প্রতীতি হইলেও তাহা দ্বারা তাঁহার অদ্বয়ানুভব ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টিতে দ্বৈত মিথ্যাপ্রতীতি মাত্র। দ্বৈত বলিয়া কোন পদার্থের বাস্তব সত্তা নাই।

সমাহিতা ব্যুত্থিতা বা বৃত্তিঃ সর্বা চিদাকৃতিঃ॥
ন সমাহিত ধীঃ কশ্চিৎ প্রতীচোঽন্যৎ প্রপশ্যতি।
ব্যুত্থিতাত্মাপি চাত্মানং পশ্যন্নেবান্যদীক্ষতে॥

—(বৃহঃ বার্তিকসার ২।৪।৪০, ৪১)

…সমাধি বা ব্যুত্থান সর্বকালেই জ্ঞানীর বৃত্তি চিদাকার হইয়া থাকে। সমাধিস্থ পুরুষ প্রত্যক্‌চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করেন না, পুনঃ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া তিনি অন্য পদার্থ দর্শন করিলেও সদা আত্মানুভবই করিয়া থাকেন। কারণ—

অদৃষ্টা দর্পণং নৈব তদন্তস্থেক্ষণং তথা।
অমত্বা সচ্চিদানন্দং নামরূপমতিঃ কুতঃ॥

—(পঞ্চদশী ১৩।১০২)

—সর্বপ্রথম দর্পণকে উপলব্ধি না করিয়া যেরূপ দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের দর্শন হইতে পারে না, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার উপলব্ধি ব্যতীত তদ্রূপ নামরূপের বোধ হইবে কি করিয়া? —অর্থাৎ **নামরূপাত্মক ব্যবহার, জ্ঞান-কালেও তত্ত্বের ব্রহ্মানুভূতিই হয়। দ্বৈত-সত্যত্ববোধকারী যোগী ও উপাসক-গণই** দ্বৈতপ্রতীতিতে ভীত হইয়া সমাধির শরণ লইয়া থাকেন। বিচারমাত্রৈকশরণ, বেদান্তানুগ সাধকগণের পক্ষে তাহা নিষ্প্রয়োজন। চিত্তগত মালিন্যাদি দূর করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে তাঁহারাও সমাধি-আদি অভ্যাস করিতে পারেন, সে-কথা স্বতন্ত্র। সে-জন্য উপাসনা ও যোগাভ্যাসাদির বিধানও বেদান্ত দিয়াছেন।

আর একটি বিষয় এখানে বিচার্য মনে হয়। ঠাকুর অনেক স্থলে জ্ঞানের পর **বিজ্ঞানের** কথা বলিয়াছেন। বিজ্ঞানীর অবস্থা বিষয়ে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন :

'নারদাদি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন —এরি নাম **বিজ্ঞান**।' —(কথামৃত ৪।১৯।১)

'কেন ভক্তি নিয়ে থাকা? —**তা না হ'লে মানুষ কি নিয়ে থাকে? কি নিয়ে দিন কাটায়?** 'আমি' তো যাবার নয়, আমি-ঘট থাকতে সোঽহং হয় না। যখন সমাধিস্থ হ'লে. আমি পুছে যায়—তখন যা আছে তাই।'

'বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। সে সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছে।… তাঁকে চিন্তা করে অখণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ, —আবার মন লয় না হলে লীলাতে মন রেখেও আনন্দ।' (ঐ, ৩।৯।৩)

'বিজ্ঞানী দেখে—নেতি নেতি ক'রে যাঁকে ব্রহ্ম ব'লে বোধ হচ্ছে তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। তিনি দেখেন—যিনি সগুণ, তিনিই নিগুর্ণ।'—(ঐ, ৩।১।৪)

'বিজ্ঞানী কেন ভক্তি লয়ে থাকে? এর উত্তর—'আমি' যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু আবার এসে পড়ে।' (ঐ, ৩।১।৫)

'ঈশ্বর আছেন—এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান। তাঁর সঙ্গে আলাপ, আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, মধুর-ভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান। জীবজগৎ তিনি হয়েছেন—এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।'

'বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে। চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হ'তে লীলাতে থাকে—কখনও লীলা থেকে নিত্যতে

যায়। নিত্যে পৌঁছে আবার ছাখে তিনি এই সব হয়েছেন—জীবজগৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব।'

'আর এক আছে—যা কিছু দেখছ, সব তিনি হয়েছেন। যেমন—বিচি, খোলা, শাঁস তিন জড়িয়ে এক। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা, যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য।' (ঐ, ৩।২০।৩)

–ঠাকুরের এই-সকল কথা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি **বিজ্ঞানীর অবস্থা দ্বারা ব্যবহারকালে শাক্তাদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদভাব লইয়া থাকার কথাই বলিতেছেন**। এখানে ঠাকুরের একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সেটি এই : "'ব্রহ্মজ্ঞানের পরও, **যাঁরা সাকারবাদী,** তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি নিয়ে থাকে। যেমন পূর্ণ কুম্ভ—জল অন্য পাত্রে ঢালাঢালি করছে।' (ঐ ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৩৪)। —এই বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করিব। অদ্বৈতবেদান্তের অধিকারিগণকে আচার্যগণ দুইটি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। এক শ্রেণী **কৃতোপাসক** ও অপর শ্রেণী **অকৃতোপাসক**। যাঁহারা উপাস্যদেবতার সাক্ষাৎকার পর্যন্ত উপাসনা পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এইরূপ অত্যন্ত একাগ্র ও শুদ্ধচিত্ত অধিকারীদিগকে, অর্থাৎ যাঁহারা পূর্ণরূপে দ্বৈতসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অদ্বৈত সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাহাদিগকে কৃতোপাসক বলা হয়। তাঁহারাই বেদান্তের অতি উত্তম অধিকারী। আর যাঁহারা কথঞ্চিৎ দ্বৈতসাধনা সম্পন্ন করিয়া অর্থাৎ কিছু উপাসনা করিয়া বা না করিয়াই বেদান্ত বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে অকৃতোপাসক বলা হয়। ইঁহাদিগকে নিম্নাধিকারীরূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। ইঁহাদের জন্য যোগাভ্যাস, নির্গুণোপাসনাদি বিহিত আছে, কারণ ইঁহারা বিচারে অসমর্থ।

কৃতোপাসকগণ অত্যল্পকালেই বিচারাদি সাধন সহায়ে তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ করেন ও নির্বিকল্পভূমিতে আরোহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ জ্ঞানিগণ কেহ কেহ চিত্তবিশ্রান্তির তারতম্য অনুসারে পঞ্চমাদি ভূমিত্রয়ে আরূঢ় হইয়া পরমানন্দে মগ্ন থাকেন। পুনঃ কেহ কেহ বলবতী ঈশ্বরেচ্ছায় প্রেরিত হইয়া লোক-শিক্ষার্থ পূর্বাভ্যাসবশতঃ ভক্তি ভক্ত লইয়া ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ইঁহারাই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত **'বিজ্ঞানী'** পদবাচ্য বলা যাইতে পারে। সে জন্যই তিনি 'ব্রহ্মজ্ঞানের পরও, যাঁরা **সাকারবাদী,** তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে'—এইরূপ বলিয়াছেন। বাহ্য আচরণে পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞানে কোন প্রভেদ নাই। সকলেরই এক জ্ঞান। তাঁহাদের ব্যবহারগত বৈষম্য প্রারব্ধ বা ঈশ্বরেচ্ছার দ্বারাই নিয়মিত হইয়া থাকে।

জগদম্বার একনিষ্ঠ ভক্ত, মাতৃগতপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণও কিন্তু বেদান্তোক্ত অদ্বিতীয় ব্রহ্মানু-ভূতির পর মায়ের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কটুকু অভ্যাসবশতঃ ভুলিতে পারেন নাই। সে সম্পর্কটুকু বজায় রাখিয়াই তিনি ব্যবহার-ভূমিতে মায়ের সঙ্গে দিব্য লীলা শেষ অবধি করিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্ধন করিয়া গিয়াছেন। স্বীয় অননুকরণীয় কি সুমধুর ভাবেই না তিনি তাহা ব্যক্ত করিতেন! নিজেকে মাতার একান্ত নির্ভরশীল বালক ভিন্ন আর কিছু তিনি ভাবিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন—

'তোমরা জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়—ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় ইত্যাদি যাই বল না কেন, আমি কি জানি, জানো? আমি জানি—তিনি মা ও আমি ছেলে। বালকের মা চাই না?'—কি সুন্দর সরল কথা! এরূপ ব্যবহারেরও স্বকায়

মাধুর্যমণ্ডিত মহিমা কে অস্বীকার করিবে? তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের এবংবিধ লীলাদর্শন করিয়াই বোধ হয় কোন রসিক কবি গাহিয়াছেন :

দ্বৈতং বন্ধায় নূনং প্রাক্ প্রাপ্তে বোধে মনীষয়া।
ভক্ত্যা যৎ কল্পিতং দ্বৈতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্॥

—জ্ঞানলাভের পূর্বে দ্বৈতবোধ বন্ধনকারী বটে, কিন্তু শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানোদয়ের পর স্বভাব-বশতঃ ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার যে **কল্পিত উপাস্য-উপাসকাত্মক দ্বৈত-ব্যবহার,** তাহা অদ্বৈত অপেক্ষাও সুন্দর।

সন্ন্যাসপ্রদানানন্তর প্রিয় শিষ্যকে নানা যুক্তি, সিদ্ধান্তবাক্য এবং বেদান্ত-প্রসিদ্ধ 'নেতি নেতি'- উপায়াবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য ব্রহ্মজ্ঞ গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরী উৎসাহিত করিতে লাগিলে শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু সহসাই নামরূপের গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারিতেছিলেন না। মনকে বিচারসহায়ে একটু অন্তর্মুখ করিবামাত্রই চিরপরিচিত মায়ের চিদ্‌ঘনোজ্জ্বল মূর্তিটি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে পুনঃপুনঃ মনে উদিত হইতেছিল। শ্রীগুরুর বিশেষ প্রেরণায় মনকে একাগ্র করিয়া অবশেষে তিনি দৃঢ় বিচারসহায়ে অতি প্রিয় জগদম্বার শ্রীমূর্তিটিও মিথ্যা নামরূপাত্মক-জ্ঞানে পরিত্যাগ-করত ব্রাহ্মীস্থিতি লাভে গভীর সমাধিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বেদান্তোক্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিলেও তিনি ঈশ্বরেচ্ছায় লোকশিক্ষার্থ পুনঃ ভক্তি ভক্ত-ভাব লইয়াই **'বিজ্ঞানী'র** লীলা করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরকৃপায় এই 'বিজ্ঞানী'রূপে যদি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে না পাইতাম—যদি তিনি ভক্তি-ভক্ত লইয়া সুমধুর লীলা না করিতেন, তবে আমরা আমাদের সুপরিচিত দক্ষিণেশ্বরের প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে পাইতাম কি? তাঁহার কথামৃতধারায় সিঞ্চিত হইয়া জগতের অগণিত নরনারী শান্তিলাভের সুযোগ পাইত কি? গুরুগতপ্রাণ শ্রীবিবেকানন্দও এ-বিষয়ে শ্রীগুরুরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। সদা সমাধিস্থ হইয়া থাকিবার তীব্র ইচ্ছা ও সামর্থ্য সত্ত্বেও তিনি তাহা করেন নাই। কারণ অলঙ্ঘনীয় ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহাকেও লোকহিতার্থ বিবিধ কর্ম করিতে হইয়াছে। জ্ঞানী হইয়াও পুনঃ **বিজ্ঞানী** সাজিতে হইয়াছে।

যে-সকল জ্ঞানী পূর্বাভ্যাসবশতঃ অপরোক্ষ জ্ঞানের পর ভক্তি-ভক্ত লইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেই ঠাকুর **'বিজ্ঞানী'** নাম দিয়াছেন। ইহা কোন শাস্ত্রীয় পারিভাষিক শব্দ নয়। ঠাকুর এইভাবে একটি বিষয়ের সুন্দর অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন, একটি নূতন পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি করিলেন। গীতাদি শাস্ত্রে বিজ্ঞান-শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

'জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্'—গীতা ৩।৪১
'জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা'— ঐ ৬।৮
'জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্'—ঐ ৯।১

এই সব স্থলেই জ্ঞান অর্থ শাস্ত্র ও আচার্যমুখে প্রাপ্ত জ্ঞান অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান অর্থ উহার বিশেষ অনুভব অর্থাৎ অপরোক্ষ তত্ত্বসাক্ষাৎকার। জ্ঞান-শব্দটি যেখানে একক ব্যবহৃত হয়, সেখানে অনেক সময় উহা অপরোক্ষানুভববোধক হইয়া থাকে।

সে যাহাই হউক, বিজ্ঞানীর অবস্থা বুঝাইতে গিয়া ঠাকুর তাঁহাকে অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানের উপরে স্থান দিলেন, এরূপ বুঝিলে ভুল হইবে। উপর বা নিম্ন—এরূপ কোন বিবক্ষা এখানে নাই। তত্ত্বজ্ঞানীদের বাহ্য আচরণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যাঁহারা ভক্তিভাবে ঈশ্বরের নামগুণ-কীর্তনাদি-সহায়ে ভক্তগণসহ ঈশ্বরানন্দ উপভোগকরত

স্বীয় প্রারব্ধ ব্যতীত করেন, তাঁহারাই ঠাকুরের কথায় '**বিজ্ঞানী**' পদবাচ্য। ইহাতে কোন ব্যর্থতা নাই। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রারব্ধ বা ঈশ্বরেচ্ছাদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই বিষয়ে আচার্যগণ বলিয়া থাকেন :

কৃষ্ণ ভোগী শুকস্ত্যাগী নৃপৌ জনকরাঘবৌ।
বশিষ্ঠঃ কর্মকর্তা চ ত এতে জ্ঞানিনঃ সমাঃ॥

—কৃষ্ণ কত ভোগ্য পদার্থ আস্বাদন করিয়াছেন; শুক সর্বত্যাগী, জনক ও রামচন্দ্র রাজত্ব করিয়াছেন এবং বশিষ্ঠদেব সদা যাগ-যজ্ঞাদি কর্মে তৎপর—বাহ্য ব্যবহারে ইঁহাদের এইরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও ইঁহারা সকলেই তুল্য জ্ঞানী। জ্ঞানের ইতরবিশেষ কিছু নাই।

জ্ঞানের কোন তারতম্য না থাকিলেও চিত্তের সমাহিতাবস্থার তারতম্য-বশতঃ বেদান্তে ভূমিকাদি ভেদ কল্পিত হইয়াছে। জ্ঞানের সপ্তভূমিকার মধ্যে পঞ্চমাদি শেষভূমি-ত্রয় চিত্তে সমাহিতাবস্থারই বিভিন্ন স্তর মাত্র। ইহা লক্ষ্য করিয়াই ঠাকুর বলিয়াছেন: কেহ সচ্চিদানন্দ সাগর দর্শন করিয়াছে, কেহ স্পর্শ করিয়াছে, কেহ এক গণ্ডূষ, কেহ বা তিন গণ্ডূষ জলপান করিয়াছে ইত্যাদি। এ বিষয়টি এখানে আর অধিক বিস্তার করা হইল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদ-রচয়িতা স্বামী সারদানন্দের রচনা পুনরায় উদ্ধৃতিপূর্বক আমরা এই আলোচনার উপসংহার করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন :

অদ্বৈত ভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুরের এইকালে আর একটি বিষয়ও উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, **অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য।** কারণ, ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া তিনি ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা সকলেই সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে। ..... তিনি আমাদিগকে বারংবার বলিতেন—উহা শেষ কথা রে শেষ কথা। সকল মতেরই জানিবি উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ। —লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব ১৬ অ

ঠাকুর বলিতেন—'যে ঠিক ঠিক অদ্বৈত-বাদী সে চুপ হইয়া যায়। অদ্বৈতবাদ বলবার বিষয় নয়। বলতে কইতে গেলেই দুটো এসে পড়ে।' অতএব দেখা যাইতেছে, ঠাকুর বলিতেন—যতক্ষণ 'আমি তুমি' 'বলা কহা' প্রভৃতি রহিয়াছে ততক্ষণ নির্গুণ সগুণ, নিত্য ও লীলা, দুই ভাবই কার্যে মানিতে হইবে। ততক্ষণ অদ্বৈতভাব মুখে বলিলেও কার্যে **ব্যবহারে তোমাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী** থাকিতে হইবে। —ঐ, গুরুভাব। ৩য় অধ্যায়

পারমার্থিক এক নির্গুণ, নির্বিশেষ, অদ্বৈত-বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বের ভিত্তিতেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অন্য যাবতীয় মতবাদের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন এবং গুরুগতপ্রাণ অশেষগুণাধার তাঁহার পরমপ্রিয়শিষ্য নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) তাহাই অপরোক্ষ অনুভব করিয়া জগৎসমক্ষে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

সকল প্রকার ধর্মমতে সাধন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদের যাথার্থ্য নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলেন যে, উহাদের প্রত্যেকটিই অন্তিমে বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মানুভূতিতেই পর্যবসিত হয় এবং সেইজন্য তাঁহার মতে **সকল ধর্মই বেদান্তোক্ত নির্গুণ ব্রহ্মে সমন্বিত।** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণে এই বাণীই জগদ্বাসী স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শুনিতে পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত 'শিক্ষাষ্টকে'র রূপায়ণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী সুধা সেন

শ্রীমতীর প্রেমের মহিমা চণ্ডীদাস যেমন আপন অন্তরে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তেমনই ধন্য হইয়াছিলেন লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল), কবি জয়দেব ও মিথিলার কবি বিদ্যাপতি! তাঁহারাই যেন শ্রীমতীর নির্বাচিত পাত্র—গৌর-অবতারের আবির্ভাবের ক্ষেত্র তাঁহারাই প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় চণ্ডীদস, বিদ্যাপতির পদাবলী, গীতগোবিন্দ ও কৃষ্ণ-কর্ণামৃতের শ্লোকই শুধু শ্রবণ করিতেন এবং আনন্দ পাইতেন। তাঁহার ভাবানুযায়ী পদ নির্বাচন করিয়া সুকণ্ঠ স্বরূপদামোদর সঙ্গীত করিতেন এবং রায়রামানন্দ মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতেন।

ব্রজে ছিল পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, মান, দান ও ক্ষণিক বিরহ। কিন্তু ব্রজের মাত্র কয়েকটি সুখের দিবস-রজনী মুহূর্তেই বিলীন হইয়া গেল ঘনঘোর কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইয়া গেল সমস্ত আনন্দ! মথুরায় চলিয়া গেলেন—রচিত হইল জগতের চরমতম বেদনার অশ্রুভারাক্রান্ত বক্ষবিদীর্ণকারী —মাথুর কাব্য।

'মাধব! তুঁহু রহলি মধুপুর
ব্রজপুর আকুল দুকুল কলরব,
কানু কানু কহি ঝুর!'

—হে মাধব; হে ব্রজের জীবনধন! তুমি মথুরায় চলিয়া গিয়াছ, তোমার অদর্শনে আজ ব্রজপুর আকুল, সমস্ত কথাই আজ ব্রজে স্তব্ধ, কেবল 'কানু কানু' বলিয়াই অশ্রু ঝরিতেছে সকলের চোখে।

'যশোমতী নন্দ, অন্ধসম বৈঠত,
সাহসে উঠই না পার;
সখাগণ বেণু, ধেনু সব ছোড়ল
ছোড়ল নগর বাজার।
কুসুম ত্যজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুটই,
তরুগণ মলিন সমান,
শারীশুক পিক ময়ূরী না নাচত
কোকিলা না করত গান।
বিরহিণী-বিরহ কি কহব মাধব,
দশদিশি বিরহ হুতাশ,
সহজ যমুনাজল হোয়ল অধিক ভেল
কহতনি গোবিন্দদাস।'

নয়নানন্দ গোবিন্দকে নয়ন আর দেখিতে পাইবে না—তাই মা যশোমতী আর পিতা নন্দ অন্ধসম হইয়া বসিয়া আছেন—সখাগণ বেণুরব করে না—গোষ্ঠে যায় না।

আজ ম্লান তরুগুলিতে আর ফুল ফোটে না, ভ্রমর কুসুম ত্যাগ করিয়া ধূলায় লুটাইতেছে, শারী শুক পিক আর গান গাহে না, ময়ূরী আর নাচে না।

আর বিরহিণী শ্রীমতীর সে নিদারুণ বিরহ-যন্ত্রণার কথা কেমন করিয়া বলিব মাধব? তাহার বিরহতাপে আজ দশদিশি দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, সমস্ত দিক শূন্যময়—যেন মরুতৃষায় হাহাকার করিতেছে, কেবল যমুনার জলই বাড়িয়া গিয়াছে শুধু ব্রজবাসীর নয়নজলে!

এই যে বিরহের আর্তি—ইহাই মহাপ্রভুর আস্বাদ্য, ইহাই জগতে মহাপ্রভুর দান।

অনাদিকাল হইতেই জীব কৃষ্ণ-বহির্মুখ, সে তাহার এই বিচ্ছেদের কথা জানে না, যদি জন্ম-জন্মান্তরের পরম সুকৃতি-বলে গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে জীবের চিত্তে এই বিরহের বিন্দুমাত্র স্ফুরণও হয়, তখনই জীব ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয় এবং অন্ধতমসাবৃত স্বরূপকে জানার ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষায় তখনই জীব প্রার্থনা করে: 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।'

তখনই জীব প্রাণের প্রাণ প্রাণারামের সঙ্গে আত্যন্তিক মিলনের জন্য উন্মাদ হইয়া উঠে। জীবের কাম্যই এই বিরহের অনুভূতি এবং সাধনও ইহাই।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী এই বিরহের একবিন্দু অনুভব করিয়াই সারাজীবন কৃষ্ণান্বেষণে কাটাইয়াছেন—শ্রীমতীর গভীর দুঃখের অনুভূতিতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত। শ্রীমতীর ভাবেই তাঁহার চিত্ত ভরিয়া থাকিত, তাই তিনিও মেঘদর্শন করিলেই কৃষ্ণজ্ঞানে অচেতন হইতেন।

'মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন,
মেঘ দরশন মাত্রে হন অচেতন।'

সারাজীবন দিয়াও তিনি শ্রীমতীর বিরহ-দহন শীতল করিতে পারিলেন না—তাই অন্তিমকালে ধূলিতলে লুটাইয়া আর্তরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন:

'অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে!
মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে?
হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতাং কিং করোম্যহম্।'

—হে দীনদয়ার্দ্রনাথ; হে মথুরানাথ (আর তো তুমি ব্রজনাথ নও), তোমার দর্শন-লালসায় আমি বনে বনে ঘুরিতেছি, কবে তোমার দর্শন পাইব প্রভু? ওগো! তোমার অদর্শনে আমার অন্তর বিদীর্ণ হইতেছে, বলো আমি কি করিব?

এই শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে, শ্রীমতীর বিরহ-জ্বালার তীব্রতাপে দগ্ধ হইয়াই যেন শ্রীপাদপুরী দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের এই অকথিত ব্যথার ধারাটিকে তিনি সঞ্জীবিত রাখিয়া গেলেন—অন্তিমকালের একমাত্র সুহৃদ, সেবক, শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর অন্তরে। ঈশ্বরপুরী এই অমৃত জাহ্নবী-ধারাটিকে অতি সঙ্গোপনে বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া সারা ভারতে ভ্রমণ করিলেন। অবশেষে গয়াতে আসিয়া সাগরের সন্ধান পাইলেন। গৌর-সাগর-সঙ্গমে যখন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর অন্তরের স্রোতোধারাটি আসিয়া মিলিত হইল, তখন ধারারও আর পৃথক্ অস্তিত্ব রহিল না এবং সাগরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, উর্মি মুখরিত হইয়া উঠিল, সিন্ধু-বক্ষ এবং জগৎ প্লাবিত হইয়া গেল সেই উচ্ছ্বাসে!

শ্রীমতী রাধারানীর কৃপাতেই ঐ শ্লোক মাধবেন্দ্র পুরীজীর হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়াছিল।

'এই শ্লোক কহিয়াছে রাধাঠাকুরানী,
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী,
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন,
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠ জন।'

—দিব্যোন্মাদ অবস্থায় অন্যান্য পদাবলী ও শ্লোকের সঙ্গে এই শ্লোকও প্রভু আস্বাদন করিতেন। গম্ভীরার ভিতরে বিরহের অসহ্য দহনে যখন মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইত, সমস্ত দেহে কদম্বকেশরের ন্যায় পুলকাবলী প্রকাশ পাইত, দন্ত হেলিয়া যাইত, প্রতি লোমকূপ হইতে রুধির-ধারা প্রবাহিত হইত, হস্তপদাদি কখন দীর্ঘাকৃতি, কখন বা কূর্মাকৃতি হইয়া যেন শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট

হইয়া যাইত, জীবনের কোন লক্ষণ, চেতনার এতটুকু সাড়া যখন থাকিত না, তখন সেই অসহ্য যন্ত্রণার সাক্ষী থাকিতেন মাত্র দুই তিন জন অন্তরঙ্গ।

'অন্তরঙ্গ সনে করে রস আস্বাদন,
বহিরঙ্গ সনে করে নাম সংকীর্তন।'

অসহ্য দুঃখের রাত্রি আর যেন প্রভাত হইতে চাহিত না, কানের কাছে অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে কৃষ্ণনাম করিতেন রায়-রামানন্দ আর স্বরূপ-দামোদর—ব্রজের দুই ঘনিষ্ঠ সখী—ললিতা ও বিশাখা, আর শ্রীমতীর ভাবে আবিষ্ট প্রভু অন্তর্লোকে পরমমিলনানন্দে পরমসমাধিরসে ডুবিয়া থাকিতেন।

'বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, অন্তরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত।'

—হয়তো বা রাধারানীর অপরিমেয় ঋণভার এইভাবেই পরিশোধ করিতেন অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর!

'হা হা সখি! কি করি উপায়,
কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়'—চৈঃ চঃ

ক্রন্দন করিতে করিতেই সহসা প্রভুর এক উপায়ের কথা মনে হইল :

'দেখি এই উপায়ে কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন,
ছাড় কৃষ্ণ-কথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ'—চৈঃ চঃ

কিন্তু কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করিতেই পুনরায় কৃষ্ণ-স্মৃতি উদিত হইল, তখনই 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃতে'র শ্লোক পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

'কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ
মধুর মধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণাকৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে।'

—আমি এখন কি করিব? কাহাকেই বা বলিব? শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার আশা করাও বৃথা। কৃষ্ণ-কথা ছাড়িয়া অন্য ভাল কথা বলো। হায়, হায়! যাহাকে ছাড়িব বলিয়া মনে করিতেছি, তিনি যে আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়া আছেন, মধুর ঈষৎহাস্যযুক্ত যাঁহার আকার, যিনি মন ও নয়নের আনন্দদায়ক, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার উৎকণ্ঠার নিমিত্ত অতি দীনা তৃষ্ণা চিরকাল বর্ধিত হইতেছে।

যাঁহাকে কিছুতেই হৃদয় হইতে সরাইতে পারা যায় না, অন্তর বাহির যিনি পূর্ণ করিয়া আছেন, সখি! কেমন করিয়া তাঁহাকে ভুলিব বলো? সখি, যমুনার ঘাটে গিয়া কবে একদিন ঐ মোহনরূপ দর্শন করিয়াছিলাম, সেইদিন হইতেই আমি যে আমার সমস্ত দেহ মন প্রাণ তিল-তুলসী দিয়া তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়াছি। তখন তো পরিণামের কথা চিন্তা করি নাই!

অলপ বয়স মোর, শ্যামরসে জর জর
কি জানি কি হবে পরিণামে,
(আমি) যদি নয়ন মুদে থাকি,
অন্তরে গোবিন্দ দেখি
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যামে!

* * *

কহি সখি তব আগে, দাগা পেলাম শ্যামদাগে,
এ ছার জীবনের নাহি দায়
আমি তিলতুলসী দিয়া সমর্পণ করিনু হিয়া
জনমের মতো রাঙ্গা পায়।
(পদাবলী, যদুনন্দন দাস)

যিনি ছিলেন আমার অন্তরের অন্তরতম, আজ কে তাঁহাকে বাহির করিল?

'তোমায় হিয়ার ভিতর হইতে
কে কৈল বাহির?
তেঞি বলরামের পঁহুর চিত নহে থির'—

ছিলে হিয়ার রতন, আসিলে বাহিরে—পাতিলে ভুবনমোহন রূপের ফাঁদ। সেই রূপের কমলে কাহার নয়ন-ভৃঙ্গই না মধুপান করিতে উৎকণ্ঠিত হয়?

'কি রূপ হেরিনু মধুর মূরতি
পিরীতি রসের সার
আমার হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক যাঁর!
বড়ি বিনোদিয়া চূড়ার টালনি—
কপালে চন্দন চাঁদ,
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর
ভুবনমোহন ফাঁদ।'

(পদাবলী, দ্বিজভীম)

—সেই ভুবনমোহন রূপের জন্য আমার নয়ন কাঁদে, হিয়ার ধনকে হিয়ার ভিতরে পুরিয়া রাখিবার জন্য আমার হিয়া ব্যাকুল!

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
হিয়ার পরশ লাগি, হিয়া মোর কাঁদে
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে।'

(পদাবলী, জ্ঞানদাস)

—'সখি! তোরা আমায় বৃথা গঞ্জনা দিস।' 'রাই! তুই ঐ রূপ দেখলি কেন, দেখেই বা মজলি কেন?' 'কিন্তু সখি, যে কৃষ্ণরূপ দেখে নাই, কৃষ্ণগুণে যার মন মজে নাই, তার জন্মই তো বিফল সখি।'

'বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না হেরে সে চাঁদবদন,
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ?
কৃষ্ণের মধুরবাণী অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে,
কাণাকড়ি ছিদ্রসম জানিহ সেই শ্রবণ
তার জন্ম হৈল অকারণে।
মৃগমদনীলোৎপল মিলনে সে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব মান,
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাশা ভস্ত্রার সমান।
কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণচরিত
সুধাসার স্বাদুবিনিন্দন,
তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম।
কৃষ্ণ-কর-পদতল কোটি-চন্দ্র-সুশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি,
সে পরশ নাহি যার সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লৌহ সম জানি।' (চৈঃ চঃ)

—সখি! আমার হতবিধিবল শুন, আমার দেহ মন চিত্ত কৃষ্ণকে না পাইয়া সমস্তই বিফল। তোমরা আমার এই দুঃখ কেমন করিয়া বুঝিবে, কেই বা কাহার দুঃখ বুঝিতে পারে? আমি তো আনন্দ-লাভের জন্যই কৃষ্ণভজন করিয়াছিলাম।

'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল
অমিয়-সায়রে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।' (চণ্ডীদাস)

—আমার ভাগ্যে যখন সুধাই গরল হইয়া গেল, আমার কর্মে যখন এই লেখা ছিল, তখন তোমরা আর কি করিবে সখি! শুধু দয়া করিয়া আমাকে আর ধৈর্য ধরিতে বলিও না, আর সেই নিষ্ঠুরকে ভুলিতে বলিও না। তাঁহাকে যদি ভুলি, তবে কি লইয়া কাটাইব বলো? ঐ বিরহের জ্বালাই যে আজ আমার একমাত্র সম্বল! ঐ সম্বলটুকু নিয়া তোরা আমায় মরিতে দে!

সখি, তোরা কাঁদছিস কেন? আজ মরণই তো আমার একমাত্র বন্ধু, 'আমার শ্যাম-সমান'।

'প্রাণাধিকারে সখি! কাহে তোরা রোয়সি
মরিলে করবি ইহ কাজে,
নীরে নাহি ডারবি, অনলে নাহি দাহবি
রাখবি তনু ইহ বরজ মাঝে।'
(শশিশেখর)

—আমার অন্তিমকালের এই মিনতিটুকু তোরা রাখিস সখি! আমার মৃত্যু হ'লে আমার এই শ্যামময় তনু তোরা যমুনার জলে ভাসিয়ে দিস না, অনলে দাহ করিস না—আমায় তোরা ব্রজ ছাড়া করিস না, ব্রজের রজে যেন আমার এ দেহাবশেষও মিশে যায়—এই আমার কামনা।

আর এক মিনতি, শোন্ সখি, তোরা আমার মরণকালে—আমার সর্ব অঙ্গে কৃষ্ণনাম লিখে দিস, আর আমার কর্ণে কৃষ্ণনাম জপ করিস, তবেই আমার সার্থক মরণ হবে। শেষ কথা আর একটি ব'লে যাই। তোরা বলিস—কৃষ্ণ পরনারীর প্রতি আসক্ত হয়েছেন, তাই আমায় ত্যাগ করেছেন, এখন আমি কেন কৃষ্ণের জন্য প্রাণত্যাগ করি?

[শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত ৮ম শ্লোক]
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥'

—শ্রীরাধা কহিলেন, সখি! শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদদাসী আমাকে আলিঙ্গন দ্বারা বক্ষে নিষ্পেষিতই করুন অথবা দর্শন না দিয়া আমাকে মর্মাহতই করুন অথবা সেই বহুবল্লভ যেখানে সেখানে (অন্য গোপীর সহিত) বিহারই করুন, তিনি যাহাই করুন না কেন, তিনিই আমার প্রাণনাথ, প্রাণনাথ ব্যতীত অপর কেহ নহেন। কখন আমার সৌভাগ্য প্রকট করিবার জন্য তিনি অন্য গোপীকে দুঃখ দিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হন, কখন বা আমাকে মর্মপীড়া দিবার জন্য আমার সম্মুখেই অন্য নারীর সঙ্গে মিলিত হন, কিন্তু তাহাতে আমি তো দুঃখ পাই না। কৃষ্ণ-সুখেই আমি সুখী—

'না গনি আপন দুখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিলে দুখ তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুখ মোর সুখবর্য।
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ
তারে না পাঞা কাহে হয় দুঃখী?
মুঞি তার পায়ে পড়ি লাঞা যাঙ হাথে ধরি
ক্রীড়া করাঞা করো তারে সুখী। (চৈঃ চঃ)

—যে নারীকে কৃষ্ণ বাঞ্ছা করেন, আমি তাঁহার পায়ে ধরিয়াও কৃষ্ণ-সঙ্গে মিলিতা করিব। যে রমণী আমার প্রতি দ্বেষ পোষণ করিয়াও কৃষ্ণের সেবা ও সন্তোষ বিধান করেন—

'মুঞি তার ঘরে যাঞা তারে সেবোঁ দাসী হঞা
তবে মোর সুখের উল্লাস।' (চৈঃ চঃ)

আমি আমার দেহ মন প্রাণ সমস্তই কৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছি, আমার বলিতে তো কিছুই রাখি নাই—

'তোমারি গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।'

—বঁধুর গরবে আমি গরবিনী, বঁধুর রূপেই যে আমি রূপসী! আমার কৃষ্ণ ছাড়া কিছু নাই, কেহ নাই।

'অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি?' (বিদ্যাপতি)

—কৃষ্ণই আমার জীবন, কৃষ্ণ-সেবাই আমার ধ্যান, কৃষ্ণ-সুখে আমার সুখ। কৃষ্ণ সুখী হন বলিয়াই আমার এই দেহের মার্জন, ভূষণ; ইহা যে আমার পরম প্রিয়তমের অধিষ্ঠান-মন্দির, ইহাতে আমার তো কোন অধিকার নাই।

প্রভু রাধাভাবে সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইয়া এই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। ইহার যে ভাব, তাহাই ব্রজপ্রেম—শুদ্ধ, অকৈতব, নিষ্কাম ভালবাসা।

'ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
আত্মসুখের তাহে নাহি গন্ধ,
সে প্রেম জানাইতে লোকে প্রভু কৈল এই শ্লোকে
পদে কৈল অর্থের নিবন্ধ।' (চৈ: চ:)

দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া নীলাচলে কাশীমিশ্রের রুদ্ধদ্বার ভবনে ক্ষুদ্র গম্ভীরা-প্রকোষ্ঠে শ্রীমন্মহাপ্রভু দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই এইভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন, দেহবোধ এতটুকুও থাকিত না। সেবক গোবিন্দ অতি কষ্টে কোনমতে স্নান করাইয়া, জোর করিয়া কোন দিন বা সামান্য কিছু আহার্য মুখে দিতে পারিতেন, কোন দিন তাহাও হইত না। নয়নে নিদ্রা ছিল না, ছিল শুধু অশ্রুধার! যখন অর্ধ-বাহ্য দশায় থাকিতেন, তখন এইরূপ দিব্য প্রলাপ বলিতেন ও ভাবানুযায়ী পদ শুনিতেন অথবা দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় তীব্র বিরহের আর্তিতে ভিত্তি-গাত্রে মুখ ঘষিয়া, মাথা ঠুকিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেন, অঙ্গ হইতে রুধির-ধারা ঝরিতে থাকিত, দেখিয়া অন্তরঙ্গগণের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। আর যখন অন্তর্দশা হইত, তখন আর যে নয়ন মেলিবেন সে লক্ষণও থাকিত না. কত সন্তর্পণে, কত কৃষ্ণনাম-কীর্তনে দীর্ঘকাল পরে হয়তো বা চেতনা হইত, চেতনা হইলেই বিরহের আর্তিতে আবার কাঁদিতে থাকিতেন।

কখন বা—'মূর্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার
উঠি করে হুহুঙ্কার
কহে, এই আইলা মহাশয়

তক্ষনই আবার শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ-বর্ণনায় পঞ্চমুখ লইয়া উঠিতেন। রায়-রামানন্দ রসিক, অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাই সখীভাবে বলেন, 'শ্রীমতি! এই তোর ক্রোধ, এই তোর হর্ষ। যে শঠ-চূড়ামণি তোকে এত দুঃখ দিতেছেন, যেই তিনি তোর সম্মুখে আসিলেন, অমনি তুই সব ভুলিয়া গেলি। না না সখি! প্রেমের রীতি এমন ধারা নয়, তুই প্রেমের মর্যাদা জানিস না।' রাধাভাবে ভাবিত প্রভু তখন আনন্দো-ল্লাসিত ফুল্ল মুখে বলিয়া উঠেন, 'প্রেমের আমি কিছু জানি না? শুনবি সে কথা?'—

'সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়,
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।'
(বিদ্যাপতি)

—এই কৃষ্ণপ্রেম যে আমার পরশরতন সখি! এ যে তিলে তিলে নূতন হয়। লাখ লাখ যুগ ধরিয়া এই রূপে নয়ন লাগাইয়াই রাখিলাম, তবুও আমার নয়ন তৃপ্ত হইল না। ঐ মধুর বচন জনম ভরিয়া শুনিলাম, তবু কর্ণ যে আমার তৃষ্ণায় মরিয়া গেল, আমার হিয়ার মণিকোঠায় এই অরূপরতন আমি রাখিয়া দিলাম, তবু তো আমার হিয়া শীতল হইল না।

বিরহের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যখন কৃষ্ণদর্শন হইত, ভাব-সম্মিলন হইত, তখনই প্রভুর মুখ হইতে এইরূপ আনন্দোচ্ছ্বাস বাহির হইত।

বিচ্ছেদের মধ্যে মিলনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা এত প্রগাঢ় হইত, কৃষ্ণ-ভাবনা এত নিবিড় হইত যে, তখন শ্রীমতী কৃষ্ণে তাদাত্ম্য-প্রাপ্তা হইয়া নিজেই কৃষ্ণ হইয়া যাইতেন—

'অনুখন মাধব মাধব সুমরইত
সুন্দরী ভেলি মধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাবহি বিসরল,
আপন গুণ সুবধাই।
মাধব! অপরূপ তোহারি সুলেহ,
অপন বিরহে অপন তনু জর জর
জীবইতে ভেলি সন্দেহ।
রাধা সঞে যব পুন তহি মাধব,
মাধব সঞে যব রাধা,
দারুণ প্রেম তবহি নহি টুটত,
বাঢ়ত বিরহক বাধা।' (বিদ্যাপতি)

—অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করিতে করিতে শ্রীমতী নিজেই মাধব হইয়া গেলেন। রাধা নিজের নারীত্ব ভুলিয়া কৃষ্ণভাবে নিজেই নিজের গুণের প্রতি লুব্ধ হইয়া উঠিলেন।

মাধব! কি অপরূপ তোমার স্নেহ (প্রেম)! শ্রীমতী তোমার ভাবে ভাবিত হইয়া নিজের বিরহেই নিজে জর্জরিত হইয়া গেলেন। বিরহ-তাপে তাঁহার জীবন-রক্ষাই অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল।

শ্রীমতী যখন নিজেকে রাধাভাবে ভাবেন, তখন তাঁহার মনে হয় কৃষ্ণপ্রেমই পূর্ণ—আবার যখন কৃষ্ণ-ভাবে ভাবিত থাকেন, তখন মনে হয় রাধাপ্রেমই পূর্ণ, অতএব প্রেমের ত্রুটি কখন হয় না, নিত্য যুগল-মিলনে বিরহেরও অবসর ঘটে না।

এই যে ভাব-সম্মিলন, বিরহে মিলনের স্ফূর্তি অথবা মিলনে বিরহের স্ফূর্তি (দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভরিয়া)—ইহা একমাত্র ভাবময়ী শ্রীমতীতেই সম্ভব। এই প্রেমবৈচিত্র্য—ইহারই শেষ পরিণতি স্ত্রী-পুরুষের ভেদজ্ঞান-রাহিত্য ও নিবিড় একাত্মতা। প্রেমিক, প্রেম আর প্রেমাস্পদের ঐক্য—

'ন সো রমণ হাম ন রমণী।'

বিরহের গভীর অমানিশার মধ্যেও যখন মিলন-লগ্নের শুভ অভ্যুদয় হইত, তখন অন্তর্লোকের এই নিগূঢ় আনন্দের বার্তা প্রভুর দিব্য দেহে, স্মিত বদনে, অরুণিম নয়নে, নয়নের শতধার অশ্রুর মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইত, প্রভুর অন্তর্লোক হইতে তখন যেন শ্রীমতীই গাহিয়া উঠিতেন :

'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয় মুখচন্দা
জীবন-যৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা,
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল,
টুটল সবহু সন্দেহা।' (বিদ্যাপতি)

—সখি! আজ আমার সৌভাগ্যরজনীর উদয় হইয়াছে, ওরে! আজ আমি প্রিয়তমের মুখচন্দ্র দর্শন করিলাম। আজ আমার জীবন যৌবন সফল হইল, দশদিশি মধুময়, আর তো আজ আমার কোন দুঃখ—কোন দ্বন্দ্ব নাই। আজ আমার দেহ গেহ—সকলই সফল। আজ বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন, আজ আর আমার কোন দুঃখ—কোন সংশয় নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশিত পথ আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে ব্রজের এই বিরহমিলন যমুনা-ধারায় ; সে পথরেখা ধরিয়া চলিয়াছেন সুকৃতি-মান্ পথিক, কে জানে কাহার উপরে বর্ষিত হইবে করুণাঘন গৌরসুন্দরের কৃপা? কাহার নিমজ্জন হইবে প্রেম-যমুনার গভীর কালো জলে? (সমাপ্ত)

আত্মজিজ্ঞাসা

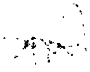
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বহু রবি হেরি নানা সরোবরে মায়ার প্রভাবে মেতে,
বহু রূপে বারি স্ফুরিত হ'ল যে ঢেউয়ের প্রকার-ভেদে।
আমারে ভুলায়ে আমি যে রেখেছি পুরাতে ভ্রান্ত দাবি
রজ্জুতে কেন ভুজঙ্গ-বোধ? আপনার মনে ভাবি।
ক্ষণিকের তরে নির্বাত দীপে প্রস্ফুরণের সম,
জীব হয়ে বুঝি মর্ত্য জীবনে ব্রহ্ম-বিহার মম!

এই দেহ-গৃহে গৃহস্থ হয়ে যে জন আমার মাঝে
করে সংসার, তাহারে কেন গো হেরিতে পাই না কাছে?
আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব-দোলায় স্বপন-কুহেলি মন
দিশেহারা হয়ে মরীচিকা পিছু ঘুরিছে অনুক্ষণ।
'জনমবীজের স্বরূপ বাসনা এখনও বিদ্যমান,
তাই কি আমার হারায়ে গিয়েছে বোধির অতীত জ্ঞান?

হীনচেতা হয়ে পিছল পথের ধারেতে রয়েছি বসি,
যোগযজ্ঞের জাগে অভিলাষ,—ধৃতি মোর তামসী।
ভোগ-সৌষ্ঠব কামনা আমার বর্ধিত হয়ে রয়,
এ জীবনে কবে করিব বারেক চিত্তকে পরাজয়?
বন্ধ্যা নারীর তনয়ার মতো ধরারে ধারণা করি,
মহা উল্লাসে যাপিলাম মোহে দিবা আর বিভাবরী।

মনের ওপারে মোর চিদাকাশে আঁধার হ'ল কি লীন?
ভূমি ও ভূমায় আলোক-ছায়ায় কেন খেলা চিরদিন!
প্রতি পরমাণু রচিছে আকাশ, প্রতি আকাশের স্তরে—
হাজার হাজার নীহারিকা জাগে নব কল্পের তরে।
অরূপ সায়রে লীলার লহরী নানা রূপে ধায় তীরে,
স্রোতোধারা সম যায় চলে যাহা, সে কি আর আসে ফিরে?



বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা

[প্রথম পর্ব—ভারত-ইতিহাসের মূলতত্ত্ব]

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক আক্ষরিক অর্থে ঐতিহাসিক নন। ইওরোপীয় প্রথায় ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ ক'রে খুঁটিনাটি তথ্য-বিচার করতে গিয়ে যে রিসার্চ বা গবেষণার যষ্টি হাতে আমরা ভারতবর্ষের বিপুল ইতিহাস-গহনে প্রবেশ করি এবং সংখ্যাতীত অলিগলির কোন একটিকে চিহ্নিত ক'রে 'বিশেষজ্ঞ' হবার সাধনা করি, সে সাধনায়, আমরা যতদূর জানি, স্বামীজী যাননি। এই যুগপ্রবর্তক মহামনীষী প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ অধ্যাত্ম-সাধনার পথে বলিষ্ঠ পথিক। জীবনের শেষ দশ বছর যে অপূর্ব কর্মযোগের পরিচয় তিনি দান করেছেন, আশ্চর্য জীবন-চর্যা দ্বারা শুধু ভারতে নয়, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যে অভিনব বিজয়স্তম্ভ তিনি প্রোথিত ক'রে গেছেন, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা রহস্য বুঝতে হ'লে স্বামীজীর আধ্যাত্মিক সাধনায় লব্ধ লোকোত্তর ঐশ্বর্যের সন্ধান করতে হবে, তাঁর আরাধ্য গুরু শ্রীরাম-কৃষ্ণের জীবনবেদকে অনুধ্যান করতে হবে। সাধারণ বিচারের মানদণ্ডে বা গতানুগতিক যুক্তি দ্বারা এ রহস্যের উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়।

স্বামীজীর ইতিহাস-চেতনার জন্ম এই অধ্যাত্মবাদের মধ্যে। সেই কারণে আমাদের মতো সাধারণ ইতিহাসের ছাত্রের কুণ্ঠা জাগে তাঁর ইতিহাস-চেতনাকে বিশ্লেষণ করতে। শব্দশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যাপকতা ও গভীরতা এবং অসামান্য মননশীলতা তাঁর অধ্যাত্মচৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করেছে ভারতেতিহাস-সাগরের গভীরে রত্ন-সন্ধানে। আমাদের এই বিরাট দেশের পথেঘাটে, পাহাড়ে জঙ্গলে, সাগরে মরুভূমিতে, আকাশে বাতাসে নিরন্তর ধাবমান মহাকালের পদচিহ্নে রচিত ইতিহাসের খোলা-পাতায়ও তিনি কম পাঠ গ্রহণ করেননি। পরিব্রাজকের বেশে তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন, কান পেতে শুনেছেন যুগযুগান্ত বেয়ে আসা ভারতের শাশ্বত বাণী, বুক দিয়ে অনুভব করেছেন শোষিত দারিদ্র্য-পীড়িত দেশবাসীর মর্মন্তুদ বেদনা। এই অপূর্ব অভিজ্ঞতা ও অসামান্য দরদী প্রাণ স্বামীজীকে একাধারে ক'রে তুলেছে মরমী দেশপ্রেমিক এবং অভিনব ভারততত্ত্ববিদ্। এ দেশের তৎকালীন শত দুর্ভাগ্যকেও তিনি সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী রূপে দেখতে পেরেছেন, তার কারণ, লোকোত্তর সাধনা-বলে তিনি অনায়াসে ভারতের মহামানবের সাগরতীরে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর ধ্যান-নেত্রের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন ভুবনমোহিনী স্বদেশজননী, উদ্‌ঘাটিত হয়েছে মাতৃভূমির থরে থরে সাজানো বহুকালের সঞ্চিত রত্নরাজি।

এখানেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন ভারতেতিহাসের মূলতত্ত্ব। নানা প্রবন্ধে, পত্রাবলীতে এবং বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি সেই তত্ত্বের অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন।

ইতিহাসের তথ্যবিচারে বা ঘটনা-বিশ্লেষণে স্বামীজী কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণার বাঁধানো রাস্তায় চলেননি। মনে রাখা দরকার যে, স্বামীজী যখন এ-কাজে ব্রতী হয়েছেন, তখন ইতিকথা ও উপকথা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বামীজীর কার্যকালে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতেতিহাসের বিচিত্র গতিপ্রকৃতি

তৎকালীন মনীষীদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করেনি। কলকাতায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং পুনায় রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-গবেষণার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন মাত্র। বাংলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর অমর লেখনী ধারণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও আশ্চর্য মননশীলতা দ্বারা ইতিহাসাশ্রয়ী প্রবন্ধ ও ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাস কিছুকাল পূর্বেই লিখেছেন এবং বাঙালী হিন্দুর অভিমান নিয়ে নবজাগরণের বলিষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করছেন। লোকোত্তর মনীষা, সূক্ষ্ম বিচার এবং অপূর্ব বিশ্লেষণী শক্তি দ্বারা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এদেশের ইতিহাসের ওপর স্বচ্ছ আলোকপাত করেছেন স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে, যদিও তিনি স্বামীজীর চেয়ে দু-বছরের বড়। ৩৯ বছর বয়সে স্বামীজীর তিরোভাব ঘটে ১৯০২ খৃঃ। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা শুরু করেন সম্ভবতঃ ১৯০৯ খৃঃ। বহু পূর্ব হ'তে এবং তৎকালেও নিরলস গবেষণা দ্বারা এদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসের ঘনীভূত তমিস্রার বুকে নিঃশঙ্ক পথ কেটে চলেছেন ইওরোপের মনীষিগণ। ভারতের গৌরবময় অতীত আমাদের জ্ঞাতসারে নিয়ে আসবার কৃতিত্ব তাঁদের। তাঁদের কাছে আমাদের গভীর ঋণ স্বীকার করেও ব'লব যে, এদেশের ইতিহাসের রাজনৈতিক দিকটার ওপর তাঁরা অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন; এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে রচিত গ্রন্থে যে-পাঠ আমরা গ্রহণ করি এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য হই, তা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র'।

এই নিশীথের দুঃস্বপ্নের পরিবেশেই স্বামীজী শাশ্বত ভারতের রূপ দেখেছেন। আমাদের বর্তমান জীবন কতটা অতীতকে আঁকড়ে আছে ও থাকবে, বাইরে থেকে উন্নত সমৃদ্ধ পশ্চিম থেকে কতটা গ্রহণ ক'রে আমাদের ভারতীয় জীবনে সমন্বিত করতে পারব—এ সকলের সুষ্ঠু বিন্যাসে স্বামীজী তৎকালীন পৃথিবীর নানা স্থানে ভাষণের পর ভাষণ দান করেছেন, ক্লান্তিহান লেখনী চালনা করেছেন। এ থেকেই ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ক'রে আমাদের স্বামীজীর ইতিহাস-চেতনা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করতে হবে। ইতিহাসের সংখ্যাতাত তথ্যের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে যদি তত্ত্বের দিকটায় একটু নজর দিই, তবে তথ্যবিচারের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা আমাদের ব্যাহত না হয়ে আনুকূল্যই লাভ করবে। অতীত থেকে যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারি, তবে ইতিহাস-পাঠ আমাদের বৃথাই হবে। স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বের আলোতে ইতিহাস দর্শনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন আমাদের সম্মুখে। তথ্য দিয়ে একে প্রতিষ্ঠিত করার বা অগ্রাহ্য করার অধিকার এবং দায়িত্ব আমাদের।

ইতিহাসে রাজা, উজীর, সেনাপতি—এক কথায় রাজদরবারের সামগ্রিক কাহিনী একটা বড় অংশ জুড়ে থাকবে—এ স্বাভাবিক। তবুও ইতিহাসের একমাত্র উপজীব্য রাজনীতি নয়, এদেশের ইতিহাসের তো নয়ই। সুপ্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস-সাগরে উত্থান-পতনের কত এলোমেলো তরঙ্গ যুগযুগান্ত ধরে বয়ে চলেছে, কত নিষ্ঠুর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এদেশের মাটি যুগে যুগে বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এটাই কি শেষ কথা ভারতেতিহাসের? সমুদ্রের বুকের

ওপর রয়েছে তরঙ্গ-বিক্ষোভ, আর ক্ষণে ক্ষণে ওঠে এলোমেলো ঝড়। সমুদ্রের গভীরে রয়েছে বিরাট প্রশান্তি, রয়েছে অগণিত রত্নসম্ভার। শুধু ওপরের সংবাদ রাখলেই কি সমুদ্রকে জানা হ'ল ?

যে অন্তর্নিহিত সূত্রটি সঙ্গোপনে ইতিহাসের নানা বিপরীত ঘটনাবলীকে বেঁধে রেখেছে, তার সন্ধান না পেলে এদেশের ইতিহাস-পাঠ অসম্পূর্ণ থাকবে। আমাদের ঐতিহাসিক খনর্শ-রাজ্যে নৈরাজ্য এসে অধিষ্ঠান করবে, যদি এই মূল সূত্রটিকে ধরতে না পারি। ভারতের অনৈক্য, শক্তিহীনতা, শত সহস্র কলুষ ও ব্যভিচার বিরাট হয়ে দেখা দেবে তখন, ভারত হবে তখন খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ছোট বড় কতগুলি দেশের সমষ্টি-মাত্র, একটা ভৌগোলিক সংজ্ঞা-মাত্র। ভারতের তপস্যা, ভারতের অখণ্ডতার সাধনা যা যুগে যুগে আমাদের সাহিত্য ও ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে এক আশ্চর্য ঐকতান বাজিয়েছে, তা পরিণত হবে নির্বস্তুক কল্পনা-বিলাসে, একটা ব্যর্থ পরিহাসে। এদেশের অতীত ও মধ্যযুগ মরুভূমির মতো ধূ ধূ করবে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, আকবর প্রমুখ পাঁচ-সাতজন শক্তিধর পুরুষ বিরাজ করবেন মরুভূমিতে ওয়েসিসের মতো। যা কিছু আলো, যা কিছু ভালো, তাই এসেছে সাগর বেয়ে পশ্চিমের কূল থেকে ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে, আজিকার স্বাধীন ভারত তাকেই একমাত্র মূলধন করেছে প্রগতির যাত্রাপথে—মনে হবে, এই বুঝি এ জাতির ইতিহাস।

কিন্তু এ তো সত্য নয়। যেমন সত্য নয় অন্ধ গোঁড়ামির এই মতবাদ যে—'সবই বেদে আছে', বাইরে থেকে ভারতের নেবার কিছু নেই। সত্য রয়েছে এ দুয়ের মাঝখানে। সে সত্যকে জানতে হ'লে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনের ভিত্তিতে ভারত যে ধারাবাহিকতার সূত্র অবলম্বন ক'রে তার সুদীর্ঘ সুপ্রাচীন সভ্যতাকে আজও অব্যাহত রেখেছে, তার স্বরূপ বুঝতে হবে। এও বোঝা দরকার যে, ভারতীয় ঐক্যের রাজনৈতিক দিকটা মুখ্য নয়, ভারতের ভাবগত আদর্শগত এবং ধর্মগত ঐক্য যুগে যুগে আবর্তিত হয়েছে রাজনৈতিক অনৈক্যের শত জটিলতাকে উপেক্ষা করেও।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্বামীজী প্রাচীন ভারতকে একটি 'নেশন' বা জাতি বলেছেন। তাঁর ইংরেজীতে লেখা 'Historical Evolution of India' (ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তন) নামক নিবন্ধে তিনি বলেছেন : In ancient India the centres of national life were always the intellectual and spiritual and not political. The outburst of national life was round colleges of sages and spiritual teachers.—অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে জাতীয় জীবনের মূলসূত্র বা কেন্দ্র ছিল বিদ্যানুশীলন এবং সংস্কৃতির গভীরে অধ্যাত্মবাদ ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত হয়ে, কখনও রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়। (ভারতের) জাতীয় জীবন নিজেকে বিকশিত করেছে ঋষিদের আশ্রমে, অধ্যাত্মবিদ্যার আলোতে উদ্ভাসিত গুরুদের বিদ্যানিকেতনে।

স্বামীজীর এ নিবন্ধটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটি রচিত হয়নি। তত্ত্বের দিক দিয়ে এ-দুটি প্রবন্ধের আশ্চর্য মিল রয়েছে, ভিন্ন পথে থেকেও এই দুই মহামানব আশ্চর্য কাছাকাছি। উক্ত নিবন্ধটি স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর ষষ্ঠখণ্ডে স্থান পেয়েছে। মাত্র সাড়ে দশ পৃষ্ঠায় যে এত কথা বলা যায়, এর

আগে তা জানা ছিল না। নিবন্ধটি পড়ে ইতিহাসের তথ্যসন্ধানী গবেষকেরাও অবাক্ না হয়ে পারবেন না। অবশ্য ইতিহাসের খুঁটিনাটি বিচারে স্বামীজীর উক্ত নিবন্ধে বা অন্যত্র আলোচিত সকল কথাই গ্রহণযোগ্য না হ'তে পারে, কিন্তু তিনি যে এদেশের ইতিহাসের 'বুড়ি' ছুঁয়েছেন এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

এদেশের ইতিহাস থেকে দু-একটি ঘটনার, অধ্যায়ের বা বড়ো ঘটনার অবতারণা করলে কথাটা আরও পরিষ্কার হবে। তখন মৌর্য-যুগের গৌরব লুপ্ত, বৌদ্ধ অহিংসা ও মৈত্রী অশোকের পরবর্তী মৌর্যরাজাদের কাপুরুষতার ও ক্লীবতার আবরণে পর্যবসিত হয়েছে। একদা আফগানিস্তান থেকে কামরূপ, হিমালয় থেকে প্রায় কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত অপূর্ব মৌর্যসাম্রাজ্য ভেঙে খানখান হয়ে গেল। উত্তর-পশ্চিমের সিংহদ্বার ভেঙে একে একে প্রবেশ ক'রে ছোট বড়ো রাজ্য গড়ে ভারতে বসতি স্থাপন করলে গ্রীক (বহ্লিকদেশীয়), শক, পহ্লব, কুশান প্রভৃতি নানা জাতি। ভেতরে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে বিভিন্ন ভারতীয় রাজবংশের মধ্যে—সুঙ্গ, কান্ব, চেত, অন্ধ্র বা সাতবাহন, নাগ ও বাকাটক যাদের মধ্যে প্রধান। বাইরের বিভিন্ন জাতি এবং ভেতরের এই বংশসমূহের মধ্যেও যুদ্ধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম হয়নি। তৎকালীন রাজনীতিতে এই সাম্রাজ্যবাদী সংঘর্ষের বা প্রাধান্য স্থাপনের জটিল প্রতিদ্বন্দ্বিতার খুঁটিনাটি সন তারিখ নামধাম ও পারম্পর্য নির্ধারণ আজিও সন্তোষজনক ভাবে হয়নি। সেদিক দিয়ে এই যুগটা অর্থাৎ মৌর্য সম্রাট্ অশোকের মৃত্যুর পর থেকে (আনুমানিক ২৩২ খৃঃ পূঃ) গুপ্তবংশের উত্থান পর্যন্ত (৩২০ খৃঃ) এই সাড়ে পাঁচশো বছরের সুদীর্ঘ যুগ অন্ধকারময় ব'লে বিবেচিত হয়। চরম অনৈক্য, চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা এবং গভীর অনিশ্চয়তা এ যুগটিকে মলিন ক'রে রেখেছে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সূত্রটি গেছে হারিয়ে, রাজনীতির জটিল আবর্তে ভারতের ঐক্য হাবুডুবু খাচ্ছে।

কিন্তু ওই সাড়ে পাঁচশো বছরের ইতিহাসে এই কথাই তো একমাত্র কথা নয়। ইতিহাসের সাধারণ পাঠকেরও অজানা নেই যে, ভারতের সভ্যতা- ও সংস্কৃতি-বিকাশের ধারায় এ ৫৫০ বছর কত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত তখন জাগ্রত ও জীবন্ত। তার উন্নত সভ্যতার ঔদার্য দ্বারা তার প্রাণধর্মের বলিষ্ঠতা দ্বারা সমন্বয়ের অপূর্ব সূত্রে সে বলদর্পী বিজয়ী বিদেশীদের আপন ক'রে নিল। ওই বিদেশী জাতিগুলি স্বাভাবিক ভাবেই যেন ভারতীয় হয়ে গেল। কেউ বৌদ্ধ, কেউ হিন্দু। এ এক আশ্চর্য ঘটনা। অস্ত্রবলে বিজিত ভারত জয় করলে বিজয়ীকে তার সভ্যতা দ্বারা, সংস্কৃতি দ্বারা, ধর্ম দ্বারা। কিছুকাল পরে আর তাদের আলাদা সত্তা কিছুই রইল না। হিন্দু বা ভারতীয় এই অভিমানে বা গর্বে তারা পরবর্তী ইতিহাসে শৌর্য-বীর্যের এক অপূর্ব অধ্যায় যোজনা করেছে।

শুধু তাই নয়। নব হিন্দু বা পৌরাণিক সভ্যতার যে পূর্ণ বিকাশ গুপ্ত যুগকে অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত ক'রে রেখেছে, তার প্রস্তুতিকাল তো পূর্ববর্তী এই যুগে। এ-যুগের তথাকথিত সুদীর্ঘ রাত্রির তমিস্রা-গর্ভেই গুপ্ত-যুগের সর্বময় সমৃদ্ধি ও গৌরবের পটভূমিকা রয়েছে। রাত্রির শেষযামের তিমিরবিদারী প্রভাত-সূর্যের জ্যোতির্ময় প্রকাশের মতো গুপ্ত-সভ্যতার ভাস্বর ভাস্কর উদিত হয়েছিল ওই রাত্রির তপস্যায়।

বস্তুতঃ ধর্ম ও সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিত্যের

ইতিহাসে ওই সাড়ে পাঁচশো বছর ভারতের গৌরবময় অধ্যায়। মহাভারত, মানবধর্মশাস্ত্র (মনুস্মৃতি) এবং মহাভাষ্য প্রধানতঃ যে-যুগের রচনা ব'লে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেছেন, সে যুগ আর যাই হোক, তমিস্রাপূর্ণ নয়। দীর্ঘকাল বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রাধান্যে গড়ে উঠেছিল ভারতের রাজনীতি, যার উজ্জ্বলতম প্রকাশ মৌর্যযুগে অশোকের রাজত্বে। তারপর এল গ্লানি, এল অহিংসার বিকৃতি। এ সুযোগে বৈদিক ধর্ম বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে আপন ক'রে নিয়ে নিজেকে ঢেলে সাজালো, ধারণ করলে নব কলেবর, জন্ম হ'ল নব হিন্দুর। মহাপুরাণ, মনুস্মৃতি, রামায়ণ ও মহাভারত হ'ল নব হিন্দুর ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান অবলম্বন, বেদ ও উপনিষদ্ বনস্পতির ভূগর্ভস্থ শিকড়ের মতো নবহিন্দুর সমাজকে প্রাণরসে বলিষ্ঠ ক'রে রাখলো। এবং গুপ্তযুগে এই নূতন সমাজ ও সংস্কৃতি বিন্যাসের পরিপূর্ণতা লাভ করলে।

ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় ভারততত্ত্ববিদ্গণের মতে কুরুপাণ্ডবের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধ আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১,০০০ শতকে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধের খুঁটিনাটি বর্ণিত আছে ভারতের অনন্য মহাগ্রন্থ মহাভারতে—ইতিকথা ও উপকথার অচ্ছেদ্য সংমিশ্রণের মাধ্যমে। একলক্ষ শ্লোক-সম্বলিত যে মহাভারত আমরা পেয়েছি, তার রচনাকাল পণ্ডিতদের মতে অন্ততঃ ৮০০ বছর—খৃঃ পূঃ ৪০০ থেকে ৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই ধর্মযুদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে প্রাচীন ভারতের সমাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি এবং রাজনীতির যে সুসমঞ্জস পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ মহাভারতকে বিধৃত ক'রে রেখেছে, ভাব-সাধনায় ও সাহিত্য-সাধনায় তাদের পটভূমিকা তো খুঁজে পাবো ঐ মৌর্যোত্তর এবং প্রাক্-গুপ্ত যুগে। ধর্মরাজ্যের মন্ত্রদ্রষ্টা মহাসারথি কৃষ্ণ ঠিক কোন্ সময়ে জন্মেছিলেন, কিংবা আদৌ তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা, তার বিচার অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু মহাভারতের স্বপ্নকে সার্থক করেছিলেন পরবর্তী মহাশক্তিধর উদার বিচক্ষণ গুপ্ত সম্রাট্গণ, সর্বদিকে সব চেয়ে বেশি গৌরবময় জাতীয় অধ্যায়ের পূর্ণ রূপায়ণে। এ তো এক বিরাট্ ঐতিহাসিক সত্য। এও তেমনি ঐতিহাসিক সত্য যে, শুধু ভাবের দিক দিয়ে নয়, কর্মক্ষেত্রেও গুপ্ত-সভ্যতার মূল রয়েছে ওই তথাকথিত অন্ধকারময় যুগে।

সুতরাং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় জাতির বলিষ্ঠ অব্যাহত সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন স্বামীজী। অবশ্য ইওরোপীয় ন্যাশনালিজ্মের সকল উপাদান এ জাতিতে পাওয়া যাবে না। যুগে যুগে এ জাতীয় সংহতির এবং ঐক্যবদ্ধতার প্রাণ-কেন্দ্র হস্তিনাপুর, পাটলিপুত্র, কান্যকুব্জ এবং দিল্লী প্রভৃতি রাজধানীতে ততটা ছিল না, যতটা নৈমিষারণ্যে, কাশীতে, মিথিলায়, তক্ষশীলায়, নালন্দায়, বিক্রমশীলায় এবং নবদ্বীপে ছিল। ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তনের কাহিনীতে স্বামীজী জাতির এই প্রাণকেন্দ্রগুলির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এদেশের ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানীর কাছে এ মূলতত্ত্বটি আশ্চর্যভাবে তুলে ধরেছেন। রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরতত্ত্ব ও তাঁর সৃষ্টির আশ্চর্য বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের সংখ্যাতীত প্রকাশকে বোঝাতে গিয়ে একটি অপূর্ব উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বলছেন: বাবুর বাগান দেখে, বৈঠকখানা দেখে সকলেই বাবুর তারিফ করে, ক-খানা গাড়ি, কটা ঘোড়া, কেমন

ঝিলমিল আসবাব ইত্যাদি প্রশংসা করে। কিন্তু 'বাবু'কে দেখতে চায় ক-জনা?—ভাল করে 'বাবু'কে দেখে নাও। তা দরোয়ানের গলাধাক্কা খেয়েই হোক না। আগে 'বাবু'কে দেখে পরে তার ঐশ্বর্যের বিষয় জানতে চাও; আবশ্যক হ'লে 'বাবু'কেই জিজ্ঞাসা কোরো, তিনি বুঝিয়ে দেবেন।—রামকৃষ্ণসূত্রের জীবন্ত ভাষ্য বিবেকানন্দ ইতিহাসের এই মূলতত্ত্বকে 'বাবু'র আসনে বসিয়েছেন, ইতিহাসে ভিড় ক'রে আসা বিভ্রান্তিকর নানা তথ্যের মালিক বা পটভূমিকারূপে তাকে স্থাপন করেছেন। মৌর্যযুগে গুপ্তযুগে মুঘলযুগে এমনকি বর্তমান যুগেও ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের তাৎপর্য এ পরিপ্রেক্ষিতে আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে। এমনকি ভৌগোলিক প্রভাবে এবং ঘটনাপ্রবাহের স্রোতে কেমন ক'রে বার বার এ রাজনৈতিক ঐক্য ভেঙে গেছে, ভেসে গেছে এবং ভেঙে যাওয়া বা ভেসে যাওয়াটা ইতিহাসের একমাত্র কথা কিনা, তাও আমরা এই আলোতেই সম্যক্ বুঝতে পারবো।

স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত 'Lectures from Colombo to Almora' নামক অধ্যায়ের গোড়ার দিকে এদেশের ইতিহাসের মূলতত্ত্বটি প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজী এ-জাতির আর একটি অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। ভারতেতিহাসের একটি বিরাট্ প্রহেলিকা হচ্ছে বিনম্র বা নিরীহ হিন্দু, স্বামীজীর ভাষায় 'the mild Hindu'। আজও সেই বিনম্র হিন্দু আছে, ইতিহাসের প্রথম অরুণোদয়েও সে ছিল তার সহনশীলতা ও তিতিক্ষা নিয়ে। আমাদের আধুনিক চোখে এবং ইওরোপীয় প্রথায় ঐতিহাসিক বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে এই 'mild Hindu' কৃপার পাত্র, উপহাসের পাত্র। ইতিহাসের নানা নজির দেখিয়ে আমরা প্রমাণ করি বা করতে প্রয়াস করি যে, হিন্দু বা ভারতীয়ের এই বিনম্রতা ও সহনশীলতার জন্যেই তার জাতীয় জীবনে, ব্যক্তিগত জীবনেও বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় এসেছে এবং আসবে। বিনম্র হিন্দু যে-দেশের অধিবাসী, সে-দেশে তো আসবেই বাইরে থেকে আঘাতের পর আঘাত। ঘটবেই তো একটানা অন্তর্দ্বন্দ্ব স্বার্থমগ্ন ক্ষমতালোভীদের মধ্যে, যার অসহায় বলি ঐ বিনম্র হিন্দু। রাজনীতির বিচারে এ ধারণাকে তো ভ্রমাত্মক কোন মতেই বলা চলে না।

তবু প্রশ্ন তুলেছেন স্বামীজী। এই যদি একমাত্র ঐতিহাসিক সত্য হয়, তবে ভারত আবহমান কাল ধরে তার বিশিষ্ট সত্তা নিয়ে রয়ে গেল কোন্ মন্ত্রবলে? শাশ্বত ভারত কি কবির কল্পনাবিলাস মাত্র?

স্বামীজী বলছেন, হিন্দুর বিনম্রতা বা সহনশীলতা যদি কাপুরুষতা ও দুর্বলতার নামান্তর হয়, তবে এত দীর্ঘকাল শাশ্বত ভারতের বৈশিষ্ট্যরূপে সে টিকে থাকত না। প্রাণি-জগতের অব্যর্থ নিয়মে শক্তের কাছে দুর্বল চিরদিন হার মানে, অবশেষে দুর্বল লোপ পেয়ে যায়। শত শত বৎসর ধরে ইসলামের প্রচণ্ড আঘাত সত্ত্বেও, আধুনিক জড়বিজ্ঞানের দৌলতে পশ্চিমের শক্তিমান্ খৃষ্টানের সর্বগ্রাসী প্রভাব সত্ত্বেও ভারত সেই 'মাইল্‌ড্ হিন্দু'কে কোলে নিয়ে আজও ভারতই রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। কালক্রমে এই 'মাইল্‌ড্ হিন্দু' মুসলমান এবং খৃষ্টানকে ভারতের বুকে সম-মর্যাদার আসন দিয়েছে। ভারতের মুসলমান, ভারতের খৃষ্টান ওই 'মাইল্‌ড্ হিন্দু'র মতোই আজ সম্পূর্ণ ভারতীয়—বলতে দ্বিধা নেই, সে আগে ভারতীয়, তারপর তার ধর্মের পরিচয়।

যদিও গায়ের জোরে এর অস্বীকৃতি এবং রাজনীতির কলুষে এর ব্যতিক্রম ইতিহাসের ধারায় দেখতে পাওয়া যাবে।

'নিরীহ হিন্দু'র এই শাশ্বত রূপকে তুলনা-মূলক আলোচনায় অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন স্বামীজী! এবং ইতিহাসের ধারায় ঘটনাবলীকে উপেক্ষা ক'রে শুধু কল্পনার জাল বুনে তা করেননি।

পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস-পাঠে আমরা জানতে পারি যে, বহু বলদৃপ্ত বিরাট্ জাতির আশ্চর্য কর্মচাঞ্চল্যের কাছে মানব-সভ্যতা কতটা ঋণী। একটা শক্তিমান্ জাতি নিজেকে প্রসারিত করবার বলিষ্ঠ প্রচেষ্টায় কত যুদ্ধোন্মাদনায় মেতেছে যুগে যুগে, কালে কালে। শক্তির কাছে পরাজিত দুর্বলতা সর্বস্বান্ত রিক্ততায় নত হয়ে হাত পেতে দান গ্রহণ করেছে। এভাবে চলেছে দেওয়া ও নেওয়া, যার সংখ্যাতীত কাহিনী মানবেতিহাসের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে। বর্তমান যুগে, যখন কূটনীতি ও যুদ্ধবিদ্যা জড়বিজ্ঞানের আশ্চর্য প্রসারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং বিরাট্ এ পৃথিবীর দূরত্বকে দূর ক'রে দিয়ে বিভিন্ন দেশ বা জাতিকে একেবারে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে, তখন এ দেওয়া-নেওয়ার গতি এবং প্রকৃতি আরও দ্রুত, আরও সহজ এবং বোধহয় আরও নির্মম হয়ে উঠেছে।

এ কাহিনীর অন্তর্নিহিত নিষ্ঠুর সত্য এই যে, যুদ্ধের দামামা ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানির মাধ্যমেই সভ্যতার এই বিস্তার-লাভ ঘটেছে। স্বামীজীর ভাষায় এই আদান-প্রদান রক্তের নিরন্তর ধারায় রঞ্জিত, অগণিত ক্লিষ্ট মানুষের হাহাকারে অভিশপ্ত, লক্ষ শিশুর ক্রন্দনে সিক্ত, বহু নারীর মর্মন্তুদ অকাল বৈধব্যে কলঙ্কিত। কিন্তু দাতার বলিষ্ঠ ভূমিকায় একদা যারা জীবন্ত অভিনয় করেছিলেন, সেই মদগর্বিত বলদর্পী জাতির মহাশক্তিধর পুরুষেরা আজ কোথায়? প্রাচীন কালের মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম—আজ তাদের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পঠিত হবার অধিকারটুকু বজায় রেখেছে মাত্র। মিশরের বলদৃপ্ত ফ্যারাওগণ পিরামিডের গর্ভে প্রস্তরীভূত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। মানব-সভ্যতার প্রথম দিনের সূর্য যে নীলনদের তীরে উদিত হয়েছিল, সেই নীলনদ আজও বয়ে চলেছে মিশর দেশের মধ্য দিয়ে কিন্তু সে নদীতীরের অধিবাসীরা আজ আরবীয় ইসলামের বলিষ্ঠ উত্তর সাধক, অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আসিরিয়া, ব্যাবিলন আজ তাদের গোত্র শুধু নয়, নাম পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে।

গ্রীস আজ প্রাচীন ঐতিহ্যলুপ্ত দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপের অন্তর্গত একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেশ মাত্র। বর্তমানের এথেন্স তার রাজধানী। কিন্তু পেরিক্লিসের এথেন্স আজ কোথায়? কোথায় সেই হেলেনীয় জাতিগুলির অপূর্ব শিক্ষানিকেতনটি—School of Hellas? থুকিডিডিস, এস্‌কাইলাস, সোফেক্লিস ইউরিপিডিস, সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল্—এঁরা আজ বিশ্বের সকল দেশের যতটুকু অধিকার বা গর্ব, তার বেশি গর্ব ওদের বংশধরেরা এথেন্সে বসে আর নিশ্চয়ই করতে পারে না। মানব-সভ্যতায় হেলিনিজমের (Hellenism) দান অপরিমেয়, কিন্তু তার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার আর যেখানেই থাক, বর্তমান গ্রাসে খৃষ্টান সভ্যতায় তা হারিয়ে গেছে বা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। মহাপ্রাজ্ঞ সক্রেটিস যদি আজ তাঁর যুগযুগান্তের ব্যবধানকে ঘুচিয়ে ফেলে, তাঁর সমাধিস্থান থেকে উঠে এথেন্সের পথে পথে সেই পুরাতন সুরে কথা বলতে

থাকেন, তবে তা শোনবার মতো একটি যুবকও তিনি খুঁজে পাবেন না। হারিয়ে গেছে তাঁর স্বদেশ, হারিয়ে গেছে তারাও, যারা হেমলক দিয়ে তাঁকে হত্যা করেছিল।

আর রোম ?—বর্তমান ইটালির রাজধানী রোম ? একদা খৃষ্টজন্মের পূর্বে এশিয়া, ইওরোপ এবং আফ্রিকা—এই তিনটি মহাদেশের বৃহদংশ জুড়ে যে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল এবং স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘকাল, এই রোমই ছিল তার রাজধানী শুধু নয়, প্রাণকেন্দ্র-স্বরূপ। যে মহাশক্তিধর সীজার বিশ্বজোড়া ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চে একচ্ছত্র নায়কের ভূমিকা অবলীলাক্রমে গ্রহণ করেছিলেন, আজ তাঁর সকল পরাক্রমের উৎস বা প্রতীক-চিহ্ন ওই ক্যাপিটোল পাহাড় ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়ে দর্শকদের কৌতূহল উদ্রেক করছে, উর্ণনাভ আজ সেখানে নিরন্তর জাল বুনে চলেছে। আজিকার রোমানগণ নিশ্চয় (Romans among men) নন। আজ তাঁরা রোমানই নন, তাঁরা ইটালীয়। অতীতের রোমানদের কোন পরিচয় আজ পাওয়া যাবে না বর্তমান রোমবাসীদের জীবনচর্যায় এবং আদর্শ পালনে। স্বামীজীর ভাষায়, জলের ওপর বুদ্‌বুদের মতো প্রাচীন রোমান মিলিয়ে গেছে, উত্তরকালের বুকে তার চিহ্নমাত্র নেই।

স্বামীজীর নির্দিষ্ট পন্থায় আলোচিত এই অংশে যে সব মন্তব্য করা হ'ল, তাতে যেন কোন বিরূপ ধারণার সৃষ্টি না হয়। প্রাচীন ওই সব দেশের ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্য অপরিমেয় ভাবে সমৃদ্ধ করেছে সমগ্র মানব-সভ্যতাকে। একে অস্বীকার করলে সংস্কৃতির আলোতে উদ্ভাসিত সব যুগের মানুষকেই অস্বীকার করা হবে। গ্রীসের বেলা এ কথা সব চেয়ে বেশি প্রযোজ্য। বর্তমান লেখকের মতে স্বামীজীর বক্তব্য এই যে, ঐ সব দেশগুলি আজ আর তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা প্রত্যক্ষভাবে বহন করছে না। ওদের বর্তমান ইতিহাস গৌরবের নয়—সে ইঙ্গিত কখনও করা হচ্ছে না। শুধু এটুকু বলা হচ্ছে যে, ওদের বর্তমান ইতিহাস অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন এক নূতন ইতিহাস।

কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা অনাহত, অব্যাহত। স্বামীজী বলছেন, মনুস্মৃতি-রচয়িতা মহর্ষি মনু ভারতের বহু প্রাচীন কালের মূর্ত প্রতীক হয়ে যদি বর্তমান ভারতে এসে উপস্থিত হন, তবে তিনি পুলকিত হবেন এই দেখে যে, তাঁর বংশধরেরা তাঁরই সুরে কথা কইছে, ওই চিরন্তন ভাবধারাতেই উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ-জীবনে মোটের ওপর একই আদর্শ পালন করছে। যা কিছু পরিবর্তন হয়েছে—তাদের চেহারায় কথাবার্তায় ও জীবন-যাত্রায়, তা মহাকালের অনিবার্য প্রভাবেই হয়েছে, মানব-সভ্যতার সামগ্রিক প্রগতির ফলেই হয়েছে। ওই পরিবর্তনটা বাইরের, ভেতরের নয়।

এই যে ভারত আজও তার বিশিষ্ট অবিচ্ছিন্ন সত্তা নিয়ে রয়েছে, তার কারণ স্বামীজীর মতে ওই 'মাইলড্ হিন্দু'র নম্রতা বা শান্তিপ্রিয়তা। সমগ্র মানব-সভ্যতায় প্রাচীন ভারতের দান অপরিমেয়, বোধ হয় গ্রীস ছাড়া এ-বিষয়ে আর কারও সঙ্গে তার তুলনা হয় না। কিন্তু ভারতের দেবার পদ্ধতি আলাদা। ভারত অস্ত্র উঁচিয়ে তার ঐশ্বর্য দান করেনি কোথাও, সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েনি অন্য কোন দেশে তাকে সভ্য করার অজুহাতে, কিছু দেবার বিনিময়ে আধিপত্য দাবি করেনি। খৃষ্টধর্ম প্রচার এবং ইসলামের দিগ্‌বিজয়ের সঙ্গে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের তুলনা করা যেতে

পারে। আজ পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম একটি এবং প্রধানতঃ এশিয়াতে এ ধর্ম প্রচার করেছেন ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ—শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ সম্রাট্ ও ভিক্ষু অশোকের 'ধর্মবিজয়ে'র আদর্শে। ভারতের কোন বৌদ্ধ রাজা একহাতে অস্ত্র এবং আর একহাতে ত্রিপিটক নিয়ে বিরাট্ বাহিনী সঙ্গে ক'রে এশিয়ার কোন দেশে গিয়ে আধিপত্য স্থাপন করেছেন, ইতিহাস এমন কোন কাহিনীর ইঙ্গিতমাত্র দান করে না। কিংবা যখন ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ অচেনা দেশে ভগবান তথাগতের মৈত্রী করুণা ও অহিংসার বাণী প্রচার করতে গিয়ে বিপদ ও বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, তখন তাঁদের রক্ষা করার অজুহাতে এদেশের কোন নরপতি সৈন্য পাঠিয়ে সে-দেশ সাময়িকভাবেও করতলগত করেছেন, এমন কথা এশিয়া বা ইওরোপের কোন দেশের ইতিহাস লেখেনি। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় ভারত কর্তৃক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠার কথা। ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, সেলিবিস, মালয়, কাম্বোডিয়া, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশগুলি কি অভিনব উপনিবেশে একদা পরিণত হয়েছিল! বর্তমান যুগের খৃষ্টান উপনিবেশবাদ আর প্রাচীন ভারতের উপনিবেশবাদ এ দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। খৃষ্টান উপনিবেশবাদ সাম্রাজ্যবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, শোষণের নামান্তর মাত্র এবং তার গতিবিধি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পথে। আর অতীতের হিন্দু ও বৌদ্ধ উপনিবেশবাদ হচ্ছে শান্তির পথে ঐশ্বর্যের আনাগোনা, সম্প্রীতির মাধ্যমে সভ্যতার আদান-প্রদান।

নম্র ভারতায় বা হিন্দুর বহিঃপ্রকাশের এই তো ধারা। আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের ধারাও আলাদা নয়। যুগে যুগে কত হিংস্র অভিযান তার উন্নত যুদ্ধ-কৌশল, রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক নৈপুণ্য, এবং বহু প্রলোভন দিয়ে ভারতের ধারাবাহিকতাকে ধ্বংস করতে প্রয়াস করেছে। শুরুতে ভারত হকচকিয়ে গেছে সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে আরও সংহত, আরও স্থৈর্যবান্, আরও দৃঢ় ক'রে তুলেছে বিপর্যয়ের একটানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে। তারপর সমন্বয়ের সুদৃঢ় হস্তখানি প্রসারিত ক'রে ভারত বিপর্যয়ের নিষ্ঠুরতাকে প্রশান্ত কল্যাণে পরিণত করেছে, সভ্যতায় এগিয়ে চলার পথে পা ফেলেছে। স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দুর এই তথাকথিত নম্রতা অকর্মণ্যতা বা তামসিকতা নয়, এ কর্মযোগের বলিষ্ঠ সাধনা। বিপর্যয়ের সংখ্যাধিক্য ভারতকে ধৈর্যহারা করেনি কখনও, নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে নব বলে বলীয়ান্ করেছে।

মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে, স্বামীজীর এই বিশ্বাস কতটা ইতিহাস-সম্মত, তা যাচাই করতে। আমরা জানি, ইসলামের দিগ্‌বিজয়ের কাহিনীতে ভারত একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার ক'রে আছে। আরবদের দ্বারা সিন্ধুদেশ বিজিত হয় ৮ম শতাব্দীর গোড়াতে। কিন্তু সিন্ধুদেশ নিয়েই আরবদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল; হিন্দু রাজাদের, বিশেষ ক'রে প্রতিহার রাজপুত বংশের পরাক্রান্ত নরপতিদের বাধা কাটিয়ে আরবেরা ভারতের অভ্যন্তরে আর প্রবেশ করতে পারেনি। তারপর একাদশ শতাব্দীর গোড়াতে নূতন ক'রে শুরু হয় তুর্কি মুসলমানদের অভিযান উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিংহদ্বার দিয়ে এবং ১২০৬ খৃষ্টাব্দে কুতবুদ্দিন আইবেক দিল্লীর সিংহাসনে বসে ভারতে সুলতানী শাসনের সূত্রপাত করলেন। ১৫২৬

পর্যন্ত মোটামুটি ৩২০ বছর স্থায়ী হয়েছিল ভারতে সুলতানী শাসন। মধ্যযুগের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য অল্পবিস্তর সকলেরই জানা। সকলেই জানেন যে, উন্নত অস্ত্রবলে ও বাহুবলে বলীয়ান্ ইসলাম, মুফতি-উলেমা-মৌলভিদের ধর্মোন্মাদনায় উদ্দৃপ্ত ইসলাম তার ধর্ম দিয়ে তার সংস্কৃতি দিয়ে এই দার-উল-হারব্ ভারতকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করতে কী অবিরাম চেষ্টা করেছে—কত অত্যাচার, কত শোষণ, কত মন্দির লুণ্ঠন, কত ভীতি প্রদর্শন, কত প্রলোভন! বিজিত হিন্দু বিজয়ী মুসলমানকে চিনে রেখেছে ভারতের মূর্তিমান্ অকল্যাণরূপে। এ অকল্যাণের বেড়াজালে বেষ্টিত হয়ে হিন্দু ভারত কত দীর্ঘকাল নীরবে কর্মযোগের সাধনা করেছে। শত রণক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করেছে, তবু সে মাথা বিকিয়ে দেয়নি, নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয়নি। শত শত বৎসরের অক্লান্ত প্রয়াসেও ইসলাম ভারতকে দার-উল-ইসলাম করতে পারলো না, প্রবেশ করতে পারলো না ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে।

ভারতের ধর্ম ও সমাজ রক্ষার প্রয়াসে নিরীহ হিন্দু কোন দুঃখকে দুঃখ ব'লে মানলে না, কোন বিচ্ছেদকেই বড় ক'রে দেখলে না, কোন বঞ্চনাতেই হতাশ হ'ল না, কোন আঘাতেই নুয়ে প'ড়ল না। এর আর যাই সমালোচনা করা হোক না কেন, স্বামীজীর মতে এ তামসিকতা বা অকর্মণ্যতা নয়। রাজনৈতিক প্রাধান্য হিন্দু হারিয়েছে, তবু দুর্ধর্ষ রাজশক্তির প্রতিকূলতার বিভীষিকায় নিজেকে বিকিয়ে দিলে না সে। ভারতের সুলতানী আমলের বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক ডক্টর ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছেন, ভারতের সুলতানী শাসন যেন বিদেশে শত্রুপুরীতে তিন শত বছরের অধিককালের জন্য অবিরাম যুদ্ধের এক শিবির স্থাপন মাত্র (a perpetual military camp in an alien country)। দিল্লীর সুলতান আর তাঁর আমীর ওমারাহ্ এদেশের জনমানস থেকে চিরদিন বহু দূরে।

কিন্তু এ অবস্থা চিরকাল চলতে পারে না। তুর্কি ও পাঠান বাইরে থেকে ভারতে এসেছে জয়ের দাবিতে, বলদৃপ্ত নিষ্ঠুর শাসন চালিয়েছে পুরুষানুক্রমে, ধর্মপ্রচার করেছে তার প্রচলিত প্রথায়। তবুও সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমান ভারতে হিন্দুর বহু পশ্চাতে রয়ে গেল, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ভারতীয় মুসলমান হয়েই তাকে থাকতে হ'ল আদিবাসভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে। হিন্দুস্থানের হিন্দুয়ানি তার কাছে যত ঘৃণারই হোক, তাকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও লোপ করা সম্ভব হ'ল না।

ঠিক এমন অবস্থার সম্মুখীন ইসলাম আর কোথাও হয়নি। যেখানে সে গেছে, তা এশিয়াই হোক, আফ্রিকাই হোক বা খৃষ্টান ইওরোপই হোক, সেখানে সে সর্বতোভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে, নির্মূল করেছে সে সব দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি বা তাকে পুরোপুরি ইসলামি রূপ দান করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সে হঠেও এসেছে তল্পিতল্পা নিয়ে, যেমন একদা আধুনিক যুগের প্রারম্ভে মূর-সভ্যতার পীঠস্থান দক্ষিণ স্পেন থেকে সে চলে এসেছিল সংহত খৃষ্টান শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে।

কিন্তু ভারতে ইসলামের সমস্যা সম্পূর্ণ আলাদা, তাকে থাকতে হবে হিন্দুর পাশাপাশি। কী সেই সূত্র, যা এ-দুটি বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির দুই কূলের দুস্তর ব্যবধানের সমুদ্রকে বন্ধন করবে? প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্তী হয়ে হিন্দু এবার এগিয়ে এল, মুসলমানও পেছনে রইল না। ভাবরাজ্যে,

ধর্মরাজ্যে নবগঙ্গার প্লাবন বইয়ে দিতে এলেন একে একে কত নব ভগীরথ। এলেন রামানন্দ, কবীর, দাদু, সুরদাস, নানক, নামদেব, ভাস্করাচার্য, তুকারাম ও নিমাই ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে। অভিনব জয়যাত্রা শুরু হ'ল ভারতেতিহাসে সাধু ও সন্তদের প্রেম ও ভক্তির প্লাবনে। মিলনসেতু নির্মিত হ'ল ঔদার্যের প্রসারিত বক্ষে, মানব-ধর্মের মাল-মশলা দিয়ে গাঁথা হ'ল তার এক একটি ধাপ। সমন্বয়ের সূত্র আবার ফিরে পাওয়া গেল ওই সাধকদেরই জীবনচর্যায় ও অভিনব যোগসাধনায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে।

স্বামীজী-প্রদত্ত ইঙ্গিতের অনুসরণ ক'রে বলতে পারি, ওই যুগের সত্যিকার ইতিহাস রচনা করা হয়েছে শত মালিন্যে কলঙ্কিত, নিষ্ঠুর রক্তধারায় রঞ্জিত দিল্লীর তখত্‌তাউস থেকে নয়, রচিত হয়েছে সাধু ও সন্তদের জীবন-সাধনায় পবিত্রীকৃত তীর্থক্ষেত্রসমূহে। মিন্‌হাজ-উদ্দীন সিরাজ, জিয়াউদ্দীন বারানী এবং সামসি সিরাজ আফিফ্‌ প্রমুখ দরবারী ঐতিহাসিক ও লিপিকারগণ ঐ যুগের এক দিকের ছবি এঁকেছেন মাত্র তবৃকত-ই-নাসিরী, তরখ্‌-ই-ফিরুজশাহী প্রভৃতি গ্রন্থে। এ চিত্র অসম্পূর্ণ এবং সময় সময় ভুল ধারণারও সৃষ্টি করে ঐ দরবারী ইতিহাসের খুঁটিনাটি ঘটনাবলী।

অন্যদিকে মধ্যযুগের সাধু ও সন্তেরা তাঁদের নিরলস কর্মসাধনা দিয়ে তৎকালীন ভারতের আকাশে বাতাসে শাশ্বত ভারতের যে অশরীরী বাণী রেখে গেলেন, তাই লাভ ক'রল বলিষ্ঠ রূপ আকবরের অপূর্ব রাজনৈতিক কার্যাবলীর সার্থকতার মধ্যে। এই মহামতি মহাশক্তিধর মুঘল সম্রাট্‌ হিন্দু ও মুসলমানের সমান অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্বের পট-ভূমিতেই আর এক মহাভারত গড়ে তুললেন, যা স্থায়ী হয়েছিল শতবর্ষেরও অধিককাল। ইসলাম ভারতের অঙ্গীভূত হয়ে এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল।

ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তনে সে সম্ভাবনা কেমন ক'রে বিঘ্নিত হ'ল, ধর্মমত বা সাম্প্রদায়িকতা এদেশের ইতিহাসের ধারাকে কিভাবে ব্যাহত ও বিপর্যস্ত করেছে, তার জন্য নতুন আলোচনা প্রয়োজন। ইতিহাসের যে সূত্র স্বামীজী আমাদের দান করেছেন, তাকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের এ ধারণা জন্মাতে পারে যে, স্বামীজী-কৃত ইতিহাসের ব্যাখ্যা এবং বিন্যাস ততটা বস্তুগত নয়, যতটা আদর্শগত—materialistic interpretation নয়, এ ইতিহাসের idealistic interpretation। এ ধারণার পক্ষে ও বিপক্ষে বারান্তরে কিছু তথ্যগত আলোচনা করবার বাসনা রইল।

শিক্ষা ঃ স্বামীজীর দৃষ্টিতে

স্বামী অক্তজানন্দ

বেলুড়ের বর্তমান মঠ তখন মাত্র বৎসর দুই স্থাপিত হইয়াছে। স্বামীজী মঠেই আছেন। বর্ষাকালের এক সকাল—ঘন কৃষ্ণ মেঘের সারি আনাগোনা করিতেছে। কথা হইতেছিল ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে। আগন্তুক দর্শনার্থীদের মধ্যে স্বামীজীর বাল্যবন্ধু শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ মহাশয়ও আছেন। প্রিয়নাথ বাবু স্বামীজীর শিষ্যও ছিলেন। আলোচনাটি প্রিয়নাথ বাবুরই এক প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হইয়াছিল। শিক্ষা—উহার আদর্শ ও পদ্ধতি লইয়া স্বামীজী আবেগভরে সেদিন অনেক কথা বলিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন :

• ওরে কেউ কাকেও শিখাতে পারেন না। শিক্ষক শিখাচ্ছি মনে করেই সব মাটি করে। কি জানিস্, বেদান্ত বলে—এই মানুষের ভিতরেই সব আছে, কেবল সেইগুলি জানিয়ে দিতে হবে, এই মাত্র শিক্ষকের কাজ। ছেলেগুলো যাতে আপনার আপনার হাত-পা নাক-কান মুখ-চোখ ব্যবহার ক'রে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু ক'রে দিতে হবে। তা হলেই আখেরে সমস্তই সহজ হয়ে পড়বে। কিন্তু গোড়ার কথা ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলো তরকারি। কেবল তরকারি খেয়ে হয় বদহজম, শুধু ভাতেও তাই। মেলা কতকগুলো কেতাব মুখস্থ করিয়ে মনিষ্যিগুলোর মুণ্ডু বিগড়ে দিচ্ছিস্।·· বাপ্! কি পাসের ধুম, আর দু-দিন পরেই সব ঠাণ্ডা। শিখলেন কি ?—না নিজেদের সব মন্দ, সাহেবদের সব ভাল। শেষে অন্ন জোটে না। এমন high education (উচ্চ শিক্ষা) থাকলেই কি, আর গেলেই বা কি ?

স্বামীজীর উল্লিখিত এই খেদোক্তির মর্ম যেমন গভীর, তেমনই দূরস্পর্শী। শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য ও উপায় এবং প্রচলিত শিক্ষার প্রহসন ও ব্যর্থতা স্বচ্ছ-সুস্পষ্টভাবে ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। এমন চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো স্বামীজীর পক্ষেই সম্ভব। আজ হইতে ষাট বৎসর পূর্বের সেই মেঘাচ্ছন্ন সকালে, বেলুড়ের গঙ্গাতটের বায়ুমণ্ডলে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল, উহাই তরঙ্গাকারে বিশ্বের আকাশে-বাতাসে আজও ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সে তরঙ্গের স্পর্শ যখনই চিত্তে লাগে, তখনই শিক্ষা-চিন্তা যেন আমাদেরও সমগ্র ভাবনাকে অধিকার করিয়া বসে। বিবেকানন্দ-বাণীর ইহাই অমোঘ শক্তি।

মূর্তিমান্-বেদান্ত স্বামীজী যে দৃষ্টিতে সব কিছু অবলোকন করিয়াছেন, খুবই সত্য যে আমাদের সে দৃষ্টি নাই। তথাপি তাঁহারই জীবনালোকের সহায়তা গ্রহণ করিলে সম্যক্ দৃষ্টি আমাদেরও খুলিতে পারে। আলোচ্য প্রসঙ্গটিও তাই স্বামীজীর দৃষ্টিতে যতই বিচার করা যাইবে, ততই পথভ্রান্তির অবসান হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শিক্ষার অর্থ স্বামীজীর কথায় জানিয়াছি : বেদান্ত বলে—মানুষের ভিতরেই সব আছে। ···কেবল সেইগুলি জাগিয়ে দিতে হবে। কথাটিকে সংজ্ঞার আকারে তিনি আরও চমৎকার করিয়া অন্যত্র বলিয়াছেন : মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশ-সাধনের নামই শিক্ষা (Education is the manifestation of the perfection already in man.)।

মাধুর্যমণ্ডিত এই শিক্ষা-সংজ্ঞাটি ইদানীং

সর্বত্রই লোকের মুখে শোনা যায়। কিন্তু ইহার আবৃত্তি যত সহজ, অর্থবোধ তত সহজ নহে। মানুষের ভিতরেই সব আছে—এই 'সব' অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্ব বলিতে কী বুঝা যায়, তাহার কোন ধারণা না থাকিলে উহাকে জাগাইয়া তোলা, বা বিকশিত করা মোটেই সম্ভব নহে। সুতরাং সর্বাগ্রে ইহাই বুঝিবার প্রযত্ন করা কর্তব্য।

অতি সামান্য একটি বীজকে, মাটিতে পুঁতিয়া, উপযুক্ত রৌদ্র-জল-সার ইত্যাদি প্রদান করিলে, এবং পোকা-মাকড়-ছাগল হইতে বাঁচাইয়া চলিলে কালক্রমে উহাকে একটি বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত করা যায়। বীজটির মধ্যে বটত্ব পূর্ব হইতে থাকে বলিয়াই উহা সম্ভব হয়। আবার যে-হেতু বটেরই বীজ, সেই হেতু উহার অন্তর্নিহিত বটত্ব একটি সুনিশ্চিত সত্য। বীজটির পূর্ণত্ব বা বটত্বের বিকাশ-সাধন মানে তাহা হইলে দাঁড়াইল, উহার বটবৃক্ষে পরিণতি-লাভ।

কয়েক খণ্ড আকরিককেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রয়োজনীয় পরিশোধন ও নিষ্কাশনাদি করিলে অতি মূল্যবান্ কোন ধাতুবিশেষে রূপান্তরিত করা যায়। ছোট সবুজ কুঁড়িটির পাপড়িগুলি একে একে প্রস্ফুটিত হইলে শতদল পদ্মের শোভায় সকলেই আকৃষ্ট হয়। আকরিক হইতে ধাতুতে রূপান্তর সম্ভব হয় না, যদি সেই ধাতুত্ব পূর্ব হইতেই ঐ আকরিকে না থাকে। শতদলরূপে ফুটিয়া ওঠার মধ্যেই তো ছোট কুঁড়িটির চরম পূর্ণতা-প্রাপ্তি। উপমাগুলির সাহায্যে এ-কথায় সহজেই বুঝা যাইবে যে, মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের প্রকাশ করাই তাহার পূর্ণত্বের বিকাশ। এই বিকাশ-সাধনের যে পদ্ধতি, উহারই নাম শিক্ষা। এখন মানুষ কী, তাহা বুঝিতে পারিলে মানুষ-ত্ব বা মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন-ব্যাপারটিও সহজবোধ্য হইবে।

'মানুষ' বলিতে আমরা সাধারণভাবে বুঝিয়া থাকি, তাহার চারিটি সত্তা: (১) দেহ, (২) প্রাণ, (৩) মন ও (৪) বুদ্ধি। দেহ আর প্রাণের সমবায়ে মানুষের বাহ্য স্থূল শরীর এবং মন ও বুদ্ধির মিলনে গঠিত তাহার সূক্ষ্ম উচ্চতর বিচারে অবশ্য মানুষের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক আরও একটি সত্তা আছে—উহা তাহার আনন্দময় সত্তা। শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে মানুষের এই চারটি সত্তারই যথোপযুক্ত পরিস্ফুরণ—এগুলিকে যথার্থ ভাবে কার্যের উপযোগী করা। মানুষের মহত্তম পঞ্চম যে সত্তাটির উল্লেখ করা হইল। উহার বোধ কিন্তু নিছক লৌকিক শিক্ষায় সম্ভব নহে—অতন্দ্র অধ্যাত্মসাধনার ফলেই উহা উপলব্ধ হয়। পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ বলিতে—তাই উক্ত সকল সত্তারই সর্বাবয়ব প্রকাশ বুঝিতে হইবে। স্বামীজীর দৃষ্টিতে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ তাহা হইলে দাঁড়াইল আত্মবিকাশ।

দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ সতেজ কর্মঠ দেহই বেগবান প্রাণশক্তিকে ধারণ করিতে সক্ষম। দেহের ইন্দ্রিয়নিচয় যদি দুর্বল অপটু হয়, তবে মন যতই শুচি-সুন্দর ও সুদক্ষ হউক, বাস্তবক্ষেত্রে সবকিছু বৃথা হইয়া যায়। আবার বুদ্ধি যদি পরিশুদ্ধ এবং মার্জিত না হয়, জ্ঞান-গরিমা শিল্প-বিজ্ঞান প্রয়োগ করিবে কে? শুধু তাহাই নয়, অপপ্রয়োগের আশঙ্কাও থাকিয়া যায়। তাই তো স্বামীজী পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাপদ্ধতি বলিতে গিয়া বার বার বলিয়াছেন: ছেলেগুলো যাতে আপনার আপনার হাত-পা নাক-কান মুখ-চোখ ব্যবহার ক'রে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু প্রস্তুত হয়, এমন সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের পক্ষে এক্ষণে প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও ইস্পাতের

মতো স্নায়ুসম্পন্ন হওয়া; এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হওয়া যে, কেহই যেন উহার প্রতিরোধে সমর্থ না হয়—যেন উহা ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে সমর্থ হয়, যদিও এই কার্যসাধনে সমুদ্রের অতল তলে যাইতে হয়, যদিও সর্বদা সর্বপ্রকারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়। ইহাই এক্ষণে আমাদের আবশ্যক।

উক্ত বাণীগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—দেহ-প্রাণ এবং মন-বুদ্ধির বিকাশের প্রতি স্বামীজীর দৃষ্টি কত প্রখর ছিল। ইচ্ছা-শক্তি, তথা মনের আবেগ ও সঙ্কল্পকে আয়ত্তাধীনে আনিয়া সুনিয়ন্ত্রণ করা শিক্ষার অপর মুখ্য উদ্দেশ্য—ইহাও তাঁহার নানা উক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট। 'বিদ্যাশিক্ষা কাহাকে বলে? বই পড়া?—না। নানাবিধ জ্ঞানার্জন? —তাহাও নয়। যে শিক্ষাদ্বারা এই ইচ্ছা-শক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা।'

যে-কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় মনের একাগ্রতা। স্বামীজীর কথায় মনের শক্তিসমূহকে একমুখী করাই জ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায়। বহির্বিজ্ঞানে বাহ্য বিষয়ের উপর মনকে একাগ্র করিতে হয়, আর অন্তর্বিজ্ঞানে মনের গতিকে আত্মাভিমুখী করিতে হয়। শিক্ষা-দীক্ষার মূল কথাই হইল মনের এই একাগ্রতা-বিধান। তাঁহার অপর উক্তি: আমার মনে হয়, শিক্ষার সার কথাই হইল মনের একাগ্রতা—কতগুলি ঘটনা-সংগ্রহ নহে।

পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতা, সেবা, সত্য, শ্রদ্ধা, চরিত্র এই গুণগুলি মনেরই এক একটি দৈবী সম্পদ্। মানুষের এত মহিমা এই সব গুণের বলেই। মনের এই রত্নভাণ্ডারটিকে উদ্‌ঘাটন করা শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। তাই তো শুনি, স্বামীজী বলিতেছেন: 'অধিকাংশ ব্যক্তিতে সেই আভ্যন্তরীণ ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ আবৃত ও অস্পষ্ট হইয়া আছে। যেন একটি লোহার পিপার ভিতর আলো রাখা হইয়াছে, ঐ আলোর এতটুকু জ্যোতিঃও বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। একটু পবিত্রতা, একটু নিঃস্বার্থতা অভ্যাস করিতে করিতে আমরা ঐ মাঝখানকার আড়ালটিকে খুব পাতলা করিয়া ফেলিতে পারি। অবশেষে উহা কাঁচের মতো স্বচ্ছ হইয়া যায়।' শ্রদ্ধার অনুশীলন-প্রসঙ্গে তাঁহার স্মরণীয় বাণী: 'এই 'শ্রদ্ধা' বা যথার্থ বিশ্বাস-তত্ত্ব প্রচার করাই আমার জীবন-ব্রত।' স্বামীজীর আদর্শানুযায়ী বিশ্বাসের ধারা দ্বিমুখী, একটি নিজের অন্তরের দিকে, আর একটি বাহিরের দিকে—শাস্ত্রে গুরুজনে। এই শ্রদ্ধার তারতম্যের ফলেই মানুষে মানুষে এত প্রভেদ। মাতৃক্রোড় হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত মানুষ যত শিক্ষাই গ্রহণ করুক, সবই এই শ্রদ্ধাকে অবলম্বন করিয়া। শ্রদ্ধার পরিমাণের উপরই নির্ভর করে আমাদের স্ব স্ব জীবনের সফলতা বিফলতা। শৈশবে মা-বাবাকে দিদিকে দাদাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম—বিশ্বাস করিয়াছিলাম নিজের ক্ষুদ্র হাত-পা-মস্তিষ্ককে। তাই তো সম্ভব হইয়াছে হামা দেওয়া, পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ানো, হাঁটা-চলা, কথা বলা—সম্ভব হইয়াছে বর্ণজ্ঞান লাভ করা, ধারাপাত পড়া, গণিত, সাহিত্য, ইতিহাস, পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন ইত্যাদি সব আয়ত্ত করা। এমন কি, প্রবল আত্ম-বিশ্বাস এবং শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস লইয়াই অধ্যাত্মজীবনে প্রবেশের অধিকারও লাভ করি। তিনি বলিতেন: 'বিশ্বাস

বিশ্বাস বিশ্বাস—আপনার উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতি-লাভের একমাত্র উপায়।... নিজের উপর বিশ্বাস-সম্পন্ন হও, সেই বিশ্বাস-বলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও ও বীর্যবান্ হও। ইহাই এক্ষণে আমাদের আবশ্যক।' আবার তাঁহার দৃপ্ত ঘোষণা: বেদান্ত বলেন, যে ব্যক্তি নিজের উপর বিশ্বাস না করে, সে নাস্তিক। তোমার আপন আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত 'নাস্তিকতা' বলেন।

সেবার তাৎপর্য ও মহিমা স্বামীজী যে ভাবে কীর্তন করিয়াছেন, পৃথিবীর অন্য কোন আচার্য এরূপ করিয়াছেন বলিয়া ইতিহাসে নজীর পাওয়া যায় না। মানুষের ভিতরের শক্তিকে জাগানোর জন্যই শিক্ষা—ইহাই স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ। তিনিই বলিয়াছেন: 'পরার্থে এতটুকু কাজ করিলে ভিতরের শক্তি জাগিয়া উঠে; পরের জন্য এতটুকু ভাবিলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়।' পরের উপকারের জন্য সেবা নহে, পরন্তু নিজেরই কল্যাণের জন্য সেবা। নিজের মধ্যে যে অন্তর্যামী হরি আছেন, প্রতি হৃদয়ে তিনিই অধিষ্ঠিত আছেন—এই জ্ঞান লইয়া অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা-বোধে সেবাই যথার্থ সেবা। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'ই স্বামীজীর সেবাদর্শ। দৈনন্দিন জীবনে ইহারই অনুশীলনে প্রেরণা-প্রদান শিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

সত্য ও চরিত্রের কথা পৃথক্ আলোচনা বাহুল্য। কারণ সকল দেশের সকল কালের সকল আচার্যের ইহাই শিক্ষা। অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন-প্রসঙ্গে স্বামীজী সুন্দর সুস্পষ্ট বলিয়াছেন: "ব্যক্তিগত 'চরিত্র' এবং 'জীবন'-ই শক্তির উৎস, আর কিছুই নহে।" মিথ্যার সামান্যতম প্রলেপও জীবনে কী ভয়াবহ, তাহা তাঁহার উক্তিতে পরিষ্কার ব্যক্ত হইয়াছে: 'বিষ এক ফোঁটা মিশ্রিত হইলেও সমস্ত খাদ্য দূষিত করিয়া ফেলে।' চরিত্র কী, তাহাও স্বামীজী সংজ্ঞাকারে বলিয়া দিয়াছেন: 'আমাদের মনের ভিতর যে চিন্তাপ্রবাহগুলি চলিয়া যায়, তাহার প্রত্যেকটি এক একটি দাগ রাখিয়া যায়; সংস্কারগুলি তাহাদের সমষ্টি। আমাদের চরিত্র এই সমুদয় সংস্কারের সমষ্টিস্বরূপ। সুতরাং শিক্ষার আর এক অপরিহার্য উদ্দেশ্য—সর্বতোভাবে এই চিন্তাপ্রবাহমালাকে এমন ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করা, যাহাতে পবিত্র শুভ্র ও কল্যাণপ্রদ রেখাই উহারা চিত্তে আঁকিয়া দিয়া যায়।

মনের সুষ্ঠু গঠন ও প্রকাশ-সাধনের প্রয়োজনীয়তা কত জরুরী, তাহা মোটামুটি বুঝিতে সকলেই পারিবেন। স্বামীজীর শিক্ষাদর্শে তাই স্থূলদেহের সুসংগঠনের সাথে সাথে মনের সর্বতোমুখী বিকাশের উপর এত জোর দেওয়া হইয়াছে। মনের কার্য যেখানে অবহেলিত, ইন্দ্রিয়নিচয় যতই তীক্ষ্ণ হউক, বিষয়ানুভবের ক্ষমতা উহাদের থাকে না। স্বামীজীর অনবদ্য উদাহরণ: মনে কর, আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আর তুমি অতিশয় মনোযোগপূর্বক আমার কথা শুনিতেছ, এমন সময়ে এখানে ঘণ্টা বাজিল, তুমি হয়তো সে ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইবে না। ঐ শব্দ-তরঙ্গ তোমার কর্ণে উপনীত হইয়া কর্ণপটহে লাগিল, স্নায়ুদ্বারা ঐ সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছিল, কিন্তু তথাপি তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? যদি মস্তিষ্কে সংবাদ-বহন পর্যন্ত সমস্ত শ্রবণ-প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? তাহা হইলে দেখা গেল, ঐ শ্রবণ-প্রক্রিয়ার জন্য আরও কিছু আবশ্যক—মন ইন্দ্রিয়যুক্ত ছিল না। যখন

মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ থাকে, ইন্দ্রিয় উহাকে কোন সংবাদ আনিয়া দিতে পারে, মন তাহা গ্রহণ করিবে না। যখন মন উহাতে যুক্ত হয়, তখনই কেবল উহার পক্ষে কোন সংবাদ-গ্রহণ সম্ভব।

উপরের উদাহরণটি বড়ই তাৎপর্যবোধক। বাহ্যেন্দ্রিয় ও মনের মিলনে এত সব প্রক্রিয়া হইলেও বিষয়ানুভূতি কিন্তু তখনও আমাদের সম্পূর্ণ হয় না। মস্তিষ্কে সংবাদবহন পর্যন্ত সবই বুঝা গেল—আরও একটি বাকী থাকিল, যাহার জন্য আমাদের জ্ঞানের অভাব থাকিয়াই যাইতেছে। স্বামীজীরই কথা: আরও একটি জিনিস আবশ্যক। ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া আবশ্যক। প্রতিক্রিয়া হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। বাহিরের বস্তু আমার অন্তরে সংবাদ-প্রবাহ প্রেরণ করিল। আমার মন উহা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির নিকট অর্পণ করিল। বুদ্ধি পূর্ব হইতে অবস্থিত মনের সংস্কার অনুসারে উহাকে সাজাইল এবং বাহিরে প্রতিক্রিয়া-প্রবাহ প্রেরণ করিল, ঐ প্রতি-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে। ঠিক কথা। দেখা যাইতেছে, বুদ্ধির কর্তৃত্ব আমার জ্ঞানের পথে একটি অনুপেক্ষণীয় সত্য। বুদ্ধি কী? স্বামীজীর ভাষায় মনে যে শক্তি এই প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে, তাহাকে বুদ্ধি বলে।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে শিক্ষাকে দেখিলে শিক্ষার লক্ষ্য তাহা হইলে দাঁড়াইল—মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, অর্থাৎ তাহার দেহ প্রাণ মন ও বুদ্ধির সুষম বিকাশ। এক্ষণে তাঁহার একটি মূল্যবান্ সতর্কবাণীর প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করিতেছি—বর্তমান আলোচনার প্রস্তাবনাতেই যাহা আমরা স্মরণ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন: '...কিন্তু গোড়ার কথা ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলি তরকারি।' ক্রমোন্নতিশীল মানুষ এক অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে কখনই চায় না—আত্মোন্নতি তাহার স্বভাব। এই বিশেষ স্বভাবই মানুষের ধর্ম। ধৃতি, ক্ষমা, সংযম, অচৌর্য, শৌচ, জিতেন্দ্রিয়তা, মেধা, বিদ্যাবত্তা, সত্য এবং অক্রোধ—ইহাই সনাতন মনুষ্যধর্ম। আত্মোন্নতির লক্ষণ এই-গুলিই। এইসব গুণের অনুশীলন দ্বারাই মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের জাগরণ হয়। স্বামীজী তাই ধর্মের অপূর্ব সংজ্ঞা দিয়াছেন। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ-সাধনের নামই ধর্ম (Religion is the manifestation of the Divinity already in man.) আজ ভাবিলে মন ব্যথায় ভরিয়া ওঠে, ধর্মসংস্রবশূন্য বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা মানুষ গড়িবার কী পণ্ডশ্রমই না দেশব্যাপী চলিতেছে। স্বামীজীর দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে বেশ প্রতীয়মান হইবে, গাছের শিকড় কাটিয়া ফেলিয়া উহাতে ফুল ফুটাইবার ও ফল ধরাইবার প্রচেষ্টার ন্যায়ই অদ্ভুত শিক্ষা-নীতি আমরা অনুসরণ করিতেছি। কোন একটি আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া, অনুরূপ জীবন গঠন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে, ঐ আদর্শ হইয়া ওঠাই শিক্ষার মূল কথা। এইভাবে অগ্রসর হইতে হইতে আদর্শময় হইয়া যাওয়াই শিক্ষার সারকথা—স্বামীজীর কথায় ইহারই নাম ধর্ম। 'Religion is being and becoming.' জীবনধারণের জন্য প্রধান আহার্য অন্নের ন্যায় ধর্মকে জীবন-বিকাশের প্রধান উপকরণ বলিয়া তিনি বলিয়াছেন।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে যে শিক্ষাদর্শ আমরা পাই, নিছক কেতাবী শিক্ষায় সে-আদর্শে পৌঁছানো শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য। ধর্ম- ও নীতিশিক্ষা-বিযুক্ত পাঠক্রমের দ্বারা শিক্ষার পূর্বোক্ত লক্ষ্য-সাধন যে অসম্ভব প্রয়াস, ইহাও আজ সকলেই মর্মে মর্মে বুঝিতেছেন। সুখ-দুঃখময় সংসারের কতগুলি সংবাদ কণ্ঠস্থ করা এবং ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ করিয়া অন্ন-বস্ত্রের সুব্যবস্থা করাই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, স্বামীজীর ভাব-চক্ষে দেখিলে ইহা প্রত্যেকেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ীঘোড়া চড়ে সে।' —'গাড়ীঘোড়া-চড়ানো' এই বিষময় শিক্ষাদর্শ যত দ্রুত বিলুপ্ত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। স্বামীজীর আবির্ভাবের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে প্রার্থনা করি, তাঁহার জীবনালোকে আমাদের দৃষ্টির মলিনতা অচিরে দূর হউক। তাঁহার অশরীরী বাণী আমাদের হৃদয় স্পর্শ করুক।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠঃ গত ১২ই ফাল্গুন (২৫শে ফেব্রুআরি) সোমবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৮তম জন্মতিথি-উৎসব মহা আনন্দে ও ভাবগম্ভীর কর্মসূচী সহায়ে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হয়। উপনিষদ্‌-আবৃত্তি, উষা কীর্তন, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, বিশেষ-পূজা, হোম, দশাবতারের পূজা, ভোগারতি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও 'কথামৃত'-পাঠ, কীর্তন (গোষ্ঠলীলা), কালীকীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রায় ১০,০০০ নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ পান।

অপরাহ্ণে মঠ প্রাঙ্গণে স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী রঙ্গনাথানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অবলম্বনে ইংরেজীতে সময়োপযোগী আলোচনা করেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা ও বাণীর সার্থক রূপায়ণই ব্যষ্টি- ও সমষ্টি-জীবনে কল্যাণের প্রকৃষ্ট পথ।

সন্ধ্যায় আরতির পর সানাইয়ে অংশ গ্রহণ করেন ওস্তাদ সাজ্জাদ হোসেন। সকাল হইতে বহু নরনারী মঠে সমবেত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। রাত্রে দশ-মহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও হোম হয়। রাত্রিশেষে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ২০ জনকে সন্ন্যাসব্রতে এবং ১০ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

পরবর্তী রবিবার ৩রা মার্চ মহোৎসব-দিনে প্রাতঃকাল হইতেই বেলুড় মঠ এক অপরূপ মহিমায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, কালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের পূর্বদিকে নির্মিত এক মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুবৃহৎ তৈল চিত্র ও তাঁহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র সজ্জিত রাখা হয়। সারাদিনে প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িঃ গত ১২ই ফাল্গুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মতিথি-দিবসে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন, কালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসব

তমলুকঃ গত ১৬ই মাঘ ১৩৬৯ (৩০. ১. ৬৩) বুধবার হইতে চারিদিনব্যাপী তমলুক রামকৃষ্ণ আশ্রমে নবনির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, ভজন, সানাই প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পর পুরাতন মন্দির হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। বেদপাঠ ও নামকীর্তন সহকারে নবনির্মিত মন্দির প্রদক্ষিণপূর্বক মন্দিরে প্রবেশ করা হয়।

অতঃপর মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য-পূজিত প্রতিকৃতি মন্দির-বেদীতে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মর-মূর্তির সম্মুখে স্থাপন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূজাদি আরম্ভ হয়।

এতদুপলক্ষে বেদ, উপনিষদ্‌, গীতা, চণ্ডী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও পূজার সুমধুর

মন্ত্রাদি উচ্চারণে নবনির্মিত মন্দির মুখরিত হইয়া উঠে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের চারিজন অধ্যাপক বৃহস্পতিবার বাস্তুযাগ ও শুক্রবার সপ্তশতী হোম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। প্রায় ৮,০০০ ভক্ত নরনারীর একটি শোভাযাত্রা নানা বাদ্য সহকারে নামকীর্তনে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া সমগ্র শহর পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় শতাধিক পোস্টারে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বাণী সকলের দৃ আকর্ষণ করে।

নূতন মন্দিরে কয়েকদিন আরতি-অনুষ্ঠানেও বহু নরনারী প্রার্থনায় যোগদান করেন, আরতির পর শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে প্রথমদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবনী ও বাণী মনোরমভাবে আলোচিত হয়। প্রথম দিনের আলোচনায় স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, নিরাময়ানন্দ, দ্বিতীয় দিনে স্বামী ঈশানানন্দ, মহানন্দ অংশ গ্রহণ করেন; সভা-শেষে বেতারশিল্পী শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐদিন 'সুরে কথামৃত' ও পরদিন বিবেকানন্দের গীতি-আলেখ্য শ্রবণ করান। চতুর্থ দিন 'রামানন্দ' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ' এই দুইটি সবাক্ চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

স্বামী প্রণবেশানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৩শে ফেব্রুআরি বেলা ১১টা ৪৫ মিঃ সময়ে স্বামী প্রণবেশানন্দ (নায়ক মহারাজ) ৭৪ বৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি কিডনিতে ক্যানসার রোগে ভুগিতেছিলেন। গত ২০শে ফেব্রুআরি সেবাপ্রতিষ্ঠানে তাঁহার অস্ত্রোপচার হয়। দুই দিন ভাল থাকার পর অবস্থার অবনতি ঘটে।

১৯২৩ খৃঃ তিনি বোম্বাই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের তিনি মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৭ খৃঃ সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। সরল প্রকৃতির জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

বিভিন্ন সময়ে তিনি বরিশাল, কলম্বো, পনামপেট, পাথুরিয়াঘাটা ও লখনৌ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। কানাড়া ভাষায় তাঁহার অনূদিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী' বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে।

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

শতবার্ষিকী সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িঃ গত ১৭ই জানুআরি 'উদ্বোধন'-ভবনে স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলারতি, ষোড়শোপ-চারে পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, কঠোপনিষৎ-পাঠ, ভজন, কালী-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দর ভাবে সাজানো হইয়াছিল।

বারাণসীঃ শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে গত ১৭ই হইতে ২৩শে জানুআরি সাত দিন ধরিয়া স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিক উৎসব মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রথম দিন স্বামীজীর জন্মলগ্নে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি, প্রার্থনা-সঙ্গীত, বিশেষ পূজা, বেদপাঠ, স্বামীজীর বাণী আলোচনা ও প্রসাদ-বিতরণ

অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজের বাণী পঠিত হইলে পর বিশিষ্ট বক্তাগণ বক্তৃতা দেন।

দ্বিতীয় দিন পূর্বাহ্ণে উপনিষৎ-পাঠ, সামবেদ-গান এবং অপরাহ্ণে 'হিন্দুধর্ম ও স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাগবত ও মহাভারত আলোচনা এবং রামচরিত-মানস ব্যাখ্যা। চতুর্থ দিনে উপনিষৎপাঠ ও দরিদ্রনারায়ণ-সেবা হয়। অপরাহ্ণে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পৌরোহিত্যে শতবার্ষিক উৎসবের মূল সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট বক্তাগণ ইংরেজী বাংলা ও হিন্দীতে ভাষণ দেন।

পঞ্চম দিনে উপনিষৎ-পাঠ, মহাভারত-আলোচনা, রামায়ণ-ব্যাখ্যা ও ধর্মসভা হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনে ধর্মসম্মেলনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁদের মতবাদ প্রাঞ্জলভাষায় ব্যাখ্যা করেন। শেষ দিনে ভাগবত-আলোচনা, মহাবিষ্ণুযাগ, ধর্ম-সম্মেলন, যজুর্বেদ-পাঠ ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়।

সারগাছি (মুর্শিদাবাদ): স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষজয়ন্তী উৎসবের বর্ষ-ব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে ১৭ই হইতে ২৬শে জানুআরি দশ দিন ধরিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, বেদগীতি, ভজন, চণ্ডী-পাঠ, কঠোপনিষৎ-পাঠ, বিশেষ পূজা, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, আলোচনা-সভা, প্রসাদ-বিতরণ, আলোকসজ্জা, অভিনয়, শোভাযাত্রা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

বাঁকুড়াঃ রামকৃষ্ণ মঠে স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ই জানুআরি মঙ্গলারতি, ঊষাকীর্তন, স্বামীজীর জন্মমুহূর্তে তোপধ্বনি, শোভাযাত্রা, পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, জনসভা, কবিতা- ও প্রবন্ধপাঠ, ছায়াচিত্র-প্রদর্শন, বাউল-সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

আসানসোলঃ গত ১৭ই জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ-জয়ন্তী উদ্বোধন উপলক্ষে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভোরে মঙ্গলারতি হয় ও সকাল ৭টায় আশ্রম-প্রাঙ্গণ হইতে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শহরের নানা অঞ্চল ঘুরিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসার পর ছাত্রছাত্রীদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভানেত্রীত্ব করেন আসানসোল মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা। সভায় আবৃত্তি ও বক্তৃতা হয়। মন্দিরে বিশেষ পূজা, হোম ও ভজন-সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়।

অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন মার্টিন ও বার্ন কোম্পানির অর্থনৈতিক ও সমাজ-উন্নয়ন উপদেষ্টা শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের বাণী পঠিত হইলে বক্তৃতা করেন স্বামী পূজ্যানন্দ, স্বামী চণ্ডিকানন্দ, অধ্যাপক কে. সি. চ্যাটার্জী ও স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ। বক্তাদের প্রত্যেকেই স্বামীজীর দেশপ্রেম ও বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করেন।

মালদহঃ গত ১৭ই জানুআরি সকালে মালদহ শহরের প্রায় প্রতিগৃহে শঙ্খধ্বনি দ্বারা শতবার্ষিক উৎসবের সূচনা হয়। বেলা ৮॥ ঘটিকায় এক বিরাট শোভাযাত্রা স্থানীয় আশ্রম হইতে বাহির হইয়া শহর পরিক্রমা করে। স্থানীয় আশ্রমে বিশেষ পূজা, হোম, গীতা ও উপনিষৎ পাঠ হয়। হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল-বিতরণ, বিবেকানন্দ-বিদ্যামন্দিরের নূতন গৃহের ভিত্তি-স্থাপন, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, ধর্মসভা, ছায়াচিত্র-যোগে স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

চণ্ডীপুর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ১৭ই জানুআরি, প্রাতে মঙ্গলারতি, ভজন, চণ্ডী ও গীতা পাঠ হয়। ৬-৪৯ মিনিটে তোপধ্বনি দ্বারা স্বামীজীর জন্মসময় জানানো হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে শঙ্খ-ধ্বনি হইতে থাকে। ষোড়শো-পচারে পূজা হোম, ভোগরাগ হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণসহ স্বামীজীর আলেখ্য বিশেষভাবে সজ্জিত করিয়া বাদ্য ও সঙ্গীতাদি সহকারে শোভাযাত্রা ৩ মাইল পথ প্রদক্ষিণ করে। আয়োজিত সভায় স্বামীজীর সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। পরে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় আলোক-সজ্জার পর ভজন ও স্বামীজীর জীবনী অখণ্ডভাবে পাঠ করা হয়।

গড়বেতা ঃ গত ১৭ই জানুআরি আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, শোভাযাত্রাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে ১০১টি প্রদীপ জ্বালানো হয় এবং আলোচনা সভায় স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। এই শুভদিনে গড়বেতার সমস্ত স্কুল, কলেজ ও ক্লাবে এবং প্রতি গৃহে স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, জন্ম-শুভলগ্নে শঙ্খধ্বনি, দীপ-প্রজ্বালন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ফরিদপুর ঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৭ই জানুআরি ব্রাহ্ম-মুহূর্তে মঙ্গলারতি, হয়। ভোর সাড়ে পাঁচ ঘটিকা হইতে সাড়ে সাত ঘটিকা পর্যন্ত স্বামীজীর মাল্যভূষিত প্রতিকৃতি সহ স্তোত্র ও সঙ্গীত মাইকযোগে প্রচার করিয়া ফরিদপুর শহরের সর্বত্র পরিভ্রমণ করা হয়। মধ্যাহ্নে বিশেষ পূজা ও চণ্ডী-পাঠ হয়। সন্ধ্যায় আরতির পর ভজন কীর্তন ও শ্যামা-সঙ্গীত গীত হয়।

রাঁচি ঃ গত ১৭ই জানুআরি স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শত-বার্ষিকীর উদ্বোধন উপলক্ষে প্রাতে মঙ্গলারতি বেদপাঠ ও ভজনান্তে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী শান্তানন্দ মহারাজ নব-নির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বেলা ৮টা হইতে ১২টা পর্যন্ত গীতা, চণ্ডী ও কঠোপনিষৎ পাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা হোম এবং চার জন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কর্তৃক বাস্তুযাগ সম্পন্ন হয়। অপরাহ্নে ন্যাশনাল কোল কর্পোরেশনের পরিচালক শ্রীএস. সি. দত্ত আই. সি. এস.-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় স্বামী বেদান্তানন্দ বেলুড় মঠের অধ্যক্ষের বাণী পাঠ করেন এবং অধ্যাপক পাণ্ডে হিন্দীতে, স্বামী সুন্দরানন্দ বাংলায় ও সভাপতি মহাশয় ইংরেজীতে স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে সমবেত তিন হাজার ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিবেকানন্দ-লীলাগীতি কীর্তন, ভজন ও আরাত্রিকের পর উৎসবের কার্য শেষ হয়।

সারদাপীঠ ঃ ১৩ই জানুআরি রবিবার, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের পরিচালনায় বেলুড়ে ভারতাত্মার বাণীমূর্তি শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ-জন্মজয়ন্তী আরম্ভ হয়। ১৩ই হইতে ২৭শে জানুয়ারি পর্যন্ত এই উৎসব চলে। এতদুপলক্ষে চৌদ্দদিনব্যাপী একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনী প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। স্বামীজীর জন্ম-মহোৎসবের উদ্বোধন ও প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীবিধুভূষণ মালিক মহোদয়। শিক্ষণমন্দির, শিল্পমন্দির, জনশিক্ষা-মন্দির, সমাজশিক্ষা-শিক্ষণকেন্দ্র প্রভৃতি

সারদাপীঠের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সমূহের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে এই প্রদর্শনীর সুষ্ঠু রূপায়ণ করেন।

স্বামীজীর বিচিত্র জীবনালেখ্য ছিল এই প্রদর্শনীর প্রধান অঙ্গ। সনাতন ধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষের একটি বিশেষ বাণী আছে; বেদ-উপনিষদের সেই শাশ্বত বাণী বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতার ও মহাপুরুষের জীবনচর্চায় প্রতিফলিত হইয়াছে। অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে স্বামীজীর দৃপ্তকণ্ঠে তাহারই মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের আগ্রহোদ্দীপক ও জ্ঞানবর্ধক করিবার জন্য বিভিন্ন কলাশিল্পের মাধ্যমে সর্বজনগ্রাহ্য করিয়া তোলা হয়।

ইহা ব্যতীত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সূচনা হইতে পৃথিবীব্যাপী তাহার বিকাশ ও বিস্তারের ইতিহাস প্রদর্শনীর বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। প্রদর্শনীর অন্যান্য অংশের মধ্যে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও প্রয়োগশিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রতিদিন প্রায় আট হাজার দর্শনার্থীর সমাগমে এই উৎসব একটি মেলার রূপ পরিগ্রহ করে। বহুদূর হইতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এবং বিশিষ্ট খ্যাতনামা মনীষিগণ এই প্রদর্শনী দর্শন করেন।

উৎসবকে শিক্ষামূলক এবং সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীজীর বিশিষ্ট অবদানের উপর কয়েকটি মনোজ্ঞ আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান করা হয়।

১৪ই জানুআরি সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় জনশিক্ষা-মন্দির-প্রাঙ্গণে আলোকচিত্রসহ স্বামীজীর জীবনী ও বাণী বিষয়ে একটি বক্তৃতার আয়োজন ছিল।

১৫ই জানুআরি মঙ্গলবার সকাল নয় ঘটিকায় বেলঘরিয়া বিদ্যার্থিভবনের সম্পাদক স্বামী সন্তোষানন্দের সভাপতিত্বে স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে একটি আলোচনা-সভা বসে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ-কল্যাণ বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীতামসরঞ্জন রায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায় এবং শিক্ষণ-মন্দিরের অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রনাথ জানা স্বামীজীর শিক্ষাদর্শনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। ঐ দিনই সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় ধর্মসঙ্গীতেরও একটি অনুষ্ঠান হয়।

১৬ই জানুআরি বুধবার সন্ধ্যায় ভগিনী নিবেদিতা চলচ্চিত্রটি শিল্পায়তনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত হয়।

১৭ই জানুআরি বেলা ১১টায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ বিদ্যামন্দিরের বিরজানন্দ বিজ্ঞান-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সন্ধ্যায় বিদ্যামন্দির-প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দ-লীলাগীতির আয়োজন হয়।

১৯শে জানুআরি শনিবার স্বামী পুণ্যানন্দজীর সভাপতিত্বে বেলুড়ের নিকটবর্তী বিভিন্ন বিদ্যায়তনের ছাত্রগণের সহযোগিতায় ছাত্রদিবস পালিত হয়। অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ স্বামীজীর বাণী, রচনাংশ ও কবিতা আবৃত্তি করিয়া এবং গান গাহিয়া অনুষ্ঠানটিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলে।

২৩শে জানুআরি অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অধ্যক্ষ ডঃ নাগচৌধুরী আণবিক শক্তির উপর একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

২৪শে জানুআরি সকাল নয়টায় স্বামী বোধাত্মানন্দের সভাপতিত্বে স্বামীজীর সাহিত্য

ও শিল্পচিন্তা বিষয়ে একটি আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করা হয়। অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ সাহিত্য-চিন্তা বিষয়ে এবং শিক্ষণ-মন্দিরের অধ্যাপক শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী শিল্পচিন্তা বিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনা করেন। ঐদিন সন্ধ্যা ছয়টায় ব্যায়ামশিক্ষক শ্রীনীরদ সরকারের পরিচালনায় ব্যায়াম-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়।

২৫শে জানুআরি সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

২৬শে জানুআরি সকাল দশ ঘটিকায় স্বামী সৌম্যানন্দের সভাপতিত্বে শিক্ষণ-মন্দিরের পুনর্মিলন-সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির ভাষণ দেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ পি. কে. গুহ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে স্বামী সাধনানন্দ রাজা মহারাজের জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সেগুলির মহিমা ব্যাখ্যা করেন। ঐদিন সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়ের পরিচালনায় তাঁহার ছাত্রবৃন্দ শারীরিক কৌশল দেখায়।

২৭শে জানুআরি সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় একটি ভজন-সঙ্গীতের আসর বসে। শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞগণ অংশ গ্রহণ করেন। এইদিন প্রদর্শনী বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পক্ষকালব্যাপী উৎসব সমাপ্ত হয়।

সেণ্টলুই ঃ আমেরিকার সেণ্টলুইস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত-সোসাইটির সেক্রেটারি জানাইতেছেন : স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সোসাইটি একটি রচনা-প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিবে। বর্তমান শিক্ষা-বৎসরে কলেজের সকল মার্কিন ছাত্র-ছাত্রীই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল ১৯৬৪ খৃঃ ৩১শে জানুআরির পূর্বেই প্রকাশিত হইবে এবং শীর্ষস্থান অধিকারীকে ১০০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হইবে।

গত ১৭ই জানুআরি স্বামীজীর পুণ্য জন্মতিথি দিবসে একটি সোসাইটিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ২০শে জানুআরি সোসাইটির ভজনালয়ে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের নেতৃত্বে একটি সভায় প্রার্থনা ও ধ্যান ‍হৃত হয়। স্বামীজী-রচিত সংস্কৃত-স্তোত্রের আবৃত্তির পর ঐগুলির ইংরেজী অনুবাদ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের বাণী পাঠ করা হইলে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে কয়েকটি ভজন-সঙ্গীত হয়। ১৮৮১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় স্বামীজী যে গানটি গাহিয়াছিলেন, সেই গানটি ছিল ইহাদের অন্যতম। গানটির অনুবাদ উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে বিতরিত হয়। ইহার পর স্বামীজীর The Song cf the Sannyasin—'সন্ন্যাসীর গীতি' নামক কবিতাটি পাঠ করিয়া শোনানো হয়। এই কবিতাটি স্বামীজী ১৮৯৫ খৃঃ গ্রীষ্মকালে আমেরিকায় রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিতার পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিও শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ-রচিত ১০ ডলার মূল্যের স্বামীজীর জীবনী, যোগ ও অন্যান্য রচনা (Vivekananda : Yoga and other works) নামক গ্রন্থটি ১১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজকে এবং ৬৬টি সরকারী গ্রন্থাগার, হাইস্কুল এবং একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তক আরও বিতরণ করার পরিকল্পনা রহিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

শতবার্ষিক উৎসব

আমেদাবাদ: গত ১৭ই জানুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (মণিনগর) সারাদিন বিভিন্ন কার্যসূচী দ্বারা স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব সমারোহে প্রতিপালিত হয়। বৈকালে পাঁচ জন বক্তা স্বামীজীর জীবন ও উপদেশ অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। রাত্রে বিবেকানন্দ-পাঠচক্রের উদ্যোগে ভজন-কীর্তন হয়।

২০শে জানুআরি স্থানীয় টাউন-হলে দুই সহস্রের অধিক ব্যক্তির সমক্ষে উৎসবের উদ্বোধন করেন মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীমেন্দী নওয়াজ জং। উৎসব-সমিতির সভাপতি শ্রীমতী সরলাদেবী সারাভাই স্বাগত প্রবচন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের বাণী পঠিত হইলে বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন।

স্বামীজীর উৎসব খুবই উৎসাহপূর্ণ ভাবে শহরের বিভিন্ন অংশে প্রতিপালিত হইতেছে।

বলরামপুর (মেদিনীপুর)**:** শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মঠে স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব ১৭, ১৯ ও ২০শে জানুআরি বিপুল উদ্দীপনার মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজাদি, শত প্রদীপ প্রজ্বালন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে তারিখে স্বামী বিশোকাত্মানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে ধর্মসভা হয়।

কটক: ১০ই ফেব্রুআরি স্বামী বিবেকানন্দ জয়ন্তী উৎসব কমিটির উদ্যোগে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব বিশেষ আনন্দ ও উদ্দীপনা সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে শত দীপ জ্বালাইয়া উৎসবের শুভ সূচনা হয়। ডক্টর নীলকণ্ঠ দাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত একটি মহতী সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর পুণ্য জীবন ও বাণী বিভিন্ন দিক হইতে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। স্বামী নিরাময়ানন্দ বলেন: স্বামীজীর ভাবধারা জীবনে রূপায়িত করিলে সাহসের সহিত যে-কোন প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে পারা যায়। শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী, স্বামী সুপর্ণানন্দ, শ্রীরাধানাথ রথ প্রভৃতি ভাষণ দেন। সভার পূর্বে বৈকালে একটি বিরাট শোভাযাত্রা শহরের একাংশ পরিভ্রমণ করিয়া সভাস্থলে সমবেত হয়। বিভিন্ন ভাষায় বিশেষতঃ ওড়িয়া ভাষায় স্বামীজীর বাণীর পোস্টারগুলি জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে।

পোর্ট ব্লেয়ার: শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৬ই জানুআরি প্রত্যূষে একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। কেন্দ্রের সভাপতি ঘোষণা করেন, সমুদ্রোপকূলে সংগৃহীত জমিতে চীফ কমিশনার শ্রী বি. এন. মাহেশ্বরীর প্রস্তাব অনুযায়ী 'বিবেকানন্দ-হল' নির্মিত হইবে। শ্রীমতী মাহেশ্বরী প্রস্তাবিত ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। উৎসবের জন্য স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের নিকট নির্মিত মণ্ডপে বহু লোকের সমাগম হয়। ভজন, পাঠ, স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে আলোচনা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে জানুআরি যথাক্রমে জনসাধারণ, মহিলা-সঙ্ঘ এবং ছাত্র ও শিক্ষকগণ উৎসবের আয়োজন করেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই উৎসবে যোগদান করায় অনুষ্ঠান বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

নানাস্থানে স্বামীজীর শতবার্ষিকী

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি :

পল্লী উন্নয়ন সমিতি, আকড়া-কৃষ্ণনগর ২৪ পরগনা; হুগলি জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সঙ্ঘ, বাবুগঞ্জ, রথতলা; রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, সুভাষনগর, দমদম গোরাবাজার, কলিকাতা ২৮; পূর্ব ঢাকুরিয়া বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিক উৎসব কমিটি, কলিকাতা ৩১; স্বামী বিবেকানন্দ সেবা-সমিতি, নাটাগড়, ২৪ পরগনা; হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার, ত্রিবেণী, হুগলি; বিবেকানন্দ শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব কমিটি, শিবপুর, হাওড়া; শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বিরাটী, কলিকাতা ২৮; রেলওয়ে উপনিবেশ, হালিসহর, ২৪ পরগনা; রামকৃষ্ণ সমিতি, কল্যাণী, ২৪ পরগনা; সাধারণ পাঠাগার, ব্যাটরা, হাওড়া; নিখিল বঙ্গ শহিদ ও দেশসেবক স্মৃতি সঙ্ঘের উদ্যোগে কলেজ স্ট্রীট কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে; রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, বেহালা, কলিকাতা; বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক উৎসব কমিটি, হরিণবাড়ী, সাগরদ্বীপ, ২৪ পরগনা; শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, পর্ণশ্রী, বেহালা, কলিকাতা; শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আগড়তলা, ত্রিপুরা; শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির, বিকানীর, রাজস্থান; শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আজমীর; শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ভাঙ্গামোড়া, হুগলি; বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী, মুরাদপুর, কলিকাতা ৮।

* * *

চালকহীন ট্রেন

সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'তাস'-এর এক খবরে বলা হইয়াছে যে, মস্কোর ভূগর্ভস্থ রেলওয়েতে স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিন পরিচালক যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হইবে। এই ধরনের স্বয়ংক্রিয় চালনযন্ত্র-যুক্ত ট্রেনে ইতিমধ্যে দশ লক্ষ যাত্রী চলাচল করিয়াছে।

উক্ত খবরে আরও বলা হইয়াছে যে, ঐরূপ ট্রেনের যাত্রীরাও জানিত না যে, তাহাদের গাড়ীর ইঞ্জিনের চালকের আসন শূন্য রাখিয়া সম্মুখের গাড়ীতে একটি কম্পিউটার যন্ত্র রাখিয়া ট্রেন চালনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ক্যান্সারে মৃত্যু

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত 'World Health'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক সার্ভেতে দেখা গিয়াছে, বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি বৎসর ক্যান্সার রোগে ২০,০০,০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

বিবেকানন্দ-দর্শনে প্রথম পি. এইচ-ডি

সাসারাম এস. পি. জৈন কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুহাসরঞ্জন রায় সম্প্রতি বিহার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার নিবন্ধের বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈত বেদান্ত'। তিনি বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মসীর অধীনে গবেষণা করেন। —আনন্দ বাজার পত্রিকা

ভ্রমসংশোধন (এই সংখ্যায়) :

(১) 'বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা' প্রবন্ধে ২য় পঙ্‌ক্তিতে 'ঐতিহাসিকের' পর 'বা ইণ্ডলজিস্ট' পড়িবেন। পৃঃ ১৫৩
(২) পৃঃ ১৫৫ পং ১০ 'খনন-কার্য' স্থলে পড়িবেন 'মনন-কার্য'
(৩) ২০ 'পরিহাস' 'পরিহাসে'



বুদ্ধবাণী

পস্‌স চিত্তকতম্‌ বিম্বম্‌ অরুকায়ম্‌ সমুস্‌সিতম্‌।
আতুরম্‌ বহুসঙ্কপ্‌পম্‌ যস্‌স নত্থি ধুবম্‌ ঠিতি ॥
অপ্‌পস্‌সুতায়ম্‌ পুরিসো বলিবদ্দো ব জীরতি।
মাম্‌সানি তস্‌স বড্‌ঢন্তি পঞ্‌ঞা তস্‌স ন বড্‌ঢতি ॥

—ধম্মপদ

এই যে বিচিত্র দেহ ছাখো ছাখো কত যত্নে ললিত বিন্যাসে
লালিত এ মুগ্ধ দেহ। ব্রণময় কলঙ্ক-কলুষ,
অথচ দুর্বল ভীরু—নিত্য নানা সংকল্পে চঞ্চল,
উদ্দাম বাসনা-বৃন্তে বিবর্ণ এ ব্যথার আকাশে
সহজিয়া সুখে তবু কী চটুল—নির্লজ্জ বেঁহুশ
কোন ধ্রুব স্থিতি নাই—পদ্মপত্রে টলমল জল।

অল্পবুদ্ধি মানুষেরা প্রজ্ঞাহীন, প্রত্যহ-সম্বল;
পাশব জীবনধারা কী প্রবাহে অন্ধ ও উদ্দাম
নিরন্তর চলে ছাখো—শুধু মাত্র বাঁচার প্রেরণা!
জানে না জীবন মানে বৃহত্তর আকাশের কথা,
মাংসময় শরীরের গ্লানিকর পৌনঃপুনিকতা।
প্রজ্ঞাহান মানুষের বলীবর্দ মতো পরিণাম
জেনেও জানি না মোরা। মেদ বাড়ে মেধা যে বাড়ে না ॥

ভাবানুবাদ: শ্রীমতী শ্রাবন্তী মুখোপাধ্যায়

কথাপ্রসঙ্গে

স্বামীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধ ও শঙ্কর

বৈশাখের পুণ্যমাসে আমরা ভারতাত্মা বুদ্ধ ও শঙ্করকে স্মরণ করি।

ভারতের প্রকৃত ইতিহাস মানবাত্মার অভিব্যক্তিরই ইতিহাস। রাজায় রাজায় যুদ্ধ যে এখানে হয় নাই, তাহা নয়; সে ইতিহাস যে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ নাই, তাহাও নয়; কিন্তু জাতীয় প্রতিভা এখানে রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যয়িত হইয়া যায় নাই। জনসাধারণও রাজার সংবাদ তত রাখে নাই, যত সন্ধান করিয়াছে রাজার রাজাকে। অর্থাৎ ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাই এ জাতির মেরুদণ্ড—এ জাতির প্রাণবায়ু।

মনীষী রমঁ্যা রলঁ্যা কী সুন্দর ভাবে ভারতকে বর্ণনা করিতেছেন, 'Land of impermanent empires'—অস্থায়ী সাম্রাজ্যের দেশ, যে দেশের নিত্যসুনীল আকাশের উপর দিয়া কালো মেঘের মতো বহু সাম্রাজ্য আসিয়া ভাসিয়া গিয়াছে, বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন দেখিয়াছে এই ভারতবর্ষ, কত পুরাতন জাতির সমাধি রচিত হইয়াছে এদেশের পথে প্রান্তরে, কত নূতন জাতি বিশ্বজিগীষা লইয়া আগাইয়া আসিয়াছে ভারতের অভিমুখে, কিন্তু ক্ষণিক বিজয়ের পর সেই উত্তাল তরঙ্গ হয় স্তিমিত হইয়া গিয়াছে, নয় যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথেই ফিরিয়া গিয়াছে। ভারতের দেহকে পদদলিত করিয়াছে, কিন্তু ভারতের অবিনাশী আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, বরং ভারতই নীরবে ধীরে ধীরে তাহার বিশ্বজয়ী ভাব দ্বারা মানব-জাতিকে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহাকে ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকতার পথে আগাইয়া দিয়াছে—অতিসংক্ষেপে ইহাই ভারতের ইতিহাস। তাই এ ইতিহাসে রাজা মন্ত্রী সেনাপতির কীর্তিকাহিনী অপেক্ষা সাধুসন্ত-মহাপুরুষদের গৌরব-গাথাই ধ্বনিত হয়—পাঠ্য পুস্তকের পাতায় পাতায় না হইলেও জনগণের হৃদয়ে হৃদয়ে। ভারত-ইতিহাসের এই ধারাই বহিয়া চলিয়াছে যুগ হইতে যুগান্তরে।

বর্তমান যুগে এই দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন স্বামীজী তাঁহার বিভিন্ন লেখায় ও বক্তৃতায়।

১৮৯৭ খৃঃ জানুআরি মাদ্রাজে প্রদত্ত 'Sages of India' বক্তৃতাটিতে স্বামীজী ভারতীয় মহাপুরুষগণের জীবন ও বাণী আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—ভারতের মর্মবাণী আধ্যাত্মিকতা; অর্থাৎ এই জীবনে আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, সমাজকে মহামায়ার ছায়া বলিয়া বুঝিতে হইবে, মানব-দেহকে ভগবানের মন্দিরের মর্যাদা দিতে হইবে।

মানুষের এই সাধনা শুরু হইয়াছে উপনিষদে, তারপর পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুগের মধ্য দিয়া এই সাধনাই অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিয়াছে আজ পর্যন্ত। রাজনীতিক ক্ষেত্রে ভারত কখন কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক স্তরে ভারত চির অতন্দ্র। কী সুন্দর ভাষায় স্বামীজী বলিয়াছেন, 'বড় বড় মহাপুরুষদের অঙ্কে ধারণ করা ব্যতীত ভারতমাতা আর অন্য কাজ কি করিয়াছেন?'

স্বামীজী তাঁহার ইতিহাস-সচেতন দৃষ্টি দ্বারা দেখাইয়াছেন, কি ভাবে একটি মহৎ নীতি এই এই সকল মহাপুরুষদের জীবনের ভিতর দিয়া

প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন একটি যুগচক্রের সার্থক সমাপ্তি। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়-মূর্তি; পরবর্তী কালে বুদ্ধ শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্য যুগ-প্রয়োজনে যথাক্রমে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির উপর জোর দেন। তাহাতে কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে, উহাদের একটিই বুঝি শ্রেষ্ঠ, অন্যদুটি নিকৃষ্ট। তাই আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রমাণিত হইল—সব পথই সত্য, তবে রুচি অনুযায়ী একটি অবলম্বনীয়।

পথের মধ্যে যেমন ছোট বড় নাই, তেমনি পথ যাঁহারা রচনা করিয়াছেন বা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কোন ছোট বড় নাই, আছে শুধু যুগ-প্রয়োজনে প্রকাশের তারতম্য। একই সত্যবস্তু প্রকাশিত হইতেছে দেশকালপাত্রের মাধ্যমে।

শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা ভুলিয়া, উপনিষদের শিক্ষা ভুলিয়া বৈদিক যাগযজ্ঞের নামে পশুবলির রক্তপিছল পথে স্বর্গলোভী মানুষ যখন প্রকৃত ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছিল, তখন তীব্র বৈরাগ্যবলে জরাব্যাধিমৃত্যুময় সংসারের রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থ কঠোর সাধনার পথে বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। ভারতবর্ষ সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-সচেতন হইল, বুদ্ধের মধ্যে স্বীয় আত্মার সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল, তাঁহার প্রদর্শিত সাধন-পথ অবলম্বন করিল। 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি'র সহিত 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' কোটি কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত ভারতবাসী তাঁহাকে 'ভগবান্ বুদ্ধ' বলিয়া এবং শ্রীভগবানের অবতার-রূপে পূজা করিয়া তবে তৃপ্ত হইয়াছে! সেই ধর্মসঙ্কটের দিনে বুদ্ধ সত্যই ভারতকে ও ভারতবাসীকে এক মোহপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

বুদ্ধ বাহ্যতঃ বেদবিরোধী, কিন্তু বেদের প্রকৃত তত্ত্ব তিনিই সর্বসাধারণে প্রচার করিয়াছেন। ঐ তত্ত্ব বেদান্ত; উপনিষদ্ ও গীতায় যাহা বিঘোষিত। বেদের কর্মকাণ্ডকে অতিক্রম করিয়াই তো বেদান্ত বা জ্ঞানকাণ্ড আচরিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

যে-কোন কারণেই হউক মুখে আত্মতত্ত্বের কথা না বলিলেও তথাগত সকলকে আত্মজ্ঞান বা বোধিলাভের জন্যই প্রস্তুত হইতে শত শত উপদেশ দিয়াছেন, নিষ্কাম কর্ম—শুভকর্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধ হইলে আত্মজ্ঞান সহজেই তাহাতে প্রতিভাত হইবে—ইহাই তাঁহার শিক্ষার মর্ম। 'অত্তদীপা চরত ভিখ্খব'—ভিক্ষুগণ, কাহারও উপর নির্ভর করিও না, নিজেরাই নিজেদের দীপ-স্বরূপ হও।

স্বামীজী বুদ্ধকে প্রধানতঃ কর্মযোগী বলিয়াই উপস্থাপিত করিয়াছেন, কর্মযোগী ও কর্মী এক নয়, শুধু কর্মের লক্ষ্য প্রধানতঃ নিজের সুখ-ভোগ, তৎসহ পরেরও কিছুটা উপকার, কিন্তু কর্মযোগীর কর্ম কামনাশূন্য, যদি কোন কামনা থাকে, তবে তাহা জ্ঞানলাভের কামনা, মুক্তির কামনা; কর্মযোগী যাহা করেন বা করিতে বলেন, তাহা 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'। বৌদ্ধযুগে এই শিক্ষা ভারতের গগন পবন মুখরিত করিয়াছিল। বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ভারত উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল—এ-কথা স্বামীজী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু প্রত্যেক উন্নতির পর অবনতি সূর্যের উদয়াস্তের মতোই সত্য। অতএব ভগবান্ তথাগতের প্রায় সহস্র বৎসর পরে আবার যখন ভারতগগন অন্ধকার, বুদ্ধের মহৎ অনুভূতি যখন একদিকে মঠ-বিহারের আলস্যপূর্ণ জীবনে,

অন্যদিকে শূন্যবাদের দর্শনে পর্যবসিত, ভারতের আকাশ বাতাস যখন একটা গুরুভাবে রুদ্ধ, তখন এই পুণ্যভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে যে সূর্যসঙ্কাশ বালসন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহা আজও জগতের বিস্ময়। কি ভাবে একটি ষোড়শবর্ষীয় বালকের মধ্যে এতখানি জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি সম্ভব! তীক্ষ্ণ মেধা ও কুশাগ্র বুদ্ধি লইয়া আচার্য শঙ্কর ভারতের সনাতন ভাবধারাকে আবার প্রশস্তখাতে প্রবাহিত করিলেন। অদ্বৈত বেদান্তের কেশরীনিনাদে অন্যান্য দর্শনসমূহ যেন শৃগালের মতো পলায়ন করিল, অথবা বেদান্তসূর্যের উদয়ে সকল অন্ধকার তিরোহিত হইল, আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইল।

স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের ক্ষেত্রে শঙ্করের প্রতিভাকে স্বীকার করিয়াও সমাজক্ষেত্রে তাঁহার অনুদারতার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনা তিনি বুদ্ধেরও করিয়াছেন, তথাপি তিনি ছিলেন বুদ্ধের উদার হৃদয়ের উপাসক।

অহিংসা, উপসম্পদা বা নির্বাণমুক্তি আদর্শ হইলেও সকলেই এখনই উহার উপযুক্ত হয় নাই। যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন মানুষ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—ইহার একটির অধিকারী। বুদ্ধ মোক্ষের উপর অত্যধিক জোর দিয়া ভারতীয় মনকে ইহবিমুখ করিয়াছেন—স্বামীজীর লেখায় ও বক্তৃতায় এ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অত্যধিক উদারতার জন্য বুদ্ধ অধিকারী বিচার করিতেন না, অনেকের মতে এই কারণেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে বহু আচারবিহীন জাতির অনুপ্রবেশ ঘটে। এই কারণে বৌদ্ধধর্ম পতিত হয় ও ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়। তথাপি ভারতবর্ষে বুদ্ধের ভাব সমাজের সর্বস্তরে আজও সঞ্চারিত রহিয়াছে। কি বৈষ্ণব ধর্মে, কি বেদান্ত-দর্শনে বৌদ্ধ রীতি-নীতি ওতপ্রোত হইয়া আছে। তাই তো বুদ্ধকে বৈষ্ণবেরাও বিষ্ণুর নবম অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং আচার্য শঙ্করকে কেহ কেহ বলিয়াছেন—প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

সমন্বয়ী দৃষ্টিতে স্বামীজী দেখিয়াছেন ভারতের আত্মা যুগ-প্রয়োজনে বিভিন্ন মহা-পুরুষের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক যুগে বুদ্ধ ও শঙ্কর বিভিন্ন সময়ে দুই মহাপ্রকাশ। কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধী মনে হইলেও এই দুই মহান্ আত্মা সূর্য ও চন্দ্রের মতো ভারতের দিন ও রাত্রি আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। একজনের হৃদয়, অপরজনের মস্তিষ্ক; একজনের উদারতা, অপরজনের ভাবের উচ্চতা আজও কেহ অতিক্রম করিতে পারে নাই; তাই তো 'বুদ্ধের হৃদয় ও শঙ্করের মস্তিষ্ক' লইয়া স্বামীজী আদর্শ মানব কল্পনা করিয়াছেন। আমরা কি তাঁহার মধ্যেই সেই আদর্শ রূপায়িত দেখিতে পাই না?

কর্মবিধান ও মুক্তি

স্বামী বিবেকানন্দ

মুক্তপুরুষের পক্ষে জীবন-সংগ্রামের কোন অর্থ কখনও ছিল না; কিন্তু আমাদের জন্য ইহার অর্থ আছে, কারণ নাম-রূপই জগৎ সৃষ্টি করে।

বেদান্তে সংগ্রামের স্থান আছে, কিন্তু ভয়ের স্থান নাই। যখনই স্বরূপ-সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে সচেতন হইতে শুরু করিবে, তখনই সব ভয় চলিয়া যাইবে। নিজেকে বদ্ধ মনে করিলে বদ্ধই থাকিবে; মুক্ত ভাবিলে মুক্তই হইবে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে থাকিয়া আমরা যে-প্রকার মুক্তি অনুভব করি, উহা মুক্তির আভাস-মাত্র, যথার্থ মুক্তি নয়।

প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলাই মুক্তি—এ ধারণার সহিত আমি একমত নই। ইহার যে কি অর্থ, বুঝি না। মানব-প্রগতির ইতিহাস অনুসারে জানা যায়, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই প্রগতি সম্ভব হইয়াছে, উচ্চতর নিয়মের দ্বারা নিম্নতর নিয়ম জয় করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেখানেও জয়েচ্ছু মন শুধু মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল; এবং যখনই দেখে নিয়মের মধ্য দিয়াই সংগ্রাম, মন তখনই নিয়মকেও জয় করিতে চায়। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদর্শ ছিল মুক্তি। বৃক্ষ কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করে না, গরুকে কখনও চুরি করিতে দেখি নাই, ঝিনুক কখনও মিথ্যা বলে না। তাই বলিয়া ইহারা মানুষের চেয়ে বড় নয়। এ জীবন মুক্তির এক প্রচণ্ড ঘোষণা এবং এই নিয়মানুবর্তিতার বাড়াবাড়ি আমাদিগকে সমাজে, রাজনীতিক্ষেত্রে বা ধর্মে শুধু জড়বস্তু করিয়া তুলিবে। অত্যধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতিমাত্রায় বিধি-নিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয় জানিবে সে সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ভারতের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করিলে দেখিবে, হিন্দুদের মতো আর কোন জাতির এত অধিক বিধি-নিয়ম নাই, এবং ইহার ফল জাতি-হিসাবে বিনাশ। কিন্তু হিন্দুদের একটি অপূর্ব ভাব - তাঁহারা ধর্ম-ব্যাপারে কখনও কোন মতবাদ বা গোঁড়ামির সৃষ্টি করেন নাই, তাই ধর্মের উন্নতি হইয়াছে। নিয়ম চিরন্তন হইলে মুক্তি অসম্ভব, কারণ 'চিরন্তন বস্তু নিয়মের অন্তর্গত'—এ-কথা বলিলে চিরন্তনকে সামাবদ্ধ করা হয়।

ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য নাই, কারণ কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি মানুষের সমান হইয়া যাইতেন। তাঁহার কোন উদ্দেশ্যের প্রয়োজন কি? কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি তো তাহা দ্বারা বদ্ধ হইতেন। তবে তো ঈশ্বর ছাড়া কোন মহত্তর ভাব আছে বলিতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ: গালিচা-নির্মাতা একখণ্ড গালিচা বয়ন করে; একটা কিছু মহত্তর ভাব তাহার বাহিরে ছিল (যাহা সে গালিচায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে)। যে-ভাবের সহিত ঈশ্বর নিজেকে মিলাইয়া চলিবেন, সেই ভাবটি কোথায়? ঠিক যেমন বড় বড় সম্রাট্‌গণ কখন বা পুতুল লইয়া খেলা করেন, ঈশ্বরও তেমনি এই প্রকৃতির সহিত খেলা করেন; এবং ইহাকেই আমরা বিধি বা নিয়ম বলি। আমরা ইহাকে নিয়ম বলি, কারণ আমরা ঘটনার যে অংশটুকু দেখিতে পাই, সেটুকু বেশ চলে।

সেইটুকুর মধ্যেই নিয়ম-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিবদ্ধ। এ-কথা বলা মূর্খতা যে, নিয়ম অনন্ত—প্রস্তরখণ্ড চিরকাল পড়িতে থাকিবে। সকল যুক্তিই যদি অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত হয়, তবে পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রস্তরখণ্ড পড়িয়াছিল কিনা, দেখিবার জন্য কে বর্তমান ছিল? সুতরাং বিধি বা নিয়ম মানুষের প্রকৃতিগত নয়। যেখানে আমরা আরম্ভ করি, সেখানেই শেষ করি—মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এ এক দৃঢ় ঘোষণা। প্রকৃতপক্ষে আমরা ক্রমশঃ নিয়মের বাহিরে যাইতেছি। শেষ পর্যন্ত সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া নিয়মের একেবারে বাহিরে চলিয়া যাই। ঈশ্বর ও মুক্তি হইতে আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম, এবং মুক্তি ও ঈশ্বরেই পরিসমাপ্তি হইবে। এই নিয়মগুলি থাকে মধ্য অবস্থায় এবং এগুলির মধ্য দিয়াই আমাদের যাইতে হইবে। বেদান্ত সর্বদা মুক্তির বাণীই ঘোষণা করে। বেদান্তবাদী নিয়মকে বড় ভয় পায়; চিরন্তন নিয়ম তাহার নিকট দারুণ ভীতির বস্তু। কারণ তাহা হইলে আর নিষ্কৃতি নাই। চিরকাল যদি অনন্ত নিয়মের অধীন থাকিতে হয়, তবে তৃণখণ্ড হইতে তাহার পার্থক্য কোথায়? আমরা বস্তুসম্পর্কশূন্য নিয়মে বিশ্বাস করি না।

আমরা বলি, মুক্তিই আমাদের কাম্য, এবং ভগবান্‌ই সেই মুক্তি। অন্যান্য বস্তুতে যে আনন্দ, এখানেও সেই আনন্দ; কিন্তু সসীম বস্তুতে খুঁজিলে মানুষ সুখের কণামাত্র লাভ করে। সাধক ভগবানে যে আনন্দ লাভ করে, চোর চুরি করিয়া সেই একই আনন্দ পায়; কিন্তু চোর দুঃখরাশির সহিত সুখের কণামাত্র পায়। ভগবান্‌ই প্রকৃত সুখ। প্রেমই ভগবান্, মুক্তিই ভগবান্। যাহা কিছু বন্ধন, তাহা ভগবান্ নয়।

মানুষের মধ্যে পূর্ব হইতেই মুক্তি আছে, কিন্তু উহা আবিষ্কার করিতে হইবে। মানুষ তো মুক্তই, তবে প্রতি মুহূর্তে সে এ-কথা ভুলিয়া যায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করার চেষ্টাই প্রত্যেকটি মানুষের সমগ্র জীবন। কিন্তু জ্ঞানী ও অজ্ঞলোকের মধ্যে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী ইহা জ্ঞাতসারে আবিষ্কার করেন, আর অজ্ঞ লোক আবিষ্কার করে অজ্ঞাতসারে। অণু হইতে নক্ষত্র পর্যন্ত—প্রত্যেকেই মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে। অজ্ঞ ব্যক্তি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মুক্তি পাইলে—ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানী অনুভব করেন, তাঁহাকে আরও দৃঢ়তর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। তিনি রেড ইণ্ডিয়ানের স্বাধীন ভাবকে মোটেই স্বাধীনতা বলিয়া মনে করেন না।

ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মুক্তিই লক্ষ্য। জ্ঞান লক্ষ্য হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান একটি যৌগিক ভাব। জ্ঞান শক্তি ও মুক্তির মিশ্রিত ভাব, এবং মুক্তিই মানুষের একমাত্র কাম্য। ইহার জন্যই মানুষ চেষ্টা করিতেছে। শুধু শক্তি লাভ করিলেই জ্ঞান হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ: বিজ্ঞানী কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণ করিতে পারে; কিন্তু প্রকৃতি ঐ তরঙ্গাঘাত অসীম দূরত্ব অবধি প্রেরণ করিতে পারে। তবে আমরা প্রকৃতির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে সম্মানিত করি না কেন? নিয়ম আমরা চাই না, আমরা চাই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য। আমরা বিধিবহির্ভূত হইতে চাই। নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হইলে মৃৎপিণ্ড হইয়া যাইবে। তুমি নিয়মের বাহিরে গিয়াছ কিনা—প্রশ্ন তা নয়; কিন্তু আমরা নিয়মের ঊর্ধ্বে—এই চিন্তার উপরেই মানবজাতির সমগ্র

ইতিহাস রচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, একজন বনে বাস করে এবং কখনও কোন শিক্ষা-দীক্ষা পায় নাই। সে একটি পাথরের টুকরাকে নীচে পড়িতে দেখিল—এ তো একটি স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু সে ভাবে, ইহা মুক্তি; সে মনে করে, পাথরের টুকরার আত্মা আছে; তাহার অন্তর্নিহিত ভাব মুক্তি। কিন্তু যখনই সে বুঝিতে পারে যে, পাথরের টুকরাটি অবশ্যই নীচে পড়িবে, তখন ইহাকে 'স্বভাব' বলে, অচেতন যন্ত্রবৎ কর্ম বলে। আমি এখন রাস্তায় বাহির হইতেও পারি, নাও পারি। ইহাতেই মানুষ-হিসাবে আমার গৌরব। যদি আমি নিশ্চয় জানি যে, আমাকে এখন ওখানে যাইতেই হইবে, তখন ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া আমি যন্ত্রে পরিণত হই। অনন্ত শক্তি সত্ত্বেও প্রকৃতি একটি যন্ত্রমাত্র; মুক্তিই সচেতন জীবনের উপাদান।

বেদান্ত বলেন, বনের মানুষের ধারণাই ঠিক; তাহার দৃষ্টি সত্য, কিন্তু ব্যাখ্যা ভুল। সে এই প্রকৃতিকে 'মুক্তি' বলিয়া মনে করে, নিয়মের দ্বারা শাসিত মনে করে না। এইসব বিবিধ মানবিক অভিজ্ঞতার পরে আমরা এই প্রকার চিন্তা করিতে শিখিব, কিন্তু আরও দার্শনিক অর্থে। উদাহরণ-স্বরূপ: আমি রাস্তায় বাহির হইতে চাই। ইচ্ছার প্রেরণা পাইলাম, তারপর থামিয়া গেলাম; ইচ্ছা হওয়া ও রাস্তায় বাহির হওয়ার মধ্যে যে-সময়টুকু ব্যবধান, সেই সময়ে আমি সমভাবে কাজ করিতে থাকি। কর্মের সঙ্গতিকেই আমরা নিয়ম বা বিধি বলি। আমার কর্মের এই সঙ্গতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, সেজন্য আমার কর্মগুলিকে আমি নিয়মাধীন বলি না। আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি। পাঁচ মিনিট ভ্রমণ করি; কিন্তু ঐ পাঁচ মিনিট সমভাবে ভ্রমণের পূর্বে ইচ্ছার ক্রিয়া ছিল। এই ইচ্ছাই ভ্রমণের আবেগ দিয়াছিল। সুতরাং মানুষ বলে যে, সে স্বাধীন, কারণ তাহার সব কর্মই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়; এবং যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সঙ্গতি বা মিল রহিয়াছে, অংশের বাহিরে সেই সঙ্গতি নাই। এই অসঙ্গতির অনুভূতির মধ্যেই মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাব নিহিত। প্রকৃতিতে আমরা কেবল সঙ্গতির বৃহত্তর খণ্ডগুলি দেখিতে পাই; কিন্তু আদি ও অন্ত অবশ্যই স্বাধীন আবেগ। প্রথমেই মুক্তির প্রেরণা প্রদত্ত হইয়াছিল, উহাই বহিয়া চলিয়াছে; কিন্তু আমাদের কার্যকালের তুলনায় প্রকৃতির কার্যকাল দীর্ঘতর। দার্শনিক যুক্তিদ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারি, আমরা স্বাধীন বা মুক্ত নই। তথাপি এই চেতনা থাকিয়া যায় যে, আমি মুক্ত। এই চেতনা কিভাবে আসে, তাহাই আমাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে পাইব যে, আমাদের মধ্যে এই দুইটি প্রেরণা আছে। আমাদের যুক্তি বলে, সব কার্যেরই কারণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রেরণাদ্বারা আমরা আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছি। বেদান্তের মীমাংসা এই—মুক্তি বা স্বাধীনতা ভিতরেই আছে, আত্মা যথার্থই মুক্ত; কিন্তু জীবাত্মার কর্ম শরীর-মনের ভিতর দিয়া পরিস্রুত হইয়া আসিতেছে; এই শরীর ও মন স্বাধীন বা মুক্ত নয়।

যখনই আমরা কোন-কিছুতে প্রতিক্রিয়া করি, তখনই আমরা দাস হইয়া পড়ি। কেহ আমার নিন্দা করিল, তৎক্ষণাৎ ক্রোধের আকারে আমি প্রতিক্রিয়া করিলাম। ঐ ব্যক্তি যে সামান্য স্পন্দন সৃষ্টি করিল, তাহাতেই আমি ক্রীতদাসে পরিণত হইলাম। অতএব আমাদের মুক্ত স্বভাব প্রদর্শন করিতে হইবে।

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নিকৃষ্ট জন্তু বা অতি দুরাচার ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা মানুষ, মুনি বা জন্তু দেখেন না, দেখেন সেই এক ঈশ্বরকে, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। ইহজীবনেই তাঁহারা আপেক্ষিক নানা-দর্শন জয় করিয়া এই একত্ব বা সমদর্শনের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। ঈশ্বর শুদ্ধ-স্বরূপ, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। যে জ্ঞানী এইরূপ অনুভব করেন, তিনি তো জীবন্ত ঈশ্বর। এই লক্ষ্যের দিকেই আমরা চলিয়াছি; প্রত্যেক উপাসনা-পদ্ধতি, মানব-জাতির প্রত্যেক কর্ম এই উদ্দেশ্য লাভ করিবারই প্রচেষ্টা। যে অর্থ চায়, সে মুক্তিরই চেষ্টা করিতেছে—দারিদ্র্যের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষের প্রত্যেক কর্মই উপাসনা, কারণ মুক্তিলাভ করাই তাহার অন্তর্নিহিত ভাব, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সব কর্মই সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখেই চলিয়াছে। যে-সকল কর্ম সেই উদ্দেশ্যের পথে বাধা, শুধু সেগুলি বর্জন করিতে হইবে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র বিশ্বই উপাসনা করিতেছে; মানুষ শুধু জানে না যে, যখন সে কাহাকেও অভিশাপ দিতেছে, তখনও সে আর একভাবে সেই এক ঈশ্বরেরই উপাসনা করিতেছে, কারণ যাহারা অভিশাপ দিতেছে, তাহারাও মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহারা কখনও ভাবে না যে, কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া করিতে গিয়া তাহারা নিজেদের ক্রীতদাস করিয়া ফেলে। আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত করা কঠিন।

আমরা সীমাবদ্ধ—এই বিশ্বাস বর্জন করিতে পারিলে এখনই আমাদের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব হইত। ইহা শুধু সময়-সাপেক্ষ। যদি তাই হয়, তবে শক্তি বর্ধিত কর, এইভাবে সময় সংক্ষিপ্ত কর। সেই অধ্যাপকের কথা স্মরণ কর, যিনি মর্মর-প্রস্তরের গঠন-রহস্য অবগত হইয়া মাত্র বারো বৎসরে উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর প্রকৃতির লাগিয়াছিল কয়েক শত বৎসর।*

* 'The Law and Freedom' বক্তৃতার অনুবাদ। Complete Works. Vol.-V-Pp. 214—19 দ্রষ্টব্য।

পূজ্যপাদ জ্ঞান মহারাজের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২২শে মার্চ রাত্রি ১২টা ২৫ মিনিটে পূজ্যপাদ জ্ঞান মহারাজ প্রায় ৮৬ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল বার্ধক্যজনিত পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন, শেষে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন।

১৯০১ খৃঃ তিনি মায়াবতীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং পরে বেলুড় মঠে আসিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। তন্মধ্যে কিছুকাল উদ্বোধন-কার্যালয়ে থাকিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার প্রথম অবস্থায় স্বামী শুদ্ধানন্দজীর সহকারী-রূপে তিনি পত্রিকা-পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। অন্য সময় কিছুকাল তিনি উদ্বোধনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

মধুরস্বভাব জ্ঞান মহারাজ ছাত্রদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন; তিনি একাধারে তাহাদের বন্ধু উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে তিনি স্বামীজীর আদর্শ ও ভাবধারা সঞ্চারিত করিতেন। ইহার ফলে হাওড়া জেলার খুরুট ও ব্যাঁটরায় দুইটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাঁহার দেহত্যাগে যে স্থান শূন্য হইয়াছে, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নয়। তিনি স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, তাঁহার দেহাবসানে স্বামীজীর সর্বশেষ শিষ্যের তিরোধান হইল।

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

যে মহামানব যোগৈশ্বর্যের উত্তুঙ্গ শিখরে দাঁড়াইয়া ধূর্জটির ন্যায় ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-মন্দাকিনীকে নিজের শিরে ধারণ করিয়া মানব-কল্যাণখাতে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার উদাত্ত কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষ বাণী মৃতপ্রায় জাতির জীবনে প্রাণসঞ্চার করিয়াছে, যাঁহার অপাবৃত ও উদার দৃষ্টি জাতীয় জীবনের সকল সমস্যাকে অবেক্ষণ করিয়া তাহাদের সমাধানের উপায় নির্দেশ করিয়াছে, সমগ্র মানবের একত্ব ও সৌভ্রাত্র কামনা করিয়া যে পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য বিশ্বপরিভ্রমণের দ্বারা মানবের মগ্ন-চৈতন্যকে আহ্বান করিয়াছেন আত্মার সর্ববন্ধন-মুক্তির পথে, সেই স্বামী বিবেকানন্দের মহিমা ও মাহাত্ম্যের পরিমাপ করা অসম্ভব। তাঁহার জীবন আমাদের মর্ত্যভূমিকে অতিক্রম করিয়া দ্যুলোক স্পর্শ করিয়াছে। ইন্দ্রিয়বদ্ধদৃষ্টি মানব আমরা, যে জীবন ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বলোকে অধ্যাত্ম-চেতনায় আস্তৃত, তাহা আমরা বুঝিব কেমন করিয়া? সমুদ্রের মতো গভীর এবং অপার এই জীবন আমাদের মনে বিরাট বিস্ময় উদ্রিক্ত করে এবং তাহার পরিপ্লাবনে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা জাগতিক ক্ষুদ্র এবং বৃহতের সংজ্ঞা বিস্মৃত হই—মনে জাগিয়া উঠে দ্বন্দ্বনিরপেক্ষ ভূমার চেতনাবভাস।

স্বামী বিবেকানন্দের মহিমাকে বুঝিবার আর একটি বাধা আছে—সে বাধা হইতেছে তাঁহার কালাবচ্ছিন্ন রূপ। তিনি যে কালে এই মরজগতে প্রকাশিত ছিলেন, সেই যুগায়ত রূপটুকুই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ নয়। কাল-প্রবাহের সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনের পূর্ণতর অভিব্যক্তি আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হইতেছে। যুগচিহ্নিত কালের উপর তাঁহার প্রথম পাদক্ষেপ মাত্র ঘটিয়াছে। ঊষার প্রথম অরুণিমা-মাত্র আমাদের নয়নগোচর। তাঁহার জীবনবেদের প্রথম অধ্যায়-মাত্র আমাদের সম্মুখে। ইহার পরিসমাপ্তি কোথায় এবং কখন—কে বলিবে? স্বামী বিবেকানন্দ নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি 'অশরীরী বাণী'। তাঁহার বাণীমূর্তিই এখন আমাদের মধ্যে কাজ করিতেছে। তাঁহার কম্বুকণ্ঠোৎসারিত ভবিষ্যদ্বাণীর যাথার্থ্য আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন, 'সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা আগামী পঞ্চাশৎ বৎসরে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, যদি তাহা অধ্যাত্মভিত্তিক না হয়।' অপর স্থানে তিনি বলিয়াছেন, 'সমস্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ড একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থান করিতেছে, আগামীকালই উহা বিস্ফোরিত হইতে পারে, চূর্ণবিচূর্ণ হইতে পারে। উহারা পৃথিবীর সকল স্থান অন্বেষণ করিয়াছে, কোথাও বিশ্রান্তি পায় নাই। সুখের পাত্র গভীরভাবে পান করিয়া দেখিয়াছে যে, সব কিছুই বৃথা।'

আজ আণবিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। জড়শক্তিতে বিশ্বাসী যুযুৎসু পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আজ বিরাট ধ্বংস-সম্ভাবনার

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের গোরখপুর অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ-জন্মশতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান-দিবসে ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৬২—সভাপতির অভিভাষণ।

সম্মুখীন। অতীতকালের কোন সময়েই পৃথিবী সামগ্রিক প্রলয়ের এত বেশী সন্নিকট হয় নাই।

শুধু তাই নয়, ১৯৫৮ খৃঃ প্রকাশিত 'Swami Vivekananda in America: New Discoveries' গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছেন, 'এবং আমি ইহা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি যে, একসময়ে স্বামীজী এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যখন ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবে তখন চীনাদের দ্বারা ভারতবিজয়ের প্রচেষ্টারূপ একটি মহাবিপদ উপস্থিত হইবে।' আজ ১৯৬২ খৃঃ চীন-ভারতের যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি—স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টি কিভাবে ভবিষ্যৎ ঘটনা নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আজ রাজনৈতিক মতবাদের অন্তরালে অন্য সবকিছুই চাপা পড়িয়া যাইতেছে বলিয়াই স্বামীজীর বাণীকে আমরা অস্বীকার করিতেছি এবং আমাদের জাতীয় জীবন সমস্যাসঙ্কুল ও সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। আমরা পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। মহাপুরুষের জীবন ও বাণী সিদ্ধমন্ত্রের মতো। নিয়মিত জপ ও পুরশ্চরণের মধ্য দিয়াই উহাকে জাগরিত করা সম্ভব—নতুবা উহা নিরর্থক হইয়া যায়। আমাদের জীবনকে তপস্যাপূত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের মহাজীবন ও বাণী-গ্রহণের উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে প্রস্তুত করিতে হইবে। এই গ্রহণের মধ্য দিয়াই নবীন ভারত এবং নূতন জগৎ গড়িয়া উঠিবে। ভারতের সম্মুখে বিপদ আছে, কিন্তু ভয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, 'সুদীর্ঘ রজনী যেন অপসৃত হইতেছে, পরিশেষে মহাবিপদের অবসান যেন ঘটিতেছে, আপাত-প্রতীয়মান শবের যেন প্রাণসঞ্চার হইতেছে এবং যে অতীতের ঘনান্ধকারে ইতিহাস, এমন কি কিংবদন্তীও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে অক্ষম, সেখান হইতে অসীম জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের হিমালয়ের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া—যে হিমালয় আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ—একটি বাণী আমাদিগের নিকট আসিতেছে, শান্ত, অবিচল অথচ ব্যঞ্জনায় অভ্রান্ত এবং যতই দিন যাইতেছে, সেই বাণী আয়তনে বৃদ্ধি পাইতেছে—দেখ, নিদ্রাগত জাগিতেছে। হিমালয় হইতে প্রবহমান বায়ুর ন্যায় ইহা মৃতপ্রায় অস্থি ও পেশীতে প্রাণাধান করিতেছে এবং কেবলমাত্র অন্ধই দেখিতে পায় না, কিংবা দুর্মতি যে সে দেখিবে না যে, আমাদের মাতৃভূমি তাঁহার গভীর সুদীর্ঘ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিতেছেন। আর কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সক্ষম নয়, আর তিনি নিদ্রা যাইবেন না, কোন বাহিরের শক্তি তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, কেননা এই বিরাট দেবতা জাগিয়া উঠিতেছেন।' স্বামী বিবেকানন্দের এই দিব্যদর্শন আমাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে দৃঢ়প্রত্যয়ান্বিত করিয়া তুলুক।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীমূর্তিকে বুঝিতে হইলে তাঁহার জীবনের গতি ও প্রকৃতিকেও বুঝিতে হইবে। যে জীবনবৃন্তের আলম্বনে এই বাণীমঞ্জরী বিকশিত হইয়াছিল, সেই জীবনকে না জানিলে বাণীর স্বরূপ-নির্ণয় সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের এই স্বরূপের কথাই ভগিনী নিবেদিতা একস্থানে অতি অনবদ্য-ভাবে বলিয়াছেন, 'আমরা এমন এক প্রেম দেখিয়াছি, যাহা দীনতম এবং অজ্ঞতমের সহিত এক হইয়া যাইত; তাঁহার চক্ষু দিয়া মুহূর্তের জন্যও জগৎ দেখিয়া মনে হইত, সমালোচনার কিছু নাই; আমরা মনীষার অপরিমেয় ভাববৈচিত্র্য দেখিয়া হাসিতাম, আমরা বীরত্বের অগ্নিতে নিজেদের উদ্দীপিত

করিতাম এবং দেবশিশুর প্রবোধনের সময় যেন আমরা উপস্থিত থাকিতাম।' আরেক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, 'যে দীনতার কাছে সকল দৈন্য দূরীভূত হয়, যে ত্যাগ অত্যাচারীর প্রতি প্রচণ্ড ধিক্কারে এবং উৎপীড়িতের জন্য অসীম করুণায় আত্মবলিদানে উন্মুখ, যে প্রেম তীব্র উৎপীড়ন এবং মৃত্যুর আসন্ন পদসঞ্চারকেও আশিস-বচনে স্বাগত-সম্ভাষণ করে—সে দীনতা, সে ত্যাগ, সে প্রেম আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।' ভগিনী নিবেদিতার উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই—স্বামী বিবেকানন্দের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত আচরণের মধ্য দিয়া প্রেম ও পৌরুষের যুগ্ম-প্রকাশ। সর্বপ্রকার হীনতার ও ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে তাঁহার জীবন 'স্বে মহিম্নি' বিরাজিত ছিল। মনীষী রোমাঁ রোলাঁও তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'পৃথিবীর যুগব্যাপী দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁহার চারিদিকে ক্ষুধিত সামুদ্রিক পক্ষীর মতো অহরহ ডানা ঝাপটাইয়া বেড়াইত। দুর্বলতার নহে—শক্তির আবেগ তাঁহার সিংহ-হৃদয়ের মধ্যে উদ্বেল হইত। তিনি ছিলেন মূর্তিমান্ শক্তি; কর্মই ছিল মানুষের কাছে তাঁহার বাণী। বীঠোফেনের মতো তাঁহার কাছেও সকল সদ্‌গুণের মূল ছিল কর্ম। নিষ্ক্রিয়তাই প্রাচ্যের স্কন্ধে গুরুভার হইয়া চাপিয়া বসিয়াছিল। নিষ্ক্রিয়তার প্রতি তাঁহার ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা।'

স্বামী বিবেকানন্দের এই যে প্রেম ও পৌরুষ, ইহার উৎস কোথায় ইহা জানিতে হইলে আমাদিগকে তাঁহার ভাবজীবন-গঠনের ইতিহাসের সহিত পরিচয় লাভ করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে তিনটি তত্ত্বের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটিয়াছিল। প্রথম তত্ত্ব—শাস্ত্র। ভারতীয় শাস্ত্রপাঠে তিনি দেখিয়াছিলেন, যে অনুভূতির কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত, তাহা আকস্মিকভাবে ঋষিদের জীবনে আসে নাই। উহার পশ্চাতে ছিল সত্যনির্ধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী মনোবৃত্তি। যদি তাহাই হয়, তবে শাস্ত্র-প্রবেদিত সত্যসমূহের প্রমাণীকরণের প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ সেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন তাঁহার গুরুর মধ্যে। এই মহাজীবনে তিনি দেখিয়াছিলেন, সেই সকল সত্যের প্রকাশ—যাহা শাস্ত্রে অর্ধস্ফুট বা অস্ফুটভাবে প্রকাশিত। এই জীবনে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে সমাধি দ্বারাই অবিরত জ্ঞান আহৃত হইতেছে। প্রত্যেক দণ্ডে মনের বহুত্ব হইতে একত্বে গতি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এই জীবনে। প্রত্যেক মুহূর্তে এই জীবনে তিনি অতিমানস-ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত বোধির প্রকাশ দর্শন করিয়াছিলেন। যিনি ছিলেন সকল শাস্ত্রের জীবন্ত বিগ্রহ, তিনি নিজে কিন্তু কোন পুস্তক পাঠ করেন নাই। এই জীবনের দীপ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জীবনদীপের শিখা জ্বালাইয়া লইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে স্বামী বিবেকানন্দও প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন আত্মোপলব্ধির চির-অতন্দ্রিত মহিমায়।

কিন্তু এই অপরোক্ষানুভূতির প্রসাদমাধুর্যও তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য-সাধনে পর্যাপ্ত ছিল না। সমগ্র ভারতভূখণ্ডের উপর দিয়া তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণের মধ্য দিয়া তিনি দেশের অন্তরাত্মার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ কেবল ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ ভূমিমাত্র নয়, ভারতবর্ষ একটি অধ্যাত্মজীবনসমৃদ্ধ প্রাণের স্পন্দন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, সর্বাবগাহী সমগ্রতার মধ্যে ভারতবর্ষ অনন্ত-কাল ধরিয়া তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা

করিতেছে, যাহার সংক্ষিপ্তসার তাঁহার গুরুর

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এই তত্ত্বত্রয়ের সংমিশ্রণ ত্রিবেণীসঙ্গমের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার পুণ্যতরঙ্গ 'সমগ্র মানবজাতিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া মুক্তি-মুখে লইয়া যাইবে।' কিংবা ভগিনী নিবেদিতার ভাষায় 'এইগুলি হইতেই তিনি উপাদান পাইয়াছেন, যাহা দিয়া তিনি পৃথিবীর জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন তাঁহার অধ্যাত্মবদান্যতার সর্বরোগহর মহৌষধি। এইগুলি হইতেছে সেই শিখাত্রয়—একটি দীপাধারে প্রজ্বলিত—যাহা ভারতবর্ষ তাঁহার হস্ত দিয়া জ্বালাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন নিজসন্তানের ও সমগ্র বিশ্বের পথনির্দেশের ।'

স্বামী বিবেকানন্দকে বলা হয় 'স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসী—জাতীয় জীবনের সংক্ষিপ্ত-সার।' ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলা হয় যে, 'তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসার পাত্রী ছিলেন তাঁহার জন্মভূমি।' কিন্তু কেবলমাত্র স্বাজাত্য-বোধই তাঁহার স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি ছিল না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি ভারতবর্ষকে দেখিয়াছিলেন আধ্যাত্মিকতার জীবন্ত বিগ্রহ-রূপে। তাই সমগ্র বিশ্বের উজ্জীবনের জন্যই ভারতবর্ষের উন্নতির প্রয়োজন! ভারতবর্ষ যে মৃতসঞ্জীবনীর অধিকারী, একমাত্র তাহাতেই মরণোন্মুখ বিশ্বের কল্যাণ আহিত। তাই তিনি বলিয়াছেন, 'ভারত কি মরিবে? তাহা হইলে সমগ্র বিশ্ব হইতে আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে, সকল নৈতিক উৎকর্ষ লোপ পাইবে, ধর্মের প্রতি সকল মধুর সহৃদয়তাপূর্ণ সহযোগিতা নির্বাপিত হইবে, সকল আদর্শবাদ বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহার স্থানে রাজত্ব করিবে স্ত্রী ও পুরুষদেবতারূপে কাম ও ভোগপরায়ণতা এবং অর্থ হইবে তাহাদের পুরোহিত; প্রবঞ্চনা, বলপ্রয়োগ এবং প্রতিযোগিতা হইবে উহাদের উৎসব এবং মানবাত্মা হইবে উহাদের বলি। এইরূপ কখনই ঘটিতে পারে না।' তিনি বলিয়াছেন, 'সত্যই আমার ঈশ্বর এবং সমগ্র বিশ্ব আমার দেশ।' তিনি আরও বলিয়াছেন, 'আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্য জানি এবং আমার সম্বন্ধে বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। আমি যতটা ভারতবর্ষের, ততটা বিশ্বের—এ-বিষয়ে ছলনার প্রয়োজন নাই। কোন দেশের আমার উপর কোন বিশেষ অধিকার নাই। আমি কি কোন জাতিবিশেষের ক্রীতদাস?' কিন্তু স্বামীজী জানিতেন যে, 'জড়শক্তির প্রকাশের কেন্দ্র ইওরোপ আগামী পঞ্চাশৎ বৎসরে ধূলিরাশিতে চূর্ণিত হইবে, যদি সে তাহার স্থান-পরিবর্তনে মন না দেয়, তাহার অবস্থিতি হইতে সরিয়া না যায় এবং আধ্যাত্মিকতাকে জীবনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ না করে। এবং যাহা ইওরোপকে রক্ষা করিবে, তাহা হইতেছে ঔপনিষদিক ধর্ম।' সেইজন্যই তিনি উদাত্তরবে আহ্বান করিয়াছেন, 'উঠ ভারত, সমগ্র বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জয় কর।'

সমগ্র বিশ্বের রক্ষার জন্যই ভারতের পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন। এই পুনরুজ্জীবন আসিবে কোন্ পথে? স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: 'আমি দেখিতেছি, প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন, প্রত্যেক জাতিরও তেমনি এক বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে। উহাই তাহার জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ।

'***ভারতের ধর্মজীবনই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, উহাই যেন জাতীয়জীবনরূপ সঙ্গীতের প্রধান সুর। যদি কোন জাতি, তাহার এই স্বাভাবিক জীবনীশক্তি, শত শত

শতাব্দী ধরিয়া উহার যে দিকে বিশেষ গতি হইয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি সেই চেষ্টায় কৃতকার্য হয়, তবে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। সুতরাং যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকেই জাতীয় জীবনের জীবনীশক্তি না করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অপর কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। যাহাতে এরূপ না ঘটে, তজ্জন্য তোমাদিগকে তোমাদের জীবনীশক্তিস্বরূপ ধর্মের মধ্য দিয়া সকল কার্য করিতে হইবে।'

সুতরাং ভারতের প্রথম প্রয়োজন ধর্মের অভ্যুত্থান। এই জন্যই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁহার জীবনের আলোকে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বিভিন্ন ধর্মমত-সমূহের সমন্বয় সাধন করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পর ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম যুগে যুগে যুগপ্রয়োজনে প্রচারিত মতসমূহের সঙ্গতিবিধান করিলেন একটি বিরাট মনীষা। হিন্দুধর্মে ইহারই প্রয়োজন ছিল। বহুশাখ, বিচ্ছিন্ন, পরস্পরবিরোধী ও সঙ্কীর্ণদৃষ্টি হিন্দুধর্মের এই নবরূপায়ণ ভিন্ন সর্বজনীনতালাভের কোন উপায় ছিল না। আর এই সর্বজনীনতা-ব্যতিরেকে হিন্দুধর্মকে জাতীয়জীবনের ঐক্যসম্পাদনে প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না।

যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ লোকাচারকে অস্বীকার করিয়া সমুদ্রপার হইয়া চিকাগো ধর্মমহাসভার মঞ্চে পদার্পণ করিলেন, সেদিন ভারতের ইতিহাসেও নব অধ্যায়ের সূচনা হইল। যে হিন্দুধর্ম ছিল বহিঃসংস্পর্শব্যাবর্তক, তাহাকে তিনি গতিশীল করিলেন। ভগীরথের ন্যায় ভারতের অধ্যাত্ম-জাহ্নবীকে শঙ্খরবে আহ্বান করিয়া মৃতপ্রায় মানববংশের উদ্ধারের আয়োজন তিনি করিলেন। একটি ভাববিপ্লবও সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হইল। মুমূর্ষু একটি জাতিও হিন্দুধর্মের জয়ধ্বনিতে আত্মসম্বিৎ ও শ্রদ্ধা ফিরিয়া পাইল। এই ভাববিপ্লবের পটভূমিতেই ভারতে উত্তরকালীন রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সমাজবিপ্লবের মূল উৎস নিহিত।

স্বামী বিবেকানন্দ সর্বধর্মমতের সমন্বয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি অদ্বৈতমতকেই চরম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, এই তত্ত্ব বিশিষ্ট অধিকারীর জন্য। স্বামীজী ইহা সকলের জন্য বলিয়াছেন। শঙ্করের ন্যায় অদ্বৈতকে ব্যক্তিগত উপলব্ধির উত্তুঙ্গ শিখরে চিরতুহিনাবৃত না রাখিয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রেমের উত্তাপে উহাকে গলাইয়া উহার সঞ্জীবনীধারা সমাজদেহে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'শত শত শতাব্দী ধরিয়া লোককে মানবের হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদ-সমূহ শিখানো হইয়াছে; তাহাদিগকে শিখানো হইয়াছে—তাহারা কিছুই নহে। সমগ্র জগতের সর্বসাধারণকে চিরকাল বলা হইয়াছে—তোমরা মানুষ নও। **তাহাদিগকে কখন আত্মতত্ত্ব শুনিতে দেওয়া হয় নাই। তাহারা এক্ষণে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করুক—তাহারা জানুক যে, তাহাদের মধ্যে অতি নিম্নতম ব্যক্তির ভিতর পর্যন্ত আত্মা রহিয়াছেন—যাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, যাঁহাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, যিনি অবিনাশী, অনাদি, অনন্ত, শুদ্ধস্বরূপ, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী।' অপর স্থানে বলিতেছেন, 'উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর! মানব কাতর-ভাবে জিজ্ঞাসা করে, মানবের কি দুর্বলতা নাই? উপনিষদ্ বলেন, আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্বলতা

দ্বারা কি এই দুর্বলতা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর হইবে? ময়লা দিয়া কি ময়লা দূর হইবে? উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই 'অভীঃ'—ভয়শূন্য এই শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ'—ভয়শূন্য এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই।'

এই তত্ত্ব সমাজক্ষেত্রে প্রচারিত হইলে কি হইবে? স্বামীজী বলিতেছেন, 'মৎস্যজীবী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে; বিদ্যার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইবে। উকিল যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল উকিল হইবে।'

এবং এই উপনিষদ্-প্রবেদিত আত্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসিতে পারিব। অদ্বৈতবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই নৈতিকতার যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যে একত্ব একমাত্র পারমার্থিক তত্ত্ব, তাহার ব্যাবহারিক প্রকাশ কেবলমাত্র প্রেমে। উপনিষদ্ এই কথাই বলিতেছেন:

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

এই কথাই স্বামীজীও বলিতেছেন—

'I cannot hate, I cannot shun
Myself from me, I can but love.'

সুতরাং এই তত্ত্বকে জীবনে বরণ করিয়া লইলে আমরা শৌর্যে, বীর্যে, প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হইব। সুতরাং এই আত্মতত্ত্বই সকলকে প্রতিনিয়ত শুনাইতে হইবে।

এই আত্মতত্ত্বকে ভিত্তি করিয়াই তিনি সমাজদেহে ভোগাধিকার-তারতম্যের নিরাকরণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'সমাজে যাহাকে সমাজনীতি বা politics বলে, তাহা কেবল এই ভোগতারতম্যসমুত্থিত অধিকারপ্রাপ্ত ও অধিকার-নিরাকৃত জাতিসমূহের সংগ্রামের নাম। এই অধিকার-তারতম্যের মহাসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ভারতবর্ষ গতপ্রাণপ্রায় পতিত হইয়াছে। অতএব বাহ্যজাতির সহিত সাম্যস্থাপন অতিদূরের কথা, যতদিন এ ভারত নিজগৃহে সাম্যস্থাপন করিতে না পারিবে, ততদিন তাহার পুনর্জীবনীশক্তিলাভের আশা নাই। অর্থাৎ সার কথা এই যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতিবিভাগ কোন দোষের নহে, কিন্তু ভোগাধিকার-তারতম্যই মহা অনর্থের কারণ হইয়া উঠিতেছে। অতএব আমাদের উদ্দেশ্য জাতিবিভাগ নষ্ট করা নহে; কিন্তু ভোগাধিকারের সাম্যসাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। আচণ্ডালে যাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অধিকার-সহায়তা হয়, তাহার সাধন করাই আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত।'

এইভাবে পৌরুষে ও প্রেমে, একত্বে এবং স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় নূতন ভারত গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই নূতন ভারতকে তিনি ডাক দিয়াছেন:

'জাগো আরও একবার!
মৃত্যু নহে—এ যে নিদ্রা তব,
জাগরণে পুন সঞ্চারিতে
নবীন জীবন, আরো উচ্চ
লক্ষ্য ধ্যান তরে, প্রদানিতে
বিরাম, পঙ্কজ-আঁখিযুগে।
হে সত্য! তোমার তরে হের
প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন,
—তব মৃত্যু নাহি কদাচন।

হও পুন অগ্রসর,
তব সেই ধীর পদক্ষেপে
নাহি যাহে হরে শান্তি তার
নিরুদ্বেগে পথিপার্শ্বে স্থিত
দীনহীন ধূলিকণিকার ;
শক্তিমান্, তবু মতি স্থির
আনন্দমগন, মুক্ত, বীর ;
হে সুপ্তিনাশন, চিরাগ্রণি !
ব্যক্ত কর তব বজ্রবাণী।'

আজ ভারতের দুর্দিনে যুদ্ধের ভয়াল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া স্বামীজীর এই দিব্যবাণী আমাদের প্রাণে সাহস সঞ্চারিত করিবে। স্বামীজী আমাদিগকে বলিয়াছেন, গৃহস্থের ধর্ম প্রতিবিধানের। আমরা তাহা গ্রাহ্য করি নাই বলিয়াই আজ চীন-যুদ্ধে আমাদের দুর্গতি হইয়াছে। কিন্তু আমরা যদি সাহস অবলম্বন করি, আত্মার শক্তিতে জাগিয়া উঠি, তবে সমস্ত বিপদ্‌জালই ছিন্ন হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষ চিরন্তন, ভারতবর্ষ মৃত্যুঞ্জয়। স্বামীজী বলিতেছেন, 'এই সেই ভারত, যাহা শত শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ, শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্যয় সহিয়াও অক্ষুণ্ণ আছে। এই সেই ভূমি, যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য ও জীবন লইয়া পর্বত অপেক্ষা দৃঢ়ভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি, অনন্ত ও অমৃতস্বরূপ, আমাদের এই ভারতভূমির জীবনও তদ্রূপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।'

আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী—সুতরাং একটি প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে তাহার বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, সেবাধর্মী বিবেকানন্দ, সাহিত্যিক বিবেকানন্দ, জ্ঞানী বিবেকানন্দ, কর্মী বিবেকানন্দ, ভক্ত বিবেকানন্দ, যোগী বিবেকানন্দ, দার্শনিক বিবেকানন্দ—প্রভৃতি বিভিন্নরূপে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। আমি কেবলমাত্র তাঁহার জীবনের মূলসূত্রটির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তাহাতেও সফলতার স্পর্ধা মনে জাগে না। তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই শিবমহিম্নঃস্তোত্রের নিম্নলিখিত শ্লোকটি মনে পড়ে :

'অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে।
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী ॥
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালম্।
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥'

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পৃথিবীর সর্বত্র যে উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে, তাহাতে তাঁহার বাণী-মূর্তির আবাহন আমরা করিতেছি। অমোঘ সেই বজ্রবাণী আমাদের চৈতন্য সম্পাদন করিবে। মঁসিয়ে রোমাঁ রোলাঁ তাঁহার বাণী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'তাঁহার কথাগুলি ছিল সংগীতের মতো; বীঠোফেনের মতো ছিল সেগুলির বাক্যাংশের বিন্যাস এবং হ্যাণ্ডেলের মিলিত সংগীতের মতো ছিল সেগুলির প্রাণ-মাতানো ছন্দ। তাঁহার এই সকল কথা ত্রিশ বৎসর পূর্বের লেখা বইগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্ত আছে। কিন্তু তবুও শরীরে তড়িৎ-স্পর্শানুভব না করিয়া আমি ঐগুলি স্পর্শ করিতে পারি না।' স্বামীজীর বাণীর মন্ত্রশক্তি আমাদিগকে শ্রেয়ের পথে, ঋতের পথে নিয়ন্ত্রিত করুক।

মুক্তি দাও ঃ ভক্তি দাও

শ্রীভবতোষ শতপথী

মুক্তি দাও : আমি চেয়েছি বহুবার—
ভক্তি দাও বলে—কেঁদেছি কতো !
যখন অসহায়, আঁধার চারিধার—
পতিত এ জীবন ঃ বেদনাহত !

তেমন মুক্তি তো চাইনি কোন দিন—
যেখানে নিপীড়িত মানব-প্রাণ !
তেমন ভক্তি তো কপট প্রাণহীন !
অযথা আত্মার—অসম্মান !

দলিত হৃদয়ের ব্যথিত দাবী নিয়ে
বলিনি কোন দিন—ভিক্ষা দাও !
স্বাগত সূর্যের সতেজ বরাভয়ে
বলেছি গুরুদেব ! দীক্ষা দাও !

জ্বলেছি মনে মনে : জ্বেলেছি দীপশিখা,
দুখের পূজারতি করেছি শেষ !
কখন কাছে এসে বসেছ চির সখা !
সরল সান্ত্বনা হরষাবেশ !

মাটির মানুষের কাতর হাহাকারে
স্বর্গে সচকিত দেব সমাজ !
নিত্য নব নব কঠোর অবিচারে
তুমিও মনে মনে পেয়েছ লাজ !!

জ্ঞান ও প্রজ্ঞা

শ্রীশশধর মুখোপাধ্যায়

এখন রয়েছে বাকী—
জীবনের বেশ কিছুদিন,
এরই মাঝে এত ভার,
এত বোঝা কেন মনে হয় !
অতি ক্ষুদ্র, তবু হায় পারিনা বহিতে—
কি করিল এত জ্ঞান শুধু প্রশ্ন রয়।
আমি যারে শ্রদ্ধা করি বসালাম অন্তরে আমার,
জীবন-সন্ধ্যায় তার কোন সাড়া নাই—
নীরব নিথর ;—
শুধু ম্লানমুখে চেয়ে থাকে মুখ পানে মোর,
অট্টহাসে হাসে শুধু নিয়তি আমার।

চঞ্চল জ্ঞানেরে আমি অচঞ্চল ভাবি
যত্ন করি রাখিলাম মনোমাঝে মোর,
আশা ছিল মনে মনে, তাহারে আশ্রয় করি
কাটাইব জীবনের শেষ দিনগুলি ;
কিন্তু হায় !
প্রজ্ঞার অভাবে জ্ঞান হ'য়ে গেছে ম্লান,
দৈবের সম্পদ সে যে দেবতার দান।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকা

শ্রীদেবব্রত চৌধুরী

'অন্যদেশের রাশি রাশি আবর্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরিব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়, এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড। বড় মানুষ, পণ্ডিত, ধনী এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গালি দিলে বা প্রশংসা করলে কিছুই এসে যায় না, এঁরা হচ্ছেন শোভা-মাত্র, দেশের বাহার। কোটি কোটি গরিব, নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধর্ম বা দারিদ্র্যে আসে যায় না, কায়মনোবাক্যে যদি এক হয়, এক মুষ্টি লোক পৃথিবী উলটে দিতে পারে—বাধা যত হবে, ততই ভাল। বাধা না হ'লে কি নদীর বেগ হয়?'

—এই বিদ্যুদ্‌গর্ভ বাণী স্বামী বিবেকানন্দের। আমেরিকা থেকে প্রেরিত এক পত্রে তিনি জনৈক অনুগামীর নিকট এই কথা লিখেছিলেন। প্রতীচ্য খণ্ডে আমেরিকায় তিনি কেন হিন্দুধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন: 'আমার ইচ্ছা হয়েছিল অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের। অপরাপর জাতির সঙ্গে না মেশাই আমার মতে—আমাদের জাতীয় অবনতির মূল কারণ—অবনতির একমাত্র কারণ। প্রতীচ্যের সঙ্গে আমরা কখনও পরস্পরের ভাবের তুলনামূলক আলোচনা করার সুযোগ পাইনি। আমরা হয়ে গিয়েছিলাম কূপমণ্ডূক।'

তারপরে বলেছেন: 'ইওরোপের কাছ থেকে ভারতকে শিখতে হবে বহিঃপ্রকৃতি-জয়। আর ভারতের কাছ থেকে ইওরোপকে শিখতে হবে অন্তঃপ্রকৃতি-জয়। তা হ'লে হিন্দু বা ইওরোপীয় ব'লে কিছু থাকবে না। উভয়-প্রকৃতিজয়ী এক আদর্শ মনুষ্য-সমাজ গঠিত হবে। আমরা মনুষ্যত্বের একদিক, ওরা আর একদিক বিকাশ করছে। এই দুইটিরই মিলন দরকার।'

এ প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও বলেছিলেন: 'আমাদের দেশে মোক্ষলাভের প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে ধর্মের। ধর্ম কি?—যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক, ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে। মোক্ষ কি? —যা শেখায় ইহলোকের সুখ গোলামি, পরলোকেরও তাই।...

'অতএব মুক্ত হ'তে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হ'লে চলবে না। বৌদ্ধদের পর থেকে ধর্মটা একেবারে অনাদৃত হ'ল, খালি মোক্ষলাভই প্রধান হ'ল। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষমার্গ অনুশীলন করে, সে তো ভালই, কিন্তু তা হয় না ভোগ না হ'লে ত্যাগ হয় না। আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে।—গৃহস্থই নয়, আবার মোক্ষ।'

প্রাচ্য যেমন পাশ্চাত্যের, তেমনি পাশ্চাত্যও প্রাচ্যের অনুপূরক। স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বিশ্বমানবকে এই অভাব পরিপূরণে—এই আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেন শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে। প্রচণ্ড শিল্প-বিপ্লবের গতি-বেগে বিপুল সমৃদ্ধি-শালী এই নূতন রাষ্ট্রটি তখন অধিকতর সম্পদ্‌-আহরণে মত্ত—বিশ্বের বহুজন সেই রাষ্ট্রটিকে

জড়বাদী ব'লে অভিহিত করেছেন। আমেরিকার এই বিভ্রান্তিকর জড়বাদী ভূমিকা সর্বজন-বিদিত হলেও তিনি বললেন: 'নানা দূর দেশ থেকে বহু মানুষ এখানে বহু পরিকল্পনা ভাব ও আদর্শ প্রচার করবার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে এবং আমেরিকাই একমাত্র স্থান, যেখানে সব কিছুর সাফল্যের সম্ভাবনা আছে।'

এর পরেই আবার এক চিঠিতে লিখেছেন: 'শুধু আমেরিকার বাতাসেই এমন একটি গুণ আছে যে, প্রত্যেকের ভিতর যা কিছু ভাল, সমস্তই ফুটিয়ে তোলে!'

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন আদর্শ একে অন্যের অনুপূরক। বিরোধ নয়, সামঞ্জস্য—সকল ক্ষেত্রেই সহ-অবস্থান, সমন্বয়, এই বাণী দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, 'হ্যাঁরে, নরেন, তুই কি চাস? নিজের মুক্তি? কোথায় তুই বটগাছের মতো হয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে ছায়া দিবি—না, তুই নিজের মুক্তি চাইছিস।' বিশ্বমানবের মুক্তি, সর্বমানবকে অধ্যাত্মলোকে উন্নত করার ব্রত নিলেন স্বামীজী—পাশ্চাত্যের বহিঃপ্রকৃতি-জয়ের বাণী ভারতে ও প্রাচ্যখণ্ডে প্রচার, আর প্রাচ্যের অন্তঃপ্রকৃতি জয়ের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে সারা ভারত ও প্রতীচ্য খণ্ডে ঘুরে বেড়ালেন।

বৈষয়িক দিক থেকে মানুষ যে কতখানি অগ্রসর হয়েছে, কতখানি পার্থিব উন্নতি সাধিত হয়েছে, তা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমেরিকায়—'কলাম্বিয়ায়' একটি বিশ্বমেলার আয়োজন করা হয়েছিল। আর একদিকে এরই অন্যতম অঙ্গ-হিসেবে আয়োজন করা হয়েছিল ধর্ম-মহাসম্মেলনের। শিকাগোতে বিশ্বের বহু দেশের বহু ধর্মের প্রতিনিধিগণকে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সমগ্র বিশ্ব ও ভারতের প্রয়োজন বিচার ক'রে স্বামীজীও এই সম্মেলনে যোগ দেওয়া স্থির করলেন। ১৮৯৩ খৃঃ ৩১শে মে তিনি আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার নির্দিষ্ট দিনের বেশ কিছুটা আগেই তিনি শিকাগো শহরে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু সম্মেলনে যোগ দিতে হ'লে যে পরিচয়-পত্রের প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল না, অর্থাভাবও ছিল প্রচুর। রম্যাঁ রলাঁ তাঁর এই অভিযানকে 'বিস্ময়কর' ব'লে অভিহিত করেছেন। ভিক্ষা ক'রে সমুদ্র পাড়ি দিলেন। আমেরিকায় পৌঁছবার পরই সেই অর্থ ফুরিয়ে গেল। রেল-স্টেশনে প্রচণ্ড শীতে শীতবস্ত্রের অভাবে প্যাকিং-বাক্সের মধ্যে থেকে আত্মরক্ষা করলেন। পরিশেষে মিসেস জি. ডব্লিউ হেল নামে জনৈকা মহিলা তাঁকে মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত ক'রে রক্ষা করলেন। এঁরই কথা তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "মিঃ হেল—যাঁর বাড়িতে চিকাগোয় আমার সেন্টার, তাঁর স্ত্রীকে আমি 'মা' বলি, আর তাঁর মেয়েরা আমাকে 'দাদা' বলে, এমন মহাপবিত্র দয়ালু পরিবার আমি তো আর দেখি না। আরে ভাই, তা নইলে কি এদের উপর ভগবানের এত কৃপা। কি দয়া এদের, যদি খবর পেলে যে, একজন গরিব ফলানা জায়গায় কষ্টে রয়েছে, মেয়ে-মদ্দ চ'লল—তাকে খাবার কাপড় দিতে, কাজ জুটিয়ে দিতে। আর আমরা কি করি?"

এইখানেই ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে মিস স্যানবার্ন নামে জনৈকা বুদ্ধিমতী মহিলা এবং কালক্রমে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

জন হেনরি রাইটের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। তাঁরা স্বামীজীর দৃঢ় প্রত্যয়, অপূর্ব মনীষা ও পৌরুষব্যঞ্জক চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হলেন। শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে যোগদানের পথ এঁদেরই সাহায্যে প্রশস্ত হ'ল। ১৮৯৩ খৃঃ সেই ঐতিহাসিক দিনটিতে সেই বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীতে বক্তৃতাদানের আহ্বান এল। এই দিনটির কথা পরে তিনি এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন :

"আর আমি, যে জীবনে কখন সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে। সঙ্গীত, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথারীতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইবার পরে সভা আরম্ভ হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক দুরদুর করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্বাহ্নে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ বলিলেন, চক্রবর্তী আরও সুন্দর বলিলেন। খুব করতালি-ধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ, কিছুই প্রস্তুত করি নাই। সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ডক্টর ব্যারোজ আমার পরিচয় দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এবং আরও দু-এক কথা বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালি-ধ্বনি হইতে লাগিল যে, কানে তালা ধরিয়া যায়। তারপর আমি আরম্ভ করিলাম, যখন আমার বলা শেষ হইল, তখন হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিন সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল, সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর সত্যই বলিয়াছেন, 'মূকং করোতি বাচালম্'—ভগবান বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া ফেলেন। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক। সেইদিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম, আর যেদিন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেইদিন হলে এত লোক হইয়াছিল যে, আর কখনও সেরূপ হয় নাই।

"প্রায় সকল কাগজেই আমাকে খুব প্রশংসা করিয়াছে। খুব গোঁড়াদের পর্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে, এই সুন্দরমুখ বৈদ্যুতিক শক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি! এইটুকু জানিলেই তোমাদের যথেষ্ট হইবে যে, ইহার পূর্বে প্রাচ্যদেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিকান সমাজের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করে নাই

যে বৈদান্তিক আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় প্রচার করেন, তার সঙ্গে আমেরিকাবাসীদের পরিচয় প্রায় কিছুই ছিল না। তা ছাড়া তাঁর মতবাদের মধ্যে না ছিল গোঁড়ামির স্থান, না ছিল ঐরকম আদর্শ সম্পর্কে আমেরিকাবাসীর কোনরূপ ধারণা। প্রতিকূলতার মুখেও তাঁর কিছু কিছু পড়তে হয়েছিল। তাই প্রশ্ন জাগে—তাঁর এই বিস্ময়কর সাফল্য-লাভের কি কারণ, কী ছিল তার মূলে?

তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ? সে কথা ঠিক। এ ছাড়াও একটি কারণ ছিল, যার গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। সেই কারণটি হ'ল, ঈশ্বরোপাসনায় স্বাধীনতা-সম্পর্কে আমেরিকাবাসীদের সনাতন মর্যাদাবোধ এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের—আধ্যাত্মিক সম্পদের সন্ধানে তাদের চিরন্তন আকূতি। অর্থাৎ বস্তুতান্ত্রিকতার পাতলা স্তরের নীচেই ছিল আধ্যাত্মিক এবং মননশীলতার প্রবহমান একটি গভীর স্রোত। শিল্পায়নের নানা কুফলের বিরুদ্ধে আদর্শবাদীদের প্রতিবাদ প্রভৃতিরও প্রভাব কিছু কম ছিল না। সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যাদির সঙ্গে আমেরিকাবাসী বিদ্বজ্জনের পরিচয় ও ঐসকল বিষয়ে চর্চাও তখন হচ্ছিল।

ভারতের সঙ্গে আমেরিকার যোগাযোগ দীর্ঘকালের, প্রথম যুগ ছিল বাণিজ্যিক লেন-দেন সম্পর্কে যোগাযোগ। ১৭৮৭ খৃঃ প্রথম মার্কিন জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসে, ১৮১৫ খৃঃ থেকে ১৮৩১ খৃঃ মধ্যে সালেম থেকে কলকাতায় 'জর্জ' নামে একটি জাহাজ একুশবার যাতায়াত করে। ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক লেন-দেনে ঐ সময়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কলকাতার রামদুলাল দে। আমেরিকায় তাঁর সম-ব্যবসায়ীদের সমাজে তিনি প্রভূত শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। আমেরিকার জাহাজের একজন মালিক রামদুলালের নামে তাঁর তিনখানা জাহাজের নামকরণ করেছিলেন। আমেরিকার বস্টন, নিউইয়র্ক, সালেম, মার্ব্লহেড এবং ফিলাডেলফিয়ার জন পঁয়ত্রিশ বণিক চাঁদা ক'রে টাকা তোলেন। সেই অর্থে তাঁরা গিলবার্ট স্টুয়ার্টের আঁকা জর্জ ওয়াশিংটনের একটি প্রতিকৃতি ক্রয় ক'রে ১৮০১ খৃঃ রামদুলালকে উপহার দেন।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে আমেরিকায় ধর্ম-সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রের সংখ্যা ছিল অগুনতি। সেগুলির প্রায় অর্ধেকের মধ্যেই রামমোহন সম্পর্কে এবং হিন্দুধর্ম ও খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারাসমূহের সমন্বয়ে তাঁর প্রচেষ্টা সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশিত হ'ত। সাধারণ পাঠাগারগুলিতে রামমোহন-রচিত গ্রন্থসমূহ রাখা হ'ত।

এমার্সন ও থোরো এবং তাঁহাদের অনুগামিগণ ভারতীয় চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী একবার বলেছিলেন, 'এমার্সনের নিবন্ধগুলি আমার কাছে পাশ্চাত্য গুরুর মাধ্যমে ভারতীয় জ্ঞানের বাণী বহন ক'রে এনেছে।' তারপর আমেরিকার প্রাচীনতম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৫৪ খৃঃ সংস্কৃতের অধ্যাপক-পদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম অধ্যাপক উইলিয়ম ডোয়াইট হুইটনিও অথর্ববেদ সম্পর্কে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তারপর সেই বিভাগটি গড়ে তুলেছিলেন এডোয়ার্ড এলরিজ স্যালিসবেরি। ১৮৮০ খৃঃ রচিত হ'ল বুদ্ধের জীবন 'লাইট অব এশিয়া'। এমার্সনের বন্ধু অ্যামাস ব্রনসন অ্যালকট এই পুস্তকটি রচনা করেন। এর ৮৩টি সংস্করণ হয়। কেবল বাণিজ্যিক নয়, ভাব-সম্পদের আদান-প্রদানের দিক থেকে আমেরিকার আগ্রহ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই মাঝে মাঝে ক্ষীণ হলেও ফল্গু-ধারার মতো প্রবহমান ছিল।

মোটের উপর উনিশ শতকের মাঝামাঝি ও শেষ দিকে আমেরিকাবাসীদের চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি জাতির বৃদ্ধি ও বিকাশের দিকেই নিয়োজিত ছিল এবং ভারত ও তার সংস্কৃতি সম্পর্কে সর্বসাধারণের আগ্রহ একেবারে সুপ্ত না থাকলেও খুব কমই ছিল।

১৮৯৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে ভারতীয় জীবন-দর্শন সম্পর্কে সেই আগ্রহ নতুন ক'রে উদ্দীপিত হ'ল। অনেকেই তাঁর ধর্মনীতি অন্তরে গ্রহণ করলেন।

এই অধিবেশনের পরে তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'এদেশে টাকা অথবা উপাধি বা জাঁকজমক অপেক্ষা বুদ্ধির আদর বেশী।' তারপর দু-বছর তিনি আমেরিকায় ছিলেন। ঐ সময়ে স্বামীজী আমেরিকার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন, বেদান্ত-দর্শন প্রচার করেছেন। শেষের দিকে আর একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, 'এশিয়া বপন করেছিল সভ্যতার বীজ, ইওরোপ উন্নতি করেছে পুরুষের আর আমেরিকা নারী ও সাধারণ লোকের—দরিদ্র ও স্ত্রীজাতির পক্ষে এদেশ যেন স্বর্গের মতো। এদেশে দরিদ্র একরূপ নাই বললেই চলে। অন্য কোথাও মেয়েরা এদেশের মেয়েদের মতো স্বাধীন, শিক্ষিত ও উন্নত নয়। সমাজে উহারাই সব–।'

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, সারা লরেন্স কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক জোসেফ ক্যাম্বেলের লেখা এবং নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ রচনার কয়েকটি ছত্র :

বিশ্বমানবের একটি অখণ্ড রূপ এবং একই চরম পরিণতি সম্পর্কে আধুনিক মানুষের মনে যে ধারণা বিবেকানন্দ জাগিয়ে তুলেছেন, সেই নবযুগের জাগরণ ঘটেছিল ১৮৯৩ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে তাঁর উপস্থিতিতে।

অধ্যাপক ক্যাম্বেল লিখেছেন : আপন সত্তায়, আত্মাতে ঈশ্বরের উপলব্ধিই সকল ধর্মের শেষ কথা। কিন্তু আমেরিকায় এসে তিনি যা দেখেছেন, যা শিখেছেন, ভারতের লক্ষ লক্ষ নিরন্ন দরিদ্র অধিবাসীর দুর্গতি দূর করবার উদ্দেশ্যে বাস্তবক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার প্রবল আগ্রহও তাঁর মনে জেগেছে। দেশে ফিরে গিয়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবাকে ব্রতরূপে গ্রহণের আদর্শ বিবেকানন্দ প্রচার করেছেন। এই আদর্শই পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে গান্ধীজীকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সেই ঐতিহাসিক অধিবেশনের সমাপ্তি-ভাষণে স্বামীজী আমেরিকাকে উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন :

'স্বাধীনতার মাতৃভূমি দেবী কলম্বিয়া, তুমি কখনও প্রতিবেশীর শোণিতে নিজ হস্ত কলঙ্কিত কর নাই, প্রতিবেশীর সর্বস্ব অপহরণ করিয়া আপনি সহজে ধনশালিনী হইবার চেষ্টাও কর নাই। সুতরাং তুমিই সভ্য-জগতের পুরোভাগে গমন করিয়া শান্তিপতাকা উড়াইবার অধিকারিণী।'

১৮৯৪ খৃঃ নিউইয়র্কে প্রথম বেদান্ত-প্রচারের কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার আন্দোলনের ক্ষেত্র তারপর থেকে ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে বারটিরও বেশী কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও স্বামীজীর নাম আমেরিকায় স্মরণ করা হয়ে থাকে।

দেহরক্ষার কয়েক বছর আগে স্বামীজী মেরী হেলকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

সকল বোধের অতীত এক শান্তি আমি লাভ করেছি, তা আনন্দ বা দুঃখের কোনটাই নয়, অথচ দুয়েরই উর্ধ্বে। যাকে সে-কথা ব'লো। গত দু-বছর মৃত্যু-উপত্যকার ভিতর দিয়ে শারীরিক ও মানসিক যাত্রা আমাকে এ-বিষয়ে সহায়তা করেছে। এখন আমি

সেই শান্তির—সেই চিরন্তন নীরবতার দিকে যাচ্ছি। সকল বস্তুকে তার নিজের স্থানে আমি দেখছি। সব কিছুই সেই শান্তিতে বিধৃত, নিজের ভাবে পরিপূর্ণ। যিনি আত্মতুষ্ট আত্মরতি, তাঁরই যথার্থ শিক্ষালাভ হয়েছে—এ জগতে এই বড় শিক্ষাটি আমাদের জানতে হয় অসংখ্য জন্ম, স্বর্গ ও নরকের মধ্য দিয়ে। আত্মা ছাড়া আর কিছুই কামনা বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু নাই। আত্মাকে লাভ করাই হ'ল শ্রেষ্ঠ লাভ। আমি মুক্ত, আমার আনন্দের জন্য দ্বিতীয় কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।'

মেরী হেল তাঁকে 'দাদা' বলতেন। শিকাগোতে তাঁদের বাড়িতেই ছিল স্বামীজীর কেন্দ্র। তারপর আর একটি চিঠিতে জনৈক ভক্তকে লিখেছিলেন: 'এবার আমি মুক্ত, পূর্বের মতো ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী, মঠের সভাপতির পদও ছেড়ে দিয়েছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি মুক্ত। গাছের শাখায় ঘুমন্ত পাখি রাত পোহালে যেমন জেগে উঠে গান করে, আর উড়ে যায় গভীর নীলাকাশে, ঠিক তেমনি ভাবেই আমার জীবনের শেষ!'

বিবেকানন্দ-স্মরণে

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী

হে মহামানব!
শতাব্দীর শেষে আজি হেরিলাম স্মরণ-উৎসব!
গুরুর বরিত শিষ্য, তদর্পিত তনু মন প্রাণ
'রাজযোগ' 'কর্মযোগ' দান তব জগতে মহান্।
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তব, তেজোদীপ্ত বাণী বৈশ্বানর!
প্রাচ্যের বিজয়বার্তা অগ্নিমন্ত্রে লেখা সে ভাস্বর!
স্বদেশে বিদেশে যেথা গিয়াছ বলেছ সেই কথা
'শ্রীরামকৃষ্ণে'র বাণী—উদাত্ত কণ্ঠের সে বারতা
পশিয়াছে আজ দেখি জগতের কানে নহে প্রাণে;
স্মরিছে ভারত আজি ভক্তিভরে তব সেই দানে!
'নরনারায়ণ ঋষি' লহ নমস্কার,
কেবল আমার নহে, এ প্রণতি আমা-সবাকার।

শতাব্দীর নমস্কার

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

শতাব্দীপূর্বে যে মহাপুরুষের আবির্ভাবে আমাদের জন্মভূমি পবিত্র হইয়াছে, আজ সেই পুরুষসিংহ বীরসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করিয়া আমরা ধন্য ও পবিত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলিতে গেলেই মনে পড়ে, তাঁহার আচার্যদেব যুগাবতার ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের কথা। স্বামীজীর নিজের কথায়, যিনি ধূলিমুষ্টি হইতে শত শত বিবেকানন্দ স্থষ্টি করিতে পারিতেন, সেই ভগবান্ রামকৃষ্ণকে কোটি কোটি প্রণাম। সেই অপূর্ব পুরুষের অপার মহিমা বিবেকানন্দই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আমরা তাহার কণামাত্র অনুধাবন করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। আবার বিবেকানন্দকেও তিনিই চিনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও একটি ব্যতীত দ্বিতীয় বিবেকানন্দ স্থষ্টি করিবার উপযুক্ত ধূলিমুষ্টি খুঁজিয়া পান নাই। গুরু ও শিষ্য উভয়ের জীবনেই একটি অলৌকিক দিক্ ছিল—কিন্তু স্বামীজীর নিজের দূরে থাকুক, ভগবান্ রামকৃষ্ণের জীবনের অলৌকিক অংশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে কাহাকেও উৎসাহিত করেন নাই, সে অধিকার বিশিষ্ট সাধকের; আমরাও স্বামীজীর লৌকিক জীবন হইতেই প্রেরণা লাভ করিতে চেষ্টা করিব।

অশীতিপরবয়স্ক মনীষী রাজাগোপালাচারী স্বামী বিবেকানন্দকে 'Father of freedom—religious, cultural and political' বলিয়া প্রণতি জানাইয়াছেন। ভারতের অন্যতম মহাসাধক শ্রীঅরবিন্দ স্বামীজীকে 'ভারতের আত্মা' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এই দুই মনীষীর কথা ভাবিয়া দেখিলেই আমরা স্বামীজীর কিছুটা পরিচয় পাইতে সমর্থ হইব। বস্তুতঃ গত শতাব্দীতে ভারতের যতটুকু অগ্রগতি হইয়াছে, ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু মোহমুক্ত হইতে পারিয়াছি, যতটুকু স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি, যতটুকু প্রাণশক্তির উদ্‌বোধন করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা এই মহাপুরুষের দান বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তিনি ছিলেন মহামনীষী, কিন্তু তাঁহার চিন্তা শুধু মানসিক ব্যায়ামে পর্যবসিত হয় নাই, প্রতিক্ষেত্রে তাহা কার্যে তরঙ্গায়িত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

তিনি যাহা বলিয়াছেন, কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া শতবার তাহা পুনরুক্ত হইয়াছে, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বহু বক্তৃতামঞ্চ হইতে তাহাই ঘোষিত হইয়াছে, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহু উত্তরসাধক তাঁহার কর্মক্ষেত্র সমৃদ্ধ করিয়াছেন। স্বামীজী বার বার বলিতেন, এদেশে শত শত বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইবে, বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের উপর তিনি প্রচুর ভরসা রাখিতেন। শত বিবেকানন্দের আবির্ভাব সহজ নহে, কিন্তু তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সেবাধর্মকে স্বীকার করিয়া শত শত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যে গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিবেকানন্দ যাহা ভাবিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে আর কেহ তাহা তেমন করিয়া ভাবে নাই, তিনি যাহা বলিয়াছেন, আর কেহ অমন অদ্ভুত দৃঢ়তার সহিত তাহা বলিতে পারে নাই, কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী হইয়া তিনি যে মহাযজ্ঞে

মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, আর কেহ তেমন পারে নাই, এইখানেই তিনি অদ্বিতীয়।

এমন একদিন গিয়াছে, যেদিন বাংলার প্রতি গ্রামে লোকশিক্ষা ও সেবাধর্মকে ব্রত বলিয়া স্বীকার করিয়া একটি করিয়া রামকৃষ্ণ-সেবাসঙ্ঘ বা বিবেকানন্দ-সেবাসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল। কতগুলি নিরলস অকপট ব্রহ্মচারী যুবক লইয়া এই সঙ্ঘগুলি গঠিত ছিল, ইহাদের আদর্শ কেবল বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। সেবকদের আরাধ্য ছিলেন ভগবান্ রামকৃষ্ণ, আদর্শ—স্বামী বিবেকানন্দ। ইহাদের মধ্য হইতেই অগণিত মনীষী উদ্ভূত হইয়া নূতন বাংলা, নবীন ভারত গঠন করিয়াছেন। রাজনীতি ও দেশের মুক্তি-আন্দোলনে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করিয়া যাঁহারা ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের শতকরা আশী জন যে ইঁহারাই ছিলেন, সে-কথা সেকালের সরকারী গোপনীয় দপ্তরের নথিপত্রে আছে। ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যে প্রবল তরঙ্গমালা প্লাবন আনিয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটি জলকণা স্বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতে শক্তি আহরণ করিয়াছিল।

কিন্তু এই অদ্ভুতকর্মা মানুষটি কেমন ছিলেন? জ্ঞানরাজ্যে ছিলেন উত্তুঙ্গ গৌরীশৃঙ্গ, ভাবরাজ্যে তিনিই ছিলেন অগাধ মহাসমুদ্র; সন্ন্যাসের তীব্র কঠোরতার মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে কি করুণার সুরধুনীই না বহিয়া যাইত! ভারতের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া জীর্ণকুটির হইতে রাজপ্রাসাদ, দীনদরিদ্র হইতে রাজাধিরাজ, অস্পৃশ্য নিরক্ষর মেথর হইতে আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পর্যন্ত সকলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় বহন করিয়া দিনের পর দিন অনশনে ভারতের সমুদ্রবেষ্টিত শেষ শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া গলদশ্রুনয়নে তিনি ভারতের কি মূর্তি দেখিয়াছিলেন? তার পর আধুনিক সভ্যতার ভাস্বরজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর লীলাভূমি, শৌর্য ও বীর্যের মহাতীর্থ আমেরিকা ও ইওরোপে ভারতের কি বার্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; তাহা সকলেই জানেন; আজ আমরা কেবল তাহা স্মরণ করিতে চাই

কেবল পররাজ্যলিপ্সু দস্যুরাই যে নররক্তে পৃথিবী কলুষিত করিয়া আসিতেছে—তাহা নহে, পরধর্মদ্বেষী ধর্মান্ধদের দ্বারাও ইহার অনুষ্ঠান কম হয় নাই। এমন একদিন ছিল যেদিন 'heathen', কাফের বা ম্লেচ্ছ শব্দগুলি অনেকে ঘৃণার সহিত উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ্যে উচ্চারণ করিতেন, কিন্তু আজ সভ্য সমাজ হইতে এই শব্দগুলি লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, মনে থাকিলেও কোন সভ্য মানুষ আজ তাহা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করিতে সাহসী হয় না—ইহা স্বামী বিবেকানন্দের দান। ধর্মজগতে তিনি যে 'সহাবস্থানের নীতি' ঘোষণা করিয়াছেন, আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সহাবস্থানের নীতি তাহারই অনুসিদ্ধান্ত।

ভগবান্ এক সময়ে সমুদ্রমগ্ন পৃথিবীকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছেন, অবজ্ঞার পঙ্কে মগ্ন, বিদ্বেষের তরঙ্গে প্লাবিত ভারতবর্ষকে জগতের সভ্য সমাজে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া বিবেকানন্দ যেমন শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়াছেন, এমন আর কেহ নহে। তাঁহার পূর্বেও ভারতের বার্তা কেহ কেহ পাশ্চাত্য দেশে লইয়া গিয়াছেন, বিবেকানন্দ তাঁহাদের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতো ভারতের আত্মার সহিত কাহারও পরিচয় ছিল না, ভারতের প্রতি অতখানি শ্রদ্ধা কাহারও ছিল না, এবং সেই জন্যই কেহই

তাঁহার মতো সফল হন নাই। বিবেকানন্দের পরেও কেহ কেহ ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধেয় করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এ কার্যের দৃঢ় ভিত্তি তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য যাহাতে প্রাচ্যের সহিত সশ্রদ্ধভাবে মিলিত হইতে পারে, তাহার পথও তিনিই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

স্বদেশকে তিনি দেবতার আসনে বসাইয়াছেন ও দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে তিনিই নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আজ পররাজ্যলিপ্সু চীনদস্যু আমাদের জন্মভূমি আক্রমণ করিয়াছে, সমগ্র জাতির পক্ষে এ অতি সঙ্কটময় মুহূর্ত। অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে ভারতপ্রাণ বিবেকানন্দ এই সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আমাদের সাবধান করিয়াছেন, আমরা তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করি নাই। এই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইলেও চাই স্বামীজীর সেই উদাত্ত বাণী 'ন্যয়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ', চাই তাঁহার সেই উৎসাহ, সেই প্রেম, সেই সাহস, সেই সর্বস্বত্যাগের ব্রত। মুক্তির পথে, উন্নতির পথে—ধ্রুবলক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে স্বামী বিবেকানন্দের মতো পথিপ্রদর্শক দ্বিতীয় আর কে আছে? যদি আমরা তাঁহার নির্দেশ পালন করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হই, তাহা হইলে আমাদের জন্মভূমির সঙ্কটে 'কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর'—কবির এই উক্তি অবশ্য সার্থক হইবে।

বিবেকানন্দ কেবল বনের বেদান্তকে ঘরে আনিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি আমাদের মাতার ন্যায় ভালবাসিয়াছেন, পিতার ন্যায় তিরস্কার করিয়াছেন। জ্ঞান-রাজ্যের সম্রাট্ নিরাসক্ত সেই মহাযোগী কর্মের দ্বারা জ্ঞানকে মার্জিত করিবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই মহান্ কর্মবীর মূঢ়তার তামসিক শয্যা হইতে আমাদের বীরের মতো কর্মক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছেন। একদিকে তিনি যেমন মানুষমাত্রেরই দেবত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, অন্যদিকে সর্বধর্মের সমন্বয় করিয়া আপনার জীবনে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ জগজ্জয়ী বিবেকানন্দ হইয়া পনের বৎসরও এই ধরাধামে ছিলেন না, কিন্তু তাহার মধ্যে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, পনের শত বৎসর ধরিয়া তাহা ক্রমবিকশিত হইবে। আজ সেই যুগাবতার মহাপুরুষের আবির্ভাবের শতবর্ষ পরে আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি, তাঁহার শক্তি আমাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হউক—এই প্রার্থনার সহিত বার বার তাঁহাকে স্মরণ করি, বার বার তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাই।*

* চাতরা স্কুলে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে পঠিত।

সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

(১২) বিবেকানন্দের উপর প্রচলিত সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব

এই-সকল আলোচনা হ'তে দেখছি যে, বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ কোন প্রচলিত সমাজতন্ত্রের গোষ্ঠীভুক্ত নয়। তা মার্ক্সগোষ্ঠীয় নয়, কারণ বিশ্বাসে বা কর্মপন্থায় তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'Historical-Dialectical-Materialism' এবং 'Historical-Scientific Spirituality' এ-দুয়ের মধ্যে সুমেরু কুমেরুর ব্যবধান।

কিন্তু বিবেকানন্দ যখন ঘোষণা করেছেন, 'I am a socialist' এবং বলেছেন, 'I am a socialist not because it is a perfect state, but half a loaf is better than no bread', তখন তিনি প্রচলিত সমাজতন্ত্রবাদের কথাই বলেছেন। তিনি বর্তমান ভারতে স্পষ্টই 'Socialism', 'Anarchism' এবং 'Nihilism'-এর উল্লেখ করেছেন। শূদ্র-অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রচলিত সমাজতন্ত্রবাদ তাঁর কাছে 'half a loaf', 'bread' নয়। শূদ্র-অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'Let every dog have his day in the miserable world'. (Letters—p. 321) আরও বলছেন, 'the first three (classes) have had their days. Now is the time for the last — they must have it—none can resist it.' Let this be tried if for nothing else, for the novelty of the thing.' 'A redistribution of pain and pleasure is better than the same persons having pains and pleasures' (Letters).

সকলে মিলে সুখ-দুঃখ ভোগ করা অপেক্ষাকৃত ভাল। শূদ্র-অভ্যুত্থানের পরিণতিতে সংস্কৃতির অবনতি ঘটবে, তিনি জানতেন। তবু এ অবশ্যম্ভাবী এবং চিরকাল অত্যাচারিত শূদ্রগণের এ অধিকার ন্যায়ের দিক থেকে সঙ্গত। এই জন্যে তিনি একে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রচলিত সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি আপন সমর্থন জানিয়েছিলেন, 'I am a socialist'। এবং এ-কথা ঠিক, তিনিই প্রথম proletkut বা শূদ্র-সংস্কৃতির কথা বলেছেন। কিন্তু তা এঁদের মতে মত মিলিয়ে যে বলেননি, তার প্রমাণ: তিনি এ-কথা লেনিন বা মাও-সে-তুং —রাশিয়া এবং চীনের দুই গণ-অভ্যুত্থানের নেতার বহু পূর্বে বলেছিলেন। ইতিহাসের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি বীজের অবস্থায় থাকলেও তিনি তাঁর অসাধারণ ঐতিহাসিক দৃষ্টি-সহায়ে তা দেখতে পেয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ 'Christian romantic socialist'-দের সমগোত্রও নন। অধ্যাপক বিনয় সরকারের তাঁকে St. Simon, Robert Owen, Fourier প্রভৃতি ধর্মযাজকদের সঙ্গে তুলনা করবার কারণ বোধ হয় এই যে, বিবেকানন্দও ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী। কিন্তু ভক্ত ধর্মযাজকদের সাম্য-সমাজ একটি 'pious wish' বা 'utopian' কল্পনা-মাত্র। কারণ তাঁরা কোন সুস্পষ্ট কর্মধারা দিতে পারেননি, তা ছাড়া তাঁদের পরিকল্পনা বিজ্ঞান-ভিত্তিক নয়—ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান বা যুক্তি-বিজ্ঞান ইত্যাদি সহায়ে তাঁদের মত তাঁরা গঠন করেননি। কিন্তু বিবেকানন্দ যুক্তিবিধি,

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, ইতিহাস পুরাতত্ত্ব সহায়ে আপন মত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর 'উত্থান-পতন-তত্ত্ব' (Theory of Rhythm) এবং 'চক্রাকারে সমাজ-আবর্তন-তত্ত্ব' (Cyclical movement of Society) এ-দিক থেকে মার্ক্স-এর 'Linear Progress' তত্ত্ব থেকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক—এ আমরা দেখেছি। তা ছাড়া, Christian Socialist-গণ সমাজ-তন্ত্রের আর্থনীতিক দিকে একেবারেই দৃষ্টিপাত করেননি। অথচ আমরা দেখেছি যে, বিবেকানন্দের মতবাদে 'proletariat dictatorship' বা 'proletkut'-এর ধারণা সুস্পষ্ট। সমাজবিবর্তনে আর্থিক শক্তিকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন, এঁরা দেননি।

(১০) বিবেকানন্দের মৌলিক সমাজতন্ত্রবাদ :
অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয়

বিবেকানন্দ প্রচলিত কোন গোষ্ঠীভুক্ত সমাজতন্ত্রবাদী নন, কিন্তু তিনি সমাজতন্ত্রবাদী। তাঁর এ সমাজতন্ত্রবাদ সম্পূর্ণ মৌলিক। তাঁর মৌলিকত্বের লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক। প্রথমতঃ এর দার্শনিক ভিত্তি অদ্বৈত ব্রহ্মবাদে, এবং তাঁর সাম্যের ধারণা আধ্যাত্মিক সাম্য। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের বৈজ্ঞানিকত্ব তিনি প্রতিপাদন করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সূত্র তিনি দেখিয়েছেন 'জ্ঞানযোগ' ও 'Science of religion' গ্রন্থে। তার সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান সংযুক্ত ক'রে তিনি এক অভিনব সমাজতন্ত্রবাদ আমাদের দিয়েছেন, যাকে আমরা 'Historical Scientific spirituality' নামে অভিহিত করতে পারি। কিন্তু এই 'Scientific spirituality' (বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মবাদ)-এর সঙ্গে 'Scientific materialism' (বৈজ্ঞানিক বস্তুতন্ত্রবাদ)-এর সম্পর্ক আছে। তিনি এ উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন। খুবই আশ্চর্যজনক মনে হয় এ-কথা। কিন্তু এ অতীব সত্য কথা। তিনি 'The Mission of Vedanta' শীর্ষক বক্তৃতায় বলছেন স্পষ্ট ক'রে, 'It seems clear that the conclusions of modern materialistic science can be acceptable, harmoniously with their (Indian) religion, only to the Vedantins, or Hindus as they are called. It seems clear that modern materialism can hold its own and at the same time approach spirituality by taking up the conclusions of Vedanta. It seems to us, and to all who come to know, that the conclusions of modern science are the very conclusions of Velanta reached ages ago ; only in modern science they are written in the language of matter.'

—আধুনিক বিজ্ঞান যে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে, বেদান্ত বহুযুগ পূর্বেই সেখানে পৌঁছেছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষা জড়কে অবলম্বন ক'রে। তাঁর মতে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানবাদ প্রতিপাদন করেছে জড়বস্তুতে জগতের একত্বে, আর বেদান্ত করেছে আত্মায় একত্ব। 'একত্ব' উভয়ের প্রতিপাদিত বস্তু। সেইজন্য আধুনিক বিজ্ঞান ও বেদান্তের মধ্যে সামঞ্জস্য-সূত্র রয়েছে। অবশ্য মনে রাখতে হবে—বেদান্ত আর একটু অগ্রসর হয়েছে, বস্তুর অন্তরালবর্তী সত্যবস্তু 'আত্মা'কে প্রতিপাদন করেছে। অবশ্য এই 'আত্মিক ঐক্যে' পৌঁছতে আধুনিক বিজ্ঞানের হয়তো খুব বেশী দেরি হবে না। দর্শন ও বিজ্ঞান বর্তমান যুগে এক চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে।[১]

১ Dr. A. N. Bose—'Science and Philosophy at the cross road.

পরবর্তীকালের গবেষণা বিবেকানন্দের মতকে সমর্থন করে এ-বিষয়ে। বিবেকানন্দ ছিলেন এক সমন্বয়-কর্তা, চিন্তা-জগতের মহাপ্রতিভাধর নেতা। জগতের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে এক অভিনব সমন্বিত মতবাদ দিয়েছেন, যা মানুষকে চিন্তার জগতে শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ এনে দিয়েছে। সেইজন্য তাঁর 'Historical-Scientific spirituality'-তে 'materialism'-এর যথাযথ স্থান নির্দেশিত হয়েছে। তাঁর চিন্তাধারায় 'materialism'-এর স্থান কতখানি, তাঁর কয়েকটি উক্তি দেখলেই পরিস্ফুট হবে। বলছেন তিনি, 'Material civilisation, nay, even luxury is necessary to create work for the poor. Bread, bread. I do not believe in a God, who cannot give me bread here, giving me eternal bliss in heaven'.

তাঁর এবম্বিধ উক্তি থেকে ডক্টর বিনয় সরকার অভিমত দিয়েছিলেন যে, 'Vivekananda was the father of modern materialism in India' অবশ্যই ডক্টর সরকারের এই উক্তিটি বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে নিদারুণ ভ্রান্তি জন্মানো স্বাভাবিক। অনেক সময়ে বিবেকানন্দের এই ধরনের উক্তির সঙ্গে সংযোজিত করা হয় আর একটি উক্তি: 'The terrible mistake in religion was to interfere in social matters. Hands off, keep yourself to your own bound and everything would come right.' (Letters -p. 84) ।ডক্টর সরকারের তাঁকে 'materialist' ব'লে ঘোষণা, আর এই উক্তিটি সংযোজন ক'রে কোন কোন মহলে বলা হয় যে, বিবেকানন্দ নিজেই স্পষ্ট ক'রে বলছেন যে, ধর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, সমাজের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। শেষ-উদ্ধৃত উক্তিটি স্বামীজী করেছিলেন পুরোহিতদের লক্ষ্য ক'রে। কারণ একই চিঠির পরবর্তী পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন, 'What business had the priest to interfere (to the misery of millions of human beings) in every social matter ?' এবং অন্য একটি চিঠিতে বলছেন, 'Religion is not at fault. On the other hand your religion teaches you that every being is only your own self multiplied. But it was the want of practical application'. তিনি যা বলতে চাইছেন, তা হ'ল: 'Root up priestcraft from the old religion and you get the best religion of the world'.

অবশ্য মুষ্টিমেয় ধর্মজ্ঞানী ব্যক্তিদের স্বার্থে জনগণ বঞ্চিত হবে—এ তিনি কোনদিনই চাননি। বলেছেন, 'The present Hindu society is organised only for spiritual men and hopelessly crushes out everybody else, why ? Where shall they go, who want to enjoy the world a little with frivolities ? Just as our religion takes in all, so should our society. This is to be worked out by first understanding the true principles of our religion and then applying them to society.' এ-কথার অর্থ হ'ল তিনি ধর্ম-জ্ঞানীদের স্বার্থে সমাজের সর্বসাধারণকে বলি দেবার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এ-কথার অর্থ এই নয় যে, সর্বসাধারণকে ধর্মশিক্ষা দেবার তিনি বিরোধী ছিলেন। বার বার বলছেন, 'spread religion and education.' ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা বিস্তার কর। 'Elevate the masses

without injuring religion.' —ধর্মকে আঘাত না ক'রে জনগণকে উন্নত কর।

আমরা দীর্ঘ সময় মূল বিষয় হ'তে দূরে গিয়ে প্রাসঙ্গিক অন্য বিষয় আলোচনা করেছি। আমরা বলতে চাইছি—বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ সম্পূর্ণ মৌলিক, তার গোত্র স্বতন্ত্র। তাকে আমরা 'Historical-Scientific Spirituality' আখ্যা দিতে পারি। কিন্তু এই 'Scientific Spirituality' ধর্ম, দর্শন ও 'scientific materialism'-এর সমন্বয়-প্রসূত। তিনি ইতিহাসের 'spiritualistic interpretation' দিয়েছেন। ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে তিনি পেয়েছেন 'শ্রেণী-সংগ্রামবাদ' এবং আসন্ন শূদ্রসংস্কৃতি-বিশিষ্ট শূদ্র-শাসন। কিন্তু সেখানেই ইতিহাসের গতিচক্র থেমে যাবে না। মহাভারতের সাম্য উল্লেখ ক'রে তিনি বলছেন: 'The whole world was in the beginning peopled with Brahmans, and as they began to degenerate, they become divided into different castes, and when the cycle turns round, they will all go back to that Brahminical origin. This cycle is turning round and I draw your attention to that. ('The Mission of Vedanta')। তাঁর মতে আদিম সমাজ ছিল সাম্য-সমাজ, কিন্তু তা ব্রাহ্মণদের উচ্চ-সংস্কৃতি-সম্পন্ন সাম্য-সমাজ। অধঃপতনের ফলে শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে। পুনর্বার চক্র ঘুরে যাবে, শ্রেণীবিহীন শূদ্র-সমাজ শ্রেণীবিহীন ব্রাহ্মণ সমাজে উন্নীত হবে। তাঁর 'proletkut'-এ শূদ্র- ও ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটবে। এবং সেইজন্য তিনি বলছেন, 'from the highest man to the lowest pariah, everyone in this country has to try and become the ideal Brahman'. সোরোকিন বলেছেন, 'Ideational' সমাজ আবার গতিক্রমে ফিরে আসবে, যে সমাজের ভিত্তি ধর্ম তপশ্চর্যা সত্য শিব ও কল্যাণের ওপর। আর কেউই তা বলেননি। বিবেকানন্দ এ-কথা বহু আগে বলেছেন, সোরোকিন তখন হয়তো জন্মাননি। সেইজন্য এখানেও বিবেকানন্দের মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক যেমন মৌলিকত্ব আমরা দেখেছি তাঁর 'proletarian classless society' ও 'Proletkut'-এর ধারণায় তিনি লেনিন প্রভৃতির পুরোগামী ছিলেন।

তাঁর কর্মপন্থার অভিনবত্ব আমরা লক্ষ্য করেছি। শিক্ষা ও বেদান্তোক্ত উদার বিশ্বজনীন ধর্ম ছড়িয়ে দিতে হবে। এ কাজ বৈপ্লবিক সংগঠন-পদ্ধতিতে করতে হবে। যুবশক্তিকে তিনি এমন ক'রে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন যে, তারা বিদ্যুদ্‌বেগে সমুদ্র-তরঙ্গের মতো প্লাবিত ক'রে ফেলবে দেশকে এবং সে তরঙ্গ পৌঁছবে চাষার লাঙলের পাশে, শ্রমিকের কারখানাতে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশে। এবং এ কর্মপন্থায় কোন পথে জোর ক'রে জনসাধারণকে চালিত করা স্থান পায়নি। তিনি সে ধরনের কার্যসূচীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গিয়েছেন। জাগ্রত জনগণের বিবেকের বিচার শুভফলপ্রদ—এ বিশ্বনিয়ম তিনি জানতেন; এবং এও জানতেন, 'Liberty of thought and action'-কে প্রথম স্থান দিতে হবে মানবীয় অধিকার-পদ্ধতিতে। না হ'লে পরিণাম অশুভ হবে—সমাজ বিচ্ছিন্নতার (disintegration) কবলিত হবে।

সুতরাং দেখছি, বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের যে কয়েকটি যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠা, তা সম্পূর্ণ মৌলিক। এ তত্ত্বগুলি হ'ল: জীবের দেবত্ববাদ, জীবনের অবশ্যম্ভাবী আধ্যাত্মিক পরিণতিবাদ, বিশেষ সুবিধাবাদ, ইতিহাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, উত্থান-পতনের নিয়মে সমাজ-বিবর্তনবাদ, শ্রেণী-সংগ্রামবাদ, ইতিহাসের চক্রাকার গতিপথবাদ, ব্যক্তি-

স্বাধীনতাবাদ ও বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ। তাঁর সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী ও অভিনব ধর্ম ও শিক্ষা প্রচার বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে; এবং মনে রাখতে হবে, তিনি সমাজের 'reform' চাননি; যা চেয়েছেন, তা হ'ল আমূল রূপান্তর। ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতি-সম্পন্ন প্রজাপুঞ্জের শ্রেণীবিহীন সমাজ। সেখানে মানুষের দেবত্ব স্বীকৃতি পাবে, এবং সকল স্বার্থনিয়ন্ত্রিত হবে মানুষের অধ্যাত্ম-প্রবণতার দিক থেকে। এইরূপ রূপান্তর-সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী কর্মপদ্ধতি তিনি দিয়েছেন।

এই সকল বিচার ক'রে সিদ্ধান্ত করছি যে, বিবেকানন্দের চিন্তাধারার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজতন্ত্রবাদ নিহিত রয়েছে, তা সম্পূর্ণ মৌলিক। অতি স্বল্পকালস্থায়ী জীবনে তিনি তা একত্র সংগ্রথিত ক'রে যেতে পারেননি, তা ঠিক তাঁর কাজও ছিল না। তিনি এসেছিলেন কালের অধিনায়করূপে আমাদের রূপান্তরের রূপ দিতে। সেইজন্য তাঁর ধারণাগুলি ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে, মৌলিক রচনায়—সর্বত্র। এইজন্যই অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে ভুল ধারণা হয়েছে। তাঁর কয়েকটি উক্তি দেখেই কেউ কেউ মনে করেছি যে, তিনি মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্রী ছিলেন, কেউ বা মনে করেছি তিনি ধর্মযাজক-সুলভ 'romantic socialist' ছিলেন। কিন্তু একটু পরিশ্রম-সহায়ে তাঁর সমগ্র রচনাবলী অনুসন্ধান করলে অবশ্য দেখা যায় যে, সমাজতন্ত্রবাদের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী নূতন মতের তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং তা পূর্ণাঙ্গ এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই নূতন ভাবধারা অলক্ষ্যে পৃথিবীর কোন কোন সমাজ-দার্শনিকের চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হয়েছে।

অবশ্য তিনি যা দিয়ে গিয়েছেন, তার অনেক কিছুই তিনি সূত্রাকারে দিয়েছেন, যা ভাষ্যের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু ভাষ্যকারেরা মনে রাখবেন যে, নিরপেক্ষ বিচার চাই। 'বৈজ্ঞানিক' আখ্যাপ্রাপ্ত আলোচনাও সব সময় নিরপেক্ষ নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই তথ্যাদি এমন ভাবে নির্বাচন করা যেতে পারে কিংবা গ্রথিত করা যেতে পারে, যাতে সত্যের বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ অবহিত হ'তে হবে। আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনায় এর কিছু প্রমাণ পেয়েছি। পূর্ব সিদ্ধান্তের দরুন এরূপ ভুল হওয়া স্বাভাবিক। 'Historical-Materialism'-এর দিক থেকে ডক্টর দত্ত এবং Christian Socialistদের সম্মুখে রেখে অধ্যাপক সরকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁরা উভয়েই বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে ভুল সিদ্ধান্তে এসেছেন। অবশ্য তাঁরাই বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ-সম্পর্কে আলোচনার উদ্বোধন করেন এবং বিবেকানন্দকে ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদের পূর্বসূরী ব'লে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ডক্টর দত্ত ও সরকার অনেক নূতন তথ্যেরও উদ্ঘাটন করেছেন। ডক্টর দত্তই দেখিয়েছেন যে, বিবেকানন্দ Lenin-এরও পূর্বে শূদ্র-শাসন ও শূদ্র-সংস্কৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। এঁরা যে গোড়ার কাজ করেছেন, তার জন্য সকলকেই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে এবং তাঁদের আলোচনা হতেই নূতন ভাষ্যকারদের অগ্রসর হ'তে হবে। কিন্তু যে কেউ আজ এ-বিষয়ে অগ্রসর হবেন, তাঁকে মনে রাখতে হবে যে, বিবেকানন্দের চিন্তা-পদ্ধতি একটি পরস্পর-সম্বন্ধে গ্রথিত, বস্তুতঃ 'one whole.' তাঁর সমগ্র চিন্তাধারা বিচার ক'রে সিদ্ধান্ত গঠন করতে হবে; নতুবা নিদারুণ ভ্রান্তপথে তাঁরা পরিচালিত হবেন। এবং বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের পরিচয় গ্রহণ করতে হ'লে তিনি ধর্মদর্শনকে যে নূতন রূপ দিয়েছেন, নূতন যে নীতিশাস্ত্র দিয়েছেন, তা বাদ দিলে চলবে না। সমগ্র জ্ঞান-জগতের যাবতীয় চিন্তাগুলির সমন্বয় সাধনের উপর তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা—এ-কথা মনে রাখতে হবে। (সমাপ্ত)

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় সমন্বয় ও সামঞ্জস্য

শ্রীকৈলাসচন্দ্র কর

ভগবান লাভ বা আত্মোপলব্ধিই মানব-জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র বারিকণার সহিত সাগরের, আলোক-কণিকার সহিত জ্যোতিঃসমুদ্রের যে সম্বন্ধ, ক্ষুদ্রায়তন মানুষেরও বিরাট ব্রহ্মসত্তার সহিত সেই সম্পর্ক। কাজেই তাহার 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্'। এই উপলব্ধিই মানুষের মনুষ্যত্ব। কিন্তু দেহমনে সীমাবদ্ধ মানুষের পক্ষে সাধারণতঃ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মসত্তার ধ্যান সম্ভবপর নয়। সাধারণের সাধনার পক্ষে একটি আদর্শ প্রয়োজন এবং শ্রেষ্ঠ আদর্শের জন্য তাহাদিগকে ভগবানের অবতার-লীলার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয়। মধ্যাহ্নের জলন্ত সূর্যকে অবলোকন করা দুঃসাধ্য, কিন্তু 'সূর্যোদয়ের সূর্য' যেমন মাধুর্যে ভরপুর, তেমন সম্ভাবনায় সমুজ্জল। বিরাট ব্রহ্মসত্তাও ঠিক তেমনই ভাবে ভক্তের জন্য অবতাররূপ করুণাবিগ্রহ ধারণ করেন। ইঁহারা মানুষের জন্য এক উচ্চতর জগতের বার্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আসেন। বর্তমানে এমনই এক পুরুষের প্রভাবে শুরু হইয়াছে এক যুগান্তরের পালা এবং এই পুরুষ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ।

মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিয়া ইষ্টলাভে সমর্থ করার জন্যই ধর্মের উৎপত্তি। কিন্তু মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বস্তুকে ত্যাগ করিয়া কেবল নামরূপ লইয়াই কলহে ব্যস্ত। তার ফলস্বরূপ জগতে আজ পর্যন্ত ধর্ম লইয়া যত অনর্থ ও অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, বোধ হয় ততটা আর কিছু দ্বারা হয় নাই। পরস্পরের উপর প্রভাব-বিস্তারে একান্ত আগ্রহশীল বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে একের অন্যের প্রতি উদার সহানুভূতির অভাব এবং অসহিষ্ণুতার ভাবই ইহার কারণ। একটি কথা আছে যে 'spirituality begins where religion ends.'—অর্থাৎ যেখানে তথাকথিত ধর্মের শেষ, সেইখানে আধ্যাত্মিকতার আরম্ভ। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন তাহার দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁহার উদার সাধনজীবনে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন শাখায়—এমন কি খ্রীষ্টীয় ধর্ম ও ইসলামের সুফী-মতেও—সাধনায় সিদ্ধিলাভের ফলস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, একই পরমবস্তু 'বহুরূপীর মতো' বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ধর্মে প্রতিভাত হইয়াছেন। এইরূপে সর্বধর্মের মূলগত একত্ব আবিষ্কার করিয়া তিনি আত্ম-প্রত্যয়ের সহিত বিস্ময়বিমূঢ় জগৎসমক্ষে ঘোষণা করিলেন 'যত মত, তত পথ'—এই মহাবাণী। ধর্মের ইতিহাসে যোজিত হইল এক অভিনব অধ্যায়।

আবহমান কাল ধরিয়া মানবমনে এক ধর্ম-প্রবণতার ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে এবং এই প্রবণতাকে বলা যাইতে পারে শাশ্বত ধর্ম বা Eternal Religion। বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ এই শাশ্বত ধর্মেরই অঙ্গীভূত। এই ধর্মসহায়ক যেন ঊর্ধ্বমূল হইয়া একই পরম-বস্তুতে শিকড় সন্নিবেশ-পূর্বক অধোদেশে বহু শাখা-প্রশাখায় বিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' কথাটি এই ধর্মতরুরই পরিপোষক। কথাটি সকলের কাছেই পরিচিত, কিন্তু অনেকেই ইহা অতি সাধারণভাবে বুঝিয়া থাকেন; ইহা যে কঠোর

সাধনপ্রসূত জগৎকল্যাণের বীজমন্ত্র এ-কথা তাঁহারা উপলব্ধি করেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ধর্মকণ্টকিত পৃথিবীতে আর একটি বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ চাপাইয়া দিবার জন্য আবির্ভূত হন নাই; শাশ্বত ধর্মের ভিত্তিতে সর্ব ধর্মের সমন্বয়ে এক উদার মহাধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব এবং এই অর্থে ছিলেন নূতন ধর্মের স্থাপক। সকল ধর্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করায় সর্বধর্ম যেন তাঁহার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল; সুতরাং তিনি ছিলেন সর্বধর্ম-স্বরূপ। জগতের ইতিহাসে ইতঃপূর্বে আর কেহই এমন মহাসমন্বয়ের বাণী আচরণ করিয়া প্রচার করেন নাই; তাই তিনি ছিলেন অবতারবরিষ্ঠ। সেইজন্যই দেশিকেন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে

'স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতার-বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥'

এই মন্ত্রে জানাইয়াছেন প্রণতি। এতদ্দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত, তত পথ' এই মহা-বাক্যের তাৎপর্যই পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সমন্বয়ী ভাবধারা ধর্মজগতে ও মননরাজ্যে বিবিধ সংগ্রামশীল আদর্শবাদ ও পন্থার মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের দ্বারা তাঁহার জীবনে এক উদার সর্বজনীনতা আনিয়া দিয়া তাঁহাকে এক অপূর্ব মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীরাম-কৃষ্ণের সমন্বয়ী ভাবধারা বহুধাবিচ্ছিন্ন মানব-সমাজের ক্ষেত্রেও কার্যকর। সকল ধর্ম যেমন মূলতঃ এক, তেমন যাহাদের ভিতর দিয়া এই সকল ধর্ম অভিব্যক্তি লাভ করে, নানা বৈষম্য সত্ত্বেও সেই মানবসমূহও মূলতঃ এক। আত্মোন্নতি ও ক্রমবিকাশের ধারা সব ক্ষেত্রে এক গতিতে অগ্রসর হয় না এবং সেইজন্য প্রকৃতির রাজ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ, সেখানে একঘেয়ে সমতার স্থান নাই। কিন্তু এই যে বৈচিত্র্য, তার ধারকরূপে রহিয়াছে এক শাশ্বত সত্তা—ঠিক চলচ্চিত্রের পর্দার মতো, যার উপর প্রতি-ফলিত ঘটনাবলী দ্রুত পরিবর্তনশীল হইলেও তাহার স্বরূপের কোনই পবিবর্তন হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ী ভাবের অনুবৃত্তি-ক্রমে বহুর মধ্যে মৌলিক ঐক্যের এই যে জ্ঞান, তাহাই হইবে বিদ্বেষ ও আত্মকেন্দ্রিকতা দ্বারা বহুধা বিচ্ছিন্ন মানবজাতির মধ্যে ভাবগত ঐক্য (Emotional Integration)-সাধনের প্রধান সহায়ক।

এখানে মানবজাতির মৌলিক ঐক্য বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বিশেষ অবদানের উল্লেখ প্রয়োজন। মানবসমাজ দুইটি পক্ষপুটের উপর ভর করিয়া অগ্রসর হয়-একটি পুরুষজাতি ও একটি নারীজাতি। এই দুইটি পক্ষপুট সমবলে বলীয়ান্ না হইলে ভারসাম্য বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে এবং অগ্রগতি হয় ব্যাহত। কিন্তু আমাদের নারীজাতি অন্ততঃ ধর্মের ক্ষেত্রে ছিলেন অবহেলিত। আমাদের অবতার পুরুষগণ, এমন কি করুণাবতার ভগবান্ তথাগত এবং প্রেমাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যও নারীকে দূরে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নারীকে অধিকতর মর্যাদা দিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণও কাঞ্চনের সঙ্গে কামিনীকে বর্জন করিয়াছিলেন। কথাটি ঠিক; কিন্তু 'কামিনী' আর 'নারী' কথা দুইটি একার্থক নহে। তিনি 'কামিনী'কে অবশ্যই বর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু নারীকে মহিমময়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নারীভক্তদের কথা সুবিদিত। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে লীলা তাঁহার জীবনের এক অলৌকিক অধ্যায় ও জগতের ইতিহাসে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক

জীবনের এক অপূর্ব আদর্শ। এতদ্দ্বারা তিনি ইহাই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, নারী বিশ্বজননীরই প্রতীক। এইরূপে তিনি মানবসমাজের দুইটি পক্ষপুটের মধ্যে সাধারণ ভাবে ভাবগত সম্পর্কের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ ঐহিক বিষয়ে আচরণ সম্পর্কিত দুইটি পন্থার মধ্যে সামঞ্জস্য। এই দুই পন্থার একটির নাম নিবৃত্তিমার্গ (the way of renunciation), যার ফল নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি এবং অপরটির নাম প্রবৃত্তিমার্গ (the way of action), যার ফল অভ্যুদয় বা ঐহিক উন্নতি। মোক্ষমার্গ প্রথমটিকেই অর্থাৎ নিবৃত্তিকেই প্রাধান্য দিয়া ত্যাগের মহিমা কীর্তন করিয়াছে, স্বল্পসংখ্যক ত্যাগব্রতী মানব ব্যতীত অধিকাংশ মানুষই কামনা-বাসনায় পূর্ণ এবং প্রবৃত্তিমার্গই তাহাদের উপযুক্ত পন্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুইটি প্রবণতার যথাযথ বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা এই যে, ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক টান না থাকিলে এবং 'মন মুখ এক করিয়া' সরলভাবে না চলিলে কোন পন্থাতেই অভীষ্ট লাভ হয় না। কোন পন্থা-বিশেষের বাহ্য আড়ম্বর নয়, ঈশ্বরপ্রীতি ও তজ্জনিত আধ্যাত্মিক গুণাবলীই প্রকৃত ধর্মজীবনের পরিচায়ক। আধ্যাত্মিক প্রেরণা, শ্রদ্ধা ও সদসদ্বিচারসম্পন্ন হইয়া সংসারে থাকিয়াও 'পাঁকাল মাছের মতো' নির্লিপ্তভাবে সংসারের আবিলতারূপ কাদামাটি হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিলে শেষ পর্যন্ত প্রবৃত্তিধর্মও নিবৃত্তিধর্মের মতোই মহিমময় হইয়া উঠে এবং পরিণামে নিঃশ্রেয়সে পৌঁছাইয়া দেয়। পক্ষান্তরে নিবৃত্তিধর্মেও কেবল বিষয়কে ছাড়িলেই চলে না, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে ধরিতে হয়; ত্যাগের শূন্যতাকে গ্রহণের পূর্ণতায় ভরিয়া তুলিতে হয়।

তৃতীয়তঃ চরম সত্যবস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়। এই সম্বন্ধে দুইটি ধারণা প্রচলিত : একটি Impersonal God অর্থাৎ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের এবং অপরটি Personal God অর্থাৎ সগুণ নিরাকার বা সগুণ সাকার ভগবানের। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম সনাতন ধর্মান্তর্গত অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য। বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদও স্পষ্টতঃ না হইলেও ঐ দিকেই ইঙ্গিত করিয়া থাকে। সগুণ নিরাকার ঈশ্বর খ্রীস্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্মের উপাস্য এবং সগুণ সাকার ভগবান্ সনাতন ধর্মের অদ্বৈতবাদ ব্যতীত অপর সকল শাখারই অভীষ্ট। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা কৃচ্ছ্রসাধন 'জ্ঞানমার্গ' নামে অভিহিত, আর সগুণ নিরাকার বা সগুণ সাকার ভগবানের উপাসনা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য 'ভক্তিমার্গ' নামে পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ববর্তী অবতারপুরুষগণ এই দুইটি মতবাদের যে-কোন একটিকেই গ্রহণ ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও তজ্জনিত উপলব্ধি ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে, এই দুইটি মতবাদ চরম সত্য বস্তুর পরস্পর-নিরপেক্ষ দুইটি পৃথক্ সত্তাকে না বুঝাইয়া একই সত্তার এপিঠ ওপিঠ নির্দেশ করিয়া থাকে। তাঁহার মতে ভক্তের প্রেমভক্তির তুহিনস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া জ্ঞানীর জ্ঞানগম্য অসীমই সসীমত্ব প্রাপ্ত হন; কাজেই তত্ত্বতঃ যিনি সসীম, তিনিই অসীম। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরেও তাঁহার ভক্তিমূলক উপাসনা এবং জ্ঞানমূলক সাধনা এই কথারই যাথার্থ্য প্রমাণ করে। এই জন্যই সাধন সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ সকলের প্রতি সমান ছিল না। তাঁহার নিজেরই ভাষায় বলা যায় যে, অভিজ্ঞা জননীর ন্যায় তিনি 'যার পেটে যেমনটি সয়' তেমন পথ্যেরই ব্যবস্থা করিতেন।

তারপর ভগবৎ-কৃপা ও স্বাধীন ইচ্ছা (Divine grace and Free will) এই দুইটি আপাতবিরোধী মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য। কৃপাবাদিগণ বিশ্বাস করেন যে, ঐহিক সিদ্ধি এবং পারত্রিক মুক্তি একমাত্র ভগবৎ-কৃপার উপরই নির্ভর করে ; পক্ষান্তরে স্বাধীন ইচ্ছার শক্তিতে যাঁহারা আস্থাবান্, তাঁহারা এই দৃঢ় মত পোষণ করেন যে, ঐহিক সিদ্ধিই হউক আর পারত্রিক মুক্তিই হউক, তাহা একমাত্র স্বাধীন ইচ্ছা ও তজ্জনিত প্রচেষ্টা দ্বারাই লভ্য। কিন্তু পরস্পর-নিরপেক্ষ ভাবে এই দুইটি মতই যে ব্যর্থ এবং সাফল্যের জন্য তাহারা যে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, শ্রীরামকৃষ্ণ এ-কথা পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, রজ্জুবদ্ধ গাভী যদি তাহার গণ্ডি-বদ্ধ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে, তাহা হইলে কৃপাপরবশ প্রভু রজ্জু দীর্ঘতর করিয়া দিয়া তাহার স্বাধীনতার পরিসর বর্ধিত করিয়া দেন এবং এইরূপে ক্রমে তাহাকে বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করেন। ঠিক সেইরূপ মানুষও যদি তাহার সীমাবদ্ধ স্বাধীন ইচ্ছার যথাযথ ব্যবহার করে, তবে ভগবৎকৃপায় তাহা পরিসরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। মোট কথা, স্বাধীন ইচ্ছা বলিতে বুঝিতে হইবে—নিজ সীমিত শক্তির যথাযথ ব্যবহার, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচার নয় ; আর তার সঙ্গে থাকিবে ভগবৎকৃপার অস্তিত্বে ও অধিকর্তৃত্বে বিশ্বাস। সেই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, 'পাল তুলে দে না ; কৃপা বাতাস তো বইছেই'।

এই প্রসঙ্গে অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই অধ্যাত্মবাদ ও জনকল্যাণবাদের (Spirituality and Humanism) কথা আসিয়া পড়ে। অধ্যাত্মবাদিগণ ভগবদারাধনা ও ভগবান্ লাভকেই মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, জনকল্যাণবাদিগণ (humanists) মনে করেন যে, যুক্তি বুদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান পার্থিব-জ্ঞানের সাহায্যে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী মানবকল্যাণ সাধন ছাড়া অন্য কোন ধর্ম নাই। কিন্তু অধ্যাত্মবাদীর পূজা, অর্চনা ও স্তবস্তুতির সঙ্গে হৃদয় মন ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা-সাধনের প্রচেষ্টা না থাকিলে তাহা গোঁড়ামি ও পৌত্তলিকতায় পর্যবসিত হয়, এবং আমাদের তাহাই হইয়াছিল। পক্ষান্তরে জনকল্যাণবাদী যে যুক্তি, বুদ্ধি ও পার্থিবজ্ঞান বা অপরাবিদ্যার অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল, তাহার নিয়ন্ত্রণের জন্য যথোপযুক্ত চরিত্রবল না থাকিলে তাহা উন্মার্গগামী হইতে বাধ্য। আধ্যাত্মিকতা বা পরাবিদ্যার অনুশীলনই চরিত্রবলের উৎস। কাজেই জনকল্যাণ সাধনের প্রবৃত্তি যদি আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তাহা মানুষকে তাহার চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগে বিপথগামী করিয়া অহমিকা, স্বার্থপরতা এবং ক্ষমতালোলুপতা দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে এবং সে গ্যেটের (Goethe) ফাউস্টের (Faust) মতো মেফিস্টফেলিস (Mephistopheles)-রূপী শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় করিয়া বসে। তখন সে তাহার পার্থিব জ্ঞানরাশিকে মানবকল্যাণের পরিবর্তে মানবের অকল্যাণেই অধিকতর প্রয়োগ করিয়া থাকে। বর্তমান বিশ্বের নৈতিক আবহাওয়াই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা পাই এই দুইটি মতবাদের এক চমৎকার সামঞ্জস্য। তাঁহার মতে প্রকৃত জনহিতৈষণা তখনই সম্ভব, যখন মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে ভগবানের সর্বব্যাপিত্বে বিশ্বাস-সম্পন্ন হয় এবং ফলে তাহার প্রভুত্বব্যঞ্জক 'জীবে দয়া'র ভাব 'জীবসেবা'র ভাবে রূপান্তর লাভ করে।

তাঁহারই ভাষায় বলা যায় যে, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শের নামই প্রকৃত জনকল্যাণ-বাদ। শিবজ্ঞানে জীবসেবার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়াই তাঁহার ভাবসাধক স্বামী বিবেকানন্দ জনকল্যাণ-ব্রতে দীক্ষিত হন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা গিরিকন্দরবাসী সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া আনিয়াছে লোকালয়ে, অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে ঘটাইয়াছে জনকল্যাণ-বাদের এক বাস্তব ও কার্যকর সমন্বয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার মধ্যে সনাতন ধর্মের তথা ভারতীয় কৃষ্টির সমন্বয়ী ভাবধারা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই হিংসা-জর্জরিত ধরণীর বর্তমান সঙ্কটজনক মুহূর্তে যে তাঁহারই শিক্ষার সন্ধানী আলো বহুধাবিচ্ছিন্ন উন্মার্গগামী মানবজাতিকে সমন্বয় ও শান্তির পথে পরিচালিত করিবে, এই আশা দুরাশা নয়।

মনোদর্শন

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

দ্বৈত হতে অদ্বৈতের এক-হ'য়ে-যাওয়া লীলামুখে
আকাশ চুম্বন করে সাগরের মধুর সঙ্গীত;
জন্মমৃত্যু আবর্তনে বহুবার হারায়ে সম্বিৎ
শুক্তিতে রজত-ভ্রমে গেল দিন বেদনার বুকে।

সুষুম্নার দ্বার খুলে চিত্তাকাশে হেরি চিত্রলেখা,
অসীমের সুরে সুরে যাবে কিগো মিশে প্রাণ মম!
বর্ষণ-মুখর ক্ষণে নীড়ে-থাকা বিহঙ্গের সম
বিচ্ছিন্ন একক আমিঃ ক্ষীণ হয়ে আসে আয়ুরেখা।

সংখ্যা-গণনার সাথে জপমালা ঘুরে যায় সদা,
অন্তরের শুক্তি মোর স্বাতী হ'তে লভিল না বারি,
হৃদয়ের সিন্ধুতলে ধীরে ধীরে মুক্তা হ'ত মা গো!

করুণায় স্নাত করি কহ রামকৃষ্ণ-তত্ত্বকথা
ত্রিপাদ বিভূতি যেথা, কবে সেথা যাব বিশ্ব ছাড়ি?
মাগি তব সমীপতা, কৃপা ক'রে কাছে মোরে ডাকো।

কবি বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে 'কবি' শব্দটির দুই অর্থে প্রয়োগ পাওয়া যায়। প্রথম অর্থ - ক্রান্তদর্শী, দ্রষ্টা। দ্বিতীয় অর্থ—কাব্য প্রতিভা-যুক্ত পুরুষ, রসস্রষ্টা। এই দ্বিবিধ অর্থেই কবিরূপে স্বামীজীর প্রতিভার বিশ্লেষণ ও নির্ণয়ে তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের দুইটি দিক সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইতে পারে।

আমাদের দেশে দ্রষ্টা বা জ্ঞানী বলিতে যে-জ্ঞানকে বুঝায়, সে জ্ঞান (কবিত্ব) উপলব্ধি-প্রসূত। এই দৃষ্টি বা উপলব্ধির কথা দার্শনিক-গণ নানাভাবে ব্যাখ্যাত ও লক্ষিত করিয়াছেন। বৈদিক মন্ত্রে ব্রহ্মের উপলব্ধিপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—'হৃদা মনীষা মনসাভিক্লিপ্তঃ'। এই বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মের উপলব্ধি বা অবগতি এই তিনটি উপায়ের দ্বারা বা তিন ভাবে হইয়া থাকে। 'হৃদা', 'মনীষা' ও 'মনসা'—এই পদগুলি ব্যাখ্যায় কিছু মতভেদ থাকিলেও ইহা সুস্পষ্ট যে, এখানে তিনটি বিভিন্ন শব্দ দ্বারা একই পদার্থ কথিত হয় নাই, তিনটি পদার্থই কথিত হইয়াছে। এই তিনটি পদার্থ কি, যাহা দ্বারা ব্রহ্মের অভিক্লিপ্তি বা অবগতি হইয়া থাকে? 'হৃদয়ে'র দ্বারা 'মনীষে'র দ্বারা ও 'মনস্'-এর দ্বারা। ইহা নিঃসংশয় যে 'হৃৎ', 'মনীষ্' ও 'মনস্' এই তিনটিতে তিন বস্তু বা তিনটি করণ অভিহিত হইয়াছে—যাহা দ্বারা পূর্ণরূপে ব্রহ্মোপলব্ধি নিষ্পন্ন হয়। 'হৃৎ' বলিতে যদি ভাবাবেগ ও অনুভূতিপ্রধান অন্তঃকরণ হৃদয়কে বুঝায়, তবে 'মনীষ্' ও 'মনস্' এই দুইটি শব্দে যথাক্রমে চিন্তা ও বিচারশক্তি-প্রধান অন্তঃকরণ 'বুদ্ধি', ও ইচ্ছাশক্তি-প্রধান অন্তঃকরণ 'মন'—যাহা দ্বারা আমরা বিচার, চিন্তা ও ভাবাবেগকে কার্যে ও জীবনে পরিণত করি- এই দুইটিকেই বুঝিতে হইবে। যে কোন সত্য বা তত্ত্বকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে তাহাকে চিন্তা ও বিচারের দ্বারা, সুগভীর ভাব বা অনুরাগের দ্বারা এবং ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে চরিত্র ও জীবনকে সেই চিন্তা ও ভাবের অনুরূপ করিয়া করিতে হইবে। তবেই পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব। যে-কোন একটির অভাব বা ন্যূনতা থাকিলেই 'করামলকবৎ' উপলব্ধিরও ন্যূনতা থাকিয়া যায়। সহজ সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলা যায়—চিন্তা দ্বারা বুঝা, দরদ দিয়া বুঝা এবং চরিত্র ও জীবন দিয়া বুঝিলেই পূর্ণরূপে কোন সত্য ও তত্ত্বকে বুঝা যায়। নতুবা শুধু চিন্তা ও বিচারে বুঝিলে বা শুধু ভাবাবেগে বুঝিলে, সেই সত্যকে চরিত্রে ও জীবনে পরিণত করিতে না পারিলে তাহাকে পূর্ণরূপে বুঝা হয় না। এমন কি কোন সত্যকে শুধু চরিত্র ও জীবনে প্রকাশ করিলেও পূর্ণরূপে উপলব্ধি হয় না, যদি তাহা চিন্তা ও বিচারে প্রতিষ্ঠিত না হয়, যদি অনুরাগযুক্ত ভাবানুভূতিতে ধরা না দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জীবনে যে-সকল সত্য ও তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা তিনি চিন্তা ও বিচারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হৃদয়ের গভীরতম দরদ দিয়া সেই চিন্তা ও ভাবকে জীবনে পরিণত করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার উপলব্ধি এত সম্যক্, এত যথার্থ, এত শক্তিমতী। তাই তিনি ছিলেন ক্রান্তদর্শী (prophet), জ্ঞানী ও

দ্রষ্টা (seer)—এই অর্থে তিনি প্রাচীন আচার্যগণের ন্যায় ও ঋষিগণের ন্যায় কবি। বিবেকানন্দের এই দ্রষ্টৃত্বরূপ কবিত্ব সর্বজনবিদিত। এই অর্থে কবিত্ব তাঁহার ব্যক্তিত্বের একটি মুখ্য দিক। যাঁহারা বিবেকানন্দের বাণী ও জীবনী অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—মানবের তথা ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টি কত গভীর, কত সত্য ছিল। 'বর্তমান ভারত' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে তিনি মানবজাতির রাষ্ট্রশাসনের চক্র-পরিবর্তনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে পর্যায়ক্রমে ব্রাহ্মণশাসন, ক্ষত্রিয়শাসন, বৈশ্যশাসন ও শূদ্রশাসনের যে অপরিহার্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও কত যথাযথ। আবার রাশিয়ার বলশেভিক জাগরণের বহু পূর্বে জারের রাজত্বকালেই রাশিয়ায় বা চীনদেশে শূদ্রজাগরণের যে ইঙ্গিত তিনি করিয়াছিলেন, তাহা ভবিষ্যতে কিরূপ সত্যে পরিণত হইয়াছিল! মানসচক্ষে দেখিয়াছিলেন জার্মানিতে রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য। তাঁহার সেই দর্শন অচিরেই সত্যে পরিণত হইয়াছিল। তাই তিনি দ্রষ্টা—কবি।

একবার বিদেশ হইতে ভারত প্রত্যাবর্তনকালে যখন তাঁহার অর্ণবযান ক্রীট দ্বীপের নিকট দিয়া যাইতেছিল, গভীর নিশীথে স্বামীজী বিস্ময়কর স্বপ্নদর্শনে নিদ্রোত্থিত হইয়া জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমরা কোথায়?' স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন—এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতেছেন যে, এই দ্বীপভূমিতেই ভারতের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তারের বহু তথ্য নিহিত রহিয়াছে। পরবর্তীকালে ক্রীট দ্বীপে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে তাঁহার সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত সমর্থিত হইয়াছিল।

আবার যখন তিনি জলদমন্দ্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন, আগামী পঞ্চাশ বৎসর দেশমাতৃকাই আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হউন, তখন সম্ভবতঃ পঞ্চাশ বৎসর অন্তে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা-সংঘটন মানস-নয়নে দর্শন করিয়াই তিনি ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বাণী সার্থকতা লাভ করিয়া কতখানি সত্য হইয়াছিল, বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর হইতেই স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ ও তৎপরবর্তী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষার চরম প্রভাবের যুগে তিনি যে নির্ভীকভাবে ও নিঃসংশয়ে বলিয়াছিলেন, 'সংস্কৃত ভাষাই ভারতের ভাষা-সমস্যার সমাধান' সে-কথার গভীরতা ও সত্যতা আজ সকলে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও শীঘ্রই সেদিন আসিবে, যখন সকলকে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সংস্কারকগণ যে সংস্কারের নামে সংহারই বেশী করিয়াছেন, প্রকৃত সংস্কারের উপায় তিরস্কার বা নিন্দা নয়—শিক্ষা ও সংগঠন। জাতির বৈশিষ্ট্য ও মূল ভিত্তিকে রক্ষা করিয়াই সর্বপ্রকার সংস্কার বা পরিবর্তন করিতে হইবে, নতুবা শুধু নিয়ম-পরিবর্তনের দ্বারা কোন স্থায়ী সুফল হইবার নয়, একটা অশুভ দূর হইবে তো আর একটা অশুভের সৃষ্টি হইবে—বিবেকানন্দের এই-সকল সুচিন্তিত বাণী তাঁহার দ্রষ্টৃত্বরূপ কবিত্বেরই প্রমাণ। তাঁহার দ্রষ্টৃত্বের বা ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টির এইরূপ বহু নিদর্শন রহিয়াছে, স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে যাহার সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নয়।

অনন্তর বিবেকানন্দের কাব্যপ্রতিভারূপ কবিত্বের—তাঁহার রসস্রষ্টৃত্বরূপ কবিত্বেরই আলোচনা করিব। ইহাই এই লেখার প্রধান আলোচ্য বিষয়। আলোচনার পূর্বে এ-কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, বিবেকানন্দের মুখ্য আত্মপ্রকাশ রসস্রষ্টা কবিরূপে হয় নাই। তাঁহার আত্মপ্রকাশ মুখ্যরূপে হইয়াছিল ভারত-প্রেমিক, মানবপ্রেমিক ও সত্যপ্রেমিকরূপে। কবিত্ব ছিল তাঁহার একটি অন্তর্নিহিত স্বভাব, যাহার কিয়দংশ প্রকাশ পাইয়াছিল তাঁহার নিভৃত অবসরকালে লেখা কয়েকটি কবিতায়, এবং তাঁহার গদ্যাত্মক ভাষণে ও রচনায়। স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি রচনায় যে গভীর ভাব ছন্দ ও রসের প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার কবিত্বের দিকটিও মনে না আসিয়া পারে না। তাঁহার জীবনের ইহা মুখ্য দিক না হইলেও তাঁহার কবিত্বের—কাব্য-প্রতিভার আলোচনা না করিলে তাঁহার জীবনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হইল বলিয়া মনে করা যায় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার পূর্বতন উৎকৃষ্ট কবিতা-সংগ্রহে বিবেকানন্দের কবিতাংশ উদ্ধৃত না করিয়া পারেন নাই।

আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি ছিলেন ত্যাগী সন্ন্যাসী। যে বিশেষ ভাব ও রস জগতের প্রসিদ্ধ কবিগণের প্রধান উপজীব্য, সেই রতি ও শৃঙ্গার রসের অস্তিত্ব ও আস্বাদন তাঁহার রচনায় আমরা আশা করিতে পারি না। সুতরাং তাঁহার রচনায় বা কবিতায় আমাদের প্রধানতঃ শান্তরস বা ভক্তিরস, এবং অঙ্গরস হিসাবে বীররস, করুণরস ও অদ্ভুতরস আস্বাদন করিয়াই তৃপ্ত থাকিতে হইবে। যখন তিনি বলিয়াছেন—'জাগো বীর। ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?' শান্তরস ইহার অঙ্গী রস (প্রধান) হইলেও অঙ্গরসরূপে বীররসও পরিস্ফুট। আর যখন বলিয়াছেন,

You sent me out in the dark to play,
and wore a frightful mask.
Then hope departed, terror came and
play became a task.
Tossed to and fro, from wave to wave
in the seething surging sea
Of passions strong and sorrows deep
grief is, and joy to be. *

দুয়ার খুলিয়া দাও মাতঃ! হেরি পথ আলোক-ছটায়—
খেলা মোর হইয়াছে শেষ—
অতি শ্রান্ত পুত্র মাগো আকুল আকাঙ্ক্ষা হৃদে
গৃহে আজি করিব প্রবেশ।
ঘনঘোর অন্ধকার মাঝে খেলিতে ছাড়িয়ে দিয়ে
বিভীষিকা দেখাও আমারে,
আশা মোর হ'ল আজি শেষ, ভয় আসি দেখা দিল
খেলার আনন্দ গেল দূরে।
তপ্তস্ফীত সাগর-সমান গভীর দুখের মাঝে
রিপুদল প্রবল তাড়নে
তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হেথা সেথা কত কষ্ট পাই মাগো
ভবিষ্যৎ সুখের ছলনে।

—তখন মুখ্য ভক্তিরসের অঙ্গরূপে করুণ ও শান্তরসও স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইরূপে বিবেকানন্দের কবিতায় ও রচনায় আমরা আস্বাদন করিব প্রধানতঃ শান্তরস ও ভক্তিরস, এবং গৌণরূপে বীররস, করুণরস ও অদ্ভুতরস (বিস্ময়)-যাহা বস্তুতই 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ'।

আমরা জানি, বিবেকানন্দ তাঁর নিভৃত অবকাশে আপন মনে কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন পুস্তকে প্রকাশিত করিবার জন্য নয়, হৃদয়ের উদ্বেল ভাবরাশিকে একটু বাহিরে আনিয়া হৃদয়কে শান্ত করিবার জন্য। তন্মধ্যে কয়েকটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত স্তোত্র কবিতা-সম্পূর্ণ ভক্তিরসাত্মক। অপর কয়েকটি বঙ্গভাষায় রচিত—শান্তরসাত্মক ও

---

* My play is done. (বীরবাণী)

ভক্তিরসাত্মক। আরও অধিক-সংখ্যক আমরা পাই ইংরেজীতে রচিত ছোট বড় কবিতা। প্রায় সকল কবিতাই অতি উচ্চ ভাবের প্রকাশক, এবং সহৃদয় পাঠককে অতি সার্থক-রূপে কোথাও শুদ্ধ শান্তরস, কোথাও বা করুণরস-পরিপুষ্ট শান্তরস আস্বাদন করায়।

বিবেকানন্দ তথাকথিত 'প্রকৃতির কবি' নন, তিনি জীবনের কবি, তথা অন্তর্জীবনের কবি। তাই তাঁহার অন্তর্জীবনের কথা, অন্তর্জীবনের ব্যথা—অন্তর্জীবনের দক্ষিণ ও রুদ্ররূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রতিটি কবিতায়। তিনি দার্শনিক কবি। জগৎকে ও জীবনকে তিনি সমগ্ররূপে দেখিয়াছেন—তাই তিনি দার্শনিক, আবার ভাবুক মনের—অধ্যাত্ম-সাধকের মনের অনেক অস্ফুট অব্যক্ত ব্যথা, ভাব ও চিন্তাকে তিনি ভাষা দিয়াছেন ও রসে পরিণত করিয়াছেন—তাই তিনি কবি। এই কবিত্ব তাঁহার প্রকাশ পাইয়াছে শুধু তাঁহার কবিতায় নয়, গদ্যরচনায় ও ভাষণেও। অতি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাতেও তাঁহার কাব্যপ্রতিভা তাঁহার রচনাকে রসযুক্ত করিয়াছে—হৃদয়গ্রাহী করিয়াছে। এমন কি 'মায়াবাদ বিষয়ে তাঁহার দুরূহ দার্শনিক রচনাও (লণ্ডন ভাষণ) কবিত্বের সংস্পর্শে মর্মস্পর্শী ও সুখস্বাদ্য হইয়া উঠিয়াছে। আবার 'সন্ন্যাসীর গীতি'র ন্যায় উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের রচনাও শান্তরসোত্তীর্ণ সুন্দর কবিতায় স্থানলাভ করিয়াছে। কবিতায় এইরূপ দুরূহ তত্ত্বে এইরূপ অনবদ্য রসসৃষ্টি বিষয়ে বিবেকানন্দই পথিকৃৎ—ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

কবিমাত্রেই তাঁহার পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ কবিগণের সঞ্চিত কাব্যরাশির উত্তরাধিকার-সূত্রে তাহাদের দ্বারা ন্যূনাধিক প্রভাবান্বিত ও পরিপুষ্ট। যেমন রবীন্দ্রনাথও তাঁর পূর্ববর্তী কালিদাস, বৈষ্ণবকবিগণ ও বিহারীলালের নিকট, এবং রবীন্দ্রনাথের যুগের কবি-মাত্রেই ন্যূনাধিক পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের ভাব, ভাষা, ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবান্বিত। বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী হইলেও রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী—রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কবি। রবীন্দ্রনাথের বিরাট অবদানের উত্তরাধিকারের সুযোগ তিনি প্রাপ্ত হন নাই তিনি পাইয়াছিলেন বিশেষ করিয়া ভাবসম্পদে উপনিষদের ঋষি কবিগণকে, আর ভাষায় ও ছন্দে এ-যুগের মাইকেল ও মিলটনকে, যাঁহাদের ভাব, ভাষা ও ছন্দের প্রভাব বিবেকানন্দের লেখায় সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তবে দীর্ঘ অমিত্রাক্ষর ছন্দ—যাহা বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটিতে দৃষ্ট হয়—তাহা ছন্দোরাজ্যে বিবেকানন্দের নূতন সৃষ্টি। মাইকেল ও মিলটনের-উভয়েরই ওজস্বিনী ভাষা ও ছন্দ শক্তিসাধক বিবেকানন্দকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। আবার সর্বপ্রকারের অসারতা, মিথ্যা ও অধঃপতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বীর বিবেকানন্দের মন ঐ উভয় কবির কাব্যেই পাইয়াছিল অনেকখানি নিজ বিপ্লবী মনোভাবের সমর্থন—অনেকখানি অনুরূপ স্পন্দন। যদিও মাইকেল ও মিলটনের কাব্যের বিদ্রোহী মনের ধারা ও লক্ষ্য হইতে বিবেকানন্দের বিপ্লবী মনের ধারা ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, তথাপি পূর্ববর্তী কবিদ্বয় দুইটি (Satan ও রাবণের) বিদ্রোহী মনে যে তেজ শৌর্যের সমাবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বিবেকানন্দের তেজস্বী কবিমনকে ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়া প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। তাই বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনা সম্পূর্ণ ভাবমূলক (Positive) ও গঠনমূলক (Constructive) হইলেও তাহার মধ্যেই

মাঝে মাঝে বাজিয়া উঠিয়াছে একটি বিপ্লবের সুর একটি আমূল পরিবর্তনের প্রেরণা।

'প্রাণসাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান্?
দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান
স্বার্থ স্বার্থ সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আগার?
হও জড়প্রায় অতিনীচ মুখে মধু অন্তরে গরল—,
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান। *

মৃত্যু ও দুঃখময় এই জীবনে সুখের লালসা একটা মহাভ্রান্তি! এই স্বার্থদ্বন্দ্বময় সংসারে শান্তিলাভের আশাও বৃথা। তাই সতত নিজের সুখের অনুসন্ধানে জীবনকে ব্যাপৃত রাখিবার বৃথা চেষ্টা হইতে, স্বার্থময় সাংসারিক জীবনে শান্তি বা প্রতিষ্ঠালাভের বৃথা চেষ্টা হইতে বিবেকানন্দ আমাদের জীবন ও মনকে অন্যত্র—প্রেমের পথে আহ্বান করিতেছেন—

'স্বার্থমলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ?
কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও,
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল!
অনন্তের তুমি অধিকারী,...'

স্বার্থদ্বন্দ্বময় সত্যহীন নীচতাপূর্ণ সাংসারিক জীবনের বাহিরে যে জীবন, তাহা স্বার্থহীন প্রেমের জীবন। 'দাও, আর ফিরে নাহি চাও..... '

এই যে আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাহিরে আসিয়া, 'স্বার্থমলিনতা অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জন' করিয়া প্রেমের জীবন—অকুণ্ঠ দানের জীবন, ইহাই তো প্রকৃত জীবন। ইহা দ্বারাই সম্ভব প্রেমময় ঈশ্বরের উপাসনা ও তাঁহার প্রেমস্বরূপের উপলব্ধি, নিজেরও পূর্ণতার উপলব্ধি। (ক্রমশঃ)

* সখার প্রতি (বীরবাণী)

'আমি' যেমন বিশ্বপ্রকৃতির চেতন আত্মা, ঈশ্বর তেমনই আমার আত্মারও আত্মা—পরমাত্মা। তুমিই হচ্ছ সেই কেন্দ্র—যার মাধ্যমে তুমি বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখছ, আবার তার মধ্যেই রয়েছ। জগৎ জীব আর ঈশ্বর, এই নিয়েই একটি সত্তা—নিখিল বিশ্ব। সুতরাং এগুলি মিলে একটি একক, তথাপি একই-কালে এগুলি আবার পৃথক্‌ও বটে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

বুদ্ধসেবক আনন্দ

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী

ভগবান তথাগত জেতবনে আর্য ভিক্ষু-সঙ্ঘের অধিবেশনে শিষ্য আনন্দকে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ে ভিক্ষুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করেন—'পাণ্ডিত্য, অপ্রমাদ, ভ্রমণ-সামর্থ্য, ধৃতি এবং সেবাপরায়ণতায় আনন্দ অদ্বিতীয়।' (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ১।২৪)

'থের-গাথা' গ্রন্থে আনন্দ-সম্বন্ধে এরূপ একটি প্রশস্তি আছে :

বহুস্সুতো ধম্মধরো কোসারক্খো মহেসিনো।
চক্খু সব্বস্স লোকস্স পূজনীয়ো
বহুস্সুতো॥ (১০৩১)

—যিনি বহুশ্রুত, ধর্মধর, মহর্ষি বুদ্ধের ধর্ম-কোষের রক্ষক, সর্বলোকের চক্ষুস্বরূপ সেই আনন্দ সকলের পূজনীয়।

আনন্দ ছিলেন গৌতম বুদ্ধের পিতৃব্য-পুত্র। বৌদ্ধশাস্ত্রে কথিত আছে, ইনি ও বুদ্ধ একই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম-গ্রহণে জ্ঞাতিবর্গের অন্তরে বিশেষ আনন্দ উৎপন্ন হওয়ায় নাম রাখা হয় 'আনন্দ'।

গৌতম বুদ্ধ সম্বোধিলাভ ও ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া যখন কপিলাবস্তুতে উপস্থিত হন, সেই সময় ভদ্রিক, অনুরুদ্ধ, ভৃগু, কিম্বিল ও দেবদত্ত প্রভৃতি শাক্য রাজকুমারগণের সহিত আনন্দ বুদ্ধদেবের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধত্ব-লাভের পর বিশবৎসর পর্যন্ত গৌতম-বুদ্ধের নির্দিষ্ট সেবক কেহ ছিলেন না। ভিক্ষু নাগসমাল, নাগিত, উপবাণ, সুনক্ষত্ত, চুন্দ, সাগত ও মেঘিয়া প্রভৃতি ভিক্ষুগণ একের পর আর তাঁহার সেবা করিতেন বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ সেবক পরিবর্তনের দ্বারা সেবাকার্য সুষ্ঠুরূপে চলিত না। শাস্তা এই সময় ৫৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়া একজন স্থায়ী সেবকের প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। তিনি একদা মূলগন্ধ-কুটিরে ভিক্ষুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, সেই সময় তাহাদিগকে জানাইলেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন আমার একজন স্থায়ী সেবকের প্রয়োজন।'

সারিপুত্র, মোগ্গলায়ন প্রভৃতি প্রধান শিষ্যগণ একে একে উঠিয়া স্থায়ী সেবকের পদ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু বুদ্ধদেব কাহাকেও অনুমতি দিলেন না। আনন্দ নীরবে এক কোণে বসিয়া ছিলেন। তিনি প্রার্থী হন নাই। ভিক্ষুগণ আনন্দকে ঐ পদের জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি কেন যাচ্ঞা করিয়া সেবক হইতে যাইব? শাস্তা কি তাঁহার উপযুক্ত সেবক বাছিয়া নিতে জানেন না?' তখন তথাগত শিষ্যগণকে বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, আনন্দকে পীড়াপীড়ি করিবার প্রয়োজন নাই। সে নিজে বুঝিয়াই আমার সেবা করিবে।'

তখন আনন্দ উঠিয়া প্রার্থনা জানাইলেন, যদি ভগবান আমাকে নিম্নোক্ত আটটি বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি ভগবানের চিরসেবক হইতে পারি : (১) যদি ভগবান স্বীয় লব্ধ চীবরবস্ত্র আমাকে না দেন, (২) স্বীয় লব্ধ পিণ্ড (খাদ্যসামগ্রী) আমাকে না দেন, (৩) একই গন্ধকুটীতে তাঁহার সহিত থাকিতে না দেন, (৪) তাঁহার নিমন্ত্রণে আমাকে সঙ্গে লইয়া না যান।

আনন্দের উক্ত শর্তগুলি আরোপের উদ্দেশ্য এই যে, নতুবা লোকে মনে করিবে, তিনি ঐ সমস্তের লোভেই বুদ্ধদেবের সেবক হইয়াছেন।

অপরাপর শর্তগুলি এই : (৫) যদি ভগবান আমার গৃহীত নিমন্ত্রণে গমন করেন, (৬) কোন দূরদেশাগত ব্যক্তি বুদ্ধের দর্শনার্থী হইলে যদি আমি যখন তখন দর্শন করাইতে পারি, (৭) আমার কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলেই যদি আমি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইতে পারি এবং (৮) আমার অনুপস্থিতিতে বুদ্ধ যে-সকল ধর্মোপদেশ দিবেন, তাহা যদি আমাকে পুনরায় বলেন, তাহা হইলে আমি ভগবানের নিত্যসেবক হইতে পারি।

শেষোক্ত চারিটি শর্ত আরোপের পিছনে আনন্দের এইরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, এই সব অধিকার না থাকিলে লোকে তাহাকে সাধারণ ভৃত্যমাত্র মনে করিবে, যাহার নিজস্ব মর্যাদা বা অধিকার নাই এবং যে বুদ্ধদেবের নিত্যসঙ্গী হইয়াও তদীয় উপদেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ।

ভগবান তথাগত সানন্দে তাঁহাকে উক্ত আটটি বর প্রদান করিলেন এবং আনন্দ তখন হইতে বুদ্ধদেবের নিত্যসেবক পদ লাভ করিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, বহু বহু পূর্বজন্ম হইতে আনন্দ তথাগতের নিত্য সেবার অধিকার লাভের জন্য তপস্যা করিয়া আসিতেছিলেন। পদ্মোত্তর বুদ্ধের কল্পে হংসবতী নগরের রাজকুমার সুমন ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত পদ্মোত্তর-নামক বুদ্ধ ও তদীয় ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া পদ্মোত্তর সুমনকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি ভাবী বুদ্ধের প্রধান সেবক হইবার জন্য বর চাহিলেন। পদ্মোত্তর তাঁহাকে বর দিলেন যে, গৌতম বুদ্ধের সময় সুমন তাঁহার প্রধান সেবকের অধিকার লাভ করিবেন। তৎপর বহু জন্ম-জন্মান্তর পরিভ্রমণ করিতে করিতে সুমন সাধনার পূর্ণতাবিধানে সচেষ্ট হন এবং অবশেষে গৌতম বোধিসত্ত্বের সহিত তুষিত স্বর্গে একত্র বাস করেন। তথা হইতে চ্যুত হইয়া বোধিসত্ত্ব শাক্য-বংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ গৌতমরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং সুমন শুদ্ধোদনের অন্যতম ভ্রাতা অমিতোদনের (মতান্তরে শুক্লোদনের) পুত্র আনন্দরূপে একই দিনে ভূমিষ্ঠ হন।

গৌতম বুদ্ধের নিত্য সেবকপদের দুর্লভ অধিকার লাভ করিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত তাহা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ বুদ্ধদেবের ব্যবহারের জন্য দ্বিবিধ জল (উষ্ণোদক ও শীতোদক) এবং ত্রিবিধ দন্তধাবন যোগাইতেন, চরণযুগল প্রক্ষালন করিয়া দিতেন, পৃষ্ঠ পরিকর্ম করিতেন। এবং গন্ধকুটীবিহার সম্মার্জন করিতেন। কোন্ সময় শাস্তার কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া যথাস্থানে যথাকালে রাখিয়া দিতেন। দিবসে নিকটে অবস্থান করিতেন এবং রাত্রিকালে গন্ধকুটীরের চতুর্দিকে দণ্ড ও প্রদীপ হস্তে নয়বার প্রদক্ষিণ করিতেন। ভগবান্ যখন ডাকিবেন, তখনই যেন উপস্থিত হইতে পারেন এবং যাহাতে তন্দ্রাভিভূত হইয়া না পড়েন, সেজন্য পরিক্রমা করিতেন।

শাস্তা ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরি-নির্বাণলাভ করেন। আনন্দ এতাবৎকাল অতন্দ্রিতভাবে যেরূপ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত তথাগতের সেবা পরিচর্যা করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। পরিনির্বাণ-শয্যায়

শাস্তিত স্বয়ং বুদ্ধদেব আনন্দের গুরুসেবার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন :

দীঘরত্তং খো তে আনন্দ তথাগতো পচ্চুপট্ঠিতো মেত্তেন কায়কম্মেন হিতেন সুখেন অদ্বয়েন অপ্পমাণেন, মেত্তেন বচীকম্মেন হিতেন সুখেন অদ্বয়েন অপ্পমাণেন, মেত্তেন মনোকম্মেন হিতেন সুখেন অদ্বয়েন অপ্পমাণেন। কতপুঞ্ঞো'সি ত্বং আনন্দ। পধানং অনুযুক্তং, খিপ্পং হোহিসি অনাসবো'তি। (মহাপরিনিব্বাণসুত্তং, ৫।১৪)

—আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল আমার নিকটে অবস্থান করিয়াছ, দীর্ঘকাল তুমি প্রেমপূর্ণ হিতকর সুখকর দ্বিধাভাবরহিত অপরিমেয় কায়িক কর্মদ্বারা, বাচনিক কর্মদ্বারা ও মানসিক কর্মদ্বারা আমার পরিচর্যা করিয়াছ। আনন্দ, তুমি কৃতপুণ্য, সাধনে একনিষ্ঠ হও, তুমি অচিরে আশ্রবসমূহ হইতে মুক্ত হইবে (অর্থাৎ অর্হত্ত্ব লাভ করিবে।

আনন্দ দীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল কিরূপ একাগ্রতার সহিত কায়মনোবাক্যে ভগবান্ তথাগতের সেবা করিয়াছিলেন, স্বরচিত তিনটি গাথায় তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন :

পন্নবীসতি-বস্সানি ভগবন্তং উপট্ঠহিং।
মেত্তেন কায়কম্মেন ছায়া'ব অনুপায়িনী॥
(থেরগাথা, ১০৪১)

—আমি পঞ্চবিংশতি বর্ষযাবৎ মৈত্রীপূর্ণ কায়িক কর্মদ্বারা ভগবানের সেবা করিয়াছি এবং ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিয়াছি।

পন্ন-বীসতি বস্সানি ভগবন্তং উপট্ঠহিং।
মেত্তেন বচীকম্মেন ছায়া'ব অনুপায়িনী॥
(—১০৪২)

—আমি পঞ্চবিংশতি বর্ষযাবৎ মৈত্রীপূর্ণ বাচিক কর্মদ্বারা ভগবানের সেবা করিয়াছি এবং ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিয়াছি।

পন্ন-বীসতি-বস্সানি ভগবন্তং উপট্ঠহিং।
মেত্তেন মনোকম্মেন ছায়া'ব অনুপায়িনী॥
(—১০৪৩)

—আমি পঞ্চবিংশতি বর্ষযাবৎ মৈত্রীপূর্ণ মানস কর্মদ্বারা ভগবানের সেবা করিয়াছি এবং ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিয়াছি।

উক্ত প্রকারে গুরুসেবার ফলে আনন্দ বিমল চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া 'কাম-সংজ্ঞা' (Sensual consciousness) ও সর্ববিধ 'দোষ-সংজ্ঞা' (hostile consciousness) হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

পন্ন-বীসতি-বস্সানি সেক্খভূতস্স মে সতো।
ন কাম-সঞ্ঞা উপ্পজ্জি পস্স ধম্ম সুধম্মতং॥
পন্ন-বীসতি-বস্সানি সেক্খভূতস্স মে সতো।
ন দোষ-সঞ্ঞা উপ্পজ্জি পস্স ধম্ম সুধম্মতং॥
(—১০৩৯-৪০)

—আমি শিষ্য অবস্থায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্যন্ত ছিলাম, কোন দিন আমার 'কাম-সংজ্ঞা' উৎপন্ন হয় নাই ; বুদ্ধ-দেশিত ধর্মের মহাপ্রভাব কিরূপ দেখ। আমি শিষ্য অবস্থায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্যন্ত ছিলাম, কদাপি আমার 'দোষ-সংজ্ঞা উৎপন্ন হয় নাই ; বুদ্ধ-দেশিত ধর্মের মহাপ্রভাব কিরূপ দেখ।

ভগবান্ বুদ্ধের তিরোধানের অল্পকাল পরেই আনন্দ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া ধন্য হন। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ আনন্দ বিমুক্তিরস সম্ভোগ করিয়া এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন :

খীণাসবো বিসঞ্ঞুত্তো সঙ্গাতীতো সুনিব্বুতো।
ধারেতি অন্তিমং দেহং জাতিমরণপারগূ॥
(—১০২২)

—এইক্ষণ আনন্দ ক্ষীণাশ্রব ও বন্ধনমুক্ত হইলেন, সকল প্রকার আসক্তি অতিক্রম করিয়া তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। এইবার তিনি জন্মমৃত্যুর পারে গমন করিয়া অন্তিম দেহ ধারণ করিলেন।

বুদ্ধদেব ও স্বামীজী

ব্রহ্মচারিণী অনীতা

বর্ষে বর্ষে শুভ বৈশাখ মাস আমাদের জন্য দুটি পবিত্র লগ্ন বহন ক'রে আনে। শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণচন্দ্রের মতো জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা নিয়ে এসেছিলেন একদিন ভগবান বুদ্ধ, পূর্ণচন্দ্রেরই মতো স্নিগ্ধ ও দীপ্তিমান্! আবার এই বৈশাখ মাসেই আবির্ভূত হয়েছিলেন জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য—রুদ্র বৈশাখের মধ্যাহ্ন-ভাস্করের মতো প্রখর তেজোদীপ্ত। একজন মানব-হৃদয় জয় করলেন তাঁর করুণা দিয়ে—সমস্ত ভারত তথা জগদ্‌বাসী তাঁর বিশাল হৃদয়ের কাছে তাদের ক্ষুদ্র অহং ও অভিমান বলি দিয়ে তাঁর শরণ গ্রহণ করলে। আর একজনের প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের কাছে মানুষের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও স্বল্প জ্ঞান নিঃশেষে পরাভূত হ'ল। যেন জ্ঞানের অসি দিয়ে তিনি তাদের অহমিকাপূর্ণ অজ্ঞানকে ছিন্ন ক'রে দিগ্বিজয়ী হলেন।

ভগবান বুদ্ধের মতে মানুষ তাঁর বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য ক্ষুদ্র আমিত্বকে ছাড়তে পারে না বলেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ক'রে দুঃখ ভোগ করে। এই ক্ষুদ্র স্বার্থ ও আমিত্বকে বিসর্জন দেবার জন্য প্রয়োজন আত্মসুখ-ত্যাগ। এমন কি একটি ক্ষুদ্র জীবের সেবার জন্যও স্বীয় স্বার্থ-বিসর্জনের প্রস্তুতি। সিংহশাবকের মতো বাসনা-জাল ছিন্ন ক'রে একমাত্র নির্বাণ বা মুক্তিলাভের প্রচেষ্টাই মানবকে জাগতিক ত্রিবিধ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করতে পারে। মানব-জগতে বুদ্ধের দিগ্বিজয় দ্রুত ও ব্যাপক, কারণ বুদ্ধের আবেদন প্রধানতঃ হৃদয়ের কাছে। কিন্তু তাঁর প্রচারিত ধর্মমতে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র আবিলতা প্রবেশ করেছিল, কারণ তাঁর উদার ও বিশাল হৃদয় অধিকারী বিচার করেনি।

শঙ্করের মতে এই জগৎ মনঃকল্পিত ভ্রান্তি-মাত্র! এর বাস্তব সত্তা নেই। জীব জগৎ বা ইতর প্রাণী ব'লে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকতে পারে না—কারণ এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুই নেই। তাই জাগতিক সুখ-দুঃখকে আপেক্ষিক জেনে তিনি তার উল্লেখ করলেন না। জীব ব্রহ্মস্বরূপ—তাই বিচারের পথে, জ্ঞানের পথে স্ব-স্বরূপ উপলব্ধিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। জ্ঞান-মার্গের সাধনায় ব্রহ্মোপলব্ধির পথে তিনি 'অধিকারী'র একটি বিশেষ সংজ্ঞা দিলেন।

শঙ্করাচার্যের ন্যূনাধিক এক হাজার বছর পরে জগৎ আর একবার পবিত্র হ'ল যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের পাদস্পর্শে! অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহ স্বামীজীও আর একবার ভারতবর্ষকে ঐক্যের পথ দেখালেন সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম কোন পথ বর্জন না ক'রে, ধর্মের কোন মতবাদ খণ্ডন না ক'রে, বিভিন্ন মতবাদকে বিভিন্ন পথ ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়ে একাত্মানুভূতিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য ব'লে তিনি নির্দেশ করলেন। স্বামী বিবেকানন্দে শঙ্করের জ্ঞান ও বুদ্ধের হৃদয়বত্তার একত্র সমাবেশ হয়েছিল। শঙ্করের অদ্বৈত-বাদকে তিনি বুদ্ধের হৃদয় নিয়ে জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে পৌঁছে দিলেন সর্বসাধারণের জন্য 'অধিকারী'র গণ্ডি অতিক্রম ক'রে।

স্বামীজীর জীবনী ও রচনাবলী অনুধ্যান করলে দেখা যায়, বুদ্ধের পুরুষকার, বৈরাগ্য, আত্মপ্রত্যয় ও বিশাল হৃদয়বত্তা দ্বারাই তিনি সমধিক আকৃষ্ট হয়েছিলেন। করুণার যে মহাশক্তি বুদ্ধকে পথের ভিক্ষু করেছিল, সেই শক্তিই আবার কর্মকোলাহলময় সংসারে জীবসেবায় নিযুক্ত করেছিল। তাই বোধ হয়, স্বামীজী বুদ্ধদেবের প্রতি জীবন-ভোর এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব ক'রে বলেছেন, 'বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর!' এবং সেই জন্যই বোধ হয় এই দুই মহান্ চরিত্রের একত্র অনুধ্যানে আমরা বিশেষ প্রেরণা লাভ করি!

ভগবান বুদ্ধের তীব্র বৈরাগ্য! তিনি নিজ মুখে তাঁর এক শিষ্যকে বলছেন, 'আমি যৌবনে খুব বিলাসী ছিলাম। আমার চিত্তবিনোদনের জন্য রাজপ্রাসাদে শ্বেত, নীল ও লাল পদ্ম-শোভিত তিনটি সরোবর ছিল। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ঋতু উপভোগ করবার জন্য তিনটি পৃথক্ প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। সুন্দরী রমণীকুল নৃত্য গীত ও বাদ্যে সদাই আমার আনন্দ সম্পাদন ক'রত। কিন্তু একদিন যখন জানলাম, ঐশ্বর্য ও বিলাস মানুষকে জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি ও দুঃখ থেকে রক্ষা করতে পারে না, সেই দিনই ঐশ্বর্যের অভিমান আমার নিঃশেষে দূর হ'ল। অকিঞ্চিৎকর বস্তু-বোধে সে-সকল আমি ত্যাগ করলাম।'

স্বামী বিবেকানন্দ তখন যুবক নরেন্দ্রনাথ। পিতৃবিয়োগের পর গৃহে মাতা ও স্বজনগণ বিপন্ন। একদিকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের কর্তব্যবুদ্ধি—মাতা ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের দায়িত্ব—অপরদিকে সত্যলাভের জন্য অন্তরে বিরামহীন আকুলতা। আর্থিক দুরবস্থা দূর ক'রে উপার্জনক্ষম হবার জন্য আইন-পরীক্ষার প্রস্তুতি—সাংসারিক কর্তব্য অকর্তব্য, সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে পৌঁছবার জন্য বৈরাগ্যের আকুল আহ্বান। শেষপর্যন্ত অন্তরের তীব্র বৈরাগ্যেরই জয় হ'ল। কলকাতার ধূলি-ধূসরিত পথে নগ্নপদে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে মায়ামুক্ত নরেন্দ্রনাথ ছুটেছেন কাশীপুরের পথে,—সংসারের কর্তব্য-বোধ বা আত্মীয়বর্গের সমালোচনা তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি।

বুদ্ধদেবের পুরুষকার সত্যলাভের জন্য তাঁকে কঠোর সাধনায় নিয়োজিত করেছে। সাধন-কালে এক একটি পথ তিনি ধরেছেন, তীব্র অধ্যবসায় সহকারে শেষপর্যন্ত দেখেছেন, কিন্তু যখনই উপলব্ধি করেছেন—এই পথে নির্বাণ-লাভ সম্ভব নয়, তখনই দৃঢ়চিত্তে সেটি পরিত্যাগ করেছেন। কত প্রলোভন, কত বাধা—ভ্রূক্ষেপ নেই! তাঁর 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্' ব'লে যোগাসনে বসার দৃষ্টান্ত স্বামীজী বহুবার উল্লেখ করেছেন। স্বামীজীর মতে পুরুষকারের এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল! শিষ্যদের প্রতি বুদ্ধদেবের উপদেশ—নিজের মুক্তি বা নির্বাণলাভের জন্য পরম পুরুষকার প্রদর্শন কর। ঈশ্বর-বিশ্বাস যদি তোমায় দুর্বল পরনির্ভর ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন করে, তবে এরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস ক'রো না। স্বামীজী বললেন - সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তোমারই সত্তা। দুর্বল হৃদয়ে কখনই তাঁর প্রকাশ সম্ভব নয়। দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু।

বুদ্ধদেবের আত্মপ্রত্যয় অপরিসীম। যৌবনে যশোধরার পাণিগ্রহণের জন্য একবার তাঁকে ধনুর্বিদ্যা ও মল্লযুদ্ধে মহা বীর ও শক্তিশালী মল্লের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছিল। রাজা শুদ্ধোদন, অমাত্যবর্গ ও

আত্মীয়-পরিজন কিঞ্চিৎ ভীত ও সন্ত্রস্ত। কিন্তু সিদ্ধার্থ ছিলেন নির্ভীক ও আত্মশক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসবান্। সাধন-কালে একবার মহারাজ বিম্বিসারের দৃষ্টি তথাগতের উপর পড়েছিল। তিনি তাঁকে শাক্য-বংশোদ্ভব রাজপুত্র ব'লে চিনতে পেরে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। অতঃপর তাঁর গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে ধর্ম উপদেশ ভিক্ষা করলেন। ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সিদ্ধার্থ তাঁকে আশ্বাস প্রদান ক'রে বললেন, 'মহারাজ, আমি বোধিলাভ করবই; সে-বিষয়ে কোন সংশয় নেই, এবং তখন ফিরে এসে আপনাকে ধর্ম উপদেশ দান ক'রব প্রতিজ্ঞা করছি।'

স্বামীজী জানতেন জগৎকে তাঁর কিছু দেবার আছে। জানতেন—তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ! তাই জাগতিক কোন বাধাকে, জগতের কোন সমালোচনাকে তিনি কখনও স্থান দেননি। পাশ্চাত্য দেশে সহস্র বাধা ও প্রতিকূল অবস্থার ভেতরেও তাঁর লিখিত পত্রাবলীতে এই কথাটি আমরা বারবার পাই —'আমার জীবনের একটি ব্রত আছে, আমাকে একাই তা উদ্‌যাপন করতে হবে।' স্বামীজী স্পষ্টই বলছেন, I have a message to the West as Buddha had a message to the East.' জগৎকে তাঁর একটি বাণী দেবার আছে, জগৎ সেই বাণী গ্রহণ করবে—এই দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর তাঁর কর্মজীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বৌদ্ধ সাধককে প্রবল আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সাধনে অগ্রসর হ'তে হবে—আমি কারও দ্বারা জিত হই না, আমিই সকল জয় ক'রব। আমি জিন-সিংহের সন্তান, আমায় তাঁর সম্মান বহন করতেই হবে।

ময়া হি সর্বং জেতব্যমহং জেয়ো ন কস্যচিৎ।
ময়ৈব মানো বোঢ়ব্যো জিনসিংহসুতো হ্যহম্॥

স্বামীজী বলছেন: আমরা তারকা চর্বণ ক'রব, বলপূর্বক ত্রিভুবন উৎপাটন ক'রব। আমাদের কি জান না? আমরা রামকৃষ্ণ-দাস।

কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ,
কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্!

বুদ্ধদেবের মতো অত্যদ্ভুত দৃঢ়চিত্ত সন্ন্যাসীর হৃদয় আবার একটি সামান্য ছাগশিশুর জন্য করুণায় বিগলিত। স্বামীজী বলেন, বুদ্ধদেবের মহত্ত্ব 'in his unrivalled sympathy'—জীব-জগতের প্রতি অতুলনীয় সহানুভূতিতে। সকরুণ কণ্ঠে সন্ন্যাসী যজ্ঞসম্পাদনকারী রাজার কাছে প্রার্থনা করছেন, 'একটি ছাগবলি দিয়ে আপনার যে পুণ্য হবে, আমায় বলি দিলে আরও অধিক পুণ্য অর্জন করবেন। আমি ঐ ছাগশিশুর প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।' রাজা মুগ্ধ ও স্তম্ভিত! এমন কথা তো তিনি জীবনেও শোনেননি, একি পাগল!

বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ আমেরিকার এক শ্রেষ্ঠ ধনীর গৃহে পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। মনশ্চক্ষে কেবলই ভেসে উঠছে অর্ধনগ্ন বুভুক্ষু ধূলিশয্যা-শায়ী দরিদ্র দেশবাসীর প্রতিচ্ছবি। পালঙ্ক-শয্যা তাঁর অসহ্য বোধ হ'ল। রুদ্ধ গৃহে ভূলুণ্ঠিত হয়ে অশ্রুজলে তিনি তাঁর প্রাণের বেদনা ঢেলে দিলেন। সেদিন নিদ্রিত ভারতবাসী জানতে পারেনি সত্যসঙ্কল্প ঋষির প্রাণের আর্তি সঞ্চিত দুঃখের ভার কতখানি লাঘব করেছিল।

লিচ্ছবির সম্ভ্রান্ত-বংশীয় রাজপুরুষগণ তথাগতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন,—অপরদিকে পরমরূপবতী বারবনিতা অম্বপালী তার আম্র-কুঞ্জে সশিষ্য বুদ্ধদেবের পাদস্পর্শ ভিক্ষা করেছেন। এই রাজপুরুষগণ অপেক্ষা ঐ

নারীই কি অধিক দুঃখে জর্জরিত নয়? বুদ্ধের আশীর্বাদের প্রয়োজন কার বেশী? এখনেও করুণার জয় হ'ল। বুদ্ধদেব অম্বপালীর নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে তাকে ধন্য করলেন।

ভ্রমণরত স্বামীজী কয়েকজন বন্ধু সঙ্গে কাইরো শহরের এক কুখ্যাত অঞ্চলে এসে পড়েছেন—বারনারী-বেষ্টিত অঞ্চল। সঙ্গিগণ অপ্রস্তুত। পথের একধারে অর্ধবস্ত্রাবৃত কয়েকটি রমণী; তারা হাতের ইশারায় স্বামীজীকে আহ্বান করছিল। বন্ধুগণ দ্রুত সেইস্থান ত্যাগ ক'রে স্বামীজীকে নিয়ে অন্য পথে যেতে চাইলেন। করুণাবিগলিত-হৃদয় স্বামীজীর তখন অন্যদিকে দৃষ্টি নেই। সঙ্গীদের পেছনে রেখে তিনি এগিয়ে গেলেন তাদের দিকে। 'আহা, হতভাগা শিশুর দল, এরা দেহটাকেই সর্বস্ব মনে করছে।'—সহানুভূতি ও করুণায় স্বামীজীর নয়নপ্রান্তে অশ্রু দেখা গেল। রমণীগণ কেউ নত হয়ে তাঁর বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করলে, অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলে 'দেবদূত'! কেউ বা সেই পবিত্র দৃষ্টির সম্মুখে লজ্জায় দুই হাতে মুখ আবৃত করলে। সেদিনের সেই পবিত্রাত্মা মহাপুরুষের করুণার অশ্রু কি তাদের জীবনের গতি ফিরিয়ে দেয়নি?

বুদ্ধদেবের জীবন-সায়াহ্ন উপস্থিত। আনন্দকে বলছেন, 'আনন্দ, এই আমার বৈশালী নগরে শেষ পদার্পণ।' ভিক্ষু-মণ্ডলীর সহিত তিনি পাবা গ্রামের সেই কর্মকার চুন্দের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। জানতেন এর প্রস্তুত 'শূকরমার্দব' ভোজনেই তাঁর জীবনান্ত হবে, তবু তার শ্রদ্ধার দান তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন না। আহারে প্রবৃত্ত হয়েই তথাগত জানালেন, তিনি আজ কেবল ঐ বস্তুটিই গ্রহণ করবেন, অন্য কিছু নয়। আহার সমাপনান্তে চুন্দকে আহ্বান ক'রে বলছেন, অবশিষ্ট 'শূকরমার্দব' যেন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পরিবেশনের পূর্বেই মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হয়। ভোজনের অব্যবহিত পরেই বুদ্ধদেব অতিমাত্রায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অন্তিম শয্যায় শুয়ে তিনি চুন্দের প্রতি অপরিসীম করুণা অনুভব করছেন। বুদ্ধের জীবনান্তের নিমিত্ত হওয়ার জন্য যে তাকে লোকের গঞ্জনা সহ্য করতে হবে। সে যে তীব্র ব্যথা অনুভব করবে। বার বার আনন্দকে বলছেন, আনন্দ, তুমি তাকে বলবে সে যেন শোক না করে। ভিক্ষু-সঙ্ঘকে অন্নদান ক'রে সে মহাপুণ্যের কাজ করেছে। আর বুদ্ধের পরিনির্বাণ-লাভে সাহায্য করেছে ব'লে সে আরও পুণ্যের অধিকারী। তাকে আমার আশীর্বাদ দেবে।—করুণার দৃষ্টান্ত দুর্লভ। করুণাঘন শাক্যসিংহ নারীজাতির জন্যও তাঁর করুণার দ্বার খুলে দিয়েছেন। ভিক্ষাব্রত-গ্রহণে নারীজাতির অধিকার আছে কিনা, আনন্দের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেন, 'আনন্দ, এ প্রশ্ন কেন? নারীজাতিও কি ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করে না? তবে নির্বাণ-লাভে তাদেরই বা অধিকার থাকবে না কেন?'

স্বামীজী বললেন—আত্মজ্ঞান-লাভই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য। আত্মাতে স্ত্রীপুরুষ-ভেদ নেই। অতএব আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য বিধিবৎ সন্ন্যাস-গ্রহণে নারীজাতিরও পূর্ণ অধিকার আছে।

এই মহাপ্রাণ মহাভিক্ষুর মুখেই একদিন এই প্রতিশ্রুতি শোনা গিয়েছিল:

এবমাকাশনিষ্ঠস্য সত্ত্বধাতোরনেকধা।
ভবেয়মুপজীব্যোঽহং যাবৎ সর্বে ন নিবৃতাঃ॥

—অনন্ত আকাশে যত জীবলোক আছে, যতদিন সেই সব জীব মুক্তিলাভ না করে, ততদিন আমি তাদের সেবা ক'রব।

ঠিক এই প্রতিশ্রুতিই আমরা আবার শুনতে পেলাম প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে স্বামীজীর মুখ থেকে: It may be that I shall find it good to get outside my body to cast it off like a worn-out garment. But I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere with God.

—জীর্ণ পরিত্যক্ত বস্ত্রের মতো দেহটাকে ফেলে যেতে হলেও আমি আমার কাজ বন্ধ ক'রব না। যতদিন না সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্য বোধ করবে, আমি জগতের প্রতিটি কোণে জীবকে অনুপ্রাণিত ক'রে যাব।

দুঃখসঙ্কুল ভুলভ্রান্তিপূর্ণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবনে এই দুই মহাপ্রাণের মহা আশ্বাসবাণীই আমাদের অনন্তকাল শক্তি ও সান্ত্বনা দেবে।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে নূতন প্রকাশন

(নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি পাইয়া আমরা আনন্দিত, সময়মত সমালোচিত হইবে)

যুগাচার্য বিবেকানন্দ—শ্রীতামসরঞ্জন রায়। কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬৭; মূল্য ৪৲।

সেই বরেণ্য সন্ন্যাসী—শ্রীমণি বাগচি। সুতপা প্রকাশনী, কলিকাতা ২৩ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১২। মূল্য ৩৲।

পত্রিকা

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী—বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা, ১০৭, নেতাজী সুভাষ রোড হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১২।

বিবেকানন্দ-প্রশস্তি—স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব-সমিতি, হাসিমারা, জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭২; মূল্য ৩৲।

সমালোচনা

What Religion is—in the words of Swami Vivekananda, with a biographical introduction by Christopher Isherwood. Edited by John Yale. Pp. 224, Price 30 S. net. Publisher: Phœnix House Ltd. 10-13, Bedford Street, London, W. C. 2.

ধর্ম বলিতে স্বামীজী কি বুঝাইতে চান, তাহা তাঁহার নিজের ভাষায় এই পুস্তকে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয়বস্তু:

সার্বভৌম ধর্মের আদর্শ, কর্মজীবনে বেদান্ত, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জগতের মহত্তম আচার্যগণ। ক্রিস্টোফার ঈশারউড-লিখিত ভূমিকায় স্বামীজীর জীবনী সংক্ষেপে বিবৃত। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সহিত যাঁহারা সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাঁহারাও ভূমিকা-সহ এই গ্রন্থপাঠে স্বামীজীর ভাবাদর্শ জানিতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইবে—এই দিক হইতে গ্রন্থ-সম্পাদনার বৈশিষ্ট্য। বাঁধাই ও মুদ্রণ সুন্দর।

মনুসংহিতা (মূল ও অনুবাদ)—অনুবাদক: পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ। প্রকাশক: শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা ৩৫। দুই খণ্ড: পৃষ্ঠা ২৪৯ + বিষয়সূচী; মূল্য ১.৫০ + ১.৫০।

নব-প্রতিষ্ঠিত 'আর্যশাস্ত্র' পত্রিকার প্রথম দুইটি সংখ্যায় পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে মনুসংহিতা প্রকাশিত হইয়াছে। আর্যগণের ধর্ম আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি অনুশাসনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মনুসংহিতা'র সাবলীল অনুবাদ বর্তমানে সনাতন ধর্ম-প্রচারে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 'আর্যশাস্ত্র' পত্রিকার পরিচালকবৃন্দ হিন্দু ধর্মশাস্ত্র প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত। তাঁহাদের মহতী প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক।

Thus Spake Guru Nanak—Compiled by Swami Suddhasatwananda. Published by the President, Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras 4. Pp. 112; Price: 40 nP.

শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানকের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ তাঁহার অমূল্য বাণী—'ঈশ্বর', 'শব্দ', 'গুরু', 'সাধনা', 'ভগবানের বিধান', 'প্রকৃত ভক্ত', 'প্রার্থনা', 'বিবিধ উপদেশ' এই কয়টি অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ। ইতঃপূর্বে প্রকাশিত 'Thus Spake' পর্যায়ের পকেট সংস্করণ গ্রন্থগুলি পাঠকগণের বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। আমরা আশা করি, এই গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠককে গুরু নানকের উপদেশাবলী হইতে শিখধর্ম বুঝিবার সহায়তা করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সংবাদ

নিউ দিল্লী: রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ১৭ই জানুআরি মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বেদপাঠ, পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

অপরাহ্নে রামলীলা ময়দানে স্বামী স্বাহানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু, দিল্লীর মেয়র প্রভৃতি ভাষণ দেন। সভায় ৬০,০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতির বিষয় বর্ণনা করিয়া শ্রীনেহরু বলেন: স্বামীজীর উদ্দীপনাময়ী রচনাবলী জনসাধারণের মনে শক্তি ও জাতীয়তাবোধ প্রভূত পরিমাণে আনিয়া দিবে, কারণ তাঁহার প্রতিটি কথা স্বদেশপ্রেম-সঞ্জাত। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ও মানসিক উৎকর্ষ এত বিরাট যে, যাহা কিছু তিনি বলিয়াছিলেন, বর্তমানেও তাহা গ্রহণযোগ্য এবং ভবিষ্যতেও জগৎ তাঁহার ভাবধারা গ্রহণ করিবে।

১লা হইতে ১৬ই ফেব্রুআরি স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী, বাংলা, পঞ্জাবী ও তামিল ভাষায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা এবং স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে হিন্দী ও ইংরেজীতে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা হয়। স্বামীজীর বাণী হইতে সংকলন করিয়া প্রতিযোগিতার বিষয় নির্বাচন করা হইয়াছিল। মোট ৫,২৪৫ ছাত্র প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

৩রা ফেব্রুআরি শ্রীজওহরলাল নেহরুর পৌরোহিত্যে মিশনে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী স্বাহানন্দ, স্বামী ভক্তানন্দ, দিল্লী কলেজের অধ্যক্ষ প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। শ্রীনেহরু তাঁহার ভাষণে বলেন, বালক ও যুবকদের আদর্শ-হিসাবে একজনের নাম করিতে হইলে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নামই উল্লেখ করিবেন।

১০ই ফেব্রুআরি 'ছাত্রদিবসে' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর সভাপতিত্ব করেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে ৪৬৮ জন পুরস্কার লাভ করে। এই দিনটিতে ছাত্রদের আনন্দ উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিশেষভাবে দেখা যায়।

মাদ্রাজ: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান গত ১৭ই জানুআরি মঙ্গলারতি, বিরাট শোভাযাত্রা-সহ নগর-পরিক্রমা, ১০১টি দীপ জ্বালানো, পূজা, হোম, ভজন, 'শিব-সহস্রনাম'-অর্চনা, হরিকথা, কালীকীর্তন, দরিদ্র-নারায়ণসেবা প্রভৃতির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়। সকালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকামরাজ নাদার ডাক ও তার বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী ডাকটিকিট বাজারে ছাড়েন। তিনি স্বামীজীকে ভারতের এক মহান্ সন্তান বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন, স্বামীজী বিশ্বে ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী প্রচার করিয়া ভারতকে বহির্বিশ্বে সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

দক্ষিণেশ্বর: শ্রীসারদা মঠে বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ই জানুআরি স্বামীজীর জন্মতিথি-পূজা এবং ২২শে হইতে ২৬শে জানুআরি সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ উৎসব ও প্রদর্শনীর

উদ্বোধন করিয়া এক উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণে বলেন: একমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতের নব জাগরণ সম্ভব, সুতরাং ধর্ম-সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতন হওয়া উচিত। সভার প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা-বাণী পঠিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বলেন, নবভারত-গঠনে নারীজাতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে—স্বামীজীর এই দৃঢ় বিশ্বাসের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন ভক্তমহিলা-সম্মেলন, তৃতীয় দিন 'ছাত্রীদিবস', চতুর্থ দিন ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাটিকার অভিনয় ও 'বিবেকানন্দ-লীলাগীতি' কীর্তন উল্লেখযোগ্য।

উৎসবের সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল শোভাযাত্রা। উহাতে সহস্রাধিক মহিলা ও ছাত্রী যোগদান করেন। পত্রপুষ্পসুশোভিত স্বামীজীর চারিখানি সুবৃহৎ প্রতিকৃতি-সহ শোভাযাত্রাটি আড়িয়াদহ ও দক্ষিণেশ্বরের বিভিন্ন পথ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির হইয়া পুনরায় শ্রীসারদামঠে প্রত্যাবর্তন করে।

জামসেদপুর: গত ১৭ই জানুআরি রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত সভায় বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীসরোজকুমার দাশ পৌরোহিত্য করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের বাণী পঠিত হইলে পর সোসাইটি-পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীরা স্বামীজীর কবিতা ও বাণী হইতে ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দীতে আবৃত্তি করে।

বিশিষ্ট বক্তাগণ বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন।

শিলং: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৭ই হইতে ২০শে জানুআরি বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর প্রারম্ভিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, ভজন, চণ্ডীপাঠ, কঠোপনিষৎ-পাঠ, বিবেকানন্দ-লীলাগীতি, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ভোগরাগ, সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

২০শে জানুআরি অপরাহ্ণে আসামের প্রধান বিচারপতি শ্রীজে. মেরহোত্রের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত মহতী ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভাপতি মহোদয় স্বামীজী-প্রদর্শিত সেবা-ধর্ম প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে প্রতিফলিত করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

উক্ত দিবসে ছেলেমেয়েরা স্বামীজীর রচনা ও বক্তৃতা হইতে নির্বাচিত অংশ আবৃত্তি করে।

ভুবনেশ্বর: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ১৭ই জানুআরি স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলারতি, কঠোপনিষৎ-পাঠ, প্রভাতফেরি, বিশেষ-পূজা, ভজন, হোম, স্বামীজীর বাণী-পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, আবৃত্তি, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

কাঁথি: রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ই জানুআরি গৈরিক পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রা, জীবনী-আলোচনা, পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ৮ শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, প্রায় সমস্ত হাইস্কুলে ও

ক্লাবে ঐ দিন স্বামীজীর জন্মমুহূর্তে শঙ্খধ্বনি, শোভাযাত্রা ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। বহু গ্রামে সন্ধ্যায় দীপমালা জ্বালানো হয়।

ঢাকা : রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামীজীর শত-বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে গত ১৭ই জানুআরি পূজা হোম প্রভৃতি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত মহতী সভায় ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের ডীন ডক্টর কাজী মোতাহের হোসেন সভাপতিত্ব করেন এবং ভাইস্ চ্যান্সেলার ডক্টর মাহ্‌মুদ হোসেন উদ্বোধন-ভাষণ দেন।

ফরিদপুর : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৭ই হইতে ৯ই ফেব্রুআরি স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন জনাব সলিমুদ্দিন আহম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী স্বামীজীর জীবন-দর্শন প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিন ভজন-কীর্তনাদির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। শেষ দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রবন্ধপাঠ ও স্বামীজী-স্মরণে গীতি-বিচিত্রা উল্লেখযোগ্য।

নারায়ণগঞ্জ : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১২ই হইতে ১৮ই ফাল্গুন (৩.৩.৬৩) স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষ পূজা, ভজন, স্বামীজীর জীবন-বিষয়ক প্রদর্শনী, রুদ্রযাগ, রামায়ণ-গান, কবিগান, শোভাযাত্রা, ছায়াচিত্র, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী, ডক্টর মোঃ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর গোবিন্দ দেব প্রভৃতি ভাষণ দেন।

মনসাদ্বীপ (সাগর) : গত ২রা হইতে ৬ই মার্চ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ও হরিণবাড়ী স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী জীবানন্দ উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ছাত্র ও বহিরাগতদের মধ্যে আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা এবং খেলাধূলার প্রতিযোগিতা এবং পারিতোষিক-বিতরণ হয়। উভয় কেন্দ্রেই কৃষি, শিল্প ও শিক্ষা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল।

আশ্রমে 'বিবেকানন্দ-শত-বার্ষিকী স্মৃতি-সদনে'র দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়। শিক্ষামূলক সবাক্ চলচ্চিত্র প্রদর্শন উৎসবের অঙ্গ ছিল। পালাকীর্তন, যাত্রাভিনয়, নারায়ণসেবা এবং ধর্মসভায় বহু লোকের সমাগম হয়। আশ্রমে প্রথম দিন প্রভাতফেরি, ভজন এবং দ্বিতীয় দিনে সঙ্গীত-সহ ছাত্রছাত্রীদের শোভাযাত্রা সকলের মধ্যে প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার করে।

এতদ্ব্যতীত স্থানীয় উন্নয়ন-কর্মচারী (B.D.O.) একটি কমিটি গঠন করিয়া বিবেকানন্দ-জন্মশত বার্ষিকীর অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদেরও নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। আশ্রমে এবং হরিণবাড়ী কেন্দ্রে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের সভায় শ্রীহরিপদ বাগুলি, শ্রীব্যোমকেশ মাইতি, শ্রীঅরবিন্দ পাত্র প্রভৃতি স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভাপতি স্বামী জীবানন্দ যুগপ্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আবির্ভাবের তাৎপর্য, সমাজের উপর শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর প্রভাব এবং স্বামীজীর জীবনালোকে যুগোপযোগী প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

সিয়্যাটেল্ : বেদান্তকেন্দ্রে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দের পরিচালনায় গত ১৭ই জানুআরি পূজা এবং পরদিন প্রার্থনা, ভজন,

স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। আগামী গ্রীষ্মকালে এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী সহায়ে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলিতেছে।

পোর্টল্যাণ্ডঃ বেদান্ত-সোসাইটির উদ্যোগে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ ধর্মসভার অধিবেশনে পাঁচজন বিশিষ্ট ধর্মনেতা নিজ নিজ মতানুযায়ী 'মুক্তি'র অর্থ বিশ্লেষণ করেন। 'মুক্তি' অর্থ পাপ ও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ—এই ভাবটি প্রত্যেক বক্তার ভাষণেই পরিস্ফুট হয়। প্রত্যেকেই বলেন, ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতে মানুষকে সাহায্য করিতে হইবে।

পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত-সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অশেষানন্দ বলেন, হিন্দুধর্মমতে এই জীবনেই মুক্তিলাভ সম্ভব। সাধনা দ্বারা আধ্যাত্মিকতা পূর্ণরূপে বিকশিত করিতে পারিলে অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়—এই উচ্চতম অবস্থাই মুক্তি।

শতবার্ষিকী কমিটি সংবাদ

স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটি (১৬৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ১৪) হইতে ইতিপূর্বে তিনটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী (Bulletin) প্রকাশিত হইয়াছে, সম্প্রতি প্রকাশিত চতুর্থ বিবরণী (Bulletin No. 4) পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবের কোথায় কিরূপ প্রস্তুতি চলিতেছে ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহাতে তাহার বিবরণী দেওয়া হইয়াছে।

গত ১৭ই জানুআরি স্বামীজীর শুভ জন্মদিবসে বেলুড় মঠে শতবার্ষিক উৎসবের শুভারম্ভ হয়, এই এক-বৎসরব্যাপী উৎসব শ্রীরামকৃষ্ণ মঠমিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে ও অন্যান্য স্থানে দেশবিদেশে এবং স্কুল কলেজ, সাধারণ পাঠাগার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে অনুষ্ঠিত হইয়া আগামী জানুআরি মাসে (১৯৬৪) সমাপ্ত হইবে।

শতবার্ষিকী কমিটি হইতে প্রকাশিত 'ছোটদের বিবেকানন্দ' ও 'স্বামী বিবেকানন্দ' পুস্তক দুইখানি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইতেছে।

আগামী অক্টোবরে কাশীতে সাধুসম্মেলন হইবে, ডিসেম্বরে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠমিশনের সাধু-ব্রহ্মচারীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে, নির্ধারিত সময় পরে জানানো হইবে।

কলিকাতায় ধর্মমহাসম্মেলন আরম্ভ হইবে ২৬শে ডিসেম্বর হইতে। মহিলা-সম্মেলনের দিন নির্ধারিত হইয়াছে ১৮ই ডিসেম্বর হইতে।

সঙ্গীত-সম্মেলন, প্রদর্শনী, তীর্থপরিক্রমা, শোভাযাত্রা প্রভৃতিও আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হইবে। স্বামীজী-সম্বন্ধে প্রামাণিক চলচ্চিত্র শীঘ্রই বাহির হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর সাধারণ সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ আহূত হইয়া নিম্নলিখিত স্থানসমূহে শতবার্ষিক উৎসবে স্বামীজী-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন :

দক্ষিণভারতে : মাদ্রাজ, চিদাম্বরম্, কুম্ভকোণম্, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, রামেশ্বরম্, মাদুরা, তিন্নাভেল্লী, কুমারিকা, নাগর কইল, ত্রিবান্দ্রম্, কোয়েম্বাতুর, কালাডি, ত্রিচুড়, সালেম।

রাজস্থানে : আজমীর, বেওয়ার, পুষ্কর, জয়পুর, বিকানীর।

মধ্যপ্রদেশে : গোয়ালিয়র, এবং মহারাষ্ট্রে : বোম্বাই ও নাসিক।

[শতবার্ষিকী কমিটি প্রকাশিত Bulletin No. 4 হইতে]

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বারাসত: রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে গত ২৫শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব যোড়শোপচারে পূজা, চণ্ডীপাঠ, উদয়াস্ত অখণ্ড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-পাঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণনাম-জপ, প্রসাদ-বিতরণ ও আলোচনার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। অপরাহ্নে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মলীলা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

শতবার্ষিকী সংবাদ

হাওড়া: কেন্দ্রীয় বিবেকানন্দ জন্মশত-বার্ষিকী কমিটি কর্তৃক গত ১৭ই ফেব্রুআরি রবিবার অপরাহ্নে হাওড়া ময়দানে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সভাপতির ভাষণে বলেন, ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক মানবদরদী স্বামীজীর আদর্শ রূপায়ণের মাধ্যমেই তাঁহার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন সম্ভব। প্রধান অতিথি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেন, বিবেকানন্দের আদর্শে সমাজ গঠন এবং দিকে দিকে বিবেক-বাণী প্রচারের চেষ্টা করিলে সত্যই সুখ-সমৃদ্ধিময় ভারত গড়িয়া উঠিবে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, পৌরপ্রধান শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বামী গম্ভীরানন্দ ও স্বামী ভাষ্যানন্দ।

হাওড়া: গত ২৩শে ফেব্রুআরি অপরাহ্নে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম ও বিবেকানন্দ' ইনস্টিটিউশনের যুক্ত উদ্যোগে আয়োজিত তিন-সপ্তাহব্যাপী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন সুসম্পন্ন হয়। স্বামী গম্ভীরানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামীজীকে অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র এবং সকল ভারতীয় আন্দোলনের আদি নেতারূপে উল্লেখ করা হয়।

কলিকাতা: মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে (মেন) গত ২২শে মার্চ স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতির ভাষণে স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন, সর্ববিধ ভয় ও সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া স্বামীজীর আদর্শ জীবনে রূপায়িত করিতে পারিলেই ভারত জাতি-হিসাবে বাঁচিবে। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বলেন, স্বামীজী ভারতকে জাগাইয়াছেন, অসীম মানবপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীধরণীমোহন মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া বলেন, স্বামীজী এই বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন, এবং কিছুকাল এখানে শিক্ষকতাও করেন—আজ আমরা ইহা স্মরণ করিয়া গৌরবান্বিত। স্কুলের ছাত্রগণ সঙ্গীত, আবৃত্তি, রচনা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

হুগলি: বাবুগঞ্জ রথতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ পার্কে হুগলি জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৫শে ফেব্রুআরি এবং ১লা হইতে ৩রা মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে নির্মীয়মাণ 'বিবেকানন্দ-ভবনে' পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'-পাঠ ও রামায়ণগান অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ,

পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, স্বামী জীবানন্দ, শ্রীতামসরঞ্জন রায় প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সভান্তে লীলাকীর্তন ও গীতি-আলেখ্য শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ আনন্দ বর্ধন করে।

আগড়তলা (ত্রিপুরা) : রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৮ই জানুআরি স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকীর বর্ষব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে বৈদিক স্তোত্র- ও গীতা-পাঠ, ভজন, বৃক্ষরোপণ, হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল-বিতরণ, শতদীপ প্রজ্বালন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। একটি মহতী সভায় স্বামীজীর দিব্যজীবন ও বাণী অবলম্বনে বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন।

তিনসুকিয়া (আপার আসাম) : স্থানীয় বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী পালন-সমিতি এবং উৎসব-সমিতির যুক্ত উদ্যোগে ৬ দিন ধরিয়া শতবার্ষিকীর প্রারম্ভিক উৎসব পূজাদি ও বিবিধ অনুষ্ঠান-সূচী সহায়ে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযদুনাথ ভূঞার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামীজীর দিব্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে সময়োপযোগী আলোচনা হয়।

সালেপুর (কটক) : স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৭ই জানুআরি স্বামীজীর জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে যথাবিধি পূজা হোম ও গীতাপাঠ হয়। আশ্রমের সেক্রেটারি শ্রীচন্দ্র-শেখর মিশ্র স্বামীজীর উপদেশাবলী পাঠ করিয়া সালেপুর হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দকে স্বামীজীর আদর্শে নিজ নিজ জীবন গঠন করিতে বলেন।

আমেদাবাদ : কুলু (হিমালয়) সর্বাঙ্গী বিকাশ সঙ্ঘের ।আমেদাবাদ-বরোদা শাখা-কেন্দ্রের উদ্যোগে বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন। সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী, বাংলা, সিন্ধী ভাষায় স্বামীজী-সম্বন্ধে রচিত প্রবন্ধ পঠিত হয়। ছাত্রগণ স্বামীজীর উদ্দীপনাময়ী বাণী হইতে আবৃত্তি করে। ভজন, বেদপাঠ, পুষ্পাঞ্জলি, ১০১টি দীপ-সহায়ে আরতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

কুমিল্লা : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১৭ই হইতে ২১শে জানুআরি স্বামীজীর শতবার্ষিকী উদ্বোধন-উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঊষাকীর্তন, ভজন, ষোড়শোপচারে পূজা, প্রবন্ধপাঠ, রামায়ণ-গান, জীবনী-আলোচনা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন।

ভূপাল (মধ্যপ্রদেশ) : গত ১৬ই ফেব্রুআরি স্থানীয় বঙ্গীয় মহিলা ও গীতা সমিতির উদ্যোগে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীপটাশকর সভাপতিত্ব করেন! স্তোত্রপাঠ, গীতাপাঠ ও ভজন হয়। সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল: বর্তমান ভারতের প্রতি স্বামীজীর নির্দেশ।

১৪ই ও ১৫ই ফেব্রুআরি শহরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে কয়েকটি সভায় 'স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন', 'গীতা ও স্বামীজীর বাণী', 'বর্তমানে যে ধর্মের প্রয়োজন' প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। ভূপালবাসী বিশেষ করিয়া স্থানীয় ছাত্রসমাজ এই সব সভায় যোগদান করেন।

আজমীর : রামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৭ই মাঘ পূজা, পাঠ ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা মাঘ বিশিষ্ট বক্তাগণ 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় নারী-

জাতির আদর্শ' এবং ৬ই মাঘ 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মসমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভায় বহু গণ্যমান্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। ৭ই মাঘ স্থানীয় দয়ানন্দ কলেজে উৎসবের আয়োজন করা হয়।

নানা স্থানে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি :

প্যাটেল নগর বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী, সিউড়ি; হুগলি সংস্কৃত-মহাসম্মেলনের অধিবেশনে বিবেকানন্দ-দিবস; বঙ্গভারতী, রায়পুর, দেরাদুন; খাঁটোরা, হাওড়া; শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, তেজপুর, আসাম; শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসঙ্ঘ, ইমামবাজার, হুগলি; বিবেকানন্দ-পাঠাগার, বোরাগাড়ি, জলপাই-গুড়ি; রামকৃষ্ণ আশ্রম, কুমিল্লা; মণিনগর রামকৃষ্ণ আশ্রম, আমেদাবাদ; নাটশাল রামকৃষ্ণ আশ্রম, মেদিনীপুর; খেজুরী, মেদিনীপুর; বিবেকানন্দ-শতবর্ষ উদ্‌যাপন-সমিতি, আর্যপল্লী, দমদম; দ্বারকানাথ উচ্চ বিদ্যালয়, জাঙ্গীপাড়া, হুগলি; ঢাকুরিয়া রামকৃষ্ণ আশ্রম, কলিকাতা; রামকৃষ্ণ আশ্রম, চারিগ্রাম, ২৪ পরগনা; রামকৃষ্ণ আশ্রম, নূতন-পুকুর, ২৪ পরগনা; কলিকাতা মার্কাস স্কয়ারে বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে বিবেকানন্দ-দিবস; কালনা, বর্ধমান; দ্বারহাট্টা, হুগলি; গয়েশপুর, নদীয়া; গোচারণ, ২৪ পরগনা; গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগনা; রামকৃষ্ণ-সাধনালয়, মাকড়দহ, হাওড়া; রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগনা; বাগনান, হাওড়া; ভদ্রেশ্বর, হুগলি; বৃন্দাবন; নাসিক; ধুম (পূর্ব পাকিস্তান); ডিব্রুগড়; ভুপাল; সোলাপুর; কাশ্মীর।

ক্ষুধামুক্তি সপ্তাহ

গত ১৭ই হইতে ২৩শে মার্চ অন্যান্য দেশের সহিত ভারত আন্তর্জাতিক 'ক্ষুধামুক্তি সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করিয়াছে। রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন এই উপলক্ষে ভাষণ দেন। ক্ষুধামুক্তি সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য হইল পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার অনুপাতে সুষম পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ দ্বারা খাদ্যসমস্যার সমাধান করা এবং জনসাধারণকে এই ভয়াবহ সমস্যা বিষয়ে সচেতন করা।

এই বিষয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য ৫ মিলিয়ন পাউণ্ড সংগ্রহ করা হইবে। ইংলণ্ডের 'ক্ষুধামুক্তি অভিযানে'র উদ্যোগে ভারতে ১৭টি খাদ্য-পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার জন্য ৭০০,০০০ পাউণ্ড সংগৃহীত হইতেছে; ইহার কিছু অংশ সিংহলের জন্য ব্যয়িত হইবে।

সপ্তাহব্যাপী ক্ষুধামুক্তি আন্দোলনে গ্রামে ও নগরের উপকণ্ঠে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধনের জন্য প্রচারকার্য চালানো হয়। শতাধিক দেশে এই উপলক্ষে ডাকটিকিট বাহির করা হইবে। বিভিন্ন দেশের ডাক-টিকিট একটি বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে। —P.T.I.

ভারতে বিদেশী বাসিন্দা

ভারতের বাসিন্দা-রূপে নাম-রেজেস্ট্রীকৃত বিদেশীর সংখ্যা ৫৯,৭৪৪।

বিভিন্ন দেশবাসীর সংখ্যা :

তিব্বতী	১৪,৯৮৮	বর্মী	১,৬২৩
চীনা	১০,৬২৭	রুশ	১,৫৮১
ইরানী	৪,৫০১	ফরাসী	১,০৪৭
আর্মেনিয়ান	৪,৪২১	ইটালিয়ান	১,০৪৪
আফগান	৩,৬৪৮	জাপানী	৯৩৭
জার্মান	২,৯৩০	থাই	৯১৮

এই সংখ্যার মধ্যে ১৬ বৎসরের কমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের ধরা হয় নাই। কমানওয়েল্থ দেশগুলিও ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে।

—U.N.I.



শ্রীবুদ্ধস্তোত্রম্

শ্রীমৎস্বামিগুণাতীতানন্দ-বিরচিতম্

শুদ্ধোদনাদ্ধি মায়ায়াং সুসংজাতো মহামুনিঃ।
নীতিধর্মপ্রতিষ্ঠাতা শাক্যবংশশিরোমণিঃ ॥ ১
সর্বসদ্গুণসম্পন্নঃ সর্বৈশ্বর্যসমন্বিতঃ।
প্রেমপূর্ণদয়াদর্শো বুদ্ধকোটি-প্রবেশিতঃ ॥ ২
সিদ্ধার্থো বোধিসত্ত্বশ্চ শাক্যসিংহস্তথাগতঃ।
গৌতমো বুদ্ধসংজাতো নির্বাণৈকপ্রদীপকঃ ॥ ৩
স্বার্থৈকনির্ভরো ভূত্বা যতেৎ স্বদুঃখনাশনে।
নরোঽহিংসাসত্যমার্গে সম্যক্ সাষ্টাঙ্গতৎপরঃ ॥ ৪
অবিদ্যাং দুঃখমূলাঞ্চ পঞ্চস্কন্দপ্রসারিকাম্।
নয়েন্নির্মূলতাং সত্ত্ব ইতি বাণী সুসূচকাম্ ॥ ৫
প্রোক্তবান্ ধীরগম্ভীরঃ সর্বভূতোপকারকঃ।
বন্দ্যবন্দ্যো মহাজ্ঞানী নিবৃত্তিপথশোধকঃ ॥ ৬
কণ্টকো ঘোটকো যস্য ছন্দকশ্চাশ্বপালকঃ।
নগরভ্রমণে গচ্ছন্ হ্যভবৎ সারশোধকঃ ॥ ৭
জরাস্থো ব্যাধিতঃ প্রেতঃ প্রকৃতস্ত্যাগিভিক্ষুকঃ।
ক্রমেণ দর্শনাত্তেষাং প্রতিবোধিতসান্তরঃ ॥ ৮
বিচতুর্দৃশ্যমাত্রেণ বৈরাগ্যাগ্নিঃ প্রদীপিতঃ।
সুচারুসুমনোহারী স্ত্রীপুত্রত্যাগকীর্তিতঃ ॥ ৯
রাজ্যঞ্চ বিপুলং ত্যক্তং যৌবনে যেন ত্যাগিনা।
নিত্যশুদ্ধেন বুদ্ধেন ত্যাগাদর্শেন মৌনিনা ॥ ১০

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং বিলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনেতি কৃতপ্রতিষ্ঠঃ ॥ ১১

ক্ষণিকসকলভাবান্ বর্জয়িত্বৈকনিষ্ঠো
মৃদুলগুণগভীরঃ শুদ্ধনির্বাণদিষ্টো।
মনসিজকৃতভাবান্ ধীরবুদ্ধ্যা হি জেতা
জয়তু জয়তু দেবো বুদ্ধ বুদ্ধঃপ্রবুদ্ধঃ ॥ ১২
অতুলিতবলবীর্যং শাক্যসিংহং মহান্তম্
সমুদিতনরকায়ং শ্রেষ্ঠলাবণ্যবন্তম্।
সুতধনকুলরাজ্যং ত্যক্তবন্তং কলত্রম্
নমত ভজত নিত্যং সৌগতং তং পবিত্রম্ ॥ ১৩

কথা প্রসঙ্গে

ধর্ম ও দেশপ্রেম

অনেকের মতে, 'ধর্ম একটা পারলৌকিক জিনিস'—ইহলোকের সহিত সম্পর্কশূন্য একটা কল্পিত আদর্শের পিছনে ছোটাছুটি করা, অথবা কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, ইহজীবনকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মনে করিয়া ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সুখের আশায় দুশ্চর তপস্যাদি করা বা স্বেচ্ছায় নানাবিধ দুঃখ বরণ করা, নতুবা অপ্রতিকার-হীন হইয়া, ঈশ্বরেচ্ছা মনে করিয়া 'অনিত্য অসুখ সংসারে' দুদিনের জীবন কোন রকমে মুখ বুজিয়া কাটাইয়া দেওয়া—ধর্ম বলিতে এখনও অনেকে এইরূপই বুঝিয়া থাকেন।

আর দেশপ্রেম? দেশপ্রেম সম্পূর্ণ ইহলৌকিক ব্যাপার; যে দেশে যেকালে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি—সেই দেশের মাটির সহিত, সে দেশের ইতিহাসের সহিত, সে দেশের সুখ-দুঃখের সহিত আমাদের সম্বন্ধ জন্মগত, এবং এ সম্বন্ধ একপ্রকার অচ্ছেদ্য। জন্মভূমির দুঃখ-দুর্দশা দূর করা জননীর দুঃখদুর্দশা দূর করার মতোই মানুষের অবশ্য কর্তব্য। জন্মভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খলের বন্ধন দেশপ্রেমিকগণ মর্মে মর্মে অনুভব করেন, এবং সে বন্ধন দূর করিবার চেষ্টায় তাঁহারা সর্ববিধ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া নীরবে জীবন বিসর্জন করিয়া যান। সংসারের মায়ার বন্ধন অনুভব করিবার, বা 'জন্মান্তর'-গ্রহণের দুঃখযন্ত্রণার দার্শনিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার সময় ও সুযোগ তাঁহাদের জীবনে ঘটিয়া উঠে না।

এ দিক দিয়া দেখিলে অবশ্য ধর্ম ও দেশ-প্রেম দুইটি ভিন্নমুখী আদর্শ; একটি পারলৌকিক, অন্যটি ইহলৌকিক; একটি নিজের কল্পিত মুক্তি ও অনিশ্চিত সুখের প্রয়াস, অন্যটি বহুর মুক্তি ও বহুর নিশ্চিত উন্নতির প্রচেষ্টা। এক্ষেত্রে বর্তমান যুগের মানুষ যে ধর্ম ছাড়িয়া দেশপ্রেমকেই বড় মনে করিবে—তাহাতে আশ্চর্য কি?

কিন্তু প্রশ্নটি অন্যরূপে দেখা দেয়, যখন আমাদের সম্মুখে এমন সব মানুষ আবির্ভূত হন, যাঁহাদের জীবনে ধর্ম ও দেশপ্রেম সমতালে চলিয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা ধর্মের চরম আদর্শ লাভ করিয়াছেন আবার দেশকেও প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছেন, দেশের উন্নতির জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সমর্পণ করিয়াছেন?

তখন আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে: তবে ধর্ম ব্যাপারটা কি? দেশপ্রেমের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ? এমন কি কোন স্তর আছে, যেখানে ধর্ম ও দেশপ্রেম একত্র মিলিত হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত দিবার জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা। শেষ প্রশ্নটির উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে, হ্যাঁ এরূপ স্তর আছে। তবে সেই স্তরে পৌঁছিতে হইলে ধর্মের কতকগুলি উদ্ভট ভাব বর্জন করিতে হইবে, দেশপ্রেমেরও কতকগুলি উৎকট ভাব ত্যাগ করিতে হইবে। মানবজীবন কক্ষে কক্ষে বিভক্ত কতকগুলি একান্ত পৃথক্ বিভাগ নয়। মানবজীবন এক অখণ্ড সত্তা—বিভিন্ন স্তরে তাহার বিচিত্র বিকাশ!

নিম্নতম স্তরে উহা দৈহিক জীবনের রক্ষণ, বিস্তার ও উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত, এক্ষেত্রে অবশ্যই জীববিজ্ঞানের (Biology) স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই তাহাকে চলিতে হয়, এই

স্তরে মানুষ পশুপক্ষীর সহযাত্রী। এই স্বার্থকেন্দ্রিক জৈবিক প্রয়োজনাধীন অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রাচীন জ্ঞানিগণ বলিয়াছিলেন, 'ধর্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানাঃ। ইহা কোন গালি বা অভিশাপ নয়, ইহা যথার্থ অবস্থা বর্ণন। এই অবস্থায় মানুষ পশুর সমান। মানুষ এই অবস্থা অতিক্রম করে ধর্মের সহায়ে। এখন ধর্ম কি?

বুদ্ধির স্তরে বহু মানব সারা জীবন শুধু দর্শন বিজ্ঞান আলোচনা করিয়াই জগৎকারণ সম্বন্ধে জানিতে চান। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম আত্মিক স্তরে।

বহু দেশে বহু কালে ধর্মের বহু সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও হইবে। শাস্ত্রকারগণই শাস্ত্রারণ্যকে মহারণ্য বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন—'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'—ধর্মের তত্ত্ব বাহিরে নয়, হৃদয়েই নিহিত আছে। হৃদয়ের প্রেরণা, বিবেকের শাসন মানুষকে ঠিক পথে ধর্মপথে চালিত করে, 'মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বে হৃদয়ের নির্দেশই গ্রহণ করিও' ইহা স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ। ধর্ম ও দেশপ্রেম লইয়া যে দ্বন্দ্ব ও উহাদের একটি মিলনভূমির সন্ধান-চেষ্টা, তাহা সম্প্রতি স্বামীজীর জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই নূতনভাবে দেখা দিয়াছে।

স্বামীজী ধর্মজগতেও চরম অনুভূতির অধিকারী, বর্তমান সংশয়সঙ্কুল বৈজ্ঞানিক যুগে আধ্যাত্মিক বাণীর তিনি নবতম আচার্য, আবার পরাধীনতার শৃঙ্খলে সহস্র বৎসর জর্জরিত ভারতমাতার দুঃখও তিনি যেভাবে অনুভব করিয়াছেন, এবং সেই দুঃখদুর্দশা দূর করিবার জন্য তিনি যে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, দ্বিতীয় আর কাহাকেও তো সেরূপ দেখি না।

এ ক্ষেত্রে সেই পূর্ব প্রশ্নই ঘনীভূত হইয়া রূপ গ্রহণ করে—ধর্ম ও দেশপ্রেম কিভাবে কোথায় মিলিত হয়? মিলিত যে হইয়াছে, এবং মিলিত যে হয়, ইহাতো অবিসংবাদিত প্রত্যক্ষ সত্য। এখন প্রশ্ন: কিভাবে হয়? এ প্রশ্নের উত্তরও আমরা স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মধ্যে স্পষ্টতম ভাষায় পাইব।

স্বামীজীর প্রচারিত শিক্ষা অনুসারে ধর্ম একটি পারলৌকিক ব্যাপার নয়, ধর্ম ইহজীবনেই সত্যানুভূতি, ধর্ম মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ, মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, ধর্মের চরম আদর্শ অনন্ত বিস্তার, মানুষ ইহজীবনেই তাহা অনুভব করিতে পারে। সকলের মধ্যে যখন নিজেকে অনুভব করা যায়, তখনই মানুষ ঠিক ঠিক মুক্ত হয়, তখন মানুষ সকলের সুখদুঃখ নিজের বলিয়া অনুভব করে, এবং দুঃখ দূর করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে। অর্থাৎ দেখা গেল, ধর্মের চরম অনুভূতি জীবনে রূপায়িত হয় মানবপ্রেমে ও মানব-সেবায়, দেশপ্রেমও প্রকৃতপক্ষে দেশবাসীর সেবা, সেই হিসাবে উহা মানব-সেবারই অন্তর্ভুক্ত।

* * *

এই শতবার্ষিকীর শুভ অবসরে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী নানাদিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে, ইহা অবশ্যই শুভ লক্ষণ। নানাস্থানে বিবিধ উদ্যোগ-আয়োজনে বিভিন্ন প্রকার বক্তাও আমন্ত্রিত হইতেছেন, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিকগণেরই আহ্বান সর্বাগ্রে, সঙ্গীতশিল্পিগণ তো আছেনই সভাকে মাধুর্য-মণ্ডিত করিবার জন্য। অনেক উদ্যোক্তারা মনে করেন, স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে আয়োজিত সভায় একজন সাধু সন্ন্যাসীও একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু অনেক

সময় উদ্যোক্তারা একটু মুস্কিলে পড়েন—সন্ন্যাসী বক্তা কি বলিয়া ফেলিবেন তাহা লইয়া, যদি তিনি বলেন, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—অথবা যদি বলিয়া ফেলেন, 'সংসার ত্যাগ না করিলে কিছুই হইবে না', তবে তো এতো উদ্যোগ আয়োজন সবই পণ্ড।

তাই উদ্যোক্তারা পূর্বাহ্ণেই সন্ন্যাসী বক্তাকে চুপি চুপি বলিয়া যান, স্বামীজীর দেশপ্রেমের দিকটাই বেশী করিয়া বলিবেন, ধর্ম টর্ম আজকাল লোকে ঠিক বোঝেও না, চায়ও না, স্বামীজীর দেশপ্রেম, মানবপ্রেম—এই দিকটার ওপরেই জোর দিবেন।

কথাগুলি অনুধাবনীয়। সত্যই ভারতে স্বামীজীর যে আবেদন তাহা প্রধানতঃ দেশপ্রেমমূলক;—দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী বা Patriot Saint ইহাই আমাদের সংবাদ-পত্রাদিতে স্বামীজী সম্বন্ধে বহুল-ব্যবহৃত বিশেষণ।

কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে, স্বামীজীর এই অপূর্ব দেশপ্রেমের উৎস ও ভিত্তি ছিল ধর্ম, যাহার অপর নাম আধ্যাত্মিক অনুভূতি—সর্বভূতে আত্মানুভূতি!

স্বামীজীর কর্মপ্রচেষ্টা ভারতেই নিঃশেষিত হয় নাই, তিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন, 'আমেরিকায় ও ইওরোপে আমি আমার জীবনের অর্ধেকের বেশি শক্তি ক্ষয় করিয়াছি।' কেন? এক সময় আমরা মনে করিতাম, উহার মূলেও তাঁহার ভারত-প্রেম। ভারতের উন্নয়ন ও নবজাগরণ স্বামীজীর পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচার ফলস্বরূপ দেখা দিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু পাশ্চাত্যে ধর্ম প্রচারের নিজস্ব মূল্য একটা আছে, তাহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। স্বামীজী বর্তমান যুগের জগদ্‌গুরু, এ-যুগের সমগ্র মানবজাতির সমস্যা সমাধানের ভার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার উপর দিয়া গিয়াছেন; কিভাবে এ যুগের মানুষ সন্দেহ সংশয় অতিক্রম করিয়া, স্বার্থপূর্ণ ভোগময় জীবনকে অতিক্রম করিয়া চরম সত্য উপলব্ধি করিবে—জীবন সার্থক করিবে—গুরুপ্রদত্ত শিক্ষা অনুযায়ী স্বামীজী তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন; দেশকালপাত্র-ভেদে ইহা নানারূপ গ্রহণ করিয়াছে ও করিবে। বিদেশে ইহা আধ্যাত্মিক বেদান্ত-আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে, এবং দেশে ইহা ধর্মভিত্তিক দেশপ্রেম ও মানবসেবার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। স্বামীজীর জীবনে ভগবৎপ্রেম, মানবপ্রেম ও দেশপ্রেম সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সঙ্গীতের সুরের মতো ধাপে ধাপে উঠিয়াছে ও নামিয়াছে।

বেলুড়ে বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়*

একটি পরিকল্পনা ও আবেদন

[রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রকাশিত]

ভারতে এখন জাতীয় ভিত্তিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিক অনুষ্ঠান চলিতেছে। অল্পাধিক সাময়িক ভাবের অনুষ্ঠানাদি ব্যতীত বহু প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্বামীজীর স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে নানাবিধ স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। রামকৃষ্ণ-মিশন-কর্তৃপক্ষ স্বামীজীর জন্মের শততম বর্ষে তাঁহার নামে বেলুড়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করিবার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা প্রয়োজনীয় আইনসঙ্গত অনুমোদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রেরণ করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত শিক্ষার আদর্শ তাঁহার রচনা ও বক্তৃতায় ছড়াইয়া রহিয়াছে; তাহা সুবিদিত, অতএব পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তিনি মনে করিতেন, শিক্ষা 'মানুষের ভিতরেই পূর্ণতার বিকাশ' এবং তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীতে সকল শিক্ষা ও অনুশীলনের লক্ষ্য মানুষ তৈয়ারী করা। স্বামাজীর দৃষ্টিতে 'শিক্ষা দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনোবল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধি প্রশস্ত হয় এবং মানুষ তাহার নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে।'

স্বামীজীর মতে ভারতীয়দের প্রকৃত শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রাচীন ভারতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যে-সব উন্নতিলাভ করিয়াছিল, সেগুলির সহিত অধুনা পাশ্চাত্যের উন্নত বিজ্ঞান এবং শিল্পবিদ্যা পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের ব্যক্তিত্ব-গঠন এবং আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য এই উভয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন আবশ্যক। এই সকল ভাব বাস্তবে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে স্বামীজী তাঁহার স্থাপিত রামকৃষ্ণ সংঘের আনুকূল্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কর্মকেন্দ্র বেলুড়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথাও চিন্তা করেন। এই পরিকল্পনা পরিপূর্ণভাবে আমাদের ঐতিহ্য-সম্মত।

প্রাচীন ভারতে নালন্দা ও বিক্রমশীলার ন্যায় আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র-রূপে বিকশিত বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিরাট ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। ইহা আকস্মিক ঘটনা নহে, পরন্তু একটি পবিত্র পরিবেশে মানব-কল্যাণে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছিল। এইরূপ সংস্পর্শের মূল্য অতিরঞ্জিত করা যায় না। স্বামীজীর মতে শিক্ষক ও বিদ্যার্থীর মধ্যে এই ব্যক্তিগত সংস্পর্শের অভাবেই বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয় নাই-- এই পদ্ধতিই ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের সকল শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি। এক সঙ্গে বিভিন্ন বিজ্ঞানের তত্ত্বগত বিদ্যা এবং জীবনে তাহাদের ব্যাবহারিক প্রয়োগ-শিক্ষা দ্বারা আধুনিক শিক্ষার পরিধি বিস্তৃত করার প্রয়োজন সম্বন্ধে স্বামীজী সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

---

* গত ২৪শে এপ্রিল বুধবার অপরাহ্ণে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক-সম্মেলনে (Press conference) প্রদত্ত বিবৃতির অনুবাদ।

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'রামকৃষ্ণ মিশন' উহার বরণীয় প্রতিষ্ঠাতার নির্ধারিত পথে সুশিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। ইহার ফলে মিশনের প্রযত্নে ও তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী বহু কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত কয়েক দশকে এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রশংসনীয় ফল আমাদের দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অধিকন্তু ছাত্রাবাসে সাধুদের স্নেহযত্ন, নিয়মশৃঙ্খলা ও তত্ত্বাবধানে সর্বপ্রকার ব্যাবহারিক শিক্ষা এবং শিক্ষক ও বিদ্যার্থীর মধ্যে একটা সুস্থ সম্পর্ক বিদ্যার্থীদের চরিত্রগঠনে শুভ ফল দেয়। এই সকল এবং ঐরূপ অন্যান্য কারণে মিশনের প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসাধারণের নিকট এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে ভরতি হইবার জন্য সর্বদাই ভিড় লাগিয়া থাকে। এই নিয়ত চাপে মিশনকে শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার কার্যাবলী বহুদিকে প্রসারিত করিতে হইয়াছে। যাহার ফলে মিশন বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি মহাবিদ্যালয়, বহু উচ্চ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় এবং নানাপ্রকার শিল্পবিষয়ক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালাইতেছে।

এই সকল কার্যাবলী এখন এমন একটি অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, সম্পূর্ণরূপে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি স্বতন্ত্র কর্তৃত্বাধীনে মিলিত হইলে ঐগুলির আরও উন্নতি সাধিত হইবে। স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে একটি শিক্ষাদানকারী ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেই ইহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব।

১৯৩৯ খৃঃ মার্চ মাসে বেলুড়ে মিশনের প্রথম ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ 'বিদ্যামন্দির' শুরু করার সময় মিশনের পরিচালকবর্গের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব হইতেই দেখা যাইবে যে, ইহা একটি সহসা-কল্পিত ধারণা নহে, পরন্তু ইহার প্রতি সর্বদাই রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ছিল :

'প্রস্তাবিত মহাবিদ্যালয়টি স্বামীজীর পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত-রূপেই বিবেচিত হইবে, এবং সেইজন্য যখনই সম্ভব ইহার সহিত অন্যান্য শাখা যুক্ত করা হইবে, যথা ধর্মতত্ত্ব, শিল্প ও কৃষি-শিক্ষায়তন, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ইত্যাদি, এবং যখন স্বামীজীর ভাবে একটি ব্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকরী করিবার প্রকৃষ্ট সময় উপস্থিত হইবে, এই প্রস্তাবিত কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্পর্কচ্যুত করা হইবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-কমিশন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভের সমর্থন করিয়া অন্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁহাদের বিবরণীতে বলেন (৫৪৮ পৃঃ): 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্য-কমিশন কোন প্রতিষ্ঠানের মান নির্ণয় এবং সাহায্যের পরিমাণ স্থির করিবার সময় উক্ত প্রতিষ্ঠান অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে—এই বিচারে পরিচালিত হওয়া অনুচিত, বরং ঐ প্রতিষ্ঠানে ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে যথেষ্ট দান আছে কিনা এই বিচার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। বৈচিত্র্যের সহিত উৎকর্ষকে উৎসাহ দিলে ভারতের শিক্ষা-সম্পদ সমৃদ্ধ হইবে।'

আশা করা যায়, বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বোক্ত আদর্শকে রূপ দিতে সমর্থ হইবে এবং তদুপরি ইহার বিদ্যার্থীদিগকে ভারতীয় ঐতিহ্যের যোগ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সুযোগদান করিবে।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা খুবই উচ্চাভিলাষপূর্ণ সন্দেহ নাই। প্রারম্ভেই বহু অর্থ প্রয়োজন হইবে। খুবই আনন্দের বিষয়—কলিকাতা-নিবাসী শ্রীবলরাম রায় (পূর্ববসতি পাকিস্থানের ভাগ্যকুল) এই উদ্দেশ্যে রাজোচিত দান করিতে অগ্রবর্তী হইয়াছেন। আমরা সাগ্রহে আশা করিতেছি যে, আমাদের দানশীল দেশবাসীদের মধ্যে যাঁহাদের ছাত্র-সমাজের জন্য প্রকৃত ভালবাসা আছে এবং বরণীয় স্বামীজী যে ঈষৎ আভাস দিয়াছেন, সেইরূপ জাতীয় ধারায় যাঁহারা তাহাদিগকে শিক্ষিত হইতে দেখিতে চান, তাঁহারা তাঁহাদের দানের অংশ যোগ করিয়া এই শততম বৎসরের মধ্যেই বিবেকানন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তুলিবেন।

দান আয়কর-মুক্ত হইবে এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন :

(১) জেনারেল সেক্রেটারি
রামকৃষ্ণ মিশন,
পোঃ—বেলুড় মঠ, জিঃ—হাওড়া।
(ফোন :—৬৬-২৩৯১)

(২) সেক্রেটারি
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ,
পোঃ—বেলুড় মঠ, জিঃ—হাওড়া।
(ফোন :—৬৬-৩২৯২)

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর একটি অপ্রকাশিত পত্র

প্রিয় শর্বানন্দ,

কিছুকাল পূর্বে তোমার এক পত্র পাইয়াছিলাম, কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় এ যাবৎ তোমায় লিখিতে পারি নাই। আজ উত্তর দিব। বিষয়টি কঠিন, তবুও সাধ্যমত চেষ্টা করা যাউক, প্রভুর কৃপায় যদি সম্ভব হয়।

ঠাকুরের মত বলা বড় সহজ নয়। আমার মনে হয় সকল ধর্মমতকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন, 'যত মত তত পথ।' সকল মত তিনি নিজে সাধন ক'রে 'এক সত্যে পৌঁছানো যায়'—অনুভব ক'রে তবে পূর্বের অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পারমার্থিক সত্য এক অদ্বৈত, যাকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান ইত্যাদি অনেক নামে অভিহিত করা হয়। যিনি ঐ সত্য (Truth) উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি উহা নিজের সংস্কার ও রুচি অনুযায়ী প্রকাশ করিতে বিশেষ নাম দিয়াছেন।

কিন্তু কেহই 'পরিপূর্ণ সমগ্র সত্য' কি, তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। 'তিনি যাহা, তিনি তাহাই'—এই মনোভাবই উপলব্ধিমান্ ব্যক্তিসকলের চরম সিদ্ধান্ত।

অবস্থাবিশেষে গৌড়পাদের অজাতবাদ, শঙ্করের বিবর্তবাদ, রামানুজের পরিণামবাদ অথবা শিবাদ্বৈতবাদ—সকলই সত্য।

আবার এ-সকল ছাড়া তিনি 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'। ঐ সকল মতবাদের প্রতিষ্ঠাতাগণ (প্রবর্তকগণ) তপস্যা করিয়াছেন এবং ভগবানের বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই নির্দেশে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন।

তাঁহাকে লইয়াই সকল বাদ, কিন্তু তিনি বাদবিচারের পারে—এই সত্যটি প্রচার করাই যেন ঠাকুরের মত বলিয়া মনে হয়।

'দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽস্মি তে জীববুদ্ধ্যা তদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহং ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥'

ইহাই তিনি উত্তম সিদ্ধান্ত বলিয়া বলিতেন। আর 'চিন্ময়-কোলাকুলি' কেন হবে না?

'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্'—তিনি ভিন্ন তো কিছুই নাই, সবই তো 'তিনি'। আমরা তাঁকে না দেখেই তো অন্য জিনিস দেখি—নতুবা তিনিই সব। নামরূপ তো তাঁ থেকেই এবং তাঁতেই। তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদ্—জল ছাড়া তো কিছুই না। এতে তোমার বিবর্তবাদ থাক আর যাক।

এ সত্য যে দেখেছে, সে আর মিথ্যা বলতে পারে না। তবে ঠাকুরের এমন অবস্থা হয়ে যেত, যখন তিনি ভাবাতীত হয়ে যেতেন। তখন নামরূপ থাকত না, তার পারে যেতেন। সে অবাঙ্‌মনসোগোচর অবস্থা। তখনও সেই একই আছেন—অদ্বৈত, আর কিছু নাই। সেখানে বিবর্ত কোথায়, অজাতই বা কোথায়? বিবর্ত, অজাত, পরিণাম তাতেই হচ্ছে। তিনি মাত্র সত্য। আবার তা থেকে যে জীব-জগৎ হচ্ছে। তাও সত্য, যদি তাঁকে না ভোলা যায়। তাঁকে ভুলে নামরূপ দেখলেই মিথ্যা হয়ে গেল। কেন? না, তারা থাকে না। কিন্তু যদি তাঁকে মনে থাকে, তবে বুঝতে পারি 'মাঝেরই খোল, খোলেরই মাঝ'। 'ময়া ততমিদং সর্বম্,' 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতম্' ইত্যাদি তখন যেন বোঝা যায়।

আসল কথা তাঁকে দেখতে হবে। তাঁকে দেখলে আর কিছুই থাকে না। সব 'তিনিময়' বোধ হয়ে যায়। তাঁকে দেখবার আগে অবধি যত গোল, যত বাদ-বিবাদ। তাঁকে দেখলে সব গোল মেটে। তাঁকে জানলেই নিরাবিল শান্তি।

ঠাকুরের মত অতএব এইরূপ: যে-কোন উপায়ে, যা হোক ক'রে তাঁকে পাইতে হইবে। 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে কর'—ইহার অর্থ একবার যদি তাঁকে পাও, তবে তোমার রুচি অনুসারে যে-কোন মত-পোষণে আসে যায় না। তাঁকে জানলেই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। তখন আর কোন বন্ধন থাকে না। মৃত্যুর অনন্তর, তুমি দেহান্তর গ্রহণ কর বা না কর, সে তোমার খুশি।

যারা নির্বাণাকাঙ্ক্ষী, তারা জগৎকে স্বপ্নবৎ জ্ঞান করে, তারা নৈর্ব্যক্তিক imper-(sonal—নিরুপাধিক) ব্রহ্মে মন ডুবাইয়া দেয় এবং তাঁতেই একীভূত হয়। যারা ভক্ত, ভগবানে আসক্ত, তারা জগৎকে ভগবানেরই প্রকাশ মনে করে, তাঁহারই শক্তির বিকাশ জানে। ইঁহারা সচ্চিদানন্দ ভগবানের সহিত নিজেদের যুক্ত রাখে, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণে ভয় পায় না—নিজেদের ভগবানের খেলার সাথী মনে করে এবং খেলিতেই আসে। তাঁর নিকট কিছুই চাহে না, আত্মারাম হইয়া ভগবানে প্রীতিযুক্ত হয়, নির্বাণ দিলেও গ্রহণ করে না। আজ এই পর্যন্তই।

তুরীয়ানন্দ

নিউইয়র্কে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী*

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দের বাণী

রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

যখন বিদেশীর পদানত ভারত আত্মবিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তখন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের জীবনপ্রদ বাণী, শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী এবং সহজাত দেবত্বের ভিত্তিতে মানুষের ঐক্যের বাণী বহন করিয়া লইয়া যান। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও প্রতীচ্যের কর্মপ্রবণতায় সংঘর্ষ ঘটিল এবং উভয়ের মধ্যে পরিবর্তন সম্পাদন করিয়া মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক সর্বজনীন মঙ্গলের যুগ আনয়ন করিল। মহান্ স্বামীজীর জন্মের শততম বর্ষ স্থায়ী শান্তি ও মানব-জাতির ভ্রাতৃত্ব-বোধ অর্জনের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র তাঁহার বাণী-প্রচারে উৎসর্গ করা উচিত।

আমি তোমাদের শতবার্ষিক উৎসবাদির সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

(স্বাক্ষর) **স্বামী মাধবানন্দ**

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের বাণী

রাষ্ট্রপতি-ভবন, নয়া দিল্লী ৪

নিউইয়র্কে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী সম্পাদিত হইবে জানিয়া আমি সুখী হইয়াছি। স্বয়ং একজন বিশিষ্ট ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি হইয়াও স্বামীজী হিন্দুধর্ম ও দর্শনের উচ্চতম আদর্শসকল অভ্যাস এবং প্রচার করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, দরিদ্র ও অনুন্নতের সেবাই যথার্থ আরাধনা। এবং তাঁহার শিষ্যবর্গকে জাতি-সম্প্রদায়-ধর্ম-নির্বিশেষে সেবাব্রতে নিযুক্ত হইতে তিনি নির্দেশ দেন। তাঁহার উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও গভীর মানব-প্রেমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় স্থানেই তিনি বহু শিষ্য আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। নিউইয়র্ক কয়েক বৎসর তাঁহার কর্মকেন্দ্র ছিল এবং সেখানে তাঁহার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

(স্বাক্ষর) **এস. রাধাকৃষ্ণন**

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বাণী

প্রধানমন্ত্রীর আবাস, নয়া দিল্লী

নিউইয়র্কে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইবে জানিয়া আমি প্রীত হইলাম। ভারতবাসীদের নিকট ইহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তাঁহার সমগ্র জীবন ও উপদেশ আমার সমসাময়িকদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং অদ্যাবধি আমাদের জাতিকে অনুপ্রেরণা যোগাইতেছে। তাঁহার তীব্র স্বদেশপ্রেম বিরাট আধ্যাত্মিকতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলে তাঁহার বাণী শুধু ভারতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীতে কার্যকরী হইয়াছে। আমি তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

৮ই জানুআরি, ১৯৬৩ (স্বাক্ষর) **জওহরলাল নেহরু**

* স্বামী বুধানন্দ-প্রেরিত সংবাদ হইতে অনূদিত।

১৯৬৩ খৃঃ ২৮শে মার্চ নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের উদ্যোগে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ওয়ারউইক্ হোটেলে একটি ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল মাননীয় শ্রী উ থাণ্ট ঐ সন্ধ্যায় প্রধান বক্তা নির্বাচিত হইয়াছিলেন এতদুপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আমেরিকা এবং ভারত-বাসীদের প্রতিনিধিবর্গের এক বিশাল জনতা সম্মিলিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে স্বামী পবিত্রানন্দ, নিত্যস্বরূপানন্দ এবং সর্বগতানন্দও উপস্থিত ছিলেন। স্বামী নিখিলানন্দ কর্তৃক স্তোত্র পাঠের পর ভোজ আরম্ভ হয়। ভোজ চলিতে থাকিলে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিবেকানন্দ-স্মারক ডাক-টিকিট বিতরণ করা হইয়াছিল।

ভোজ-শেষে স্বামী বুধানন্দ প্রার্থনা করার পরে সভা আরম্ভ হয়। নিউইয়র্ক কেন্দ্রের সহকারী সভাপতি জন. পি. রাদারফোর্ড সান্ধ্য ভোজের প্রারম্ভিক কর্তব্য সম্পাদন করিয়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ, ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন ও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বাণী পাঠ করেন।[১]

রাদারফোর্ড ক্ষুদ্র উপক্রমণিকায় অতিথি-গণকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, এখানে সম্মিলিত প্রত্যেকের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সম্পদ আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর মাধ্যমেই বিতরিত হয়।

ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে ভারতের রাষ্ট্রদূত মাননীয় শ্রীবি. কে. নেহরু এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্যই বিশেষভাবে নিউইয়র্কে আসিয়াছিলেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করিয়া শ্রীনেহরু একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশা-বলীর বৈপ্লবিক সংঘাতই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনয়নে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। তিনি গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশের মূল্য সর্বকালে ও সর্বদেশে বর্তমান। শ্রীনেহরু সমবেত ব্যক্তি-বর্গকে এই সংবাদও দেন যে, এপ্রিল মাসে ভারতীয় কন্সালেটে এবং নিউইয়র্কের কমিউনিটি গির্জায় এবং মে মাসে নিউইয়র্ক এশিয়া সোসাইটিতে স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হইবে।

'সর্বকালের মহত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন' এবং 'ভারত-ইতিহাসে সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক দূত'—এই বলিয়া উ থাণ্ট মর্মস্পর্শী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মহা স্বামীজীর প্রতীচ্যে বিশেষতঃ আমেরিকায় অবদান পর্যালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের উন্নত জড়-বিজ্ঞানের সহিত প্রাচ্যের উন্নত অধ্যাত্ম-জ্ঞানের মিলন করিতে চেষ্টা করেন। সেক্রেটারি জেনারেল আরও বলেন যে, তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেন, এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা যদি কার্যে পরিণত করা না হয়, তাহা হইলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতিরেকে একমাত্র বুদ্ধি-বৃত্তির উন্নতি অবশ্য আমাদিগকে এক সঙ্কট হইতে অন্য সঙ্কটে চালিত করিবে। তিনি কি সহজ উপায়ে আমেরিকাবাসীদিগকে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইতে উ থাণ্ট স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলী হইতে কতক অংশ পাঠ করেন। মানবজাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য

১ এগুলির অনুবাদ পূর্বপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পৃথিবীর সকল ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের সহনশীলতার বাণী অনুসরণ করার চূড়ান্ত গুরুত্বের প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীভিন্‌সেন্ট শীন শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে স্বামী বিবেকানন্দের ক্রমিক রূপান্তর, আমেরিকার কার্য এবং তিনি তাঁহার জীবনে ও কর্মে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও সামাজিক চেতনার কিরূপ মিলন সাধন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করেন।

প্রাচীনদিগের উপর স্বামীজীর প্রভাব এবং কিরূপে একই প্রকার ভাবধারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গান্ধীজীর ন্যায় মহান্ ব্যক্তিদের জীবনে আশ্চর্যভাবে পরিস্ফুট হয়, তাহা বিবৃত করেন নিউইয়র্কের ভারতীয় কন্‌সাল জেনারেল শ্রী এস. কে. রায়।

স্বামী নিখিলানন্দ উপসংহারে মন্তব্য করেন, বর্তমান রাষ্ট্রসংঘে আমরা স্বামীজীর বিশ্বমানব-সংসদের অলৌকিক দর্শন আংশিক ভাবে সফল দেখিতে পাই। ধন্যবাদ-প্রস্তাবনায় স্বামী নিখিলানন্দ বলেন, অনুষ্ঠানে উ থাণ্ট যোগদান করায় এই অনুষ্ঠান যে সত্যই সর্বজনীন, তাহা প্রকটিত হইয়াছে।

যাঁহারা ভোজে অংশ গ্রহণ করেন, অনুষ্ঠানের পরে তাঁহারা সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন। 'আজ সন্ধ্যায় এ-স্থানে উপস্থিত থাকা একটি অসামান্য সৌভাগ্যের কথা'—এই বলিয়া নিউইয়র্কের একজন অস্ত্রচিকিৎসক সম্ভবতঃ সকলের অনুভূতিই সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।[১]

১ মাননীয় উ. থাণ্ট ও স্বামী নিখিলানন্দজীর বক্তৃতার অনুবাদ আগামী কোন মাসে প্রকাশিত হইবে।

সরকারী ভাষা : সংস্কৃতের দাবি

অধ্যাপক শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী

[লোকসভার সাম্প্রতিক অধিবেশনে এ সমস্যার সাময়িক নিষ্পত্তি হইয়াছে। তথাপি সমস্যাটি সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া প্রবন্ধটি আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম—উঃ সঃ।]

গত ১৭ই ফেব্রুআরি পার্লামেণ্ট-ভবনে দলীয় সভায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, এই ১৯৬৫ খৃঃ পরেও রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজী সহযোগী (Associate) ভাষা হিসাবে থাকবে।

কিন্তু কথা হ'ল, দেশবাসীর মন যদি কোন সিদ্ধান্তকে সহজভাবে মেনে না নেয়, তবে কি ভাবে তা মানানো যাবে? প্রধানমন্ত্রীর মুখেই আমাদের প্রশ্ন: ভারতব্যাপী ভাষাবিরোধের ভাব দূর করার উপায় কি?

পূর্বোক্ত সভায় মহীশূরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহনুমান্থাইয়া বলেন, একমাত্র সংস্কৃতভিত্তিক হিন্দীই দাক্ষিণাত্যে চলতে পারে। তাঁর মতে দাক্ষিণাত্য হিন্দীকে মানবে সংস্কৃতের খাতিরে। এই কথার মধ্যেই ভাষা সমস্যা সমাধানের প্রকৃত সূত্রটি বিদ্যমান। সংস্কৃতের প্রতি দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ লোকের শ্রদ্ধা আছে, আর উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত ভাষার জননীরূপা সংস্কৃত ভাষা। হিন্দীর জায়গায় সংস্কৃতকে গ্রহণ ক'রে সেই সঙ্গে ইংরেজী রাখলেই সমস্ত বিবাদ মেটে না কি?

অধুনা জাতীয় সংহতি নিয়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের শিরঃপীড়ার অন্ত নেই। এই ঐক্য বা সংহতির সমস্যা নিতান্তই সাম্প্রতিক, অথচ বর্তমানের ন্যায় কোন কালে ভারতভূমির এত বিরাট অংশ একটিমাত্র শাসন-যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত

ছিল না। কাজেই এ-কথা মানতেই হবে, যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে যে জাতীয় ঐক্য বিরাজ করেছে, তা রাষ্ট্র—তথা শাসনব্যবস্থাকেন্দ্রিক নয়, তার ভিত্তি সংস্কৃতি। সে সংস্কৃতি হিন্দু-সংস্কৃতি—সঙ্কীর্ণ অর্থে 'হিন্দু' নয়, এতে বৌদ্ধ, জৈন, এমন কি ইসলামেরও দান রয়েছে। হিন্দু সংস্কৃতির ধারক বাহক সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃতের মাধ্যমেই এই সংস্কৃতি পারস্য, মধ্য এশিয়া, চীন, তিব্বত ও দ্বীপময় ভারতে ছড়িয়েছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে মধ্যএশিয়া ও দ্বীপময় ভারতের রাজ্যগুলিতে সংস্কৃতের ব্যাপক চর্চা হয়েছে। কাম্বোজে তো পূজাপার্বণ, রাজকার্য—সব কিছুই পরিচালিত হ'ত সংস্কৃতের মাধ্যমে. সম্রাট্ সপ্তম জয়বর্মনের রানী (দ্বাদশ শতাব্দী) সংস্কৃত ভাষায় অপূর্ব কবিতা লিখতেন। আধুনিক কালেও দেশের অভ্যন্তরে বহুলাংশে এই সংস্কৃতই সাংস্কৃতিক ঐক্যকে ধারণ ক'রে আছে, তার পুষ্টি বিধান নীরবে ক'রে যাচ্ছে। দূর কারিকলের পল্লীতে যেমন, আসামের জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামেও ধর্মীয় মঙ্গলকর্ম সব সম্পন্ন হয় সংস্কৃত ভাষায়।

জাতীয় ঐক্যের বাহন হিসাবে আধুনিক কালে সংস্কৃতের পাশে ইংরেজীর দাবি সর্বাগ্রগণ্য। ইংরেজীর অন্য দাবিও রয়েছে; এটি ভারতীয় নাগরিক এংলো ইণ্ডিয়ানদের মাতৃভাষা। দেড়শ' বছর ধরে বহু ভারতীয় এই ভাষায় ভাবপ্রকাশ ক'রে যে সাহিত্যসম্পদ গড়ে তুলেছেন, তা ভারতীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত। সাহিত্য আকাদামি এই Indo-Anglican সাহিত্যকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছে। সর্বোপরি ইংরেজী সর্বাপেক্ষা দ্রুত প্রসারশীল আন্তর্জাতিক ভাষা, আমাদের পক্ষে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের প্রকৃষ্ট মাধ্যম।

জাতীয় সংহতির ব্যাপারে আর একটি বিষয় স্মরণীয়। সামগ্রিকভাবে যেমন ভারতের একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য রয়েছে, তেমনি বৃহত্তর ভারতের মধ্যে আঞ্চলিক সংস্কৃতি-স্বাতন্ত্র্যও বিদ্যমান। ভারতবর্ষকে যদি 'নেশন' (জাতি) বলা হয়, তবে বাংলা, উড়িষ্যা, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতিকে 'sub-nation' (উপজাতি) ব'লে গণ্য করতে হবে। এই সাব-নেশনগুলির বিশিষ্ট দানেই সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি পুষ্ট ও সমৃদ্ধ। এই আঞ্চলিক সংস্কৃতিগুলির প্রাণকেন্দ্র সেই সেই অঞ্চলের ভাষা অর্থাৎ বাংলা, উড়িয়া, কানাড়ী, মারাঠী প্রভৃতি। এই সমস্ত ভাষা কোণঠাসা হ'লে আঞ্চলিক সংস্কৃতিগুলি পঙ্গু হ'য়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংহতিতেও ধরবে ঘুন

সংস্কৃত এবং ইংরেজী কোন ভাষা থেকেই প্রাদেশিক ভাষাগুলির বিপদের আশঙ্কা নেই। সংস্কৃত প্রথম থেকেই এবং আধুনিক কালে ইংরেজী এই সমস্ত ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি বিধান ক'রে যাচ্ছে। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা না হ'লে শিক্ষাক্ষেত্রে—মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষণীয় ভাষার সংখ্যা এবং উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যমের ব্যাপারে যে সমস্যা ও বিরোধ, তারও অবসান ঘটতে পারে। মাধ্যমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা, সংস্কৃত ও ইংরেজী এবং উচ্চতর পর্যায়ের মাধ্যম বিষয় ও অবস্থাভেদে মাতৃভাষা, ইংরেজী অথবা সংস্কৃত স্থিরীকৃত হ'তে পারে। সরকারী কাজকর্ম ও সর্ব-ভারতীয় পরীক্ষা কোন্ ভাষায় হবে, তা ঠিক করতে গিয়েই যত গোলযোগের সৃষ্টি হচ্ছে

হিন্দীকে কেন্দ্র ক'রে এ পর্যন্ত যে বাদ-বিতণ্ডা বিরোধ-সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে দেশে, তা নিমেষে বন্ধ হয়ে যায়, যদি সংস্কৃত ও তৎসঙ্গে ইংরেজীকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তাতে দাক্ষিণাত্যের

আপত্তি থাকবে না, উত্তরাবর্তেরও থাকার কারণ নেই ; প্রাচীনপন্থী নবীনপন্থী সমন্বয়বাদী কারও অসন্তোষের কারণ ঘটবে না। যে স্বাজাত্যের দোহাই দিয়ে ইংরেজী সরিয়ে হিন্দীকে বসাবার চেষ্টা হচ্ছে, সে স্বাজাত্যেরও পরীক্ষা হয়ে যাবে। (যদি সত্যি আমরা স্বদেশী ভাষা চাই, তবে সংস্কৃতকে সর্বথা ব্যবহার্য ক'রে তোলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রব, এবং একমাত্র সংস্কৃতই সমগ্র ভারতের পক্ষে স্বদেশী ভাষা। আমার তো মনে হয়, যে পরিমাণ শক্তি ও অর্থ-নিয়োগ এ পর্যন্ত হিন্দী-প্রচারে হয়েছে, তা যদি সংস্কৃতের জন্যে হয়, তবে সংস্কৃত ব্যাপকতর প্রসার লাভ করবে, কারণ আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়ে লোকে এই ভাষার চর্চা করবে। (সংস্কৃত ত্যাগ করতে যে আমরা প্রস্তুত নই, তার প্রমাণ বিশেষ কোন উৎসাহ না পেয়েও বহু বিদ্যার্থী, সাহিত্যসেবী, সংস্কৃতিকামী, শাস্ত্রানুরাগী, ধর্মজিজ্ঞাসু তার চর্চা ক'রে যাচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায় থেকে আমরা তাকে বিসর্জন দিতে চাইছি না। আর এ ভাষা মৃত—এ অপবাদ সর্বৈব মিথ্যা, শুধু পূজাপার্বণ ক্রিয়াকাণ্ডেই যে এর ব্যবহার টিকে আছে, তা নয়, এখনও শাস্ত্রী-মহলে আন্তঃপ্রাদেশিক আলোচনা এই ভাষায় হয়ে থাকে, এখনও অজস্র পুস্তক ও সাময়িক পত্র এই ভাষায় রচিত হচ্ছে। ডক্টর ডি. রাঘবন Contemporary Indian Literature (সাহিত্য আকাদামি প্রকাশিত) গ্রন্থে আধুনিক যুগে সংস্কৃত-চর্চার বিবরণী দিতে গিয়ে লিখছেন, '...in the same cadence and diction in which Kalidasa and Bana composed, a Sanskritist to-day writes his verse or prose.'

এ-কথা সত্যি যে, ঘরেও সংস্কৃত ব্যবহার করেন এমন লোকের সংখ্যা বেশি নেই। কিন্তু ভারতের মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিতের কয়জনে ঘরেও ইংরেজী ব্যবহার ক'রে থাকেন? তাই ব'লে কি আমরা ও-ভাষায় পঠন-পাঠন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাষ্ট্রপরিচালনা প্রভৃতি চালিয়ে যাচ্ছি না? তা ছাড়া সংস্কৃত না বললেও যে-ভাষা আমরা ব্যবহার করি, তাতে কি সংস্কৃত শব্দই কি উত্তরে কি দক্ষিণে একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে নেই? সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে এও দেখা যায় যে, রাজকার্য ও সংস্কৃতি ব্যাপারের মাধ্যম হিসাবে এই ভাষা তখনই পরিণতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল, যখন লোকে ঘরোয়া ব্যাপারে এর ব্যবহার প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল :

'Though it appears paradoxical at first sight, the Sanskrit language only reached its full development as a language of culture and administration at a time when it had ceased to be a mother tongue.' (T. Burrow. The Sanskrit Language. P. 57, 1955)

আর একটি কথা স্মরণীয় : নবভারতের নির্মাতা রামমোহন, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, তিলক, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মহামনীষী ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী হলেও তাঁদের ব্যক্তিত্বের মূল বৈদিক সাহিত্য এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই সংস্কৃতে ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য।) তাঁরা যে আদর্শবাদ যে অধ্যাত্ম-দর্শনকে আধুনিক ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও মুক্তির উপায় হিসাবে নির্দেশ ক'রে গেছেন, তার সঙ্গে ভারতবাসী যোগ হারিয়ে ফেলবে, যদি কারিগরী বিদ্যার এই ব্যাপক প্রসারের যুগে সংস্কৃত ভাষাকে জাগিয়ে না রাখা হয়।

(কাজেই সরকারী ভাষা হিসাবে সংস্কৃতকে গ্রহণ করার প্রস্তাবের মধ্যে অযৌক্তিক বা উদ্ভট কিছু নেই। যদি ক্ষুদ্র ইস্রাইল রাষ্ট্র মৃত হিব্রুকে জাগিয়ে তুলে সব কাজে লাগাতে পারে, তবে আমরাও বহুল ব্যবহৃত সংস্কৃতকে যথার্থ রাষ্ট্রভাষা ক'রে তুলতে পারব—এ আশা মোটেই দুরাশা নয়।

ভাষাবিরোধ মীমাংসার উপায় সংস্কৃতকে চালু করা এবং তার সঙ্গে ইংরেজীও রাখা।)

দ্রষ্টা ও দৃশ্য

স্বামী সুন্দরানন্দ

বেদান্ত-মতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা আত্মা দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদির একমাত্র অধিষ্ঠান-সত্তা বা আশ্রয় হইলেও ইহাদের জন্মদাতা নহেন। এই যুক্তিপূর্ণ দর্শন ব্যাবহারিকভাবে সকল প্রাণী ও পদার্থের জায়মানতা স্বীকার করিলেও পারমার্থিক তত্ত্বদৃষ্টিতে এক নিত্য ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন প্রাণী ও পদার্থের আত্যন্তিক সত্তা স্বীকার করেন না। বেদান্তের দৃষ্টিতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। জগতের সকল জীব ও বস্তুর অনিত্য ব্যাবহারিক সত্তা থাকিলেও নিত্য পারমার্থিক সত্তা নাই। বেদান্ত বলেন, 'মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতম্ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ' —দ্বৈত অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন অপর সকলই মিথ্যা মায়া-মাত্র, পরমার্থতঃ একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই সত্য। 'অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভেদ উচ্যতে'—অদ্বৈত ব্রহ্মই প্রকৃত সত্য, দ্বৈত (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যান্য সকলই) তাঁহার অনিত্য ভেদ বা কার্যমাত্র। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেন, 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'—যেমন মৃত্তিকা-নির্মিত ঘট-সরাদি সকল অনিত্য বিকারী বস্তু বাগালম্বন-আশ্রিত এক মৃত্তিকারই বিভিন্ন নাম-মাত্র, এক মৃত্তিকাই সত্য; যেমন সুবর্ণের পরিণামভূত বিভিন্ন অলংকার বাগালম্বনে আরোপিত এক সুবর্ণের বিভিন্ন বিকারী নামমাত্র, কেবল সুবর্ণই সত্য, সেইরূপ একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই নিত্য ও সত্য, জগতের সকলই মিথ্যা—বাগালম্বনে আরোপিত বিভিন্ন নাম-মাত্র। এ-বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ—অদ্বয় ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হইলে দ্বৈতজ্ঞান একেবারে অন্তর্হিত হয়।

এই কারণে বেদান্ত প্রচার করেন, 'স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিৎ বস্তু জায়তে'—স্বতঃ বা পরতঃ কোন বস্তুই জন্মে না। বেদান্ত মতে ব্রহ্ম বা আত্মা নিত্য শাশ্বত সৎ, তিনি 'বাহ্যাভ্যন্তরঃ অজঃ',—বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়তঃ জন্মরহিত। কাজেই তাঁহার জন্ম এবং তাঁহা হইতে অপর কিছুর জন্ম হইতেই পারে না। তাঁহার অজ প্রকৃতি বা সৎস্বরূপ-তাই ইহার কারণ। অসৎ বা অভাব পদার্থও জন্মিতে পারে না, কারণ অসত্তাই তাহার হেতু। আর সদসৎ উভয়াত্মক বিরুদ্ধস্বভাব কল্পিত বস্তুরও জন্ম যুক্তি-বিরুদ্ধ। সুতরাং কোন কিছু যে জন্মে না এবং জন্মিতে পারে না, ইহাই বিচারসিদ্ধ সত্য। তথাপি প্রাণী ও বস্তুর জায়মানতা—জন্ম পরিণাম মৃত্যু লোক-ব্যবহারে স্বীকৃত; কিন্তু বিচারের দিক দিয়া ইহা মায়ামাত্র—মিথ্যা। এই অভিমতের সমর্থনে বৈদান্তিকগণ প্রচার করেন, 'দৃগ্ ব্রহ্ম দৃশ্যং মায়েতি সর্ববেদান্তডিণ্ডিমঃ'—দৃক্ দ্রষ্টা চৈতন্যস্বরূপ নিত্য শাশ্বত সর্বসাক্ষিরূপী বিজ্ঞাতা ব্রহ্ম; দৃশ্য—অনাত্ম জড়, জগৎ প্রপঞ্চ, সুতরাং অনিত্য মায়ামাত্র বলিয়া মিথ্যা। ইহাই সর্ব-বেদান্তের সারমর্ম।

বেদান্ত বলেন, 'মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতম্'—দ্বৈত মনেরই দৃশ্য। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বৈদান্তিকগণ প্রচার করেন, 'অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং চিত্তং স্বপ্নে ন সংশয়ঃ',—স্বপ্নকালে অদ্বয় মনই দ্রষ্টা ও দৃশ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যে দ্বৈত সৃষ্টি করে, ইহাতে কাহারও সন্দেহ দেখা যায় না। কারণ স্বপ্নে দুই থাকে না, এক

মনই দ্রষ্টা ও দৃশ্য দুইভাগে পরিণত হয়। বেদান্ত-মতে তদ্রূপ 'অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ'—জাগ্রৎ অবস্থায়ও যে অদ্বয় মনই দ্বৈতাকারে প্রকাশিত হইয়া ক্রিয়া করে, ইহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ জাগ্রতের দ্রষ্টা ও দৃশ্য এক মনেরই ক্রিয়া। আচার্য শংকর তদীয় ভাষ্যে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, স্বপ্ন-দর্শীর ন্যায় জাগ্রৎ ব্যক্তির দৃশ্য পদার্থসমূহও কেবলই চিত্ত-দৃশ্য, সেইজন্য উহারা চিত্ত হইতে ব্যতিরিক্ত বা পৃথক্ নহে। তাঁহার মতে জীব ও তাহার চিত্ত এতদুভয়ই অন্যোন্যদৃশ্য। কারণ জীবকে অপেক্ষা করিয়া চিত্ত এবং চিত্তকে অপেক্ষা করিয়া জীব। অতএব উভয়েই পরস্পর দৃশ্য-ভাবাপন্ন। এই জন্য বলা হয় যে, এক অদ্বয় ব্রহ্ম ভিন্ন জাগতিক সকল বিষয়ের ন্যায় চিত্ত এবং উহার দৃশ্যও মায়ামাত্র—অসৎ - মিথ্যা। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থায় চিত্ত ও দৃশ্য উভয়েরই অস্তিত্ব একেবারেই থাকে না।

বেদান্তের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আচার্য শংকর বলেন, 'আত্মবিজ্ঞানস্বরূপম্ এব চিত্তমিতি' —চিত্ত আত্মবিজ্ঞানস্বরূপ। অর্থাৎ চিত্ত ব্রহ্ম বা আত্মার বিজ্ঞানস্বরূপের প্রতিবিম্ব। চিত্ত কোন বাহ্যদৃশ্য-জাত নয় এবং বাহ্যদৃশ্যও চিত্ত-জাত নহে। কারণ মানুষের বাহ্য আভ্যন্তর সকল ভাবই জ্ঞানের স্ফুরণ, তিনি আরও বলিয়াছেন,—'চিত্তম্ (মনঃ) অর্থং ন সংস্পৃশতি, অর্থাভাসং চ তথা এব'—মন কখনই বাহ্য পদার্থ এবং অর্থাভাস (মনঃকল্পিত বিষয়) গ্রহণ করে না। কারণ উভয়েই মায়ামাত্র— মিথ্যা। দেখা যায়—স্বপ্নকালে বাহ্যদৃশ্য বিদ্যমান না থাকিলেও মন নিজেই দৃশ্যাকারে প্রতিভাসমান হয়, ইহাই মনের স্বভাব। এই সকল কারণে বেদান্ত বলেন, 'তস্মান্ন জায়তে চিত্তং চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে'—প্রকৃতপক্ষে মন জন্মে না এবং মনের দৃশ্যাদিও জন্মে না। কারিকোপেত-মাণ্ডুক্যোপনিষৎ বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, যাঁহারা মনের জন্ম দর্শন করেন, তাঁহারা আকাশেও পক্ষীর পদচিহ্ন দেখিতে পান। আচার্য শংকর বলিয়াছেন, চিত্তকে যে ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয়, ইহা মিথ্যা, কারণ বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়তঃ 'অজ'ই ব্রহ্মের প্রকৃতি। সুতরাং সেই অজ হইতে চিত্তের বা অন্য কিছুর জন্ম স্ববিরোধী। বেদান্ত-মতে মন প্রভৃতি দ্বৈতের জায়মানতা অসিদ্ধ হইলেও উহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মিথ্যা নিশ্চিত বুদ্ধিকে 'ভূতাভিনিবেশ' বলা হয়। দ্বৈতের অসত্তা 'কেবলমেকমেব' অদ্বয় ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞান দৃঢ় হইলে অজ্ঞানজনিত 'ভূতাভিনিবেশ' নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আচার্য শংকরের মতে 'চিত্তং নির্বিষয়ং (বিষয়-সম্বন্ধশূন্যম্ আত্মস্বরূপমেব) তেন নিত্যম্ অসঙ্গম্ (নির্বিকারং) কীর্তিতম্'—প্রকৃতপক্ষে চিত্তও স্বভাবতঃ নির্বিষয় আত্মজ্ঞান-স্বরূপ। এইরূপ স্বভাব-বিশিষ্ট বলিয়াই পরিণামে ইহা অদ্বয়ব্রহ্মে বিলীন হয়। অদ্বয় বৃত্তির দ্বারা অজ্ঞান সম্পূর্ণ বাধিত হইলেই মনের পক্ষে ইহা সম্ভব হইয়া থাকে।

মনের এই অবস্থা সম্বন্ধে 'উপদেশসার' গ্রন্থে প্রকাশিত এ-যুগের সুপ্রসিদ্ধ বেদান্ত-সাধক দাক্ষিণাত্যের রমণ মহর্ষির সাধনলব্ধ অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: তাঁহার মতে মনরূপ অহমিকার আচ্ছাদন দ্বারা যেন নিত্যমুক্ত আত্মা স্বেচ্ছায় আচ্ছাদিত হইয়া ভোক্তা জীবরূপে বদ্ধ হইয়া আছেন। এই আচ্ছাদন ত্যাগ করিলেই তিনি তাঁহার যথার্থ শিবস্বরূপে প্রকটিত হইবেন। এই জন্য বলা হয় যে, মানুষের মন প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের মায়া-

শক্তির এক ঐন্দ্রজালিক অভিব্যক্তি। একমাত্র ব্রহ্মভিন্ন জগতের সকল পদার্থের ন্যায় মনও অনিত্য পরিণামী মিথ্যা। মনের কোন স্থায়ী সত্তা নাই। অবিদ্যা হইতে ইহার উদ্ভব এবং 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই তত্ত্বজ্ঞানালোকের উদয়ে ইহা ব্রহ্মে বিলয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপে মনোনাশই আত্মার অব্যক্তস্বরূপ পরিব্যক্তির উপায়।

সমুদ্রে যেমন অনুক্ষণ অনন্ত বুদ্বুদ উঠিয়া মিশিয়া যায়, মানুষমাত্রেরই মনরূপ সমুদ্রেও তদ্রূপ সংখ্যাতীত বৃত্তির বুদ্বুদ উঠিয়া মিশিয়া যাইতেছে। অহমিকাপূর্ণ 'আমি'-আশ্রিত কামনা-বাসনাই মনোবৃত্তিরূপ বুদ্বুদগুলির উৎস। এজন্য বেদান্তের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া মহর্ষি সহজ ভাষায় মনকে 'বাসনার পুঁটলি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মানুষের মনরূপ ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে তাহার অন্তর্নিহিত কামনা-বাসনাই প্রকটিত। মানুষের মন এবং তাহার কামনা-বাসনাই মনঃকল্পিত অর্থাভাসরূপে দ্রষ্টা ও দৃশ্যে পরিণত হয়। এই কারণে 'জীবন্মুক্তিবিবেক'-মতে এই জীবনেই বিক্ষেপহীন শাশ্বত শান্তি লাভ করিতে হইলে মন এবং উহার কামনা-বাসনার মূলোচ্ছেদ অপরিহার্য। এই মহান্ শাস্ত্র প্রচার করেন যে, মনোনাশ বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান পরস্পর সাপেক্ষ। ইহাদের মধ্যে যে-কোন একটি অর্জিত হইলে তৎসঙ্গে অপর দুইটিও স্বতই আয়ত্তাধীন হয়।

মন এই অবস্থায় উপনীত হইলে বেদান্তমতে মানুষ একেবারে বৃত্তিহীন হইয়া সমাধিস্থ হয়। মহর্ষি বলেন যে, সুষুপ্তিতে মাত্র চেতন মনের বৃত্তি বিলুপ্ত হয়। কিন্তু অবচেতন ও অচেতন মনে অতি সূক্ষ্মাকারে বৃত্তি লুক্কায়িত থাকে। এই কারণে সুষুপ্তিতে মনে অজ্ঞানবৃত্তি দ্বারা যে শান্তি হয়, ইহার তুলনায় নির্বিকল্প সমাধি-অবস্থায় অদ্বয় ব্রহ্মে বিলীন মনের শান্তি অনন্তগুণে অধিক। বেদান্ত-মতে ইহাই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও শাশ্বত শান্তি। এই শান্তিই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মানুষ-মাত্রেরই একান্ত কাম্য।

মনকে এই অবস্থায় উপনীত করিবার উপায় সম্বন্ধে মহর্ষি বলিয়াছেন: মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ইহাকে আয়ত্তাধীন করিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। কারণ চোর ধৃত হইবার আশঙ্কায় সর্বদাই যেমন পুলিসের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলে এবং প্রয়োজন হইলে পুলিসের বেশ ধারণ করিয়া সহজেই পলায়ন করে, মনও তদ্রূপ। এইজন্য মহর্ষি জগতের সকল বিষয়ের ন্যায় মনকেও মিথ্যা-মায়ামাত্র বলিয়া গণ্য করিয়া ইহার অস্তিত্ব তত্ত্বজ্ঞান-আশ্রয়ে একেবারে অস্বীকার করাই বাসনা- ও মনোনাশের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে তত্ত্ববিচার দ্বারা মন ও তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞানতা দূর করাই মনকে জয় করিবার সহজসাধ্য পন্থা।

কবি বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী

প্রায় সর্বস্তরের মানুষের মনের ব্যথা, বেদনা ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হইয়াছে—ভাষা পাইয়াছে পৃথিবীর নানা কবির কাব্যে ও কবিতায়। কিন্তু গৃহহীন ত্যাগী সন্ন্যাসীর—অধ্যাত্মসাধকের হৃদয়বেদনা ও সমাধিমান্ পুরুষের অভিজ্ঞতা ভাষা পাইয়াছে বিবেকানন্দের কবিতায়—

'বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়
প্রেমহেতু উন্মাদের মতো প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়।
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়;
নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধরে দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে কি ধন করিনু উপার্জন?
শোন বলি মরমের কথা;.........'[১]

বাস্তবের ব্যর্থতা, পথের দুঃখবেদনা ও অভিজ্ঞতা আরও বলিয়াছেন:

'ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখসুখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার।'

যতদূর বুদ্ধির এলাকা, যতদূর প্রকৃতির রাজ্য বিস্তৃত, ততদূরই সংসার-সমুদ্র—সুখ-দুঃখের তরঙ্গ। কোথাও স্থূল, কোথাও বা সূক্ষ্ম—এইমাত্র প্রভেদ। সুখ-দুঃখের পারে যে তত্ত্ব, তাহার সন্ধান, তরঙ্গ-আকুল ঘোর সংসারের পারে যাইবার যে উপায়, তাহার সন্ধানও মানুষ সহজে পায় না। নানাপ্রকার বুদ্ধির বিভ্রমে পতিত হইয়া সংসারের তরঙ্গেই হাবুডুবু খাইতে থাকে।

'তন্ত্রমন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত দর্শন-বিজ্ঞান, ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম...,'[২]

কোন্ সম্পদ বিবেকানন্দ অর্জন করিয়াছিলেন, মরমের কী কথা তিনি শুনাইয়াছেন?

'প্রেম' 'প্রেম!' এইমাত্র ধন...
এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
...দেব, দেব বল আর কেবা?
কেবা বল সবারে চালায়?
পুত্র তরে মায় দেয় প্রাণ,
দস্যু হরে প্রেমের প্রেরণ........ ॥[৩]

প্রেমই তো পরম দেবতা ঈশ্বর! কারণ প্রেমই সর্বনিয়ন্তা—অন্তর্যামী। দস্যুর হরণে, মাতার প্রাণদানে প্রেমের বিশ্বানুগ (immanent) রূপ। প্রেমের শুদ্ধরূপ—বিশ্বাতিগ (transcendent) রূপও আছে। প্রেমই মহাশক্তি, প্রেমই মৃত্যুরূপা কালী; আবার প্রেমই অবাঙ্‌মনসোগোচর ব্রহ্মতত্ত্ব।

'হয়ে বাক্য-মন-অগোচর,
সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা,
মাতৃভাবে তারি আগমন...।'[৪]

তাই আমাদের জীবনে, অধ্যাত্মসাধকের জীবনপথে স্বার্থহীন প্রেমই একমাত্র তরী, যাহা 'তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর' পার করিয়া দিতে সমর্থ। বিনিময়ে কোন কিছু না চাহিয়া—

১ সখার প্রতি (বীরবাণী)

২ ঐ   ৩ ঐ   ৪ ঐ

শুধু ভালবাসিতেই ভালবাসা, ভালবাসাকেই চরমফলরূপে গণ্য করা—ইহাই স্বার্থহীন প্রেম।

'প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান—
দাও দাও!—যেবা ফিরে চায়,
তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।' ৫

এই প্রেম শুধু ঈশ্বরের প্রতি নহে—সকলের প্রতিই সম্ভব—

'ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু
সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন প্রাণ শরীর অর্পণ
কর সখে এ সবের পায়।'৬

শুধু যে সম্ভব, তাহা নহে—ঈশ্বরোপাসনার, ঈশ্বরসেবার, ঈশ্বরপ্রেমের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।...... ইহাই প্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের হৃদয়-মথিত নিগূঢ় মর্মকথা। এই প্রেমের জীবনে, সেবার জীবনে যে জাগরণ, তাহারও বাণী ধ্বনিত হইয়াছে পরম জ্ঞানের সাথে সাথে বিবেকানন্দের উদাত্তকণ্ঠে সেই ওজোময়ী ভাষায়—

'Awake! Arise! and dream no more!
This is the land of dreams, where Karma
Weaves unthreaded garlands
with our thought.
Of flowers sweet or noxious,—and none
Has root or stem, being born in naught
Which the softest breath of truth
Drives back to primal nothingness.
Be bold and face the truth!
Be one with it!
Let visions cease!
Or, if you cannot, dream then truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free!' ৭

অনুবাদ:
উঠ, জাগ, স্বপ্ন নহে আর!
স্বপন-রচনা শুধু ভবে—
কর্ম হেথা গাঁথে মালা যার···
ভাল মন্দ পুষ্প ভাবনার,—
জন্ম লভে গর্ভে অসতের,
সত্যের মৃদুল শ্বাসে ধায়
আদিতে যে শূন্য ছিল তায়!
অভী হও, দাঁড়াও নির্ভয়ে,
সত্যগ্রাহী, সত্যের আশ্রয়ে
মিশি সত্যে যাও এক হয়ে,
মিথ্যা কর্ম স্বপ্ন ঘুচে যাক্—
কিংবা থাকে স্বপ্নলীলা যদি,
হের সেই, সত্যে গতি যার,—
থাক স্বপ্ন নিষ্কাম সেবার,
আর থাক প্রেম নিরবধি।

এই প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। প্রেমই অফুরন্ত শক্তির উৎস। আদ্যাশক্তিরূপিণী বিশ্বমাতার আরাধনায় ও আশীর্বাদেই এই শক্তি—এই প্রেম লাভ হয়। তাই নব-জাগ্রত ভারতের প্রতি বিবেকানন্দের আশীর্বাণী:

'And all above,
Himalaya's daughter Uma, gentle, pure,
The Mother that resides in all as Power
And Life, who works all works, and
Makes of one the world, whose mercy
Opes the gates to truth and shows
The One in all, give thee untiring
Strength, which is Infinite Love.'৮

অনুবাদ:
সর্বোপরি, যিনি উমা
শান্ত পূতা হিমগিরি-সুতা
শক্তিরূপে প্রাণরূপে আর
জননী যে সর্বভূতে স্থিতা,
কার্য যাহা সবি কার্য যাঁর,

৫ ঐ　　৬ ঐ

৭ To the Awakened India.

৮ To The Awakened India.

এক ব্রহ্ম করে প্রপঞ্চিত,
কৃপা যাঁর সত্যের দুয়ার
খুলি এক বহুতে দেখায়,
দিবে শক্তি সে জননী তোমা
ক্লান্তিহীন, স্বরূপ যাঁহার
অসীম সে প্রেম পারাবার।

ভারতের জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় জাগরণের শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক্ বিবেকানন্দের কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হইল—'ভারত যুবাবস্থ (India is young). ভারত মৃত নহে—নিদ্রিত।' তাই নিদ্রোত্থিত ভারতের প্রতি কবি বিবেকানন্দের বাণী :

'Once more awake !
For sleep it was, not death,
to bring thee life
Anew, and rest to lotus-eyes,
for visions
Daring yet. The world in need
awaits, O Truth !
No death for thee !'

অনুবাদ : জাগো আরো একবার !
মৃত্যু নহে, এ যে নিদ্রা তব,
জাগরণে পুনঃ সঞ্চারিতে
নবীন জীবন, আরো উচ্চ
লক্ষ্য ধ্যান তরে, প্রদানিতে
বিরাম পঙ্কজ-আঁখিযুগে।
হে সত্য ! তোমার তরে হের
প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন,
—তব মৃত্যু নাহি কদাচন।

শুধু কবির অভিনব কল্পনা নহে, অভিনব সত্যদর্শন ! ভারতের এই মধ্যযুগীয় অবসাদ বা অধঃপতন—মৃত্যু নহে, মৃত্যুর লক্ষণ নহে। এ সাময়িক নিদ্রা—বিশ্রাম-মাত্র। মানব-কল্যাণ ও লোকোত্তর সত্যকে ধারণ করিয়া ভারত সত্য-স্বরূপ। সমগ্র জগতের জন্য তাহার বাঁচিবার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে, জগৎ তাহার প্রতীক্ষায় আছে। তাই ভারত মরিতে পারে না। ভারত-আত্মার অমরত্বের এই শাশ্বত বাণী বিবেকানন্দের কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল। 'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি' এই কবিতা তাঁহার দ্রষ্টৃত্বেরই অনবদ্য নিদর্শন।

বিবেকানন্দ প্রকৃত অর্থে শক্তিসাধক ছিলেন। তাঁহার রচনায় ও কবিতায় একটি প্রধান সুর—শক্তির সুর। জ্ঞানে শক্তি, প্রেমে শক্তি, সেবা ও কর্মে শক্তি—সর্বক্ষেত্রেই তিনি শক্তির উপাসক। দুর্বলতাই পাপ। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—এই ছিল তাঁর কথা। উপনিষদের ঋষি-কবিগণের রচনায়, গীতা-কারের গীতার কবিতায়—তিনি এই শক্তির বাণীই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় ও কবিতাগুলির অনেক স্থানে এই শক্তির সুরই বাজিয়া উঠিয়াছে রসোত্তীর্ণরূপে।

ব্যক্তিগত উপাসনার ক্ষেত্রেও তিনি প্রধানতঃ আদ্যাশক্তি কালীর উপাসক। সম্ভবতঃ তাহা তিনি তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বীর বিবেকানন্দের উপাসিত কালীর রূপ শ্রীরামকৃষ্ণের কালীর কোমলতা ও আনন্দময়ী কালীর রূপ হইতে ভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের কালী আনন্দময়ী, রঙ্গময়ী।

'কখন কি রঙ্গে থাক শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী।'

কিন্তু, বিবেকানন্দের কালী ভয়ঙ্করা, করালী।

'সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী,
সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।'[১]

কিন্তু বিরোধ নাই! শ্রীরামকৃষ্ণের সুধা-তরঙ্গিণী আনন্দময়ী কালীতে পৌঁছাইবার দ্বার বা সোপান বা পূর্বভূমি এই বিবেকানন্দের

---

১ নাচুক তাহাতে শ্যামা

ভয়ঙ্করা মৃত্যুরূপা কালী। এই ভয়ঙ্করা কালীর কথা তিনি কতভাবে বলিয়াছেন :

'রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায়
মাতৃরূপা এলোকেশী।
উষ্ণধার, রুধির-উদ্গার, ভীম তরবার
খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়,
নাম দেয় দয়াময়ী।
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি,
বিতরিছ জনে জনে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা॥'[১০]

আবার বলিয়াছেন :

…'Come! Mother come!
For Terror is Thy name!
Death is in Thy breath,
And every shaking step
Destroys a world for ever,
Thou Time the all-destroyer!
Come, O Mother come!
Who dares misery love
And hug the form of the Death
Dance in Destruction's dance,
To him the Mother comes.'[১১]

অনুবাদ :

…মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম,
মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ
প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো,
আয় মোর পাশে॥

সাহসে দুঃখ দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

মায়ের স্বরূপ তিনি আরও নানাভাবে বলিয়াছেন :

'Who knows, what soul and when
The Mother makes Her throne?
…Whose freak is greatest order,
Whose will resistless law?'[১২]

অনুবাদ :

কে জানে কখন হবে অধিষ্ঠান,
কোন্ হৃদে মাতা লইবেন স্থান?
খেয়াল তাঁহার জগৎ-শৃঙ্খলা
ইচ্ছা তাঁর অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

যাকে আমরা বলি বিশ্বশৃঙ্খলা, তা আদ্যাশক্তি-রূপিণী—মায়ের খেয়াল-মাত্র। যাকে বলি প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম, তাও মায়ের ইচ্ছা-মাত্র। তিনি কখন কার ভিতরে কী ভাবে প্রকাশ পাইবেন, কাহাকে দিয়া কী করাইবেন, কিছুই বলিতে পারা যায় না।—এইরূপ গভীর দার্শনিক তত্ত্বের বর্ণনাতেও অপূর্ব রসসৃষ্টি বিবেকানন্দের অভিনব বৈশিষ্ট্য।

তথাকথিত প্রকৃতির কবি বিবেকানন্দ নন বটে, তথাপি প্রকৃতির সৌন্দর্য মাধুর্য বাস্তবের দ্বন্দ্ব ঘাতপ্রতিঘাত সম্পর্কে তিনি অনভিজ্ঞ বা উদাসীন ছিলেন না। তাঁর ভাব-প্রধান তত্ত্বপ্রধান কবিতার মাঝে মাঝে তাঁহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ অনবদ্য ভাবে ও ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে :

'ফুল্ল ফুল সৌরভে-আকুল,
মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে পাশে।
শুভ্র শশী যেন হাসিরাশি,……।
মৃদুমন্দ মলয় পবন, যার পরশন,
স্মৃতিপট দেয় খুলে।

১০ নাচুক তাহাতে শ্যামা
১১ Kali the Mother
১২ Who knows How Mother plays.

নদনদী, সরসী-হিল্লোল,
ভ্রমর চঞ্চল, কত বা কমল দোলে॥
ফেনময়ী ঝরে নির্ঝরিণী,
তান-তরঙ্গিণী, গুহা দেয় প্রতিধ্বনি।'[১৩]

শুধু ছন্দের ও রসসৃষ্টির কুশলতা নহে, শব্দের ধ্বনিতে অর্থের দ্যোতনা—ইহাও বিবেকানন্দের এই সব কবিতায় যেরূপ সুস্পষ্ট সুখস্বাদ্য, বাংলা কবিতায় এইরূপ খুব বেশী দৃষ্ট হয় না।

অথবা সমুদ্রের প্রাকৃতিক বর্ণনে :

'নীলাকাশে ভাসে মেঘকুল,
শ্বেতকৃষ্ণ বিবিধ বরণ—
পীত ভানু মাগিছে বিদায়,
রাগচ্ছটা জলদ দেখায়।
বহে বায়ু আপনার মনে,……'।[১৪]

অন্যত্র বলিয়াছেন :

'From the land of thy birth
Where vast cloud-belted
Snows do bless and put their
strength in thee,
…The heavenly River tune thy voice
to her own immortal song ;
Deodar shades give
thee eternal peace.'[১৫]

* * *

অনুবাদ :

সেই তব জন্মস্থান হ'তে,
হিমস্তূপ অভ্রকটিহার
…হেথা সুরনদী তব স্বর
বাঁধিবে অমর-গীতি-সুরে,
দেবদারু ছায়া বিধানিবে।

প্রকৃতির বাস্তব-সৌন্দর্যের পাশেই আবার প্রকৃতির ভীষণা মূর্তি :

'মেঘমন্দ্র কুলিশ-নিস্বন,
মহারণ, ভূলোক-দ্যুলোক-ব্যাপী।
অন্ধকার উগরে আঁধার,
হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয়বায়ু॥
ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়,
রক্তকায় করাল বিজলী-জ্বালা,
ফেনময় গর্জি মহাকায়,
ঊর্মি ধায় লঙ্ঘিতে পর্বত-চূড়া॥'[১৬]

অথবা 'Kali the Mother' কবিতায় মা-কালীর পটভূমিরূপে—

'The stars are blotted out,
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant, sonant,
In the roaring whirling wind
Are the souls of a million lunatics—
Just loose from prison-house,
Wrenching trees by the roots,
Sweeping all from the path
The sea has joined the fray,
And swirls up mountain-waves.'[১৭]

অনুবাদ :

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল,
মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার,
গরজিছে ঘূর্ণ্য-বায়ুবেগ।
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরান
বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি
ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!

মানবের বাস্তব-জীবনে বিরুদ্ধ শক্তির, ব্যর্থতার আঘাত মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া তাহার যে অনবদ্য বর্ণনা দিয়াছেন :

১৩ নাচুক তাহাতে শ্যামা ১৪ সাগর-বক্ষে
১৫ To the Awakened India
১৬ নাচুক তাহাতে শ্যামা
১৭ Kali The Mother.

'Let eyes grow dim, and heart
grow faint,
And friendship fail and love betray.
Let Fate its hundred horrors send,
And clotted darkness block the way—
All nature wear one angry frown,
To crush you out ....'[১৮]

অনুবাদ :
স্তিমিত হউক নেত্র, অন্তর মূর্ছিত,
বিফল বন্ধুত্ব—প্রেম প্রতারণা হ'ক,
নিয়তি পাঠাক তার ভীতি অগণিত
পুঞ্জীকৃত অন্ধকারে পথ রুদ্ধ র'ক।
রোষ-দীপ্ত মূর্তি ধরি আসুক জগৎ
চূর্ণিতে তোমায়—

তার মাঝেও অধ্যাত্মবাদী বিবেকানন্দ আনিয়াছেন আশার দিব্য বাণী :

'Still know my soul,
You are divine—march on and on !'

অনুবাদ :
তবুও জানিও নিশ্চয় ;
হে আত্মন্ ! দেবত্বই স্বরূপ তোমার,
ভয়হীন হও অগ্রসর ! (ক্রমশঃ)

১৮ The Song of the Free

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে' বাক্যে 'অধিকার'-শব্দের তাৎপর্য

শ্রীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য

গীতায় যে 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' (২।৪৭) বলা হইয়াছে, তাহার উপপত্তির জন্য ব্যাখ্যাতৃগণ যথামতি প্রয়াস করিয়াছেন। আধুনিক যুগের নবীনদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাখ্যাকারগণ এই বাক্যের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তের মহত্ত্বও প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে, আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ 'অধিকার' বলিতে তাহাই বুঝেন, যাহাকে ইংরেজীতে 'right' বলা হয়। আজকাল 'right' ও 'duty' বলিলে যে-জাতীয় 'অধিকার' কর্তব্য বুঝায়, গীতোক্ত 'অধিকার' বলিতে সেইরূপ 'অধিকার'ই নবীন ব্যাখ্যাকারগণ স্বীকার করেন—ইহা মনে হয়। শঙ্করাদি প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ 'অধিকার' বলিতে কি বুঝিতেন, তাহা বিশদভাবে ভাষ্যাদিতে বিবৃত না থাকিলেও ইহা অনুমিত হইতে পারে যে, তাঁহারা 'অধিকার' শব্দে প্রাচীন শিষ্টসম্মত বক্ষ্যমাণ অর্থই বুঝিতেন।

আমাদের বক্তব্য এই যে, ইংরেজীতে 'right' বলিতে যাহা বুঝায়, সংস্কৃত ভাষায় 'অধিকার' বলিতে তাহা বুঝায় না। যদি কোন আধুনিক গ্রন্থে 'right' অর্থে অধিকার-শব্দের প্রয়োগ থাকে, তাহা হইলেও গীতা-মহাভারত-জাতীয় প্রাচীন ধর্মদর্শনমূলক গ্রন্থে 'অধিকার' শব্দের অর্থ কদাপি 'right' স্বীকার করা যাইতে পারে না—'অধিকার' শব্দের শিষ্টসম্মত প্রাচীন অর্থই এখানে গৃহীত হইবে। এই শ্লোকের অর্থ-বিষয়ে যে সংশয় হয়, তাহার কারণও এই যে, আধুনিক মনীষী ব্যাখ্যাকারগণ 'right' অর্থেই 'অধিকার' শব্দকে বুঝেন। আমি বহু চিন্তাশীল বিদ্বানের মুখে শুনিয়াছি যে, গীতার এই বাক্যটি

অবৈজ্ঞানিক, যেহেতু ফলেচ্ছা ব্যতীত কেহই কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, যদি কর্মে আমার 'right' আছে, তবে ফলে আমার 'right' নাই কেন? গীতার 'অধিকার' শব্দের অর্থ না জানার ফলে এই জাতীয় বহুবিধ আপাত-মনোরম তর্কের উৎপত্তি হয়, যাহার সমাধান কঠিন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু 'অধিকার' শব্দের অর্থ বুঝিলে এই জাতীয় বিবাদের অবকাশই থাকে না। গীতায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা একটি বাস্তব প্রাকৃতিক তথ্য, উহা কোন কাল্পনিক মনোভাব নহে, এবং কাহারও উহা অতিক্রম করার সামর্থ্য নাই।

আমাদের মতে 'অধিকার' শব্দের প্রাচীন শিষ্টসম্মত অর্থ—কার্যক্ষেত্র, যাহা আমার শক্তির দ্বারা সাধ্য, যাহা আমার আয়ত্ত হইবার যোগ্য, যাহা আমার ক্রিয়ার নিশ্চিত বিষয়। 'অধিকার' শব্দের ব্যুৎপত্তির প্রতি দৃষ্টি দিলে এই অর্থই জ্ঞাত হইবে—'right' অর্থে 'অধিকার' শব্দ ব্যুৎপন্ন হইবার নহে। যখন বলা হয় যে, পাণিনির অমুক সূত্রের 'অধিকার' অমুক সূত্র পর্যন্ত, তখন 'অধিকার' শব্দের অর্থ কার্যক্ষেত্র বা শক্তির বিষয় বুঝায়। চেতন-প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে 'অধিকার' শব্দের এই অর্থের সহিত 'কর্তব্যপালন-সামর্থ্য' বা 'দায়িত্ববোধ'ও বুঝায়। যেমন যদি বলা হয় যে, 'রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়েরই অধিকার', তবে তাহার অর্থ হইবে, রাজসূয় যজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের শক্তির দ্বারাই সাধ্য, উহা ক্ষাত্র শক্তিরই বিষয় এবং রাজসূয় যজ্ঞ নিষ্পাদনের দায়িত্ব ক্ষত্রিয়ই বহন করিবে। 'right' বলিতে কার্য-সম্পাদনে যে 'যথেচ্ছ স্বাতন্ত্র্যভাব' (আমি ইচ্ছা করিলে করিতে পারি, বা না পারি বা যখন যেমন ইচ্ছা হইবে, তেমনিভাবে অনুশাসনহীন হইয়া করিব) বুঝায়, উপর্যুক্ত স্থলে 'অধিকার' বলিতে তাহা বুঝায় না, ইহা ধীরভাবে চিন্তা করিলেই এবং যজ্ঞাদিতে অধিকার-সূচক বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। প্রাচীন গ্রন্থে অধিকারের দ্বারা 'কার্যক্ষেত্র' বা 'শক্তির বিষয়' বুঝায় অর্থাৎ 'যদি কিছু আমার ক্রিয়ার বিষয় থাকে, তবে তাহা ঐ পর্যন্তই' ইহা বুঝাইতেই 'অধিকার' শব্দ ব্যবহৃত হয়—'right' অর্থের সহিত এই অর্থের কোন সমন্বয় নাই।

উপর্যুক্ত বিচার হইতে ইহা বুঝা গেল যে, অধিকারে 'duty'র (কর্তব্য) ভাবই প্রধান। 'ব্রাহ্মণের অধ্যাপনে অধিকার' বলিলে বুঝা যাইবে যে, ব্রাহ্মণই অধ্যাপনা-কর্ম করিতে বাধ্য এবং তাহাকেই অধ্যাপনার দায়িত্বও লইতে হইবে। ব্রাহ্মণ ইচ্ছামাত্র অধ্যাপনা-কর্ম ত্যাগ করিতে পারে না (অধ্যাপনা-ত্যাগের শাস্ত্রসম্মত হেতু না থাকিলে) এবং অধ্যাপনা-কার্যে তাহার প্রবৃত্তি তাহার রুচির অধীন নহে, কিন্তু তাহাকে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে, যেহেতু অধ্যাপনা-কর্ম ব্রাহ্মণেরই শক্তির বিষয়। যে-সমস্ত অল্পজ্ঞ ব্যক্তি স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে ব্যবহৃত 'অধিকার' তত্ত্বকে উপহাস করে, এবং 'অধিকারবাদ'কে বর্তমানযুগের অনুপযোগী বলে, তাহারা যদি ঠিকভাবে শাস্ত্র বুঝিতে চেষ্টা করে, তবে তাহারাই উপকৃত হইবে। আজকাল আমরা 'right' বলিতে যাহা বুঝি, তাহা প্রাচীনকালে অজ্ঞাত ছিল মনে হয়, এবং ঐজন্য আমরা উন্নত ছিলাম। আজও 'অধিকার'-তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রবল হেতু আছে।

এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে জ্ঞাত হইবে যে, গীতার পূর্বোক্ত বচনে কোন অস্পষ্টতা ও অসঙ্গতি নাই। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে' বাক্যের

অর্থ হইবে—যাহা তুমি করিতে পারো (=কার্য-ক্ষেত্র বা ক্রিয়ার বিষয়), সেটি কর্মই, অর্থাৎ ফলোৎপত্তির হেতুভূত ক্রিয়াটাই তুমি করিতে পারো। 'মা ফলেষু' বাক্যের অর্থ হইবে—ফলের উৎপাদনে তোমার সাক্ষাৎ অধিকার (=কার্যজনন-শক্তি) নাই। তাৎপর্য এই যে, তোমার শক্তির অনুসারে তুমি কর্মই করিতে পারো এবং উহা তোমাকে করিতেই হইবে (কেননা কর্মতেই পুরুষের অধিকার-বাক্য বেদে আছে: স্বর্গকাম অগ্নিহোত্র-নামক যজ্ঞকর্ম করিবে) এবং কর্মজন্য ফলটি কর্মকারী কর্তার শক্তির বিষয় নহে। ঈপ্সিত ফলটি যথাবৎ পাওয়া যাইবে কিনা, তাহা কেহই পূর্বে বলিতে পারে না। যেহেতু কর্তাকে কর্মের মাধ্যমে ফলনিষ্পত্তি করিতে হয় এবং কর্মটি কর্তার শক্তির বিষয় হইলেও ফল-নিষ্পাদনহেতুভূত সর্ববিধ কর্ম কর্তার সম্যক্ অধীন নহে। উদাহরণ দিয়া বলা যায় যে, যথাবিধি টিকিট লাগাইয়া, ঠিকানা লিখিয়া নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য চিঠিটি ডাক-বাক্সে ফেলারূপ 'কর্ম'ই আমি করিতে পারি। কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছানো-রূপ 'ফলটি' আমার শক্তির অধীন নহে। কেননা আরও যে-সমস্ত হেতুতে চিঠিটি যথাস্থানে পৌঁছায়, সে-সব হেতুর সহিত আমার কোন প্রত্যক্ষ যোগ নাই এবং এই সব হেতুতে কোন বিপর্যয় ঘটিলে চিঠিটি লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবে না (আমার কর্ম যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলেও)। এই ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, ফলের হেতুভূত কর্মটাই (কর্মের একটা অংশমাত্রই) আমরা করিতে পারি, উহাই আমাদের শক্তির বিষয় (=অধিকার), ফল প্রত্যক্ষভাবে আমাদের শক্তির বিষয় (=অধিকার) নহে।

বিচার করিলে বুঝা যায় যে, 'ফল' কখনও কর্তার সম্যক্ অধীন হইতে পারে না, কেননা প্রত্যেক ফলই বহুকর্মসাধ্য। সেই কর্মসমূহের একটা অংশই কর্তা করিতে পারে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ কর্ম অপূর্ণভাবে কৃত হয়), এবং ঐ কর্মটুকু করা ব্যতীত আর সে কিছুই করিতে পারে না। অতএব বহু-কর্মোৎপাদ্য ফল কখনও কর্তার সম্যক্ অধীন হয় না। যেহেতু ফল কার্যশক্তির বহির্ভূত। অতএব 'মা ফলেষু কদাচন' বলা সমীচীন। ইহা উপদেশমাত্র নহে, কিন্তু বাস্তব তথ্য।

অধিকার, কর্ম ও ফলের এই বাস্তব সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলে ফললাভ না হইলেও বিজ্ঞ ব্যক্তি শোকগ্রস্ত হন না, কেননা তিনি জানেন যে, ফলপ্রাপ্তির হেতুভূত বহুবিধ কর্মের একটা অংশমাত্রই তিনি (অসম্যক্‌ভাবে বা সুষ্ঠুরূপে) করিয়াছেন, অতএব ফলপ্রাপ্তি যে হইবেই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যদিও ফলোৎপাদনের সহিত কর্মের নিয়ত সম্বন্ধ আছে, তথাপি সেই নিয়ত সম্বন্ধের পূর্ণ জ্ঞান জীবের নাই বলিয়া কখনও ফলপ্রাপ্তি আশানুরূপ হয় না। ফলের সহিত কর্মাধি-কারীর প্রত্যক্ষ যোগ নাই বলিয়া আশানুরূপ ফললাভ না হইলেও কর্মতত্ত্ববিৎ মুহ্যমান হন না—কর্মবিজ্ঞানের এই ফলটি গীতোক্ত বাণী হইতে জানা যায়, অধিকারের প্রকৃত অর্থ-জ্ঞান না হইলে যাহা জানা যায় না। গীতার এই মতটি যে সম্যক্ যুক্তিযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

জয়রামবাটী-তীর্থে

শ্রীপুষ্পকুমার পাল

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীমাকে মায়ের বাড়ি জয়রামবাটীতে দর্শন করার জন্য প্রস্তুত হলাম। 'উদ্বোধনে' মায়ের বাড়িতে মাকে ঠিক একান্তভাবে পাওয়া যায় না। শ্রীশ্রীমা সন্তানদের জয়রামবাটীতে যেতে বলতেন। সেখানে তিনি সন্তানদের যেন আরও বেশী কাছে আসতেন। তাঁরাও সেই পরিবেশে মাকে পেয়ে ঠিক যেন গর্ভধারিণীর কাছে থাকার অনুভূতি লাভ করতেন।

অনেকদিন অদর্শনের পর মাকে দেখতে যাবার সময় তিনি যা ভালবাসতেন, তাই নিয়ে যেতে আগ্রহ হয়। মা আমার জগজ্জননা হয়েও সাধারণ মেয়েদের মতো জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। একখানি সরু লালপাড় সাধারণ কাপড়, কিছু মাখন-মিছরি, বড়ি, ফুটকড়াই, চালভাজা, শাকসবজি, আনারস ও মিষ্টি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। মনের বাসনা—এই সামান্য উপকরণ মা গ্রহণ করবেন!

মোটরে যাত্রা করবার সময় জনৈক পরিচিত ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাজার-হাট নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' বললাম, 'বাঁকড়োয়—মায়ের বাড়ি'। ভদ্রলোক জানেন, আমি যশোহরের লোক। আমার মা যে বহুদিন দেহ রেখেছেন, এ-কথা তাঁর জানা নেই। তিনি বললেন, 'মা কি এখন বাঁকুড়ায় থাকেন নাকি?' জবাব না দিয়ে মৃদু হাসলাম। গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। মাকে দেখতে যাচ্ছি—বলার মধ্যে যেন কত তৃপ্তি পেলাম। এটা কি অহংকার? তা বোধ হয় নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, 'ঈশ্বরকে ভালবাসি—এ অহংকার ভাল, অন্য অহংকার ভাল নয়।'

সমস্ত রাস্তা মায়ের চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলাম। মাকে গিয়ে কেমন দেখব?—সেই সাধারণ সরু লালপাড় একটি শাড়িপরা—হাতে হোগলা-পাকের বালা—কণ্ঠে সোনার তারে গাঁথা ক্ষুদ্রাকৃতি রুদ্রাক্ষের মালা—সেই করুণাঘন চক্ষু! সেই শান্ত স্নেহভরা মুখমণ্ডল! বিকালে যখন পৌঁছব, মা তখন কোথায় থাকবেন? মা কি তখনও তাঁর ঘরের দাওয়ায় বসে থাকবেন? স্ত্রীভক্তেরা কয়েকজন হয়তো তাঁর কাছে বসে আছেন! হয়তো 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' থেকে পড়া হচ্ছে। নয়তো মা বোধ হয়—ঠাকুরের কথা, দক্ষিণেশ্বরে তাঁর মধুর জীবনের কথা বলছেন। না, তা বোধ হয় নয়। তিনি হয়তো তখন তাঁর সন্তানদের রাত্রের আহারের জন্য কুটনো কুটছেন। অপর মেয়েরা বোধ হয়, তাঁর নির্দেশমত কাজকর্ম করছেন। এমনও হ'তে পারে, কেউ তার দুঃখের কথা মায়ের কাছে ব'লে চলেছে। মা তার সঙ্গে কাঁদছেন ও তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এও হ'তে পারে, বাতের ব্যথায় তিনি অসুস্থ। কোন ভাগ্যবতী তাঁর পদদ্বয়ে তেল মালিশ করছে। মায়ের প্রসন্ন-বদনে তৃপ্তির আভাস, চক্ষে সস্নেহ-দৃষ্টি। সেবারতা নারী আপনাকে কৃতার্থ মনে করছে।

মায়ের চিন্তায় মগ্ন থেকে তারকেশ্বরে এসে গেলাম। বাবা তারকনাথকে দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে পড়লাম। কত কথা মনে পড়ছে! অনেকের কাছে শোনা ও অনেকের হৃদয়গ্রাহী রচনা পড়া। কত সরল, সাধারণ ও শিক্ষাপ্রদ জীবন! ঠাকুর আপন-ভোলা মহেশ্বর। শিশুর ন্যায় সরল, ঈশ্বরপ্রেমে

মাতোয়ারা শ্রীশ্রীমা অন্নপূর্ণার প্রতিমূর্তি। মায়ের ক্ষমারূপ তপস্যা। কারও দোষ দেখা নয়। কারও কাছে কিছু প্রত্যাশা নয়, সন্তানের কল্যাণচিন্তার সাধনা। তোমরা এখানে এসেছ, তোমরা আমায় মা ব'লে ডেকেছ, তোমরা আমার সন্তান। 'মাভৈঃ' দিয়ে মা বলেছেন, তোমাদের কোন ভয় নেই। কতবার কত স্থানে রামকৃষ্ণভাবে ভাবময়ী হয়ে তিনি বলেছেন, 'ঠাকুর, আমার জানা অজানা সমস্ত সন্তানকে তুমি দেখো।' মায়ের সেই স্নেহ, করুণা ও কৃপাময়ী মূর্তি বার বার মনে পড়তে লাগলো।

পল্লীর পরিবেশে স্মৃতিচারণ করতে করতে কামারপুকুর এসে গেলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন ক'রে তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। 'বাপের চেয়ে মা দয়াল!' মা যেন বেশী আপনার। তাঁর কাছে, তাঁর অতি সন্নিকটে বোধ হয় বসা যায়। তাঁর কাছে সব কথা যেন বলা যায়! আমার মতো সাধারণ লোকের 'মা' ভিন্ন গতি নেই।

শ্রীশ্রীমায়ের গ্রামে এবার প্রবেশ করছি। মনে অপার আনন্দ হচ্ছে। হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠছে। মায়ের বাড়ি ও মাতৃমন্দিরে এসে গেছি। মনে হ'ল চেঁচিয়ে ব'লে উঠি—মা আমি এসেছি, তুমি কোথায়? মন্দিরে মাথা নত করলাম। প্রণামের মধ্যে আকুল হয়ে ভাবলাম, মা কি একবার মাথায় তাঁর শ্রীহস্তের স্পর্শ দেবেন না?

মায়ের মন্দিরের পরিচিত সন্তানেরা মায়ের মতোই কুশল-প্রশ্ন করলেন। সামান্য জিনিস কেউ নিয়ে গেলে মা সাদরে যেমন তা গ্রহণ করতেন ও সেই সামান্য বস্তুর যেমন সমাদর করতেন, সেইভাবেই তাঁরা তা গ্রহণ করলেন।

'উদ্বোধনে' মায়ের বাড়িতে যেমন মনে হয়ে থাকে, মা আছেন, জয়রামবাটীতেও শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতি তেমনি সর্বদা অনুভূত হয়।

সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল। মায়ের মন্দিরের সামনের পুকুরে কাদের জানি না, একদল হাঁস ভিজা গা ঝাড়তে ঝাড়তে নিজেদের ডেরায় ফিরে গেল। কত নাম-না-জানা পাখি চতুর্দিকে গাছে সুস্থির হয়ে রাত্রি কাটাবার বাসনায় কলরব করতে লাগলো। ঝির-ঝির বাতাস বইছে। পুকুরের চতুর্দিকে সযত্নে রোপিত বৃক্ষগুলি পুষ্পসম্ভারে অপরূপ হয়ে আছে। পুকুরের জলের উপর দিয়ে ভেসে-আসা সেই নির্মল বাতাস পুষ্প-গন্ধে সুরভিত হয়ে সেই দেবী-মন্দিরের আশে পাশে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

মনে হ'ল সন্ধ্যায় মা জপে বসেছেন যাই, একবার উঁকি দিয়ে দেখে আসি, মাকে দেখতে পাই কি না! মায়ের ঘর ও দাওয়া দেখলাম। হয়তো মা বসে আছেন। হয়তো মা সন্তানদের কল্যাণের জন্য তাঁদের হয়ে হাজার হাজার জপ ক'রে যাচ্ছেন! এখন মাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। দরজার গোড়ায় বসে থাকি। মায়ের জপের পর নিশ্চয়ই তাঁর দেখা পাব। আবার স্মৃতিচারণে রত হলাম। আচ্ছা, কোন্ জায়গায় বসে মহাকবি গিরিশ-চন্দ্রকে মা বলেছিলেন, 'গুরুপত্নী নয়, গুরু-মা নয়, পাতানো মা নয়, একেবারে আপনার মা।' এখানেই কোথায় বসে মা শত শত সন্তানকে দেখা দিয়েছেন। কত মধুমাখা উপদেশ! কত আপনার জনের মতো কথা!

মায়ের মন্দিরে আরতির ঘণ্টায় চকিত হয়ে উঠলাম। আরতির সময় মনে হ'ল, মা যেন লক্ষ্মীস্বরূপা হয়ে পদ্মের উপর বসে আছেন। কত স্নেহ, কত কৃপা, কত দয়া!

আরতির পর মায়ের ছোট গ্রামটির চতুর্দিকে বেড়িয়ে বেড়ালাম। এর মধ্যেই গ্রামে কোলাহলের লেশমাত্র নেই। চতুর্দিক নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। সিংহবাহিনীর মন্দির শয়ন-আরতির পর বন্ধ হয়ে গেল। গ্রামের সাধারণ লোকেরা কাজের মানুষ। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার পরই বিশ্রাম নেয়। কয়েকটি বাড়িতে গেলাম। কেউ কেউ রামায়ণ-মহাভারত পড়ছে। মায়েরা অনেকে সলতে পাকাচ্ছে। দু-চারজনকে সুতা কাটতেও দেখলাম মায়ের সময়ের দু-চারটি মানুষকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলাম। না, প্রায় কেউই নেই। সেই জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর সাধারণ জীবন-যাপনের ও তাঁর আন্তরিক ভালবাসার সাক্ষী প্রত্যক্ষদ্রষ্টা প্রায় সকলেই মহাপ্রস্থান করেছেন। পথে পথে ঘুরে পুনরায় মন্দিরে ফিরে এলাম।

মাকে চাক্ষুষ দেখতে পেলাম না, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরও যদি শুনতে পেতাম! শুনেছি শব্দের লয় নেই। মায়ের কণ্ঠশব্দ তো এখানকার আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। যদি প্রণালী জানা থাকত তো অনেকে তা শুনতে পেত।

রাত্রের খাবার ঘণ্টা প'ড়ল। স্বল্প অন্ধকারে প্রসাদ পেতে বসে গেলাম। সামান্য আয়োজন, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও সেবকদের আন্তরিকতা মনে অপরূপ তৃপ্তি দেয়। সামান্য প্রসাদ এত মধুর লাগছে কেন? কেন এই পরিতৃপ্তিবোধ? মা কি এখানে বসে আছেন? তিনি কি বলছেন —পেটভরে প্রসাদ পাও। এই যৎসামান্য আয়োজনের জন্যে তিনি কি দুঃখ প্রকাশ করছেন? মনে হয়, মা সব সময়ই সন্তানদের এখানে তাঁর সান্নিধ্য দিচ্ছেন। আমার সুকৃতির অভাবেই বোধ হয়, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।

রাত্রি গভীর হ'ল। নিদ্রার পূর্বে মনে হ'ল, না ঘুমিয়ে মন্দিরের সিঁড়িতে বসে থাকি। করুণা ক'রে করুণাময়ী বোধ হয় দেখা দিতে পারেন। একভাবে মাকে ভাবতে ভাবতে বসে রইলাম। স্বল্পজ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। মাঝে মাঝে জোনাকির ঝিকিমিকি। গ্রামের আশে-পাশে পুরানো গাছগুলি শ্রদ্ধাভরে যেন দাঁড়িয়ে আছে। পুষ্প চন্দন ও ধূপ মিশ্রিত মৃদু গন্ধ মন্দিরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। মৃদু মন্দ হাওয়ায় মনে হয়, লেবুফুলের একটি মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। নির্মল ও শুদ্ধ পরিবেশ। মাকে চিন্তা করার উপযুক্ত অবসর। মন্দির-অঙ্গনের দুটি কুকুর সহানুভূতি নিয়ে আমার কাছেই বসে রইল। কিন্তু মনে হয়, একাগ্রতার অভাবে নিরাশ হলাম। মনে হ'ল, আমার এমন সাধনা নেই যে, এভাবে মাকে দর্শন ক'রব। আচ্ছা, স্বপ্নে তো তাঁকে অনেকে দেখতে পায়, আমারও তো সৌভাগ্য হ'তে পারে? এই মনে ক'রে নিদ্রামগ্ন হলাম। মনে হ'ল: 'মা বলছেন, 'আমি তো তোমাদের অন্তরেই আছি, এমন পাগলের মতো ব্যবহার ক'রো না।' এ আমার স্বপ্নে দেখার সুকৃতি নয়। এ যেন নিজ কল্পিত অনুভূতি। মা তো সত্যই তাঁর সন্তানদের বলতেন, 'এখানে দুদিনের জন্য এসেছ। এত জপ-ধ্যান কেন? আমি তো তোমাদের জন্যে কচ্ছি। এখানে খাও দাও, আনন্দে থাকো।'

আমি দেখতে পেলাম না, কিন্তু মা এখানে আছেন। তাই আমরা এখানে এলে এমন বিহ্বল হয়ে পড়ি, মায়ের স্নেহ ও কৃপা অনুভব করি। মায়ের গ্রামের পথঘাট, বাড়ি, মন্দির প্রতিটি ধূলিকণা এক উদ্দীপনা আনে। এ অনুভূতি অপূর্ব। এ ভাল-লাগা যে কি, তা প্রকাশ করা যায় না!

ঠাকুর বলেছেন, 'দিব্যচক্ষু না হ'লে তাঁকে দেখা যায় না।' কি ক'রে তা হবে? সাধনায়? তাঁর কৃপা না হ'লে উপায় নেই। কিন্তু তাঁর কৃপা পাবার জন্য আমাদের ব্যাকুলতা কোথায়? তাই তো শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'তবে সংসারী লোকদের ঈশ্বরে অনুরাগ ক্ষণিক, তপ্ত লোহে জলের ছিটে দিলে জল যতক্ষণ থাকে।'

'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

'বাপ ছেলের হাত ধরে লয়ে গেলে সে ছেলে আর পড়ে না।' এমনি কত রকমের উপমা দিয়ে ঠাকুর বুঝিয়ে গেছেন: 'যে তাঁর উপরে নির্ভর করে, তার ভার তিনি লন।' দ্রৌপদী প্রথমটায় চেষ্টা করেছিলেন, নিজের চেষ্টায় লজ্জা নিবারণ করবেন। দুঃশাসনের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবেন কেন? কাতর-নয়নে পঞ্চপতির দিকে চাইলেন সাহায্যের আশায়। সেদিক থেকে সাহায্য এল না। ভীষ্ম-দ্রোণ প্রমুখ মহারথীরাও নারীর এই চরম দুঃসময়ে নিষ্ক্রিয় রইলেন। তখন নিঃসহায় কুল-ললনা আকাশের দিকে দু-বাহু বাড়িয়ে দিয়ে ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকলেন, 'নারায়ণ!' দুঃশাসন কাপড় টেনে আর শেষ করতে পারে না। গায়ের জোরে নারীকে পরাস্ত করা যায়, সর্বশক্তিমান্ ভগবানকে নয়। ঠাকুর বলতেন: 'ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড়কুটো!' মহা মহা পণ্ডিতেরা প্রায় নিরক্ষর ঠাকুরের সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। তাদের সমস্ত পাণ্ডিত্য 'থু' হয়ে গেল। তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান্ হয়, বোবার কথা ফুটে। যখন জীব বলে, 'নাহং, নাহং, নাহং' আমি কেহ নই, হে ঈশ্বর! তুমি কর্তা; আমি দাস, তুমি প্রভু—তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি।

তবে অজ্ঞান সহজে যেতে চায় না। মানুষের ইচ্ছার সঙ্গে ভগবানের করুণার যোগ না হ'লে কিছু হবার জো নেই—এ জ্ঞান হওয়া কি সহজ কথা? চামারে চামড়া দিয়ে জুতা তৈরী করে। অবশেষে নাড়ীভুঁড়ি থেকে তাঁত হয়। ধুনুরির হাতে প'ড়ে তখন গরু হাম্বা হাম্বা ছেড়ে বলে, 'তুহুঁ, তুহুঁ'—তুমি, তুমি।' ঠাকুর বলতেন: 'আমি ও আমার'—এ দুটি অজ্ঞান। 'তুমি ও তোমার'—এ দুটি জ্ঞান।

জীবনের নাগর-দোলায় দুলতে দুলতে মানুষ সহসা একদা আবিষ্কার করে, তার ইচ্ছাশক্তির মূল্য সামান্যই। সহসা ভিতরের জগতে কামনার ঝড় ওঠে। সংযমের বাঁধ ভেঙে বাসনার ক্ষিপ্ত সমুদ্র জলপ্লাবনে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মানবীয় শক্তিতে সে প্লাবনকে ঠেকাবার আর কোন উপায় থাকে না। তখন ব্যর্থতার অহঙ্কারের মধ্যে অশ্রু-সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ নিস্তারের আশায় জলদেবতা বরুণের আশ্রয় নেয়। দেবতার করুণাধারা নেমে আসে অন্তরীক্ষ থেকে। অশান্ত সমুদ্র শান্ত হয়ে যায়। দুঃখের হল-মুখে বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তাক্ত রন্ধ্রপথে বেরিয়ে আসে নবজীবনের শ্যামাঙ্কুর। অহঙ্কারের মিথ্যা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর শরণাগত হওয়া—এটি হলেই তো সব হয়ে গেল। সাকার-নিরাকারের প্রশ্ন তো বড় নয়। ঠাকুর বলতেন: তাঁতে বিশ্বাস থাকা, তাঁর শরণাগত হওয়া—এই দুটি দরকার।

মানুষ ভগবানের করুণার ভিখারী হয়েছে পাদ্রী-পুরুতদের ছেঁদো কথার বশে নয়, তন্ত্রে বিশ্বাসে নয়। নিষ্ঠুর জীবনের উপর্যুপরি ধাক্কার সামনে কিছুতেই যখন সে হালে পানি পায় না, নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রামের মতো এমন কঠিন সংগ্রাম তো আর নেই—এই

সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যখন সে দিগন্তে কোন আশ্রয়ই খুঁজে পায় না, তখনই সে করুণ-কাতর কণ্ঠে ডাকে: 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।' তখন তার মর্মের গভীর থেকে উৎসারিত হয়:

Have mercy upon me, and draw me out of the mire, that I may not stick fast in it, and may not remain cast down for ever. (Of the Imitation of Christ).

আমাকে দয়া করো, আমাকে টেনে তোলো পঙ্ক থেকে। কর্দমের মধ্যে আমি জড়িয়ে থাকতে চাইনে, চাইনে চিরকালের জন্যে ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে থাকতে।

আগুনের মধ্যে লোহা থাকলে সেই লোহা যেমন মরচে থেকে মুক্তি পেয়ে রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে, ঈশ্বর-চিন্তার মধ্যে মনকে ডুবিয়ে রাখলে তেমনি মানুষের এই জন্মেই জন্মান্তর ঘটে। কেবলমাত্র ঈশ্বরচিন্তায় মনকে পূর্ণ রাখলে রত্নাকরের বাঁশ বাল্মীকির বাঁশী হয়ে যায়—এতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু মুস্কিল তো পাগলা মনটাকে ঈশ্বরে লাগিয়ে রাখা নিয়ে। ঠাকুর বলেছিলেন ডাক্তারকে: 'ওসব তো অনেক করলে—টাকা, মান, লেকচার; এখন মনটা দিনকতক ঈশ্বরেতে দাও।'

মনটা ঈশ্বরে দেওয়া—এর নামই তো সাধন। ঈশ্বরকে নিয়ত চিন্তায় রাখতে পারা তো সহজ নয়। সংসার মনটাকে অধিকার ক'রে রয়েছে। সংসারাসক্ত মানুষদের প্রতি ঠাকুরের ব্যঙ্গমিশ্রিত মন্তব্যগুলি যেন চোখা চোখা বাণ। বলছেন: 'আবার মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে পরিবার কিংবা ছেলেদের বলে, প্রদীপে অত সলতে কেন, একটা সলতে দাও, তা না হ'লে তেল পুড়ে যাবে।...... যদি তীর্থ করতে যায়, নিজে ঈশ্বরচিন্তা করবার অবসর পায় না, কেবল পরিবারদের পুঁটলি বইতে বইতে প্রাণ যায়, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে, গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত।'

সংসারকে মন থেকে তাড়ানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বাসনাকে মিথ্যা বললে কি হবে! কামনাকে মৃত্যুর জাল বললেই বা কি হবে? আচার-তেঁতুল বলতে জিভে জল আসে। ঠাকুর বলতেন: 'মেয়েমানুস পুরুষের পক্ষে এই আচার-তেঁতুল।' নারী নিয়ে সর্বদা ঘর ক'রব, বিষয়কে সর্বদা আঁকড়ে থাকবো আর ঈশ্বর আমার মনকে জুড়ে থাকবেন—এমন কথা পাগলের মুখেই শোভা পায়। ঠাকুরের 'কথামৃতে'র মধ্যে আছে: 'আবার যে-ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরেই আচার-তেঁতুল আর জলের জালা! তা রোগ সারবে কেন?'

তা হ'লে মনের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তাকে দীপ-শিখার মতো জ্বালিয়ে রাখবার উপায়? 'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।' চিরদিন মন ভেবে এসেছে কামিনীর কথা, কাঞ্চনের কথা, খ্যাতির কথা। এই সংসারাসক্ত মনকে বিষয়চিন্তা বর্জনের কথা বললে সেটা কি শীতের রাতে কাউকে বরফ-গলা জলে স্নান করতে বলার মতো শোনায় না? নাকে মাছের আঁশটে গন্ধ না গেলে মেছুনীর কি ঘুম হয়? কেশব সেনকে বলা ঠাকুরের সেই গল্প! 'তুমি একবার আঁশচুবড়িটা আনিয়ে দিতে পারো? কেমন ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না।'

কিন্তু বিষয়ে ছড়িয়ে-পড়া মনকেও কুড়িয়ে নিয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে জড়ো করা যায়, অভ্যাসযোগের দ্বারা। ঠাকুর বলতেন:

'ঈশ্বরচিন্তা অভ্যাস করলে শেষের দিনেও তাঁকে মনে পড়বে।' গড্‌সের গুলিতে মরণোন্মুখ গান্ধীজীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো : 'হে রাম!'

তবে এই অভ্যাসযোগের পক্ষে অনুকূল হচ্ছে নির্জনতা। ঠাকুর বলতেন, 'দিনকতক ঠাঁইনাড়া হয়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার-তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই।' কেশব সেনকে ঠাকুর বলছিলেন, 'নির্জনে না গেলে, শক্ত রোগ সারবে কেমন ক'রে?' ঠাকুর তাঁর গৃহস্থ ভক্তদের সংসার ত্যাগ করতে বলেননি। সদরওয়ালার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'সংসারে থেকেই হ'তে পারে। তবে আগে দিনকতক নির্জনে থাকতে হয়।' এই নির্জনবাসের সাহায্য নেওয়া চেতনায় নিয়ত ঈশ্বরকে রাখবার জন্যে। একবার মনকে ঈশ্বরমুখী করতে পারলে সংসারে আর ভয় কি? তখন মনকে সংসাররূপ জলের উপরে রাখলে সে নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে। ঈশ্বরের করুণার দিকটাকে মূল্য দিয়ে ঠাকুর ক্ষান্ত থাকেননি। বার বার বলছেন: 'নির্জনে থেকে ঈশ্বরের সাধনা করতে হয়।'

ঈশ্বরচিন্তায় মনকে অভ্যস্ত করাটাই হ'ল বড় কথা। মনের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা সদাজাগ্রত থাকলে কাম কাঞ্চন কি করবে? তখন নির্বিঘ্নে সংসার করা যায়। তবে জনক-রাজা হ'তে গেলে সাধন করা চাই। ঠাকুর বলতেন, 'তোমরা কিছু কর, তবে তো জনক-রাজা হবে।'

মনটাকে ঈশ্বরে লাগিয়ে রাখাই শক্ত। কতদিক থেকে কত চিন্তার তরঙ্গ এসে পড়ছে মনের উপরে। 'যত বার আলো জ্বালাতে চাই, নিবে যায় বারে বারে।' ঈশ্বরের আসন থেকে যাচ্ছে গভীর অন্ধকারে। চিন্তা প্রবৃত্তির সহজ টানে যেদিকেই প্রভাবিত হোক না, মনকে ঈশ্বরে লাগিয়ে রাখবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতেই হবে। মার্কিন দার্শনিকের (William James) মতে—ইচ্ছা-শক্তির কাজই হ'ল, যাকে আমাদের বিষয়-বাসনা মনের মধ্যে মোটেই আমল দিতে প্রস্তুত নয়, তাকে চেতনায় জাগিয়ে রাখা। একবার চেতনায় ঈশ্বরচিন্তা জেঁকে বসলে বিষয়ে মন যাবে কেন? ঠাকুর বলতেন: 'বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তা হ'লে আর অন্ধকারে যায় না।'

উইলিয়াম জেম্‌স্ বলছেন: আমাদের সাধনার পথে বিঘ্ন বাইরের দিক থেকে তত নয়, যতটা মনের দিক থেকে। 'The difficulty is mental; it is that of getting the idea of the wise action to stay before our mind at all'. একটা প্রবৃত্তির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে মন একবার গিয়ে পড়লে সেই মন সঙ্গে সঙ্গে লোভনীয় অনেক ছবি আঁকতে শুরু ক'রে দেয়। বিপরীত ঢং-এর কোন স্বপ্নকে সে আমলই দেবে না। যুক্তির কথা সে কানেই নেবে না। কিন্তু একবার যদি শুভ চিন্তা মনের মধ্যে একটু জায়গা ক'রে নিতে পারে, সেই চিন্তা ক্রমে ক্রমে মনকে পূর্ণ ক'রে ফেলবে।

নির্জনবাস শুভচিন্তাকে মনের মধ্যে প্রাধান্য-লাভের সুযোগ দেবার জন্যে। কোন রকমে মন যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তা হ'লে ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করতে বা অর্থ মান-সম্ভ্রমের জন্য সে মন দৌড়ায় না। পা মদের দোকানের দিকে এগোবে, না বিপরীত দিকে চলতে শুরু করবে—সেটা নির্ভর করছে মনকে আসক্তি কতখানি পেয়ে বসেছে তার উপর। শরীরের দিক থেকে পা-দুখানাকে মদের দোকানের

দিকে নিয়ে যাওয়া যেমন সহজ, বিপরীত দিকে নিয়ে যাওয়াও তেমনি সহজ। শক্ত হচ্ছে—মন যখন মদের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে, তখন তাকে মদ খাওয়ার কুফল সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলা, মদ না খাওয়ার যুক্তিকে মনের মধ্যে ঘা মেরে মেরে বসিয়ে দেওয়া, মাতালের দুর্গতির চিন্তাকে অন্তরে জাগিয়ে রাখা।

মন বিষয়ের মধ্যে ডুবে থাকবে, না বিষয়-চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে—সবটাই নির্ভর করছে মনটা কোথায় রাখব, তারই উপরে। 'The whole drama is a mental drama.' ভাষাটা উইলিয়াম জেম্‌সের। 'The whole difficulty is a mental difficulty—a difficulty with an object of our thought.'

অভ্যাসযোগের যদি আশ্রয় না নিই, বিষয়চিন্তা ঈশ্বরচিন্তাকে মন থেকে তাড়িয়ে দেবে; আর অভ্যাস করতে করতে শেষের দিনে তাঁকেই মনে পড়বে। নির্জনবাসের উপদেশ—মনকে সাধনার দ্বারা ঈশ্বরমুখী হবার পথে সাহায্য করার জন্য।

আবির্ভাব

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আত্মসমাহিত তপস্যায়
দেখেছিলে চিদাকাশে ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপ,
অন্ধকার অপসৃত শতসূর্য-প্রদীপ্ত ভূমায়;
ভূমিতে আকাশ লীন: রূপ ও অরূপ
একাধারে বর্তমান। বিচিত্র আলোকে
দেখেছিলে কোটি কল্প মানুষের আগম নির্গম
অজ্ঞেয় রহস্য যত ছিল লোকে লোকে।

জরা-ব্যাধি-মৃত্যুভয় যন্ত্রণা নির্মম
একে একে দিয়েছ আহুতি
প্রজ্বলন্ত হোমগর্ভে কৃতাঞ্জলিপুটে,
আজি মৃত্যুঞ্জয় জীবনের দ্যুতি
বিকীর্ণ দিগন্তহীন; জয়ধ্বনি ওঠে
সহস্রের কণ্ঠে কণ্ঠে। এ বিশ্বভুবন
আজিও তমসাবৃত;
কর তার নির্মোক মোচন।

খুলে দাও অন্তর্দৃষ্টি কল্যাণের পথে
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মেঘান্ধ আকাশে
বিদ্যুতে উঠুক জ্বলি এই অঙ্গীকার:
প্রাণ দিয়ে শিখাইব প্রাণের প্রাচুর্য মহত্তম
জীবনের সকল তুচ্ছতা
নিঃশেষ করিয়া দিব মহাজীবনের সাধনায়।

দ্বিতীয় আকাশ

শ্রীবাসুদেব মুখোপাধ্যায়

যখনই অন্ধকার ঘন হয়, সাধকের মন
যোগভ্রষ্ট, ধরাতল ছেয়ে নামে চতুর কুয়াশা।
ভয়াল ভ্রান্তির মতো, আজন্মলালিত সব আশা
ভীষণ অলীক লাগে, প্রেম প্রীতি ভোলায়—তখন
অন্য আকাশের কোলে শীর্ণ হয়ে আসা মন ভাসে—
বিবেকের বিশাল আকাশে।

হৃদয়ের দ্বারগুলি যখনই রুদ্ধ সব, রণ-
জিঘাংসায় ভয়াবহ কালো হয় আত্মীয়ের বুক,
ক্রন্দনের রোল তোলে বাতাসেরা, সারি সারি মুখ
বড়োই অচেনা লাগে, নিজেকেও চিনি না—তখন
অন্য আকাশের কোলে ম্লান হয়ে আসা মন ভাসে—
আনন্দের অমল আকাশে।

ঘোর দুর্দিনেও জানি থাকবেই স্থির ও-আকাশ
হেলায় পেরিয়ে যাবো ও আলোয় সব সর্বনাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কীর্তন

প্রভাতফেরি বা কীর্তন, তাল—তালফেরতা

কথা—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সুর—শ্রীনিখিলজ্যোতি ঘোষ

গাও রামকৃষ্ণ, ভজ রামকৃষ্ণ, জপ রামকৃষ্ণ হৃদে অনিবার
(প্রভু) ধরাধামে এসে নিরক্ষর বেশে ত্রিতাপ-তাপিতে করিতে উদ্ধার ॥
কি দিয়ে পূজিবে তাঁহে, কি আছে তোমার ?
প্রেমফুলে পূজিলে নাকি কৃপা হয় তাঁহার।
মনমুখ এক ক'রে সত্য সরল ব্যাকুল হয়ে
কাতরে ডাকিলে নাকি পাওয়া যায় তাঁহায়।
তুলসী আর গঙ্গাজলে পূজিলে কি তাঁকে মিলে,
প্রেমাশ্রুতে না ধোয়ালে চরণ-কমল তাঁহার ?
জাতিধর্ম-নির্বিচারে প্রেম বিলায়ে সবাকারে
জগত-কল্যাণ-তরে করেন ধর্মসমন্বয় প্রচার ॥

সমাজতন্ত্রবাদ ও বিবেকানন্দ

(পরিশিষ্ট)

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

বিবেকানন্দের সমাজতাত্ত্বিক মতামতের বৈজ্ঞানিক উপকরণ

আমরা বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের তিনটি ভিত্তি এ পর্যন্ত লক্ষ্য ক'রে এসেছি। এক—আধ্যাত্মিক দর্শন-মত (অদ্বৈত বেদান্ততত্ত্ব); দুই—গণ-মানসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়; তিন—পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাণিবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞান-ভিত্তিক ইতিহাস-অনুশীলন। এর মধ্যে প্রথম দুটির আমরা সংক্ষেপে পরিচয় গ্রহণ পূর্বেই করেছি। তৃতীয়টির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ স্থানে স্থানে করেছি। কিন্তু লোক-মনে এ ধারণা আজ দৃঢ় সন্নিবিষ্ট যে, ধর্মাচরণে নিযুক্ত বিবেকানন্দ যা বলেছেন, তার ভিত্তি মিস্টিসিজম ও অতি-জাগতিক কতকগুলি দার্শনিক মতবাদ। এ ভ্রান্তিনিরসন-কল্পে আমি এই তৃতীয় ভিত্তির কিঞ্চিৎ বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। কিন্তু প্রারম্ভেই ব'লে রাখি, পুরাতত্ত্ব নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের বিচারক আমি নই এবং একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবরে এ-প্রসঙ্গে পূর্ণ আলোচনার সুযোগও কম। আমি যে তথ্যাদি ও বিচার এখানে উপস্থাপিত ক'রব, তা কোনমতেই এ-বিষয়ে সব, তা বলা চলে না। আরও তথ্য আছে, আরও যুক্তি আছে, নিঃসন্দেহে যাঁরা এ-বিষয়ে উত্তম অধিকারী, তাঁরা আলোচনা করতে পারেন। আমি শুধু এ প্রসঙ্গে অসম্পূর্ণ আলোচনা করছি স্বচ্ছ ও মুক্ত-দৃষ্টিসম্পন্ন সেই উত্তম অধিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে।

বর্তমান সময়ে সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ইতিহাস-ব্যাখ্যার একটি প্রবণতা এসেছে। ইতিহাস শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা রাজা ও শাসক-শ্রেণীর চরিতকথা নয়, এ হ'ল সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ-কাহিনী—এ ধারণা সুস্পষ্টভাবে লাভ করবার পর থেকে ঐতিহাসিকগণ এই সমাজ-তাত্ত্বিক পদ্ধতি সম্বন্ধে চেতনা লাভ করেছেন। এই পদ্ধতিটি হ'ল—'The process of writing history from the bottom up' অর্থাৎ সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে ইতিহাস অনুসন্ধান করা। পুঁথি ছেড়ে সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হবে। এবং তা না হ'লে সমাজ-বিকাশের কাহিনীর মূল রহস্য অজানিত থেকে যায়। 'History conceived without its social medium is the motion perceived without that which is moving'[১]. ম্যানহাইমের এই উক্তি এ-বিষয়ে যথার্থ সত্য প্রদর্শন করছে। নূতন কালের ইতিহাস সেইজন্য অধিকতররূপে আঞ্চলিক জন-সংস্কৃতি বিশ্লেষণ-ভিত্তিক। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের এই সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির আবিষ্কার একেবারেই আধুনিক, যদিও মর্গানের আলোচনার ভিত্তিতে ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্ক্স এই পদ্ধতিতে আলোচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু এ পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই বিংশ শতাব্দীতেই। আমাদের দেশে ইতিহাস-রচনায় এর প্রভাব নিতান্তই সাম্প্রতিক[২]।

১. Karl Manheim—The False and the Proper concept of History and Society. (P. 37)

২. শ্রীবিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' এ-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শ্রীনির্মল বসুর 'হিন্দুসমা গড়ন'।

আশ্চর্যের বিষয় বিবেকানন্দ ইতিহাসের এই সমাজতাত্ত্বিক উপকরণটি সেই উনিশ শতকের শেষ ভাগেই ক'রে গিয়েছেন। তাঁর 'আর্য ও তামিল' শীর্ষক নিবন্ধের প্রারম্ভেই তিনি বলছেন: 'সত্যই এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়তো সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডোলমেনদেরও অভাব নাই। চকমকি-পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও যে-কোন স্থানে মাটি খুঁড়িলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। হ্রদ-অধিবাসিগণ, অন্ততঃ নদীতীরবাসিগণ নিশ্চয়ই কোনকালে সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। গুহাবাসী এবং পত্রসজ্জা-পরিহিতগণ এখনও বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনও এদেশের নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশসম্ভূত ও ভাষাতাত্ত্বিকগণের তথাকথিত আর্যদের নানা প্রশাখা-উপশাখা আসিয়া মিলিত হয়। পারসীক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হুন, চীন, সীথিয়ান—এমন অসংখ্য জাতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; ইহুদী, পারসীক, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্কাণ্ডানেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি—যাহারা এখনও একাত্ম হইয়া যায় নাই—এইসব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানব-সমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আবার শান্ত হইতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।'

স্বামী বিবেকানন্দের মতে এই সকল সুবিপুল মানব-গোষ্ঠী ভারতীয় জাতি গড়ে তুলেছে। এবং যে পদ্ধতিতে গড়েছে, তারও সুস্পষ্ট বর্ণনা বিবেকানন্দের মধ্যে পাই: "প্রকৃতির এই উন্মাদনা-স্রোতের মধ্যে অন্যতম একটি প্রতিযোগী জাতি একটি পন্থা উদ্ভাবন করিয়া আপন উন্নততর সংস্কৃতির সাহায্যে ভারতের অধিকাংশ জনগণকে আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইল। এই উন্নত জাতি নিজেদের 'আর্য' বলিত এবং তাহাদের পন্থা ছিল বর্ণাশ্রমাচার—তথাকথিত জাতিভেদ-প্রথা।" ভারতের জাতীয় ইতিহাস বিভিন্ন জাতি বা বংশের (race) সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ইতিহাস এবং তার উপায় ছিল বর্ণাশ্রমধর্ম। এ-বিষয়ে অনেক পরবর্তীকালের সমাজতত্ত্ববিদ্ ও সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীদের আঞ্চলিক উপজাতিদের প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণান্তর একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেখি। শাকদ্বীপ (আফগানিস্থানের উত্তরাঞ্চল)-আগত মগ পুরোহিতদের ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজে স্থানপ্রাপ্তি, রামায়ণে কোল এবং ওঁরাও-গণের শুদ্ধাচারী হয়ে হিন্দুসমাজে আশ্রয়প্রাপ্তি এবং মহাভারতে বিভিন্ন দস্যু-জাতির ব্রাহ্মণাদিষ্ট বিভিন্ন আচার-ব্যবহার গ্রহণপূর্বক বিভিন্ন বনে প্রবেশলাভ ইত্যাদি তথ্য উল্লেখ ক'রে অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র বসু সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, 'ভারতীয় সমাজে বর্ণ-ব্যবস্থা এইরূপে বাহিরের জাতিকে নিজের কোলে স্থান দিয়া, অথবা সমাজের মধ্যে শিল্পের উৎকর্ষ বা আচারশুদ্ধির ফলে নানাবিধ শাখা-প্রশাখা বিস্তারের দ্বারা উত্তরোত্তর জটিল হইয়াছিল, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।'[৩]

এ সম্পর্কে বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ভারতের সমাজ-বিন্যাসের সঙ্গে পৃথিবীর

৩ হিন্দু-সমাজের গড়ন, পৃঃ-৬৩

অন্যান্য দেশের সমাজ-বিন্যাসের পদ্ধতির অতি সংক্ষিপ্ত অথচ অতি সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন। অন্য সকল দেশে সমাজে সর্বপ্রথম প্রাধান্য অর্জন করেন ক্ষত্রিয়েরা, আর ভারতে ব্রাহ্মণ—এই হ'ল বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত। এ সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন ক'রে তিনি বলছেন: 'রাইন নদীর তীরবর্তী কোন অভিজাতবংশীয় দস্যুকে নিজের পূর্বপুরুষরূপে আবিষ্কার করিতে পারিলে রোমের পোপ খুবই খুশী হইবেন। ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেন প্রশান্তচিত্ত পুরুষগণ—শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, সাধক ও মহাপুরুষেরা।' ব্রাহ্মণাধিপত্য সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা সকল সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে সুস্পষ্ট ব'লে মনে হয়। পুরোহিত ভিন্ন শ্রেণী; শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, সাধক ও মহাপুরুষেরা ও পুরোহিতশ্রেণী যে এক নয়, এ তিনি ইহুদী জাতির ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা ক'রে সুন্দররূপে দেখিয়েছেন। 'ইহুদীদের ইতিহাস স্মরণ করলেই বেশ বোঝা যায়, তাদের দু-রকম ধর্মনেতা ছিলেন—পুরোহিত ও ধর্মগুরু। পুরোহিতেরা জনসাধারণকে শুধু অন্ধকারেই ফেলে রাখত, আর তাদের মনে যত কুসংস্কারের বোঝা চাপাত। পুরোহিতদের অনুমোদিত উপাসনা-পদ্ধতিগুলি ছিল মানুষের উপর আধিপত্য কায়েম রাখবার অপকৌশল মাত্র।' সমস্ত Old Testament-এ পুরোহিতদের সঙ্গে ধর্মাচার্যগণের বিরোধ দেখা যায়। ধর্মাচার্যগণ জনসাধারণকে পুরোহিতদের থেকে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত যীশুর আবির্ভাবে শেষোক্তদের জয় হয়—'এই মহাপুরুষ পৌরোহিত্যরূপ দানবীয় স্বার্থপরতাকে নিধন করেন এবং তার কবল থেকে সত্যরত্ন উদ্ধার ক'রে বিশ্বের সকলকেই তা দিয়েছিলেন।' ভারতবর্ষে অনুরূপ ঘটনা ঘটে ব'লে বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন। 'পুরোহিতেরা যখন বেশ জাঁকিয়ে উঠেছেন, তখন সন্ন্যাসী নামে ধর্মাচার্যেরাও ছিলেন।' 'প্রাচীন ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিরা পুরোহিতদের নির্দেশকে অস্বীকার ক'রে শুদ্ধ সত্য প্রচার করেছিলেন। পুরোহিতদের শক্তিকে তাঁরা বিনষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছু করেওছিলেন।'[৪] ধর্মাচার্যদের উদারতার ফলে বিভিন্ন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত জাতিগণ তাদের ধর্মকর্ম, আচার-আচরণ, রীতিনীতি নিয়ে ভারতের সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। সেইজন্য ভারতের ধর্মে উচ্চতম অদ্বৈত-তত্ত্ব থেকে নিম্নতম সাপ-ব্যাঙ পূজার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এ-বিষয়ে বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত অন্যান্য সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেছেন।[৫] ভারতের জাতিগত এই বৈশিষ্ট্যকে বোধ হয় বিবেকানন্দ প্রথম স্বীকৃতি দেন, কারণ তখন শাসকশ্রেণী-প্রচারিত ভারতীয় উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ আর্যজাতি ও শূদ্রশ্রেণী অনার্য—এই সকল ভ্রান্তিমূলক তত্ত্ব-প্রচারের বহুল প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে ছিল। বিবেকানন্দ এ-তত্ত্ব তাঁর যুক্তিজাল-সহায়ে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে সিদ্ধান্ত করেন: '…আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করি; এ পর্যন্ত পরিচিত সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি তামিল-ভাষীদের জন্য আমরা গর্বিত; এই দুই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল-পূর্বপুরুষদের জন্য আমরা গর্বিত;

৪ 'বুদ্ধের বাণী'—স্বামীজীর বাণী ও রচনা—৮ম খণ্ড

৫ 'নানাজতি যখন ব্রাহ্মণের অধীনতা স্বীকার করিয়া বৃহত্তর হিন্দুসমাজ গঠন করিতে লাগিল; তখন কাহারও আচার-অনুষ্ঠানকে অকারণে নষ্ট করা হয় নাই।…… ফলতঃ হিন্দুসমাজ যেমন নানাজাতির সংশ্লেষের দ্বারা রচিত হইয়াছে, হিন্দুধর্মও তেমনি নানা মত ও পথের সংশ্লেষের দ্বারা বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে।'—হিন্দুসমাজের গড়ন পৃঃ ৭৫

মানবজাতির যে আদি-পুরুষেরা প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ফিরিতেন, তাঁহাদের জন্য আমরা গর্বিত।'

বিশুদ্ধ আর্যজাতির অস্তিত্ব যে সম্পূর্ণ অবাস্তব, এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এবং এ-বিষয়ে পরবর্তীকালের সকল পুরাবিদ্গণ তাঁর মতে একমত হয়েছেন দেখা যায়। বিবেকানন্দ বলছেন, 'আর্য ও দ্রাবিড় এই বিভাগে কেবল ভাষাতাত্ত্বিক বিভাগমাত্র, করোটি-তত্ত্বগত (craniological) বিভাগ নহে, সে ধরনের বিভাগের পক্ষে কোন দৃঢ় যুক্তিই নাই।' ভারতের ইতিহাসে একান্তরূপে এ তত্ত্ব সত্য ব'লে দেখা গিয়েছে, 'কারণ যে বর্ণের হস্তে তরবারি রহিয়াছে, সেই বর্ণই ক্ষত্রিয় হইয়া দাঁড়ায়; যাহারা বিদ্যাচর্চা লইয়া থাকে, তাহারাই ব্রাহ্মণ, ধনসম্পদ যাহাদের হাতে, তাহারাই বৈশ্য। শক-পুরোহিতগণ আমাদের ব্রাহ্মণ-সমাজের অঙ্গীভূত হন।'[৬]

ভাষাতত্ত্বের সহায়তাও বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছেন ভারতীয় ইতিহাসের জাতীয় ধারা-ব্যাখ্যানে। বলছেন তিনি এ সম্পর্কে: "ভাষাতাত্ত্বিকদের 'আর্য' ও 'তামিল' এই শব্দ-দুইটির নিহিত তাৎপর্য যাহাই হউক না কেন, এমনকি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, ভারতীয়দের এই দুই বিশিষ্ট শাখা ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত-পার হইতে আসিয়াছিল, তবু অতি প্রাচীনকাল হইতে এই বিভাগ ভাষাতত্ত্বগত, রক্তগত নহে।" এ-বিষয়ে ইউনেস্কো এবং জুলিয়ান হাক্সলের আধুনিকতম মত বিবেকানন্দের সঙ্গে এক—এদের মতে জাতি (রক্তগত জাতি) ব'লে কিছুই নাই।'

৬ 'ভারতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারা'
৭ Julian Huxley—'Race'

বিবেকানন্দের প্রাচীন ইতিহাস অনুশীলনে নিজস্ব সিদ্ধান্তও কিছু কিছু ছিল। যেমন তিনি মনে করতেন যে, মিশরীয়গণের আদি-ভূমি ভারতের মালাবার উপকূল। 'আমরা মনে করি, মিশরবাসীদের পন্টই মালাবার দেশ নয়, বরং সমগ্র মিশরীয়গণ মালাবার তীর হইতে সমুদ্র পার হইয়া নীলনদের তীর ধরিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণের দিকে ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল। এই পন্টকে তাহারা পবিত্রভূমিরূপে সাগ্রহে স্মরণ করিত।'[৮] দ্বিতীয়তঃ তিনি মনে করতেন যে, ভারতে যে মিশ্রজাতি আর্য নামে খ্যাত, তা বহিরাগত নয়। এ-বিষয়ে তাঁর প্রথম যুক্তি: 'In what Vedas, in what Sukta, do you find that the Aryans came into India from a foreign country? When do you get the idea that they slaughtered the wild aborigines?'—অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যে আর্য-জাতির বিদেশ-বাসের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি হ'ল: 'প্রাচীন নথিপত্র অনুসারে আর্যদের বাসভূমি ছিল তুর্কীস্থান, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম তিব্বতের মধ্যবর্তী দেশ।' এ সম্পর্কে স্বামীজীর মতের অনুমোদন আমরা পাই Dr Eichstedt-এর মতের মধ্যে, যাঁর সিদ্ধান্ত হ'ল যে, বৈদিক আর্যগণের পূর্ব-পুরুষগণ পরবর্তী তুষার-যুগ (Late Ice-Age) হ'তে হিন্দুকুশ পর্বতের অঞ্চলের অধিবাসী। মোটের উপর স্বামীজীর অভিমত: বৈদিক আর্যজাতি ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী ইওরোপীয়গণের কল্পিত আর্যজাতি—এ-দুই এক ও অভিন্ন নয়। বিভিন্ন জাতির শারীরিক লক্ষণাদি-সংক্রান্ত নৃতাত্ত্বিক বিষয় তাঁর সাহায্যে এসেছে: 'In the

৮ 'আর্য ও তামিল'—স্বামীজীর বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড

opinion of modern savants, the Aryans had reddish white complexions, black or red hair, straight noses and well-drawn eyes, etc.........When the complexion is dark, there the change has come to pass owing to the mixture of the pure Aryan blood with black races.........But the European Pundits ought to know by this time that, in the southern parts of India, many children are born with red hair and blue or grey eyes .....Whether of pure or mixed blood, the Hindus are Aryas.'[৯] আর্যজাতি একটি মিশ্রিত জাতি—এ সিদ্ধান্ত হ'তে স্বামীজী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন : 'সংস্কৃত যেমন ভাষা-সমস্যার সমাধান, আর্য তেমনি জাতিগত সমস্যার সমাধান। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রগতি ও সংস্কৃতির এবং সর্বপ্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান ব্রাহ্মণত্ব।' ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের মূলমন্ত্র এই কথা-কয়টির মধ্যে নিহিত রয়েছে। ভারতীয় আর্যজাতি এ সমস্যার সমাধান করেছে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর সংস্কৃতির মিশ্রণ দ্বারা। সমস্ত আদর্শটি ধর্মকে অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠেছে। একেশ্বরবাদের দ্বারা ব্যাবিলোনীয় সভ্যতা ও ইহুদী-সভ্যতা এইরূপ ঐক্য-সাধনের প্রয়াস করেছিল। ব্যাবিলোনীয়-গণ সব 'বাল'-দেবতাকে 'বাল-মেরো ডাচে' (সর্বশক্তিমান্ এক দেবতা) পরিণত করে এবং ইহুদীগণ সব 'মোলোক'-দেবতাকে সর্বশক্তিমান্ 'মোলোক যিয়োবাহ'তে পরিণত করে। কিন্তু এতে যে ঐক্য সাধিত হয়, তার দ্বারা ধ্বংস সাধিত হয়—বিকাশের পথ আর থাকে না। সুতরাং স্বামীজীর মতে বিরাট সমস্যা হ'ল বিভিন্ন উপাদানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিনাশ না ক'রে তাদের ঐক্য ও সংহতি-সাধন। ভারতবর্ষে এই সমস্যার সমাধান হয় 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' মন্ত্রের দ্বারা। অতএব স্বামীজীর মতে একেশ্বরবাদ নয়, অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদই এর সমাধান। ভারতবর্ষের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব-সাধন এবং ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ পশু-মানবকে দেবমানবে রূপান্তর সাধনের প্রয়াস মহিমময় ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করছে।

অতএব আমরা দেখছি বিবেকানন্দের ইতিহাস-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি আধুনিক সমাজ-তাত্ত্বিক ইতিহাস-পদ্ধতি ও সর্বপ্রকার মানব-শাস্ত্র—পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব সাহায্যে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত-সকল কল্পনা নয়, যুক্তিগ্রাহ্য ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক।

স্বামীজীর ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনায় আমরা অনুরূপ পুরাতাত্ত্বিক ভিত্তি দেখতে পাই। ইতিপূর্বে আমরা তাঁর ধর্ম-বিজ্ঞান ও ফুয়ারবাক-মার্ক্সের মতালোচনায় তার কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। এখানে সে-সম্বন্ধে স্বামীজীর মৌলিক মত আলোচনার চেষ্টা ক'রব। আত্মতত্ত্ব বৈদিক আর্যদের দ্বারা প্রথম আবিষ্কৃত হয়-এই হ'ল স্বামীজীর অভিমত।[১০] এ সম্পর্কে হেরোডোটাস হ'তে আরম্ভ ক'রে ম্যাসপেরো, হেকেল প্রভৃতি যাবতীয় মিশর-তত্ত্ববিদ্‌দের মত উদ্ধৃতিপূর্বক স্বামীজী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যদিও হেরোডোটাস বলেন যে, মিশরীয়গণই সর্বাগ্রে আত্মার অমরত্বের ধারণা করতে পেরেছিল; ম্যাসপেরো, আর্মান ও হেকেলের মত যে, আত্মা বা পুনর্জন্ম সম্বন্ধে এদের কোন ধারণা ছিল না। তারপর কাল্ডিয়া, হিব্রু, হেলেনীয় ও পারসীক জাতির

৯ Complete Works Vol. V, P. 368

১০ 'পুনর্জন্ম'—স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড।

উপাসনা-পদ্ধতির উল্লেখ ক'রে স্বামীজী সিদ্ধান্ত দেন যে, পিথাগোরাস আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে পেরেছিলেন, কারণ এপুলিয়াসের মতো তিনি ভারতে শিক্ষা পেয়েছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত স্বামীজী এই সিদ্ধান্ত দেন যে, যে-সকল জাতি মৃতদেহকে ভস্ম ক'রে ফেলে, তাদের মধ্যেই আত্মার অমরত্ব ও দেহের নশ্বরত্বের ধারণা সুস্পষ্ট দেখা যায়। যে-সকল জাতি দেহকে কবরস্থ করে, তাদের মধ্যে দেহবাদ প্রধান, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণার অভাব। এই সকল দেহবাদী ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মচেতনার মূলে ভীতির প্রাধান্য দেখা যায়। 'সেমিটিক ধর্মে ভয় ও কষ্টের ভাব প্রচুর; ঐ ধর্মের ধারণা এই যে, মানুষ ঈশ্বর দর্শন করিলেই মরিবে।'[১১] কিন্তু আর্যজাতির ধর্মচেতনার আদিতে এরূপ ভীতির প্রাধান্য দেখা যায় না। এ সম্পর্কে স্বামীজী বলেন: 'উহার মধ্যে কোনরূপ দুঃখের ভাব নাই। উহাতে সরল হাস্যের অভাব নাই। বেদের কথা বলিতে বলিতে আমি যেন দেবতাদের হাস্যধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি।' 'অনেক বৈদিক মন্ত্রে আছে, যেখানে পিতৃগণ বাস করেন, তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও, যেখানে কোন শোক দুঃখ নাই ইত্যাদি। এইরূপে এদেশে এই ভাবের আবির্ভাব হইল যে, যতশীঘ্র শবদেহ দগ্ধ করিয়া ফেলা যায়, ততই ভাল। তাঁহাদের ক্রমশঃ ধারণা হইল যে, স্থূলদেহ ছাড়া একটি সূক্ষ্মদেহ আছে, স্থূলদেহ ত্যাগের পর সূক্ষ্মদেহ এমন এক স্থানে চলিয়া যায়, যেখানে কোন দুঃখ নাই, কেবল আনন্দ।' বিভিন্ন দেবদেবী কল্পনা তাঁরা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের বর্ণনায় যে অপূর্ব কাব্য ও ভাষা দেখা যায়, তার মধ্যে একটি প্রফুল্ল আনন্দের বিকাশ আছে। প্রথমে তাঁরা বহির্জগতে জগৎ-সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন, কিন্তু সেখানে উত্তর পাওয়া গেল না, তাঁরা দেখলেন বহিঃপ্রকৃতি দেশকালে সীমাবদ্ধ। তখন তাঁরা 'নেতি নেতি' বিচারপূর্বক দেখতে গেলেন অন্তর্জগৎ, তখন বিভিন্ন দেবগণ এক হয়ে গেলেন; চন্দ্র, সূর্য, তারা, ব্রহ্মাণ্ড—সব এক হয়ে গেল।

স্বামীজীর বিশ্লেষণে অতি সুস্পষ্ট যে, ধর্মকে আদিম মনের ভীতিসঞ্জাত কুসংস্কার বলা চলে না, তাকে মননশীল জীবের ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের অনুসন্ধানের স্বাভাবিক প্রেরণা বলা যেতে পারে। আমাদের ধর্মগুলিকে অবলম্বন ক'রে যে-সকল পুরাতাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে, সবগুলির সিদ্ধান্ত সেইজন্য আত্মতত্ত্ব-বিরোধী, বস্তুবাদ-প্রতিপাদক। কিন্তু বিবেকানন্দ যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন বৈদিক সাহিত্যের ভিত্তিতে, তাতে আছে সুপরিস্ফুট ধর্ম-চেতনার প্রকৃত স্বরূপ। এবং এ আলোচনায় সেমেটিক ধর্মকে বাদ দেওয়া হয়নি।

এইরূপে আমরা দেখি, বিবেকানন্দের ভিত্তি ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ কল্পনামাত্র নয়। এ-বিষয়ে তিনি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতিরও প্রচুর সহায়তা নিয়েছেন। স্থানাভাবে অতি সংক্ষেপে দু-একটি কথা এখানে উপস্থাপিত করছি।

বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, দ্বৈতবাদের উপর আধুনিক বিজ্ঞান কি আঘাত হেনেছে, দ্বৈতবাদের কাছে এই আক্রমণের কোন উত্তর নেই। দ্বৈতবাদী ধর্মগুলিকে বিজ্ঞান সত্যই অপ্রমাণিত করে। এজন্যই প্রধানতঃ ফুয়ারবাক, মার্ক্স খ্রীষ্টধর্মের অবৈজ্ঞানিকতা প্রমাণ ক'রে জড়বাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু বিবেকানন্দের মতে ধর্মের অকাট্য ভিত্তি আছে

১১ খেতড়ি বক্তৃতা—বেদান্ত—ঐ ৫ম খণ্ড

অদ্বৈতবাদের কাছে। অদ্বৈতবাদ বিজ্ঞান-সম্মত। এ সম্পর্কে তিনি বলছেন: 'সর্বত্রই বিজ্ঞান ও ধর্মে কি বিরোধ? প্রচলিত ধর্মগুলি বহির্মুখী ব্যাখ্যায় এতদূর জড়িত যে, সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—এইরূপ অনন্ত দেবতার কল্পনা করে, আর ভাবে, যাহা কিছু ঘটিতেছে, সবই একটা না একটা দেবতা বা ভূত করিতেছে। ইহার মোট কথা এই যে, ধর্ম—কোন কিছু সেই বস্তুর বাহিরে অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান যত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, ততই উহা প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা ভূত-প্রেতের হাত হইতে নিজের হাতে লইতেছে। যেহেতু ধর্মরাজ্যে অদ্বৈতবাদ এই কাজ করিয়াছে, সেই হেতু অদ্বৈতবাদই অধিকতর ভাবে বৈজ্ঞানিক ধর্ম। এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড বাহিরের কোন ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, জগতের বহির্দেশে অবস্থিত কোন দৈত্য তাহা সৃষ্টি করে নাই। আপনা-আপনি সৃষ্ট হইতেছে, আপনা-আপনি উহার প্রলয় হইতেছে, উহা এক অনন্ত সত্তা ব্রহ্ম। 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'—হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই।[১২]

বিবেকানন্দের দর্শনতত্ত্বে ও সমাজ-বিবর্তবাদে আমরা দেখেছি ক্রমবিকাশবাদ একটি প্রধান স্থান অধিকার ক'রে আছে। তবে ডারুইন-প্রণীত ক্রমবিকাশবাদের সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু মতভেদ ছিল। প্রথমতঃ যেহেতু ভারতীয় তর্কশাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী শূন্য হ'তে কিছু সৃষ্ট হয় না, বীজ হ'তে গাছ, গাছ হ'তে বীজ, অব্যক্ত হ'তে ব্যক্ত ও ব্যক্ত হ'তে অব্যক্ত—এইরূপে বিবর্তন চলে, সেইহেতু ক্রমবিকাশ থাকলে ক্রমসঙ্কোচ অবশ্য থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁর মত 'Survival of the fittest' theory ভুল। পতঞ্জলি-বর্ণিত প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা এক জাতি হ'তে আর এক জাতির উৎপত্তি সংসাধিত হয়। সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই উন্নতির উপায় নয়। স্বামীজীর এ সম্পর্কে মত: 'সকল মানবই পূর্ব হইতেই অনন্তশক্তি-সম্পন্ন, কেবল এই সকল বিভিন্ন অবস্থা-চক্ররূপ প্রতিবন্ধক বা বাধা তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলি সরাইয়া ফেলিলেই তাহার সেই অনন্তশক্তি মহাবেগে বাহির হইয়া থাকে। ইতরপ্রাণীর ভিতর মনুষ্যভাব অবরুদ্ধ রহিয়াছে; যখন সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই সে মনুষ্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। আবার যখন উপযুক্ত সুযোগ ও অবসর উপস্থিত হয়, তখনই মানবের মধ্যে যে ঈশ্বর বর্তমান, তাহা অভিব্যক্ত হয়।'[১৩] আধুনিক বিজ্ঞানীরা 'Atavism' (পূর্বানুকৃতি) স্বীকার করেন, অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীদের মধ্যে পূর্বপুরুষ বা আদিম স্তরের লক্ষণ দেখা যায়। বিবেকানন্দ এই পূর্বানুকৃতির প্রমাণ-সহায়ে ক্রমসঙ্কোচবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। ক্রমসঙ্কোচবাদ তাঁর সমাজ-বিবর্তনবাদে কি স্থান অধিকার ক'রে আছে, তা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি এবং এও দেখেছি যে, সোরোকিনের 'Theory of immanent change' এই ক্রমসঙ্কোচবাদকেই প্রকারান্তরে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

*　*　*

স্বামীজী কর্তৃক সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির ব্যবহার-সম্পর্কে যে-আলোচনা আমরা উপরে করলাম, পুনর্বার তার অসম্পূর্ণতা স্বীকার করছি। স্বামীজীর এই সকল উপকরণ প্রয়োগ সর্বত্র—তাঁর সমগ্র

১২ হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি। —৫ম খণ্ড।

১৩ প্রশ্নোত্তরে আলোচনা—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট্‌স্ ফিলজফিক্যাল সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতার পর আলোচনা।—ঐ ২য় খণ্ড।

রচনাবলী হ'তে তা উদ্ধার করা সহজসাধ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ নই। আমার আলোচনায় তাই তাঁর এ সকল আলোচনা ও প্রয়োগের যাথার্থ্য-বিশ্লেষণ আমি খুব কমই করেছি। সে বিচার বিশেষজ্ঞেরা করবেন, তবে মুক্ত ও স্বচ্ছ দৃষ্টি চাই, নতুবা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসকলের প্রয়োগ ঘটলেও আলোচনা সত্যনিষ্ঠ হয় না।[১৪] আমি এখানে যেটুকু আলোচনা করবার প্রয়াস পেয়েছি, তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু এইটুকু দেখানো যে, বিবেকানন্দের সমাজতাত্ত্বিক ধারণাসকল বিজ্ঞান-ভিত্তিক, প্রচুর উপকরণ তিনি ব্যবহার করেছেন, এবং তর্কশাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী সে সকল হ'তে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন। আশা করি, আমার সে উদ্দেশ্যটুকু সফল হয়েছে এই সীমাবদ্ধ আলোচনায়।

১৪ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'Swami Vivekananda —The Patriot-Prophet' গ্রন্থে এ-বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন; কিন্তু তা একদেশদর্শী হয়েছে তাঁর পূর্বপোষিত 'Historical Materialism'এ বিশ্বাসের জন্য। তাতে এই সকল উপকরণ যে উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ ব্যবহার করেছেন, সেই সকল উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা বিকৃত হয়েছে।

তথাগত

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিখারীর তরে সেজেছ ভিখারী
ব্যথিতে লয়েছ বুকে,
রাজার আসন ত্যজিয়া ধুলায়
বসেছ গো হাসিমুখে।

সুখের আশায় অন্ধ—
লভিল নয়ন তব জ্ঞানালোকে
ঘুচিল সকল দ্বন্দ্ব ;

বুঝিল জীবন কেবলি স্বপন
নিমগন চির দুখে।

প্রভাত হইল নিশি,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেম-বিনিময়ে
ভেদাভেদ গেল মিশি ;
ডুবিয়া মরিল হিংসা-কলহ
মধুর মিলন-সুখে।

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা

[দ্বিতীয় পর্ব—ভারতের ইতিহাস ও ধর্ম]

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

(১)

আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্যে স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা সমগ্র বিশ্বের সভ্যতা-স্রোতস্বিনীর বহুমুখী ধারায় অবগাহন করেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের বিচিত্র ও বিপরীত প্রভাবে অনুরঞ্জিত এবং আবর্তিত মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ স্বামীজীর বৈদগ্ধ্যের গভীরে রেখাপাত করেছে। ভারতে ও বিদেশে নানা ভাষণের মাঝে তিনি তাই পরিবেষণ করেছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত', 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' প্রভৃতি নানা রচনার মাধ্যমে এবং পত্রাবলীর ভেতর দিয়ে তিনি বিভিন্ন দেশকাল সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।

ইতিহাস-সাগরের বেলাভূমিতে আবহমান কাল ধরে প্রবাহিত তথ্যের ঢেউ এসে নিরন্তর আছড়ে পড়ছে। এ তথ্যের ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে দিশেহারা হয় ইতিহাস-সাগরের সাধারণ যাত্রী, তার খেই যায় হারিয়ে। কিন্তু স্বামীজী খেই হারাননি। তাঁর বলিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদের ভেলা ভাসিয়ে দিয়ে, অসাধারণ মনীষার দাঁড়খানি বেয়ে তিনি সাগরকূলে এসে পৌঁছেছেন। তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণের পথে তাঁর ইতিহাস-চেতনাকে পরিচালিত ক'রে স্বামীজী উত্তরকালের ভারতবাসীর জন্য ভারতের ইতিহাসের মূলসূত্রটি বলিষ্ঠ ঐতিহ্যরূপে জমা রেখে গেছেন।

সে সূত্রটি ধর্ম। ভারতীয় ধর্ম বা ধর্মাশ্রয়ী ভারতীয় সংস্কৃতির উন্মীলিত ও নিমীলিত হবার পথে ছিল তাঁর ইতিহাস-চেতনার নিঃশঙ্ক পরিক্রমা। উদাত্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন, 'অন্যান্য জাতির পক্ষে ধর্ম সংসারের অন্যান্য কাজের মতো একটা কাজ-মাত্র। রাজনীতি চর্চা আছে, সামাজিকতা আছে, ধন ও প্রভুত্বের দ্বারা যা পাওয়া যায়, তা আছে⋯।⋯এখানে—এই ভারতে কিন্তু মানুষের সমগ্র চেষ্টা ধর্মের জন্য—(কলম্বো-বক্তৃতা)।' কুম্ভকোণম্-বক্তৃতায় আরও স্পষ্ট ক'রে স্বামীজী জানালেন :

> 'জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম হওয়া উচিত অথবা রাজনীতি—এ-বিষয়ে এখন আমি বিচার করিতে চাহি না। তবে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ভালই হোক বা মন্দই হোক—ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি স্থাপিত। ⋯ভালই হোক আর মন্দই হোক সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ⋯তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া আবার নূতনখাতে প্রবাহিত করাইতে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বসূচক ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি বা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে।'

ভারতেতিহাসের মূলসূত্রের এই ভাষ্য তথাকথিত বিজ্ঞান-সম্মত অর্থনৈতিক বা মার্কসীয় ব্যাখ্যার এত পরিপন্থী যে, অতি আধুনিকের চোখে স্বামীজী প্রতিক্রিয়াশীল বা revivalist ব'লে পরিগণিত হবেন। তদুপরি তিনি যখন উত্তরকালের ভারতবাসীকে সম্বোধন ক'রে বললেন, এই ধর্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়, তখন তো

অতি আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষক ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলবেন যে, এই দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক, এ পথনির্দেশ অত্যন্ত সনাতনী ও প্রগতি-বিরোধী। তিনি আরও মন্তব্য করবেন: যুগে যুগে ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মানুষের ধর্মবুদ্ধি দিয়ে নয়, তার জৈবিক সত্তা, দৈহিক প্রয়োজন এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতার খুঁটিনাটি দ্বারা সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে সংখ্যাতীত সংঘর্ষ ও রেষারেষির পশ্চাতে যে কাহিনী, তা উচ্ছ্বাসে বা ভাববিলাসে গঠিত নয়, নিছক বাস্তব রূঢ়তায় তা বিন্যস্ত। মানুষের ইতিহাস তার অর্থনৈতিক জীবনধারার আধার ও আধেয় দুইই। যে ধর্মের দোহাই দিয়ে অতীতে ও মধ্যযুগে বলদর্পী নায়কগণ ইতিহাসের গতি-নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হয়েছেন, সেটা একটা আড়াল বা অজুহাত-মাত্র, অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির একটা সোপান-মাত্র। ভারতেতিহাস এ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বাইরে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে গড়া কোন কাহিনী নয়, তা যতই কেন না জাহির করা হোক বাঙ্‌ময় উচ্ছ্বাসে।

এ সমালোচনাকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেও ব'লব যে, এও এক রকম গোঁড়ামি বা একদেশদর্শিতা। ইতিহাস-নিয়ন্ত্রণে ও তার বিবর্তনে অর্থনীতির স্থান নিশ্চয় আছে, আজকের জড়বাদী জটিল ধনতান্ত্রিক পৃথিবীতে তা হয়তো আরও প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু ইতিহাস কি শুধু একটা নীতি বা মতবাদের বিস্তার বা বিন্যাস-মাত্র? মানুষ কি শুধু বিশেষ কোন মতবাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ? যুগে যুগে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ যা ভেবেছে এবং করেছে, তাকে একটা ছাঁচে ঢালাই ক'রে কোন সিদ্ধান্তে হয়তো পৌঁছতে পারি, তাকেই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তরূপে জাহিরও করতে পারি এই ব'লে যে, দু'য়ে দু'য়ে সর্বদা চার হয়। কিন্তু এ-পথে শুধু যদি ইতিহাসের গবেষণা চলে, তবে ভয় হয়, গোড়ায় গলদ থেকে যাবে। ইতিহাস তো মানুষেরই ইতিহাস, যে মানুষের জীবনযাত্রায় দেশ-কাল-পাত্রভেদে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই, বিভেদের সীমা নেই। জড়-বিজ্ঞানের লেবরেটরিতে আর জলজ্যান্ত মানুষের লেবরেটরিতে গবেষণা একই পদ্ধতিতে চলতে পারে না। এক অবস্থায় সকল দেশের মানুষ যুগে যুগে একই রকম ব্যবহার করেনি, করবেও না, ইতিহাসের গতি ফর্মুলার অমোঘ নিয়মে নির্ধারিত হয় না। এ-কথাটা মনে রাখলে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, স্বামীজীর বাণী ও রচনায় ভারতেতিহাসের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যে-ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণাঙ্গ না হ'তে পারে, কিন্তু অনৈতিহাসিক বা অবৈজ্ঞানিক মোটেই নয়, যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সেখানে ধ্বনিত হয়েছে, তা বাঙ্ময় উচ্ছ্বাসমাত্র নয়, সাবধানে সশ্রদ্ধচিত্তে বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা গ্রহণযোগ্য।

মানুষ তো শুধু অর্থনীতির ছকে বাঁধা বিশিষ্ট জীব নয়। জীবনের অন্যান্য বহু দিক তার আছে, সেখানেও তাকে খুঁজতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঐতিহ্যের দ্যোতনা এবং ধর্মের প্রেরণা যুগে যুগে ইতিহাসের পটভূমি হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এই কারণেই বিভিন্নতা দেখা দেয়। স্বামীজী বলেছেন:

"প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতিনীতি সেই উদ্দেশ্যটি সফল করার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে।…তিনটি বর্তমান জাতির তুলনা কর, যাদের ইতিহাস তোমরা অল্পবিস্তর জান—ফরাসী ইংরেজ ও হিন্দু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড। প্রজারা সব অত্যাচার অবাধে সয়; করভারে

দিয়ে দাও, কথা নেই; দেশশুদ্ধকে টেনে সেপাই কর, আপত্তি নেই; কিন্তু যেই সে স্বাধীনতার উপর হাত কেউ দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে। কেউ কারু উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পাবে না—এইটিই ফরাসী চরিত্রের মূলমন্ত্র।···ইংরেজ চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি, আদান-প্রদান প্রধান। যথাভাগ, ন্যায়বিভাগ—ইংরেজের আসল কথা। রাজা, কুলীন জাতি—অধিকার ইংরেজ ঘাড় হেঁট ক'রে স্বীকার করে; কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার করতে হয় তো তার হিসাব চাইবে। রাজা আছে বেশ কথা—মান্য করি, কিন্তু টাকাটি যদি তুমি চাও তো তার কার্য-কারণ হিসাবপত্রে আমি দু-কথা বলবো; বুঝবো, তবে দেবো। রাজা জোর ক'রে টাকা আদায় করতে গিয়ে মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন; রাজাকে মেরে ফেললে।—হিন্দু বলছেন কি যে রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা বেশ কথা; কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা 'মুক্তি'। ···ঐখানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্বনাশ, তা ছাড়া যা কর, চুপ ক'রে আছি। লাথি মারো, 'কালো' বলো, সর্বস্ব কেড়ে লও—বড় এসে যাচ্ছে না, কিন্তু ওই দোরটা ছেড়ে রাখো।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)

বর্তমান আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র) বিস্ময়কর কারিগরী প্রতিভা, অসামান্য আর্থিক সমৃদ্ধি এবং সমগ্র পৃথিবীর বুকে উত্তমর্ণের ভূমিকা নিয়ে (পুঁজিবাদী) গণতন্ত্রের কেতন উড্ডীন রাখবার যে বলিষ্ঠ প্রয়াস ক'রে চলেছে, তা স্বামীজী দেখে যাননি। তখন যুক্তরাষ্ট্র 'মন্‌রো' নীতির বা শুধু দুই আমেরিকার সুখদুঃখের বেড়াজালে আবদ্ধ। বাইরের জগৎ-সম্বন্ধে সে ছিল নীরব বা নিরপেক্ষ। তবুও আমেরিকার জীবন-পর্যালোচনায় স্বামীজী নানা ভাবে এ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সাম্যবাদী রাশিয়ার আশ্চর্য প্রতিভা, যা বর্তমান পৃথিবীর একাধারে গর্ব ও ভীতি, তার বিন্দুমাত্র উন্মেষ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হয়নি। রাশিয়া তখন জার-কবলিত রাজতন্ত্রের ভালমন্দ-মিশ্রণে শাসিত। অভিনব ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষভাবে রাশিয়ার এ অপূর্ব সম্ভাবনার কথা কোথাও বলেননি, যতদূর জানি। তা বলার সুযোগও তাঁর ছিল না। আমরা আরও জানি, স্বামীজীর ইতিহাস-অনুশীলন মুখ্যভাবে নয়, প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ ও নির্দিষ্ট ব্রত-পালনের মহান্ পথে। আর্নল্ড টয়েনবি বা উইল ডুরান্টের পূর্বসূরী তিনি নন, যদিও ইতিহাস পাঠ ও পর্যালোচনা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়বস্তু ছিল এবং এ-বিষয়ে তাঁর প্রতিভা ছিল অসামান্য। সময়ের দিক দিয়ে তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিধিও এ-প্রসঙ্গে স্মরণে রাখতে হবে। আরও মনে রাখা দরকার, তাঁর ইতিহাস-চেতনায় ভারতই মুখ্য কথা, তৎকালীন দুই শক্তিধর পাশ্চাত্য জাতি—ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উপমেয়রূপে সে-চেতনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ড সম্বন্ধে দু-একটি তথ্যের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি যে-দুটি তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, তা আশ্চর্যভাবে ইতিহাস-সম্মত। এর সমর্থনে বহু ঘটনার উল্লেখ করা যায় উভয় দেশের ইতিহাস থেকে। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর গৃহযুদ্ধ এবং স্টুয়ার্ট রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ (ক্রমওয়েলের প্রাধান্য-কালে) ইংরেজের ব্যবসাবুদ্ধি-চরিত্রের বিশিষ্ট প্রকাশরূপে স্বামীজী দেখেছেন। গৃহযুদ্ধের প্রাক্‌কালে প্রধানতঃ কর দেওয়া বিষয়েই পার্লামেণ্ট বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছিল, বলেছিল রাজা যা খুশিমত চাইবেন, প্রজা তা দিতে বাধ্য নয়, প্রজার উপর কর ধার্য করবেন রাজা জাতির প্রতিনিধি পার্লামেণ্টের সম্মতি নিয়ে।

আর ভারতের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য যে ধর্ম, তা তিনি তাঁর বাণী ও রচনার সর্বত্র

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যাখ্যা ক'রে, বিন্যাস ক'রে বলেছেন। মাদ্রাজে প্রদত্ত 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বক্তৃতায় এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন যে, যদি ভারত তার ধর্মরূপ জাতীয় ভিত্তিকে ত্যাগ ক'রে পরানুকরণে অন্য কোন আদর্শ ও লক্ষ্যকে গ্রহণ করতে যায়, তবে সে 'চূর্ণবিচূর্ণ' হয়ে যাবে।

'তোমরা যে শত শত শতাব্দীর অত্যাচার সহ্য করিয়া এখনও অক্ষতভাবে দাঁড়াইয়া আছ, তাহার কারণ তোমরা সযত্নে এই ধর্ম রক্ষা করিয়াছ, উহার জন্য সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছ।'

আমাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে: আমরা মনে করি, ধর্ম ধর্ম করেই এ দেশটা উচ্ছন্নে গেছে। স্বামীজী যে পারমার্থিক স্বাধীনতা বা মুক্তির কথা বলছেন, তা এখন শিকেয় তুলে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। পশ্চিমের জড়বাদের ধারায় দেশটাকে ঢেলে সাজা আজ সবচেয়ে বড় জাতীয় কর্তব্য। জগৎকে অবহেলা ক'রে পরমার্থকে সেবা করতে গিয়ে ভারত 'ইতো নষ্ট স্তুতো ভ্রষ্টঃ' হয়েছে। অপরে ভোগ করেছে এ-জাতির অপরিমেয় ঐহিক ঐশ্বর্য, আর আমরা তথাকথিত ধর্মকে আঁকড়ে ধরে, ভগবানের দোহাই দিয়ে 'শুধু দিন-যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি' বহন ক'রে চলেছি। আজ আমরা ইংরেজ-কবলমুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক, আমাদের সংবিধান অনুসারে আমাদের শাসনবিধি ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র (Secular democracy)। অতীতের ভুলের আর আমরা পুনরাবৃত্তি ক'রব না। ধর্মকে আর প্রাধান্য দিয়ে ভারতের পতন ডেকে আনব না। ধর্ম যদি রাখতে হয়, তবে থাক সে আরও অনেক জিনিসের মতো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে, যেমন আছে পশ্চিমে।

এই ভারতের নূতন মূল্যবোধ, এর সমর্থনে দুটো কথা না বললে আধুনিক বা প্রগতিশীল হওয়া যায় না। প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইতিহাসে যে-ধর্ম হিন্দুর জাতীয় ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে, বার বার ভারতের পতনকে করেছে অনিবার্য, তাকে নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করা কেন? স্বামীজী সন্ন্যাসী মানুষ, ধর্মের কথা বলবেনই তো। তাঁর জন্মের এই শতবার্ষিক উৎসব-কালে তাঁকে সভাসমিতি ক'রে শ্রদ্ধা জানালেই তাঁর কাছে আমাদের ঋণ-স্বীকার করা হ'ল।

তবুও একটা 'কিন্তু' থেকে যায় আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে, যতই বাইরে আধুনিকতার বড়াই করি না কেন, যতই ধর্মকে এড়াতে যাই না কেন। এটা আমাদের সূক্ষ্ম হিন্দু instinct (অবচেতনে সূক্ষ্ম অনুভূতি), যাকে আজ শত যুক্তি দিয়ে আমরা চেপে দিতে প্রয়াস করছি। আজ আমরা একটি কথাই বুঝতে চেষ্টা করছি যে, 'বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম-কল্যাণের মোহে পড়িয়া আমরা যেন আর ইহলোকের সর্বনাশ না করি!' স্বামীজী আধুনিক ভারতীয় মনের এই অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন। একদা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়' পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে লাভ ক'রে এই instinctকে অস্বীকার করতে গিয়েছিল। বর্তমানে স্বাধীন ভারতে এই প্রবণতা আপাতদৃষ্টিতে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। নূতন ক'রে পশ্চিমের জড়বাদ আবার আমাদের ধর্মভাবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, আজ আমরা আবার খানিকটা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছি। এই দোটানার অবস্থাটা স্বামীজী নিজেই 'বর্তমান ভারতে' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষ' অনুচ্ছেদে অপূর্বভাবে বর্ণনা করেছেন: 'সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী

নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে। আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী, তপোবন-জটাবল্কল, কাষায়-কৌপীন, সমাধি-আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্য সমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি?'

(২)

স্বামীজীর মতকে গ্রহণ বা বর্জন করতে হ'লে আমাদের আগে বোঝা দরকার স্বামীজী হিন্দুর ধর্ম কাকে বলছেন এবং আমাদের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে তার মিল বা অমিল কতখানি। বোঝা দরকার যে-ধর্ম ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তা কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমত কিনা আর যে-ধর্ম হিন্দুর পতন ডেকে এনেছে, তা ধর্ম না ধর্মহীনতা

তারও আগে 'হিন্দু'-শব্দটির তাৎপর্য বুঝতে হবে। স্বামীজী 'হিন্দু' শব্দটির ঐতি-হাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, একাধিক স্থানে তার অবতারণা করেছেন। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে তিনি বলছেন :

"বেদে সিন্ধুনদের 'সিন্ধু' 'ইন্দু' দুই নামই পাওয়া যায়। ইরানীরা (পারস্যবাসী) তাকে 'হিন্দু', গ্রীকরা 'ইণ্ডুস্' ক'রে তুললে। তাই থেকে ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্মের অভ্যুদয়ে 'হিন্দু' দাঁড়ালো—কালা (খারাপ) যেমন এখন 'নেটিভ'।"

জাফনা-বক্তৃতায় (ভারতে বিবেকানন্দ) তিনি একই কথা আরও খুলে বলছেন। যে 'হিন্দু' নামে পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন কিন্তু তাহার আর কোন সার্থকতা নাই। কারণ ঐ শব্দের অর্থ 'যাহারা সিন্ধুনদের পারে বাস করিত।' প্রাচীন পারসীদের বিকৃত উচ্চারণে 'সিন্ধু'-শব্দই 'হিন্দু'রূপে পরিণত হয়। তাহারা সিন্ধুনদের অপর তীরবাসী সকলকেই হিন্দু বলিতেন। এইরূপে 'হিন্দু'-শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে। মুসলমান শাসনকাল হইতে আমরা ঐ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।···বর্তমান কালে সিন্ধুনদের এই দিকে সকলে আর প্রাচীনকালের মতো এক ধর্ম মানেন না। সুতরাং ঐ শব্দে আজ আর খাঁটি হিন্দু বুঝায় না, উহাতে মুসলমান খৃষ্টান জৈন এবং ভারতের অন্যান্য অধিবাসী-গণকেও বুঝাইয়া থাকে।

সুতরাং হিন্দু ধর্মবাচক শব্দ নয়, জাতিবাচক শব্দ, ভারতীয় মাত্রেই আজ হিন্দু, তার ধর্মমত যাই হোক না কেন। হিন্দুধর্ম মানে ভারতীয়ের ধর্ম, কোন বিশেষ ধর্মমত নয়। এবং যাকে আমরা প্রচলিত কথায় হিন্দুধর্ম বলি, তা কোন বিশেষ দেবতা বা দেবতাকুলের পূজায় পর্যবসিত নয়, কোন বিশেষ অবতারের প্রেরণায় বা শিক্ষায় ও প্রচারে তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই একে বলা হয় 'সনাতন ধর্ম'। স্বামীজী কোথাও কোন বিশেষ ধর্মকে হিন্দুধর্ম বলেননি। যদিও স্বভাবতই একদা প্রাচীন ভারতে আর্য ঋষিদের সাধনা, প্রজ্ঞা ও দার্শনিক বিন্যাস দ্বারা মানুষের যে-ধর্ম বিকশিত হয়েছিল এবং আর্য সমাজকে বিধৃত করেছিল, তাই এই ভারতীয় ধর্মের ভিত্তি-স্বরূপ। যুগে যুগে এই উদার অসাম্প্রদায়িক মানবধর্মে গলদ ঢুকেছে, সম্প্রদায় এবং সঙ্কীর্ণতা মাথা তুলেছে; বাইরের আচার-অনুষ্ঠান যখনই ধর্মের কণ্ঠরোধ করেছে, তখনই এসেছেন অবতার বা সংস্কারক মহাপুরুষ। এসেছেন বুদ্ধ, বর্ধমান মহাবীর,

শঙ্করাচার্য, রামানুজ, রামানন্দ, নানক, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ সনাতন ধর্মকে উদ্ধার করতে, যুগোপযোগী পটভূমিকায় ঔদার্যের ও বলিষ্ঠতার উপাদানে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। বহিরাগত বিজয়ী জাতিসমূহকে সম্পূর্ণ ভারতীয় ক'রে তোলবার প্রয়াসে কত নীরব অথচ বলিষ্ঠ কর্মসাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন যুগে যুগে ভারতের নাম জানা ও অজানা কত সাধু ও সন্ত, কত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। সাম্প্রদায়িক ধর্মমত ও অন্ধ গোঁড়ামি দ্বারা সৃষ্ট বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে যখন জাতি হাবুডুবু খেয়েছে, ভুলে গেছে দিতে ও নিতে, তখনই এসেছে ধর্মহীনতা, এসেছে ভারতের পতন। স্বামীজী ভারতের এই ধর্মকেই বলেছেন, 'The great Force, manifesting itself as the desire for Mukti or spiritual independence with the Hindu'. এর কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক প্রগতি গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। যুগে যুগে তাই ভারতাত্মার প্রশ্ন জেগেছে—মুক্তি কোন্ পথে? ভারত-সন্তানের কর্মধারায় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই প্রশ্নই যুগে যুগে উত্তরের আশায় আবর্তিত হয়েছে; এবং স্বামীজীর মতে যুক্তিবাদী আধুনিক যুগও ভারতের এই শাশ্বত আকুলি-বিকুলিকে দূরে ঠেলে রাখেনি, রাখতে পারে না।

গুরুদত্ত সাধনার ধারায় সিদ্ধিলাভ ক'রে বিদগ্ধচিত্ত বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতীয় ধর্মের মর্মবাণী আবিষ্কার করেছেন বেদান্তদর্শনে, যার মূর্তবিগ্রহ দর্শন করেছেন 'যত মত তত পথে'র ঋষি গুরু রামকৃষ্ণের মধ্যে, দিগ্‌দিগন্তে ছুটে বেড়িয়েছেন বেদান্তনির্ঘোষে অভিনব বিশ্বশান্তির সনন্দ প্রচার করতে। বিখ্যাত 'চিকাগো-বক্তৃতা'য় তিনি বললেন:

'যে-ধর্ম জগৎকে পরধর্মের প্রতি ঔদার্য ও সর্ববিধ ধর্মমতকে স্বীকৃতি দান করিতে শিখাইয়াছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা যে (শুধু) অন্য ধর্মাবলম্বীকে সমদৃষ্টিতে দেখি—তাহা নহে, সকল ধর্মমতকে আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।'

'কলম্বো-বক্তৃতা'য় স্বামীজী আরও অনেক কথা বলেছেন হিন্দু বা ভারতীয় ধর্মসম্বন্ধে। একদা প্রাচীন কালে বেবিলনীয়, ইহুদি, গ্রীক ও রোমক প্রভৃতি বহু দেবদেবী-বিশ্বাসী জাতিসমূহের মতো ভারতীয়দেরও বহু প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদেবী ছিল, ওদের মতো ভারতীয় দেবদেবীরাও যুদ্ধের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতা স্থির করতেন।

"কিন্তু ভারতের ও সমগ্র জগতের সৌভাগ্যক্রমে এই অশান্তি-কোলাহলের মধ্য হইতে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—একমাত্র সৎস্বরূপই আছেন, জ্ঞানী ঋষিগণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন—এই মহাবাণী উত্থিত হইয়াছিল।··· নাম বিভিন্ন, কিন্তু বস্তু এক।··· সমগ্র ভারতের বিস্তারিত ইতিহাস ওজস্বী ভাষায় সেই এক মূলতত্ত্বের পুনরুক্তিমাত্র। ···এইরূপে এই ভারতভূমি পরধর্ম-সহিষ্ণুতার এক অপূর্ব লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই শক্তিবলেই আমরা আমাদের এই প্রাচীন মাতৃভূমিতে সকল ধর্মকে, সকল সম্প্রদায়কে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবার অধিকার লাভ করিয়াছি।"

স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকে আরও বহু উদ্ধৃতি দ্বারা ভারতীয় বা হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যায়। কালক্রমে যীশুখৃষ্ট এবং মহম্মদ-প্রচারিত ধর্ম ভারতের এই ধর্মে মহান্ স্বীকৃতি ও সমশ্রদ্ধা লাভ করেছে; অপর দিকে

খৃষ্ট, ইসলাম বা বৌদ্ধ ধর্মে কিন্তু অপর কোন ধর্মমত স্বীকৃতি লাভ করে না।

বিশ্বের এই তিনটি প্রধান ধর্মমত যার যার prophet বা মহাপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা যথাক্রমে যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও বুদ্ধ। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতারূপে কোন একজন বিশেষ মহাপুরুষের নাম করা যায় না। খৃষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ (অবশ্য ভারতের বাইরে) যার যার পরিত্রাতাকে বা পয়গম্বরকে কেন্দ্র করেই ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করে। পর ধর্মমতের স্বীকৃতি স্বভাবতই ওদের কারও নেই। কিন্তু ভারতীয় হিন্দু সকল ধর্মমতকে, সকল মহাপুরুষকেই সমশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারে।

এই হিন্দুধর্মকেই ভারতেতিহাসের নিয়ন্তা ও প্রাণস্পন্দন-রূপে স্বামীজী গ্রহণ করেছেন। ঔদার্য ও বলিষ্ঠতা—এই দুটি স্তম্ভের উপর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার বাঁধনে যে মহাসেতু নির্মিত, সে সেতুপথ বেয়েই চলেছে যুগে যুগে ভারতের ধর্মজীবন ও জাতীয় সমৃদ্ধির শোভাযাত্রা।

(ক্রমশঃ)

সংযোজনী টীকা ঃ চৈত্র (১৩৬৯) মাসের উদ্বোধনে বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা 'প্রথম পর্ব' প্রবন্ধে একটি ভুল তারিখ আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩০৯ সালে, ইংরেজী ১৯০৯ খৃঃ নয়। এবং আর একটি অবিস্মরণীয় প্রবন্ধ "ভারতবর্ষে ('ভারতবর্ষের' নয়) ইতিহাসের ধারা" 'প্রবাসী'-পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালে। তথ্যের ঐতিহাসিকত্বে, তত্ত্বের গভীরতায় এবং দৃষ্টির স্বচ্ছতায় এ-দু'টি প্রবন্ধ স্বামীজীর 'Historical Evolution of India' প্রবন্ধটির সমপর্যায়ভুক্ত। তারিখের হিসাবে স্বামীজীর রচনাটি অপেক্ষাকৃত পুরাতন। এ ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের উক্ত রচনায়। অবশ্য তারও পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ভারতেতিহাসের কয়েকটি ঘটনা প্রধানতঃ গল্পাকারে 'ভারতী' ও 'বালক'-পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-বিষয়ক রচনাসমূহ ইতিহাস-নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়েছে 'বিশ্বভারতী' কর্তৃক। স্বামীজীর ঐ-জাতীয় বাণী ও রচনাগুলি সংগৃহীত হয়ে অগৌণে 'উদ্বোধন' কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে—এ আশা পোষণ করছি।

ইতি লেখক

সমালোচনা

বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য ॥ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ॥ করুণা প্রকাশনী পৃষ্ঠা ১৮৩; মূল্য পাঁচ টাকা।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উৎসবে আবার নতুন ক'রে তাঁর ধ্যানমূর্তি, কর্মমূর্তি ও পুরুষকারের পরিচয় পেয়ে বিশ্ববাসী আজ সংশয়ব্যাকুল অনীহবাদের পটভূমিকায় মানুষের ইহ ও অমুত্রের যথাযথ সম্পর্ক বুঝতে অগ্রসর হয়েছে। আল্ডুস হাকস্‌লি যাকে 'Perennial Philosophy' বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ সেই নিত্যসত্য বস্তুকে পার্থিব চেতনার সঙ্গে এমনভাবে সমন্বিত করেছেন যে, বিশ্বমানবতার ইতিহাসে তার গূঢ় তাৎপর্য আগামীকালের পথিকদের চিত্তে শান্তি, সান্ত্বনা, কর্মোদ্যম ও চিত্তযোগের অপূর্ব রসায়ন হয়ে বিরাজ করবে। তাঁর জীবন ও সাধনার বিষয়ে প্রায় সর্বত্রই নানা আলোচনা চলেছে, দেশে-বিদেশে বহু গ্রন্থও রচিত হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ সম্প্রতি স্বামীজীর জীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় সম্পর্কে গবেষক-সুলভ তথ্য সরবরাহ ক'রে এবং সেই তথ্যকে সাহিত্যের রসে পরিস্নাত ক'রে বক্ষ্যমাণ 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থে স্বামীজীর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ নির্ণয় করেছেন। এই গ্রন্থে মোট এগারটি অধ্যায়ে বিবেকানন্দের সাহিত্য-প্রতিভা সবিস্তারে আলোচিত হওয়ার ফলে বাংলা গদ্যে স্বামীজীর কৃতিত্ব নির্ণয়ের বিশেষ সুযোগ ঘটেছে। লেখক স্বামীজীর গদ্যরচনার তথ্য- ও তত্ত্বগত বিচার-বিশ্লেষণের পরে তাঁর ভাষারীতির বিচিত্র ঐশ্বর্য সম্বন্ধে মৌলিক আলোচনার অবতারণা করেছেন। চলতি রীতিকে বিবেকানন্দ যে প্রাণাবেগ দান করেছিলেন, সাধুভাষাকেও যে চিন্তাঋদ্ধ ক্লাসিক রূপ দিয়েছিলেন, তার শিল্পরূপ ও বাক্‌রীতির প্রয়োগ ও নানা কৌশলগুলি অধ্যাপক ঘোষ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। সর্বোপরি বিবেকানন্দ যে 'কবির্মনীষী', শিল্পী, রসস্রষ্টা—সেই কবিত্বশক্তির আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখক স্বামীজীর কবিতার গভীর রস ও রহস্য ব্যাখ্যা ক'রে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের নব মূল্য-বিনির্ণয়ে সাহিত্য-রসিকের পক্ষ থেকে স্বামীজীর স্মৃতির প্রতি কর্তব্য পালন করেছেন সুষ্ঠুভাবে। বিবেকানন্দের মধ্যে যে একটি রসশিল্পীর সৌন্দর্যচেতনা অন্তর্নিহিত ছিল, অধ্যাপক ঘোষ সেই জনবিরল প্রদেশে পাঠকের প্রবেশাধিকার সহজতর করেছেন, এর জন্য তিনি সংস্কৃতিকামী বঙ্গবাসীর কাছ থেকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করবেন। তাঁর দূরপ্রসারী চিন্তা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য—সর্বোপরি বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নৈষ্ঠিক সম্পর্কের দ্বারা বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দ-স্মারকগ্রন্থগুলির মধ্যে তাঁর এই গ্রন্থটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ও গবেষকগণ এতদিন কেন যে স্বামীজীর সাহিত্য-প্রতিভার যথার্থ বিচারবিশ্লেষণ করেননি, তার কারণ অজ্ঞাত। যাই হোক অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অভাব দূর করলেন, তা সানন্দে স্বীকৃতির যোগ্য। বাঙালীর মনের মাটি অনুর্বরতার অভিশাপে ধূসর না হয়ে গেলে এ আলোচনা সেখানে সোনার ফসল ফলাবে, এই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস।

—শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভগবৎপ্রসঙ্গ ঃ দ্বিতীয় পর্যায়—ডক্টর হরিশ্চন্দ্র সিংহ প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির-প্রকাশকমণ্ডলী, ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা ২৫ হইতে প্রকাশিত। ডিমাই অক্টেভো, ১২৮ মূল্য ২৲।

পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বচরাচরে সব কিছুর ভিতরে সেই একই ঈশ্বরের সত্তা প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত—এই মহাসত্যটি যুক্তিতর্কের বিষয় নয়, উপলব্ধির বস্তু। জীবনে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে চিরশান্তি ও আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু ইহা সাধন-সাপেক্ষ। আলোচ্য গ্রন্থখানি এই সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। ইহার মধ্যে কয়েকটি প্রসঙ্গ ও প্রবন্ধ 'উদ্বোধনের' পাঠকবর্গ আগেই দেখিয়াছেন। পূর্বে অপ্রকাশিত অন্যগুলিতেও গ্রন্থকার সাধকের মনে সাধারণতঃ যে-সকল সংশয় উদিত হয়, তাহা নিরসন করার উপায় সরল ভাষায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 'তিতিক্ষা', 'মন স্থির করার উপায়', 'সতত যুক্ত থাকা' এবং 'প্রার্থনা' শীর্ষক প্রসঙ্গগুলিতে অধ্যাত্ম-সাধনার নানা অভিনব ইঙ্গিত বিদ্যমান। 'মায়ের প্রত্যাদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধটি সিস্টার নিবেদিতা প্রণীত 'Kali the Mother' নামক গ্রন্থখানির একটি অধ্যায়ের অনুবাদ।

কল্যাণ (হিন্দী) **ঃ** ৩৭তম বর্ষের ১ম সংখ্যা সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণাঙ্ক। সম্পাদক—শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০০ ; মূল্য টাকা ৭.৫০।

হিন্দী ভাষায় সনাতন ধর্মপ্রচারে 'কল্যাণ' পত্রিকার স্থান অতি উচ্চে। কল্যাণের পরিচালকমণ্ডলী প্রতি বৎসর একখানি করিয়া বিশেষ অঙ্ক প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইতিপূর্বে বিষ্ণুপুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ, শিবপুরাণ প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

এই বর্ষে সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয় গ্রন্থ এবং ভক্তমাত্রেরই আদরণীয়। এই পুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোলোক-লীলা ও অবতার-বিষয়ে বিশদ বর্ণনা আছে।

আলোচ্য বিশেষ অঙ্কটিতে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের বিষয় সংক্ষেপে উৎকৃষ্ট হিন্দী ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১২০ খানি রেখাচিত্র এবং বহু রঙের ১৭টি চিত্র এই গ্রন্থের অলঙ্কার। পূর্ব-পূর্ব বর্ষের ন্যায় এই বিশেষ অঙ্কটিও সুন্দর এবং বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ; ইহা গ্রন্থাগারের একটি অলঙ্কার-বিশেষ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মূল ও পদ্যানুবাদ) **ঃ** অনুবাদক শ্রীকস্তুরচাঁদ লালওয়ানী; প্রকাশক : 'প্রজ্ঞানম্', ১২ ডাফ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ২৮৮ ; মূল্য টাকা ১.২৫।

পকেট সাইজ এই গীতাখানি বহুল-প্রচারিত হইবে বলিয়া মনে হয়। প্রতিটি মূল শ্লোকের নিচে মূলানুগ সরল পদ্যানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। প্রচ্ছদপটে পার্থসারথির সুন্দর চিত্র বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছে এবং পুস্তকের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।

সন্তবাণী (পকেট সংস্করণ) **ঃ** ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। ৺কাশীধাম সন্ত আশ্রম হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৯২ ; মূল্য ৫০ ন.প.।

আলোচ্য গ্রন্থে গুরুতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়জয়, প্রার্থনার উপকারিতা, শ্রেষ্ঠ সাধন, আত্ম-সমর্পণ প্রভৃতি বিষয়ে সন্তদাস বাবাজীর বাণী সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকটি অধ্যাত্ম-পিপাসু-গণের আদরণীয় হইবে।

আঁটপুরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তদীয় সাঙ্গোপাঙ্গগণ প্রকাশক—হরেরাম ঘোষ, গ্রাম ও পো: আঁটপুর, জেলা হুগলি। পৃষ্ঠা ১৭ ; বিনামূল্যে বিতরিত।

আঁটপুর পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রাম—শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দের জন্মস্থান। এই গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ গিয়াছিলেন। স্বামীজী (নরেন্দ্রনাথ) ও তাঁহার ৮ জন গুরুভ্রাতা এই গ্রামে ধুনি জ্বালাইয়া গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্থানীয় শিবমন্দিরে শিবরাত্রিতে শিবপূজা করাইয়াছিলেন এবং বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণের নিকট আঁটপুর তীর্থক্ষেত্র।

আলোচ্য পুস্তিকায় আঁটপুর গ্রামের নক্সা, দ্রষ্টব্য স্থান, শ্রীরামকৃষ্ণের আঁটপুর পরিদর্শনের কথা, আঁটপুরে শ্রীশ্রীমায়ের আগমন, শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণের ধুনি-জ্বালানো, আঁটপুরের আকর্ষণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তিকাটিতে ভক্তগণের জ্ঞাতব্য অনেক কিছু আছে।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে নূতন প্রকাশন

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি :

জাগোরে ধীরে (ছায়ানাট্যে স্বামীজী ও নবযুগ): শ্রীতামসরঞ্জন রায়। পৃষ্ঠা ২৯ ; মূল্য ১৲। কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত।

স্বামীজীর বাণী (পকেট সংস্করণ): ৫৯ ; মূল্য ৪০ ন, প.। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল হইতে প্রকাশিত।

ভারত-আত্মা বিবেকানন্দ (স্বামীজীর শতবাণীসহ শতবার্ষিকী প্রচার-পুস্তক) শ্রীনির্মলকুমার রায় কর্তৃক সঙ্কলিত। পৃষ্ঠা ৮৫ ; সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, ৭৬বি, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৫০ হইতে প্রকাশিত।

পত্রিকা

মহাজীবন : পৃষ্ঠা ৬৭ স্বামীজী সঙ্ঘ বিবেকানন্দ জন্ম-শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব উপলক্ষে ৪, রেলওয়ে প্লট, পাতিপুকুর, কলিকাতা ২৮ হইতে প্রকাশিত।

শ্রদ্ধাঞ্জলি : পৃষ্ঠা ৬৪। স্বামী বিবেকানন্দের শততম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিবেকানন্দ সেন্টিনারি সেলিব্রেশন কমিটি, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত।

স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ-জয়ন্তী : ৫৫। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাটানগর হইতে প্রকাশিত।

বিবেকানন্দ - জন্ম - শতবার্ষিকী স্মরণিকা : পৃষ্ঠা ৩০। প্রকাশক : বিবেকানন্দ অ্যাম্বুলেন্স ডিভিসন, সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড (ইণ্ডিয়া), ৪৬।১, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

স্মরণিকা : পৃষ্ঠা ৬৩। সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, ৭৬ বি, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৫০ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

রাঁচি ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে গত ২৫শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৮তম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে বিশেষ পূজা, হোম, গীতা চণ্ডী উপনিষৎ-পাঠ ও ভজনের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের ঘটনা অবলম্বনে লীলাকীর্তন হয়। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করেন। সভান্তে ভজন হয়। সহস্রাধিক নরনারী উৎসবে যোগদান করেন।

ফরিদপুর ঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৫শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, হোম; চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসুধীররঞ্জন চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-দর্শন আলোচনা করেন।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী

বোম্বাই ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৭ই জানুআরি হইতে চারদিন-ব্যাপী স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভা উৎসবের অঙ্গ ছিল। ১৯শে জানুআরি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত উদ্বোধন-ভাষণে বলেন, স্বামীজী দিয়াছেন আধ্যাত্মিক শক্তি, সত্য ও প্রেমের মন্ত্র। মৃতপ্রায় ভারতকে তিনি জাগাইয়াছেন, তাঁহার আবির্ভাবে ধর্ম ও সংস্কৃতি পুনর্জীবিত হইয়াছে, সমগ্র জগৎ ভারতের আত্মা ও হিন্দুধর্মকে বুঝিতে পারিয়াছে। মহীশূরের রাজ্যপাল প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, স্বামীজী ভারতবাসীকে মন্দ ও অসত্য ত্যাগ করিয়া সত্য ও ন্যায়ের পথে চলিতে বলিয়াছেন। স্বামীজী বিশ্বাস করিতেন, একমাত্র শক্তির দ্বারাই জীবনে সাফল্য লাভ করা যায়। তিনি দেশবাসীকে আত্মশক্তিতে শক্তিমান্ হইতে বলিয়াছেন।

২০শে জানুআরি আশ্রমে এবং শিবাজী পার্কে সভার আয়োজন করা হয়। শ্রীকে. এম. মুন্সী এবং শ্রীগোলওয়েলকর সভাপতিত্ব করেন। সভা-দুইটিতে বিপুল লোকসমাগম হয়। সমবেত জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্বামীজীর সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণ করেন।

রেঙ্গুন ঃ রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটিতে গত ১৭ই হইতে ২৫শে জানুআরি স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই জানুআরি প্রাতঃকালে ৫,০০০ লোকের একটি বিরাট শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের যোগদানে শোভাযাত্রাটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বেদপাঠ, 'ধম্মপদ' হইতে পাঠ, পূজা, হোম, স্বামীজীর জীবনী-পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ। পূজায় প্রায় ৫০০ লোক যোগদান করেন। সোসাইটি-হলে আয়োজিত ধর্মসভায় ২০০ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উপস্থিতি গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের বাণী পঠিত হয়। বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজনের পর স্বামী আত্মস্থানন্দ বক্তৃতা দেন।

১৮ই জানুআরি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। অন্যান্য দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে ১৯শে স্বামীজীর 'কর্মযোগ' সম্বন্ধে আলোচনা, ২০শে প্রায় ৪,০০০ লোককে প্রসাদ-বিতরণ, ২২শে ইংরেজী ও বর্মী ভাষায় স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা এবং ২৫শে সঙ্গীতানুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

কাটিহার: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৩শে হইতে ৩১শে মার্চ স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। প্রাতঃকালে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, উপনিষৎপাঠ, প্রভাতফেরি এবং সন্ধ্যায় ধর্মসভা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ কর্তৃক নাট্যানুষ্ঠান এবং রামায়ণ-গান অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ স্বামী পরশিবানন্দ, ডক্টর মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। স্বামী প্রবণাত্মানন্দ আলোকচিত্র সহযোগে স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। চিত্রের মাধ্যমে স্বামীজীর জীবনালেখ্য-প্রদর্শনী বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। স্থানীয় শিক্ষাব্রতীদের লইয়া শিক্ষাবিষয়ে স্বামীজীর নির্দেশ-সম্বন্ধে সময়োপযোগী আলোচনা হয়।

স্থানীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আবৃত্তি, রচনা, সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন-প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। শেষদিনে নারায়ণ-সেবায় আনুমানিক ৪,০০০ ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

টাকী: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৭ই জানুআরি স্বামীজীর জন্মতিথি-দিবসে এক বিরাট প্রভাতফেরি নগর পরিক্রমা করে। অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচিত হয়।

১২ই হইতে ১৭ই মার্চ স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব ও শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভোগরাগ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, রঙ্গনাথানন্দ, বিশ্বাশ্রয়ানন্দ প্রভৃতি সময়োপযোগী মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন বসিরহাট মহাকুমাশাসক শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা-মন্দির কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। উৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী যোগদান করেন।

কার্যবিবরণী

(১) কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম: এই প্রতিষ্ঠানের (জানুআরি'৬১—মার্চ'৬২) বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে ৯৩ জন বিদ্যার্থীর মধ্যে ৬২ জন ফ্রি, ১৬ জন আংশিক খরচ দিয়া ছাত্রাবাসে ছিল।

সাহায্য: কলিকাতা ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন ৪২ জন দরিদ্র ছাত্রকে পরীক্ষা-ফি বাবদ সাহায্য করা হয়।

গ্রন্থাগার: আশ্রম-লাইব্রেরি ২,৮১৭ সুনির্বাচিত পুস্তকের মধ্যে ছাত্রেরা ৮৩৮টি পড়িবার জন্য লইয়াছিল এবং পাঠ্য পুস্তক হিসাবে তাহাদিগকে ১,৪৬০ খানি গ্রন্থ পড়িতে দেওয়া হয়। ৬টি দৈনিক ও ১৮টি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত রাখা হইয়াছে। মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক-বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়।

ভ্রমণ ও সম্মিলন: বিদ্যার্থীদের মধ্যে ১৮ জন এই বৎসর দার্জিলিং ভ্রমণের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। নববর্ষ ও বিজয়া-সম্মিলনে আশ্রমের বহু প্রাক্তন ছাত্র যোগদান করে।

(২) শিল্পপীঠ: ১৯৫৮ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত এই লাইসেন্‌সিয়েট ইঞ্জিনিয়রিং বিদ্যালয়ের

ছাত্রসংখ্যা ৫৪০, তন্মধ্যে সিভিল ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগে ৩৬০, মেকানিক্যাল ও ইলেকৃট্রিক্যাল উভয় বিভাগেই ৯০ করিয়া।

শিল্পপীঠ-লাইব্রেরিতে ১,৫৩৭ পুস্তক রাখা হইয়াছে; ৫টি দৈনিক ও ১১টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

কোয়েম্বাতুর: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১৯৬১-৬২ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত ইহার কর্মধারা:

বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়: বিজ্ঞান, কৃষি ও শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ে ১৭৬ জন ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ৩৪টি বিনা বেতনে ও ৬৪টি আংশিক বেতনে পড়িবার সুযোগ লাভ করে।

সিনিয়র বেসিক স্কুল: 'কলা-নিলয়ম্' নামে পরিচিত—এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৬০১ (ছাত্রী ২৩৪)।

বেসিক ট্রেনিং স্কুল: প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী — প্রত্যেকটিতে ছাত্রসংখ্যা ৩৯।

বি. টি. কলেজ: ৫৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৬ জন উত্তীর্ণ হয়। অগস্ট মাসের প্রথম দিকে ১০ দিন শিবির পরিচালনা করা হইয়াছিল। পার্শ্ববর্তী উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে ৫ সপ্তাহ যাবৎ শিক্ষাদান-অভ্যাসের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৬১ জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর এম. এড ডিগ্রী কোর্স (M. Ed. Degree Course) বিভাগ উদ্বোধন করেন।

সমাজসেবা (S. E. O. T. C.) ও শারীর শিক্ষা কলেজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

গ্রামীণ শিক্ষা: ইঞ্জিনিয়রিং স্কুল, কৃষি-বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়—এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে গ্রামের ছেলেরা উচ্চশিক্ষা-লাভের সুযোগ পাইতেছে। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ২১৪।

গবেষণা: এই বিভাগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা নির্ণয় এবং শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা করা হইয়াছে।

শিক্ষাবিস্তার-প্রচেষ্টা: সভাসমিতি, পাঠচক্র, গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রদর্শনী, পত্রিকা-প্রকাশন দ্বারা কোয়েম্বাতুর, সালেম ও নীলগিরি জেলায় শিক্ষাবিস্তার করা হয়।

গ্রন্থাগার: বিভিন্ন বিষয়ে ২৪,০০০ বই রাখা হইয়াছে। ১৭,১২৯ বই ছাত্রদিগকে পড়িতে দেওয়া হয়।

গ্রামে চিকিৎসা: এক্স্-রে-সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসালয় আছে। আলোচ্য বর্ষে ১২,৯১৯ রোগী চিকিৎসিত হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র। কেন্দ্রাধ্যক্ষ: স্বামী নিখিলানন্দ; সহকারী: স্বামী বুধানন্দ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ধ্যান এবং গীতা ও উপনিষদের ক্লাস যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

সেপ্টেম্বর, ৬২: ধ্যান-তীর্থে যাত্রা; ধর্মবোধ কি করিয়া হয়? আত্মসংযমের তিনটি প্রণালী; মনের রহস্যপূর্ণ স্বভাব।

অক্টোবর: ঈশ্বরই আমাদের চিরকালের মা; জীবনের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী; জ্ঞানীর আনন্দ; মানুষ: বাস্তব ও প্রতীয়মান।

নভেম্বর: ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিমান্ হও; যোগ: ইহার বিপদ ও লাভ; মনঃসংযোগ ও ধ্যান; বাহিরের কর্ম ও মনের শান্তি।

ডিসেম্বর: ঈশ্বর, আত্মা এবং বিশ্ব; বিশ্বাসের শক্তি; খৃষ্ট ও বেদান্ত; শ্রীশ্রীমা ও তাঁহার উপদেশ; খৃষ্ট ও বর্তমান জগৎ; আধ্যাত্মিক উন্নতি।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

কুমিল্লা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৫শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, ষোড়শোপচারে পূজা, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় প্রবন্ধপাঠ, ভজন, বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা হয়।

বোরাগাড়ি (জলপাইগুড়ি) ঃ গত ২৫শে ফেব্রুআরি স্থানীয় বিবেকানন্দ পাঠাগারের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দ সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। পূজা, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'-পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করেন।

আগড়তলা (ত্রিপুরা) : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৫শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলারতি, ভজন, পূজা, হোম, ভোগরাগ, চণ্ডীপাঠ হয় এবং ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়।

২৬শে ফেব্রুআরি নেফায় নিহত জোয়ানদের পরিবারবর্গের (আগড়তলায় আগত) মধ্যে বস্ত্রাদি বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন অবলম্বনে বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন। ২৭শে ফেব্রুআরি 'যুব-জীবন-গঠনে স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে স্কুল-কলেজের বিদ্যার্থীদের মধ্যে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণ ও স্বামীজী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। রাত্রে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

শতবার্ষিকী সংবাদ

কলিকাতা ঃ গত ৬ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের উদ্যোগে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ, অনুষ্ঠিত সভার উদ্বোধন করিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন : স্বামীজী ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার উপর বিশেষ জোর দিতে বলিয়াছেন, ইহা জীবনের উন্নতির মূলে ; ছাত্রদের ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। স্বামীজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিকতা সমগ্র জগদ্‌বাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিল, অগণিত মানবের তিনি পূজা পাইতেছেন। স্বামীজীর অগ্নিময়ী বাণী শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। স্বামীজী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, ভারত একদিন জগতে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, স্বাধীন ভারতে তাহা সত্য হইয়াছে। বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া ছাত্রগণকে স্বামীজীর ভাবধারার অনুশীলনে সচেষ্ট হইতে হইবে।

বক্তাদের মধ্যে ছিলেন আইন কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি), বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীবিধু-ভূষণ মালিক (প্রধান অতিথি), বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ।

বেলাড়ী (হাওড়া) : স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৭ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে উষাকীর্তন, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম-সভায় স্বামী সুশান্তানন্দ (সভাপতি), শ্রীদুর্গাপদ তরফদার প্রভৃতি স্বামীজী-সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

বাটানগর: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৩ই হইতে ১৭ই মার্চ স্বামীজীর শতবার্ষিকী উৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে আনন্দ সহকারে উদ্‌যাপিত হয়। প্রভাতফেরি, পূজা-পাঠ, ধর্মসভা, চলচ্চিত্র-প্রদর্শন, নাট্যাভিনয়, ব্যায়াম, ভজন, গীতি-আলেখ্য, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

ময়নাপুর (বাঁকুড়া): গত ১৭ই মার্চ স্থানীয় বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান কমিটির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'-রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের জন্মস্থানে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামযজ্ঞ, পূজা, হোম, বক্তৃতা, আবৃত্তি, গান, গৈরিকপতাকা উত্তোলন, রামায়ণ-গান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী গদাধরানন্দ এই উৎসবে প্রধান অতিথি-রূপে যোগদান করেন। বিবেকানন্দ স্মৃতি-পাঠাগারের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা হয়।

হাসিমারা (জলপাইগুড়ি): শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন-মঠের প্রচার-বিভাগের উদ্যোগে ডুয়ার্সের চা-বাগান অঞ্চলে এবং ভুটান-সীমান্ত-সংলগ্ন হাসিমারায় গত ৩০শে মার্চ হইতে ১লা এপ্রিল দিবসত্রয় মহাসমারোহে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপনপূর্বক ব্যাণ্ড-বাদ্য ও সমবেত সঙ্গীতসহ শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমা করে। বিশেষ পূজা, হোম, নরনারায়ণ-সেবা, 'রেখা ও লেখায় স্বামীজী' প্রদর্শনী, ধর্ম-সভা, আবৃত্তি ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, সঙ্গীতা-লেখ্য, সৎপ্রসঙ্গ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, 'যুগান্তর'-পত্রিকার 'স্বপনবুড়ো' ও স্বামী জীবানন্দ এই উৎসবে যোগদান করেন। এই অঞ্চলে এই ধরনের অনুষ্ঠান ইহাই প্রথম।

পাতিপুকুর (কলিকাতা ২৮): স্বামীজী সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৬ই হইতে ৯ই এপ্রিল স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব বিশেষ আনন্দ সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের ধর্ম-সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ এবং প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দেন শ্রীশৈল কুমার মুখোপাধ্যায়। সঙ্ঘ-প্রাঙ্গণে স্বামীজীর একটি আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ কর্তৃক স্বামীজীর জীবন-সম্পর্কিত প্রদর্শনী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। বিভিন্ন দিনে বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল ভজন, ছায়াচিত্র-প্রদর্শন ও নাটকাভিনয়।

বেহালা (কলিকাতা): পর্ণশ্রী রামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১৪ই হইতে ১৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও স্বামীজীর শত-বার্ষিক উৎসব পূজাপাঠ, ভজন, শোভাযাত্রা, প্রসাদ-বিতরণ, চলচ্চিত্র-প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে আনন্দ সহকারে উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন।

একদিনের সভায় কঠোপনিষদের 'যম-নচিকেতা'-সংবাদ সংস্কৃতে ও বাংলায় আলোচনা বিশেষ উপভোগ্য হয়।

বক্তৃতা-সফর

স্বামী ঈশানানন্দ গত ফেব্রুআরি মাসে বর্ধমান, আসানসোল, বার্নপুর, মাইথন, সিন্ধ্রি ও ধানবাদে মোট ১৩টি স্থানে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা আলোচনা করেন। সর্বত্রই শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

নানা স্থানে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি :

পল্লীকল্যাণ গান্ধী আশ্রম, কাঞ্চনতলা, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ; শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত; বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ, ব্রাহ্মণপাড়া, মুন্সিরহাট, হাওড়া; শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, প্রীতিনগর, নদীয়া; কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, হেঁড়্যা, মেদিনীপুর; শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, গোলাঘাট, বারাকপুর; জনতা কলেজ, কালিম্পং, দার্জিলিং; মেদিনীপুর কলেজ; খিদিরপুর সুরবিতান; জোড়াবাগান বিবেকানন্দ শত-বার্ষিকী কমিটি, কলিকাতা; গড়িয়া বিবেক ভারতী; বরিষা বিবেকানন্দ কমিটি; হোমিও-প্যাথিক কলেজ, কলিকাতা; খাগড়া, মুর্শিদাবাদ; কুমারটুলি ইনস্টিট্যুট, কলিকাতা; বিবেকানন্দ অ্যাম্বুলেন্স ডিভিসন, কলিকাতা ৬; শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, টালিগঞ্জ; রেলওয়ে স্টোর্স, খড়্গপুর; কল্যাণসংসদ, উদয়পুর, বেলঘরিয়া; কিশোর কল্যাণ পরিষদ, কলিকাতা; বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ জয়ন্তী কমিটি, শেঠপুকুর, বারাসত; রামপুরহাট, বীরভূম; পল্লীশ্রী, যাদবপুর, কলিকাতা ৪০; জাগ্রত বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, কলিকাতা ৬; বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উৎসব কমিটি, চিত্তরঞ্জন; বিবেকানন্দ-সেন্টিনারি কমিটি, লিলুয়া; রামকৃষ্ণ আশ্রম, গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ; বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী, গড়ফাহাট, কলিকাতা ৩২; বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী কমিটি, গান-শেল ফ্যাক্টরি, কাশীপুর; বড়গাছিয়া, হাওড়া; সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা; নন্দলাল ইনস্টিটিউসন, চাতরা, শ্রীরামপুর।

ধর্ম-অনুসারে জনসংখ্যার হিসাব

গত দশকে আনুপাতিক হারে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। গত দশ বৎসরে ভারতে হিন্দুর সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহা মুসলমান, খৃষ্টান ও শিখ—এই তিন প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বৃদ্ধির অনুপাতে কম।

জন-গণনার হিসাব হইতে জানা যায়, ১৯৫১ খৃঃ এদেশে প্রতি হাজারে হিন্দু ছিল ৮৫০; '৬১ খৃঃ হইয়াছে ৮৪০। মুসলমানের সংখ্যা প্রতি হাজারে ৯৯ হইতে বাড়িয়া ১০২, খৃষ্টানের সংখ্যা ২৩ হইতে ২৪ এবং শিখের সংখ্যা ১৭ হইতে ১৮ হইয়াছে। জৈনদের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারের (প্রতি হাজারে ৫) পরিবর্তন হয় নাই। বৌদ্ধদের আনুপাতিক হার '৫১ খৃঃ প্রতি হাজারে ১ হইতে বাড়িয়া '৬১ খৃঃ ৮ হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রে হিন্দুর আনুপাতিক হার সর্বাপেক্ষা কমিয়াছে :

রাজ্য	১৯৫১ হাজার-করা	'৬১
মহারাষ্ট্র	৮৯৫	৮২.২
কেরল	৬১৬	৬০৯
উত্তরপ্রদেশ	৮৫০	৮৪৭

নাগাভূমি, পঞ্জাব ও গুজরাত—এই তিন রাজ্যে হিন্দুর আনুপাতিক হার বাড়িয়াছে :

নাগাভূমি	৪১	৯৪
	৬২৩	৬৩৭
গুজরাত	৮৮১	৮৯০

১৯৬১ খৃঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যা :

হিন্দু	৩৬,৬১,৬২,৬৯৩
মুসলমান	৪,৬৯,১১,৭৩১
খৃষ্টান	১,০৪,৯৮,০৭৭
শিখ	৭৮,৪৬,০৭৪
বৌদ্ধ	৩২,৫২,৮০৪
জৈন	২০,২৭,২৪৬

ভ্রম-সংশোধন

গত চৈত্র সংখ্যার ১২৫ পৃষ্ঠায় ১ম পংক্তিতে ২৭শে স্থলে ২৮শে পড়িবেন।



শ্রীদক্ষিণামূর্তি-স্তোত্র

[আচার্য শঙ্কর-কৃত সংস্কৃত-স্তোত্রের পদ্যানুবাদ]

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

দর্পণের প্রতিচ্ছবি নগরীর প্রায়, আপন ভিতর হ'তে বিশ্ব সমুদায়,
মায়াবলে মানসের সৃষ্টি হেরে বাহিরে উদ্ভূত—যেমন নিদ্রায়,
প্রবুদ্ধ হইলে দ্বৈতহীন নিজ আত্মা সাক্ষী হয় যাঁহার অন্তরে,
নমি এই শ্রীগুরুমূর্তিতে বিরাজিত শ্রীদক্ষিণামূর্তি মহেশ্বরে। ১

বীজের ভিতরে যথা অঙ্কুর আদিতে এ-জগৎ ছিল নির্বিশেষ,
পরে মায়া-সৃষ্ট দেশকালবশে আঁকি তাহা বৈচিত্র্যে অশেষ,
মায়াবীর মতো মহাযোগি-সম যিনি বিস্তারেন নিজ ইচ্ছা ভরে,
নমি এই শ্রীগুরুমূর্তিতে বিরাজিত শ্রীদক্ষিণামূর্তি মহেশ্বরে। ২

একমাত্র সৎ স্বরূপ যাঁর, অলীক কল্পনা হেন প্রতিভাস হয়,
'তত্ত্বমসি' শ্রুতিবাক্যে নিজাশ্রিতগণে করান যে সাক্ষাৎ প্রত্যয়,
উহার প্রত্যক্ষ হ'লে ফিরিতে না হয় পুনরায় সংসার-সাগরে,
নমি এই শ্রীগুরুমূর্তিতে বিরাজিত শ্রীদক্ষিণামূর্তি মহেশ্বরে। ৩

বহুছিদ্র ঘটমাঝে অবস্থিত মহাদীপ-প্রায়, উজ্জ্বল প্রভায়
জ্ঞান যাঁর চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয়ের মুখে স্পন্দনেতে সদা বাহিরায়,
'জানিতেছি' এই বোধ তাঁহারি, তাঁহাতে প্রকাশিত বিশ্বচরাচর,
নমি এই শ্রীগুরুমূর্তিতে বিরাজিত শ্রীদক্ষিণামূর্তি মহেশ্বর। ৪

দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-নিচয় অথবা চঞ্চল বুদ্ধি যেবা শূন্য জানে—
স্ত্রীলোক-বালক যাহে অন্ধজড়প্রায় 'আমি আমি' বলে ভ্রমজ্ঞানে,
মায়াশক্তি-বিলাসে কল্পিত এই মহামোহ কৃপা যাঁর জীবের সংহরে,
নমি এই শ্রীগুরুমূর্তিতে বিরাজিত শ্রীদক্ষিণামূর্তি মহেশ্বরে। ৫

রাহুর কবলে রবি কিংবা শশিপ্রায় মায়ামেঘে যিনি আবরিত,
ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহারে সুষুপ্ত পুরুষ সত্তামাত্রে হন অবস্থিত,
জাগরিত হ'লে পুনঃ 'নিদ্রাগত ছিনু' বলি স্মৃতি যাঁর স্ফুরে,
নমি এই শ্রীগুরুমূর্তিতে বিরাজিত শ্রীদক্ষিণামূর্তি মহেশ্বরে। ৬

বাল্য আদি দশা আর স্বপ্ন জাগরণ—অবস্থার নানা আবর্তনে,
নিরন্তর অনুস্যূত রহি স্ফূর্ত হয়—'আমি'-বোধ মানবের মনে,
সেই নিজ আত্মা যিনি সেবক সকলে প্রকাশেন জ্ঞানমুদ্রা-করে,
নমি এই শ্রীগুরুমূর্তিতে বিরাজিত শ্রীদক্ষিণামূর্তি মহেশ্বরে। ৭

নিখিল যে হেরে কার্যকারণ-শৃঙ্খলে, স্বত্ব-স্বামী ভেদের মাঝারে,
শিষ্য ও আচার্যরূপে, আর পিতাপুত্র-আদি সম্বন্ধ আকারে,
এহেন পুরুষ যেবা স্বপ্ন-জাগরণে বদ্ধপ্রায় ভ্রমে মায়াঘোরে,
নমি এই শ্রীগুরুমূর্তিতে বিরাজিত শ্রীদক্ষিণামূর্তি মহেশ্বরে। ৮

ক্ষিতি-জল-অগ্নি-বায়ু-ব্যোম-দিবাকর-নিশাকর-যজমান আর—
এই অষ্টমূর্তির আকার চরাচরে প্রকাশিত স্বরূপ যাঁহার,
চিন্তারত চিত্তে বিভু পরাৎপর—যাঁহা ছাড়া আর কিছু নাহিক অপর.
নমি এই শ্রীগুরুমূর্তিতে বিরাজিত শ্রীদক্ষিণামূর্তি মহেশ্বর। ৯

এই স্তবে পরিস্ফুট যেহেতু আত্মার সর্বময় স্বরূপ নিয়ত,
ইহার শ্রবণে অর্থমননে আর ধ্যানে সংকীর্তনে কিংবা অবিরত,
সর্বাত্মক ঈশ্বরত্ব পরমবিভূতি সহ অন্তরেতে স্বতঃ উপজয়,
অষ্টবিধ ঐশ্বর্য তেমনি অব্যাহত পরিণামে সদা সিদ্ধ হয়। ১০

বটতরুমূলে ভূমিতলে বিতরেন অদূরে আসীন যিনি জ্ঞান মুনিগণে,
ত্রিভুবন গুরু জন্ম-মৃত্যু-দুঃখহারী প্রণমি দক্ষিণামূর্তি দেবের চরণে। ১১

কি বিচিত্র! বটমূলে গুরু-যুবা বৃদ্ধ-শিষ্যচয়,
মৌন হয় গুরু, উপদেশ নাশে সব শিষ্যের সংশয়। ১২

প্রণমি প্রণব-গম্য শুদ্ধ জ্ঞান মাত্র তত্ত্ব যাঁর,
সুবিমল সুপ্রশান্ত শ্রীদক্ষিণামুরতি তাঁহার। ১৩

সকল বিদ্যার নিধি ভবরোগে বৈদ্য জনতার—
সর্বলোকগুরু তিনি শ্রীদক্ষিণামূর্তি অবতার। ১৪

প্রকাশেন পরব্রহ্ম যুবা যিনি নীরব ভাষণে
পরিবৃত সুপ্রাচীন ব্রহ্মনিষ্ঠ অন্তেবাসিগণে,

করে জ্ঞানমুদ্রা সদানন্দ পূজি আচার্যপ্রবর
আত্মারাম হাস্যমুখ শ্রীদক্ষিণামূর্তি ভবহর। ১৫

কথাপ্রসঙ্গে

৪ঠা জুলাই

৪ঠা জুলাই—প্রতি বৎসর আসে ও যায়, আমরা বিশেষ লক্ষ্য করি না। কিন্তু এ বৎসর এই বিশেষ দিনটি আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী বৎসরে এ দিনটির গুরুত্ব আমাদের অনুধ্যান করিতে হইবে। একাধিক কারণে দিনটি স্মরণীয়।

প্রথমেই মনে ওঠে ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই—সে যেন এক মধ্যাহ্নে সূর্যাস্তের দিন! সারা পৃথিবীর আকাশ জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করিয়া সহসা যেন ভারত-সূর্য অন্তর্হিত হইল। সেদিনের বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা কোথাও লিপিবদ্ধ দেখি না, কিন্তু সহজেই অনুমান করা যায়, সেদিন বিনামেঘে বজ্রপাত হইয়াছিল; তারপর লক্ষ লক্ষ মন হতাশার মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছিল, আরও অনুমান করা যায়—সহস্র সহস্র মন গঙ্গার মতোই সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা শুরু করিয়াছিল! সীমা হইতে অসীমের দিকে, বন্ধন হইতে মুক্তির দিকে নবজীবনের অভিযান অব্যাহত রাখার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিল।

৪ঠা জুলাইএর বাণী মুক্তির বাণী! ৪ঠা জুলাইএর বাণী বাঁধন ভাঙার বাণী, শিকল ছেঁড়ার বাণী! জীবনে জীবনে ইহার বিভিন্ন প্রয়োগ! কোন জীবনে এ বন্ধন রাজনীতিক, কোন জীবনে বা সামাজিক, আবার কোন জীবনে আধ্যাত্মিক! কোথাও এ বন্ধন বিদেশী রাষ্ট্ররচিত পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল, কোথাও এ বন্ধন নিজেদেরই রচিত সমাজবিধি, কোথাও বা এ বন্ধন এই দেহের বন্ধন, মনের বন্ধন—বাসনার কামনার স্বার্থ-বন্ধন! সর্বত্র সকলেই স্বামীজীর জীবন ও বাণী হইতে প্রেরণা পাইয়াছে বন্ধন ভাঙিবার, শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার। উদাত্ত কণ্ঠে স্বামীজী বলিয়াছেন 'Freedom is the song of the soul' তাঁহার প্রাণের সঙ্গীত The Song of the Sannyasin (সন্ন্যাসীর গীতি) কবিতায় এই বন্ধন-মুক্তির কি অপূর্ব ঝঙ্কার!

১৮৯৮, ৪ঠা জুলাই—কাশ্মীরে নদীবক্ষে নৌকাতেই পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাগণকে চমকিত করিয়া স্বামীজী পালন করিলেন আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস! এক অপটু দরজিকে দিয়া একটি তারকাচিহ্নিত ডোরাকাটা পতাকা (Stars & Stripes) তৈয়ারি করাইয়া নৌকার উপর উড়াইয়া দিলেন, এবং প্রাতরাশের সময় ৪ঠা জুলাইএর উদ্দেশ্যে রচিত একটি কবিতা সকলকে উপহার দিলেন। সেই 'To the Fourth of July' কবিতায় উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে শুধু আমেরিকার স্বাধীনতা নয়, পৃথিবীর প্রতিদেশের মুক্তির আগমনী, আরও বলা যায় সেখানে ঝঙ্কৃত হইয়াছে মানুষের মুক্তি—সকল প্রকার বন্ধন হইতে, সকল প্রকার সংস্কার হইতে। সত্যই সেদিন তিনি দেখিয়াছিলেন সূর্যের আলো—জ্ঞানের আলো মুক্তি বিকীরণ করিতেছে, তাই বলিয়া উঠিয়াছিলেন: 'Oh Sun, today thou sheddest Liberty', তাইতো বিশ্বমুক্তির সঙ্গীত গাহিয়া তাঁহার এ বন্দনা শেষ করিয়াছেন।

Move on, O Lord, in thy resistless path!
Till thy high noon o'erspreads the world,
Till every land reflects thy light,
Till men and women with uplifted head,
Behold their shackles broken, and
Know, in springing joy, their life renewed!

চার বৎসর পরে এক সজল সন্ধ্যায় বেদান্তকেশরী—নবযুগচিন্তার অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দ দেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সীমা হইতে অসীমে লীন হইয়া গেলেন! মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে শুধু পূর্বাভাস দিয়া গেলেন: শশি ভাই, ভাঁজ-করা পোশাকের মতো শরীরটা ছেড়ে গেলাম।

সমন্বয়ের সীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-নামের সহিত সমন্বয়-শব্দটি প্রায় সমার্থক রূপেই উচ্চারিত ও ব্যবহৃত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে আর কিছুই জানে না, সেও বলিবে, শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্মের সমন্বয় করিয়াছিলেন। কিন্তু গণ্ডগোল লাগিয়াছে 'সমন্বয়' শব্দটির অর্থ লইয়া। গোলমাল এড়াইবার জন্য বরং বলা ভাল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্ম সাধনা করিয়াছিলেন এবং উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 'সব ধর্মই সত্য'। আন্তরিক-ভাবে সাধনা করিলে প্রত্যেকটি ধর্ম বা ভাব সহায়েই ঈশ্বর লাভ করা যায়। সাধনার ক্ষেত্রে আন্তরিকতাই মুখ্য, আর সব গৌণ।

তবে কি বহুল-প্রচারিত এবং অধুনা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত 'ধর্ম-সমন্বয়' কথাটি অর্থহীন? নিশ্চয়ই নয়, 'ধর্ম-সমন্বয়' যথেষ্ট অর্থপূর্ণ। কিন্তু 'সমন্বয়' কথাটি নানা জনে নানা অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন, প্রত্যেকেই মনে করেন, আমার অর্থ ঠিক। তাই সমন্বয়ের নামে আবার এক প্রকার নূতনতর বিরোধের সূত্রপাত হইতেছে।

ধর্ম-সমন্বয় সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই নিজের ধর্ম সম্বন্ধেও ভাল করিয়া জানেন না বা জানিতে চান না। বিষয়টির গভীরে না প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা ভাসা ভাসা পল্লবগ্রাহী আলোচনা হইতেই তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করিতে চান।

সমন্বয় এক দিক দিয়া খুব সহজ ও স্বাভাবিক, আবার বেশী যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়া ব্যাপারটি খুবই জটিল এবং মনে হয় ইহা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। কারণ বৈচিত্র্যই যদি প্রকৃতির নিয়ম হয়, সেখানে আবার সমন্বয় কোথায়? তাই চিন্তাশীল মনে প্রশ্ন ওঠে: বৈচিত্র্য কাহার? এবং এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই নির্ভর করিতেছে সমস্যার সমাধান! বৈচিত্র্য অবশ্য একেরই, কিন্তু সেই একের স্বরূপ কি? ক্রমশঃ আমরা অদ্বৈত বেদান্তের অথই জলের দিকে অগ্রসর হইতেছি। প্রকৃত-পক্ষে সমন্বয়-ভাবটি অদ্বৈত-তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈতবাদকে অস্বীকার করিয়া যেখানেই সমন্বয়ের অর্থ নিরূপণ করার চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই গণ্ডগোল বাঁধিয়াছে।

সিদ্ধান্ত শেষের জন্য রাখিয়া এখন আমরা সমন্বয়ের নানাবিধ অর্থ আলোচনা করি। কাহারও কাহারও মতে সমন্বয়ের অর্থ কয়েকটি নির্বাচিত পদার্থ বা ভাবের মিশ্রণ; অর্থাৎ কতকগুলি বিভিন্ন ধর্মী বা বিপরীত ধর্মী পদার্থ বা ভাবের পাশাপাশি সংস্থান ও অবস্থান,—অনেকটা আজকালকার রাজনীতিতে ব্যবহৃত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের (peaceful co-existence) মতো। অনেকে এই জন্যই ধর্ম-সমন্বয়ের সমর্থক, কোন বিশেষ ধর্মের পক্ষপাতী না হইয়া সব ধর্মকেই মান্য দেওয়া হইল। ইহাকেই কেহ কেহ সেকুলারিজ্‌ম্ বলেন; কিন্তু ইহা সমন্বয় নয়।

কোথাও বা দেখা যায়, বহুকে জোর করিয়া একের ছাঁচে ঢালাই করিবার চেষ্টা, ধর্মপরায়ণ একেশ্বরবাদী রাষ্ট্রেও এ প্রচেষ্টা আছে, আবার ধর্মহীন সাম্যবাদী রাষ্ট্রেও উঁচুনীচু সমতল করিবার এ প্রচেষ্টা বহুল-ব্যবহৃত, ইহাতে শেষ পর্যন্ত বহুভাব নির্মূল হইয়া যায়—একটি ভাবই প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করে, 'শত ফুল আর ফুটিতে পায় না',—এ বাগানে বৈচিত্র্য নাই, একঘেয়ে একচিত্রতা। একেশ্বরবাদ বা একতত্ত্ববাদ কিন্তু অদ্বৈত নয়; সাম্যবাদও সমন্বয় নয়!

তবে সমন্বয় কি? না, সমন্বয় অত সহজ নয়। সমন্বয় একীকরণ (equalisation)

বা সমীকরণ (equation) নয়, লঘুকরণ বা গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (Greatest Common Measure) নয়, সমন্বয় আত্মসাৎ-করণ, সমন্বয় সর্বভাবে আত্মদর্শন। সমুদ্র যে ভাবে উঁচুনীচু তরঙ্গকে আত্মসাৎ করে। তরঙ্গও শেষে বুঝে—আমিই সমুদ্র। সর্ব বৈচিত্র্যকে যে নিজের বলিয়া মনে করিতে পারে, সর্বভাবের মধ্যে যে নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখে, তাহার পক্ষেই সমন্বয় সম্ভব।

অন্যে শুধু খানিকটা সহিষ্ণুতা দেখাইতে পারে, কিন্তু শুধু সহিষ্ণুতা সমন্বয় নয়। প্রকৃত সমন্বয় পূর্ণভাবে গ্রহণে, মাতা যেভাবে বিভিন্ন ও বিপরীত-ভাবাপন্ন পুত্রকন্যাগণকে গ্রহণ করেন, বর্জনের কোন প্রশ্নই সেখানে নাই!

আজকাল একটা ধারণা হইয়াছে—যে কোন বিপরীত-ভাবমূলক কার্য এক সঙ্গে করিলেই বা করিতে পারিলেই সমন্বয় করা হইল। যথা বলা হয়: শ্রীরামকৃষ্ণ সংসার ও সন্ন্যাসের সমন্বয় করিয়াছিলেন। তিনি সংসারীও ছিলেন, আবার সন্ন্যাসীও ছিলেন। সত্যই কি ব্যাপারটা তাই? বরং বলা যাইতে পারে, তিনি এই উভয় আশ্রম অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহার মানসিক স্তর এ দুয়ের উর্ধ্বে।

স্বামীজী সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হয়, সেগুলি আরও ভ্রান্তির পরিচায়ক। 'বিবেকানন্দ ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় করিয়াছিলেন'—ভাবার্থ যেন ধর্ম ও কর্ম দুইটি বিপরীত ভাব! প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ও কর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহা অপেক্ষা হাস্যোদ্দীপক উক্তি: 'বিবেকানন্দ ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় করিয়াছিলেন!' আর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর উক্তি: 'বিবেকানন্দ অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের সমন্বয় করিয়াছিলেন।' এইটাই নাকি এ যুগে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি! ইতিপূর্বে আর কেহই এরূপ করিতে পারেন নাই!

যেহেতু এটিকে 'সমন্বয়ের যুগ' বলা হয়। অতএব সব কিছুর সহিত সব কিছুর সমন্বয় করিতেই হইবে। নহিলে যেন কিছুই করা হইল না; যে যত সমন্বয় করিতে পারিয়াছে, সেই তত বড়! কিন্তু এই ভ্রান্ত সমন্বয়বাদীদের প্রশ্ন করি, সমন্বয় কি একটা অনন্তবিস্তারশীল পদার্থ, যে সব কিছুই ইহার মধ্যে ভরা যাইবে? না ইহার বিস্তারের একটা সীমা আছে? আমরা বলি, সমন্বয়ের একটা সীমা আছে, একটা নিজস্ব ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্র মানসিক। বহু মানসে অনুভূত হইলেই ঐ ভাব অবশ্য সমাজে প্রতিফলিত হইবে।

আপাতবিরোধেরই সমন্বয় সম্ভব, প্রকৃত বিরোধের নয়। আলোক ও অন্ধকারে কি সমন্বয় হয়? ইহার সহজ সরল স্পষ্ট উত্তর: হয় না। তবে? তবে দেখিতে হইবে আলোক এবং অন্ধকার আপাতবিরোধী, না যথার্থই দুইটি বিপরীত তত্ত্ব! এইখানে অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ বলিতেছেন, তত্ত্ব একটিই, আলোকই তত্ত্ব, উহার অভাব অন্ধকার; অন্ধকার একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নয়! যে কম্পন হইতে আলোকের উদ্ভব হয়—তাহারই মৃদুতম কম্পন অন্ধকার, উহা আমাদের চোখে কোন প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে না। তাই আমরা বলি, উহা অন্ধকার! এইরূপ সর্বত্রই আপাতবিরোধ। তত্ত্বতঃ বিরোধ এ জগতে কোথাও নাই, প্রকৃত বিরোধ নাই। স্তরের তারতম্যের জন্যই বিরোধ প্রতীয়মান হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে বিরোধ অবশ্যই আছে, কিন্তু সেজন্য বিবাদ নিষ্প্রয়োজন।

অদ্বৈতেই অবিরোধ বা প্রকৃত সমন্বয়। অদ্বৈত-তত্ত্বের আভাসমাত্র পাইলেও হৃদয়ঙ্গম হয়, সবই সোপানবৎ সত্য, অতএব দেশ-কাল-পাত্র ও অবস্থা ভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনীয়। সর্বদা সর্বত্র সকলের জন্য এক ব্যবস্থা কখনই নয়। বাহিরে বহু বৈচিত্র্য বৈপরীত্য থাকুক; অন্তর্নিহিত এক, ঐক্য এবং অদ্বৈতভিত্তিক অবিরোধই সত্য। ইহাই প্রকৃত সমন্বয়

স্বামী বিবেকানন্দ : জীবন ও বাণী

স্বামী নিখিলানন্দ

[গত ২৮শে মার্চ ১৯৬৩ স্বামী বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী ভোজসভায় প্রদত্ত নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজীর ভাষণের অনুবাদ।]

এক শত বৎসর পূর্বে যে অসাধারণ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা আজ রাত্রে তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। সকল মহাপুরুষদের ন্যায় স্বামী বিবেকানন্দও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অনেকের ন্যায় ধ্যানে ও প্রার্থনায় তিনি সেই অনুভূতি স্বয়ং উপভোগ করিতে চান নাই, অথবা নির্বাচিত শিষ্যদের আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। ভারতে ও অন্যত্র তিনি বহু আন্তরিক সাধকের আধ্যাত্মিকতা জাগ্রত করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিশেষতঃ ভারতের জনসাধারণের অবস্থার ঐহিক উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক—উভয়বিধ। এই কারণেই তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকী ইওরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, দূর-প্রাচ্যের দেশসমূহে এবং ভারতেও জাতীয় উৎসবের আকারে পালন করা হইতেছে।

কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। যুক্তিবাদী পিতা এবং ধর্মপরায়ণা মাতা উভয়ের দ্বারাই তাঁহার চরিত্র গঠিত হয়। কলেজ-জীবনে তিনি বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা এবং জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, ডেভিড হিউমের ন্যায় পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কি অতীন্দ্রিয়, কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয়েরই তিনি যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাবি করিতেন। কিন্তু প্রার্থনা ও ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকাই ছিল তাঁহার অন্তরাত্মার প্রবল বাসনা। সংশয়ান্দোলিত মন লইয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হন—কলিকাতার বহু লোক তখন তাঁহার ভগবদ্ভাবে মাতোয়ারা জীবন দেখিয়া আকৃষ্ট হইতেছিল। 'মশায়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' তাঁহার এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টভাবে বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি। তোকে যেমন দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্টভাবে দেখেছি।' বহু পর্যবেক্ষণ ও অনেক পরীক্ষার পরে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের শিষ্য হইলেন এবং অন্তরে সত্য উপলব্ধি করিয়া দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে তিনি বিশেষরূপে শিক্ষালাভ করিলেন—সকল ধর্মমতই শেষ পর্যন্ত অকপট সাধককে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরব্রহ্ম ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়! এক সময়ে বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ) ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহার গুরুকর্তৃক এই ভাবে তিরস্কৃত হন : 'তুই চোখ বুজে ঈশ্বরকে দেখার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিস কেন? চোখ খুলে তাঁকে দেখতে পারিস্ না? ঈশ্বর সকল মানুষের মধ্যে বাস করেন। মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা।' এই উপদেশটুকু বিবেকানন্দের জীবন এক নূতন পথে চালিত করে।

রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ সংসার ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজকরূপে ভারতবর্ষের সর্বত্র পর্যটন করেন। তিনি তীর্থস্থান এবং সংস্কৃতির স্মৃতি-সৌধসকল দর্শন করেন এবং সকল শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। যদিও তিনি জাতির অতীত কীর্তিতে বিশেষ

গৌরব বোধ করিতেন, তথাপি ভারতের জনসাধারণের ঐহিক দুর্দশা-দর্শনে তাঁহার হৃদয় বেদনাপ্লুত হইত। তাহাদের ঐহিক অবস্থা উন্নত করার পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা তিনি বুঝিতে পারিলেন, আধুনিক পাশ্চাত্যে যে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা বিকশিত ও উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা ভারতেও প্রয়োজন। তিনি আরও বিশেষ-রূপে অনুভব করিলেন, পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে ভারতের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অংশ দিয়া দ্রুতবর্ধমান জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে—সাহায্য করিতে পারেন। ভয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করিয়া জড়বাদ তাহাদিগকে অন্তরের শান্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

ঈশ্বরের ইঙ্গিতে চালিত হইয়া ত্রিশবৎসর-বয়স্ক যুবক স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শিকাগো শহরে ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিতে আমেরিকায় উপনীত হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক দূতরূপে স্বীকৃত হইলেন। এই ঈশ্বর-প্রেরিত মানুষটির বাগ্মিতা, স্নেহপ্রবণ হৃদয় ও পবিত্রতা অনুভবক্ষম মার্কিন নরনারীকে আকর্ষণ করিল। চার বৎসর তিনি আমেরিকায় বহু পর্যটন করেন এবং হিন্দুধর্মের চিরসম্মানিত সনাতন সত্যসমূহ প্রচার করেন। তিনি তাহাদিগকে শিখাইলেন, প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব, মানুষের মূলগত ঐক্য এবং সর্বধর্ম-সমন্বয়। তিনি তাহাদিগকে শিখাইলেন, সকল ঈশ্বরের উপরে এক পরমেশ্বর আছেন, আমাদের সকল আচার, অনুষ্ঠানের উর্ধ্বে এক ধর্ম আছে, উহা সকল বদ্ধমূল ধারণা আচার-অনুষ্ঠান ও মতবাদের পারে। তিনি দেখাইয়া দেন যে, সমগ্র পৃথিবী একটি সর্বজনীন ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব, যাহা যীশু, বুদ্ধ ও কৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষদের দিব্য ভাব স্বীকার করিবে; সেই ধর্মে অসহিষ্ণুতা ও নিগ্রহের কোন স্থান থাকিবে না, বরং সকল ধর্মমতের উপরেই অপরিসীম শ্রদ্ধা থাকিবে এবং এই ধর্ম প্রতিটি নরনারীকে আভ্যন্তরীণ উন্নতির ধারা অনুসরণ করিতে দিয়া তাহাদের সুপ্ত দেবত্ব জাগ্রত করিতে যত্নশীল হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ জোর দিয়া বলেন যে, প্রকৃত ধর্ম মানুষকে শক্তি, সৌন্দর্য, সম্ভ্রম অর্জন করিতে এবং অন্য সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্যে আবদ্ধ হইতে সাহায্য করে। আক্রমণকারী অশুভভাবের সহিত সংগ্রাম করিতে পৃথিবীতে সত্যই ঐরূপ একটি আক্রমণকারী শুভভাবের প্রয়োজন।

পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিক শক্তির স্বীকৃতির বলে বলীয়ান্ হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং জাতীয় অভ্যুত্থানের কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন। উনচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার অকাল মৃত্যুর পূর্বে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সুগঠিত করেন। ঐ সঙ্ঘের সদস্যগণকে ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য এবং সর্বত্র মানব-সেবার জন্য (আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ) জীবন উৎসর্গ করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বিজ্ঞান ও পরজ্ঞান বা ধর্ম উভয়েরই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উভয়ের সমন্বয়ের পথও দেখাইয়া দিয়াছেন। বিজ্ঞানের দ্বারা যে বুদ্ধিবৃত্তি উন্নতি লাভ করে, প্রকৃত দৃষ্টির অভাবে তাহা সমাজ ধ্বংস করিতে পারে। করুণা- ও সহানুভূতি-শূন্য বিচার-বুদ্ধি পৃথিবীকে নিশ্চয়ই রক্তবন্যায় প্লাবিত করিতে পারে। বিজ্ঞানের প্রদর্শিত ব্যাবহারিক পথ অস্বীকার করিয়া ধর্মও মানুষের জরুরী ঐহিক প্রয়োজনগুলি স্পর্শ না করিয়া শুধু শূন্যগর্ভ আদর্শরূপেই থাকিয়া যাইবে। হিন্দু শাস্ত্র বলে, বিদ্যা বা বিজ্ঞান দ্বারা মানুষ

রোগ দারিদ্র্য অজ্ঞতা দূর করে, এবং পরাবিদ্যা বা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান দ্বারা সে অমরত্ব লাভ করে। বিবেকানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, বিজ্ঞান ও ধর্মের সহযোগিতায় পৃথিবী বর্তমান যন্ত্রণার অবস্থা অতিক্রম করিবে, এবং নব মানবতা নির্বিঘ্নে জন্মলাভ করিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভবিষ্যতের মহান্ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সত্তর বৎসর পূর্বে ধর্মমহাসভার মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে তাঁহার বাণী দিয়া গিয়াছেন। তখনই তিনি মানব-জাতির এক মহাসভার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেখানে মানব-জাতি তাহার ক্রমবিকাশের পথে যে-সকল উচ্চ চিন্তা সঞ্চয় করিয়াছে, তুলনামূলক বিচারের জন্য সেগুলি সংগৃহীত হইবে। সেখানে থাকিবে মহাপুরুষ ও সত্যদ্রষ্টাদের নির্ভীক ঘোষণা, আধুনিক বিজ্ঞানীদের চমকপ্রদ আবিষ্কার ও কীর্তি, শিল্পী ও কবিদিগের ভাবময় দৃষ্টি, দার্শনিকদিগের যুক্তিপূর্ণ বিচার, সর্বস্থানের সৃজনশীল কর্মীদের উন্নতিমূলক কার্যাবলী। পৃথিবীতে শান্তি ও মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য—এই এক উদ্দেশ্যে সবগুলি নিয়োজিত হইবে।

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৬ই জুলাই বেলা ১টা ১০ মিনিটের সময় স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ (হেম মহারাজ) বেলুড় মঠে আনুমানিক ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি নানাবিধ অসুখে কয়েক বৎসর যাবৎ ভুগিতেছিলেন। বেলুড় মঠেই গঙ্গাতীরে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

১৯১৬ খৃঃ তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ঢাকা মঠে প্রেরিত হইয়া তিনি প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী ধীরানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দের সাহচর্য লাভ করেন। ১৯২৫ খৃঃ হইতে তিনি নানাবিধ সেবাকার্যে নিযুক্ত হন। প্রতিটি কার্যে তাঁহার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা প্রকাশ পাইত।

তিনি শ্রীশ্রীমহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং তাঁহারই নিকট ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত হন। ১৯২৬ খৃঃ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন।

বিভিন্ন সময়ে ভূমিকম্প বন্যা ঘূর্ণিবাত্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অতিশয় সাফল্যের সহিত তিনি সেবাকার্য পরিচালনা করেন। ব্রহ্মদেশে আকিয়াবে বাত্যা-বিক্ষুব্ধ জনগণের সেবা, চাঁদপুরে কুলী-রিলিফ, বিহারে ভূমিকম্প-রিলিফ, নানাস্থানে বন্যার্তসেবা, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করিয়া চাঁদপুর-নোয়াখালিতে দাঙ্গাপীড়িতদের সেবা উল্লেখযোগ্য। ভারত-বিভাগের পর অসহায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য মিশনের নির্দেশে আগড়তলা ও ভদ্রেশ্বরে দুইটি আদর্শ কলোনি-প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তীতে অতি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল।

এক সময় তাঁহার লিখিত ভ্রমণকাহিনী ও অন্যান্য লেখা উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকারা পড়িয়াছেন। তাঁহার রচিত 'প্যাগোডার দেশে' ও 'উত্তরস্যাং দিশি' জনপ্রিয় পুস্তক।

তাঁহার দেহত্যাগে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একজন অক্লান্ত কর্মীর অভাব ঘটিল। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! ওঁ শান্তিঃ!!!

বিবেকানন্দের ইতিহাস চেতনা

[দ্বিতীয় পর্যায়—পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

(৩)

ভারতেতিহাসে ধর্মসংস্কার, ধর্মপ্রচার এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠার রীতিনীতি তার নিজস্ব। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠশতাব্দীতে বৈদিক ধর্মে বহু গলদ প্রবেশ করেছিল। যাগযজ্ঞ ও কর্মবিধির নাগপাশে আচার-সর্বস্ব হয়ে প'ড়ল বৈদিক সমাজ, কণ্টকিত হ'ল অসাম্য অস্পৃশ্যতা ও সঙ্কীর্ণতায়। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত তার প্রাধান্য বজায় রাখতে সমাজের অজ্ঞতার বা উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে সকল স্তরের লোকের কাছে বৈদিক ধর্মের আধ্যাত্মিকতার বদলে ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধিকেই বড় ক'রে তুললেন, বৈদিক সূক্তের করলেন অপব্যাখ্যা। অথচ এই যুগই দর্শনের যুগ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার যুগ। সমাজের ঋষিকল্পব্যক্তিগণ বুঝি দূরে অরণ্যের গভীরে গিয়ে উপনিষদ্-দর্শনের গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলির সাধনায় ও বিন্যাসে আনন্দলোক সৃষ্টি ক'রে চলেছিলেন। এলেন ক্ষত্রিয় রাজকুমার গৌতম বুদ্ধ। বেদকে অস্বীকার ক'রে নয়, তার কর্মকাণ্ডের জটিল প্রাণহীন আচার-ব্যবহারকে অস্বাকার ক'রে স্থাপন করলেন মানবধর্ম। আরণ্যক উপনিষদের অমৃতকথা অরণ্য ও পর্বতগুহা থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে জাতি- ও শ্রেণী-নির্বিশেষে সকল মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতেই এই রাজ-পুত্র জীর্ণকন্থা প'রে পরিব্রাজক বুদ্ধ হয়েছিলেন।

তারপর ভারতের যে ইতিহাস, তা ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে পরিণত হ'ল এবং স্থায়ী হ'ল শতাব্দীর পর শতাব্দা ধরে। এই বৌদ্ধযুগের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হ'ল সর্ব-যুগের সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ মৌর্য অশোকের রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ২৭১—২৩২)। সম্রাট্-ভিক্ষু অশোক তাঁর দ্বাদশ শিলালিপিতে স্বধর্মনিষ্ঠার এক আশ্চর্য সংজ্ঞা দান করেছেন: 'স্বধর্মে তীব্র অনুরাগবশে যদি কেউ পরধর্মকে বা ভিন্ন সম্প্রদায়কে হেয় জ্ঞান করে, কিংবা অপরের ধর্মকে নিন্দা করে স্বধর্মের গৌরব-ঘোষণার নিমিত্ত, তবে সে প্রকৃতপক্ষে স্বধর্মেরই সমূহ ক্ষতি সাধন ক'রে থাকে।' ইতিহাস সাক্ষী, অশোকের যে হাতখানি এই লিপি উৎকীর্ণ করেছিল, সে হাতখানিই তাঁর জীবনের সবকাজে তা ফুটিয়ে তুলেছিল। হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের বলিষ্ঠ ও সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি তো ছিলই; বৌদ্ধ অশোকের প্রীতি ও রক্ষার প্রতিশ্রুতি পেয়ে বর্বরোচিত ধর্মাবলম্বী মুষ্টিমেয় আজীবিক সম্প্রদায়ও গয়া জেলায় বরাবর-পর্বতগুহায় তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। এই সম্রাট্ই 'ধম্মবিজয়' করেছিলেন ভারতে ও ভারতের বাইরে, অপূর্ব সার্থকতার সঙ্গে তৎকালীন একটি আঞ্চলিক ধর্মমত—বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বহুকাল পরে খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম বিশ্বময় প্রচারে যে-পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল, তা এ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

এই ধর্মাশ্রয়ী সংস্কৃতি দিয়েই অশোকোত্তর যুগে অস্ত্রযুদ্ধে বিজিত হিন্দু ও বৌদ্ধ ভারত বিজয়া গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ এবং পরবর্তীকালেও হিন্দু ভারত গুর্জর হূন প্রভৃতি বহু বহিরাগত জাতিকে সম্পূর্ণ ভারতীয় ক'রে ভারতের আর্যসমাজে মর্যাদার স্থান দিয়েছিল।

বিদেশী কুষাণ বংশের কণিষ্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উত্তর ভারতের বৃহদংশ-সমেত এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অপরাজেয় সম্রাট্ ছিলেন। তিনি হয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভারতীয়। মহাযান-বৌদ্ধধর্মের বলিষ্ঠ প্রচারক এই ভারতীয় সম্রাট্ ছিলেন মৌর্য অশোকের উত্তরসাধক, বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে অশোকের পরেই তাঁর স্থান।

কালক্রমে বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতিতে দুর্নীতি প্রবেশ ক'রল, অহিংসা পর্যবসিত হ'ল কাপুরুষতা ও সঙ্কীর্ণতার আবরণে, রাজধর্মের আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হ'ল, ভারত বহুধাবিভক্ত হ'ল। রাষ্ট্রের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই গ্রীক, শক, কুষাণ প্রমুখ বিদেশী জাতিসমূহ একে একে ভারতের বিভিন্ন অংশে বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। ধীরে ধীরে মাথা তুলতে লাগলো হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম, নূতন ক'রে পৌরাণিক সংস্কৃতির আলোতে উদ্ভাসিত হ'ল। এ ধারারই পূর্ণ পরিণতিপ্রাপ্তি গুপ্তযুগে, যা ৩২০ খৃঃ থেকে অন্ততঃ ষষ্ঠশতাব্দীর কিছুকাল পর্যন্ত স্থায়ী হ'ল। এ কাহিনী ভারতেতিহাসের মূলতত্ত্বে (উদ্বোধন—চৈত্র, ১৩৬৯) সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। গুপ্তবংশের পরমভাগবত মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত প্রমুখ মহাপরাক্রান্ত নরপতিগণ বেদভিত্তিক পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সগৌরব প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করলেন, বহু শতাব্দী-কাল-স্থায়ী বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে সবলে ধ্বংস ক'রে নয়, তাকে সমশ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে আপন ক'রে নিয়ে। হিন্দু-বৌদ্ধ-সমন্বয়ীকৃত ভারতের এই ধর্ম আজও অব্যাহত রয়েছে। ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি ভারত থেকে পৃথিবীর এই অন্যতম প্রধান ধর্মমত লুপ্ত হয়ে যায়নি, ভারতীয় সত্তায় তা অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) যখন পাটলিপুত্রের সম্রাট্ (সম্ভবতঃ খৃঃ ৩৮০—৪১৩), তখন এসেছিলেন চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা হিয়েন—ভগবান তথাগতের জন্ম-মাহাত্ম্যে তীর্থীভূত ভারতভূমিতে তীর্থযাত্রীর মন নিয়ে, বৌদ্ধশাস্ত্র ও সংস্কৃতির সাগরে অবগাহন করবার অভিলাষ নিয়ে। তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। স্বপ্নের ভারতে আর বাস্তব ভারতে কোন তফাৎ তিনি দেখতে পাননি, কখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি যে, তৎকালে উত্তর ভারতের শক্তিমান্ অধীশ্বর চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধ নন বা সে-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক নন। অথচ ইতিহাস বলে, তাঁর রাজত্বকালই পৌরাণিক হিন্দুধর্মের স্বর্ণযুগ। ফা-হিয়েন দেখেছিলেন, হিন্দু ও বৌদ্ধ—ভারতের এ-দুটি প্রধান ধর্ম পাশাপাশি রয়েছে কোন ভুল বোঝাবুঝির বশীভূত না হয়ে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসেছিলেন হুয়েন সাঙ, প্রখ্যাত চৈনিক মনীষী, চিরজিজ্ঞাসু বৌদ্ধ পরিব্রাজক। তখন থানেশ্বরের পুষ্যভূতি-কুলতিলক হর্ষবর্ধন কনৌজকে কেন্দ্র ক'রে উত্তর ভারতের সম্রাট্ হয়ে বসেছেন। ইতিহাস বলে, হর্ষবর্ধন আনুষ্ঠানিক-ভাবে কোনদিন বৌদ্ধ হননি, যদিও এ ধর্মে তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল। তিনি কৌলিক দেবতা আদিত্য ও শিবের উপাসকই ছিলেন মৃত্যু পর্যন্ত। তাঁর রাজত্বের মহৎকীর্তি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচীন যুগে সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই পীঠস্থান প্রধানতঃ বৌদ্ধ সংস্কৃতিরই কেন্দ্র ছিল। হুয়েন সাঙ এখানে কয়েক বৎসর ছাত্র হয়ে অধ্যয়ন করেন। তাঁর বৃহদায়তন ভ্রমণ-বৃত্তান্তে

বৌদ্ধ ভারতের জয়গান গাওয়া হয়েছে, যদিও আমরা জানি যে, বৌদ্ধধর্ম তখন ভারতে পতনোন্মুখ, হিন্দুধর্মের সঙ্গে তা ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রায় একীভূত বা সমঞ্জসীভূত হয়ে গেছে।

অবশ্য পূর্বভারতে বৌদ্ধ জনগণ বাংলার বৌদ্ধ পাল-রাজগণের (অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত) আনুকূল্যে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে আরও কিছুকাল টিঁকে রইল। বাংলার এই মহাযানী বৌদ্ধ পাল-রাজগণ ভারতে শেষ বৌদ্ধ যুগের ধারক ও বাহক। আবার এ-যুগেই তন্ত্রকে ভিত্তি ক'রে বর্তমান বাংলার ধর্ম ও সমাজ-জীবন দানা বাঁধতে লাগলো। ভারতের অচ্ছেদ্য অংশ হয়েও বাংলা যে তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ধর্মাচরণের বৈশিষ্ট্যে নিজেকে আজও চিহ্নিত ক'রে রেখেছে, তার গোড়ার কথা রয়েছে এই সমন্বয়ধর্মী পাল-রাজাদের কীর্তিকাহিনীতে, বৌদ্ধ ও হিন্দুর ভাবধারার মধ্যে। প্রাক্-মুস্লিম বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দু-রাজবংশোদ্ভূত সেন-রাজগণ বাংলার শ্রেণী-কুল-জাতি-পর্যায়-সম্বলিত হিন্দু সমাজের বহিরঙ্গকে স্থায়ী রূপ দান করলেন। এই প্রসঙ্গে বল্লালসেনের আমলে বাংলার সামাজিক ইতিহাস স্মরণযোগ্য। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি পরম বৈষ্ণব সাধক জয়দেব তাঁর দশাবতার-স্তোত্রে উদাত্ত-কণ্ঠে জগদ্‌বাসীকে শোনালেন : 'কেশব ধৃতবুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে !'

(৪)

ধর্মাশ্রয়ী প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এইতো ধারা। যখন এই ধর্মকে ভারত কুসংস্কার কদাচার ও সঙ্কীর্ণতার পঙ্কে নিমজ্জিত করলে, তখনই হ'ল হিন্দু-ভারতের পতন। অবিশ্বাস্য আত্মপ্রসাদ তাকে কূপ-মণ্ডুকে পরিণত করলে, অন্ধ রক্ষণশীলতা তার সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সিংহদ্বার রুদ্ধ ক'রে দিলে, রাজনীতি ও সমরনীতিতে প'ড়ল সামাজিক দুর্নীতির গভীর ছাপ, রাষ্ট্রে এল চরম অনৈক্য বৈষম্য ও আদর্শচ্যুতি।

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে অপরাজেয় আরবীয় ইসলাম ভারত আক্রমণ করেছিল এই স্বর্ণপ্রসূ ভূখণ্ডকে ইসলামের কুক্ষিগত করতে। তারপর স্বামীজীর ভাষায় বলি : 'আরবেরা ভারতবর্ষ জয়ের অনেক চেষ্টা করেও সফল হয়নি। মুসলমান-অভ্যুদয় সমস্ত পৃথিবী বিজয় করেও ভারতবর্ষের কাছে কুণ্ঠিত হয়ে গেল।'—(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)

ভারতের পশ্চিমে ক্ষুদ্র সিন্ধুদেশ নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এই যুগটা আচার্য শঙ্করের অভ্যুদয়ের যুগ। দক্ষিণ ভারতের কেরল দেশের এই মহান্ বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্লাবন থেকে ঔদার্যের ভিত্তিতে হিন্দুধর্মকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর অসামান্য কর্মের ক্ষেত্র ছিল সমগ্র দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারত জুড়ে। ঐ যুগের ইতিহাসে মুসলমানের ব্যর্থতা ও হিন্দুর সাফল্যের পশ্চাতে অধ্যাত্মবাদী হিন্দুর পুনরভ্যুত্থানে মায়াবাদী দার্শনিক শঙ্করাচার্যের কতটা প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল, বলা শক্ত। শুধু এটুকু জানি, দক্ষিণে ও উত্তরে একাধিক ভারতীয় রাজবংশ তখন ছিল ভারতীয় ধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। স্বামীজীর মতে উত্তরাঞ্চলে মালব সাম্রাজ্যের সাময়িক গৌরবদীপ্তি এ সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। উত্তর ভারতের কনৌজকে কেন্দ্র ক'রে শেষ হিন্দু (রাজপুত) সাম্রাজ্যবাদী প্রতিহার-রাজবংশের কথাই বোধ হয় স্বামীজী এখানে বলছেন। প্রতিহারের আদি বাসভূমি ছিল মালবাঞ্চলে। তা যদি হয়, তবে এ এক আশ্চর্য ইতিহাস-চেতনা

স্বামীজীর। কেননা প্রতিহার-বংশের গুরুত্ব ভারতেতিহাসে স্বীকৃত হয়েছে স্বামীজীর মৃত্যুর বহু পরে। এই বংশের দুর্ধর্ষ রাজগণ—বৎসরাজা, দ্বিতীয় নাগভট, মিহিরভোজ এবং মহেন্দ্রপাল উত্তর ভারতে প্রাধান্য-স্থাপনের নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট এবং বাংলার পালদের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত থেকেও কখনও বিস্মৃত হননি পশ্চিম ভারতে ওই প্রত্যন্তদেশের আরবীয় ইসলামের দুর্বার স্রোতকে রুদ্ধ ক'রে রাখতে। প্রত্যক্ষদর্শী আরব পরিব্রাজক সুলেমানের মতে প্রতিহার-বংশের রাজারাই ছিলেন আরবজাতির অশনি। ইতিহাস আরও বলে যে, শেষ পর্যন্ত পরধর্মা-সহিষ্ণু আরবীয় ইসলাম সিন্ধুদেশবাসী হয়ে প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্যসমূহের সঙ্গে মোটের উপর সদ্ভাব রেখে চলতে চেষ্টা করেছিল, ভারতীয় জলমাটির গুণে অনেক পরিমাণে গোঁড়ামি ত্যাগ ক'রে হিন্দু প্রজাদের উপর ধর্মের কারণে অত্যাচার করা বন্ধ করেছিল। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' স্বামীজী যে বলেছেন, 'সিন্ধুদেশ আরবেরা একবার আক্রমণ করেছিল মাত্র; কিন্তু রাখতে পারেনি'– এ-কথাটা আজও গবেষণার বিষয়।

'কয়েক শতাব্দী পর তুর্ক প্রভৃতি তাতার জাতি বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে মুসলমান হ'ল, তখন এই তুর্কীরা সমভাবে হিন্দু, পার্শী, আরাব সকলকে দাস ক'রে ফেলল।' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' তাতার জাতি সম্বন্ধে স্বামীজীর এই মন্তব্য সম্পূর্ণ ইতিহাস-সম্মত। ভারতীয় হিন্দুসমাজ তখন জীর্ণ ও দুর্নীতিগ্রস্ত; তুর্কী ইসলাম—দুর্ধর্ষতায় এবং নবধর্ম ইসলামের প্রেরণায় অপরাজেয়। মনে হয়, উত্তর ভারতের জনসমাজে বা রাজনীতিতে শঙ্করাচার্য এবং তাঁর উত্তরসাধকেরা কোন স্থায়ী সুদূর-প্রসারী প্রভাব রাখতে পারেননি, যেমন পেরেছিলেন ওই সুদূর অতীতে বুদ্ধ এবং শত শত বৎসর পরেও বৌদ্ধরাজগণ এবং সংখ্যাতীত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের সম্প্রদায় ও মঠ সৃষ্টির ব্যাপারেই রয়েছে শঙ্করের অবিস্মরণীয় কীর্তি। শঙ্করের 'জাতিভেদে অতিনিষ্ঠা, সহজ ভাবাবেগ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এবং (পুঁথির ভাষা) সংস্কৃতের মাধ্যমে সে জ্ঞান (উচ্চ জ্ঞানমার্গের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা) প্রচার'—এ-সব স্বভাবতই জন-সাধারণের মধ্যে (রাজন্যবর্গের মধ্যেও) সাড়া জাগাতে পারলো না। প্রতিহার-বংশের (স্বামীজীর ভাষায় মালব সাম্রাজ্যের) পতনের সঙ্গে সঙ্গে (একাদশ শতাব্দীর গোড়ায়) উত্তর ভারত জুড়ে স্থাপিত হ'ল পরস্পর-বিবদমান ছোট ও বড় বহু রাজপুত রাজ্য। অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল, আদর্শচ্যুত এবং কেন্দ্রচ্যুত রাজপুত-শক্তিকেই একে একে পরাস্ত ক'রে তুর্কী ইসলাম অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা উত্তর ভারতে উড্ডীন করলে। স্বামীজী তাঁর বিখ্যাত 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, মালব সাম্রাজ্যের অবসান ঘটলে পর 'উত্তর ভারত যেন দীর্ঘকালের জন্য গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। আর সে নিদ্রা রূঢ়ভাবে ভাঙিয়াছিল আফগানিস্তানের গিরিবর্ত্ম দিয়া সবেগে সম্মুখে ধাবমান মুসলমান (তুর্কী) অশ্বারোহি-দলের বজ্রনিনাদে।'

একাদশ শতাব্দীর গোড়ায় উত্তর ভারতে সপ্তদশ বার নিষ্ঠুর প্রলয়ঙ্কর অভিযান চালিয়ে দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিলেন গজনীর সুলতান মামুদ। হিন্দুর রণনীতি অবিশ্রান্ত রক্ষণশীলতার ফলে তখন দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্বল. হিন্দুর সমাজ তখন কূপমণ্ডুকতার আত্মপ্রসাদে

মগ্ন, চরম অনৈক্যে ও অসাম্যে সহস্র ফাটল ধরেছে তখন রাষ্ট্রে ও সমাজে। সুলতান মামুদের ভারত-অভিযানের সাথী ছিলেন এক অদ্ভুত আরব মনীষী, নাম অল্-বেরুনি। হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠনের, কাফেরের দেশে কাফেরের কীর্তি চূর্ণবিচূর্ণ করার এবং অগণিত নিরীহ হিন্দু নিধনের গৌরবে ভূষিত সুলতান মামুদের প্রশস্তি রচনা করতে অল্-বেরুনি ভারতে আসেননি। এসেছিলেন ওই অতীতের মেগাস্থিনিস, ফাহিয়েন, হুয়েন সাঙের মতো মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির জননী ভারতভূমিকে দেখতে ও জানতে এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তরখ-ই-হিন্দে' সুলতান মামুদের দস্যুতার উপর নির্ভীক ও কঠোর নিন্দাবাক্য আছে।

কিন্তু একাদশ শতাব্দীর ভারতকে দেখে তিনি বেদনাবিদ্ধ হলেন। খুঁজে পেলেন না কোথাও তাঁর কল্পনার ভারতকে। তিনি লিখলেন: হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, তাদের দেশ ছাড়া আর কোন দেশ নেই, তাদের মতো কোন জাতি নেই, নেই তাদের রাজার মতো আর কোন রাজা। আর ধর্ম ও বিজ্ঞানে তাদের অধিকার তো একচেটিয়া। · জ্ঞান বা প্রজ্ঞাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে নয়, তাকে কৃপণের ধনের মতো সযত্নে অপরের কাছ থেকে আড়াল ক'রে রাখতেই হিন্দুর আপ্রাণ প্রয়াস ও আনন্দ। বিদেশী তো ঘৃণ্য ম্লেচ্ছ। নিজের সমাজেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া তুলেছে হিন্দু। হিন্দুর ঔদ্ধত্য এবং অন্ধতা আজ এত চরমে উঠেছে যে, তার জ্ঞান-ভাণ্ডারকে যে বিদেশের কোন রত্ন একদা সমৃদ্ধ করেছে কিংবা কদাপি করতে পারে, এ-কথা সে ভাবতেই পারে না।—অথচ তার পূর্বপুরুষ কখনও এমন ছিলেন না। সর্বদাই আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাঁরা ভারতের সভ্যতাকে মার্জিত উন্নত ও জীবন্ত রেখেছেন, ভারতের বাইরে যে পৃথিবী, তাকে সমৃদ্ধ করেছেন, কাছে টেনে নিয়েছেন।

বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এর উপর মন্তব্য করেছেন, হিন্দুর পতনের কারণ এইখানেই নিহিত রয়েছে। তৎকালীন ভারতের হিন্দু-সমাজ কী পরিমাণ দুর্গতিতে আচ্ছন্ন, তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ অল্-বেরুনির গ্রন্থ। জাতের নামে বজ্জাতি চলেছে একটানা, মানুষে মানুষে স্ত্রী-পুরুষে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান গড়ে উঠেছে। তার ফলে হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শুধু নয়, সমগ্র জাতীয় জীবনে ঘটলো প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয়। বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ইসলামের উন্মাদনায় প্রদীপ্ত দুর্ধর্ষ তুর্কীর কাছে হিন্দুর পরাজয় অনিবার্য হ'ল। জীবন্ত নূতনের কাছে জীর্ণ পুরাতন হার মানলো। ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু নরপতিদের (যেমন শাহীরাজ আনন্দপাল, চৌহানরাজ তৃতীয় পৃথ্বীরাজ) অমানুষিক শৌর্যবীর্য এবং ধর্মের আদর্শরক্ষায় অসামান্য তিতিক্ষা আর আত্মবিসর্জনও হিন্দু ভারতকে রক্ষা করতে পারলো না। ১২০৬ খৃঃ বিজয়ী সীহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘুরির পুত্রোপম ক্রীতদাস কুতবুদ্দীন আইবাক দিল্লীতে উত্তর ভারতের মুস্লিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করলেন।

সুতরাং হিন্দুর পতনের কারণ ধর্ম নয়, ধর্মহীনতা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এ সূত্রের ভাষ্য ক'রে স্বামীজী বলছেন, 'যে মানুষটা বলে আমার কিছু শিখবার নেই, সে মরতে বসেছে। যে জাতিটা বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট।' তুর্কী মুসলমানের কাছে উত্তর

ভারতের এই ধর্মহীন সবজান্তা হিন্দু তাই নতি স্বীকার করেছিল। হিন্দু সংস্কৃতি বা ধর্মের প্রাণ যে সমন্বয়, তা তখন অবলুপ্ত, তাই সে ধর্মহীন, যদিও কুসংস্কার ও কদাচারে পর্যবসিত ধর্মের খোসাটা আঁকড়ে ধরে তৎকালীন ভারতবাসী ক্ষীণস্বরে বলছিল যে, সে ধার্মিক আর মুসলমান ম্লেচ্ছ।

যুগে যুগে ভারতের উত্থান ও পতনের ইতিহাস ধর্ম ও ধর্মহীনতার চতুর্দিকে এমনি করেই আবর্তিত হয়েছে। 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে স্বামীজী পতনের পর পুনরুত্থানের পটভূমিকাস্বরূপ একটি অমূল্য কথা সূত্রাকারে আমাদের দান করেছেন। 'ভারতের ইতিহাসে বারবার দেখা গিয়াছে যে, কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের পরে, তাহারই অনুবর্তিভাবে একটি রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে।' ইওরোপের ইতিহাস পাঠ ক'রে আমরা এমন আর একটি কথা শিখেছি। 'Renaissance precedes revolution' (বিপ্লব সংস্কৃতির পূর্বগামী)। অবশ্য ভারতেতিহাসে রেনেসাঁ বা সংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থান ধর্মকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না, এবং এদেশের বিপ্লব বা আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় নীরবে দীর্ঘকালের সাধনায় ও কার্যক্রমে।

তুর্কী সুলতানী যুগের প্রাক্‌কালে উত্তর ভারতে কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান হয়নি। তুর্কী-পাঠান শাসনকালের (১২০৬-১৫২৬) শেষার্ধে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাধু-সন্তদের জীবন ও সাধনা কেন্দ্র ক'রে ভারতে এক অভিনব আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটেছিল। (উদ্বোধন—চৈত্র, ১৩৬৯ দ্রষ্টব্য)। সুলতানী শাসনের প্রকৃতিতে অনিশ্চয়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে স্বামীজী বলছেন, 'এই দেখো, পাঠানরা আসছিল যাচ্ছিল, কেউ সুস্থির হয়ে রাজ্য শাসন করতে পারছিল না, কেননা হিঁদুর ধর্মে ক্রমাগত আঘাত কচ্ছিল।'—(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)। রামানন্দ, নানক, চৈতন্য প্রমুখ সন্তদের আবির্ভাবের পটভূমিকা তুর্কী-পাঠান শাসনের চরম হিন্দুবিদ্বেষ-নীতিতে নিবদ্ধ। ওই সন্তরা প্রধানতঃ হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতিকে সুরক্ষিত করতেই এসেছিলেন, যে-ভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে বোধগম্য, সেই ভাষাতেই তাঁরা নব ভাবধারা প্রচার করেছিলেন, অবশ্য ভক্তির পথে। মুক্তি-পথের যে দ্বার অত্যাচারী মুস্লিম সুলতান ও তাঁর অনুচরেরা বন্ধ করতে গিয়েছিলেন, তাকে খোলা রাখতেই নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন ভারতের হিন্দু, মুসলমানকেও প্রেমের ও ঔদার্যের ভিত্তিতে আপন ক'রে নেবার বাণী সে কান পেতে শুনলো সাধুসন্তদের ভক্তিমার্গে সাধনার অভ্যন্তরে।

কিন্তু তবুও মধ্যযুগে হিন্দুর 'রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত' হ'ল না উত্তর ভারতে এত বড় আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান সত্ত্বেও। তবে কি স্বামীজীর সূত্রটি ইতিহাস-সম্মত নয়? উত্তর স্বামীজী নিজেই দিয়েছেন ওই বিখ্যাত প্রবন্ধে।

'রামানন্দ, কবীর, দাদু, শ্রীচৈতন্য বা নানক এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্তগণ দার্শনিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও মানুষের সম-অধিকার প্রচারে সকলে একমত ছিলেন। সাধারণের মধ্যে ইসলামের অতিদ্রুত অনুপ্রবেশ রোধ করিতেই ইঁহাদের অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে; কাজেই নূতন আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শের উদ্ভাবন তখন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ যদিও জনসাধারণকে নিজ ধর্মের আবেষ্টনীতে ধরিয়া রাখিবার জন্য তাঁহাদের প্রয়াস অনেকটা ফলপ্রসূ হইয়াছিল এবং মুসলমানদিগের উগ্র সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিও কতকটা প্রশমিত করিতে তাঁহারা সক্ষম;

হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা ছিলেন নিছক আত্মসমর্থনকারী; কোনপ্রকারে শুধু বাঁচিয়া থাকার অধিকার লাভ করিবার জন্যই তাঁহারা প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছিলেন।'

স্বামীজীর সূক্ষ্ম ইতিহাস-চেতনা উপরের উদ্ধৃতিতে অপূর্বভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, বহু তথ্য বা ঘটনার অবতারণা করলেও মধ্যযুগের ইতিহাসের ধর্মভিত্তিক এই বৈশিষ্ট্যকে এমনভাবে ফোটানো বোধহয় সম্ভব নয়।

কিন্তু সাধুসন্তদের জীবন-সাধনা কি ব্যর্থ হবার? অভিনবভাবে তা অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই দিল্লীর দরবারের ইতিহাসে রূপায়িত হ'ল, সমগ্র ভারতে তার আশীর্বাদ বর্ষিত হ'ল। হিন্দু রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ফিরে পেল না সত্য (বোধহয় তখন সে যোগ্যতাও তার ছিল না, রাণাপ্রতাপের মহান্ প্রয়াসের ব্যর্থতাই তার প্রমাণ), কিন্তু তার মুক্তির প্রশস্ত দুয়ার আবার খুলে গেল। যে জীবনকে অশরীরী বাণীরূপে ওই সাধুসন্তরা আকাশে বাতাসে রেখে গিয়েছিলেন, মহামতি মুঘল সম্রাট্ আকবর তাকেই যেন ভিত্তি ক'রে মহাভারত রচনা করলেন হিন্দু ও মুসলমানের সম-অধিকারের ভিত্তিতে। আকবরের রাজত্ব ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে এক অসামান্য বলিষ্ঠ ও সুদূরপ্রসারী ঘটনা। ভারতের অত জটিল অবস্থার মধ্যেও মধ্য এশিয়ার বাবরের বংশধর আকবর সত্যসত্যই ছিলেন ভারতের জাতীয় সম্রাট্।

লরেন্স বিনিয়ন আকবরের চরিত্র ও ভারতের ইতিহাসে তাঁর স্থান নিরূপণ করতে গিয়ে নানা কথার মধ্যে লিখলেন—এই অদ্ভুত পুরুষের মধ্যে দুটি সত্তা পাশাপাশি বাস ক'রত। নিষ্ঠুর বর্বরতা ও বীরত্বে অতুলনীয় তৈমুরের যোগ্য বংশধর, মধ্য এশিয়ার রুক্ষ তুর্কী ও মোঙ্গলদের অমানুষিক শৌর্য বীর্য ও কর্মদক্ষতার উত্তরাধিকারী এই আকবর আবার একজন ভারত-পথিকও বটে। এদেশের বুদ্ধ ও অশোক, আরও কত সাধুসন্ত তাঁর মাঝে কথা করে উঠত, এদেশের মর্মস্থলে প্রবেশ করার চাবিকাঠি তৈমুরের এই বংশধরের হাতে যেন অবলীলাক্রমে চলে এল।

আকবরের প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য স্থায়ী হ'ল একশত বৎসরেরও বেশি কাল; ভারতের জাতীয় ঐক্য ও রাষ্ট্রিক সংহতি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ফলে ফুলে শোভিত করলে। তারপর ঔরঙ্গজীব তাঁর রাজত্বের মধ্যভাগে আকবরের নীতিকে সম্পূর্ণ বদলে দিলেন। ইসলামের এই একনিষ্ঠ ও শক্তিমান্ সেবক গোঁড়ামি, সন্দিগ্ধ-চিত্ততা ও পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের মিলনে গড়া ভারতকে আবার বিপর্যস্ত করলেন। নানাভাবে অত্যাচারিত হয়ে বিদ্রোহী হিন্দু অশান্তি ও অরাজকতায় দেশকে ছেয়ে ফেললে। মৃত্যুর (১৭০৭ খৃষ্টাব্দ) পূর্বেই ঔরঙ্গজীব দেখে গেলেন যে এতবড় সুসংহত মুঘল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে।

স্বামীজী এতবড় উত্থান-পতনের ইতিহাসকে দুটি কথায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' ফুটিয়ে তুলেছেন। 'মোগল রাজ্য কেমন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, কেমন মহাবল হ'ল। কেন? না—মোগলেরা ওই জায়গায় (হিঁদুর ধর্মে) ঘা দেয়নি। হিঁদুরাই তো মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি, জাহাঙ্গীর, সাজাহান দারাস্যকো—এদের সকলের মা যে হিঁদু। আর দেখ, যেই পোড়া আরঙ্গজেব আবার ঐখানটায় ঘা দিলে, অমনি এতবড় মোগল রাজ্য স্বপ্নের মতো উড়ে গেল।' দারাসাকোর মা মমতাজ অবশ্য মুসলমান, কিন্তু মনীষী দারা ছিলেন হিন্দু সংস্কৃতির অসীম অনুরাগী এবং উদারচরিত্রের

মুঘল যুবরাজ, আকবরের ঐতিহ্যের ও আদর্শের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। কিন্তু রাজনীতি, রণ-নীতি ও কূটনীতিতে অনভিজ্ঞ এই উপনিষদ্-প্রেমিক সাজাহান-নন্দন সিংহাসনের জন্য যে ভ্রাতৃবিরোধ হয়েছিল, তাতে ঔরঙ্গজীবের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। ভারতের হিন্দু-মুসলমান-মিলনে গঠিত বিরাট জাতির ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল, এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল। দারার এই হিন্দু-প্রীতির জন্যেই বোধহয় স্বামীজী তাঁর জননীকে রূপকভাবে হিন্দু বলেছেন। যে ধর্মাশ্রয়ী ভারতীয় সংস্কৃতির কথা স্বামীজী বার বার বলেছেন, তার মানস-সন্তান ছিলেন হতভাগ্য দারাসাকো।

সুতরাং ভারতীয় ধর্মের ঐতিহ্যে উদার ও শক্তিধর আকবর যে অপূর্ব মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ঔরঙ্গজীব নানাগুণে বিভূষিত হয়েও ভারতের প্রয়োজন ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মহীন—পরধর্মাসহিষ্ণু ব'লে প্রমাণিত হলেন এবং সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করলেন।

(ক্রমশঃ)

মরুর মৌমাছি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীবন !
মুকুরের ঘরে বাস করি অনুক্ষণ !
যেদিকে ফিরাই আঁখি, হেরি আপনারে !
কাঁদিতেছি 'অহং'-এর পিঞ্জর-দুয়ারে।
তুমি ভেঙে দাও এই 'আমি'র অর্গল !
তোমার আকাশে করো আমারে ঈগল !

জ্যোতির সমুদ্রে নিত্য করিতেছি স্নান !
মুক্তির এ স্বপ্ন কবে হবে ফলবান্ ?
ভূমাতেই সুখ মোর, অল্প নিয়ে আছি !
কামনার সাহারায় তৃষার্ত মৌমাছি !
এ কান্না থামাতে পারো তুমিই কেবল।
জাগিয়া ঘুমাই ; দৈবী মায়ার শৃঙ্খল
ভাঙিবার শক্তি কই ? কৃপার ভিখারী
আমারে তোমার করো,—কেবল তোমারই !

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(১)

ওঁ শরণম্ ৺কাশী

শ্রীমান্ গুরুদাস, ১৩।৭।২০

তোমার ৮।৭ তারিখের পত্র পাইয়াছি। তোমার শরীর ভাল আছে ও তুমি বেশ ধ্যান, ভজন, পাঠ ইত্যাদি করিতেছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। এখানে কিছু বৃষ্টি হইয়াছে, তাই গরমের কষ্টও অপেক্ষাকৃত কমিয়াছে। ঘামাচির যাতনা আর তত নাই। তবে পায়ের বেদনা খুব বাড়িয়াছে। বাহিরে বেড়াইতে পারি না। পাশের ময়দানে পায়চারি করিয়া থাকি। শরীর একরূপ চলিয়াছে, বেশ স্বচ্ছন্দ নহে। সনৎ অনেকদিন—প্রায় একমাস কলিকাতা হইতে ফিরিয়াছে ও ভাল আছে। শ্রীশ্রীমার অসুখ কিছুতেই সারিতেছে না। কত চেষ্টা-চরিত্র হইতেছে, কিছুই কাজে আসিতেছে না। প্রভুর মনে কি আছে, তাহা তিনিই জানেন।

মৈথিলি স্বামীর দেহত্যাগের সংবাদে দুঃখিত হইলাম। যদিও আমি তাঁহার পরিচিত ছিলাম না, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে অনেক শুনিয়াছিলাম। ভালই হইয়াছে। 'কলিযুগে ধন্যাঃ নরাঃ যে মৃতাঃ।' ইহা খুব সত্য কথা বলিয়াই ক্রমে ধারণা হইতেছে।

পতিতপাবনের একখানি পত্র কিছুদিন পূর্বে আমি পাইয়াছিলাম। হরিপদ শিক্ষকতা-কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম।

সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা। গীতা পাঠ করিয়া তুমি স্বাভাষ্টলাভ কর—এই প্রার্থনা।

সৎসঙ্গ অতীব দুর্লভ।...'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি' ইত্যাদি শ্রীভগবান্ বলিয়াই রাখিয়াছেন। ভোগেই সকলের চিত্ত ধাবিত হয়; সংসার ছাড়িতে কে চায়? মতলব —সব সুখভোগ, দুঃখ না হয়। কিন্তু এটা মনে আসে না যে, দুঃখ-সংভিন্ন সুখ কখনই সম্ভব নয়। মহামায়ার এমনি মায়া, কিছুতেই চৈতন্য হ'তে দেয় না। তুমি গীতার ধ্যান অভ্যাস করিও। যাহা পড়িবে, তাহাই মনে মনে আলোচনা করিবে—উঠতে, বসতে, খেতে, শুতে সর্বদাই। তা হ'লে গীতার মর্ম হৃদয়ে প্রস্ফুরিত হবে, তাহাতেই শান্তি পাবে। সেবা করিলে মেওয়া মিলিবে, ইহা অতি ঠিক—অবিসম্বাদী সত্য। চতুর্দশ অধ্যায়ের গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে পারিলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে গুণাতীতের লক্ষণ, তাহার উপায় ইত্যাদি বেশ পরিষ্কারভাবেই বিবৃত আছে।

'মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥'

ইহার কারণও দিয়াছেন—

'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্ অমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥'

অতএব এই চতুর্দশ অধ্যায় উত্তমরূপে অভ্যাস ও ধারণা করিতে পারিলে আর কিছুরই

আবশ্যক হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, চতুর্দশ অধ্যায়ে তাহাই বিভিন্ন প্রকারে বলিয়াছেন। দ্বাদশ অধ্যায়েও 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্' ইত্যাদি অধ্যায় পরিসমাপ্তি পর্যন্ত আবার ঐ উভয় লক্ষণাক্রান্ত ভক্তের কথাই উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আপনার সহিত মিলাইয়া লইবার জন্যই এই সকল লক্ষণ ভগবান পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন জানিবে।

আসৃরানি আমাকেও মজঃফরগড় হইতে এক পত্র দিয়াছিল। আমিও তাহার বাড়ির ঠিকানায় এক জবাব লিখিয়াছি। ১৫ই তারিখে সে বেনারসে আসিবে, ১৯শে তারিখে তাহার কলেজ খুলিবে। তোমার Application-এর কি হইল? বোধ হয় কিছু হইবে না। কারণ আমি শুনিয়াছি, উহারা সমস্ত ঠিক করিয়া পরে advertise করে। গণেশপ্রসাদের এক ছাত্র নাকি ঐ পদে মনোনীত হইয়াছে। আসৃরানি আসিলে তুমি সকল সংবাদ জানিতে পারিবে। এখানকার সকলে একপ্রকার কুশলে আছে। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২)

শ্রীহরিঃ শরণম্ ৺কাশী

শ্রীমান্ গুরুদাস, ২৬।৮।২০

তোমার ২০শে তারিখের একখানি পত্র বহুদিন বাদে পাইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমার শরীর খুব খারাপ যাইতেছে। ৩।৪ দিন হইতে সর্দিজ্বরের মতো হইয়াছে। আজ সর্দি পাকিয়াছে। বোধ হয় এইবার সারিবে। পায়ের বেদনা মধ্যে অতিরিক্ত কষ্ট দিয়াছিল। এখনও খুব কষ্ট দিতেছে। ইচ্ছামত চলাফেরা আর করিতে পারি না, অতিশয় দুর্বল। অরুচি সমভাবেই চলিয়াছে। শরীর খুব কৃশ হইয়া গিয়াছে।

আসৃরানি এখন ভাল আছে। কখন কখন আমার নিকট আসিয়া থাকে। আমি দু-একবার মাত্র তাহার বাসায় গিয়াছিলাম। ইচ্ছা থাকিলেও আর পারিয়া উঠি না। তাহাদের কলেজে যে-সব কাজ খালি ছিল, তাহা পূর্ব হইতেই স্থির হইয়াছিল। সেখানে আর কাহারও প্রবেশ সম্ভবপর নহে। আমি তাহাকে তোমার পত্রের কথা বলিয়াছি। হরিপদর নিকট হইতে এক পত্র পাইয়াছিলাম। উত্তর দিয়াছি। আর পত্র পাই নাই।···

'অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্‌গীতে ভবদ্বেষিণীম্।' ইহা হইতে ভবরোগ শান্তি হয় নিশ্চয়। তিলক-প্রণীত 'গীতারহস্য' আমি পড়িয়াছি—বাংলায় নয়, হিন্দীতে। মাধব সাপ্রে অনুবাদ করিয়াছেন। তিলক নিরপেক্ষ বিচার করেন নাই, ইহাই আমার ধারণা। যাহা হউক, খুব পরিশ্রম করিয়াছেন ও সময়ের উপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

Progress অল্প অল্পই হইয়া থাকে এবং সেইরূপ হওয়াই ভাল। Environment নিজে create করতে হয়। ক্রমে হয়।

জ্ঞান না হইলে অনাসক্ত হওয়া যায় না সত্য, কিন্তু অনাসক্ত হইবার অভ্যাস করা যাইতে পারে, এবং দীর্ঘকালের অভ্যাসে যদি উহা আন্তরিক হয়, তাহা হইলে অনাসক্তির উদয় আপনি

হইয়া থাকে। আর কর্ম করিয়া তাহার ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে, তাঁহারই প্রীতির জন্য পরে তাঁহারই জন্য কর্ম করিতেছি—ভালরূপে ধারণা করিতে পারিলে ভগবানে ভালবাসা হয়, ইহাই ভক্তি। মা সন্তানের জন্য কত কষ্ট করেন। সদাই তাহার সুখ-সুবিধার জন্য কত প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা কর্ম বলিয়া তাঁহার একবারও মনে হয় না। ঐরূপ করিয়াই মার সুখ এবং সেইজন্য উহা কর্ম নয়, ভালবাসা। ঈশ্বরে এই ভালবাসা হইলেই তাহাকে ভক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি। ভগবানকে যদি ভালবাসা যায়, তাঁহাকে যদি আপনার হইতে আপনার বোধ হয়, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হয়, কারণ ভগবানই আমাদের প্রাণের প্রাণ ও আত্মার আত্মা।

আমাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী

শ্রীতুরীয়ানন্দ

[**মন্তব্য :** নিম্নলিখিত পত্র-দুইখানি পূজ্যপাদ হরি মহারাজের স্বহস্তলিখিত না হইলেও তাঁহারই নির্দেশ ও ভাব অনুযায়ী লিখিত বলিয়া এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল।]

(৩)

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথঃ শরণম্ ৺কাশীধাম

প্রিয় গুরুদাসবাবু, ৯।১২।২১

পরম পূজনীয় মহারাজ আপনার ২৯।১১ তারিখের বিস্তারিত পত্রে আপনার গীতানুশীলন ও মনও একটু একটু করিয়া সহিষ্ণু হইতেছে জানিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। মহারাজ এখনও স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছেন না, বিশেষতঃ পায়ের neurotic অসহ্য বেদনায় দিবারাত্র সমানে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। শীত যত পড়িবে, ততই বেদনার বৃদ্ধি হইয়া তাঁহাকে যন্ত্রণা দিবে। সকাল-বৈকালে একটু হাঁটিয়া থাকেন। এখন হোমিও ঔষধ চলিতেছে, এখনও কোন উপকার দর্শায় নাই। গত মারাত্মক অসুখের পর হইতে চক্ষে ছানি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, উহা নাকি advanced stage-এ না আসিলে কোন প্রতিকার নাই। চক্ষু ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য coloured চশমা ব্যবহার এবং চক্ষে মধু দেওয়া হইতেছে। আপনাদের ওখানে খাঁটি পদ্মমধু পাওয়া যায় কি? সুবিধা হইলে কিছু পাঠাইলে খুব উপকারে আসিবে। মহারাজের পড়াশুনা ও লিখা সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। সুতরাং আপনাকে স্বয়ং পত্র লিখিতে পারিলেন না। আপনার প্রশ্নের মীমাংসা আমাকে বলিয়া দিলেন। আমি প্রকাশ করিতে পারিলাম কিনা সন্দেহ।

'সংন্যস্য' অর্থ সমর্পণপূর্বক। কি রকম সমর্পণ করিতে হইবে, শ্রীভগবান্ তাহাই এই শ্লোকে বুঝাইয়া বলিতেছেন। 'সর্বকর্মাণি'—লৌকিক বা বৈদিক যাহা কিছু কর্ম অনুষ্ঠান করিবে (৯ম অধ্যায়ে—'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ, যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্'—যাহা বলিয়াছেন)। তৎ সমস্তই চেতনা—বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা 'ময়ি'—ঈশ্বরে 'সংন্যস্য' সমর্পণপূর্বক কর্মফলের সিদ্ধির দিকে মন না দিয়া 'মৎপরঃ'—আমি যে বাসুদেব জগদীশ্বর-রূপ শ্রেষ্ঠ সর্বাশ্রয় বা পুরুষার্থ তাহাতে বুদ্ধি অর্পণ কর এবং বুদ্ধিযোগ-সমাহিত বুদ্ধি-যুক্ত হইয়া (ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগমুপাশ্রিত্য) সতত চিত্তকে ভগবদ্‌ভাব বা প্রেমে আপ্লুত কর। 'আমি তোমারই হইলাম।'—আপনি যেমন লিখিয়াছেন—প্রভুর কার্যে ভৃত্য যেমন বা

যন্ত্রের ন্যায়। 'ময়ি' প্রকৃতি হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতি তো জড়। তার আবার কর্ম কি? শ্রীভগবান্ 'অহং', 'মম', 'ময়ি' প্রভৃতি স্বপক্ষে ব্যবহার করিতেছেন এখানে। আর জগদীশ্বর সগুণ নির্গুণ—দুই-ই। এখানে অজ্ঞান বা অহংকার দূর করিবার জন্য বলিতেছেন। কারণ পরশ্লোকেই বলিতেছেন—'মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।' আর বিপক্ষে বলিতেছেন—'অর্থ চেৎ ত্বমহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।' গীতাখানি আদি অন্ত পড়িয়া দেখিলে আমরা পাই যে, অর্জুন মোহগ্রস্ত হইয়া ধর্ম উপেক্ষা করায় সন্ন্যাস-ধর্মে যে আস্থা বাড়িয়াছিল এবং সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া বন্ধু-বান্ধব-বধজন্য পাপ আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাই শ্রীভগবান্ শরণগ্রহণরূপ কর্মের ব্যবস্থা করিয়া সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন। সুতরাং এখানে সর্বকর্ম-সন্ন্যাস মনে করা উচিত নহে, পরন্তু আপনার ব্যাখ্যানুযায়ী ভাবের কোন ব্যাঘাত বা গোলমাল ঘটে না।

'ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু'—ইত্যাদি যে উক্তি আছে, তাহা তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দবল্লী ২য় অধ্যায়ে পাইবেন ও ব্যাখ্যা উহার শাঙ্কর ভাষ্যে পাইবেন। বাংলায় আবশ্যক হইলে সীতানাথ তত্ত্বভূষণকৃত উপনিষদের ২য় ভাগে পাইবেন। সুতরাং এখানে আর ব্যাখ্যা দিলাম না।

মহারাজের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবেন। এখানকার আর আর সংবাদ ভাল। আশা করি আপনি ভাল থাকিতেছেন। আমাদের ভালবাসাদি জানিবেন। ইতি— —

(৪)

ওঁ শ্রীগুরুঃ শরণম্ ৺কাশী সেবাশ্রম

প্রিয় গুরুদাসবাবু, ১৭।১২।২১

আপনার পত্র পূজনীয় হরি মহারাজকে শুনানো হইয়াছে, এ-বিষয়ে তাঁহার সহিত সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। মোট কথা, তিনি আপনার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। তবে এইটুকু মাত্র বলিলেন যে, কৃষিকাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা আপনাদের শারীরিক অবস্থাতে কিছু প্রতিকূল হইবে, অন্য কোন প্রকার Home industry শিখিয়া লইলেই চলিবে। তিনি বিশেষ ক'রে এই কথা বললেন যে, 'প্রথমটা তো বেরিয়ে পড়ুক, তারপর অন্য বিষয় দেখে শুনে নেওয়া চলবে।' বার বার তিনি এই শ্লোকাংশ আবৃত্তি করতে লাগলেন, 'স্বগৃহাৎ তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্।' প্রথম একটা decisive step নিতে পারলে তারপর পথ আপনা হতেই সাফ হয়ে আসে। প্রথমটা নিশ্চয় ক'রে একটা কিছু করাই শক্ত। আমার যতটা মনে হ'ল, তাতে তিনি এই অভিমতই প্রকাশ করলেন যে, প্রথমটা বেরিয়ে পড়ে তারপর অন্য সব সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া; নতুবা সব বন্দোবস্ত ক'রে পরে বেরিয়ে আসাটা প্রায়ই হয়ে উঠে না।

আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য করিবার ৺কাশী খুব অনুকূল স্থান বলিয়াই আমার মনে হয়, পূজনীয় হরি মহারাজও সে-বিষয়ে কোন আপত্তি করেন নাই। আপনার সংকল্পটাকে খুব দৃঢ় ক'রে তাকে যথার্থ কাজের দিকে শীঘ্র এগিয়ে নিয়ে আসার কথাটাই তিনি বেশী ক'রে বললেন। স্থান নির্বাচন বা mode of living—এ-সব বিষয়ে তিনি ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন না। সেগুলি সব গৌণ।

এদিককার সকল সংবাদই ভাল। পূজনীয় হরি মহারাজ পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। অন্যান্য উপসর্গ অনেকটা কম। একটু একটু বেড়াচ্ছেন। বৈকালে তাঁহার কাছে অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠ হচ্ছে। আপনি তাঁহার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবেন।··· ইতি— —

কবি বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সর্বোপরি উপনিষদের ঋষি-কবিগণের উত্তরাধিকারী কবি বিবেকানন্দ। তাঁহার কবিতার পদে পদে বিদ্যমান শান্তরসোত্তীর্ণ শুভ্র জ্ঞানের বিদ্যোতন; তাঁহারই ভাষায়—
'ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ।' [১]

নির্বিকল্প সমাধিলব্ধ জ্ঞান, ঔপনিষদ অদ্বৈত-জ্ঞানের শান্তভাব তিনি ছড়াইয়া দিয়াছেন তাঁহার অধিকাংশ কবিতার ছন্দে, পরিণত করিয়াছেন অপূর্ব রসে—

'Know these are but the outer crust—
All space and time, all effect, cause,
I am beyond all sense, all thought,
The witness of the universe !'[২]

অনুবাদ :

দেশ আর কাল, আর কার্য ও কারণ,
এ-সকলি হয় মাত্র বহিরাবরণ।
ইন্দ্রিয়-মনের পারে মোর অবস্থান।
আমি দ্রষ্টা এ বিশ্বের, সাক্ষী সে মহান্!

'Not two or many, 'tis but one,
And thus in me all one's I have,
I cannot hate, I cannot shun
Myself from me,—I can but love !'[৩]

অনুবাদ :

নহে দ্বৈত, নহে বহু, অদ্বৈতের ভূমি,
একত্রে মিলিত তাই সকলই আমায়।
ভেদ ঘৃণা নাহি মোর, নাহি ভিন্ন আমি,
থাকি আমি মগ্নমাত্র প্রেমে ······।

'From dream awake, from bonds be free
Be not afraid —this mystery,
My shadow cannot frighten me !
Know once for all that I am He !'[৪]

—ভাঙ্গ মায়া—মুক্ত হও বন্ধন হইতে,
ভীত নাহি হও—বুঝ রহস্য পরম!
নিজ প্রতিবিম্ব মোরে নারে সন্ত্রাসিতে,
জেনো সুনিশ্চয় আমি, 'সোঽহম্ সোঽহম্'!!

এ যেন সেই উপনিষদেরই কবিতা, উপনিষদেরই সুর।

নির্বিকল্প সমাধির পথে স্তরে স্তরে যে জগন্মিথ্যাত্বের ও অদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধি হয়, তাহাই 'প্রলয়' শীর্ষক কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন উপনিষদেরই সুরে :

"নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥···
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হ'ল শূন্যে শূন্য মিলাইল"······

এ শূন্যতা জগতের দিক হইতেই শূন্যতা, নতুবা ইহাই পূর্ণতা। আর এইরূপ চরমতত্ত্বের যে এইরূপ সঙ্গীতসৃষ্টি ও রসসৃষ্টি, তাহা তাঁহার কবিত্বের বিস্ময়কর নিদর্শন।

'The Song of the Sannyasin' (সন্ন্যাসীর গীতি) কবিতায় মুক্তপুরুষের জ্ঞান ও আনন্দানুভূতির সহিত কাব্যপ্রতিভার অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে :

'Wake up the note !
the song that had its birth
Far off, where worldy taint could never reach
In mountain-eaves,
and glades of forest deep ;
Whose calm no sigh for lust
or weatlh or fame
Could ever dare to break ;
where rolled the stream
Of knowledge, truth and bliss
that follows both.'

১ শিবস্তোত্রম্
২ The song of the free
৩ Ibid
৪ Ibid

অনুবাদ :

উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে গান,
হিমাদ্রি-শিখরে উঠিল যে তান
গভীর অরণ্যে পর্বত-প্রদেশে
সংসারের তাপ যেথা নাহি পশে
কাঞ্চন কি কাম কিংবা যশ-আশ
যাইতে না পারে কভু যার পাশ
যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী......

এই কবিতায় ভাষা ভাব ও রসের যে অপূর্ব সমাবেশ, তাহা সত্যই অতুলনীয়।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'আমারই আত্মাকে'[৫] শীর্ষক কবিতায় প্রত্যক্ আত্মার সাক্ষিভাব ও সগুণ—এই দুইটি ভাবই যুগপৎ প্রকাশ পাইয়াছে ছন্দ ও রসের মাধুর্যে। কবি 'আত্মা'-কেই দেখিয়াছেন পথপ্রদর্শক গুরু বা বন্ধুরূপে, আবার নিজের চিরন্তন স্বরূপ, স্থির সাক্ষিরূপে—

'আমি মোর যত কাছে, তার চেয়ে তুমি
আরো কাছে, মাঝে মাঝে
মনের তরঙ্গগুলি উঠিবার আগে
প্রকাশিত করেছ তুমিই।'

'সৃষ্টি'শীর্ষক কবিতায়ও সেই পরমতত্ত্বই সরস ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে—যাহা 'অশব্দম-স্পর্শমরূপমব্যয়ম্', যাহা 'নেতি-নেতীত্যাত্মা'। তিনিই আবার 'সৎ'-শব্দবাচ্য মায়াশক্তি-সমন্বিত জগৎকারণ ব্রহ্ম—যিনি 'বহু স্যাম্' এই ঈক্ষণ বা বাসনার দ্বারা 'জীবেনাত্মনানু-প্রবিশ্য' অসংখ্য 'অহং'রূপ ধারণপূর্বক নাম-রূপের অভিব্যক্তি দ্বারা বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া আছেন। এই বিশ্বরূপ তাঁহারই রূপ—সেই সশক্তি ব্রহ্মেরই রূপ, তাই তাঁহারই কিরণ। 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপং যৎ মূর্তমমূর্তঞ্চেতি।' কিরণ সূর্য হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নয়, একই বস্তু। শক্তিও তাহার কার্য—ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বস্তু নয়, স্বরূপতঃ ব্রহ্মই—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' এ কবিতায় আমরা পাই, সুস্পষ্ট বেদান্তের সিদ্ধান্ত, ছন্দে ও রসে সমৃদ্ধ।

'গাই গীত শুনাতে তোমায়' শীর্ষক কবিতা বিবেকানন্দের তত্ত্বনিষ্ঠ কাব্যপ্রতিভার অতুলনীয় নিদর্শন। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ও রসসৃষ্টিতে ইহার সমকক্ষ কবিতা বিশ্বসাহিত্যে মিলিবে কিনা সন্দেহ। বিবেকানন্দের মর্ম-বাণীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতির অপূর্ব সমাবেশ। এই কবিতায় একসঙ্গে পাই তাঁহার দার্শনিক চিন্তার সিদ্ধান্ত, তাঁহার হৃদয়-মথিত গুরুভক্তি ও প্রেম, তাঁহার সমাধি-কালীন লয়ের অনুভব। 'দাস তব জনমে জনমে,'...'বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।' 'ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত, জপ-তপ সাধন-ভজন, আজ্ঞা তব দিয়েছি তাড়ায়ে;' —এই অহেতুক প্রেমের অভিনব প্রকাশের পার্শ্বেই পাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির আকৃতি—'আছে মাত্র জানাজানি-আশ, তাও প্রভু কর পার।' আবার দেখি ভক্তির চরম আবেগের সহিত যুক্ত তত্ত্বজ্ঞান—'প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর!'

'কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।' আবার সকল আবেগের অন্তে—'এ-সকল সত্য কথা, কিন্তু মানি অতি স্থূল ভাব, তত্ত্বজ্ঞের এ নহে বারতা।'

'সুবিস্তৃত অনন্ত আকাশ মন দেখে···
কেন্দ্র যার অহমহমিতি'

'মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার জড় জীব সেই সমক্ষেত্রে অবস্থিত।'

সেই 'মাণ্ডূক্য-কারিকা'র ধ্বনি—'মনো-গ্রাহ্যমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।'

[৫] To my own soul.

তারপর উচ্চতম অনুভূতির ভূমিতে—

'স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে।
সর্ববৃত্তি মনের যখন
একীভূত তোমার কৃপায়
কোটী সূর্য অতীত প্রকাশ,
চিৎসূর্য হয় হে বিকাশ,
গলে যায় রবি শশী তারা,
শান্ত ধাতু, মন আস্ফালন নাহি করে।
খুলে যায় সকল বন্ধন,
মায়ামোহ হয় দূর।'

সমাধিজ তত্ত্বজ্ঞানের সহিত শরণাগতির অপূর্ব মিলন! তত্ত্বজ্ঞানের পরেও জ্ঞানী তার স্বভাব-সুলভ প্রেমভক্তি, ধ্যান বা সেবাত্মক কর্ম লইয়াই থাকেন। তাই—

'দাস তব প্রস্তুত সতত সাধিতে তোমার কাজ।'

এর পরে কবিতাটিতে আমরা পাই অপূর্ব এক আত্মানুভূতির বিবরণ,যা প্রাচীন যুগে শ্রুত হইয়াছিল অম্ভৃণী বাকের কণ্ঠে 'দেবীসূক্তে', অথবা ঋষি বামদেবের কণ্ঠোদ্ভূত 'অহং মনুরভবম্ সূর্যশ্চ'—এই মন্ত্রে। আবার 'নাসদীয় সূক্তে'র আদিম 'তমঃ'রও অনবদ্য রসোত্তীর্ণ বর্ণন। প্রেমিক ভক্তের যিনি 'তিনি' বা 'তুমি', জ্ঞানের দৃষ্টিতে তিনিই প্রকৃত 'আমি।'—

'আমি বর্তমান।
প্রলয়ের কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার-বুকে
আমি বর্তমান।'

আবার সৃষ্টির আদিতে অবস্থিত সূক্ষ্ম পরমাণুকায় ঈশ্বরও 'আমি'। এখানেও সেই সর্বাত্ম-ভাবের ধ্বনি - ঈশ্বরাত্মভাব।—

'একাকার সূক্ষ্মরূপ শুদ্ধ পরমাণুকায়
আমি বর্তমান।'

শক্তিও আমার বিকার বা বিবর্তমাত্র, অপরমার্থ—'আমি হই বিকাশ আবার।
মম শক্তি প্রথম বিকার,…
আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ-রচনা—
জড় জীব আদি যত,
একা আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ…।'

মহা সৃষ্টি বহুর প্রকাশ, তাহাও ঈশ্বররূপী আমারই লীলা—আমারই নিজ রূপ দর্শনাকাঙ্ক্ষার ফল—

'তদস্য রূপং পরিচক্ষণায়।'

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বিবেকানন্দ যদি কেবলমাত্র কবি ও সাহিত্যিক-রূপেই আত্মপ্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তিনি কবি ও সাহিত্যিক-রূপেই জগদ্‌বরেণ্য হইয়া থাকিতেন। এত গভীর ভাব ও তত্ত্বনিষ্ঠার সহিত এরূপ ছন্দ ও রসসৃষ্টির সমাবেশ শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের উপনিষৎ, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে ও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ব্যতীত আর কোন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি গদ্যাত্মক রচনায় তাঁহার কবিজনোচিত বর্ণনা পাঠকের মনে অনির্বচনীয় রসের সৃষ্টি করে। হৃষীকেশের গঙ্গার অপূর্ব বর্ণন, সমুদ্র ও বেলাভূমির বর্ণন অচিরেই পাঠকের হৃদয়কে সেই পরিবেশের মাঝে উপস্থিত করাইয়া অনির্বচনীয় রস আস্বাদন করায়। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি গবেষণামূলক প্রবন্ধেও রসের প্রাচুর্য সর্বত্রই বিদ্যমান। তত্ত্বনিষ্ঠার সূক্ষ্মতা ও দৃঢ়তায়, ভাব-সম্পদের প্রাচুর্যে, ছন্দের বৈচিত্র্য ও নবীনতায়, রসের বিশুদ্ধতা ও সুখাস্বাদ্যতায় বিবেকানন্দের কবিতা ও রচনাসমূহ যে অতি উচ্চ স্থান লাভ করিবার যোগ্য, এবং তিনি যে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি—ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

'কথামৃত'কার 'শ্রীম'

শ্রীশান্তশীল দাশ

অমৃতলোকের সন্ধান পেয়েছে যে,
ভাগ্য যে তার নহে অতি সাধারণ ;
প্রণম্য সে তো প্রাকৃতজনের কাছে,
চরণে তাহার নতি করি নিবেদন।

অমৃতলোকের যাত্রী যে-মহাজন,
আরো বরেণ্য, আরো শ্রদ্ধেয় যে সে ;
ভক্তি, শ্রদ্ধা, দীনতায় নত হয়ে
প্রণাম আমার জানাই তার উদ্দেশে।

অমৃততীর্থে এসে যে করেছে পান,
তার ভাগ্যের পরিমাপ করা যায় !
বিস্ময়ে থাকি হতবাক্ হয়ে চেয়ে,
শত কুসুমের অঞ্জলি দিই পা'য়।

আকণ্ঠ পান করেছ সে-অমৃত,
ধন্য করেছ আপন জীবনখানি,
সেই অমৃত দিয়ে গেছ ঘরে ঘরে—
তোমার চরণে কী অর্ঘ্য দেব আনি ?

'দর্শন' না 'দরশন' ?

শ্রীপঞ্চানন ঘোষ

পাণ্ডিত্যের পণ্ড তর্ক করি,
শাস্ত্র পুঁথি যায় তত বাড়ি।
ভাব ও ভাষার আড়ম্বরে,
নিকট সে চলে যায় দূরে।
মীমাংসার পথে জটিলতা,
'দর্শনে' দুর্বোধ্য করে তথা,
মায়া-মরীচিকা ফেলে জাল,
ব্যর্থতায় কেটে যায় কাল।

কিছুক্ষণ না পাইয়া মা'য়
শিশু হয় পাগলের প্রায়।
পরম প্রশান্তি 'দরশনে,'
মাতৃক্রোড়ে থাকে খুশী মনে।
সারল্যের কাতর আহ্বান,
তর্কশাস্ত্র না রাখে সন্ধান।
মনোমন্দির ফাঁকা সেথা,
ভজন-পূজন সবই বৃথা ?
'দরশন' নাহি হ'লে হায়,
'দর্শন' যে দুর্বোধ্যই রয় !

'শ্রীম'-সকাশে

শ্রীশান্তিকুমার মিত্র

জনৈক ভক্ত ৫০নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে স্কুল-বাড়িতে আসিয়া দেখেন, 'শ্রীম' একতলায় একখানি বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট হইয়া অপর একজন ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। ভক্তটি মঠে গিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও গুরুদর্শন না হওয়ায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীম। গুরুস্থানে গিয়ে, গুরুদর্শন না ক'রে ফিরে আসাটা ঠিক হয়নি। একজন জগন্নাথ দর্শন করবে ব'লে পঞ্চাশ মাইল রাস্তা হেঁটে শ্রীমন্দিরে গিয়ে, সাত দেউড়ি পার হয়ে সস্তায় ফেরবার গাড়ি পেয়ে দর্শন না করেই ফিরে এসেছিল। এটাও ঠিক সেই রকম হ'ল। একটু অসুবিধা হয়তো হ'ত ; কিন্তু পরমার্থ-লাভ,—সে কি অমনি হয়? গুরুই তো সব।

ভক্তটির মনে বড় অশান্তি, সাধন-ভজন সাধ্যমত করেন, কিন্তু বিশেষ কোন উপকার না পাওয়ায় ইতিপূর্বে 'শ্রীম'কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রাণায়াম কি কুম্ভকের দ্বারা মন স্থির করিয়া গভীর ধ্যান হইতে পারে কিনা? 'শ্রীম' তখন তাঁহাকে শ্রীগুরুর আদেশ-মত কাজ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আজ ভক্তটি পুনরায় সেই প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন, 'আমার বোধ হয় কিছু হবে না।'

শ্রীম। 'ন শ্রোষ্যসি, বিনঙ্ক্ষ্যসি।' গুরু কিংবা গুরুস্থানীয় ব্যক্তি যা বলেন, তাঁদের কথা শুনতে হয়। না শুনলে অকল্যাণ হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ঐ রকম বলেছিলেন। তাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—সবই দেখতে পান। বিকারের রোগী বলে, 'এক জালা জল খাব'। তোমার এক কাঁচ্চা বুদ্ধি নিয়ে জেনে ফেলেছ যে, তোমার কিছু হবে না, তা হ'লে তুমি নিজেই তো সিদ্ধপুরুষ। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারের স্তূপ সব জমে রয়েছে। সেগুলি পরিষ্কার না হ'লে কি ক'রে হবে? এই সব সংস্কারমুক্ত হ'তে হবে। শ্রীগুরুসঙ্গে—সাধুসঙ্গে মন স্থির হ'লে, তাঁর শরণাগত হয়ে প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে তাঁর নাম করতে পারলে তবে তাঁর কৃপায় এ-সবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আর কুম্ভক করা—নিজের গুরুর আদেশ না নিয়ে ঐ সব করতে গেলে বিপদ আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'ব্যাকুল হয়ে তাঁর জন্য কাঁদলে কুম্ভক আপনি হয়।'

এতক্ষণে চারতলার ছাতে আসিয়া পূর্বোক্ত ভক্তটির সহিত আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম। যাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছ, তাঁকে শক্ত ক'রে ধরে থাকো। তাঁকে বলো, তিনি তোমার ইহকাল পরকাল, জন্ম-জন্মান্তর ধরে রয়েছেন। তাঁর উপর বিশ্বাস হারিও না। স্বামীজী বলতেন, 'গুরুকা দ্বারমে কুত্তাকা মাফিক পড়া রহো।' গুরু তো মানুষ নন, গুরুতে যে মানুষ-বুদ্ধি করবে, তার কিছুই হবে না। গুরু অহেতুক-কৃপাসিন্ধু। শ্রীভগবান্‌ই জগতের মঙ্গলের জন্য শক্তি সঞ্চার করতে গুরুরূপে আসেন। গুরুকরণ যখন হয়েছে, তুমি তো তাকিয়া পেয়ে গেছ, ঠেস দিয়ে ব'সো—

এপাশ ওপাশ। এবারে সব ভার তাঁর উপর ছেড়ে দাও। তিনিই সব করবেন, তুমি শুধু তাঁর আদিষ্ট কর্ম কর। মনে অস্থিরতা আসা ভাল। এটি তাঁর কৃপা। যদি কিছু নাই হয়, মনে কর যে, অনেক জন্ম তো এমনিই গেছে, নয় আর একটা জন্মই যাক। কিন্তু সত্যই কিছু হবে না—তা নয়, এবার জীব উদ্ধারের জন্য যিনি এসেছিলেন, এমন বিরাট শক্তিমান্ পুরুষ, অবতার হয়ে আর কখনও এসেছেন কিনা জানি না। তবে সব কিছুই সময়সাপেক্ষ। পার্ষদ যাঁরা—সর্বত্যাগী, তাঁরই বিরাট শক্তি, ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ। এ-সব এখন না বুঝলেও পরে বুঝবে। শ্রীগুরুসঙ্গে ও সাধুসঙ্গে চৈতন্য হবে, পবিত্রতা আসবে, তাঁর নামে রুচি হবে, আর তাঁর নামেতেই মন স্থির হয়ে সমাধিস্থ আপনিই হবে। নাম, নামী আর নামদাতা এক। তাঁর নামই মহামন্ত্র।

এইবার পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ স্বামীর জনৈক গৃহী-ভক্ত আসিয়াছেন, শ্রীম তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

ভক্ত। মহাশয়! মঠে শুনলাম আপনার শরীর খারাপ। আপনি এ অবস্থায় একতলা থেকে চারতলা পর্যন্ত ওঠানামা না ক'রে একতলায় কি দোতলায় একখানা ঘরে থাকলে ভাল হয়।

শ্রীম। চারতলায় খোলা ছাত দেখা যায়। উপরে অনন্ত আকাশ, সর্বদাই অনন্তের সঙ্গে যোগ, যেমন হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় এলে হয়। আকাশের দিকে চাইলে মন যেন অনন্তে মিশে যায়। তুমি কেমন আছ?

ভক্ত। আমার কথা আর কি ব'লব! গুরুদেব কি আমায় ভুলে গেলেন? এখন আর আগেকার মতো জপতপ করতে পারি না, সর্বদাই মনে অশান্তি। সকাল-সন্ধ্যায় বসি বটে, কিন্তু মন সে-রকম তন্ময় হয়ে যায় না। আর বয়সও তো হ'ল, এখন না হ'লে আর কবে হবে?

শ্রীম। মহাপুরুষদের কৃপা কিংবা ভালবাসা ঠিক যেন আঠার মতো আঁকড়ে ধরে থাকে। তাঁর শরীর নেই ব'লে কি তিনি নেই। গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ তো শুধু শরীরের সঙ্গেই নয়। সকাল-সন্ধ্যায় শ্রীগুরুর মূর্তির সামনে ধূপ ধুনা দিয়ে তাঁর গলায় একটা মালা পরিয়ে দেবে। ভোরবেলায় জপ করবার আগে শ্রীগুরুর স্তব করবে আর সর্বদা মনে করবে যে, তিনি তোমায় ধরে রয়েছেন। তবে তো মন স্থির হবে, পবিত্র হবে!

ভক্ত। সংসারে থেকে মন স্থির রাখা বড় শক্ত। কখন কখন মন বড় চঞ্চল হয়, আর যেন বশে আনতে পারি না।

শ্রীম। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে ঐ কথা বলেছিলেন, আর 'অভ্যাসযোগেন' মনকে বশে আনতে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। চারাগাছ ফুটপাথে পুঁতে লোহার জাল দিয়ে ঘিরে দেয়, পাছে গরু-ছাগলে খেয়ে ফেলে, কিন্তু সেই গাছই বড় হ'লে হাতি বেঁধে দিলেও কোন ক্ষতি করতে পারে না। মনটাও এই রকম। মনের সে অবস্থা হ'লে মনই শ্রীগুরুর কাজ করে।

অপর ভক্ত। মহাশয়, সাধুরা কত জপ-ধ্যান করেন, আমরা তো কিছুই করি না, সময়ও নেই। আমাদের কি করা উচিত?

শ্রীম। ভাল কাজ ক'রে মন্দ কর্মের ফল সব নষ্ট করতে হয়, যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, আর তাঁর শরণাগত হ'তে হয়।

প্রকৃতিতে যেটুকু কর্ম আছে, আপনাকে অকর্তা জেনে, কর্মফল ত্যাগ ক'রে সেইটুকু কর,—এই নিষ্কাম কর্মেই চিত্তশুদ্ধি হয়। তবে সাধন-ভজন না থাকলে ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম করা প্রায় অসম্ভব। সাধুদেরই দেখ না, সব ত্যাগ ক'রে গিয়েও famine relief, flood relief, রোগীর সেবা—এ-সব প্রথম অবস্থায় করতে হয়—এতে চিত্তশুদ্ধি হয়। সাধুরা কিন্তু এ-সবও করছে, আবার জপ-ধ্যানও করছে, ওটি না করলে 'আমি কর্তা'—এই বোধ এসে পড়বে, আর তা হলেই কর্মে জড়িয়ে পড়বে।

—তবে সংসারেই থাকো আর সন্ন্যাসই কর, নিয়মমত সাধন-ভজন করা একান্ত দরকার, নয়তো বড় বিপদ। জপ-ধ্যান নিষ্কাম হয়ে করতে পারলে মনের ময়লা কাটে, আর তাঁর কৃপাতে তাঁকে লাভ করা যায়। তবে সব সময় হয়তো জপ-ধ্যান করা যায় না—তখন শ্রীগুরুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ, নচেৎ পূর্বে যে-সব সাধুসঙ্গ হয়েছে, সেগুলির চিন্তা—খাওয়ার পর গরু যেমন জাবর কাটে, সেই রকম। সংসারে কর্ম যাই কর—মনটা তাঁর দিকে ফেলে রাখতে চেষ্টা করতে হয়। দেখ না, বুড়ো হয়েছি, এখন আর মঠে যেতে পারি না। ভক্তেরা মঠে গেলে তাঁদের মুখে মঠের কথা শুনি, আর এই সব চিন্তা করি, ঠাকুরের চিন্তা করি। প্রকৃতি-ভেদে কর্ম আছেই। তাই শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'আমায় স্মরণ কর, আর তোমার প্রকৃতিতে যুদ্ধ রয়েছে—যুদ্ধও কর। 'মামনুস্মর, যুধ্য চ।' আর সময়ের কথা? ইচ্ছা থাকলে কি সারা দিনের মধ্যে দু-তিন ঘণ্টা সময়ও সাধন-ভজনে দেওয়া যায় না? সংসার কি সব সময়ই তোমায় হাত চেপে রেখেছে? Lame excuse (বাজে ওজর)। 'Where there is a will, there is a way'—ইচ্ছা থাকলে উপায়ও হয়। সাধুসঙ্গ মাঝে মাঝে বড় দরকার—তবে তো সাধন-ভজন করতে ইচ্ছে হবে।

গদাধর আশ্রম হইতে জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারী।

শ্রীম। আসুন, আসুন, আসুন। সাধুরা যখন আসছেন, বুঝতে হবে তিনি এখনও আমাদের ভোলেননি।

সন্ন্যাসী। আজ সকালে গঙ্গার ঘাটে অনেকটা ঠাকুরের মতো দেখতে একজনকে দেখেছি, কিন্তু তিনি মৌনী, কিছু বললেন না। সেই থেকে তাঁর কথা মনে হচ্ছে। ভাবলাম, আপনার মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনব ও আপনাকে দর্শন ক'রব—তাই আসা।

শ্রীম। আর একজনেরও এক সময়ে ঐ রকম হয়েছিল। অনেক কাল আগে, তখন ঠাকুরের শরীর গেছে, ঠাকুরের একজন ভক্ত—হাওড়া পোলের কাছে, অনেকটা ঠাকুরের মতো চেহারা, এক সাধুর মুখে রোদ লাগছে দেখে, ছাতাটা খুলে যাতে মুখে রোদ না লাগে, এমন ক'রে দাঁড়ালেন। সাধুটি হাসলেন। 'আমি কি আপনার জন্য কিছু ক'রতে পারি?'—জিজ্ঞাসা করায় সাধুটি বললেন, 'কাশীর একখানা টিকিট পেলে কাশী যেতাম।' টিকিট কেটে তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে দিলে তিনি ভক্তটির হাতে একটি পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ দিয়ে বললেন, 'এটা রাখ্, তোর ভাল হবে।' ভক্তটি কি জানি কেন, সেটি হাত পেতে নিলেন। পরে হাওড়ার পোল পার

হওয়ার সময়, তাঁর মনে হ'ল—ঠাকুর তো আমার ভাল মন্দ, মঙ্গল অমঙ্গল, জীবন মরণ, ইহকাল পরকাল—সব ভারই নিয়েছেন, তবে হাত পেতে কেন ওটি নিলাম, তা হ'লে তাঁর উপর আমার সে বিশ্বাস কোথায়? তাই গঙ্গায় সেটি ফেলে দিলেন। তিনি যখন রাতদিন দেখছেন, রক্ষা করছেন, তখন ও-সব আর কেন?

—প্রথম যখন তাঁর দর্শন পাই, মনে হ'ল—যেন সাধারণ মানুষ; তারপর যত দিন যেতে লাগলো, দেখি—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, মায়ার আবরণে যেন ঢাকা, আমাদের মনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

—তিনি বেদবিধির পার। কৃপা ক'রে শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাই। তিনি চলে গেছেন কত বৎসর হ'য়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মনে হয়—এ-সব ঘটনা যেন কাল হয়ে গেছে! তিনিই সব। ট্রামের ট্রলি, যতক্ষণ তারের সঙ্গে যোগ—গাড়ি, আলো, পাখা সবই ঠিক চলছে, ট্রলিটাকে নিচু ক'রে দাও তো কিছুই আর চলবে না। এখন বেশ দেখতে পাচ্ছি, তিনি হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, আর শেষটুকু তিনিই নিয়ে যাবেন।

এতক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছে। সমস্ত দেবদেবীর 'ফটো'র সামনে আলো দেখানো হইতেছে। একটা পাখি ডিমে তা দিতেছে—এই ছবিটির কাছে আসিয়া শ্রীম বলিতেছেন, 'কাজ যাই করা যাক, পুরো মনটা থাকবে তাঁর উপর। দেখুন এই পাখিটা, পুরো মনটা রয়েছে 'তা' দেওয়ার কাজে, চোখদুটি খোলা থাকলেও বাহিরের জিনিসে মন নেই, কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তাঁর কৃপাতে মনকে যদি এই রকম ক'রে তাঁতে লাগিয়ে রাখা যায় তো হয়। জপতপ, সাধন-ভজন, বিবেক-বৈরাগ্য—এ-সবের উদ্দেশ্য হ'ল তাঁকে পাওয়া। কিন্তু সে-রকম ব্যাকুলতা একাগ্রতা ও তন্ময়তা না এলে তিনি ধরা দেন না।'

সন্ন্যাসী। যেমন শ্রীমতী রাধারানীর হয়েছিল?

শ্রীম। হ্যাঁ, ঐ রকম। তাঁর চিন্তা করতে করতে নিজের দেহবোধ পর্যন্ত থাকবে না। তবে সাধারণ জীবের অতটা হওয়া তো সম্ভব নয়। শ্রীরাধিকা মহাভাবময়ী। শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন তো হয়েছে, তাঁকে কি আমরা বুঝতে পারি? মহাশক্তি স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েছিলেন। তাঁর ভাব চাপবার ক্ষমতাও ছিল অসীম। যেন অন্তঃসলিলা ফল্গু। উপরে বালির স্তর, নিচে যে জল আছে, বোঝবার জো নেই। এদিকে 'রাধু রাধু' করছেন, হেঁসেলে রান্না করছেন, ঘর নিকুচ্ছেন, আবার ওরই মধ্যে হয়তো পা-দুখানি মেলে ব'সে আছেন, বাইরের কোন হুঁশ নেই, সমাধিস্থ।

এইবার সকলে ধ্যান-জপ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারীটি গান গাহিতেছেন, 'গাওরে জয় জয় রামকৃষ্ণ-নাম।' 'শ্রীম' হাত জোড় করিয়া গান শুনিতেছেন। পরে আবার গান হইতেছে: 'রামকৃষ্ণ, শ্যাম, শ্যামা, শিবে ভেদ ভেব না আমার মন।' গান শুনিতে শুনিতে 'শ্রীম'র চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া চোখ মুছিতেছেন ও বলিতেছেন, 'তিনিই সব। তাঁকে চিন্তা করলে সব দেব-দেবীরই চিন্তা করা হয়।'

বিশুদ্ধানন্দ-স্মৃতি

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা

বোধহয় সেটা ১৯২৭ খৃঃ। রাঁচিতে ঐ সময় চমৎকার একটি 'ভক্তগোষ্ঠী' গড়ে উঠেছিল আমাদের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের অজস্র কৃপা আর স্বামী বিবেকানন্দের সুদুর্লভ সঙ্গ লাভ আমাদের মধ্যে অনেকের ভাগ্যেই ঘটেছিল। বছর কয়েক আগে ১৯১৩ খৃঃ জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা লাভ করেছি। 'বাঘে-খেকো ছেলে' ব'লে মা যে আমাকে বিশেষভাবে চিনতেন, সেই আনন্দে আমি তো প্রায় আত্মহারা হয়েই থাকতাম।

আমাদের নিজের গ্রাম বার্থায় ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯০৬ খৃঃ। বরিশালের ঐ গ্রামে একটা বাঘ উপদ্রব করছিল একবার। অনেক গরু-ছাগল গিয়েছিল বাঘটির পেটে। একদিন গ্রামের লোকজন সব জড় হয়ে লাঠি-সড়কি নিয়ে টিন পিটিয়ে ঘেরাও ক'রে বাঘটাকে মারবার ব্যবস্থা করেছে। দর্শকদের মধ্যে আমিও ছিলাম। হঠাৎ বাঘটা সরাসরি এসে পড়ে আমার ওপর। বলা বাহুল্য গ্রামবাসীদের তৎপরতায় প্রাণে বেঁচে গেলাম, কিন্তু বাঘের সস্নেহ আলিঙ্গনের চিহ্ন আজও ধারণ ক'রে আছি নিজের দেহে। জয়রামবাটীতে প্রসঙ্গ-ক্রমে ভক্তদের মধ্যে এই গল্পটি মুখে মুখে ফিরতে ফিরতে শ্রীশ্রীমায়ের কানে গিয়ে পৌঁছয়। সেই থেকে শ্রীশ্রীমা আমাকে আদর ক'রে 'আমার বাঘে-খেকো ছেলে' ব'লে উল্লেখ করতেন।

রাঁচিতে সেই সময় বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ এলেন। রাঁচির মোরাবাদী পাহাড়ের ঠিক নিচে শ্রদ্ধেয় ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্ঞানদা দেবী রামকৃষ্ণ মিশনকে সাত-আট কাঠা জমি দান করেছিলেন। তার ওপর ছোট খোলার চালের একটি জীর্ণ ঘর ছিল। আর মাসিক দান বরাদ্দ ছিল পঁচিশ টাকা। এই সম্বল নিয়ে স্বামী সারদানন্দজীর নির্দেশে বিশুদ্ধানন্দজী মিশনের কাজ শুরু করলেন। তাঁর একক শক্তি অনুযায়ী তিনি যথাসাধ্য পরোপকার করতেন। গরীব রোগীদের হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিতেন। তাঁর আশ্রমে ধর্মালোচনা করতেন।

অতি শান্ত এবং অমায়িক ভাব ছিল তাঁর। সমবয়সী বলেই বোধহয় আমার সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে উঠতে দেরি হ'ল না একটুও। আমাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার পর ডুরাণ্ডা দুর্গাপূজা-হলে একটি ক্লাস খুললেন। সেখানে উপনিষদ্ আর গীতা পড়াতেন। অতি চমৎকার ব্যাখ্যা করতেন। ক্রমে যা হয়, বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের অনুরাগীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। সরকারী উকিল ছিলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের মুখে তাঁর নাম ছিল গোপালবাবু। তিনি উদ্যোগী হয়ে চাঁদা তুলতে লাগলেন—টাকাটা সিকেটা যে যা দেন। তা ছাড়া গোপালবাবু ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান। চেষ্টাচরিত্র ক'রে ওই চাঁদার টাকা দিয়ে গোপালবাবু মিশনের ওই ঘরখানার সংস্কার করালেন। খোলার ছাদের তলাটা টিনের সিট দিয়ে বাঁধিয়ে দিলেন। আর মিশনের সারা বছরের খরচের চাপটা যোগাড় ক'রে দিলেন।

তখন উৎসব-টুৎসবে আমরা একাই একশো। ঠাকুরের কি মায়ের জন্মদিন কিংবা কোন পুজো পার্বণে এক ঘটি দুধ নিয়ে গিয়ে হাজির হতাম আশ্রমে। তারপর চলতো পুজো আর ভোগ রান্নার আয়োজন। আয়োজন আর কি—একটু তরকারি আর পায়েস আর খানকতক লুচি। আমি বেলে দিতাম আর বিশুদ্ধানন্দজী ভাজতেন। ব্যস, হয়ে গেল। প্রসাদ পেতাম আমরা দু-জন কখনো-সখনো বাইরের দু-একজন ভক্ত। ওর বেশী সামর্থ্য কোথায়! আর আজ 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্'!

বড় আনন্দে কাটতো দিনগুলো। তখন সপ্তাহান্তে (week-end ticket) তিন টাকা পৌনে সাত আনা দিলেই কলকাতা যাতায়াতের টিকিট পেতাম—বৃহস্পতি থেকে মঙ্গলবার। আসতাম বেলুড় মঠে। সেখানে দেখা হ'ত মঠের সাধুদের সঙ্গে, আলাপ-আলোচনা হ'ত ধর্মপ্রসঙ্গে। আবার ফিরে আসতাম রাঁচিতে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত আমি মোরাবাদী আশ্রমেরই বাসিন্দা ছিলাম। শিবলাল সাহু ব'লে এক ভক্ত মিশনের জন্য আরও দুখানি ঘর তুলে দিলেন—সঙ্গে একটি বারান্দা আর বাথরুমও তৈরী ক'রে দিলেন। তখন বিশুদ্ধানন্দজীর অনুরাগীর সংখ্যা প্রচুর।

রাত্রি তিনটের সময় বিশুদ্ধানন্দজী শয্যা ত্যাগ করতেন। বেলা আটটা পর্যন্ত নিজের ঘরে বসে ধ্যান করতেন। সকাল আটটা সাড়ে আটটার সময় ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন, ঠাকুরঘরে প্রণাম ক'রে সামান্য কিছু খেয়ে জল খেতেন। তারপর বেড়াতে যেতেন একটু। ফিরে এসে চিঠিপত্র লিখতেন। দুপুরবেলা সবার সঙ্গে খেতে বসতেন। খুব সামান্য পরিমাণে খেতেন। দুপুরে এক ছটাক চালের ভাত আর রাত্রে এক ছটাক আটার রুটি। এই পরিমাণের ব্যতিক্রম দেখিনি। মাস্টার মশায়ের জীবনযাত্রার ধারা আহারাদিতে অনুসরণ করতেন। খেতে বসে নানা কথা নিয়ে আলোচনা করতেন। কত সহজ প্রসঙ্গ শুরু ক'রে গভীরতার মধ্যে ডুবে যেতেন। একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন তো বৃন্দাবনে বঙ্কুবিহারীর ঝাঁকি দর্শন হয় কেন?' নানা জনে নানা উত্তর দিলেন। কোনটাই ওঁর মনঃপূত হ'ল না। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি বলেন নগেনবাবু?' আমি বললাম, 'মহারাজ, শুনেছি—একবার এক পরম ভক্ত বঙ্কুবিহারীর অপরূপ রূপ দর্শন করতে করতে সেইখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন।' উনি ঘাড় নাড়লেন—'উঁহু তাও নয়। ক্ষণিকের দর্শন—তারপরেই দর্শনলাভে বঞ্চিত হয়ে দর্শনাতীতকে হৃদয়ে স্থাপন করা। তারপর সেই রূপের অনুচিন্তনে গভীর ধ্যানে ডুবে যাওয়া।' প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সঙ্গে উনি যেন নিজে সেই প্রত্যেকটি স্তরকে অন্তরে উপলব্ধি ক'রে গভীর ধ্যানে ডুবে গেলেন। আমরা গভীর বিস্ময়ে ওঁর সেই ধ্যানস্থ মুখের দিকে চেয়ে রইলাম!

খেয়ে ওঠার পর দুপুরবেলাটা পড়াশুনার মধ্যে দিয়ে কেটে যেত। বিকেলবেলা বাইরের সব লোকজন আসত। কত লোক যে আসত দূরদূরান্তর থেকে—কোন কোন দিন দুশো তিনশো লোক আসত। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভগবৎপ্রসঙ্গে নানা আলোচনা হ'ত। একদিন সন্ধ্যাবেলা একটা গরম চাদরে পা-টা সব মুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছি। হঠাৎ বিশুদ্ধানন্দজী তাঁর নিজের এক জোড়া মোজা এনে আমায় বললেন, নগেনবাবু এই

মোজা-দুটো আপনি পরুন। আমি তো মহাকুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম, তাঁর পরা মোজা আমি পায়ে দিতে পারি! নিলাম না। আজ কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গিয়েছে। এখন মনে হয়, কত সহজেই নিতে পারতাম, উনি যদি একবার বলতেন, 'মাথায় একবার ঠেকিয়ে নিন, তা হলেই হবে।' তা হ'লে নিশ্চয়ই নিতাম। ঢাকার নীরদ মজুমদারের মাকে শ্রীশ্রীমা এই রকম বলেছিলেন।

খাবার পর এঁটো হাত ধোবার জন্য শ্রীশ্রীমা জল এগিয়ে দিয়েছিলেন। ভক্ত কুণ্ঠিত হয়ে বলেছিলেন, 'মা, আপনার দেওয়া জলে এঁটো হাত ধোব?' মা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তাতে কি! প্রথমে একটু মাথায় ঠেকিয়ে নাও।'

মা চট ক'রে কি রকম সমস্যার সমাধান ক'রে দিলেন! সত্যিই তো, ভক্তিই সব। গঙ্গার জলে স্নান করতে নামার আগে একটু জল মাথায় ছিটিয়ে নিতে হয়। তারপর সে জলে পা ঠেকালেও কিছু দোষ নেই।

১৯৫২ পর্যন্ত বিশুদ্ধানন্দজী মোরাবাদী আশ্রমে ছিলেন। তখন প্রতি বছর পুজোর সময় যেতেন কাশীতে। উৎসবের সময় বেলুড়ে, নয় জয়রামবাটীতে। রাঁচিতে যতবারই গিয়েছি, প্রত্যেকবারই তাঁর সঙ্গ লাভ করেছি। ১৯৪৭ খৃঃ স্বামী অচলানন্দজী যখন দেহরক্ষা করলেন, স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী তখন মিশনের সহাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। যেখানেই থাকি না কেন, বিজয়ায় এবং পয়লা বৈশাখে প্রণাম জানিয়ে চিঠি দিয়েছি—আশীর্বাদী উত্তর পেয়েছি। ১৯৬০-এর ৺বিজয়াতে কাশীর ঠিকানায় যে চিঠি দিয়েছিলাম, কেন জানি না, তার উত্তর পাইনি। সেজন্য পয়লা বৈশাখ আর চিঠি দিইনি। বিশুদ্ধানন্দজী আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনে এসে খোঁজ নিলেন, 'বার্নপুরের সেই বুড়োটি বেঁচে আছেন তো?' বেঁচেই তো আছি। তাই খবর শুনে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ওঁর সদানন্দ সঙ্গলাভ শেষবারের মতো হ'ল!

সাধুসঙ্গ বড় প্রয়োজন; ঠাকুরের ভাষায় 'ঘড়ি মেলানো'। ঠাকুরের কাছে যাঁরা যেতেন, তাঁরা তাঁর কথা শুনে বুঝতে পারতেন, তাঁদের মনটা বিষয়ের দিকে কতটা এগিয়েছে, আর ভগবানের দিক থেকে কতটা পিছিয়ে এসেছে। সাধুর কাছে গেলে সেইটে বুঝতে পারা যায়—অর্থাৎ তখন বিবেক জাগে। বিবেক ব'লে দেয়—আমরা ভগবানের কাছ থেকে পিছিয়ে এসেছি। এই জন্য মন-ঘড়িটিকে মিলিয়ে নিতে হয়, regulate ক'রে নিতে হয়। সাধুসঙ্গ হুঁশ এনে দেয়। সাধুসঙ্গে ভক্তি বিশ্বাস, অনুরাগ লাভ হয়, এমনকি ভগবান পর্যন্ত দর্শন হয়। এখনই হয় না কেন? কারণ, মন বিষয়ে বাঁধা পড়েছে। আমার নিজের জিনিস অপরের কাছে বাঁধা পড়েছে। মন তো আমার হাতে নেই। কাজেই কি ক'রব? সাধুসঙ্গে সেই বন্ধকী মন নিজের কাছে ফিরে আসে।

—'সৎপ্রসঙ্গ'

শতাব্দীর নমস্কার

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

শতাব্দীর মহালগ্নে করি নমস্কার—
হে বীর বিবেকানন্দ, নর-অবতার।
সপ্তর্ষির জ্যোতির্বর্ত্মে অখণ্ডের ঘরে
মহাতপে মগ্ন ছিলে বরতনু ধ'রে।
জীবত্বঃখে হিয়া তব উঠিল কাঁদিয়া—
তাই কিগো ছুটে এলে ধেয়ান ত্যজিয়া!
রামকৃষ্ণ-অবতারে নবভাষ্য দিতে
নররূপী নারায়ণ এলে কি ধরাতে?
কেহ তোমা চিনে নাই সেই যুগক্ষণে—
গুরু তব টেনে নিল হৃদয়-গহনে।
তোমায় দরশ লাগি ব্যাকুল পরানে
কত নিশি কাটিয়াছে বিনিদ্র নয়ানে!
সৌর লোকে উল্কা-সম মুহূর্তে জ্বলিয়া—
চলে গেলে দিব্য ধামে মরত ভুলিয়া।
রেখে গেলে ধরাতলে অমিয়-বারতা।
জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-পথে অপূর্ব সমতা।
ভারতের দৈন্য-ত্বঃখে সদা চিন্তা-লীন—
যাপিয়াছ কত নিশি নিমেষ-বিহীন।
বনের বেদান্তে আনি সংসারের মাঝে
ছড়াইয়া দিলে তারে প্রতিদিন কাজে।
পাশ্চাত্যে শোনালে তুমি ভারতের বাণী,
কম্বুকণ্ঠে 'অভীঃ'-মন্ত্রে জাগালে ধরণী:
'শিবজ্ঞানে জীবসেবা,
দীনরূপী নারায়ণে পূজা,
ঈশ্বর সাক্ষাৎ সেই
বৃথা তারে অন্য কোথা খোঁজা।'
বিশাল হৃদয়ে তব দীন-ত্বঃখী তরে
স্নেহের পীযূষ-ধারা রেখেছিলে ধরে।
সেই কথা স্মরি হিয়া কাঁদে বার বার
শতাব্দীর মহালগ্নে করি নমস্কার।

শ্রীজ্ঞানেশ্বরের 'অমৃতানুভব'

[সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বঙ্গানুবাদ]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এই গ্রন্থে শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ শুদ্ধ অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন।

১২১২ শকে শ্রীজ্ঞানেশ্বর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা 'জ্ঞানেশ্বরী'[১] বা 'ভাবার্থদীপিকা' মারাঠী ভাষায় 'ওবী' ছন্দে রচনা করেন। কথিত আছে, যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও গুরুদেব শ্রীনিবৃত্তিনাথের চরণে এই গ্রন্থ সাদরে অর্পণ করেন, তখন গুরু নিবৃত্তিনাথ তাঁহাকে অখণ্ড সর্বব্যাপী নিত্য স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ আপন বুদ্ধি ও অনুভব অনুসারে রচনা করিতে আদেশ করেন। দশ প্রকরণে বিভক্ত 'অমৃতানুভব' বা 'অনুভবামৃত' গুরুর আজ্ঞায় রচিত সেই গ্রন্থ। ইহাও 'ওবী' ছন্দে রচিত এবং ইহার মোট শ্লোকসংখ্যা ৮১২।

'জ্ঞানেশ্বরী'তে যে অদ্বৈত-তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়, যাহা 'চাঙ্গদেব-পাষষ্টী'তে সংক্ষেপে জীবের ব্রহ্মৈক্য-স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, 'অমৃতানুভবে' সেই অদ্বৈত-তত্ত্বের বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। জীব ও জগৎ যে তত্ত্বতঃ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে, ইহাই এই গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

(১)

প্রথম প্রকরণে শ্রীজ্ঞানদেব জগতের মূল জনক-জননী—আদিকারণ নিরুপাধিক শিব-শক্তিকে বন্দনা করিতেছেন। ইঁহারা উভয়ে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া নিরন্তর অদ্বৈত আত্মতত্ত্বই প্রকট করিতেছেন, দম্পতির মধ্যে একজন (পুরুষ) যখন আপন স্বরূপে লীন হইয়া থাকেন, তখন প্রকৃতির আভাস হয়, আর পুরুষ জাগিয়া উঠিলে সংসারের নিবৃত্তি হয় এবং শুদ্ধ স্বরূপমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। যিনি সূক্ষ্ম ও অক্রিয়ভাবে আপন স্বরূপানন্দে বিরাজমান এবং সূক্ষ্মরূপেই সর্বব্যাপক, তিনিই প্রকৃতির শোভায় বিশ্বরূপ ধারণ করেন। দ্বৈতভাবের বিলাস হইলেও মূলতঃ এক অদ্বৈত আত্মতত্ত্বই প্রকট হইয়া আছে। এই শিবশক্তি হইতে অভিন্ন শিবশক্তি-রূপ ভূতেশ ও ভবানীকে জ্ঞানদেব বন্দনা করিতেছেন।

(২)

দ্বিতীয় প্রকরণে গুরু-প্রশস্তি করা হইয়াছে। এই গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ একটি আশ্চর্য ব্যাপার। যিনি সংসারতাপ-পীড়িত জীবের দুঃখনিবৃত্তির জন্যই শরীর ধারণ করেন, যাঁহার অপাঙ্গ-দৃষ্টিতেই আত্মজ্ঞানলাভ হয় এবং বন্ধনও মোক্ষরূপ ধারণ করে, যাঁহার কৃপাতুষার-বৃষ্টিতে অবিদ্যার নাশ হয়, সেই গুরু ও তাঁহার শিষ্যের মধ্যে কোন ভেদ নাই। সূর্যের সম্মুখে যেমন রাত্রি টিকিতে পারে না, জলে পড়িলে যেমন লবণের আকার ঘুচিয়া যায়, কর্পূরের অলংকার যেমন অগ্নির কাছে গেলে আর অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি সদ্গুরুর কাছে শিষ্যের নামরূপের অবসান হয়। বন্দনা করিতে গেলেও তিনি বন্দনীয় হন না! 'গুরু' ও 'শিষ্য' এই দুই শব্দের অর্থ এক শ্রীগুরুই; গুরুই নিজে শিষ্য ও গুরু হইয়া বিলাস করেন।

১ 'জ্ঞানেশ্বরী' জ্ঞানদেব বা জ্ঞানেশ্বর-কৃত গীতার ব্যাখ্যা। গত কয়েক বৎসরে উদ্বোধনে ইহার কয়েক অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।—উঃ সঃ

(৩)

তৃতীয় প্রকরণে বাণীর ঋণশোধের কথা বলা হইয়াছে :

'পরা'দি বাণী জীবের অবিদ্যারূপ বন্ধনের নাশ করিয়া মোক্ষসাধনের উপযোগী হয়, পরন্তু অবিদ্যার সহিত বাণীও আপন স্বরূপের নাশ করিয়াই মোক্ষের উপযোগী হয়। এই 'পরা', 'পশ্যন্তী', 'মধ্যমা' ও 'বৈখরী' বাণী তত্ত্বজ্ঞানরূপ দীপ জ্বালায়। এই জ্ঞানও বন্ধন-স্বরূপ, নিত্যজ্ঞানরূপ আত্মা যখন সত্ত্বগুণাশ্রয়ী জ্ঞানের প্রভায় আপনাকে 'সোঽহম্' বলিয়া জানিতে পারে, তখন সেই জ্ঞানই বন্ধন হয়। এই জ্ঞান জ্ঞানাতীত আত্মস্বরূপে বিলীন হইলেই মোক্ষ হয়।

(৪)

চতুর্থ প্রকরণে জ্ঞানেশ্বর জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। নিদ্রার নাশ হইলে যেমন তৎসাপেক্ষ জাগৃতিও চলিয়া যায়, এবং তখন কেবল স্বরূপভূত জাগৃতিই থাকে, তেমনি অজ্ঞানকে নাশ করিয়া জ্ঞানও নাশপ্রাপ্ত হয়। তখন জ্ঞানাজ্ঞান গ্রাস করিয়া শুধু স্বরূপভূত শুদ্ধজ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত করা যায়, কিংবা অজ্ঞানের দ্বারা মলিন হয়, শুদ্ধ-ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান এরূপ নহে—জ্ঞানাজ্ঞান-বিবর্জিত শুধু জ্ঞানমাত্র। আর এই শুদ্ধজ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব নাই; 'আকাশ কি আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে? অগ্নি কি আপনাকে জ্বালায়? দৃষ্টি কি আপনাকে দেখিতে পায়? স্বাদ কি আপনাকে চাখিতে পারে? নাদ কি আপনার ধ্বনি আপনি শুনিতে পায়? সূর্য কি আপনাকে প্রকাশিত করে?' তেমনি ব্রহ্ম-স্বরূপ শুদ্ধজ্ঞান জ্ঞাতৃত্ব-বিনাই কেবল জ্ঞান-মাত্র। নির্মল আকাশের ব্যাপ্তি মেঘের দ্বারা ঢাকিয়া গেলেও আকাশ যেমন আপন স্বরূপে তেমনিই থাকে, সেইরূপ আত্মাও 'অস্তিত্ব' 'নাস্তিত্ব' বিনাই স্বরূপে স্বয়ংসিদ্ধ।

(৫)

পঞ্চম প্রকরণে 'সচ্চিদানন্দ' এই পদত্রয়ের বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। 'সৎ' 'চিৎ' 'আনন্দ' রূপে পরমাত্মাকে বর্ণনা করিলে তাহাতে সর্বধর্মবিবর্জিত পরমাত্মার মধ্যে স্বগত-ভেদ হইতে পারে—এই প্রকরণে সেই আশঙ্কা নিরসন করা হইয়াছে :

'সৎ' 'চিৎ' 'আনন্দ'—এই তিনটি পদ ভিন্ন দেখাইলেও শব্দাতীত-স্বরূপ পরমাত্মার মধ্যে তাহাদের সংজ্ঞার লোপ হইয়াছে। সত্তা আনন্দ ও জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, জ্ঞানও সত্তা আনন্দ হইতে ভিন্ন নয়, যেমন অমৃত হইতে উহার মাধুর্য পৃথক্ করা যায় না। 'অসৎ' 'জড়' ও 'দুঃখের' নিরাকরণের জন্যই শ্রুতিতে 'সচ্চিদানন্দ আত্মা' এই শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে—পরমার্থতঃ ইহা ব্রহ্মবাচক নহে। যাঁহার তেজে বাণী জড়পদার্থকে প্রকাশ করে, সেই বাণী কি স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মাকে প্রকাশিত করিতে পারে? যিনি স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁহার প্রমেয়ত্ব নাই; প্রমাণও নাই। আত্মবস্তু তত্ত্বতঃ জ্ঞানরূপ, সুতরাং এখানে 'জ্ঞেয়' 'জ্ঞাতা'—এই ভেদ কোথায়? এই জন্যই বলা যায় যে, 'সচ্চিদানন্দ' এই শব্দ বস্তুবাচক নহে। 'সৎ' 'চিৎ' 'আনন্দ'—এই তিন পদ জ্ঞাতাকে আপন শুদ্ধ পরমাত্মরূপ দেখাইয়া মৌনের মার্গ অবলম্বন করে, অর্থাৎ 'সচ্চিদানন্দ' শব্দের নিবৃত্তি হয়। 'সৎ' 'অসৎ' কল্পনার সহিত নাশপ্রাপ্ত হইলে, 'চিৎ' 'অচিৎ'কে লইয়া অস্ত গেলে, 'সুখে'র সহিত 'অসুখ' চলিয়া গেলে—সাপেক্ষিক অন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, শুধু নিরুপাধিক, আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাই

থাকেন। বোধবৃত্তি যেখানে পশ্চাদপসরণ করে, অনুভব পঙ্গু হয়, সেখানে শব্দের কি উপযোগিতা?

(৬)

ষষ্ঠ প্রকরণে জ্ঞানদেব আত্মতত্ত্ব-নিরূপণে শব্দের অনুপযোগিতার কথা বলিয়াছেন:

লৌকিক জগতে স্মারক-হিসাবে শব্দের উপযোগিতা আছে। ইহা বিস্মৃত বস্তুকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু পরমাত্মবস্তু স্মরণ-বিস্মরণের বিষয় নয়। সুতরাং পরমার্থতত্ত্ব-নিরূপণে শব্দ সম্পূর্ণ অনুপযোগী। স্বয়ংবেদ্য পরমাত্মার শব্দের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। বলা হয়, শব্দ অবিদ্যা নাশ করিয়া আত্মস্বরূপের 'অনুভব' আনয়ন করে। পরন্তু আত্মা জ্ঞানরূপ, নিত্য-প্রকট, সেখানে অজ্ঞানের লেশমাত্র নাই, সুতরাং শব্দ কী প্রকট করিবে? নানাভাবে বিচার করিয়া তিনি বলিয়াছেন, অবিদ্যার অস্তিত্বই নাই—ইহা 'অভাব'-স্বরূপ, শব্দদ্বারা অবিদ্যা-নাশের চেষ্টাও তেমনি ব্যর্থ। আত্মা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, স্বতঃসিদ্ধ; শব্দ আত্মাকে আত্মজ্ঞান দিতে পারে না। এই ভাবে শব্দখণ্ডন হইল।

(৭)

সপ্তম প্রকরণে অজ্ঞান খণ্ডন করা হইয়াছে। 'অন্ধকার'কে আশ্রয় করিয়া যেমন খদ্যোতের দীপ্তি, তেমনি 'অভাব'-রূপ মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া অজ্ঞান অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান আছে বলিয়া প্রতীতি হয়, স্বপ্নের মহিমা যেমন স্বপ্নেই, অন্ধকারের মান অন্ধকারেই, তেমনি অজ্ঞানের মধ্যেই অজ্ঞানের গরিমা। নানা-প্রকারে বিচার করিয়া তিনি বলিতেছেন: জ্ঞান-স্বরূপ আত্মার মধ্যে অজ্ঞান থাকিতে পারে না, অজ্ঞান ঘনীভূত অন্ধকার-স্বরূপ আর আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ—এ-দুইটির একত্র অবস্থিতি সম্ভব নয়। স্বপ্ন ও জাগৃতি, স্মরণ ও বিস্মরণ, শীত ও তাপ, তমঃ ও সূর্যের প্রকাশ, মৃত্যু ও জীবন যদি একত্র থাকিতে পারে, তবেই আত্মা ও অজ্ঞান একস্থানে থাকিতে পারে। অজ্ঞান কার্যানুমেয় নয়; প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারাও অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না,—অজ্ঞান যদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ না হয়, তবে অজ্ঞানের অস্তিত্ব কোথায়? এই ভাবে অজ্ঞানের খণ্ডন হইল। অজ্ঞান 'দৃশ্যানুমেয়' এই যুক্তিরও খণ্ডন করিয়াছেন। এই নাম-রূপাত্মক জগৎ জ্ঞানরূপ পরমাত্মারই প্রকাশ, জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত চিন্মাত্র পরমাত্মাই তাহার অধিষ্ঠান। এই দৃশ্যজগৎ তাহারই বিলাস। তথাপি এই পরমাত্মবস্তুর মধ্যে দ্বৈতের রেখা পড়ে না। গ্রন্থকর্তা ইহাকে 'অদ্বৈত-বিস্তার' বলিয়াছেন।

ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানস্বরূপ দ্রষ্টা বলিয়া তাহাতে দ্রষ্টৃত্ব সম্ভব নয়, ব্রহ্মবস্তু স্বতই অদ্রষ্টা, স্বয়ংসিদ্ধ এবং স্বয়ংপ্রকাশ - নিত্য স্ফুরদ্রূপ। 'স্বয়ং দর্শন-স্বরূপ হওয়ায় আত্মস্বরূপেই সর্বপ্রকার দৃশ্য-দ্রষ্টাদিভাবের আভাস হয়, পরন্তু আত্মার নিজাত্মভাব নষ্ট হয় না।' 'আত্মরাজ' আপন তেজেই আপনাকে অসংখ্যপ্রকার দেখিতেছেন—স্বয়ং নানা নামরূপাত্মক দৃশ্যভাবে বিলাস করিতেছেন। এই সম্পূর্ণ জগৎই 'বস্তুপ্রভা' অর্থাৎ চৈতন্য-স্বরূপেরই প্রকাশ—এই জগদ্রূপ ব্রহ্মবস্তু হইতে বস্তুকেই পাওয়া যায়—নিরপেক্ষ, স্বরূপভূত জাগৃতির ন্যায় যাহা জ্ঞানাজ্ঞানাতীত এক অদ্বৈত, চিদ্রূপ অবস্থা।

(৮)

অষ্টম প্রকরণে গ্রন্থকার অজ্ঞানের সাপেক্ষ জ্ঞানের খণ্ডন করিতেছেন:

আত্মস্বরূপে অজ্ঞান নাই, সুতরাং তাহার সাপেক্ষ জ্ঞানের কল্পনাও নাই—'জ্ঞান অজ্ঞানে

আসিলে অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং তৎসাপেক্ষ জ্ঞানও চলিয়া যায়; জ্ঞানাজ্ঞান দুই-ই মিথ্যা হয়'—এই ভাবে জ্ঞানাজ্ঞানরূপী দিবসরাত্রি গ্রাস করিয়া চিদাকাশে জ্ঞানরূপী সূর্যের উদয় হয়।

(৯)

নবম প্রকরণে জীবন্মুক্ত-দশার সুন্দর ও অপূর্ব বর্ণনা রহিয়াছে :

চিদ্‌গগনে চিদাদিত্যের উদয় হইলে 'ভোগ্য' ও 'ভোক্তা', 'দৃশ্য' ও 'দ্রষ্টা'—এই দ্বৈত ভাব অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মের মধ্যে একত্ব লাভ করে। নব নব অনুভবের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলেও 'অক্রিয়' সেই ব্রহ্মবেত্তার সে-সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হয় না। ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বিষয়ের দিকে দৌড়াইলেও দৃষ্টি যেমন দর্পণে পড়িতে না পড়িতেই পশ্চাতে ফিরিয়া দৃষ্টিকেই দেখে, তেমনি ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বিষয়ে না গিয়া স্ব-স্বরূপে ফিরিয়া আসে; ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার বন্ধ হয়, পরন্তু নিত্য স্বয়ংসিদ্ধ চৈতন্যের অনুভব হয়। লৌকিক দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় বিষয় সেবন করে, পরন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে কোন সম্বন্ধই হয় না। নির্বিষয় আত্মভাব উৎপন্ন হইলে 'বিষয়' ও 'বিষয়ী' এই দুই ভাবাতীত জ্ঞানী পুরুষ এক অনির্বচনীয় স্থিতিতে অবস্থান করে। দৃশ্য-দ্রষ্টা, ভোগ্য-ভোক্তারূপ দ্বৈত ব্যবহার হইতে থাকিলেও অদ্বৈত-স্থিতির বিলোপ হয় না, পরন্তু অভেদ ব্রহ্মভাবের বিকাশ হয়। এই স্থিতিতে জ্ঞানী-ভক্তের এক সহজ উপাসনা চলিতে থাকে! এই উপাসনার উৎপত্তি নাই, লয় নাই—ইহা আপনারই সঙ্গে পূর্ণভাবে বিরাজমান; এই উপাসনা-সুখের উপমা এক আনন্দ বা সুখরূপ বস্তুর দ্বারাই দেওয়া যায়। এই সহজ ভক্তিযোগ জ্ঞানাদির বিশ্রাম স্থান।

(১০)

দশম প্রকরণে জ্ঞানেশ্বর মহারাজ স্বানুভব-রূপ পকান্নের দ্বারা ভোজ 'অনুভবামৃত' গ্রন্থ-রূপে পরিবেশন করিয়া গ্রন্থ-সমাপ্তি করিতেছেন :

এই চরাচর বিশ্বই ব্রহ্মরূপ, অন্যকিছু নহে, ইহাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বুঝানো যায় না—সর্ববিশ্বই শিবস্বরূপ। অন্তিম শ্লোকে বলিতেছেন, এই 'অনুভবামৃত'-গ্রন্থ আনন্দোৎসব সদৃশ—সর্ববিশ্ব এই আনন্দ উপভোগ করুক।

উপসংহার

সুললিত প্রাকৃত 'ওবী' ছন্দে রচিত এই গ্রন্থে শ্রীজ্ঞানদেব অদ্বৈত-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। ছন্দোমাধুর্যের অনুবাদ যদিও সম্ভব নয়, তথাপি অনুবাদে এই গ্রন্থের রচনা-চাতুর্যের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। অনুবাদটি যথাসম্ভব মূলানুযায়ী করা হইয়াছে। অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতে শ্রীজ্ঞানদেব যে উপমা-শৈলীর বিস্তার করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় এবং তাহাই এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। এই অনুবাদ-গ্রন্থ মারাঠী ভাষায় অনভিজ্ঞ বঙ্গের সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইলে আপন শ্রম সার্থক মনে করিব।

'অমৃতানুভবে'র বঙ্গানুবাদ

বন্দনা বা মঙ্গলাচরণ

যদক্ষরমনাখ্যেয়মানন্দমজমব্যয়ম্।
শ্রীমন্নিবৃত্তিনাথেতি খ্যাতং দৈবতমাশ্রয়ে ॥১॥

—নির্বিকার শব্দাতীত আনন্দস্বরূপ অজ অব্যয় শ্রীনিবৃত্তিনাথ নামে খ্যাত পরমপুরুষ দেবতাকে আমি আশ্রয় করিতেছি।

গুরুরিত্যাখ্যয়া লোকে সাক্ষাৎ বিদ্যা হি শাংকরী।
জয়ত্যাজ্ঞা নমস্তস্যৈ দয়ার্দ্রায়ৈ নিরন্তরম্ ॥২॥

—ইহলোকে সকল বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সাক্ষাৎ স্ফুরদ্রূপ (আজ্ঞারূপ) শাঙ্করীবিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা); তাঁহারই জয় হউক, সেই দয়ালু ব্রহ্মবিদ্যাকে আমি নিরন্তর নমস্কার করি।

সার্ধং কেন চ কস্যার্ধং শিবয়োঃ সমরূপিণোঃ।
জ্ঞাতুং ন শক্যতে লগ্নমিতি দ্বৈতচ্ছলান্ মুহুঃ ॥৩॥

—শিবের সহিত সমরূপিণী শক্তি নিরন্তর লগ্ন হইয়া থাকায় দ্বৈতাভাসের জন্য কে কাহার সহিত সংযুক্ত বা কে কাহার অর্ধ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

অদ্বৈতমাত্মনস্তত্ত্বং দর্শয়ন্তৌ মিথস্তরাম্।
তৌ বন্দে জগতামাদ্যৌ তয়োস্তত্ত্বাভিপত্তয়ে ॥৪॥

—এইভাবে যাঁহারা নিরন্তর অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব পরস্পর স্পষ্ট দেখাইতেছেন, সেই (ব্রহ্মস্বরূপ) আত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য জগতের আদিকারণ উভয়কে আমি বন্দনা করি।

মূলায়াগ্রায় মধ্যায় মূলমধ্যাগ্রমূর্তয়ে।
ক্ষীণাগ্রমূলমধ্যায় নমঃ পূর্ণায় শম্ভবে ॥৫॥

—(জগতের) আদি, স্থিতি ও লয়ের কারণ এবং আদি স্থিতি ও অন্তের অভিন্ন মূর্তিস্বরূপ, পরন্তু যাঁহার স্বরূপে আদি, স্থিতি ও অন্ত নাই, —সেই পূর্ণস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করিতেছি।

প্রথম প্রকরণ : শিবশক্তি-সমাবেশ

প্রকৃতি-পুরুষের যথার্থ স্বরূপ-বর্ণন

এইরূপে আমি নিরুপাধিক, জগতের মূল জনক-জননী (কারণ) দেবদেবী (শিবশক্তি)-কে বন্দনা করিতেছি। ১

যিনি আপনার স্বরূপেই (অর্ধনারী-নটেশ্বর-রূপে) একই দেহে, একত্বের অবসান না করিয়া, প্রেমে পূর্ণ হইয়া প্রিয়ের প্রাণেশ্বরী হইয়াছেন। ২ *

প্রেমের আতিশয্যে উভয়ের অঙ্গ উভয়কে গ্রাস করে, পুনরায় (বিলাস শেষ হইলে) গ্রাসমুক্ত হইয়া দ্বৈতভাব প্রকাশ করে। ৩

প্রকৃতি পুরুষ যে একেবারে একই, তাহা নহে; উভয়ের পৃথকৃত্বও প্রমাণ করা যায় না, ইঁহাদের স্বরূপের আকার যে কি প্রকার, তাহা কে জানে? ৪

ইঁহাদের স্বসুখের (স্বানন্দানুরাগের) আবেশ এতই অধিক যে, কৌতুকেও একত্ব-ভাবের অবসান করিতে না দিয়া ইঁহারা একত্র মিলিয়াই দ্বৈতভাব প্রকাশ করেন। ৫

ইঁহারা উভয়ে বিয়োগ (বিরহ)-ভীতির জন্য এই জগতের ন্যায় সন্তান প্রসব (উৎপন্ন) করিয়াও দ্বৈতভাব (পরস্পরের প্রতি প্রেম) নষ্ট হইতে দেন না। ৬

এই চরাচর সংসার তাঁহাদের অঙ্গ হইতেই উদ্ভূত, পরন্তু তাঁহারা (এই জগতের ন্যায়) কোন তৃতীয় পদার্থের কথাই উঠিতে দেন না। ৭

ইঁহাদের উভয়েরই এক সত্তায় স্থিতি, উভয়েই এক প্রকাশের অলঙ্কারে সজ্জিত,

* জো প্রিয়ুচি প্রাণেশ্বরী।
উলথে আবডীচে সরো ভরীঁ।
চারুস্থলী য়েকাহারী। য়েকাংগাচী। ২।

অনাদিকাল হইতে ইঁহারা উভয়েই একত্বেই অতিসুখে অবস্থান করিতেছেন। ৮

(প্রকৃতি-পুরুষের মধ্যে) ভোগের ইচ্ছারূপ যে ভেদভাব দ্বৈত খুঁজিতে গিয়া (তাহা না পাইয়া) লজ্জার আবেশে (সচ্চিদানন্দরূপ) ঐক্যরসে ডুবিয়া যায়। ৯

যে দেবী দেবের মধ্যেই সম্পূর্ণ, যে দেব বিনা তাঁহার স্বামিনীত্বই নাই, কিংবহুনা, উভয়েই পরস্পর উভয়ের উপর নির্ভরশীল। ১০

উভয়ের মধ্যে প্রেমের (মধুরতার) ঐক্য জগতে ওতপ্রোতভাবে ভরিয়া আছে, পরমাণুর মধ্যেও উভয়ে সানন্দে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ১১

পরস্পরের সহযোগিতা বিনা ইঁহারা একটি তৃণও নির্মাণ করেন না, ইঁহারা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের জীবন ও প্রাণ। ১২

পরিবারে শুধু ইঁহারা দু-জনেই আছেন, স্বামী যখন শয়ন করিতে শয্যায় যান (আপনার স্বরূপে লীন হইয়া থাকেন), তখন কর্তব্যপরায়ণা পত্নী (প্রকৃতি) দম্পতিভাবে জাগিয়া থাকেন (প্রকৃতির আভাস হয়)। ১৩

এই দু-জনের মধ্যে একজন (পুরুষ) কদাচিৎ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলে সংসারের নাশ হয়, তখন শুধু স্বরূপমাত্রই অবশিষ্ট থাকে, আর কিছুই থাকে না। ১৪

দু-জনের (প্রকৃতি ও পুরুষের) অঙ্গের (স্বরূপের) লয় হইলে উভয়ে একত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন অর্ধার্ধিভাবে ভেদের প্রকাশ হয়। ১৫ পরস্পর পরস্পরের বিষয় এবং বিষয়ীভূত, এইভাবে উভয়ে উভয়ের মধ্যে আনন্দলাভ করেন। ১৬ স্ত্রীপুরুষ নামভেদে এক শিবত্বই বিরাজমান, সমস্ত জগৎ ইঁহাদের অর্ধার্ধ ভাগে ভরিয়া আছে। ১৭ দুটি কাঠি, কিন্তু শব্দ এক; দুটি ফুল, কিন্তু সুগন্ধ এক; ...ণ, কিন্তু প্রকাশ যেমন এক, ১৮

ওষ্ঠ দুটি—কিন্তু কথা এক, চক্ষু দুটি—কিন্তু দৃষ্টি এক, তেমনি সৃষ্টি মধ্যে উভয়ের (প্রকৃতি-পুরুষের) ব্যাপ্তি থাকিলেও একটিই (শিব) আছেন। ১৯

অনাদি এই প্রকৃতি-পুরুষ যুগল দ্বৈতভাব দেখাইয়া (আপনাদের) সমরসত্ব (একত্ব) অনুভব করিতে থাকেন। ২০

স্বামীর সত্তা বিনা নারী পতিব্রতা হয় না, (আর) প্রকৃতিকে ছাড়িয়া যাঁহার (পুরুষের) সর্বকর্তৃত্ব থাকে না, ২১

পুরুষের যে জ্ঞান ও সত্তা প্রকৃতির মধ্যেও সেই জ্ঞান ও সত্তা, (সেই জন্য) দুটির মধ্যে কে কোন্‌টি, তাহা নির্ধারণ করা যায় না, ২২

গুড় ও তাহার মিষ্টত্ব, কর্পূর ও তাহার সুগন্ধ যেমন ভিন্ন করা যায় না। পার্থক্য (নির্ধারণ) করিতে গেলে যেমন নির্ধারণেরই ক্রিয়া পঙ্গু হয়। ২৩

দীপের সমগ্র দীপ্তি ধরিতে গেলে যেমন দীপকেই হাতে ধরিতে হয়, তেমনি যাঁহার (শিবশক্তির) স্বরূপ নির্ধারণ করিতে গেলে তত্ত্বতঃ শিবেরই প্রাপ্তি হয়। ২৪

যেমন সূর্যের মধ্যেই (তাহার) প্রভা শোভা পায়। প্রভার অধিষ্ঠান সূর্যই। তেমনি ভেদ চলিয়া গেলে শোভাই থাকে। ২৫

কিংবা বিম্ব যেমন প্রতিবিম্বের দ্যোতক, এবং প্রতিবিম্ব বিম্বের অনুমাপক, তেমনি দ্বৈতাভাস থাকিলেও এক (পরমাত্মা)-ই বিলাস করেন। ২৬ সর্বশূন্যের নৈষ্কর্ম্য যে পরমাত্মা, তাঁহাকে যে গৃহকর্ত্রী পুরুষ করিয়াছে (পুরুষত্ব দিয়াছে), সেই স্বামীর বিশেষ সত্তার প্রভাবে যিনি 'শক্তি' হইয়াছেন। ২৭

যে প্রাণেশ্বরীর বিহনে শিবের শিবত্ব টিকিতে পারে না, (তেমনি যে প্রকৃতি) তিনি নিজেই শিবকে ব্যক্ত করিয়াছেন,

(আপনার মধ্যে) শিবকে ধারণ করিয়া আছেন। ২৮

ঐশ্বর্যের ঈশ্বরী, যাঁহার অঙ্গ হইতে এই সংসারের উৎপত্তি এবং যিনি নিজেই এই বিশ্ব রচনা করিয়া তাহার মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ২৯ পতির অরূপত্ব দেখিয়া লজ্জিত হইয়া এই নামরূপাত্মক জগতের ন্যায় একটি বৃহৎ অলংকার আপন অঙ্গের ঐশ্বর্যের দ্বারা নির্মাণ করিলেন। ৩০

ঐক্যের অকাল পড়িল, (প্রকৃতি) সদা সহজ লীলায় বহুত্বের উৎসব দেখাইতেছেন। ৩১

যিনি (প্রকৃতি) আপন অঙ্গ ক্ষীণ করিয়া পতির উৎকর্ষ সাধন করেন (ব্যক্তরূপ প্রকট করেন), যে পুরুষ আপন স্বরূপ সঙ্কোচ করিয়া প্রিয়াকে জগতে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন, ৩২

যাহাকে (প্রকৃতিকে) দেখিবার প্রবল ইচ্ছায় পুরুষের দ্রষ্টৃত্বের ক্ষোভ আসিয়া যায়, তাহাকে না দেখিলে তৎক্ষণাৎ অঙ্গ (অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্বভাব) ত্যাগ করেন। ৩৩

কান্তার সংযোগে এই জগতের ন্যায় উপাধির আবরণ অঙ্গে ধারণ করেন, (তাঁহাতে এই বিশ্বাভাস হয়) আর যাহার বিহনে (মায়ার নাশ হইলে) তাঁহার অঙ্গ আবরণশূন্য হয় (এই জগদাভাসের লোপ হয়)। ৩৪

যিনি আপন স্বরূপানন্দে, সূক্ষ্মভাবে (অক্রিয় ভাবে) বিরাজ করেন, এবং এই সূক্ষ্মরূপেই সর্বব্যাপক হইয়া আছেন, তিনি প্রকৃতির শোভায় বিশ্বরূপ ধারণ করেন। ৩৫

যে প্রকৃতি নানা নামরূপাত্মক বেদ্য জগদ্রূপ বহু প্রকারের পক্বান্ন ভোজন করাইবার জন্য পুরুষকে জাগাইলেন, সেই পুরুষ (জাগিয়া উঠিয়া) পক্বান্নের সহিত পরিবেশনকারিণীকেও আত্মসাৎ করিয়া তৃপ্ত হইলেন (শুদ্ধ পরব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে অবশিষ্ট থাকিলেন)। ৩৬

পতি নিদ্রিত হইলে যিনি চরাচর জগৎ প্রসব করেন, এবং যাঁহার লয় হইলে পতিরও পতিত্ব থাকে না, ৩৭ কান্ত যখন তাঁহার বিশেষরূপ লোপ করেন, তখন তাঁহার 'দোষ' (বিশেষ রূপ) জানা যায় না। (প্রকৃতি ও পুরুষ) উভয়ে দর্পণ-স্বরূপ ; (প্রকৃতির সত্ত্বগুণ হইতে পুরুষের জ্ঞান-স্বরূপের প্রতীতি হয়, পুরুষের সত্তায় প্রকৃতির অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়)। ৩৮

যাঁহার সহিত অঙ্গ-সম্বন্ধের জন্য (শিব) আপনার আনন্দ আপনি ভোগ করেন, আর যিনি না থাকিলে কোন ভোক্তৃত্বই প্রাপ্ত হন না। ৩৯

প্রিয়ার অঙ্গই যে পুরুষের শোভার কারণ, যে প্রিয় (পুরুষ)-ই প্রকৃতির শোভা উভয়রূপ প্রকাশ করেন, এই ভাবে দুই অর্ধ ভাগের (শিব ও শক্তি) যখন সংযোগ হয়, তখন দ্বৈতভাবের বিলাস হয়। ৪০

বায়ুর সহিত যেমন তাহার গতি, স্বর্ণের সহিত কান্তি, তেমনি শিবের সহিত শক্তিকে গ্রহণ করিতে হয়। ৪১

কিংবা কস্তুরীর সহিত যেমন পরিমল (গন্ধ), কিংবা উষ্ণতার সহিত যেমন অনল, তেমনি শক্তির সহিত শিবও অভিন্ন (আলিঙ্গিত)। ৪২ রাত্রি ও দিন যেমন সূর্যের কাছে গেলে (লুপ্ত) হয়, তেমনি (প্রকৃতি ও পুরুষ) এই দুটি সেই সত্য-অধিষ্ঠানে (পরমাত্মায়) গিয়া মিথ্যা (লীন) হয়। ৪৩

আর অধিক কি বলিব ? শিবশক্তি প্রণব অর্থাৎ ওঁকার হইতে উৎপন্ন এই জগতের বৈরী (অর্থাৎ ইঁহাদের স্বরূপ বিচার করিলে এই জগতের অস্তিত্বই থাকে না)। ৪৪

জ্ঞানদেব বলিতেছেন : যথেষ্ট হইল—এই নামরূপাত্মক জগতের ভেদরূপ (দ্বৈতরূপী) 'রস' খাইয়া যে শিবশক্তি একার্থ (পরমাত্ম-তত্ত্ব) প্রকট করেন, তাঁহাদের আমি নমস্কার করি। ৪৫

যে দু-জনের (প্রকৃতি-পুরুষের) আলিঙ্গনের মধ্যে উভয়েই লীন হইয়া যান এবং সর্বরজনীর (অজ্ঞানের) নিবৃত্তি হইয়া শুধু জ্ঞান ( )-স্বরূপ পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। ৪৬

যাঁহাদের (প্রকৃতি-পুরুষের) রূপ নির্ধারণ করিতে গেলে 'পরা'র সহিত 'বৈখরী' বাণীর লয় হয়—যেমন প্রলয়ের জলে সিন্ধুর সহিত গঙ্গা বিলীন হয়। ৪৭

বায়ু যেমন গতি-সহ (ব্যোমের) আকাশের কুক্ষিতে বিলীন হয়, প্রলয়কালের তেজের মধ্যে প্রভা-সহ সূর্য যেমন (লয় প্রাপ্ত হয়), ৪৮

তেমনি যাঁহাদের স্বরূপ বিচার করিতে গেলে দ্রষ্টা ও দর্শন দুই-ই লয়প্রাপ্ত হয়, ঘরে বাহিরে (অন্তরে বাহিরে) যাঁহারা ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, সেই প্রকৃতি-পুরুষকে আমি বন্দনা করি। ৪৯ যে প্রকৃতি-পুরুষের যথার্থ স্বরূপ বিচার করিতে গেলে বেত্তার বেদ্য-সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হয় না, উপরন্ত বেত্তা আপন অঙ্গের (স্বরূপের) নাশ করে, ৫০

তাঁহাদের নমস্কার করিবার জন্য আমি (তাঁহাদের হইতে পৃথক্) অন্য একজন হই, কিন্তু ভেদ করিবার জন্য আমি কি অন্যদিকে যাই? ৫১ অলংকার সোনা হইতে ভিন্ন নহে, উহা সোনাকেই ভজনা করে, উহা সোনাই, আমার (প্রকৃতি-পুরুষকে) নমস্কার করাও তেমনি। ৫২

বাণী দ্বারা বাক্য বলিলে বাচ্য-বাচকের সম্বন্ধ হয়, তাহাতে কি বাণীর ভেদ-দোষ স্পর্শ করে? ৫৩

সমুদ্র ও গঙ্গার মিলনে স্ত্রী-পুরুষ এই নামেরই ভেদ দেখায়, বস্তুতঃ জলের কি দ্বৈত দোষ হয়? ৫৪

প্রকাশ ও প্রকাশ্য দুই-ই সূর্যের মধ্যে দেখা যায়, তাহাতে কি সূর্যের একত্ব নষ্ট হয়? ৫৫

চন্দ্রের বিম্বের উপরই কৌমুদী বিকীর্ণ হয়, তাহা কি চন্দ্র হইতে ভিন্ন? দীপ হইতে কি তাহার দীপ্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়? ৫৬ মোতির প্রভা মোতির উপরেই লাগিয়া থাকে তাহাতে কি তাহার নির্মল শোভা অধিক মাত্রায় বাড়ায় না? ৫৭

প্রণবের (ওঁকারের) তিনমাত্রা দ্বারা (অ, উ, ম) কি প্রণবকে টুকরা করা হয়? 'ণ' কারের (ণ) তিন রেখাদ্বারা কি তাহাতে ভেদ আনয়ন করা হয়? ৫৮

অহো, নিজের একত্বের পুঁজি না হারাইয়া যদি সৌন্দর্য (শোভা) লাভ হয়, তবে জল নিজের তরঙ্গ-রূপ পুষ্পের সুবাস কেন না আঘ্রাণ করিবে? ৫৯ অতএব আমি ভূতেশ ও ভবানী (শিব ও শক্তি)-কে, পৃথক্ না করিয়া বন্দনা করিলাম। ইহাতেই আমার বন্দনা (নমস্কার) শোভা পাইতেছে। ৬০

দর্পণ ত্যাগ করিলে (দর্পণের মধ্যের) প্রতিবিম্ব বিম্বে প্রবেশ করে (বিম্বের সহিত ঐক্য হয়), কিংবা বায়ুর প্রবাহ থামিলে তরঙ্গ (জলে) ডুবিয়া যায়, (জলের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হয়)। ৬১

অথবা নিদ্রা ভাঙিতেই আপনার নিজত্ব-প্রাপ্তি হয়। তেমনি বুদ্ধিত্যাগের দ্বারাই (জীবত্বের উপাধি ত্যাগ করিয়া) আমি দেব-দেবীর (শিব-শক্তির) বন্দনা করিলাম। ৬২

লবণত্বের লোভ ত্যাগ করিয়া লবণ সিন্ধুত্ব লাভ করিল। তেমনি 'অহং' ত্যাগ করিয়া আমি শম্ভু-শাম্ভবী (শিবশক্তি) হইয়াছি। ৬৩

কদলী বৃক্ষের খোলস ত্যাগ করিলে গর্ভাকাশ যেমন আকাশে লীন হয়, তেমনি শিবশক্তি হইতে অভিন্ন যে আমি, তাঁহাদের নমস্কার (বন্দনা) করিলাম। ৬৪

(প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত)

স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাঙালী

শ্রীজয়দেব চট্টোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করিয়া সারা পৃথিবীতে এক বিরাট উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এ উৎসবের আয়োজন অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু বিবেকানন্দের সঙ্গে বর্তমান বাঙালীর কি সম্বন্ধ, তাহা পুনর্বিবেচনা করিবার সময় ও সুযোগ আজ আমাদের দ্বারে উপস্থিত। আজিকার এই উৎসবের মধ্যে সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের জীবনের কি যোগ, তাহা চিন্তা করা অবশ্য প্রয়োজন ও কর্তব্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালীর জীবনে একটি জাগরণ আসে, প্রাতঃস্মরণীয় রামমোহন হইতেই ইহার শুরু, এ-কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাহা জানিলেও বাঙালীর সমগ্র সমাজ-জীবনে ইহার প্রভাব কতটুকু ছিল এবং বাংলার সাধারণ মানুষ ইহা কেমনভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা অনেক সময়েই আমরা ভাবিয়া দেখি না। রামমোহনের সময় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বাঙালার জীবনে যে সাড়া, তাহা প্রধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; আজ দূর হইতে বাঙালীর ভাবজীবনে তাহার বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাইলেও ঠিক সেই সময়ে নিরক্ষর জনসমাজের সহিত তাহার বিশেষ যোগসূত্র আমরা খুঁজিয়া পাই না। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কিন্তু এ যোগসূত্রের অভাব নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে পল্লীবঙ্গের একজন সাধারণ মানুষ। তাঁহার ধর্মজীবন ও সাধনা বাংলা তথা ভারতের জনসাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। রামমোহন ধর্ম-সম্বন্ধে এক পরিবর্তন আনিবার চেষ্টা করিলেও তাহার সহিত সাধারণ মানুষের বিশেষ যোগ ছিল না। এ-কথা খুবই সত্য যে, ভারতীয় তথা বাঙালীরও জীবনের প্রধান সুর ধর্ম। ধর্মকে বাদ দিয়া যে আন্দোলনই আমাদের দেশে আসিয়াছে, তাহা জনসাধারণের চিত্তভূমিতে নামিয়া আসিতে পারে নাই! শ্রীরামকৃষ্ণের নবীন সাধনা বাংলার জনসাধারণের প্রাণের স্বাভাবিক সাধনা অর্থাৎ ইহার মধ্যে কোন তাত্ত্বিক পরীক্ষা বা অন্য কিছু পরিবর্তনমূলক কোন উদ্দেশ্যের সন্ধান আপাতদৃষ্টিতে পাওয়া যায় না, চিরাচরিত বাঙালী হৃদয়ের 'মা'-ডাকের হৃদয়-নিঙড়ানো এক সুরই আমাদের হৃদয়ে আসিয়া ধাক্কা দিয়াছে।

এই 'মা'-ডাকও হয়তো আমাদের এতদূর সচেতন করিয়া তুলিত না, যদি না সমসাময়িক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার কাছে না আসিতেন এবং নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র বুদ্ধিমত্তা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান লইয়া বিশ্বসমক্ষে তাঁহার ভাব প্রচারপূর্বক প্রতিষ্ঠিত না করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-ভাব বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা এই শক্তির নবতম রূপ দেখিয়া বেশী করিয়া আত্মসচেতন হইয়া উঠিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের অনন্ত মহিমায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া নূতন দৃষ্টিতে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া লইলাম। রামমোহন, মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বঙ্গদেশে যে নূতন ভাব কেন্দ্রীভূত হইয়া বিরাজ করিতেছিল,

শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলন তাহা সকল জনগণ ও বিশ্ববাসার নিকট ছড়াইয়া দিল, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনাই বাঙালীর প্রাণের সাধনা। এতদিন জাগরণের যে জয়ধ্বনি বাঙালী হৃদয়ের বাহির দুয়ারে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবে তাহা মরমে গিয়া স্থান করিয়া লইল।

এখন প্রশ্ন হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ—বিশেষভাবে স্বামী বিবেকানন্দ কি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইয়া নবজাগরিত প্রাণশক্তির সহিত জনচিত্তসংযোগ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? ইহার উত্তরে প্রথম কথা হইল, ভারত ধর্মের দেশ, নবজাগরণের মানবতাবাদ যতই আমাদের জীবনে আলোড়ন ঘটাক না কেন, বাঙালী তথা ভারতীয় জনচিত্ত সর্বদাই এক তপস্যাপ্লুত ধ্যানগম্ভীর চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আসিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের একদিকে ছিল সেই তপস্যা-মণ্ডিত পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবন, অপরদিকে ছিল যুগোপযোগী একটি ক্ষুরধার পর্যবেক্ষণশক্তি। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত নিঃসম্বল অবস্থায় পরিব্রাজক সন্ন্যাসী-রূপে ঘুরিয়া বিভিন্ন স্তরের মানুষের সহিত—বিশেষভাবে দেশের দরিদ্র জনগণের সহিত ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ পরিচয়ের মাধ্যমে তিনি লাভ করিয়াছিলেন এক বিরাট অভিজ্ঞতা, যাহা অন্য কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। এই আধ্যাত্মিক চরিত্র আর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তি দ্বারা লব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ কি চায়, তাহা ভালভাবে বুঝিয়াছিলেন এবং তাহার ফলেই তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সকলের হৃদয়ে আপনার স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সফলতার মূলে আরও একটি জিনিস কাজ করিয়াছে, তাহা হইল ধর্মকে যুগোপযোগী করিয়া প্রচার করা। অবশ্য তিনি ইহা তাঁহার গুরুর নিকট হইতেই উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও সনাতন ধর্মের সহিত নবজাগরণের লক্ষণগুলির এক অপূর্ব সমন্বয় স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। স্বর্গকে মর্ত্যে নামাইয়া আনা অথবা ইহলোকেই আপনার সাধ্য বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা বিবেকানন্দের ন্যায় মহাপুরুষের দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল। জীবন-স্বীকৃতির এরূপ জলন্ত দৃষ্টান্ত আর কোন মনীষীই বোধহয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; কিন্তু নবজাগৃতির স্বরূপগত অন্যান্য গুণের সহিত বিবেকানন্দের ধর্ম-আন্দোলনের পার্থক্য এইটুকু যে, নবশক্তির উন্মাদনায় সবকিছু পাইয়াও কিছু না পাওয়ার ক্ষোভ বা অতৃপ্তি যেখানে মানবজীবনকে দীর্ঘশ্বাস-মণ্ডিত করিয়া তোলে, বিবেকানন্দের ধর্ম-আন্দোলনের মধ্যে সেখানে আপনার বক্ষ হইতে রক্তমোক্ষণের মধ্য হইতেও তিলে তিলে অন্যের হিতের জন্য আপনার সর্বস্ব-ত্যাগের মহিমার মধ্যে এক আত্মিক আনন্দ আসিয়া আমাদের প্রাণকে ভরাইয়া দেয়। এ আনন্দের আস্বাদ পাশ্চাত্যের শক্তির দম্ভ দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না, ইহা ভারতবাসীর একান্ত আপনার।

নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি জাতির প্রাণে শক্তির জোয়ার আসে। এ শক্তির মূলে থাকে পৌরুষ। কিন্তু পৌরুষ তাহাদের জীবনে ত্যাগের মহিমায় মণ্ডিত না হইয়া ভোগের সৌধসৃষ্টি করিতে গিয়া আপনার মৃত্যু-গহ্বর আপনিই খনন করিয়া রাখে, যাহার

ফলে সমস্ত পাশ্চাত্য সমাজ আজ এক ধ্বংসের মুখে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছে। বিবেকানন্দ-চরিত্রের এ পৌরুষ ইহলোকের কোন শক্তি-অর্জন বা ভোগ্যদ্রব্য-অর্জনে নিয়োজিত না হওয়ায় এক অমৃতভাণ্ড হস্তে লইয়া বাঙালী বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। যে পৌরুষ আধুনিক জীবনের সমস্ত কিছুর মূলাধার-স্বরূপ, তাহা অর্জন করিয়া জগতের জন্য তিনি তুলিয়া ধরিলেন এক অমৃতভাণ্ড। এইখানেই স্বামী বিবেকানন্দের আন্দোলনের বিশেষত্ব।

সে যাহা হউক, বাঙালীর জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের এই বৈশিষ্ট্যসমূহ কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা দেখা যাক। বিবেকানন্দের পৌরুষের বাণী ও সেই পৌরুষ দ্বারা অর্জিত শক্তিকে মহান্ ব্রতে নিয়োজিত করা—এই দুইটিই তৎকালীন বাঙালী সমাজকে বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়াছে। এই প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া সাময়িকভাবে ত্যাগের মহান্ ব্রতে সকলেই ছুটিয়া চলিতে চাহিয়াছে, কিন্তু মহান্ যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, আপনাকে নিষ্কলঙ্ক ও নিখুঁত করিয়া তুলিতে পারিলে যে মায়ের পূজার 'বলি'র যোগ্য হওয়া যায়, এ-কথা তখন ভাবিয়া দেখিবার অবসর অধিকাংশেরই হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ কোন সময়েই সাময়িক উত্তেজনার পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি চাহিয়াছিলেন আত্মশক্তির উদ্বোধন। এই আত্মশক্তির উদ্বোধনের জন্য চাই নিজের অন্তর্নিহিত পৌরুষের জাগরণ। স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পরে এই পৌরুষকে গৌণ করিয়া, অর্থাৎ অর্জনের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সকলেই দানের উত্তেজনায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। ভাবপ্রবণ বাঙালীর এ প্রকার অবস্থা যে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু তৎকালীন নবজাগ্রত স্বাধীনতা-আন্দোলন এই উত্তেজনার ইন্ধন যোগাইয়া আসিয়াছে। বিবেকানন্দ-প্রচারিত শক্তি-অর্জনের মন্ত্রের সহিত সাময়িক উত্তেজনার কোন যোগ নাই। স্বামীজী কাহারও উপর কিছু আরোপ করিতে চাহেন নাই, সাধারণ জন-সমাজ আপনার শক্তিতে আপনিই জাগিয়া উঠুক—ইহাই ছিল তাঁহার একান্ত অভিপ্রায়। এজন্য যথেষ্ট প্রস্তুতির প্রয়োজন, তাহা তিনি জানিতেন। এক বিশেষ শিক্ষা ও বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা এক মহা সাধনার প্রস্তুতির জন্যই তাঁহার সঙ্ঘ-সৃষ্টি। কিন্তু স্বাধীনতা-আন্দোলনের পুরোধাগণ এদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সাময়িক উত্তেজনার বশে দেশের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতায় তাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। দেশের জনগণ আপনাদের চিন্তা-দ্বারা কোনকিছু বিশেষভাবে বুঝিবার পূর্বেই সেই সময়ের যুগের হাওয়ায় অজানিত পথে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

দেশের সাহিত্য—জাতির প্রাণশক্তির প্রকাশ। মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে যে পৌরুষের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা জাতির সাহিত্যিক হিসাবে একটি দায়িত্বকে নিষ্ঠার সহিত পালন করিবার প্রয়াস দেখিতে পাই।

রবীন্দ্র-গান্ধী-নেতৃত্বে ভাব-আন্দোলনের যে স্রোত বহিয়াছিল, ঠিক সেই সঙ্গে অপরদিকে আমরা অরবিন্দ-সুভাষের স্বাধীনতা-আন্দোলনও পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাই। ভিক্ষা ব্রাহ্মণেরই সাজে, হয়তো তাহাতে গৌরবও আছে, কিন্তু রাজা ভিক্ষা করিলে

অর্থাৎ এক রাজশক্তির কাছে—যে পরে ঐ রাজশক্তিরই অধিকারী হইবে, তাহার ভিক্ষাবৃত্তি শোভা পায় না। এ-কথা অরবিন্দ ও সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রের আন্দোলনের মধ্যে সাময়িক উত্তেজনা ছাড়া অনেকখানি পরিকল্পনা, ধাপে ধাপে জাতিকে একটি দৃঢ় ভূমিতে দাঁড় করাইয়া দিবার চেষ্টা ছিল। নেতৃত্ব করিবার সে-শক্তিও সুভাষচন্দ্র অর্জন করিয়াছিলেন, তিনি কাহারও নিকট ভিক্ষা করিতে চাহেন নাই, আপনার শক্তিবলে সমস্ত কিছু অর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত এইখানেই তাঁহার মিল অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় জাতিকে সাময়িক উচ্ছ্বাস ত্যাগ করাইয়া যে দৃঢ় ভূমিতে তিনি দাঁড় করাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সর্বতোভাবে সফল হইতে পারেন নাই, আজিকার জাতীয় জীবন এক পৌরুষহীন জড়তা আসিয়া গ্রাস করিয়াছে, নেতাজীর কথা আমরা আর শুনিতে পাই না, সাময়িক উত্তেজনা-বশে সাধ্যের অতিরিক্ত যে-শক্তি আমরা ঢালিয়া দিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে বর্তমানে আমাদের শক্তির ভাণ্ডার-শূন্য। দেশকে পাওয়া গেল, কিন্তু নূতন করিয়া গড়িবার সামর্থ্য রহিল না। সমস্ত মিলিয়া আধুনিক জনচিত্ত একটা শূন্যতার মধ্যে দিন কাটাইতে বাধ্য হইয়াছে।

বর্তমান বাঙালীকে বুঝিবার জন্য পূর্বোক্ত আলোচনার অবতারণা। এ হেন দিশাহারা বাঙালীর জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিবে, তাহার বিচার আজ অবশ্যই প্রয়োজন। প্রথম কথা, পূর্বেই বলিয়াছি—স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যেকের শক্তির জাগরণ বুঝিয়াছিলেন, ব্যষ্টি-শক্তির জাগরণই সমষ্টি-শক্তিকে দৃঢ় করিতে সক্ষম হইবে। অর্থাৎ বাঙালী আজ বহির্জগতের কোনপ্রকার ঝলকানিতে মুগ্ধ না হইয়া আপনার অন্তর্জগতের শক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে আগাইয়া চলিবে। বাঙালী এতদিন ইহা করে নাই, ভুল করিয়াছে; সাধ্যের অতিরিক্ত শক্তি খরচ করিবার ফলে আজ সে দেউলিয়া, অথচ তাহাকে সাহায্য করিবার জন্যও আজ আর কেহ নাই। নিজের স্বরূপকে চিনিয়া লইয়া পুনরায় পৌরুষের সাধনা দ্বারা শক্তিলাভ করা ভিন্ন আজ তাহার কোন দ্বিতীয় পথ নাই। সঙ্কীর্ণতা, পঙ্কিলতা যতই তাহাকে গ্রাস করুক না কেন, সূক্ষ্ম আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে তাহাকে নিজের পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যে হতাশার অন্ধকার তাহাকে গ্রাস করিয়াছে, তাহা দূরে সরাইয়া আজ আপনাকে আপনিই বলিতে হইবে:

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥'

—হে অর্জুন, ক্লীবভাব আশ্রয় করিও না; এরূপ কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না। হে শত্রুতাপন, হৃদয়ের এ তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও।

স্বামী বিবেকানন্দ সকল বীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বীরত্ব ছাড়া কখনই কোন কিছু সম্ভব নয়, আজ কাহারও প্রতি দোষ না দিয়া আপনার শক্তি-অর্জনের মাধ্যমে আমাদিগকে বীর হইতে হইবে। জাতির দুর্দিনে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে বিশ্বাসী বাঙালী যুবকগণকে সমস্ত বিভ্রান্তি দূরে রাখিয়া এই মন্ত্র জপ করিতে হইবে যে, তাহারা ছোট নহে, তাহারা বিরাট; কেবল তাহারা নিজেকে জানে না বলিয়াই দীন, জয়লাভ অবশ্যই করিতে হইবে এবং তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন।

যৌবন-ধর্মের মূর্তবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ। পৌরুষকে বাদ দিয়া আমরা একদিন নির্ঝঞ্ঝাট স্বাধীনতা বা মুক্তি চাহিয়াছিলাম। আজ সেই রাজনীতিক স্বাধীনতা আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইলেও তাহাকে অন্তরের সহিত বরণ করিয়া লইতে পারিতেছি না। পৌরুষ ভিন্ন প্রতিটি জীবনে কোনপ্রকার শক্তি-অর্জন সম্ভব হয় না। প্রতিটি বাঙালী যুবককে আজ পৌরুষের সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। আমাদের মধ্যেই সমস্ত শক্তি লুক্কায়িত আছে, তাহাকে নূতন করিয়া জাগানো প্রয়োজন। একদিন যে-শক্তির অকাল-বোধনের ফলে বর্তমান শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, পুনরায় সেরূপ ঘটিতে না দিয়া ভাবপ্রবণতাকে দূরে রাখিয়া আত্মশক্তির উদ্বোধন আজ আমাদের অবশ্য প্রয়োজন। বাঙালীর সম্মুখে আজ আর কোন পথ নাই; ক্লীবতা জড়তা তাহাকে গ্রাস করিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দের শক্তি কোথায় অদৃশ্যভাবে কাজ করিতেছে, তাহা ধারণা করিবার শক্তিটুকুও আজ আমাদের নাই, এরূপ অবস্থাতেও ধৈর্য ধরিয়া জাতির অগ্রগতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনাকে চিনিতে সক্ষম হইলে দেখা যাইবে, সেই বিরাট ঋষির প্রদর্শিত পথ ছাড়া আজও আমাদের সম্মুখে অন্য কোন পথ উন্মুক্ত হয় নাই। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমাদের সেই পথ অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে, ইহা ছাড়া আর অন্য কোন পথ নাই।

এ সমস্ত কিছুর ধারণার জন্য আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন। প্রচলিত ধারায় যে শিক্ষায় আমরা শিক্ষিত হইতেছি, তাহা আত্মশক্তির উদ্বোধনে কোনরূপ সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেছে না। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়ের অধিকাংশ ব্যয় করিয়া আমরা যাহা পাই, তাহা দ্বারা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতেই পারি না, পূর্বে যদিও বা কেরানীগিরি একটা জুটিত, এখন সে দিকও অন্ধকার। প্রতিবৎসর আমরা বহু অর্থব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ভিড় জমাইতেছি, অথচ স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ না করিয়া আপনাদের পায়ে আপনারাই কুঠারাঘাত করিতেছি। অবশ্য ইহার জন্য বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারের বিরাট বোঝাও অনেকাংশে দায়ী। প্রতিটি বাঙালীর মাথায় আজ সাংসারিক চাপ এত বেশী যে, তাহাকে দূরে সরাইয়া স্বাধীন চিন্তার বিকাশ করাও এক অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবুও ইহা ছাড়া আমাদিগের পথ নাই, আপনার শিক্ষার ভার আপনার হাতেই তুলিয়া লইতে হইবে।

জনৈক চিন্তাশীল অধ্যাপক এইরূপ বলিয়াছেন: বাঙালীর নবজাগরণ নবজাগরণ করিয়া আমরা সকলেই চীৎকার করি, ভাবের দিক হইতে নবজাগরণের শক্তির জোয়ার হয়তো আসিয়াছিল, কিন্তু কোনপ্রকার সুদৃঢ় আর্থনীতিক বনিয়াদের উপর তাহা স্থাপিত না হওয়ায় এবং আজ সে আন্দোলনের ভাবের ঘোর কাটিয়া যাওয়ায় আমরা বর্তমানে এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে আসিয়া পৌছাইয়াছি। এ দিক দিয়া চিন্তা করিলে বাঙালীর ঐ নবজাগরণকে 'নবজাগরণ' নামে অভিহিত না করিয়া একটি 'ভাব-আন্দোলন' বলিলে বোধ হয় বিশেষ ভুল হয় না।

সত্যসত্যই বাঙালীর জীবনে যে নবজাগরণ আসিয়াছিল, তাহার দৃঢ় ভিত্তি কোথায়? আর্থনীতিক যে দৃঢ় বনিয়াদের উপর শিল্প ও সংস্কৃতি রক্ষিত হয়, সে বনিয়াদ নিশ্চয়ই আমাদের জীবনে এখনও পাকা হয় নাই। কিন্তু কেন? কারণ আর্থনীতিক দৃঢ় বনিয়াদের জন্যও প্রয়োজন একটি সুপরিকল্পিত

কার্যক্রম। যে কার্যক্রমকে অনুসরণ করিয়া জাতি আপনার শক্তির দ্বারা আপনি দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত আর কাহারও মধ্যেই এখনও জাতির বনিয়াদ দৃঢ়ীকরণের জন্য একটি সামগ্রিক ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায় নাই। অথচ এই মহাপুরুষকেই আমরা ভাবপ্রবণতার উন্মাদনায় ভুলিতে বসিয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা ভিন্ন কখনই সেই প্রত্যাশিত আর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের জীবনে আসিতে পারে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবশ্যই আমাদিগকে সেই পথ অনুসরণ করিতে হইবে।

এখন কথা হইল, বাঙালীর জীবনে যে জাগরণ আসিয়াছিল, তাহা কি একেবারেই ভিত্তিহীন, না বাঙালীর ইতিহাসে তাহার কোন মূল্যই স্বীকৃত হইবে না? শক্তির জোয়ার বাঙালীর জীবনে আসিয়াছিল, তাহা অস্বীকার অবশ্যই করা যায় না—সে শক্তি যে-ভাবেই চালিত হউক। অবস্থা এই যে, শক্তির জাগরণ আমাদের জীবনে হইয়াছিল, কিন্তু আমরা পুঁজির বেশী খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। এই হইতে এই জাগরণকে 'নবজাগরণ' অর্থে আমরা ঠিক যাহা বুঝি, তাহা না বলিয়া যদি নবজাগরণের প্রথম ধাপ বলি, তাহা হইলে বোধ হয় বিশেষ অসঙ্গত হইবে না। অতি অল্পকাল পরেই জাতির জীবন যে এরূপ হতাশা ও পঙ্কিলতা গ্রাস করিল, তাহাতে উনবিংশ শতাব্দীর ঐ জাগরণকে 'নবজাগরণ' না বলাই বোধহয় সঙ্গত হইবে। তাহাকে নবজাগরণের প্রথম ধাপ হিসাবে ধরিয়া লইয়া যাহার জন্য এই জাগরণ প্রকৃত নবজাগরণে পর্যবসিত হইতে পারিল না, সেই ভাবপ্রবণতা-বর্জিত সুপরিকল্পিত কার্যক্রমের অনুসরণে বর্তমান বাঙালীকে অবশ্যই যত্নবান্ হইতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে এক প্রবল ধাক্কা দিয়া গিয়াছেন আমাদিগের আত্মসচেতন নবজীবন লাভের জন্য। আজ সেই ধাক্কা দিবার জন্য স্থূল শরীরে তিনি উপস্থিত নাই, ভাবের ধারক পরবর্তী সাধকগণই বা আজ কোথায়, তাহাও আমরা জানি না, অত্যন্ত ধীরভাবে আমাদিগকে তাঁহাদের প্রদর্শিত বর্তিকার আলোক দ্বারা পথ চিনিয়া লইতে হইবে। হয়তো বা নবজাগরণের দ্বিতীয় ধাপের আরম্ভের জন্য এইরূপ একটি অবস্থার প্রয়োজন ছিল, হয়তো বা নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের মত ও পথের সত্যতা সম্বন্ধে সুনিশ্চয় হইবার জন্য আমাদের এ দুঃখ প্রাপ্য ছিল। আলোকের আবাহন মানুষ করিবেই। বিশেষ করিয়া বেশী দিন সঙ্কীর্ণতার অন্ধকারে আমরা বাস করিতে পারি না। এই নিপীড়ন, এই অপমানই আজ আমাদিগকে আরব্ধ কর্মের পথে জাগ্রত করিয়া তুলিবে। সুস্থ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির দ্বারা বাঙালী প্রমাণ করুক - সে দুর্বল নয়, সে মরিতে জানে, বাঁচিতেও জানে, আত্মশক্তিতে সে যথেষ্ট শক্তিমান্, কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া আপনার উন্নতি সে আপনিই করিতে সমর্থ।

পরিশেষে ধর্ম- ও কর্ম-আন্দোলনের পুরোধা স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকীতে আরও একটি আশার আলোক ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা রাখিতে প্রেরণা জোগাইতেছে। ভারত ধর্মের দেশ। ধর্মের মাধ্যমেই তাহার সমস্ত প্রকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম-আন্দোলনের প্রতিটি নেতাই বোধ হয় তাঁহাদের জীবৎকালে বা মৃত্যুর পরেও জাতি

কর্তৃক স্বীকৃত হন না, কিছুটা সময় লাগে। বুদ্ধদেব শঙ্করাচার্য চৈতন্যদেব সকলের ক্ষেত্রেই এইরূপ হইয়াছে। প্রতিটি জীবনেরই ইহলোকের কর্ম-সমাপ্তির পঞ্চাশ-ষাট এক-শ বৎসর পরে জাতি নূতনভাবে ইঁহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর ষাট বৎসর অতীত হইয়াছে, জাতির বর্তমান দুরবস্থার মধ্যে দিশাহারা হইয়া আন্তরিকভাবে পথ খুঁজিতেছে। আশা হয়, স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝিবার কাল সমুপস্থিত। এইরূপ অবস্থাতে মহান্ যোগীর শতবার্ষিকীও সমাগত হওয়ায় তাঁহাকে বুঝিবার এক বিশেষ সুযোগ আসিয়াছে।

হে দুর্দশাক্লিষ্ট বাঙালী, সাবধান হও, আজ আর তাঁহাকে ভুল বুঝিও না। তোমার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হও, কারণ অনুসন্ধান কর, আপন বিচার-বুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া চিন্তা কর, সেই বিরাট পুরুষের প্রদর্শিত পথ কতদূর তোমার উপযোগী। এই তামসিক অন্ধকারের মধ্যে তুমি কখনই বাঁচিতে পার না, অথচ তোমাকে বাঁচিতে হইবে—তোমাকে উঠিতেই হইবে। তুমি জাগো, তুমি ওঠ, শ্রদ্ধাসহকারে বলো, স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন না করাতেই আমাদের এই দুরবস্থা, আমরা আর ভুল করিব না, এবার আমরা আমাদের শিবকে—কল্যাণকে চিনিয়া লইবই। হে ত্যাগী দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী, তুমি আমাদিগকে আশীর্বাদ কর, তুমি আমাদের পথ দেখাও।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে নূতন প্রকাশন

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি:

Patriot Saint Vivekananda - Edited by Tarini Sankar Chakravorty. Published by Secretary, Swami Vivekananda Birth Centenary Celebrations Committee, Muthiganj, Allahabad 3. Pp. 160 ; Price : Rupee one only.

স্বামী বিবেকানন্দ (সংক্ষিপ্ত হিন্দী জীবনী)—লেখক: ওঁকার শরদ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩২ ; মূল্য ২৫ ন. প.

বিবেকানন্দ-বাণী-শতক—স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, দিনাজপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪০।

Swami Vivekananda in Germany—1896 - Published by German-Indian Association, Calcutta. Pp 12.

Vivekananda on National Reconstruction—Published by the Director, Publications Division, Old Secretariat, Delhi 6. Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. Pp. 28.

Swami Vivekananda's three Visits to Almora—Published by the President Sri Ramakrishna Kutir, Almora, U. P. Pp. 20.

স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৮০+৬০; মূল্য ৫৲।

দিব্যগীতি—(১০১টি গান ও স্বরলিপি)—স্বামী অপূর্বানন্দ-সঙ্কলিত। প্রকাশক: সেক্রেটারি, স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী, ১৬৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ১৪। পৃষ্ঠা ২৪৮; মূল্য ৮৲।

শিকাগোয় বিবেকানন্দ—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রিশড়া (হুগলি) হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৮, মূল্য ৫০ ন. প.।

ঠাকুর, মা, স্বামীজী—স্বামী সোমানন্দ। শোভনা প্রকাশনী, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯২; মূল্য টাকা ১.৫০।

বাংলার বিবেকানন্দ—(বাংলার তরুণদের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের শিক্ষা ও প্রেরণা)—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। প্রকাশক: সম্পাদক বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বজ বজ, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৭২; মূল্য ২৲।

পত্রিকা

বিবেক-জ্যোতি (শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হিন্দী ত্রৈমাসিক) —বিবেকানন্দ আশ্রম, গ্রেট ঈস্টার্ন রোড, রায়পুর (মধ্য প্রদেশ) হইতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲; বার্ষিক মূল্য ৪৲। জানুআরি—মার্চ সংখ্যা: পৃষ্ঠা—১৪৭; এপ্রিল—জুন সংখ্যা: পৃষ্ঠা—১৫৩।

শতবর্ষ-স্মরণিকা—রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, ৫, নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১৮।

Swami Vivekananda Centenary Souvenir—স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কমিটি, লিলুয়া (হাওড়া) হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৯।

সংসদ (স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা)—১৩, রাষ্ট্রগুরু এভেন্যু, দমদম, কলিকাতা ২৮ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯৯।

কিশোর ভারতী—বিবেকানন্দ-জন্ম-শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব উপলক্ষে বিবেকানন্দ পল্লী, বেহালা, কলিকাতা ৩৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১০।

ভারত-আত্মার বাণী—স্বামী বিবেকানন্দ (স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্বামীজী সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত)। ৪, পাতিপুকুর রেলওয়ে প্লট, কলিকাতা ২৮ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১০।

স্বামী বিবেকানন্দ শততম জন্মজয়ন্তী স্মরণিকা—স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ-জয়ন্তী উপসমিতি, পশ্চিম বঙ্গ খাদ্য-সরবরাহ-বিভাগ সাংস্কৃতিক পরিষদ, ১১এ, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৫।

Prabuddha Bharata—Swami Vivekananda Birth Centenary Number. Publication Office: 5, Dehi Entally Road, Calcutta 14. Pp. 320; Price 3.75.

সমালোচনা

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ: মোহিতলাল মজুমদার: জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃঃ ১৮৪; মূল্য পাঁচ টাকা।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে কয়টি আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম এবং বোধ হয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি প্রকাশ ক'রে জেনারেল প্রিণ্টার্সের কর্তৃপক্ষ পাঠক-সাধারণের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বিষয়—বিবেকানন্দ এবং লেখক—মোহিতলাল। বিষয় ও লেখকের এ-হেন যোগ সহজেই আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করবে—এটা তেমন আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু আশ্চর্য এই প্রবন্ধসঙ্কলনে চিন্তা ও বাণীর গভীর তাৎপর্যময় সম্মেলন। এমন ধ্রুপদী আঙ্গিকেই এমন চিরন্তন ভাবৈশ্বর্যের সার্থক প্রকাশ সম্ভব। উনিশ শতকের সমস্ত ভাবসাধনার শীর্ষবিন্দুতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব—সে আবির্ভাবের সার্থকতাকে মোহিতলাল তাঁর প্রজ্ঞাগম্ভীর মনন-ঋদ্ধ ভাষায় ভারত- তথা বিশ্ব-বাসীর কাছে সমুপস্থিত করেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে ছড়ানো তাঁর এই প্রবন্ধগুলিকে সঙ্কলয়িতা এমন নিপুণভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন, যাতে এদের মধ্য দিয়ে মোহিতলালের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুধ্যান একটি অখণ্ড তাৎপর্য লাভ করেছে।

শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রশস্তিবাচন বা স্মরণকীর্তনের নিজস্ব মূল্য মনে রেখেও এই জাতীয় মূল্যায়ন-প্রচেষ্টাই যে অধিকতর কাম্য, সে-কথা অবশ্যস্বীকার্য। তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাঁরা বিচারব্রতী, তাঁদের নিজস্ব মানদণ্ডটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যে ভারত-ইতিহাস-সচেতনতা ও অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার থাকলে বিবেকানন্দের মানস-পরিমণ্ডলটি সঠিক অনুধাবন করা যায়, এ-যুগে সেই ধরনের স্থিতধী ও সুসমঞ্জস ধ্যানধারণার অধিকারী লেখক ক্রমে একান্ত দুর্লভ হয়ে আসছেন। তাই মোহিতলালের এই গ্রন্থে কর্ম জ্ঞান ভক্তি ও যোগের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ-দর্শনের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে।

প্রধানতঃ রম্যাঁ রলাঁর বিবেকানন্দ-জীবনী এবং অদ্বৈত আশ্রম-প্রকাশিত স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীটিকে মোহিতলাল আকরগ্রন্থ-রূপে ব্যবহার করেছেন। সেদিক থেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ পর্ব'টি তাঁর বিশেষ সহায়ক হ'তে পারত। কিন্তু এই প্রবন্ধমালার সূচনা থেকে শেষ অবধি অনুধাবন করলে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারার মৌলিকতা ও গভীরতাকে মোহিতলাল অনেকখানি আপন অন্তরে অনুভব করতে পেরেছিলেন। আর সেই অনুভূতির প্রেরণাতেই তিনি এই প্রবন্ধাবলী লেখবার প্রেরণা পেয়েছেন—নিছক বুদ্ধি-চর্চাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

বিবেকানন্দ-চর্চায় উৎসাহী কোন কোন লেখক বা বক্তা যেমন দার্শনিক বিবেকানন্দকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র তাঁর মানব-দরদী সত্তাটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, সৌভাগ্যের বিষয় মোহিতলালের প্রবন্ধাবলীতে তেমন কোন এক-দেশদর্শিতা নেই। বরং তিনি বিবেকানন্দের এই জীবন-ভাষ্য রচনাকালে বিবেকানন্দ-মানসের সেই উৎসগুলি বেশী ক'রে অনুসন্ধান করেছেন,

যাদের মধ্যে ভারতীয় তথা বিশ্বজীবনবোধের সঙ্গীতধারা সবচেয়ে বেশী উৎসারিত। এক-ধারে বেদান্ত, গীতা, তন্ত্র, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ; অন্য ধারে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র এবং নবযুগের মানবতাবাদ। স্বামীজীর মননলোকে আচার্য শঙ্করের প্রভাব ততটা আলোচিত হয়নি; এদিক থেকে নূতন আলোকপাতের প্রয়োজন এখনও আছে। তবু ভারতীয় সাধনার পটভূমিতে বাঙলার এই সন্ন্যাসী সন্তানের নিজস্ব সাধনা ও সিদ্ধির উত্তরাধিকারকে মোহিতলাল যে সশ্রদ্ধ অভিনিবেশের সঙ্গে বিচার করেছেন, তা বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে অনন্য-উদাহরণ।

বিবেকানন্দের সন্ন্যাস ও মানবপ্রেমের যোগসূত্রটি মোহিতলাল তাঁর অপূর্ব ভঙ্গীতে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—"বিবেকানন্দ মানবাত্মার মুক্তিকেও যেমন, তাহার বন্ধনকেও তেমনি আত্মগোচর করিয়াছিলেন। এজন্য সেই বন্ধন তাঁহার যেমন অসহ্য হইয়াছিল, এমন আর কাহারও হয় নাই। কোন্ দেশের কোন্ সমাজে তিনি মানুষের চরম দুর্গতিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন? পৃথিবীর আর সকল দেশে তিনি মানবাত্মার মহিমা ঘোষণা করিতেন, কিন্তু নিজের দেশে আসিয়া তিনি নির্বাক্ হইয়া যাইতেন, অশ্রুবাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইত।...স্বামী বিবেকানন্দ স্বজাতির সেই ব্যাধি যন্ত্রণাও যেমন, তাহার হৃত স্বাস্থ্যকেও তেমনি নিজ দেহ ও আত্মায় যেরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, এ-যুগে তৎপূর্বে আর কেহ তেমন করে নাই—এই সত্য সর্বাগ্রে ও সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। তাহার কারণও ছিল।

প্রথমতঃ তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী; সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর যে প্রেম তাহার নাম কি দিব? ভারতবর্ষে প্রেমকে ভগবৎ-প্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শে শোধন করিয়া মানুষের মুক্তিসাধনার অনুকূল করা হইয়াছে; কিন্তু সেই ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনাকে তুচ্ছ করিয়া এই যে মানব-প্রেম, এবং বিশেষ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম, ভারতবর্ষে ইহা নূতন; আবার এই প্রেমও যে অধ্যাত্ম-পিপাসারই একটা রূপ, তাহা একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব। সন্ন্যাসী না হইলে, বৈরাগ্যের দ্বারা সুরক্ষিত না হইলে প্রেম এমন নির্ভীক ও বলীয়ান্ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সেই কারণেই কোন সমাজ-বন্ধন না থাকায় তিনি দেশের সকল সমাজে মিশিয়া, সকলপ্রকার জীবনযাত্রা আপন চক্ষে দেখিবার ও আপন মনে বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। দেশকে ভালবাসার মূলে ছিল—দেশের যাতনাক্লিষ্ট সর্ব-অঙ্গের সহিত এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়।"

[বিবেকানন্দের উত্তরসাধক: অরবিন্দ, গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র—সপ্তম অধ্যায়, পৃঃ ১৪১-১৪২]

'মানুষ-পূজা' প্রবন্ধে এ গ্রন্থের সূচনা এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে পরিসমাপ্তি। সঙ্কলয়িতা যে ধ্রুবপদে এ গ্রন্থের তান বিস্তারিত করেছিলেন, শেষ প্রবন্ধটিতে এসে সার্থক সমে তার পরিসমাপ্তি। প্রবন্ধ-বিন্যাসে তাঁর কৃতিত্ব আন্তরিক সাধুবাদের যোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ—পরস্পর-পরিপূরক এই যুগ্মসত্তাকে পরস্পরের আলোকে বিচার করেই যে অদ্বৈতসত্যে আমরা পৌঁছতে পারি, সেই সার্থক উপলব্ধিতে এ গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে এ গ্রন্থ সর্বত্র প্রচারিত হোক—এই আমাদের প্রার্থনা।

—শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

মুকুটা-প্রতিভা (মহাকবি গিরিশচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে একাঙ্ক নাটিকা) ঃ লেখক ও প্রকাশক শ্রীনলিনকৃষ্ণ দাস, 'কোকোয়া কট', ১৫, টি. এন. বিশ্বাস লেন, শ্রীদক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা ৩৫। পৃষ্ঠা ৫৭, মূল্য টাকা ১'০০।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন: "ভক্ত ভৈরব গিরিশচন্দ্রের ছদ্মনাম 'মুকুটাচরণ মিত্র' (শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'গিরিশচন্দ্র'—২০২।৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ব্যবহার কালীন স্বয়ং গিরিশ-কথিত ঘটনা অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র নাটিকা প্রণয়ন করিতে সাহসী হইয়াছি।"

নাটিকাটির উপজীব্য হাস্যরস। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও কলিকাতার ভাষায় রচিত কৌতুক-নাটিকাটি রসোত্তীর্ণ কি না, তাহা বিবেচিত হইবে অভিনয়-সাফল্যের দ্বারা। আমাদের মনে হয়, বইটি হাস্যরসিকগণের ভাল লাগিবে।

ভারতের সাধক (৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড) ঃ শঙ্করনাথ রায় প্রণীত; ৫ম খণ্ড রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ হইতে এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড শ্রীপ্রকাশন, একডালিয়া রোড, কলিকাতা ১৯ হইতে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডে পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩০০; মূল্য প্রতি খণ্ড টাকা ৬'৫০।

সাধক মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করা অতি কঠিন কাজ। যাঁহারা লোকগুরু, ধর্মাচার্য, সংস্কৃতির যথার্থ ধারক ও বাহক, তাঁহাদিগের অমূল্য জীবন লোক-সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে যে সাবধানতা ও অনুধ্যান প্রয়োজন, আলোচ্য পুস্তকে তাহার অভাব অনুভূত হয় না। ভারত-সাধনার সমগ্ররূপের পরিচয়-প্রদান-কার্যে লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়। বস্তুনিষ্ঠা ও বিন্যাস-কৌশলের পরিচয় প্রতিটি রচনায় বিদ্যমান

ইতিপূর্বে 'ভারতের সাধক' চার খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে এবং পাঠকগণের সমাদর লাভ করিয়াছে। ৫ম খণ্ডে তীর্থঙ্কর মহাবীর, জ্ঞানদেব, তন্ত্রাচার্য সর্বানন্দ, নানক, শ্রীজীব গোস্বামী, সিদ্ধ কৃষ্ণদাস, রামঠাকুর এবং ৬ষ্ঠ খণ্ডে বিদ্যারণ্য স্বামী, নামদেব, আচার্য রামানন্দ, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী, ভক্ত লালাবাবু, পওহারী বাবা, যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ, হংসবাবা অবধূত--এই পুণ্য জীবনগুলি আলোচিত হইয়াছে।

প্রাঞ্জল ভাষা, রচনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য এবং হৃদয়গ্রাহী বিন্যাসের জন্য গ্রন্থ-দুইখানি বাংলা জীবনী-সাহিত্যে মূল্যবান্ সংযোজন-রূপে গৃহীত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শতবার্ষিকী সংবাদ

লণ্ডন ঃ রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৩১শে জানুআরি ক্যাক্সটন্ হলে ভারতের হাই কমিশনার শ্রীএম. সি. চাগলা স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তুষারপাত এবং প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও প্রায় ৪০০ লোকের সমাগম হয়।

শ্রীচাগলা তাঁহার ভাষণে বলেন : স্বামীজী বাস্তবিকই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-সেতু। ভারতের এই মহান্ সন্তান স্বদেশে যেমন পাশ্চাত্যেও তেমনি সুপরিচিত। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের নিকট হইতে এবং পাশ্চাত্য প্রাচ্যের নিকট হইতে শিক্ষা করিবে—ইহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন এবং ইহাই প্রচার করিতেন। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানব-জাতির কল্যাণের জন্য পৃথিবীর উভয় অংশেরই পরস্পর আদান-প্রদানের অনেক কিছু আছে। স্বামীজী বলিতেন, আমরা সর্বত্র ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিব—কি হিন্দুর মন্দিরে, খৃষ্টানের গির্জায়, ইহুদীর উপাসনা-স্থানে বা মুসলমানের মসজিদে। ঈশ্বর সর্বত্রই বিদ্যমান, তিনি সর্বব্যাপী।

স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা-প্রশাখা সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া আছে। এই সব কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারিত হয় এবং দুঃস্থদিগকে সাহায্য দেওয়া হয়। স্বামীজীর একটি প্রধান শিক্ষা—মানব-সেবাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ধর্মভাব প্রকাশ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় মানুষের সেবা। এই ভাবেই রামকৃষ্ণ মিশনের জনকল্যাণমূলক কাজ অনুষ্ঠিত হইতেছে।

মাঞ্চেস্টার (অক্সফোর্ড) কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ রেভাঃ সিডনি স্পেনসার বলেন : স্বামীজীর ভাবধারা-প্রচারে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি দ্বারা যাহা করা হইতেছে, তাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধর্মীয় ঐক্য-প্রচারই তাহাদের কাজ। বহুর মধ্যে এক সত্যই বর্তমান—স্বামীজী এই সত্য ধর্মের ক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই তাঁহার সত্যানুসন্ধান। স্বামীজী একজন পবিত্র মানব, যোগী, অখণ্ডব্রহ্মচারী।

ঢাকা : রামকৃষ্ণ মিশনে গত ১২ই হইতে ১৮ই ফাল্গুন সপ্তাহব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে পূজার্চনা, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, কালীকীর্তন, রামায়ণ-গান, ‘কথামৃত’পাঠ, ‘কৃষ্ণলীলা’-অভিনয়, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ই ফাল্গুন অপরাহ্নে মঠপ্রাঙ্গণে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ মুহম্মদ আসীরের সভাপতিত্বে আয়োজিত সাধারণ সভায় ‘শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বপ্রেম’ সম্বন্ধে বিশিষ্ট বক্তাগণ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

আসানসোল ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১১ই হইতে ৩০শে এপ্রিল বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী পালিত হয়।

১১ই এপ্রিল মঙ্গলারতি, বিশেষ-পূজা, হোম, ভজন, শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

বিভিন্ন দিনে বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী গম্ভীরানন্দ, ধ্যানাত্মানন্দ, ঈশানানন্দ, হিরণ্ময়ানন্দ, বীতশোকানন্দ, মহানন্দ, শ্রীক্ষিতীশ-চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীদক্ষিণা-রঞ্জন বসু, শ্রীহরিপদ ভারতী, শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত প্রভৃতি। বক্তাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাবের তাৎপর্য ও মহিমা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষণ করেন।

স্বামীজীর জীবন-সম্বলিত পুতুল-প্রদর্শনী দেখিবার জন্য দূরবর্তী অঞ্চল হইতেও দর্শকগণ আগমন করেন।

বিভিন্ন দিনের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান: বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ, ভজন-কীর্তন, বিবেকানন্দ-লীলাগীতি, বাউল-কীর্তন, রামায়ণ-গান, ব্যায়াম-প্রদর্শনী, 'স্বামীজী' নাটকাভিনয়, ছায়াচিত্র-সহযোগে স্বামীজী-সম্বন্ধে বক্তৃতা।

এই উৎসবে আসানসোল ও নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলের অগণিত জনসাধারণ যোগদান করিয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করেন।

রহড়া: রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের উদ্যোগে স্বামীজীর শততম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এ বৎসর পক্ষকালব্যাপী এক বিরাট উৎসব আয়োজিত হইয়াছিল। উৎসব আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হইবার পূর্ব হইতেই স্বামীজীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে বালকাশ্রম তিনটি বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রথমটি 'বিবেকানন্দ হল্' নির্মাণ, দ্বিতীয়টি 'বিবেকানন্দ শতবার্ষিক মহাবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় পরিকল্পনা—'শতবার্ষিক ছাত্রাবাসের' নির্মাণ।

শতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ 'আশ্রম' পত্রিকা, স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী-সঞ্চয়ন' এবং বালকাশ্রমের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও বর্তমান কর্মধারার পরিচয়-সংবলিত একখানি 'স্মরণী' প্রকাশ করা হয়।

গত ৬ই ফেব্রুআরি নবনির্মিত 'বিবেকানন্দ হল্'-এ শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাধিকর্তা ডক্টর ভবতোষ দত্ত, পৌরোহিত্য করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়।

আশ্রম-সংলগ্ন প্রশস্ত ময়দানে আয়োজিত বিরাট শিক্ষা-শিল্প-প্রদর্শনীটি বিষয়ের বৈচিত্র্যে প্রতিদিন সহস্র সহস্র নরনারীকে আকর্ষণ করিয়াছে। উৎসবের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ধর্মগ্রন্থ ও স্বামীজীর রচনাবলী পাঠ, শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার প্রমুখ মহাশয়গণের সারগর্ভ আলোচনা, প্রখ্যাত শিল্পীদের ভক্তিমূলক ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, কবিগান, তরজা, কথকতা, যাত্রা, দেশাত্ম-বোধক নাটকাভিনয়, গীতি-আলেখ্য, চলচ্চিত্র ও ব্যায়াম-প্রদর্শনী প্রভৃতি। উৎসবের সমাপ্তির মুখে ১৯শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় এক বিরাট শোভাযাত্রা নগর-পরিক্রমা করে।

কাঁকুড়গাছি: রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠে গত ১২ই হইতে ১৫ই এপ্রিল এবং ২১শে এপ্রিল স্বামীজীর শতবার্ষিক জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবের প্রথম দিন প্রাতে বিশেষ-পূজা ও হোম হয়। অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিন স্বামী ওঙ্কারানন্দ উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন এবং স্বামী পুণ্যানন্দ 'দেশপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তৃতীয় দিন স্বামী ওঙ্কারানন্দ 'স্বামীজীর জীবন ও বাণী' অবলম্বনে বক্তৃতা দেন, বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল; সঙ্গীতে অংশ

গ্রহণ করেন শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। চতুর্থ দিন স্বামী নিরাময়ানন্দ ভাষণ দেন, তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল: 'নবযুগের নূতন আচার্য'। ২১শে এপ্রিল বিশেষ-পূজা, হোম, ভজন-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় এবং রাত্রে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

উৎসবের প্রথম চারদিন পূর্বাহ্ণে স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর পারায়ণ ও ভজন এবং রাত্রে বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীঅমর ভট্টাচার্য, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রভৃতি। প্রঃ সাজ্জাদ হোসেনের সানাই, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃদঙ্গ এবং প্রঃ সৌকত আলি খাঁর তবলা বিশেষ উপভোগ্য হয়।

জলপাইগুড়িঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৯ই এপ্রিল হইতে সপ্তাহব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও স্বামীজীর জন্ম-শত-বার্ষিকী বিশেষ আনন্দ সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বেদপাঠ, বিশেষ-পূজা, ভজন-কীর্তন, স্বামীজীর জীবনালেখ্য-প্রদর্শনী, শোভাযাত্রা, রামায়ণগান, বিবেকবাণী-পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় বক্তৃতা দেন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ, অজজানন্দ, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, শ্রীতামসরঞ্জন রায়, শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। স্বামী দেবানন্দ গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উৎসবের কয়দিন আশ্রমে বহু লোকের সমাগম হয়।

কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া): শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২রা মার্চ হইতে দিবসত্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে, মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, স্তোত্র- ও চণ্ডীপাঠ, বিশেষ-পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, শোভাযাত্রা, নগরকীর্তন, ধর্মসভা, 'কথামৃত'-পাঠ, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম দিনের আয়োজিত সভায় স্বামী জপানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে মহকুমা-শাসক শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী গদাধরানন্দ, নির্জরানন্দ প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

জয়রামবাটীঃ গত ২৬শে এপ্রিল শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির-প্রতিষ্ঠার ৪১তম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। উষা-ভজন, বিশেষ-পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, ধর্মসভা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রায় ২,৫০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। ধর্মসভায় স্বামী ঈশানানন্দ, গদাধরানন্দ, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেন, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও ভাবধারা অবলম্বনে বক্তৃতা দেন।

২৭শে এপ্রিল স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সকালে শোভাযাত্রা-সহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যাপীঠ-প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্র ও ভক্তবৃন্দ স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ছাত্রদের নিকট সরলভাবে স্বামীজী সম্বন্ধে বলেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক ও প্রসাদ-বিতরণ। অপরাহ্ণে 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সন্ধ্যায় বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন ও ভাবধারা অবলম্বনে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন।

পরদিবস পূজা পাঠ ও স্বামীজীর জীবনী আলোচনান্তে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিভিন্ন দেশ হইতে এবং স্থানীয় বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ করেন।

দিনাজপুর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১০ই হইতে ১৩ই মে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ-পূজা, হোম, ভোগরাগ, চণ্ডীপাঠ, কঠোপনিষৎ-পাঠ, ভজন, বিবেকানন্দ-লীলাগীতি, শোভাযাত্রা, ছায়াচিত্র-প্রদর্শন, নাটকাভিনয়, নর-নারায়ণ-সেবা, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, ব্যায়াম-কৌশল ও যোগাসন প্রদর্শন, 'বিবেকানন্দ-বাণী-শতক' পুস্তিকা-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রথম দিনের আয়োজিত সভায় জনাব কাজী আজিজুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন এবং ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব ও বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন-দর্শন আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিনে মহতী সভায় স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

স্বামীজীর শতবার্ষিকী

কলিকাতা ঃ বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে গত ১৮ই মে সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন করিয়া শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বলেন, ভারতের ধর্ম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য কত উদার, স্বামীজীর প্রচারের ফলে বিশ্ববাসী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, স্বামীজী ভারতকে ধর্মের পথ দেখাইয়াছেন, দেশকে ভালবাসিতেও শিখাইয়াছেন। স্বামীজীর জীবন হইতে তাঁহারা এই শিক্ষা লাভ করেন যে, আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে সঙ্গে দেশ গড়ার কাজেও আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সোসাইটির সভাপতি স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ উপস্থিত সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং সম্পাদক সোসাইটি-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেন। বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী ভাষ্যানন্দ (হিন্দীতে), অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী এবং শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার (সভাপতি)। বক্তাদের ভাষণে স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয়। সভান্তে সিকদার বাগান সঙ্গীত-সমাজ কর্তৃক 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' অভিনয় সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

১৯শে হইতে ২৫শে মে সোসাইটি-ভবনে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের কার্যসূচী ছিল: 'মাতৃবন্দনা', 'বিবেকানন্দ-গীতি-আলেখ্য', 'বিবেকানন্দ ও গীতা', 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ', 'দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ', 'স্বামীজীর বক্তৃতাবলী', 'স্বামীজীর পত্রাবলী'।

কলিকাতা ঃ গত ৬ই, ৭ই ও ৮ই মার্চ এণ্টালিস্থ মথুরানাথ বালিকা বিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ-জন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শেষ দিবস বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

প্রথম দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ। দ্বিতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা। শেষ দিবসের অনুষ্ঠানে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী পৌরোহিত্য করেন ও প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী নিরাময়ানন্দ।

প্রতিদিন বক্তারা স্বামীজীর জীবনী সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়া বর্তমান অবস্থায় কিভাবে ছাত্রীরা তথা দেশবাসীরা স্বামীজীর

প্রদর্শিত পথে চলিতে পারে তাহা নির্দেশ করেন। এই উপলক্ষে ছাত্রীদের দ্বারা আয়োজিত স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সংবলিত একটি প্রদর্শনী এক সপ্তাহ যাবৎ দর্শক-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

শেষ দিবসের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে 'যুগসূর্য বিবেকানন্দ' অভিনীত হয়।

নানা স্থানে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি :

চন্দ্রনাথধাম, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম; মধ্য কলিকাতা সম্মিলিত স্বামীজী জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতি, কলিকাতা ১২; শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, চাকদহ, নদীয়া; ভবানীপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ২৪ পরগনা; কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম; শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বিশরপাড়া, বিরাটী; সরস্বতী সমিতি, ৪ নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৫; মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা; বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান, ২৩ রাধানাথ চৌধুরী রোড, টেংরা, কলিকাতা ১৫; সালকিয়া তরুণ-দল, সালকিয়া, হাওড়া; কল্যাণব্রত সঙ্ঘ, বৃন্দাবনপুর, হাওড়া; পার্ক ইনস্টিটিউশন, কলিকাতা ৪; বেলানগর, পোঃ অভয়নগর, হাওড়া; বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া; শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মঠ, বলরামপুর, মেদিনীপুর; হুগলি সংস্কৃত পরিষদ, চুঁচুড়া; সারস্বত সম্মেলন, ২৫৯ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; শ্রীসারদা আশ্রম, নিউ আলিপুর, কলিকাতা ৩৩; বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব সমিতি, ৮ বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা ৩; ধর্মীয় সাধারণ পাঠাগার, তারকেশ্বর; জাগরী যুব সম্মেলন, কলিকাতা ৩; লোকপীঠ বিবেকানন্দ জুনিয়ার হাইস্কুল, বিষ্ণুপুর বাজার, মেদিনীপুর; দত্ত-দারিয়াটন, জেলা বর্ধমান; ইণ্টালি বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতি, কলিকাতা ১৪; বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার, সিউড়ি, বীরভূম; বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সমিতি, বজবজ; শান্তি সঙ্ঘ, শিবপুর, হাওড়া; আমিড়া, ডায়মণ্ড ক্লাব, ২৪ পরগনা; পাইকপাড়া সঙ্ঘ, কলিকাতা ৩৭; বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী, ৪, যশোহর রোড, কলিকাতা ২৮; পোর্ট কমিশনার রিক্রিয়েশন ক্লাব (হিলারি ইনস্টিট্যুট); এয়ার পোর্ট ক্লাব, দমদম; নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (A. B. T. A.); বিবেকানন্দ শতাব্দী উৎসব, আমেদাবাদ ১; শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি, রায়পুর, মধ্যপ্রদেশ।

পোপ জনের দেহত্যাগ

রোম্যান ক্যাথলিক জগতের ধর্মগুরু মহামান্য পোপ ত্রয়োবিংশ জন ৮১ বৎসর বয়সে রোমের নিকটবর্তী ভ্যাটিক্যান নগরীতে গত ৩রা জুন দেহত্যাগ করেন। বিভিন্ন আদর্শের সঙ্ঘাতে বিভক্ত পৃথিবীতে যাঁহারা শান্তি ও সৌহার্দ্যে বিশ্বাসী, পোপ জন ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

পোপ জন ১৮৮১ খৃঃ ২৫ নভেম্বর ইতালির এক কৃষক-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া খৃষ্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরুর পদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বনাম ছিল অ্যাঞ্জেলো গামে পেসা রনসালি। বিশ্বের বিবদমান শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বোঝাপড়ার আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

ভ্রম-সংশোধন

এই সংখ্যার ৩০২ পৃঃ ২০ পঙ্‌ক্তিতে 'বিপ্লব সংস্কৃতির পূর্বগামী' স্থলে পড়িবেন: 'সাংস্কৃতিক জাগরণ বিপ্লবের পূর্বগামী'।



ত্রিপুরায় বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

[সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও আবেদন]

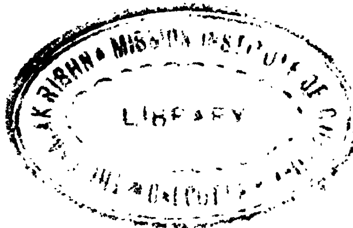
ত্রিপুরা রাজ্যে বিলোনিয়া মহকুমায় ঋষ্যমুখ অঞ্চলে—আগড়তলা হইতে প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণে পাকিস্তান সীমান্তে অভয়নগর, জয়পুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি ৭টি গ্রামে গত ১০ই জুন মিশন সেবাকার্য শুরু করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে ১৪৫০ ধুতি ও শাড়ী, ১০০০ ছোটদের পোশাক, ৩১৩২ পাউণ্ড দুগ্ধ বিতরণ করিয়াছেন। কিছু কম্বল এবং ঔষধপত্রাদি বিতরণ করিয়াছেন।

তারপর ২৫শে জুন হইতে বিলোনিয়ায় কেন্দ্র করিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে সেবাকার্য করিতেছেন; প্রায় ২০,০০০৲ টাকা মূল্যের বস্ত্রাদি এই অঞ্চলে বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই কার্যের জন্য আমরা সহৃদয় দেশবাসীর কাছে অর্থ-সাহায্যের আবেদন করিতেছি। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ—বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া, এই ঠিকানায় সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে।

(স্বাঃ) বীরেশ্বরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ

৭. ৭. ৬৩



কথাপ্রসঙ্গে

'বীরভোগ্যা স্বাধীনতা'

ভারত যখন যুগযুগব্যাপী পরাধীনতার পঙ্কে নিমগ্ন, বিদেশীর ঘৃণাস্পদ ও স্বদেশীর ঈর্ষাস্থল—ভারতবাসী যখন স্বপ্নেও যথার্থ স্বাধীনতার কথা চিন্তা করিত না বা খাঁচার পাখির মতো উদার উন্মুক্ত আকাশে বিচরণের কথা চিন্তা করিতে ভয় পাইত, তখন প্রাচীন ভারতের মুক্ত মহান্ জীবনের আদর্শ নবীন বিক্রমে সারা বিশ্বে যিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহারই কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল নব ভারতের স্বদেশমন্ত্র!

স্বাধীনতা-উৎসবের আয়োজনে আজকাল সে মহামন্ত্র ছোট বড় কেহ মনে করে বলিয়া মনে হয় না, যাঁহাদের মনে পড়ে, তাঁহারাও শৈশবের পাঠ বলিয়াই উহা উপেক্ষা করেন, অবহেলা করেন, হয়তো বা অপ্রয়োজনীয় এবং কালের অনুপযোগী মনে করেন! কিন্তু মহাকাল তাহার অন্যরূপ মূল্যায়ন করিয়াছেন, তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাদের আবার সেই পুরাতন পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। যে পাঠ গ্রহণ করিয়া একদিন স্বাধীনতার স্বপ্ন হৃদয়ে হৃদয়ে আন্দোলিত হইয়াছিল—যে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শত শত বীর রক্তরেখার স্বাক্ষরে 'মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত' হইতে অগ্রসর হইয়াছিল, আজ আবার সেই আহ্বান আসিয়াছে, আবার শোনা যাইতেছে, 'ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত'।

সেই সম্পূর্ণ অনাসক্ত সন্ন্যাসী পুরামাত্রায় মানবপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিক হইয়াও ষোল আনা ভারতপ্রেমিক তথা স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি জানিতেন ভারতবাসীর ব্যাধি কোথায়, তিনি জানিতেন সে ব্যাধি নিরাময়ের ঔষধ ও পথ্য!

সত্ত্বের ধুয়া ধরিয়া যে দেশ তমঃসমুদ্রে ডুবিতে বসিয়াছে, তাহার জন্য তাঁহার প্রথম বিধান—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় তীব্র বিদ্যুৎ-সঞ্চারী রজোগুণ! জন্মালস বৈরাগ্য লইয়া যে ধ্যান করিতে বসিয়া নিদ্রামগ্ন হয়, তাহার জন্য তাঁহার বিধান—কর্ম, কর্ম, কর্ম! নিজের অক্ষমতার দরুন যে অন্যায়ের প্রতিকার করিতে না পারিয়া সবলের অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিতে বাধ্য হয়, তাহার প্রতি তাঁহার নির্দেশ—আঘাত করো! সে অপমানের যুগে অবনমিত ভারতবাসীকে পূর্ণ মনুষ্যত্বে উদ্বোধিত করিবার জন্য তিনি বজ্রকণ্ঠে সকলকে অন্তরের অন্তস্তল হইতে বলিতে বলিয়াছেন, 'সদর্পে বলো—আমি ভারতবাসী—ভারতবাসী আমার ভাই'!

এই মহামন্ত্র কি আমরা ভুলিয়া যাইব?—ভুলিয়া গেলে জাতি হিসাবে আমরা বাঁচিব কি করিয়া? প্রথমে অনুভব করিতে হইবে—সগর্বে অনুভব করিতে হইবে—'আমি ভারতবাসী', তারপর অনুভব করিতে হইবে—'ভারতবাসী আমার ভাই'!—ইহা এক বিশাল অনুভূতি, বিরাট সম্ভাবনাময়! দেশকে ভালবাসার অর্থ শুধু দেশের মাটীকে, ভূগোলকে, সীমানাকে ভালবাসা নয়; দেশকে ভালবাসার অর্থ দেশের ইতিহাস ও কৃষ্টিতে গর্ব অনুভব করা, দেশকে ভালবাসার অর্থ দেশবাসীকে ভালবাসা, তাহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। 'মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত' হওয়ার অর্থ ভাইয়ের সেবায় আত্মনিয়োজিত হওয়া।

স্বামীজী জানিতেন—মাহুষ ভুলিয়া যায়, বিশেষত তমোগুণাচ্ছন্ন ভারতবাসী প্রমাদ ও আলস্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। তাই বজ্রের মতো কর্ণবিদারী ধ্বনিতে দেশবাসীর শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তীব্র রজোগুণের সঞ্চার করিবার বাসনায় তিনি মহামন্ত্র 'স্বদেশমন্ত্র' ঘোষণা করিবার সময় ছত্রে ছত্রে বলিতেছেন : ভুলিও না—ভুলিও না —ভুলিও না!

তাঁহার বড় ভয়—দেশবাসী ভুলিয়া যাইবে। ভুলিয়া যাইবে তাহার জীবনের মহান্ আদর্শ, ভুলিয়া যাইবে তাহার স্বরূপ, তাহার ঐতিহ্য—তাহার কৃষ্টি, তাহার ইতিহাস। তাই পূর্বাহ্নেই তিনি সাবধান করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার সাবধান বাণী—তাঁহার সেই স্বদেশমন্ত্রের প্রতিটি অক্ষর নূতন অর্থ লইয়া প্রতিভাত হইতেছে, আমাদের ইহার অর্থ বুঝিতে হইবে, এবং তদনুযায়ী জীবন গঠন করিতে হইবে, প্রয়োজন হয়—মোহময় অনেক কিছু বিসর্জন দিয়া, ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন আদর্শে জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাই স্বামীজীর আহ্বান।

জাতীয় জীবনাদর্শ গঠনের প্রথমেই তিনি আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন :

এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ, দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?

স্বামীজী তাঁহার ধ্যানসিদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। ভারত জাগিতেছে, ভারত উঠিতেছে, ভারত স্বাধীনতা লাভ করিতেছে। এমনভাবে জাগিতেছে যে আর শীঘ্র নিদ্রাগত হইবে না, এমনভাবে উঠিতেছে যে কোন শক্তি তাহাকে অবনত করিতে পারিবে না। কিন্তু এ উত্থান এ জাগরণ কখনও পরের সাহায্যে সম্ভব নয়, নবজাগ্রত ভারতকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। স্বাধীন ভারতকে আত্মনির্ভর হইতে হইবে। পরানুকারী, পরনির্ভর, পরমুখাপেক্ষী হইলে কেহ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে না, সে অপরের ভাবে ভাসিয়া যায়! সর্বোপরি জানা দরকার ঐ প্রবৃত্তিগুলি দাস মনোভাবেরই পরিচায়ক, স্বাধীন মনের নয়! যাহারা দীর্ঘকাল বিভিন্ন জাতির দাসত্ব করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা বা কাজ করা কঠিন, কারণ ইহা তাহাদের অভ্যাসের মধ্যে নাই, তাই তাহারা সহজেই অনুকরণের এবং অনুসরণের পথ অবলম্বন করে, পরনির্ভর হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় স্বজাতি-বিদ্বেষ, নিজেদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা এবং জাতীয় জীবন অতি নিষ্ঠুর আত্মকলহে পর্যবসিত হয়। এই ভাবেই বহু-জাতি স্বাধীনতা হারাইয়াছে। ভারতও কি-ভাবে বার বার স্বাধীনতা হারাইয়াছে—সে ইতিহাস আজ নূতন দৃষ্টি সহকারে অধ্যয়ন করা উচিত। যে জাতি ইতিহাস-সচেতন, সে জাতি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ অঙ্গে ধারণ করিয়া আছে, এই সচেতনতা—এই সর্বদা জাগরূক থাকা, সাবধান থাকাই স্বাধীনতার মূল্য বলিয়া কথিত হয়। স্বাধীনতা অর্জন করা অপেক্ষা রক্ষা করা কঠিনতর—এ-কথা আজ ভারতবাসীর স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একদিন ভারতবাসী যে সাধনা করিয়াছিল—যে উন্নত চরিত্র গঠন করিয়াছিল, যে ত্যাগের আত্মবিসর্জনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহার শতগুণ শক্তিশালী আদর্শ প্রয়োজন। স্বাধীনতা লাভের পর কেন আমরা ধরিয়া লইয়াছি :

আর ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন নাই, এখন আমরা শুধু ভোগ করিব, আর উচ্চতর নীতির প্রয়োজন নাই, এখন যেমন করিয়া পারি অপরকে অর্থাৎ নিজেরই দেশবাসীকে নিজেরই ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিয়া, তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া আমি একটু গুছাইয়া লইব।

এই মনোভাব দেশের দৃঢ়তা নষ্ট করিতেছে,—সর্বতোভাবে ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। ত্যাগের আদর্শ ব্যতীত সেবার আদর্শ স্থাপিত হইতে পারে না, তা সে মানবসেবাই হউক আর দেশসেবাই হউক।

'তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন,—তোমরা বীর হও'—বীর সন্ন্যাসীর এই আহ্বান স্মরণ করিয়া আমরা যেন শক্তিমান্ জাতিগঠনের পথে অগ্রসর হই। তবে মনে রাখিতে হইবে এ বীরের বীরত্ব শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বীর হইবার প্রেরণা স্বামীজী দিয়া গিয়াছেন। এ বীরত্বের প্রধান পরিচয় ত্যাগ ও সেবায়। লোকচক্ষুর অন্তরালে নিন্দাস্তুতির উর্ধ্বে থাকিয়া, তিরস্কার পুরস্কার উপেক্ষা করিয়া সততার সহিত স্বীয় কর্তব্যসম্পাদনে যে বীরত্ব অর্জিত হয়, তাহাই স্বাধীনতার দৃঢ়ভিত্তি, তাহাই জাতীয় জীবন-গঠনের প্রধান উপাদান।

বিবেকবাণী

শ্রীপ্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবেকের বাণী বিবেকানন্দ তোমায় জানাই নমস্কার,
তোমায় পেয়ে ধন্য মোরা, ধন্য হ'ল এ সংসার।
জীবের সেবা করলে মোদের মিলবে ঘরেই ভগবান্,
মানুষ-প্রেমে প্রেমিক তুমি আনলে নূতন ভাবের বান!
আমরা জানি তোমার বাণী মুক্ত করে কুসংস্কার।

চিত্তজয়ীর মর্মবাণী বিশ্বে তোমার অভ্যুদয়,
নিত্য কালের ধর্মবীণায় তোমারই গায় জয়।
কর্মযোগে কর্মী তুমি, ভক্তিযোগে ভক্তিমান্,
বিত্তহীনের বিত্ত তুমি, শক্তিহীনের শক্তি মান!
শোনাও সবে 'ওঠ জাগো'—নবযুগের হুহুঙ্কার।

শ্রীজ্ঞানেশ্বরের 'অমৃতানুভব'

[দ্বিতীয় প্রকরণ—গুরুর স্তবন (প্রশস্তি)]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

গুরুর স্বরূপ-কথন ঃ

এখন উপায়—সাধনরূপ বনে যিনি বসন্ত (শোভা, সফলতা) আনয়ন করেন, যিনি আজ্ঞার (ব্রহ্মবিদ্যার) মঙ্গল সূত্র (শোভাস্বরূপ), যিনি অমূর্ত (নিরাকার), পরন্তু কারুণ্যের মূর্তিস্বরূপ (করুণা করিয়া মূর্তিগ্রহণ করেন—সেই যে শ্রীগুরু)। ১। অবিদ্যার (অজ্ঞানের) অরণ্যে (যে জীব জন্মমরণরূপ সংসারচক্রের দুঃখ ভোগ করিতে আসে, সেই জীব-দশাপ্রাপ্ত চৈতন্যের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়া যিনি ধাইয়া যান। ২। মায়ারূপ হস্তীকে বিনাশ করিয়া যিনি মুক্তিরূপ মুক্তার পকান্ন ভোজন করাইয়া থাকেন, সেই সদ্‌গুরু শ্রীনিবৃত্তিনাথকে বন্দনা করি। ৩। যাঁহার অপাঙ্গদৃষ্টিতে বন্ধন (জীবদশা) মোক্ষরূপ প্রাপ্ত হয়, যাঁহার কাছে গেলে জ্ঞাতা আত্মজ্ঞান লাভ করে। ৪। যিনি কৈবল্যরূপ স্বর্ণ দান করেন, যিনি ছোটবড় ভেদ করেন না, যিনি দ্রষ্টার দর্শন জয় করিয়াছেন (দ্রষ্টা-দর্শন ভাব থাকিতে দেন না)। ৫। যিনি সামর্থ্যের জোরে শিবেরও গুরুত্ব (মহত্ত্ব) জয় করেন, আত্মার (জীবাত্মার) আত্মমুখ দেখিবার যিনি দর্পণস্বরূপ। ৬। বোধরূপ চন্দ্রের কলা বিচ্ছুরিত হইলে যাঁহার কৃপারূপ পূর্ণিমার লীলায় পুনরায় একত্রীকৃত হয়। ৭। যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র (সাধনের) উপায়গুলি পূর্ণতা লাভ করে, প্রবৃত্তিগঙ্গা (কর্মমার্গ) যে শ্রীগুরু-রূপ সাগরে গিয়া স্থির হন। ৮। যাঁহার (অবিদ্যমানে) দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত, দৃশ্যের সম্মুখীন হয়, এবং যাঁহার দর্শনমাত্র এই সব বহুরূপ (দৃশ্য) লয়প্রাপ্ত হয়। ৯। যাঁহার শীতল প্রসাদরূপ সূর্যের প্রকাশে অবিদ্যারূপী রাত্রি স্ববোধ (আত্মজ্ঞান)-রূপ সুদিনে পরিণত হয়। ১০।

যাঁহার কৃপাসলিলে জীব এত শুদ্ধ হয় যে, শিবত্ব ('আয়োপাধিক ঈশ্বরত্বকে') অস্পৃশ্য মনে করিয়া অঙ্গে লাগিতে দেয় না। ১১। শিষ্যকে রক্ষণ করিতে গিয়া যিনি গুরুভাব বর্জন করেন, অথচ যিনি (গুরুশিষ্যভাবশূন্য হইয়াও) গুরুগৌরব ত্যাগ করেন না। ১২। একত্ব সুখের কারণ নহে, সুতরাং গুরুশিষ্য-সম্বন্ধের ছলে গুরু উভয়ের মধ্যে আপনাকেই দেখিতে পান। ১৩। যাঁহার কৃপাতুষার-বৃষ্টিতে অবিদ্যার নাশ হয়, এবং পরিণামে অপার জ্ঞানামৃত লাভ হয়। ১৪। বেদ্যকে (শ্রীগুরুকে) দেখিতে গেলে শ্রীগুরুর দৃষ্টি বেত্তাকে গ্রাস করে, পরন্তু যাঁহার দৃষ্টি উচ্ছিষ্ট হয় না। ১৫। যাঁহার কৃপাসাহায্যে জীব ব্রহ্মভাবের—'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ভাবের উপরে যায়, যিনি উদাস হইলে (অর্থাৎ গুরুকৃপা-বিনা) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপী জীব) তৃণাপেক্ষাও হীন হয়। ১৬। যে সাধক (গুরুর) উপাসনায় এমনিভাবে লাগিয়া থাকে যে তাঁহার অনুজ্ঞা পালনে জীবন উৎসর্গ করে, তাহার সমস্ত সাধনের উপায় সফল হয়। ১৭। যে গুরুর কৃপাদৃষ্টি-রূপ বসন্ত বেদরূপ বনে প্রবেশ না করিলে আত্মজ্ঞান-রূপ ফল হস্তগত হয় না। ১৮। যাঁহার কৃপাদৃষ্টির অগ্রভাগ (শিষ্যের) স্থূল দেহের উপর পড়িলে (স্পর্শ করিলে) তাহার দেহাত্মভাব নষ্ট হয়, অথচ

এই জয়ের কর্তৃত্ব যিনি স্বয়ং ভোগ করেন না। ১৯। যিনি (শিষ্যের) লঘুত্বের মূলধনের উপর 'গুরুত্বের' শ্রেষ্ঠ পদ লইয়া বসেন, এই মিথ্যা গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ নাশ করিয়া যিনি ভাগ্যবান্ (অর্থাৎ যাঁহার স্বয়ম্ভু-গুরুত্ব নষ্ট হয় না)। ২০।

অসৎরূপ (মায়ারূপ) জলে ডুবিতেছি, তখন যাঁহার ঘন (দৃঢ়, সমর্থ) সাহায্যে ত্রাণ পাওয়া যায়; এবং ত্রাণ করিবার পর যাহাকে আর কোথাও দেখা যায় না (সদ্গুরু-প্রসাদে তাহার আত্মস্থিতি লাভ হইলে, দেবাত্মবুদ্ধি জীবাত্মবুদ্ধি বা ব্রহ্মাত্মবুদ্ধি থাকে না—সর্বকর্ম-রহিত জ্ঞানমাত্র আত্মস্থিতিতে সে বিরাজ করে।)। ২১। সাবয়ব (সর্বগুণযুক্ত) এই ভূতাকাশ গুরুরূপ আকাশের সমকক্ষ নহে—এইরূপ কোন এক জ্ঞানঘন আকাশ যে গুরু। ২২। যাহার সংযোগে চন্দ্রাদির সুশীতল প্রকাশ হয়, অন্ধকার হইতে যাঁহার প্রকাশে সূর্য প্রকাশিত হয়। ২৩।
ভাবের ত্রাসিত শিবের (ঈশ্বরের) মূলস্বরূপ বিচার করিতে যে (সদ্গুরুরূপ) জ্যোতিষীর দরকার হয় (সদ্গুরুরূপী জ্যোতিষী তাহা মুহূর্তে বিচার করিয়া দেন।) ২৪। চাঁদনীরূপ অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া যদিও প্রকাশের আধিক্যে দ্বৈতাভাস হয়, তথাপি যে চন্দ্রের (গুরুরূপ) একত্বরূপ নষ্ট হয় না। ২৫। স্পষ্ট হইলেও যাঁহাকে দেখা যায় না, স্বয়ং-প্রকাশ হইয়াও যিনি প্রকাশিত নন, সর্বত্র বিদ্যমান থাকিয়াও যাঁহাকে কোথাও পাওয়া যায় না। ২৬। এখন যিনি 'যে', 'সে' ইত্যাদি শব্দের বিষয় নন, যাঁহাকে অনুমানের দ্বারা ধরা যায় না ('তাঁহার কাছে অনুমানের পঙ্ক্তি সাজাইয়া কী হইবে?'), যিনি কোনরূপ প্রমাণের কাছে সাড়া দেন না (যিনি প্রমাণ-নিরপেক্ষ)। ২৭। যেখানে (শিষ্যের) শব্দের লেখা পুঁছিয়া যায়, সেখানেই যিনি কথা বলিতে বসিয়া যান, অন্যের প্রতি যাঁহার একত্বভাব রুষ্ট হয় (অন্যের দ্বৈতভাব সহ্য করিতে পারেন না)। ২৮। সর্বপ্রকার প্রমাণের অন্ত হয়, তখন প্রমেয় বস্তুর (শ্রীগুরুর) আবিষ্কার হয়, প্রমাণের দ্বারা প্রকট না হইবার এই ইচ্ছা—ইহা অস্তিত্বহীনতার ইচ্ছা। ২৯। কেহ যদি বলে কদাচিৎ 'সামান্য দেখা যায়' (বুঝিতে পারা যায়), তবে 'দেখা যায়' এই কথাও যেখানে দোষযুক্ত (অর্থাৎ দেখা যায় না)। ৩০।

তেমন (সমরূপশূন্য) স্বরূপকে নমস্কার বা স্তুতি করিতে কি করিয়া পা বাড়ানো যায়? (কারণ) সদ্গুরু তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিবার নামও করিতে দেন না। ৩১। আত্মার আত্মপ্রবৃত্তি নাই, তবে 'নিবৃত্তি' এই নাম কি করিয়া হইল? তথাপি 'নিবৃত্তি' এই নামের মিথ্যাভাস (আভাসরূপ বস্ত্র) অর্থাৎ উপাধি ত্যাগ করা যায় না। ৩২। নিবারণ (নিরসন) করিবার অন্য কিছুই নাই, কি নিবারণ করিবে? শ্রীগুরু 'নিবৃত্তি' এই নাম কি করিয়া প্রাপ্ত হইলেন? ৩৩। সূর্যের সম্মুখে কি অন্ধকার গোচর হয় (দেখা যায়)? তথাপি কি তাঁহাকে 'তমারি' এই নাম দেওয়া হয় না? ৩৪। ইঁহার (সত্তার) উপর মিথ্যার আভাস হয়, ইঁহার (স্বরূপপ্রকাশে) জড়বস্তু প্রকাশিত হয়, যাহা ঘটিবার নহে তাহাও ইঁহার মায়ায় ঘটিয়া যায়। ৩৫। হে গুরো, (আপন) মায়ায় যাহা দেখাও, তাহা মায়িক (মিথ্যা) বলিয়া ত্যাগ করো; মায়ার অতীত তোমার স্বরূপ কাহারও 'বিষয়' হয় না। ৩৬। শিব শিব! হে সদ্-গুরুরাজ! তোমার গূঢ় স্বরূপ সম্বন্ধে কি করা

যায়? তোমার স্বরূপ নির্ধারণ করিতে গেলে তুমি কি ধরা দাও? কি সেই নির্ধারণ টিকিতে দাও? ৩৭। নানাপ্রকার নামরূপের (মিথ্যা) সৃষ্টি করিয়া তাহা উৎসন্ন করিয়া দাও, আপন সত্তার উপর যে নামরূপের মিথ্যা আরোপ হয়, তাহার আবেশে কি সন্তুষ্ট হও না? ৩৮। জীবভাব হরণ না করিয়া (শিষ্যের) শোভা চালু হইতে দাও না, স্বামী (সেব্য) ও ভৃত্যের (সেবকের) যে সম্বন্ধ থাকিবে, তাহাও নহে (চাও না)। ৩৯। (নামরূপশূন্য গুরুর) আত্মত্ব বিশেষ নাম সহ্য করিতে পারে না, আর অধিক কি বলিব? তাঁহার কাছে কিছুই চলে না। ৪০।

সূর্যের সম্মুখে যেরূপ রাত্রি টিকিতে পারে না, কিংবা লবণ জলে পড়িলে যেমন তাহার লবণত্ব থাকে না, জাগ্রত হইলে যেমন নিদ্রা থাকিতে পারে না। ৪১। কর্পূরের সুন্দর অলঙ্কার যেমন অগ্নির কাছে লইয়া গেলে অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি তাঁহার কাছে (শিষ্যের) নামরূপ টিকে না। ৪২। (শ্রীগুরুর) হাতে-পায়ে পড়িলেও বন্দ্যত্বে স্বীকার করেন না, (বন্দ্যভাবে আসিতে চান না) আগ্রহ করিলেও ভেদভাবের কবলে পড়িতে চান না। ৪৩। উদয়াস্তভাবশূন্য রবি যেমন নিজের উদয় করে না, তেমনি (নিত্যবন্দ্য) শ্রীগুরু বন্দনা করিতে গেলেও বন্দ্য হন না। ৪৪। যাহা কিছু করা হউক না কেন, নিজে যেমন নিজের সম্মুখে আসা যায় না, তেমনি তিনি নিজের বন্দ্যত্ব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। ৪৫। আকাশের দর্পণে যেমন প্রতিবিম্বের ছাপ পড়ে না, তেমনি কেহ নমস্কার করিতে গেলে শ্রীগুরু তাহার বন্দ্য হন না। ৪৬। তিনি যদি বন্দ্য না হইতে চান, হইবেন না,—এ বিরুদ্ধতার আমি কি বর্ণনা করিব? পরন্তু যে বন্দনা করিতে যায় তাহার (অস্তিত্বই) চিহ্নমাত্র থাকিতে দেন না (আপনার স্বরূপ হইতে ভিন্ন থাকিতে দেন না)। ৪৭। অঙ্গে পরিহিত ধুতির একদিক খুলিয়া দিলে অন্যদিক আলগা না করিলেও পড়িয়া যায়। ৪৮। অথবা প্রতিবিম্ব যখন নষ্ট হয়, তখন যেমন (যাহার প্রতিবিম্ব সেই বিম্বের) বিম্বত্বও সঙ্গে লইয়া যায়, তেমনি যিনি বন্দনাকারীর সহিত আপন বন্দ্যত্বও নাশ করেন। ৪৯। যেখানে রূপ নাই) সেখানে দৃষ্টির কিছুই (কোন উপযোগিতাই) নাই, এইরূপ দশাপ্রাপ্ত আমার পক্ষে এখন শ্রীগুরুর চরণই ফলপ্রদ। ৫০।

পলিতা ও তেলের সংযোগে তৈয়ারী দীপের শিখা কি কর্পূরের জ্যোতির সমান হয়? ৫১। দুইটি (অগ্নি ও কর্পূর) পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত হইলে, দুইটিই একেবারে নাশপ্রাপ্ত হয়। ৫২। তেমনি শ্রীগুরু আমাকে দেখিতে না দেখিতে, বন্দ্য ও বন্দিত – এই দুই ভাবই নষ্ট হয়। যেমন জাগিয়া উঠিলে স্বপ্নের কান্তা অদৃশ্য হয়। ৫৩। আর অধিক কি বলা যায়? যে ভাষায় দ্বৈতের প্রমাদ আছে, সেই দ্বৈত ভাষা ত্যাগ করিয়া আমি স্ব-সখা শ্রীগুরুদেবকে বন্দনা করিলাম। ৫৪। ইঁহার সখ্য এক আশ্চর্য ব্যাপার। ইঁহার অঙ্গে একত্বও নাই, 'রূপও' নাই, আর (পরন্তু) গুরুশিষ্য দ্বৈতভাবের বিস্তার করিয়াছেন। ৫৫। দেখ, দ্বৈত বিনা আপনা-আপনির মধ্যে কেমন এই (গুরুশিষ্য) সম্বন্ধ। ইহাতে বিলক্ষণ (আশ্চর্যের) কিছুই নাই—ইহা যে হয় না, এমন নহে। ৫৬। যে (আকাশ) জগৎকে গর্ভের মধ্যে ধারণ করে, সেই আকাশের ন্যায় যিনি বৃহৎ, তিনি অস্তিত্বের ত্রাস (রাত্রি, অভাবাত্মক দশা) সহ্য করেন। ৫৭।

শিষ্য যেমন পূর্ণতা ও অপূর্ণতার আধার, তেমনি যাঁহার ঘরে (অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব এই) দুই বিরুদ্ধ ধর্মের অতিথি সৎকার হয়। ৫৮। তেজ (প্রকাশ) ও অন্ধকারের মধ্যে পরস্পর কোন সখ্য (সামঞ্জস্য) নাই, পরন্তু সূর্যের কাছে এক সূর্যই আছে। ৫৯। 'এক' বলিলে যে ভেদ হয়, সেখানে কি অনেকত্ব থাকিতে পারে? বিরুদ্ধতা কি আপনার বিরুদ্ধতা সনাক্ত করে? ৬০।

সেইজন্য 'শিষ্য' ও 'গুরু' এই দুই শব্দের অর্থ এক শ্রীগুরুই। পরন্তু শ্রীগুরুই নিজে শিষ্য ও গুরু হইয়া বিলাস করেন। ৬১। সুবর্ণ ও অলঙ্কার যেমন এক সুবর্ণেই আছে, (অথবা) চন্দ্র ও চাঁদনী (চন্দ্রের প্রকাশ) যেমন চন্দ্রেই বাস করে। ৬২। অথবা কর্পূর ও তাহার সুগন্ধ যেমন কেবল কর্পূরই, গুড় এবং তাহার মিষ্টত্ব যেমন শুধু গুড়ই। ৬৩। তেমনি গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধে যদিবা কোন দ্বৈতভাব দৃষ্ট হয়, গুরুশিষ্যরূপে এক (গুরুই) বিলাস করেন। ৬৪। দর্পণের মধ্যে মুখের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা মুখই (অন্য কিছু নহে)—ইহা যে মুখ তাহা আপন-জ্ঞানেই বুঝিতে পারে। ৬৫। (বিচার করিয়া) দেখ, নির্জন বনে কেহ নিদ্রা গিয়াছে, সে তো নিশ্চিত একলাই, পরন্তু যখন সে জাগিয়া উঠে, তখন যে জাগে এবং যে জাগ্রত করে—এ উভয়েই সেই। ৬৬। যে জাগিয়া উঠে, সেই জাগাইয়া তোলে, তেমনি যে বুঝে সেই বুঝায়, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এমনই। ৬৭। দর্পণ বিনাই চক্ষু যদি আপনাকে দেখিবার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, তবেই সদ্‌গুরুর এই লীলা বর্ণনা করা যায়। ৬৮। এই ভাবে দ্বৈতের উদ্ভব ঐক্যের বিঘ্ন করিতে দেয় না, শ্রীগুরু (গুরুশিষ্যের) আত্মীয়তা বাড়াইতে থাকেন। ৬৯। নিবৃত্তি যাঁহার নাম, নিবৃত্তি যাঁহার শোভা, যে নিবৃত্তি-রূপ শ্রীগুরুর ঐশ্বর্য নিবৃত্তিই। ৭০।

তাহা হইলেও প্রবৃত্তির বিরোধ করে বা নিবৃত্তির জ্ঞান আনয়ন করে, এইরূপ সংজ্ঞার নিবৃত্তি নহে। ৭১। রাত্রি আপনাকে নাশ করিলে দিবসের উন্নতি (প্রকাশ, উৎকর্ষ) হয়। তেমনি প্রবৃত্তি নিরোধ করিয়া নিবৃত্তি লাভ করা—আমার শ্রীগুরু নিবৃত্তি তেমন নহেন। ৭২। পালিসের সাহায্যে যে রত্নের প্রভা বাড়ানো হয়, আমাদের শ্রীগুরু তেমন রত্ন নহেন, ইনি স্বয়ংসিদ্ধ, চক্রবর্তী। ৭৩। গগনকে পেটে ভরিয়া চন্দ্রের যখন পুষ্টি বৃদ্ধি হয়, (অর্থাৎ চন্দ্রের কিরণ আকাশে ছড়াইয়া যায়) তখন তাহা হইতেই চাঁদনী উঠে এবং তাহার অঙ্গ হইয়া যায় (চন্দ্র ও চাঁদনী) এক হইয়া যায়। ৭৪। তেমনি শ্রীগুরুর নিবৃত্তি-ভাবের কারণ তিনি নিজেই—যেমন আপন সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে ফুল নিজেই ঘ্রাণ (নাসিকা) হয়। ৭৫ পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া যদি দৃষ্টি মুখের সৌন্দর্য দেখিতে পায়, তবে কি দর্পণ খুঁজিবার দরকার হয়? ৭৬। রাত্রি চলিয়া গেলে এবং দিন আসিলে কি সূর্যের সূর্যত্ব আনিতে হয়? ৭৭। সুতরাং (আমার) স্বামী (শ্রীগুরু নিবৃত্তিনাথ) বোধ্য-বোধের (জ্ঞেয়-জ্ঞানের) কিংবা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হইবেন এইরূপ নহে—তিনি নিশ্চিত ভাবে নিবৃত্তি-স্বরূপই। ৭৮। এইভাবে যে শ্রীগুরুর অকৃত্রিম স্বয়ম্ভু নিবৃত্তিভাব, তাঁহার শ্রীচরণ এমনি ভাবে বন্দনা করিলাম। ৭৯। এখন জ্ঞানদেব বলিতেছেন—এইভাবে শ্রীগুরু প্রণাম করিয়া (পরা পশ্যন্তি প্রভৃতি) চার বাণীর ঋণ শোধ করিলাম। ৮০

'গুরুস্তবন' নামক দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত।

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা

[দ্বিতীয় পর্ব--পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

মধ্যযুগে উত্তর ভারতের ইতিহাস ইসলামের জয় ও বিস্তারের ইতিহাস, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি আলাদা। প্রাক্-মুসলমান আর্যসভ্যতা ও গৌরবকে অক্ষুণ্ণ ও অম্লান রাখবার দায়িত্ব দ্রাবিড়ভূমি দক্ষিণ ভারতই স্কন্ধে তুলে নিলে সমগ্র মধ্যযুগ ধরে। আজও এই কারণেই উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের বাইরের ও মনের চেহারা আলাদা। উত্তর ভারতের ধর্মে ও সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব গভীর। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়জাতি ধর্মে ও সংস্কৃতিতে উত্তর ভারতের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে প্রাচীন আর্যদের উত্তরাধিকারী। স্বামীজী বলেন, এর কারণ শঙ্কর ও রামানুজের এবং পরবর্তীকালে আরও অনেক সাধুসন্তের অভ্যুদয়। রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের পূর্বে আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান এরাই একাধিকবার ঘটিয়েছিলেন। রামানুজ ছিলেন ভক্তিমার্গের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য, একাদশ শতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাব। '...অত্যন্ত কার্যকর বাস্তব মতবাদের ভিত্তিতে এবং ভাব-ভক্তির বিরাট আবেদন লইয়া রামানুজ অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধর্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে জন্মগত-জাতিবিভাগ তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলেন, সর্বসাধারণের কথ্যভাষাই ছিল তাঁহার প্রচারের ভাষা। ফলে জনসাধারণকে বৈদিক ধর্মের আবেষ্টনীতে ফিরাইয়া আনিতে রামানুজ সম্পূর্ণভাবে সফল হইয়াছিলেন।' মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের পটভূমিকা-স্বরূপ স্বামীজী এইভাবে রামানুজকে স্থাপন করেছেন। '...দক্ষিণাঞ্চলে শঙ্কর ও রামানুজের অভ্যুদয়ের পরই এদেশের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে একতাবদ্ধ জাতি ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল।'

এই প্রসঙ্গে শৈব নায়ানার এবং বৈষ্ণব আলওয়ারদের কথাও স্মরণ রাখতে হবে। তাঁরা রামানুজেরও আগে। সপ্তম অষ্টম ও নবম শতাব্দীর এই অপূর্ব সাধকগণ সংস্কৃত সাহিত্যের চৌহদ্দিতে বিকশিত ভারতের গৌরব-গাথা ও ইষ্টদেবতার কাছে প্রার্থনার স্তোত্রসমূহ দক্ষিণ ভারতের জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে মাতৃভাষায় (প্রধানতঃ তামিলে) রচনা করলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চারণগণ এই সঙ্গীত দ্বারে দ্বারে পরিবেশন করেছেন, সমগ্র দক্ষিণ ভারতকে মুখরিত করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন জনগণকে, শক্তি দান করেছেন রাজা মন্ত্রী ও সেনাপতিদের। দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের পশ্চাতে 'নায়ানার ও আলওয়ার' খুব বড় কথা। তৎকালীন ভারতে আর কোথাও এ কথাটির প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে না। তখন দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের আধিপত্য। শঙ্কর রামানুজ প্রমুখ সন্তদের দক্ষিণ ভারতে জন্ম একটা আকস্মিক ঘটনা নয়।

এই ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিবেশে দক্ষিণ ভারতে চোল ও পরে পাণ্ড্যদের অপূর্ব অভ্যুত্থান তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। পল্লবদের পতনের সুযোগ নিয়ে দক্ষিণ ভারতকে সংহত করলেন অতি প্রবীণ তামিলভাষী চোলবংশের পরাক্রান্ত রাজগণ, তাঞ্জোর তাঁদের আদি

রাজধানী। এই বংশের রাজরাজ (৯৮৫-১০১৬) এবং পুত্র রাজেন্দ্র (১০১৬-১০৪৪) গড়ে তুললেন এক অপূর্ব সামুদ্রিক সাম্রাজ্য, ভারতমহাসাগর হ'ল তাঁদের স্বচ্ছন্দ যাতায়াতের ও বীরত্ব-প্রকাশের ক্ষেত্র, উত্তর ভারতের পূর্বাংশ পরিণত হ'ল রাজেন্দ্র চোলের সার্থক অভিযানের স্থলে। এই স্মৃতিকে অমর ক'রে রাখতে তিনি নূতন রাজধানী গড়লেন—গংগইকোণ্ড চোলপুরম্, যদিও উত্তর ভারতকে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন না স্বাভাবিক কারণে। শিল্পে ও স্থাপত্যে, সঙ্গীতে ও গাথায়, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে, পরাক্রমে ও সমৃদ্ধিতে, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে চোলনগরী হয়ে উঠল সমগ্র পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

তারপর মাদুরার পাণ্ড্যবংশের যুগ। চোল ইতিহাসের জের টেনে চললেন পাণ্ড্যরা। সমৃদ্ধির পরিচয়-স্বরূপ বহুবন্দর-শোভিত পাণ্ড্য-রাজ্যের নরপতিদের মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুন্দর পাণ্ড্য কুলশেখর ও জাতবর্মন সুন্দর পাণ্ড্য কীর্তিমান্ পুরুষ। ভিনিসীয় পরিব্রাজক মার্কো-পোলো এবং ঐতিহাসিক ওয়াসফ মুগ্ধ বিস্ময়ে পাণ্ড্যরাজ্যের সমৃদ্ধি ও পরাক্রম বর্ণনা করেছেন। এই ভাবে যখন দক্ষিণ ভারতে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির বলিষ্ঠ সুসংহত রূপায়ণ, উত্তর ভারতে তখন চলেছে ধর্মচ্যুত হিন্দুর একটানা বিপর্যয় ও পতনের ধারা, ধাপে ধাপে চলেছে মুস্লিম প্রাধান্য স্থাপনের নির্মম সার্থক অভিযান।

মুসলমান কি চেষ্টা করেনি দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করতে? হিন্দুর যে মন্দির তার অপরিমিত রত্নসম্ভার নিয়ে দুর্ধর্ষ ও সম্পদভিলাষী মুসলমান অভিযানকারীকে সর্বদা প্রলুব্ধ করেছে। সে মন্দিরের সংখ্যা ও সমৃদ্ধি তো বিন্ধ্যপাহাড়ের দক্ষিণে ভারতীয় ভূখণ্ডকে অসামান্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এর সংবাদ কি সে রাখত না? অবশ্য ভৌগোলিক প্রতিকূলতা ছিল? দূরত্ব ও দুরতিক্রম্যতা উত্তর-পশ্চিমের সিংহদ্বার দিয়ে অনুপ্রবেশকারী, উত্তর ভারতের সমস্যায় সদাবিব্রত তুর্কী মুসলমানের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেনি। তারপর চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বলদৃপ্ততায় ও রণকুশলতায় দিল্লীর অদ্বিতীয় সুলতান আলাউদ্দীন খিল্‌জি উত্তর ভারত বিজয় সম্পূর্ণ ক'রে তাঁর প্রখ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুরের আনুকূল্যে সুদূর দক্ষিণ ভারতে পাণ্ড্য রাজ্য পর্যন্ত সার্থক রক্তক্ষয়ী অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানতঃ রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে তিনি এর কোন স্থায়ী ফললাভ করতে পারেন-নি। দক্ষিণে হিন্দু-প্রাধান্যই বজায় রইল, যতদিন পর্যন্ত না কৃষ্ণা নদীর উত্তরকূলে বিরাট বাহ্‌মনী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে সে প্রাধান্যকে বিঘ্নিত ক'রে তুলল। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত, অর্থাৎ বাহ্‌মনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হাসান শাহ্‌ থেকে পরম বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ গওয়ানের হত্যা (১৪৮১) পর্যন্ত, যে মহম্মদ গওয়ান ছিলেন বাহ্‌মনী রাজ্যের সম্ভাবনাময় সংহতির শেষরশ্মি।

স্বামীজী তাঁর মূলসূত্রের অর্থাৎ ইতিহাসের উপর ধর্মের গভীর প্রভাবের বিশেষ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারতকে গ্রহণ করেছেন। 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, 'দক্ষিণ ভারতকে পদানত করিবার জন্য মুসলমানগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সে অঞ্চলের কোথাও একটি শক্ত ঘাঁটি নির্মাণ করিতে পারে নাই।'...'দক্ষিণ ভারতই তখন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল।'

স্বামীজীর এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরে বিজয়নগর-রাজ্যের উত্থান ও পতন আলোচনার যোগ্য। কৃষ্ণা-নদীর দুই তীরে অবস্থিত দুইটি রাজ্য—মুসলমান বাহ্‌মনী ও হিন্দু বিজয়নগর। উভয়ে পুরুষানুক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে সংখ্যাতীত সংঘর্ষে ও আহবে লিপ্ত হয়েছে; কারণ ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি সাংস্কৃতিক। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে এ এক অপূর্ব তাৎপর্যময় কাহিনী। এ কাহিনী সবিস্তারে যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে একটি বিষয় বড় আশ্চর্য ব'লে বোধ হয়। বাহ্‌মনী চায় ইসলামের বিস্তার। উত্তর ভারতে তুর্কী পাঠান যা করেছে, তাই করবে দক্ষিণ ভারতে বাহ্‌মনী। সুসংহত মুস্লিম রাজ্য দক্ষিণ ভারত জুড়ে সে প্রতিষ্ঠা করবে, ইসলামী সংস্কৃতি ও ধর্মের আর এক পীঠস্থান হবে সমগ্র দক্ষিণ ভারত। বাহ্‌মনী সুলতানদের যতই দোষ থাক না কেন, বীরত্বে ও রণকৌশলে তাঁরা উত্তর ভারতের মুসলমান নরপতিদের তো নিচে ছিলেন না।

অপরদিকে বিজয়নগর চায় ভারতের প্রাক্‌-মুসলিম আর্যসভ্যতার ধ্বজা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে। সর্বজয়ী ইসলামের গ্রাস থেকে দক্ষিণ ভারতকে মুক্ত রাখবার প্রতিশ্রুতি নিয়েই বুঝি বিজয়-নগরের জন্ম হয়েছে। এই দুই আদর্শের সংঘাত রাজনৈতিক কারণে এবং অর্থনীতির দিক দিয়ে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্তী আশ্চর্য উর্বরা রায়চুর দোয়া ভূমির মালিকানা দাবির সঙ্গে যুক্ত হয়ে দীর্ঘকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হ'ল। দুইটিই বৃহৎ রাজ্য, জনবল অর্থবল সৈন্যবল কারও কম নয়। বাহ্‌মনী-সুলতান প্রথম মহম্মদ (১৩৫৮-'৭৭), মুজাহিদ, ফিরুজশাহ্‌, আহম্মদশাহ্‌, আলাউদ্দিন প্রমুখ দুর্ধর্ষ বলদৃপ্ত নিষ্ঠুর রণকুশলী সুলতানদের কাছে যুদ্ধে বার বার পরাজয় বরণ করেছেন বিজয়নগরের প্রথম বুক্কারায়, দ্বিতীয় হরিহর, প্রথম দেবরায়, দ্বিতীয় দেবরায় প্রমুখ প্রখ্যাত নরপতিগণ। রাজ্যাংশ ছেড়ে দিতে হয়েছে, অজস্র আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে, হাজার হাজার নির্দোষ নরনারী বলি গেছে, ঘরবাড়ি শ্মশানে পরিণত হয়েছে, রাজধানী লুণ্ঠিত হয়েছে, তবু ধৈর্য হারায়নি বিজয়নগর, নতি স্বীকার করেনি কোন দিন। সুযোগ পেলেই আবার উঠেছে, আবার লড়েছে। শেষ পর্যন্ত বাহ্‌মনী রাজ্য ভেঙে গেল, পাঁচটি ছোট বড় মুসলমান রাজ্যে পরিণত হ'ল (আহ্‌মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বেরার ও বিদর), যাদের মধ্যে চললো পরস্পর তীব্র আত্মঘাতী সংঘর্ষ (খৃষ্টাব্দ ষোড়শ শতাব্দী)। এবার সুযোগ এল বিজয়নগরের, সুযোগকে সার্থক করলেন ওই দেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-'৩০)। বিজয়নগর গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করলে।

এ এক আশ্চর্য কাহিনী। সিউয়েল সাহেব (Sewell) তাঁর 'একটি বিস্মৃত সাম্রাজ্য' (A Forgotten Empire) নামক অপূর্ব গ্রন্থে বিজয়নগরের কীর্তি-কাহিনীকে অমর ক'রে রেখেছেন। তিনি এ রাজ্যের জন্মকাহিনীতে ইসলামের প্রতিরোধ এবং হিন্দুর আত্মরক্ষার আদর্শ খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু তিনি ঠিক সন্ধান পাননি, কোথা থেকে বিজয়নগর এত শক্তি লাভ করলে, যা শত পরাজয়ে ক্ষয় পেল না। সহস্র বিপর্যয়েও হাল ছেড়ে না দিয়ে দক্ষিণ ভারতে তার আদর্শ, আর্য ভারতের আদর্শ সে শুধু বজায় রাখলে না, তাকে দক্ষিণ ভারতের বলিষ্ঠ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকাররূপে চিহ্নিত ক'রে গেল।

স্বামীজী এর সন্ধান পেয়েছেন। বিজয়নগরের আর এক নাম বিদ্যানগর, যদিও এ নামটি ইতিহাসে প্রচলিত নেই। স্বামীজী একবার প্রসঙ্গক্রমে 'বিদ্যানগর' নামটিই ব্যবহার করেছেন। বিদ্যারণ্যের নামেই কি বিদ্যা-নগরের নাম, নামের মধ্যে উক্ত রাজ্যের তাৎপর্যই কি স্বামীজী ফুটিয়ে তুলেছেন?

বিজয়নগরের জাগরণ ও গৌরবের পশ্চাতে রয়েছে দক্ষিণ ভারতের আকাশ ও বাতাস, জল ও স্থল। নায়ানার ও আলওয়ারদের উদ্দীপনাময় সঙ্গীতের সুর তখনও সেখানে ধ্বনিত হচ্ছে। শঙ্কর-রামানুজের ঐতিহ্য তখনও জাগ্রত। সর্বোপরি ছিল মাধব বিদ্যারণ্য এবং বেদের শ্রেষ্ঠ টীকাকার সায়নাচার্যের সাধনা ও দার্শনিক পরিচালনা। এই মহামনীষী সন্ন্যাসী ভ্রাতৃদ্বয় বিজয়নগর-প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গমবংশের হরিহর ও বুক্কের গুরু ও পথপ্রদর্শক। মাধব বিদ্যারণ্য বিজয়নগর রাজ্যের প্রত্যক্ষ দার্শনিক ও মন্ত্রদাতা। তাঁর বিখ্যাত শিষ্যদ্বয় একদা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং তাঁরই প্রেরণায় এবং প্রয়াসে হরিহর ও বুক্ক পৈত্রিক ধর্মে ফিরে আসেন এবং গুরুর স্বপ্ন ও সাধনাকে রূপ দিতে গিয়ে বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে আর্য সংস্কৃতি ও ধর্মের আদর্শগত শক্তি দিয়ে তিনিই বিজয়নগরের বনিয়াদ এত দৃঢ় ক'রে রচনা করেছিলেন। বিজয়নগরের শক্তির উৎস মাধব বিদ্যারণ্য ও সায়নাচার্যের নেতৃত্বে যে আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তাতেই নিহিত রয়েছে। যে ইতিহাস আমরা পাঠ করি, তাতে এত বড় একটা ঘটনার শুধু ইঙ্গিতমাত্র আছে।

একটা সন্দেহ হয়তো যুক্তিবাদী ইতিহাস-সন্ধানীর মনে জাগবে। প্রাচীন আর্য ধর্মকে ফিরিয়ে আনা মানে—বিজয়নগরের পিছন ফিরে তাকানো, এ তো প্রগতির লক্ষণ নয়, এ যে অধোগতি, এ যে প্রতিক্রিয়াশীলতা। এতে এত গৌরব কিসের? বরং তেলিকোটার প্রান্তরে (১৫৬৫ খৃঃ) বিজয়নগর যে বিধ্বস্ত হয়ে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল, সেটাই স্বাভাবিক ঘটনা। তার জন্যে ভাবপ্রবণ সিউয়েল সাহেবের সঙ্গে চোখের জল ফেলে লাভ কি! বিজয়নগর-পতনের করুণ বিবরণ সিউয়েল সাহেবের 'একটি বিস্মৃত সাম্রাজ্য' গ্রন্থের অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

এর উত্তর স্বামীজী বহুস্থানে দিয়েছেন তাঁর রচনা ও বাণীতে, এ প্রবন্ধে তার একাধিক উল্লেখ আছে। ভারতীয় ধর্ম তো কোন ধর্মমত নয় যে, তা পিছনে টানবে, সকল ধর্মের সকল মতের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিতে সমৃদ্ধ এ মানব-ধর্ম, এ ধর্মের প্রাণ সহনশীলতা ও সমন্বয়। ভারতবর্ষের মর্মবাণী এরই মধ্যে বিধৃত, ভারতের জাগরণ ও সমৃদ্ধি, প্রগতি ও শান্তি একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। এই ধর্মকে বাদ দিয়ে ভারতের ইতিকথা ভাবা যায় না।

বিজয়নগরে ফিরে আসি। কৃষ্ণদেবরায়ের আমলে বিজয়নগরের প্রসার, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি, শিল্প ও স্থাপত্যের বিকাশ ভারতের ইতিহাসে এক অসামান্য অধ্যায় যোজনা করেছে। অবশ্য এর প্রস্তুতি চলছিল পূর্ব থেকেই। বিজয়নগরের সঙ্গে বাহ্‌মনীর বৈষম্যের নানা দিকের মধ্যে একটি প্রধান দিক এই যে, বাহ্‌মনীরাজ্যে হিন্দু জনগণ ছিল উৎপীড়িত ও শোষিত উত্তর ভারতের তৎকালীন হিন্দুর মতোই, আর বিজয়নগরে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি সমান অধিকারে বাস ক'রত। নিকলোকনিট,

আবদুর রেজ্জাক, নুনিজ ও পায়েস প্রমুখ বিভিন্ন দেশের পর্যটকগণ বিভিন্ন সময়ে বিজয়নগর পরিদর্শন করেছেন, অবাক্‌বিস্ময়ে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কেউ কেউ লিখেছেন যে, সমগ্র বিশ্বে বিজয়নগর আর দ্বিতীয়টি নেই। যা কর্ণ কখনও শ্রবণ করেনি, চক্ষু কখনও দর্শন করেনি, বিজয়নগর ঠিক সে-রকম একটি কল্পনার রাজ্য। কিন্তু এ তো কল্পনা নয়।

কৃষ্ণদেবরায়ের মৃত্যুর পর বিজয়নগর শক্তিহীন হয়ে প'ড়ল, সামরিক দিক দিয়ে নয়, নৈতিক বা ধর্মের দিক দিয়ে। কৃষ্ণদেবরায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব যখন সিংহাসনে আসীন, তখন শাসনের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বলদর্পী উচ্চাভিলাষী অমাত্য রামরাজার হাতে। কূটনীতিতে সিদ্ধহস্ত এই শাসক উত্তরের তিনটি মুসলিম রাজ্য বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও আহ্‌মদনগর (আর দুইটি স্বাধীন সত্তা তখন লুপ্ত হয়ে ওই তিনটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে)—এদের পরস্পর রেষারেষির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ক'রে বিজয়নগরকে আপাতদৃষ্টিতে আরও বড় ক'রে তুললেন। একদা আহ্‌মদনগরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ ক'রে বিজয়নগরের হিন্দু সৈন্যবাহিনী রামরাজার প্রতিশোধমূলক আদেশে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করলে, মসজিদ ধ্বংস করলে, কোরান অপবিত্র করলে। ঐ তিনটি রাজ্যের জন্মকাল থেকে যা সম্ভব হয়নি, ইসলামের অবমাননায় এবার তাই হ'ল। ইসলামের মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে এবং হিন্দুর উপর চরম পালটা প্রতিশোধ নিতে দাক্ষিণাত্যের এই তিন শক্তি সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল এবং তেলিকোটার প্রান্তরে (১৫৬৫) বিজয়নগরের সমাধি রচনা করলে। একটি মাত্র যুদ্ধে এতবড় বিপর্যয় ও বিলুপ্তি পৃথিবীর ইতিহাসে আর বোধহয় কখনও হয়নি।

কালক্রমে কতকগুলি স্বাভাবিক কারণে একটা জাতির পতনের সময় আসে। দুই শতাব্দীর অধিককাল বিজয়নগর তার তাৎপর্যময় গৌরবের ধারা বহন করেছিল ভীষণ প্রতিকূলতার মাঝেও। তারপর নানা কারণে তার বিলুপ্তি ঘ'টল। রামরাজার দম্ভ, আদর্শচ্যুতি, গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা এবং সামগ্রিক-ভাবে বিজয়নগরের সমাজে ধর্মের নামে নানা নিষ্ঠুর বিধির প্রচলন এবং আচারসর্বস্বতা (বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে তার অনেক উদাহরণ আছে)—এক কথায় ধর্মের নামে ধর্মহীনতা বিজয়নগরের পতন ঘটাতে প্রভূত সাহায্য করেছিল কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু দক্ষিণে হিন্দুর অভ্যুত্থানের ইতিহাস বিজয়নগরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল না। এ-বিষয়ে মধ্যযুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে মৌলিক প্রভেদ।

দাক্ষিণাত্যে ও দক্ষিণ ভারতে মুসলমানের সার্থক বিজয়কাহিনী মুঘল যুগের গৌরবের সঙ্গে জড়িত। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাজাহান একে একে দাক্ষিণাত্যে মুঘল-প্রাধান্য স্থাপন সম্পূর্ণ করলেন। দাক্ষিণাত্যে আহ্‌মদনগর ছাড়া আর কোন মুস্লিম রাজ্যের বিলুপ্তি সাধন ক'রে এ প্রাধান্য স্থাপিত হয়নি, দক্ষিণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ওই তিনজন বিচক্ষণ মুঘল সম্রাট্ সচেতন ছিলেন। কিন্তু তারপর ঔরঙ্গজীব দক্ষিণে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত জয় ক'রে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হবার অভিলাষে তাঁর 'দাক্ষিণাত্য-নীতি' প্রয়োগ করলেন। রাজত্বকালের শেষার্ধে তিনি দাক্ষিণাত্যে এলেন পাত্রমিত্র উজীর-ওমরাহ সৈন্যসামন্ত নিয়ে। আর ফিরে যেতে পারলেন না তাঁর সাধের

দিল্লী নগরীতে। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। তারপর তাঁর পক্ষে সবচেয়ে বড় কণ্টক মারাঠা উৎসাদনের পালা। নবপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন মারাঠা জাতির জনক ঔরঙ্গজীবের পরম শত্রু ছত্রপতি শিবাজী তখন পরলোকে। এই তো পরমক্ষণ! বীর্যবান্ কিন্তু শিবাজীর আদর্শচ্যুত পুত্র ছত্রপতি শম্ভাজীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা ক'রে পুত্র শাহুজীকে মুঘল-হেরেমে আশ্রয় দিয়ে ঔরঙ্গজীব আত্মপ্রসাদে মগ্ন হলেন এই ভেবে যে, এতদিনে শিবাজীর ঔদ্ধত্যের চরম-শাস্তি দেওয়া হ'ল। মারাঠা-জাতি আজ তাঁর পদানত। ঔরঙ্গজীবের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা আচার্য যদুনাথ লিখছেন : মনে হ'ল ঔরঙ্গজীব যা চেয়েছিলেন, তা এতদিনে সম্পূর্ণ পেয়ে গেছেন। মুঘল সাম্রাজ্য আজ সমগ্র ভারত জোড়া (১৬৮৯)। কিন্তু আসলে এখানেই আরম্ভ হ'ল ঔরঙ্গজীবের তথা মুঘল সাম্রাজ্যের পতন। শিবাজী ও তাঁর অনুচরদের ঔরঙ্গজীব বলতেন পার্বত্য মূষিকের দল। এই পার্বত্য মূষিকদলই মুঘল সাম্রাজ্যের বনিয়াদকে ঝাঁঝরা ক'রে দিলে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু সে-কথা বলবার আগে মারাঠা-জাতির উত্থানে স্বামীজীর সূত্র আরোপ করা যায় কিনা, বিচার করা দরকার। মারাঠা-জাতির অসামান্য কৃতিত্বের কাহিনী পূর্বোক্ত প্রবন্ধে যথানিয়মে অতি অল্প কথায় স্বামীজী আশ্চর্য-ভাবে বলেছেন : 'সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-বিজয় যখন প্রায় সমাপ্তির মুখে, ঠিক তখনই সেই ভূখণ্ডের পার্বত্যদেশ হইতে, মালভূমির নানা প্রান্ত হইতে কৃষকগণ অশ্বারোহী যোদ্ধবেশে দলে দলে কাতারে কাতারে রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। রামদাস-প্রচারিত, তুকারাম-সমুদ্গীত ধর্মের জন্য তাহারা প্রাণবিসর্জন দিতে কৃতসংকল্প; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য নামে মাত্র পর্যবসিত হইল।'

স্বামীজীর এ বিশ্লেষণ যে কত বড় ঐতিহাসিক সত্য, তা ইতিহাসের পাঠক-মাত্রেই জানেন। স্বাধীন মহারাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি ওই দেশের আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের মধ্যে। গুরু রামদাসের স্বপ্ন ও সাধনার বলিষ্ঠ রূপায়ণ তাঁর মন্ত্রশিষ্য শিবাজীর (জন্ম ১৬২৭ বা '৩০, মৃত্যু ১৬৮০) আশ্চর্য কর্মধারায়, নবজাগ্রত মারাঠা-জাতির প্রাণশক্তি রামদাস-প্রদত্ত গৈরিক পতাকার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের মধ্যে। শিবাজীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা-লাভের পূর্বেই একে একে সন্ত নামদেব, তুকারাম ও রামদাসের সাধনা ও প্রচারের ফলে ওই পার্বত্য অঞ্চলের কৃষিজীবী নিরীহ অধিবাসীরা ভাষার একত্বে, ধর্মের প্রেরণায় এবং জীবনযাত্রার সাযুজ্যে এক অপূর্ব জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। সন্ত রামদাসের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় শিবাজী এই মন্ত্রকেই স্বাধীন মারাঠা-জাতির রাষ্ট্রিক সত্তার অভ্যন্তরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্থাপন করেছিলেন, অসীম বীরত্ব ও তীক্ষ্ণ কূটনীতির সাহায্যে শুধু স্বাধীন মারাঠা-রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে ছত্রপতি হয়ে বসেননি। এ কারণেই শিবাজী যাকে প্রতিষ্ঠা করলেন, তা স্থায়ী হ'ল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। স্বাভাবিক ঔদার্য, পরধর্মে সমশ্রদ্ধা-জ্ঞাপন এবং স্বধর্মরক্ষায় প্রাণপণ করা শিবাজী-প্রতিষ্ঠিত মারাঠা-জাতি ভারতের এই হিন্দু-ধর্মকেই আঁকড়ে ছিল। হিন্দুবিদ্বেষী ঔরঙ্গ-জীবের সুহৃদ্ ও দরবারী ঐতিহাসিক কাফিখাঁ শিবাজীকে নরকের কীট ব'লে বর্ণনা করেছেন ব্যর্থ আক্রোশে, তবুও অবাক্‌বিস্ময়ে এ-কথা

না লিখে পারেননি যে, এই ঘৃণ্য কাফের ইসলামকে কত শ্রদ্ধা করে, মসজিদ-নির্মাণে মন্দির-নির্মাণের মতোই অর্থ সাহায্য করে, মুসলমান ফকিরকে গুরুর মতো শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে।

এখানেই মারাঠা-শক্তির উৎস। যতদিন ধর্ম ছিল, মারাঠারা ছিল অপরাজেয়। তাই শিবাজীর মৃত্যুর পর নেতৃহীন মারাঠা-জাতি ঔরঙ্গজীবের আচমকা আক্রমণে প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও, কেন দিন হাল ছেড়ে দেয়নি। প্রতিটি গৃহকে দুর্গে পরিণত ক'রে অপরিসীম দুর্গতি স্বীকার ক'রে স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে এই পরমকষ্টসহিষ্ণু জাতি একটানা জনযুদ্ধ করেছে প্রায় অষ্টাদশবর্ষ কাল। অমিতবলশালী মুঘলকে পরাজয় স্বীকার করিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। ১৭০৭ খৃঃ ভগ্নমনোরথ ঔরঙ্গজীব প্রাণত্যাগ করলেন দাক্ষিণাত্যে আহ্‌মদনগরে। আচার্য যদুনাথের মতে এই দক্ষিণী ক্ষতই (মারাঠা-প্রতিরোধ) ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু ও মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনলো সঙ্গে সঙ্গে মুঘল ভারতে নামলো কৃষ্ণ যবনিকা, মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরব অতীত ইতিহাসের বিষয় বস্তুতে পরিণত হ'ল।

(ক্রমশঃ)

বিবেকানন্দ-স্তোত্র

শ্রীভবতোষ শতপথী

চির-জাগ্রত! ভারত-তীর্থে জাগো—
সব-বন্ধন-শৃঙ্খল—ভাঙো ভাঙো!
রুধিরাক্ত ধরিত্রী, রোরুদ্যমানা—
ভেদাভেদ-বিষময়, যুগ-চেতনা!
পাপ-জর্জরিত 'পরিত্রাহি' ডাকে!
জাগো, ভৈরব-তাণ্ডবে—মর্ত্যলোকে!
ভীরু-দুর্বল-জীবন: দুঃখ-গ্লানি—
আনো, নন্দন-নির্ঝর—পুণ্যবাণী!
সুধা-সিঞ্চিত সান্ত্বনা গন্ধে গানে—
এস, আত্ম-সচেতন মন্ত্র-দানে।—

শতবর্ষ প্রতীক্ষা সমাপ্ত আজি—
সুস্বাগত সন্ন্যাসী! বীর-স্বামীজী!
ঐ মঙ্গল শঙ্খ—নিঃশঙ্কে বাজে
স্বয়মাগত জনগণ: বিশ্ব মাঝে।
মহানন্দে-আনন্দিত: শুভ-বারতা—
জাগো শাশ্বত! তথাগত, যুগ-দেবতা
ডাকে অন্ধ-খঞ্জ—অবহেলিত প্রাণী
মহামানব! আনো নব বিবেক-বাণী!
অমৃত-আনন্দ—সুছন্দে নাচে—
শরণাগত নরনারী করুণা যাচে!
মহালগ্ন সমাগত—সুস্বাগতম্!
জাগো, সুন্দর-নির্মল—সত্য-শিবম্!!

বাংলাসাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের দান

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

জগতের বিচিত্র রহস্য ও জীবনের গভীরতম উপলব্ধিকে যিনি ভাষায় রূপায়িত ক'রে তোলেন, তাঁকেই আমরা কবি ব'লে অভিহিত করি। আর কবি-মানসিকতার দ্বারা আমরা শুধুমাত্র কাব্য-প্রকাশই বুঝি না; সেই সঙ্গে জীব-জগতের প্রত্যক্ষ সত্যোপলব্ধি ও তার অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে কবিকে আমরা ব'লে থাকি সাধক ও ঋষি। এদিক থেকে সাধক বিবেকানন্দকে বিচার করলে তাঁকে ঋষি ভিন্ন আর কোন নামেই আমরা তাঁর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি না। জগৎ-রহস্য ও জীবন-রহস্যের বিচিত্র দিকগুলি তাঁর ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে এবং সেই তরঙ্গস্পর্শে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগৎকে বহুযুগের কুসংস্কার ও ধ্যান-ধারণা থেকে নতুন চেতনায় উদ্বোধিত করেছেন। যখন পাশ্চাত্যের জড়বাদী শিক্ষার বাইরে স্বদেশ ও বিদেশে কোন অন্তর শিক্ষানুভূতি দেখা দেয়নি, সেই কালে চিকাগোর ধর্মসভায় ভারতীয় বেদান্ত ব্যাখ্যা ক'রে তিনি জগৎকে চমকিত ক'রে দিলেন। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের এই বৈদান্তিক অনুভূতির আলোকেই ফরাসী দার্শনিক ভিক্টর কুঁজো একসময় বলেছেন: 'আমরা যখন ভারতের দার্শনিক গ্রন্থসকল পাঠ করি, তাদের মধ্যে এমন সুগভীর সত্য দেখতে পাই এবং সেগুলি য়ুরোপের প্রতিভার এত ঊর্ধ্বে এবং এত বিস্ময়কর যে, ভারতের কাছে আমরা নতজানু হ'তে বাধ্য হই।'

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এই দার্শনিক ভাব-মানসিকতার ধারক ও বহির্বিশ্বে ভারত-সংস্কৃতির বাণীবাহক। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে একসময় রোমাঁ রোলাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'If you wish to know India, study Vivekananda. In him everything is positive and nothing negative.' তিনি ছিলেন একদিকে বৈদিক ভারতের বেদব্যাস ও ব্রাহ্মণ্যভারতের শঙ্করাচার্য। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাংলার ধ্যান-ধারণাকে তিনি নবভাবে রূপায়িত ক'রে গেছেন। তিনি সেই অর্থে কবি—যে-অর্থে কাব্য-মাধুর্যে তিনি সমস্ত জাতিকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে গেছেন, আবার সেই অর্থে ঋষি—যে-অর্থে ধর্মে জ্ঞানে ও কর্মে তিনি সমগ্র দেশকে উদ্বোধিত ক'রে গেছেন, আবার সেই অর্থে শিক্ষাবিদ্ ও সাহিত্যিক—যে-অর্থে নতুন শিক্ষাদর্শ প্রবর্তন এবং ভাষা ও সাহিত্য-ব্যঞ্জনায় জাতীয় সাহিত্যকে উন্নীত ও গৌরবান্বিত ক'রে গেছেন।

তাঁর বাংলা রচনাবলী আয়তনে অল্প সন্দেহ নেই, তবু তার মধ্যেই তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গীর লালিত্য ও শব্দ-সৌকুমার্যের যথেষ্ট পরিচয় গাথা রয়েছে। তার প্রত্যেকটিকেই স্বতন্ত্রভাবে এক একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্য ব'লে অভিহিত করা চলে। তবে তাঁর যে শ্রেণীর জীবনযাত্রা ছিল, তাতে সাহিত্য রচনা করতে হবে ব'লে সাহিত্য করার মতো অবকাশের একেবারেই অভাব ছিল, দ্বিতীয়ত: 'আর্ট ফর আর্ট সেক'-এর তিনি পক্ষপাতীও ছিলেন না; তাঁর জীবনবোধের সঙ্গেই সাহিত্য ছিল

অঙ্গাঙ্গিসূত্রে গাঁথা। সেই জীবনবোধে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল স্বজাতি-হিতৈষণায় উদ্বুদ্ধ স্বদেশপ্রেম। তবু সাহিত্য-কেন্দ্রানুগ তাঁর ধ্যানধারণা ও শিল্পচিন্তার যেটুকু পরিচয় আমাদের কাছে জ্ঞাত, তা আমরা প্রধানতঃ পাই তাঁর 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা' এবং কবিতা ও পত্রাবলীতে। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় তিনি অনলস জীবন-যাত্রার পথে পথে যে মনন-সম্পদ আহরণ করেছেন, তাকেই তিনি ভাষায় রূপ দিয়েছেন। তাঁর রচনার প্রারম্ভিক কালে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রকে যেভাবে প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন করেছিলেন, তাতে বিবেকানন্দের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর উপর তাঁর প্রভাব পড়া অত্যন্তই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, রচনার স্টাইল ও ডিক্‌সনে বিবেকানন্দ সর্বদা আপন স্বকীয়তায় ভাস্বর ছিলেন। কথ্য-ভাষায় গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা সর্বপ্রথম বিবেকানন্দের লেখনী দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। তাঁর 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'ভাববার কথা'র নানা অংশ জুড়ে তার উজ্জ্বল উদাহরণ রয়েছে। বাংলা কথ্যভাষায় যে অফুরন্ত শব্দ-সম্পদ রয়েছে, এ-কথার উল্লেখ ক'রে ১৯০০ খৃঃ 'উদ্বোধন'-পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত এক পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন: 'স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গী, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও, সেদিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।'

'পরিব্রাজকে' তিনি নিজেই বাংলার প্রচুর চলতি বুলি ও প্রবচন ব্যবহার করেছেন, যেমন—'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল', 'টাল-মাটাল', 'ডম্ফ', 'গদাই-লস্করি', 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে' ইত্যাদি। ভাষার মাঝে মাঝে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার ক'রে তিনি ভাষাকে ওজস্বিনী ও বলিষ্ঠ ক'রে তুলতেও কম প্রয়াস পাননি। এই প্রসঙ্গে 'পরিব্রাজকের' একটি অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য, যেমন—"আর্য-বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা ডম্‌ম্‌ম্‌ ব'লে ডম্ফই কর, তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' ব'লে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতের যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্ছ তোমরা।...এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূতকাল, লুঙ্‌ লঙ্‌ লিট্—সব একসঙ্গে। বর্তমানকালে তোমাদের দেখছি ব'লে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণজনিত দুঃস্বপ্ন! ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ—লোপ, লুপ্‌। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরি ক'রছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কাল-কুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না?...তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল

ধ'রে চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উহুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরে না, এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল যা ত্রৈলোক্যে নেই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি, ফেলে দাও এদের মধ্যে যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি-জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য-কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি,—'ওয়াহ্ গুরুকী ফতে'।"

তাঁর কোন কোন রচনায় স্যাটায়ারও (satire) স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে যেখানে ধর্ম লোকাচারে পর্যবসিত হ'য়েছে এবং অনুশাসনের চাইতে লোকের কাছে লোকাচারের মর্যাদাই বড়, এই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে 'ভাববার কথা'য় বিবেকানন্দ বলেছেন: "সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির —সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর সেথা নাই বা কি? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম হ'তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূয্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুচদেবতা ষষ্ঠী, মাকাল, প্রভৃতি নাই কি? আর বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণতন্ত্রে ঢের মাল আছে, যার এক একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটি লোক সেদিকে দৌড়চ্ছে। আমারও কৌতূহল হ'ল, আমিও ছুটলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ মুণ্ডু, একশত হাত, দু-শ পেট, পাঁচ-শ ঠ্যাঙ্গওয়ালা মূর্তি খাড়া! সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওর ভেতরে যে-সকল ঠাকুর-দেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই—যিনি দ্বারদেশে; আর ঐ যে বেদ-বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ—শাস্ত্র-সকল দেখছ, ও মধ্যে মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে হবে এঁর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলুম—তবে এ দেবদেবের নাম কি? উত্তর এলো—এর নাম 'লোকাচার'।"

সমাজের প্রতি এর চাইতে শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গ আর কি হ'তে পারে? অথচ প্রকাশে জ্বালা নেই, কেবল উপলব্ধিতে সেই জ্বালার তীব্রতা।

রচনায় তিনি যেমন চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে গৌড়ীয় রীতিও অনুসরণ করেছেন। এবং উভয় ক্ষেত্রেই ভাষা তাঁর ভাবের অনুসারী হয়েছে। তাঁর 'বর্তমান ভারত' বাংলা সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। বিবেকানন্দের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিশ্লেষণ-শক্তি ও দিব্যদৃষ্টির পরিচয় আছে এই

গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে। বিশেষ ক'রে ভাষার যে পরিমিতি-বোধ সাহিত্যের উচ্চতম গুণ, 'বর্তমান ভারত' তার উজ্জ্বল নিদর্শন। এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারি বর্ণই ক্রমিক পর্যায়ে পৃথিবী ভোগ করে। পৃথিবীর নানা দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে বিবেকানন্দ এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন। তেমনি ভারতবর্ষেও ক্রমে ব্রাহ্মণ্যশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশ্যশক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। বৈদিক ঋষির আধিপত্যের অবসানে এ-দেশে যে ক্ষত্রিয়-শক্তির অভ্যুত্থান হয়, সে-সম্পর্কে তিনি বলেছেন: 'রাজশক্তিরূপ মহাবল যজ্ঞাশ্ব আর পুরোহিত-হস্ত-ধৃত-দৃঢ়-সংযত-রশ্মি নহে; সে এবার আপন বলে স্বচ্ছন্দচারী। এ যুগের শক্তিকেন্দ্র সামগায়ী, যজুর্যাজী পুরোহিত নাই, রাজশক্তিও ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয়-বংশসম্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীপতিতে সমাহিত নহে; এ যুগের দিগ্-দিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহত-শাসন, আসমুদ্র-ক্ষিতীশগণই মানবশক্তি-কেন্দ্র। এ যুগের নেতা আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নহেন, কিন্তু সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত, ধর্মাশোক প্রভৃতি।'

রচনায় সমাসবদ্ধ পদের জন্য হয়তো সর্বসাধারণের পক্ষে স্থানে স্থানে অর্থোদ্ধার কঠিন হয়ে পড়বে, কিন্তু স্বল্পবাক্যের দ্বারা অধিকতর ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে এ-রকম সমাসবদ্ধ শব্দ ব্যবহার ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই। অন্যত্র ভারতে বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থান-সম্পর্কে বিবেকানন্দ লিখেছেন: 'যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্তমধ্যে তড়িৎপ্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বার্তা বহন করিতেছে, মহাচলের ন্যায় তুঙ্গতরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার নির্দেশে একদেশের পণ্যচয় অবলীলাক্রমে অন্যদেশে সমানীত হইতেছে এবং যাহার আদেশে সম্রাট্কুলও কম্পমান, সংসার-সমুদ্রের সর্বজয়ী এই বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। অতএব ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেল-পুস্তকের ভারতজয়ও নহে, পাঠান-মোগলাদি সম্রাড়্গণের ভারতবিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ইশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিনীবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরী-ভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর, এ-সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিমনি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্য-বীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।'

এ ভাষা এবং এ কথা বজ্রদীপ্ত পুরুষ বিবেকানন্দেরই উপযোগী ভাষা ও কথা। অন্যত্রও তাঁর উদাত্তধ্বনি আমাদের সচকিত করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘর্ষে বাঙালী-মন যেভাবে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তারই ভিত্তিতে তিনি লেখেন: 'একদিকে প্রত্যক্ষশক্তি-সংগ্রহরূপ-প্রমাণ-বাহন, শত-সূর্য-জ্যোতিঃ, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহুমনীষি-উদ্ঘাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতি-যোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্ম-তত্ত্বকাহিনী! একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহা কোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে পূর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র

পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী, তপোবন-জটাবল্কল, কষায়-কৌপীন, সমাধি-আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্যসমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ।'

এই অকাট্য যুক্তি তৎকালীন বঙ্গসমাজের বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিকেই আলোড়িত করেছে এবং আজও আমাদের কাছে সেই ইতিহাসের সত্যতা উপস্থাপিত ক'রে আমাদের চমকিত করে।

গদ্য ব্যতীত বিবেকানন্দ বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজীতেও বহু কবিতা রচনা করেছেন। সেই কবিতাবলী পরে 'বীরবাণী' নামে পুস্তকে প্রকাশিত হ'য়েছে। তাঁর ইংরেজী কাব্যের দু-একটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক অনূদিত হয়। তাঁর বাংলা কবিতার অধিকাংশই অধ্যাত্মসুরের উপর ভিত্তি ক'রে রচিত। কেবল 'সখার প্রতি' কবিতাটিতে তাঁর 'আত্মদর্শন' বা 'আত্মজিজ্ঞাসা'র সঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হই। তিনি লেখেন—

'বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মতো, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়;
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্বত-গহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধ'রে দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে কি ধন করিনু উপার্জন?'

কিন্তু তখনই তিনি বুঝতে পারলেন—

'ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন,
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।'

এতদ্ব্যতীত বীর্য ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে তিনি যে কাব্য রচনা করেন, তা আজও বাঙালী-মাত্রকেই অনুপ্রাণিত ও উদ্বোধিত করে। যেমন—

'জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার
প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান; হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা॥'

অন্যত্র জীবপ্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর-সেবার সার্থকতায় দেশবাসীকে আহ্বান ক'রে তিনি বললেন—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

জীবই শিব। জীবের দুঃখ দূর ক'রে জীবের সেবা ক'রে যে মানুষ নিজেকে ভুলতে পারে, সেই একমাত্র ঈশ্বরকে লাভ করে, কারণ দরিদ্রের পর্ণকুটীরেই ঈশ্বরের অবস্থিতি। জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করার আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যেই ১৮৯৭ খৃঃ ১লা মে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন এবং ক্রমে সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ গড়ে তুললেন। তার মূল উৎস তাঁর গুরু পরমহংসদেবের উপদেশ। বিবেকানন্দ যখন তাঁর কাছে নির্বিকল্প সমাধি চেয়েছিলেন, গুরু তখন বললেন: 'এখন নয়, তোকে যে লোকশিক্ষা দিতে হবে, খালি নিজের চিন্তাই করছিস, কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশের আপামর সাধারণের চিন্তা কে করবে?' সঙ্গে সঙ্গে আত্মচিন্তা থেকে জগৎচিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন বিবেকানন্দ, আপন মনেই একবার উচ্চারণ করলেন: 'জগদ্ধিতায়'। জগতের সেবার জন্যই তিনি বেরিয়ে পড়লেন পথে, ভ্রমণ

করলেন সারা ভারত ও পৃথিবীর বহু দেশ। দেখলেন—কি নিদারুণ দারিদ্র্যক্লিষ্টতার মধ্যে সারা ভারত নিমজ্জিত হয়ে আছে! গোটা ভারতবর্ষ রোগে দারিদ্র্যে, অনাহার এবং অর্ধাহারক্লিষ্টতায় প্রতিমুহূর্তে ধুঁকছে। এই দীনদরিদ্র তেত্রিশ কোটি (তখন জনসংখ্যা তেত্রিশ কোটিই ছিল) ভারতবাসীকে লক্ষ্য ক'রে তাঁর শিষ্যবৃন্দ ও যুবকদের আহ্বান ক'রে তিনি বললেন :

"এই গরীব নিরক্ষর মানুষগুলি কি সরল! তোমরা কি ইহাদের কণামাত্রও দুঃখ লাঘব করিতে পারিবে না? যদি না পার, তবে গেরুয়া পরিয়া লাভ কি?—তাই আমি মাঝে মাঝে খুবই ভাবি—মঠ, আশ্রম প্রভৃতি গড়িয়া লাভ কি? সেগুলি বিক্রয় করিয়া টাকা-পয়সা গরীবদের মধ্যে দুঃস্থ-নারায়ণের মধ্যে বিলাইয়া দিলে হয় না? দেশের লোকের মুখে যখন অন্ন নাই, পরনে যখন বস্ত্র নাই, তখন আমরা মুখে গ্রাস তুলি কেমন করিয়া? ইহাদের দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিয়া আমি ভাবি—কি কাজ এই সব শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া? এই সব মূর্তির সম্মুখে বাতি ঘুরাইয়া উপাসনার বাহ্যাড়ম্বর করিয়া? কি কাজ পাণ্ডিত্যে, কি কাজ শাস্ত্রপাঠে, কি কাজ ব্যক্তিগত মুক্তির লোভে সাধনায়? এ-সব ফেলিয়া গ্রামে গ্রামে যাই, দরিদ্রের সেবায় জীবন দিই, আমাদের উন্নত চরিত্র, আধ্যাত্মিক শক্তি এবং সংযত জীবনযাত্রার মধ্য দিয়া ধনীদিগকে দরিদ্রের প্রতি তাহাদের কর্তব্য-সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলি, অর্থসংগ্রহ করিয়া কিংবা অন্য উপায়ে দীন-দুঃখীর সেবা করি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে দীন-দুঃখীদের কথা কেহই চিন্তা করে না। যাহারা জাতির মেরুদণ্ড, যাহারা খাদ্য উৎপন্ন করে, তাহাদের জন্য আমাদের দেশে কে সহানুভূতি দেখায়, তাহাদের সুখে-দুঃখে কেই বা অংশ লয়?—তোমাদের সকল শক্তি একত্রিত কর। আমি দিবালোকের মতো একেবারে স্পষ্ট দেখিতেছি—সেই একই ব্রহ্ম। একই শক্তি—যিনি আমাদের মধ্যে আছেন, তিনি তাহাদের মধ্যেও আছেন, শুধু প্রকাশের তারতম্য—এইমাত্র। নিশ্চয় জানিও, যে দেহের একটি অঙ্গ পঙ্গু, সে দেহের দ্বারা কোনও শ্রেষ্ঠ কাজ কখনও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না।—এত তপস্যা করিয়া এই সত্যটুকু আমি জানিয়াছি যে, 'তিনি' সকলের মধ্যেই আছেন। ইহারা সকলেই 'তাঁহার' বহুরূপে প্রকাশ-মাত্র। আর, অন্য কোন ভগবানের সন্ধান করিতে হইবে না। যে সকলের সেবা করে, কেবল সেই ভগবানের প্রকৃত পূজা করে।—সকল মানুষই সমান, সকলেই সেই একই ভগবানের সন্তান, সকলের মধ্যেই সেই একই ভগবান রহিয়াছেন। আর কোন ভগবান নাই। যে ভগবানের সেবা করিতে চায়, তাহাকে মানুষের সেবা করিতে হইবে এবং প্রথমে হীনতম, দীনতম, পতিততম মানুষের সেবা করিতে হইবে। সব বাধাবিঘ্ন ভাঙিয়া ফেল। অস্পৃশ্যতার, অমানুষিকতার জবাব দাও। দুই বাহু প্রসারিত করিয়া মহানন্দে গাহিয়া ওঠ : এস, এস আমার ভাই! এস দরিদ্র, এস নিঃস্ব। এস নিপীড়িত, এস নিষ্পেষিত। রামকৃষ্ণের নামে আমরা অভিন্ন, আমরা এক।"

বিবেকানন্দের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বলতে আমরা একই বুঝি। তিনি যে কখনও সাহিত্য রচনা করতে হবে ব'লে সাহিত্য করেছেন, এমন নয়। তাঁর ধর্মীয় অনুভূতির মধ্যে সব কিছুই এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

সেখানে সমাজ, রাষ্ট্র, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার মতো দেশীয় সংস্কার, চরিত্র-গঠন, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষার বাহন, ভাষাসমস্যা, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ও ইতিহাস—সবই একসঙ্গে মিলেছিল। এখানে তিনি এক বিরাট সমুদ্রের সঙ্গেই মাত্র তুলনীয়। সব দিক থেকে সব নদী এসে এই সমুদ্রে মিশেছে। মাতৃভাষাই যে শিক্ষার একমাত্র বাহন হওয়া উচিত, এ-কথা নিয়ে ইদানীন্তনকালে নানা মুনির নানা মত ব্যক্ত হচ্ছে, এবং কখন কখন তা নিয়ে বিতর্ক ধূমায়িত হয়ে উঠছে। কিন্তু বহুপূর্বেই এ-সম্পর্কে নিজস্ব মত ব্যক্ত ক'রে গিয়েছেন বিবেকানন্দ। বিশেষ ক'রে সাধু ভাষা ও কথ্যভাষার দ্বন্দ্ব নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে বাংলাসাহিত্যে যে দ্বন্দ্ব চলে এবং প্রধানতঃ প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'কে কেন্দ্র ক'রে যে কথ্য ভাষার সাহিত্য গড়ে ওঠে, তৎসম্পর্কেও বহুপূর্বেই বিবেকানন্দ তাঁর 'ভাববার কথা'য় বলেছিলেন: 'চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর?

সে যুগে এমন ক'রে কথ্যভাষাকে বাঙালীর মনে কেউ ধরিয়ে দেয়নি। অথচ স্বাভাবিক বিচারে যেহেতু বিবেকানন্দ শিক্ষকতা-কার্যে বা সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য-কর্মে নিযুক্ত ছিলেন না, এবং যেহেতু তিনি তাঁর অধিকাংশ রচনা ও বক্তৃতাবলী ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই করেছেন, সেই হেতু তাঁর স্বল্পরচিত এই সব অত্যাবশ্যকীয় কথা দেশবাসী উদ্ধার করবার সুযোগ পায়নি এবং পেলেও তাকে বৃহত্তর সমাজে রূপ দেবার মতো প্রবৃত্তি লাভ করেনি। ফলে বিবেকানন্দের যে কখানি বাংলা গ্রন্থ এই শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়, বিগত ষাট বছর কালের মধ্যেও এদেশে তার ব্যাপক গঠন-পাঠন সম্ভব হয়নি। এখন যে হচ্ছে, এ-কথা বলব না, তবে অনেকে বিবেকানন্দকে নতুন ক'রে বুঝতে চেষ্টা করছেন এবং এর দ্বারা ক্রমে যে বৃহত্তর জনসাধারণের মনে তাঁর চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও বাণী অনুপ্রবেশের সুযোগ ঘটবে, তাতে সন্দেহ নেই।

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ

শ্রীধনঞ্জয়কুমার নাথ

ভারতীয় নবজাগরণের মূল কথা—পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন না দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মূল সূত্রটিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে সমাজে পরিবেশন করা। এই সূত্র সহায়ে সমাজ ও সংস্কৃতিকে মনীষিগণ তাঁদের সাধনা দ্বারা পুষ্ট ক'রে চিন্তারাজ্যে এক নবযুগের সৃষ্টি করেন। ইংরেজের আগমনে ও মুসলমান শাসকবর্গের সহিত ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-ধারা সমাজে অচল হয়ে পড়ে। তাই নবযুগের সূচনায় ভারতীয় মনীষা বিদেশী শিক্ষাকে প্রয়োজনের তাগিদে আপনার ক'রে নিতে চাইল। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে যে ভারতীয়তা বজায় রাখা সম্ভব, এ-কথা তখনও বিবেচিত হ'ল না। সেদিনের চিন্তানায়কগণ লক্ষ্য করলেন না যে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভারতের বিশেষ তাত্ত্বিক অবদান আছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয়তা বজায় রাখার সাধনা শুরু হয় পরে—স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও গান্ধীজীর চিন্তায় ও কর্মে। এঁরা সকলেই ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাধারাকে ভারতীয় ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করার প্রয়াস পেলেন। এই জাতীয় শিক্ষাবিস্তার-ক্ষেত্রে স্বামীজীই প্রথম নায়ক এ-কথা কোন ইতিহাস-সচেতন মানুষই অস্বীকার করতে পারবেন না।

স্বামীজীর শিক্ষা-চিন্তার বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, তিনি তাঁর কর্মবহুল ও স্বল্পস্থায়ী জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষাশাস্ত্রী পেস্তালৎসি বা মন্তেসরির মতো কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁর চিন্তার সত্যতা-নির্ণয়ে প্রয়াস পাননি। কারণ তিনি তাঁর শিক্ষা-চিন্তাকে সুপ্রাচীন ভারতীয় পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি প্রাচীন ইতিহাস-পাঠে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাধারার বিজ্ঞান-সম্মত রূপ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না। এই কারণেই স্বামীজী পাশ্চাত্য শিক্ষাধারাকে অস্বীকার না ক'রে তাকেই ভারতীয়তায় সঞ্জীবিত করতে চেয়েছেন। এ ছাড়া তিনি প্লেটো, রুশো বা অন্যান্য শিক্ষাশাস্ত্রীদের মতো শিক্ষা-সংক্রান্ত কোন বিশেষ পুস্তক রচনা করেননি। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের ভিত্তি বিভিন্ন সময়ে লিখিত পত্র, প্রবন্ধাবলী ও প্রদত্ত বক্তৃতাবলী।

স্বামীজী বুঝেছিলেন যে, কেবলমাত্র প্রচলিত পশ্চিমী শিক্ষাধারায় ধর্মকেন্দ্রিক ভারতীয় সমাজ তথা বিশ্বের মঙ্গল নিহিত নেই। বর্তমানে আত্মিক ও বৈষয়িক মূল্যের সমন্বয়-সাধন একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য-সাধনেই তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শের মূলসূত্রগুলি রচনা করেন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে শিক্ষার অর্থ – মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ। শিক্ষার এই আত্মিক ব্যাখ্যা প্লেটো থেকে আজ পর্যন্ত সকল ভাববাদী দার্শনিকই নানাভাবে স্বীকার করেছেন। পূর্ণতার বিকাশ কথাটি বিমূর্তক এবং সে-কারণেই বাস্তববাদী মানুষের কাছে অস্পষ্ট। এই কথাটির মূর্ত তাৎপর্য হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্বের—মনুষ্যত্বের বিকাশ। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সামগ্রিক রূপের পূর্ণ প্রকাশের সহায়। শিক্ষা কেবলমাত্র কতকগুলি তথ্যের সংগ্রহমাত্র নয়। প্রকৃত শিক্ষায় চরিত্র গঠিত হয় এবং চরিত্রগঠনই মনুষ্যত্ব

অর্জনের পথ সুগম করে। অধ্যাত্মবাদীদের দৃষ্টিতে পূর্ণতার প্রকাশেই মনুষ্যত্ব।

পরবর্তীকালে এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি পাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষ গড়া। এই সম্পূর্ণ মানুষের সাধনায় সিদ্ধি-লাভের জন্য প্রয়োজন 'অভীঃ' মন্ত্রের সাধন। স্বামীজী এই মন্ত্রের ওপরই জোর দিয়েছেন। কারণ এ মন্ত্রের সাধন ছাড়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। এই শিক্ষার মূল কথা দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন নির্ভীক ও পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তোলা; মানুষকে তথ্যবাহী শকটে পরিণত করা নয়। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ, মনের বিকাশ, আত্মবিশ্বাস-শক্তি, স্বাবলম্বন ও জীবন-সমস্যার সমাধান।

স্বামীজীর এই সুস্পষ্ট শিক্ষানীতির অনেক পরে প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুরূপ-ভাবে চিন্তা করেছেন। তিনি 'On Education' পুস্তকে 'শিক্ষার লক্ষ্য' অধ্যায়ে বলেছেন: শিক্ষার ফলে যদি উদ্যম, সাহস, অনুভূতি ও বুদ্ধি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়, তবে এমন সমাজ গড়িয়া উঠিবে, যে-সমাজ মানব-গোষ্ঠীতে কোন কালে ছিল না।'

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য হবে—ব্যাবহারিক সুযোগ-লাভ বা অন্ন-সমস্যার সমাধান এবং উচ্চতর লক্ষ্য হবে—মানব-জীবনের পূর্ণতা-সাধন। স্বামীজীর শিক্ষা-চিন্তাও জীবনের নিম্নতর লক্ষ্য-সম্পর্কে সচেতন বলেই জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করবার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছে। 'দেশের লোকগুলিকে আগে অন্নসংস্থান করিবার উপায় শিখাইয়া দাও, তারপর ভাগবত পাঠ করিয়া শোনাও।' —বলেছেন বিবেকানন্দ। তাঁর শিক্ষা-চিন্তার মূল কথা—ভাগবতের সঙ্গে অন্নের, আত্মার সঙ্গে দেহের, সংসারের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার যোগসাধন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাই স্বামীজী ডিউই সাহেবের অনেক পূর্বেই প্রয়োগবাদ (Pragmatism) স্বীকার গ্রহণ করেছেন।

স্বামীজীর শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপায়িত করতে হ'লে কোন বাঁধা নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। কারণ বাঁধা নিয়মে উৎপাদন সম্ভব হলেও সৃষ্টি সম্ভব নয়। এ-কারণেই কোন সৃজনশীল শিক্ষানীতিরই প্রয়োগ বাঁধা ছকে সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, 'বিভিন্ন-চরিত্র নরনারীর শ্রেণী সৃষ্টি নিয়মের স্বাভাবিক বিভিন্নতা-মাত্র। এই কারণেই এক প্রকার আদর্শের দ্বারা সকলের বিচার করা, বা সকলের সম্মুখে একপ্রকার আদর্শ স্থাপন করা কোন মতেই উচিত নয়।' এই উক্তিতে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি অন্যতম সূত্র 'ব্যক্তির বিভিন্নতা'র (individual difference) চমৎকার স্বীকৃতি পাই।

রুশো বা ফ্রয়েবল-এর মতে শিক্ষা 'child-gardening'; চারাগাছ (ছাত্র) আপনা হতেই প্রকৃতির নিয়মে বেড়ে উঠবে! মালীর (শিক্ষকের) কাজ কেবল বর্ধনে সহায়তা করা। স্বামীজীও শিশুকে চারাগাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্বামীজীর শিক্ষা-চিন্তায় জ্ঞান অন্তরেই নিহিত; প্রয়োজন কেবলমাত্র বিকাশের। প্লেটোও তাঁর রিপাব্লিকে বলেছেন যে, অন্তরেই জ্ঞান বিদ্যমান; দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করাতেই শিক্ষালাভ সম্ভব। স্বামীজীও প্লেটোর মতো বলেছেন যে, শিক্ষকের কাজ হবে—কেবলমাত্র সাহায্য ও চালনা করা, বাহির থেকে কিছু চাপানো নয়। আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান এ মতের সমর্থন জানায়।

শারীরিক, মানসিক, আত্মিক সকল প্রকার শিক্ষার স্থান স্বামীজীর শিক্ষাধারায় আছে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাই এই সামগ্রিক শিক্ষাদর্শের অঙ্গ। তাই মানুষকে কোন একটি বিশেষ দিকে উন্নত হলেই চলবে না। তাকে সর্বদিকে সমভাবে উন্নত করাই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। আধুনিক শিক্ষাশাস্ত্রিগণ এ-বিষয়ে স্বামীজীর সঙ্গে একমত। এই শিক্ষাদর্শে চিত্তসংযম, একাগ্রতা ও ব্রহ্মচর্য-লাভের বিশেষ স্থান আছে। স্বামীজীর মতে 'প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল মহৎ কর্ম সম্পন্ন হয়।' এই গুণগুলির মূলভিত্তি ব্রহ্মচর্য। তাই এই শিক্ষা-দর্শে ব্রহ্মচর্য অপরিহার্য, এই চিন্তাধারা যদিও প্রাচীন শিক্ষাধারা থেকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তবুও এতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকতা পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-শাস্ত্রিগণও এই ব্রহ্মচর্যের কথাই একটু অন্যভাবে উত্থাপন করেছেন। এঁদের মতে adolescence-এর (যৌবন-আগমন) কাম-কৌতূহল ও বাসনাকে sublimation (মহৎলক্ষ্যে উন্নীত) করবার উপদেশ দেওয়া হয়। অবশ্য স্বামীজী ব্রহ্মচর্যকে গভীর ও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনিও বলেছেন, 'বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা……প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তে সাম্য থাকে না, সুতরাং বিকৃত হয়ে যায়।……এইজন্য ব্রহ্মচর্যের সংযম দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।' আধুনিক কালে শ্রীঅরবিন্দ ও গান্ধীজী ব্রহ্মচর্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

স্বামীজী জাতীয় শিক্ষাপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় ভাব বজায় রাখা প্রয়োজন। এদেশের শিক্ষাধারা ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র হওয়া উচিত নয়। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে, ধর্ম-বিবর্জিত শিক্ষা মানুষকে দুর্বল, নীতিজ্ঞানহীন ও আত্ম-বিশ্বাসহীন করে। তিনি বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক সভ্যতাকে ধর্মকেন্দ্রিক সনাতন শিক্ষাপদ্ধতির পরিপূরক রূপে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন! কিন্তু এই আদর্শ—বিজ্ঞান ও যন্ত্রের প্রয়োজনে জীবন ও ধর্মকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয়। তিনি বলেন, 'যে ভাবধারা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে, তাহাই ধর্ম।' এই ধর্মকে জীবনে সার্থক ক'রে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন করার জন্য প্রয়োজন কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বেদান্তের উচ্চ ভাবগুলির সাহায্যে নির্ভীকতা-শিক্ষা। এই ভয়হীনতার শিক্ষা ছাড়া মানুষ মহাশক্তিমান্ হয়েও এ-কথা বলতে পারবে না যে, আমি অন্তরে যাকে সত্য ব'লে উপলব্ধি করেছি, তার জন্য জীবনপণ ক'রব।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, ধর্মের এই ভয়হীন ও মুক্ত রূপ প্রত্যক্ষ করতে না পেরে ভয়হীনতার শিক্ষার জন্য রাসেল সাহেব শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মকে বর্জন করতে চেয়েছেন। কারণ তিনি তাঁর দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া খৃষ্টধর্মের সঙ্গেই বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। যুক্তি-ভিত্তিক বেদান্তধর্মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলেই স্বামীজী বেদান্তকেই 'অভীঃ'-মন্ত্র-সাধনের মূলভিত্তি করতে চেয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি একদিন এই ভারতে কেবল কর্তব্য কথা—

কেবল মতবাদ-রূপে ছিল না, প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য ক'রে তোলবার জন্য অনুশাসন ছিল। সেই অনুশাসনকে যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে……।' এই ভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মের স্বীকৃতি পাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায়। তবে ধর্মকে পঠন-পাঠনের বিষয়রূপে তিনি স্বীকার করেননি। সমাজ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ থেকে এবং শিক্ষকের জীবন থেকেই ছাত্র ধর্ম শিক্ষা করবে, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, 'বাঁধা বচন মুখস্থ করা বা বাঁধা আচার অভ্যাস করা আমাদের ধর্মশিক্ষা নয়।' তিনি ছাত্র-জীবনে প্রার্থনা ও কয়েকটি ব্রতের মধ্য দিয়ে ছাত্রগণের মধ্যে প্রকৃত ধর্মবোধ জাগ্রত করতে চেয়েছেন।

বৈজ্ঞানিক সভ্যতার জন্মস্থান পাশ্চাত্যেও কোন কোন শিক্ষাশাস্ত্রীর মতে 'Religion must from the very basis of any education worth the name and that education with religion omitted is not really education at all.' অর্থাৎ ধর্মই প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি; ধর্মব্যতিরেকে কোন শিক্ষাই শিক্ষা নয়।

এখন অত্যাধুনিক প্রগতিবাদিগণ এই ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষাতত্ত্বে প্রতিক্রিয়ার সন্ধান পেয়ে প্রশ্ন করতে পারেন, স্বামীজী কি কেবলই ব্যক্তির বিকাশ চেয়েছেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তিনি ব্যক্তির বিকাশই চেয়েছেন, তবে তাঁর ব্যক্তি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বিমূর্ত ব্যক্তি নয়? স্বামীজীর জীবন-দর্শনের মূল কথা 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এখানে ব্যক্তির বিকাশ বা মুক্তির সঙ্গে সমাজসেবার আদর্শের কোন বিরোধ নেই। সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যমেই ব্যক্তির বিকাশ ঘটবে। এই চিন্তাধারার পটভূমিতেই স্বামীজীর প্রচারিত শিক্ষাবিজ্ঞানের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

বর্তমান কালের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাশাস্ত্রী Mr. P. Nunn লিখেছেন, 'Individuality develops only in a social atmosphere when it can feed on common interest and common activities.…Individuality is by no means the same thing as eccentricity' অর্থাৎ সকলের স্বার্থে, সকলের কর্মে ও সামাজিক পরিবেশেই ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব। এই ব্যক্তিত্বের অর্থ কোন মতেই উৎকেন্দ্রিকতা নয়। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তি অর্থে সামাজিক ও মুক্ত ব্যক্তিই বোঝায়। স্বামীজীর ব্যক্তি সামাজিক হয়েও আরও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

স্বামীজীই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে জনশিক্ষা-প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন—জাতিতে জাতিতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আত্মিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূল কারণ অশিক্ষা এবং ভারতীয় সমাজের কুসংস্কার-মুক্তি জনশিক্ষা ছাড়া অসম্ভব। সেই কারণেই তিনি অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভারতবাসীর জন্য প্রকৃত জনশিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করেছেন।

স্ত্রীশিক্ষা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, 'এই দেশে পুরুষ ও মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন করিয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন। বেদান্ত-শাস্ত্রে তো বলে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করেন।' তিনি মনুর ভাষায় বলেছেন, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।' ব্যাবহারিক জীবনে স্ত্রীজাতির জীবনের আদর্শ

পুরুষের জীবনের থেকে ভিন্ন হলেও পরম-পুরুষার্থের দিক থেকে উভয়েরই লক্ষ্য এক। তাই ব্যাবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য স্বীকার করলেও আত্মিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে পুরুষের শিক্ষার কোন পার্থক্য স্বীকার করেননি। সেই কারণে স্বামীজীর বাণী- ও শিক্ষা-বিশ্লেষণে প্রতিভাত হয় যে, পরমার্থের ক্ষেত্রে নারীজাতির আদর্শ গার্গী, মৈত্রেয়ী ; আর সংসারের ক্ষেত্রে আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।

রবীন্দ্রনাথেও এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি পাই, যখন তিনি লেখেন, 'বিদ্যা যদি মনুষ্যত্ব-লাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানব-মাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে, তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে-অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে, বুঝিতে পারি না।' রবীন্দ্রনাথ মেয়ে ও পুরুষের শরীর ও মনের প্রকৃতির পার্থক্য লক্ষ্য করেই মানুষ হবার জন্য 'বিশুদ্ধ' শিক্ষা ও ব্যাবহারিক শিক্ষার কথা বলেছেন। স্বামীজী বিশুদ্ধ শিক্ষা-ক্ষেত্রে মেয়ে-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করেছেন, এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষার পার্থক্য স্বীকার করেছেন। এই পার্থক্য ও ঐক্য আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান ও সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত।

আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত বর্তমান শিক্ষাধারা ভোগবাদে অনুরাগী নাগরিক তৈরী করে, প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি করে না। এই শিক্ষাধারায় আত্মিক মূল্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সত্য শিব ও সুন্দরের সাধনার কোন স্থান নেই। তাই এ-শিক্ষা শ্রদ্ধা- ও আত্মবিশ্বাস-বিবর্জিত। এই শিক্ষার বিষময় ফলের কথা চিন্তা করেই বর্তমান ভারত তথা বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর ভবিষ্যতের জন্যই স্বামীজীর শিক্ষা-চিন্তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে প্রচলিত শিক্ষাধারার ব্যাপক পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-দর্শনের মূলসূত্রগুলি স্বামীজীর চিন্তায় বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁর আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত ক'রে কল্যাণে ব্রতী নই। অধিকন্তু তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক শিক্ষার নামে ধর্ম- ও নীতিজ্ঞানহীন শিক্ষা-পরিকল্পনাকে গ্রহণ ক'রে আমরা নিতান্তই অদূরদর্শিতা ও অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছি। ফলে সমাজের সর্বত্র স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে, বোধের যোগের নিতান্তই অভাব। এই সঙ্কট-মুহূর্তে রামকৃষ্ণ মিশন যদি প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শকে রূপদান করতে সক্ষম হন, তা হ'লে আগামী দিনের মানুষ এই প্রতিষ্ঠানের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকবে।

জনগণের উদ্‌বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীঅমৃতকুমার বিশ্বাস

(১)

সম্ভবতঃ ইংরেজ কবি শেক্‌সপিয়র বলেছেন : মানুষ বড় হয় তিন উপায়ে। কেউ জন্মসূত্রেই বড়, কেউ স্বপ্রতিষ্ঠ, আবার কেউ কেউ আছেন যাঁদের ঠেলে তুলে ধরা হয়। শেষোক্ত ব্যক্তির সংখ্যা সমাজে পূর্ব দুই শ্রেণীর চেয়ে অনেক বেশি। কারণ সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে তাঁদের প্রতিষ্ঠা ; আর ঠিক সেই কারণেই তাঁদের 'মহত্ত্বে'র স্থায়িত্বও স্বল্পকাল। অপরদিকে আজন্ম মহত্ত্বে ভূষিত এমন জনের অস্তিত্ব অসম্ভব না হলেও মানব-সমাজের পক্ষে মঙ্গলময় ব'লে মনে হয় না। তাতে মানুষকে বড় হবার প্রেরণা না যুগিয়ে তাকে ক্ষুদ্রত্বের দিকে নিয়ে যায়, নানারকম অলৌকিক তত্ত্বে বিশ্বাস-প্রবণ ক'রে মানুষের স্বাভাবিক বিচার-শক্তিকে নষ্ট করে, পরিণামে সমাজে জড়ত্ব এনে দেয়। আমাদের মহাকাব্যেও তো দেখি দেবগণ, ঋষিগণ ভুল করছেন, তাঁদের পদস্খলন হচ্ছে ; আবার তাঁরা প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দোষমুক্ত হচ্ছেন—দেবত্ব, ঋষিত্ব ফিরে পাচ্ছেন। তাঁদের গুণাবলী আমাদের আদর্শ—অনুকরণীয়। নানা ভুল-ভ্রান্তির পথে বিভ্রান্ত, মোহাবিষ্ট না হয়ে সেগুলিকে অতিক্রম ক'রে যিনি আত্মস্থ হ'তে পেরেছেন এবং কোথায় ভুল কিভাবে অতিক্রম করেছেন, তা দেখিয়ে সাধারণের সঙ্গে নিজের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করেননি, তিনিই তো আদর্শ—যত বিশেষণেই তাঁকে ভূষিত করি না কেন ; রাজর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি—কোনটি-ই বোধ হয় একান্তরূপে সে-মানুষের স্বরূপ-প্রকাশে সমর্থ নয়। নিজের অসাধারণত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও কৃত্রিম আবরণের দ্বারা তাকে রক্ষা করবার নামে ফানুস তৈরী করেন না—তিনিই প্রকৃত স্বপ্রতিষ্ঠ—মহাত্মা।

বিবেকানন্দের নাম-স্মরণের সঙ্গে অপরাপর মহৎ ব্যক্তিদের নাম-স্মরণের বা গুণকীর্তনের পার্থক্য কোথায়, তা নির্দেশ করা মোটেই কঠিন নয়। বয়সে একটু বড় হলেও কর্মে তাঁরই উত্তর-সাধক[১] এবং তাঁরই সমকালীন, বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের উক্তি এক্ষেত্রে উদ্ধারযোগ্য :

'বস্তুতঃ মাহাত্ম্যের সঙ্গে ক্ষমতা বা প্রতিভার প্রভেদ আছে। মহাত্মারা আমাদের কাছে এমন একটি আদর্শ রাখিয়া যান, যাহাতে তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে স্মরণ করিলে জীবন মহত্ত্বের পথে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্ষমতাশালীকে স্মরণ করিয়া আমরা যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা নহে। ভক্তিভাবে শেক্‌সপিয়রের স্মরণমাত্র আমাদিগকে শেক্‌সপিয়রের গুণের অধিকারী করে না, কিন্তু যথার্থভাবে কোন সাধুকে অথবা বীরকে স্মরণ করিলে আমাদের পক্ষে সাধুত্ব বা বীরত্ব কিয়ৎ পরিমাণেও সরল হইয়া আসে।

তবে গুণী সম্পর্কে আমাদের কী কর্তব্য? গুণীকে তাঁহার গুণের দ্বারা স্মরণ করাই

১ উভয়েরই সমকালীন এবং বয়সে প্রবীণ স্বনামখ্যাত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁর 'Character Sketches' (চরিত্র-চিত্রণ) পুস্তকে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতীচ্য দেশের কার্যাবলী আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে 'an inheritor of Swami Vivekananda' ব'লে অভিহিত করেছেন। শ্রীজওহরলাল নেহরুও তাঁর বিখ্যাত 'Discovery of India' পুস্তকে বিবেকানন্দকে যুগচেতনার অগ্রগামী বলেই উল্লেখ করেছেন।

আমাদের স্বাভাবিক কর্তব্য। শ্রদ্ধার সহিত তানসেনের গানের চর্চা করিয়াই গুণমুগ্ধ গায়কগণ তানসেনকে যথার্থভাবে স্মরণ করে। ধ্রুপদ শুনিলে যাহার গায়ে জ্বর আসে, সেও তানসেনের প্রতিমা গড়িবার জন্য চাঁদা দিয়া ঐহিক পারত্রিক কোন ফললাভ করে—এ-কথা মনে করিতে পারি না। সকলকেই যে গানে ওস্তাদ হইতে হইবে, এমন কোন অবশ্য-বাধ্যতা নাই। কিন্তু সাধুতা বা বীরত্ব সকলেরই পক্ষে আদর্শ। সাধুদিগের এবং মহৎ কর্মে প্রাণ-বিসর্জন-পর বীরদিগের স্মৃতি সকলেরই পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু দল বাঁধিয়া ঋণশোধ করাকে সেই স্মৃতি-পালন কহে না; স্মরণ-ব্যাপার প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যহের কর্তব্য।'[২]

এ তো গেল স্মরণ-বিষয়ে ব্যষ্টি-মঙ্গল চিন্তা। স্মরণে আরও একটা দিক আছে—তা গুণকীর্তন বা কার্যাবলীর পর্যালোচনা। যে-সকল কাজের দ্বারা তিনি নিজেকে মহান্ করেছেন এবং যে চিন্তারাশি জাতিকে তাঁর কাছে ঋণী করেছে, তার কীর্তন সমাজ-কল্যাণের পরিপোষক। এর দ্বারা বর্তমান লোক উদ্ধার পায়, ভবিষ্যৎ লোকও পথের আলো পায়।

মোক্ষলক্ষ্য ভারতভূমি, মুক্তিকামী ভারত-বাসী। কিন্তু মাঝে মাঝে এ ভারতভূমিতে এমন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা আত্ম-মুক্তি তুচ্ছজ্ঞান ক'রে সমষ্টি-মুক্তির পথই খুঁজেছেন এবং প্রচার করেছেন। সংখ্যায় এঁরা নেহাৎ-ই নগণ্য এবং দুই জনের আবির্ভাব-কালের ব্যবধানও স্বল্প নয়। পরম বিস্ময়ের বিষয় ১৮৬১ থেকে ১৮৭২ খৃঃ এই বারো বছরের ব্যবধানে ভারতে চারজন মহামানবের শুভাগমন হয়েছে এবং প্রত্যেকেই আপন পথে পদচারণ ক'রে স্বদেশ-হিতৈষণায় তথা মানবমুক্তির নিদর্শন রেখে গেছেন। ১৮৬১ খৃঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৬৩ খৃঃ বিবেকানন্দ, ১৮৬৯ খৃঃ মোহনদাস গান্ধী, এবং ১৮৭২ খৃঃ শ্রীঅরবিন্দ। বিবেকানন্দ ব্যতিরেকে বাকী ক-জনই ভারতবর্ষের জলবায়ুতে দীর্ঘায়ু এবং যেমন স্বল্পকালের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তেমনি পরপর অমরধামেও যাত্রা করেছেন—রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ খৃঃ, গান্ধীজী ১৯৪৮ খৃঃ এবং শ্রীঅরবিন্দ ১৯৫০ খৃঃ। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, তবুও বিবেকানন্দের স্বাতন্ত্র্যের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। 'Cyclonic Hindu' বিবেকানন্দের অভিযানের পর প্রতীচ্য দেশবাসীর পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করা এবং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রতীচ্যের স্বীকৃতি লাভ করা বোধহয় সহজসাধ্য হয়েছিল। অরবিন্দ সম্ভবতঃ বিবেকানন্দের প্রাচীন ভারতীয় গৌরব-কীর্তন আর বর্তমান ভারতের দুর্দশা-বর্ণন দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন। আর গান্ধীজী নিপীড়িত অবহেলিত পদদলিত জনগণের ক্রন্দন শোনবার কান ও দুর্দশা দেখবার চোখ পেয়েছেন বিবেকানন্দের অনেক পরে।

জাতিকে আত্মস্থ করার কাজে আত্মনিয়োগ বিবেকানন্দ করেছিলেন; আর সেই ভাব অবলম্বন ক'রে এঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পদচারণ করেছেন, তা সেইভাব প্রত্যক্ষভাবে বিবেকানন্দের কাছ থেকেই গ্রহণ করুন বা অন্যভাবে লাভ করুন। কাজের দিক থেকে বিবেকানন্দ তাঁদের অগ্রবর্তী এবং এই হিসেবে এঁরা উত্তর-সাধক।

* * *

আজ দেশে জাতীয় আপৎকালীন অবস্থা বলবৎ। মাঝে মাঝে দেশদ্রোহীদের নজরবন্দী হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান পাশ্চাত্য-শিক্ষাদর্পী 'ভদ্রলোক'-মাত্রেই যে

২ বারোয়ারি মঙ্গল—রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড

দেশদ্রোহী—তার কি? এরাও স্বদেশের বিরুদ্ধে, স্বজাতির বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার তুলছে, হয় শিক্ষাগুণে, নয় বাঞ্ছিত পরিবর্তনের মন্থর-নীতিতে অধৈর্য হয়ে। তবুও আজ এমন একদল শিক্ষিত আছেন, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে এবং সক্রিয়ভাবে কোন গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত না থেকেও স্বদেশ-চিন্তা করেন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির চিন্তা তাঁদের কখন কখন উদ্ব্যস্ত ক'রে তোলে, কখন নিজের অক্ষমতার চিন্তায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন তাঁরা। এ শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই; দুর্ভাগ্যের বিষয় এই লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা একান্তই অল্প।

অধিকাংশ শিক্ষাভিমানী লোক হীন-স্বার্থ-চিন্তায় নিবিষ্ট এবং স্বচ্ছ-বিচারশক্তিহীন ও মঙ্গল-অমঙ্গল-বোধ-নিরপেক্ষ। এ হ'ল দীর্ঘদিনের পরবশ্যতার গুণ। 'বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনপ্রকারে একটু লাগে—দুর্বল-মাত্রেরই এই ইচ্ছা।'[৩] বিদেশী শাসকের ঐশ্বর্য-গৌরব পরাধীন মানুষকে এতদূর মোহাবিষ্ট করে যে, সে তার যুগ-যুগান্তরের ঐতিহ্য-গৌরব বিস্মৃত হয় এবং ক্ষণকালের দুর্বলতায় চিরকালের ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে বিদেশী রীতি-নীতি, ভাব-ভঙ্গী, আচার-ব্যবহার এক কথায় জীবন-বেদ অনুসরণে মত্ত হয়। উদ্দেশ্য—বিদেশী প্রভুর অনুকম্পা ও কৃপালাভ। কৃপালাভ কারও কারও ভাগ্যে ঘটে বটে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে জোটে না। জোটা সম্ভবও নয়; বিজিত রাজ্যের সকলকে কৃপা-ভিক্ষা দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পর-রাজ্য-জয়ে অগ্রসর হয়নি বিদেশী। এ তার আপন স্বার্থ-পরিপন্থী। তাই বিদেশী-শাসিত সমাজ দাস-সমাজে পরিণত হয়। তারই মধ্যে দু-চারজন স্বদেশপ্রেমিকের আবির্ভাব হয়, বিদেশীর শক্তি-মাহাত্ম্যে তাঁরা মনে করেন, শাসক-সমাজের অনুবর্তী সমাজ গঠন করলেই এদেশের সর্বোন্নতি। কিছু বিচার করেন না, শাসক-সম্প্রদায়ও তাই-ই চায়। শাসক ও শাসিতের স্বার্থ কোন কালে কোন দেশে এক নয়, বিশেষ—শাসক যখন বিদেশী। এ বিচার আমরা করিনি তখন, তার ফল ভোগ এখনও করছি।

কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে সমাজে কখন কখন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষের আবির্ভাব হয়, তা আজও জানা যায়নি। তবে মানুষের অভিজ্ঞতা এই—নিপীড়িত জনগণের মাঝে সেই পুরুষের আবির্ভাব হয়। যত শীঘ্র মানুষ তাঁকে চিনে নিতে পারে, সেই সমাজের কল্যাণ তত ত্বরান্বিত হয়। সেই অনন্য-প্রতিভার সম্মুখে কর্তব্য কী, অকর্তব্য কী, ধরা পড়ে এবং মৌলিক ভাষায় তার প্রকাশ হয়।

ইংরেজী উনবিংশ শতকের শেষ-দশকে স্বামী বিবেকানন্দ একাধিকবার ইওরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ করেন এবং সেই ধারণা থেকে ঘোষণা করেন যে, তাঁর 'পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তাহাতে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত-সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্য-অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায়-মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে।'[৪]

আমাদের দেশে ভ্রান্ত এক বিচার-ধারা বদ্ধমূল করবার চেষ্টা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ শুধু যে কেবল দুই ভিন্ন আন্দোলনের পুরোধা—তাই নয়, দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব-প্রবাহের স্রষ্টা। রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্বদেশ-চিন্তা বিশেষ অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করলে

৩ বর্তমান ভারত—বিবেকানন্দ

৪ বর্তমান ভারত

দেখা যাবে যে, বিবেকানন্দের চিন্তার আশ্চর্য পরিপূরক-স্বরূপ ঐকমত্য। বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকে জাগাতে হ'লে তাকে প্রথমে ধাক্কা দিয়ে বড় রকমের একটা নাড়া দিতে হয়। আবার সেই ধাক্কায় যাতে পড়ে না যায়, তাই তাকে ধরেও রাখতে হয়। বস্তুতঃ যে নাড়া দেয়, আর যে ধরে রাখে—উভয়েরই শেষ লক্ষ্য এক। অনেক সময় উভয় কাজ একই ব্যক্তির দ্বারা শুরু হয়, সংসাধিত হয় একাধিকের চেষ্টায়। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের সাধনা তদ্রূপ। অধিকমাত্রায় প্রথমোক্ত কাজে নিরত বলেই বিবেকানন্দের ভাষার মধ্যে একটা তীব্র তিরস্কার পাওয়া যায়। জাতিকে আঘাতের দ্বারা সম্বিৎ ফেরাবার চেষ্টাই তিনি বেশি করেছেন, তাই জাতিকে দৃঢ়পদে দাঁড় করানোর প্রাণপণ প্রয়াস সাধারণতঃ আমাদের চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ আঘাত করেননি; করেছেন অনুশোচনা আক্ষেপ, আর সহানুভূতির প্রচ্ছন্ন প্রলেপে জাতিকে আত্মস্থ হবার উপায় দিয়েছেন। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিচার বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তের অনুকূলে দেখাবার চেষ্টার মধ্যে কাউকে বড়, কাউকে ছোট ভাবনা যেন চিত্তকে গ্রাস না করে। স্বভাবতই এই জাতীয় উদ্ধৃতি দীর্ঘ হবে, তার জন্য এইটুকু ব'লে নিতে পারি—এই উদ্ধৃতি বর্তমান লেখকের কৃতিত্ব-দাবির স্বীকৃতি-আদায়ের জন্য নয়। বরং যদি মনে করা হয়, যে-চিন্তা লেখক যে-ভাষায় ব্যক্ত করতেন, তার চেয়ে সুললিত এবং অধিক প্রাঞ্জল ভাষায় তার প্রকাশের সুযোগ পাওয়া গেছে এবং তারই জন্য এই উদ্ধৃতি, তবে লেখকের প্রতি সুবিচার করা হবে। তা ছাড়া দুই চিন্তা-নায়কের চিন্তারাশির মধ্যে বিস্ময়কর মিল পাশাপাশি দেখলে আমরাও সহজেই বুঝতে পারবো—পথ কী? মঙ্গল-চিন্তার মন্ত্র-রচনা যাঁরই হোক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না; চিন্তায় কল্যাণ-কামনা থাকলেই হ'ল।

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ যে আমাদের পথ হ'তে পারে না—এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর ১৩০৯ সালের 'নববর্ষ'-চিন্তায় প্রকাশ করেছেন:

'.. ধার করা ফুলপাতায় গাছকে সাজাইলে তাহা আজ থাকে, কাল থাকে না…।

…বিদেশের বেশভূষা ভাবভঙ্গী আমাদের গাত্রে দেখিতে দেখিতে মলিন শ্রীহীন হইয়া পড়ে, বিদেশের শিক্ষা রীতিনীতি আমাদের মনে দেখিতে দেখিতে নির্জীব ও নিষ্ফল হয়—কারণ তাহার পশ্চাতে সুচিরকালের ইতিহাস নাই—তাহা অসংলগ্ন, অসঙ্গত, তাহার শিকড় ছিন্ন।

কাজেই পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করলেই পাশ্চাত্য জাতির মতো বলবীর্যসম্পন্ন হওয়া যায়, এমন বাসনা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যেই মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। এই ভিন্নতা বর্তমান যুগের সৃষ্টি নয়—মানব-সভ্যতার সুপ্রাচীন কালের আদি প্রান্ত থেকেই এর উদ্ভব এবং যুগ-যুগান্তরের অতিক্রমণে তা আরও দৃঢ়বদ্ধ—ঘনীভূত। সেই সংস্কৃতি এবং সভ্যতাশ্রয়ী মানুষগুলিও জন্ম-জন্মান্তরের পুরুষানুক্রমে একই সংস্কারের আবেষ্টনীতে সৃষ্ট ও লালিত-পালিত। বড় সহজে এই ব্যূহের বিনাশ হয় না। আর বিনাশের প্রয়াসই বা কেন? যদি বুঝি, যা আছে তা ত্যাগ করছি অধিক ভালো কিছু পাবার আশায়, তার একটা সার্থকতা আছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড।

সংশয়াতীত-ভাবে কি প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাচ্য আদর্শ অপেক্ষা পাশ্চাত্য আদর্শ বড় ? চরম পরীক্ষা তো আজও সম্পূর্ণ হয়নি। তবে যেন মনে হয়, পরীক্ষা দূরে নয়—জড় বিজ্ঞানের একান্ত চর্চায় মানুষ আজ যে স্তরে এসে পৌঁছেছে! বিধাতা যেমন একজন মানুষকে সর্বগুণ ও সর্বরূপ দিয়ে গড়েন না, তেমনি যা কিছু ভালো—যা কিছু উৎকৃষ্ট, তারই আধার-রূপে একটি সভ্যতা, একটি জাতি গড়ে উঠতে পারে না। দেশ-ভেদে, জাতি-ভেদে সভ্যতা-সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও গুণ আশ্রয় ক'রে বড় হয়, তার বড় হওয়ারও কাল-সীমা আছে। যেহেতু সর্বগুণের প্রকাশ কোন সভ্যতাতেই সম্ভব নয়। তাই যে-অবস্থায় কর্ষিত গুণ আর অকর্ষিত গুণের মধ্যে বিষম টানা-পোড়েনের সূত্রপাত, সেখানে সেই সভ্যতার গতি রুদ্ধ হয়ে ধ্বংসের অপেক্ষায় থাকে। কমবেশি সকল সভ্যতা-সম্পর্কেই এ-কথা প্রযোজ্য—এই-ই সৃষ্টি-লীলা। তাই হয়তো কোন এক বিশেষ ভাবগুণ আশ্রয় ক'রে পশ্চিম আজ স্পর্ধা প্রকাশ করছে। আমরাও যে নিঃস্ব, দুর্দিন চিরকালের--তাই বা মানবো কেন ? আমাদের নিজস্ব ভাবটি জেনে, তার শাশ্বত রূপ অনুভব ক'রে তারই উৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টায় রত হওয়াই—জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার এবং মানব-সভ্যতার অগ্রগতির পথে অর্ঘ্য রচনা করার সর্বোত্তম পন্থা ব'লে যদি মানি, তবে যেমন ভাবে এই প্রাচীন জাতি বেঁচে আছে, তেমনি ভাবেই অনাগত কাল পর্যন্ত এর জীবন-ধারা অব্যাহত থাকবে। অন্যথায় যেমন বহু আত্মবিস্মৃত জাতির অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছে এই ধরাতলে, সেই সর্বনাশা পরিণতির পথ রোধ করবার চেষ্টা নিছক বিড়ম্বনা-মাত্র।

তাই দেখি ভারতের শাশ্বত রূপ বিবেকানন্দে :

'পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ।'[৬]

"ভারতের বায়ু শান্তি-প্রধান, যবনের[১] প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা; একের মূল মন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ'; একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী, একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতা-প্রাণ; একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।"[৮]

রবীন্দ্রনাথেও দেখি এই ভারত-দর্শন :

'আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজ নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, তিনি ফললোলুপ কর্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড় পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বের মধ্যে আসীন, এবং প্রতি-যোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষা কালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই যে কর্মের বাসনা, জনসংঘের আঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে ভয়হীন শোকহীন মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপে যাহাকে 'ফ্রিডম' বলে, সে-মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে-মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু; তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর; তাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে'[৯]

(ক্রমশঃ)

৬ বর্তমান ভারত

১ সূক্ষ্ম অর্থে—গ্রীক, স্থূল-অর্থে—ইওরোপীয়।

৮ ভাববার কথা

৯ নববর্ষ—রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড

স্বামীজীর সন্নিধানে

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

[সূর্যকিরণের প্রখরতা অনুভব করিতে হইলে সৌরকরতপ্ত বস্তু স্পর্শ করিতে হয়, কিংবা সূর্যালোকের পরিচয় পাইতে হইলে দর্পণে প্রতিফলন দেখিতে হয়। স্বামীজীর জীবনের বিশালতা ও গভীরতা উপলব্ধি করিতে হইলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনালোচনা একান্ত প্রয়োজন।

'স্বামীজীর সন্নিধানে' এই পর্যায়ে আমরা স্বামীজীর দেশ-বিদেশের শিষ্য ভক্ত ও অনুরাগীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছি। বিষয়-বস্তুর অধিকাংশই ছড়াইয়া আছে স্বামীজীর জীবনী ও পত্রাবলীতে, কিছু কিছু আছে ভক্তদের স্মৃতিকথায়, সেগুলির কিছু পুস্তকাকারে প্রকাশিত, কিছু সাময়িক পত্র-পত্রিকাতেই আবদ্ধ। যথাসম্ভব তথ্যমূলক উপাদান সংগ্রহ করিয়া, ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে সংগ্রথিত করিয়া সেই সব অপূর্ব জীবন-কথা আমরা এখানে পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিতেছি।

—উঃ সঃ]

স্বামী সদানন্দ

১৮৮৮ খৃঃ শেষের দিকে স্বামীজী পরিব্রাজক বেশে বৃন্দাবন হইতে বাহির হইয়া হরিদ্বারের পথে হাতরাস স্টেশনে উপস্থিত হন। স্টেশনের এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, অনাহারে ও পথশ্রমে তাঁহার শরীর ও মন অত্যন্ত ক্লান্ত। এমন সময় সহকারী স্টেশন মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন।

বাল্যকাল হইতে জৌনপুরে মুসলমানদের মধ্যে বাস করিয়া শরৎচন্দ্র বাংলা অপেক্ষা উর্দু ও হিন্দীই ভাল বলিতে পারিতেন। তিনি সুফী-সম্প্রদায়ের অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে ছিল মাধুর্য, সরলতা ও পৌরুষ।

সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, 'বাঃ, এমন সৌম্যদর্শন সাধু তো কখনও দেখিনি।' তিনি যুবক সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক প্রভায় আকৃষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মনে হচ্ছে আপনি ক্ষুধিত, কিছু খাবেন?' স্বামীজী ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমি ক্ষুধার্ত বটে।'

তখন শরৎবাবু তাঁহাকে তাঁহার বাসায় আহ্বান করিলেন। স্বামীজী প্রশ্ন করেন, 'কি খেতে দেবে?' বালকের ন্যায় সরল শরৎচন্দ্র ফারসী কবির বয়েৎ উদ্ধৃত করিয়া বলেন, 'হে প্রিয়, তুমি আমার গৃহে অতিথি, যদি প্রয়োজন হয়, আমার হৃৎপিণ্ড দিয়াও তোমাকে সুখাদ্য প্রস্তুত ক'রে দেব।' শরৎবাবু অল্পক্ষণের মধ্যেই আহারের আয়োজন করিলেন। স্বামীজী বহুদিন যাবৎ যৎসামান্য ভোজনেই তৃপ্ত ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি তাহারও অভাব হওয়ায় ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলেন। এক্ষণে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী পরিতোষ সহকারে ভোজন করিলেন।

দৈনন্দিন কার্য সমাপ্ত হইলে শরৎবাবু সন্ন্যাসীকে ভাল করিয়া দেখিবার ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি বলিতেন, 'স্বামীজীর চক্ষুই আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল এবং প্রথম দর্শনেই স্বামীজীর উপর আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মেছিল।' তিনি স্বামীজীকে দিনকতক হাতরাসে থাকিতে অনুরোধ করিলেন

এবং তারপর বলিলেন, 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' উত্তরে স্বামীজী একটি গান গাহিলেন, সেই গানটি 'বিদ্যাসুন্দরে' মালিনীর –

'বিদ্যা যদি লভিতে চাও
চাঁদমুখে ছাই মাখো,
নইলে এই বেলা পথ দেখো।'

তরুণ ভক্ত শরৎবাবু সরলতার প্রতীক! তিনি তৎক্ষণাৎ অফিসের পোশাক ত্যাগ করিয়া মুখে ভস্ম মাখিয়া হাজির হইয়া বলিলেন, 'স্বামীজী, আপনি যা বলবেন, তাই করতে আমি স্বীকৃত। আমি সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।'

স্বামীজী তাঁহার নিঃস্পৃহ ভাব ও তীব্র বৈরাগ্য দর্শনে অতিশয় আনন্দিত ও আশ্চর্যান্বিত হইলেন, কিন্তু তখন কিছু বলিলেন না।

একদিন স্বামীজীকে ভারতের পুনর্জাগরণে বদ্ধপরিকর জানিয়া শরৎবাবু বলেন, 'স্বামীজী, বলুন, কি করতে পারি?' 'তুমি কি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে প্রস্তুত এবং এই মহান্ উদ্দেশে জীবনপণ ক'রে কাজ করবে?'—প্রশ্ন করেন স্বামীজী। শরৎবাবু তৎক্ষণাৎ স্টেশনের কুলিদের দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিয়া আনিলেন। স্বামীজী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন।

হাতরাস ত্যাগ করার সময় স্বামীজী তাঁহাকে দীক্ষা দেন। শরৎবাবু কর্মের ভার অপর একজনের উপর দিয়া স্বামীজীর সহিত হৃষীকেশ যাত্রা করিলেন।

স্বামীজী শরৎচন্দ্রকে সন্ন্যাস-নাম দেন 'সদানন্দ'। প্রথম প্রথম পরিব্রাজক জীবনের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সদানন্দ অসুস্থ হইয়া পড়েন। এমনকি তাঁহার প্রাণসংশয় হইয়াছিল। স্বামীজী সর্বদা তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। সদানন্দ বলিতেন, 'কী প্রেমময় স্বামীজীর হৃদয়! এক দিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন, সেদিন আমার নিশ্চয় মৃত্যু হ'ত। কিন্তু স্বামীজীর কী স্নেহ! তিনি আমাকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।'

হৃষীকেশে স্বামীজীর সহিত সদানন্দ কঠোর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে থাকেন। সদানন্দ এই সময় বিশেষ পীড়িত হওয়ায় স্বামীজী তাঁহাকে লইয়া হাতরাসে ফিরিলেন। সেখানে স্বামীজীও অসুস্থ হইলেন এবং গুরু-ভাইদের সনির্বন্ধ অনুরোধে দুর্বল শরীরেই বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসেন। আসিবার সময় স্বামীজী সদানন্দকে পরে বরাহনগরে আসিতে বলেন। কয়েক মাস পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া সদানন্দ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া বরাহনগর মঠে যোগদান করেন।

স্বামী সদানন্দের কথায় বরাহনগরে স্বামীজীর মঠ জীবনের একটি চিত্র: 'স্বামীজী এই সময় দিবারাত্র কাজ করতেন। কাজের সময় যেন উন্মত্তের মতো কাজ ক'রে চলতেন। অন্ধকার থাকতে উঠে সকলকে ডেকে তুলতেন। গভীর রাত্রিতে ছাদে বসে তিনি ও অন্য সাধুরা ভজন গাইতেন। অত্যন্ত খাটুনি গেছে তখন, বিশ্রামের সময় নেই! স্বামীজী মুহূর্তের জন্য কখনও অলস বা ম্লান হতেন না।'

বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মাদ্রাজে স্বামীজী গাড়িতে বসিয়া সদানন্দ স্বামীকে ভিড়ের মধ্যে দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া গাড়িতে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। স্বামীজী যখন কাশ্মীর যান, সদানন্দ তখনও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন।

১৮৯৮ খৃঃ স্বামী সদানন্দ ভগিনী নিবেদিতার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর ১৮৯৮-

৯৯ খৃঃ কলিকাতার প্লেগ-মহামারীতে সেবাকার্যে তিনি ভগিনী নিবেদিতার সহায়তা করেন। ভগিনী নিবেদিতা প্লেগ-সেবা সমিতির সম্পাদিকা এবং তিনি প্রধান অধ্যক্ষ। স্বামী সদানন্দ এই বিপজ্জনক সংক্রামক রোগের সেবাকার্যে সর্বাপেক্ষা উদ্যোগী ছিলেন এবং ধাঙ্গড়দের লইয়া বস্তিগুলি ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার ভার গ্রহণ করেন; তন্ময় হইয়া শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিতেন; দিন রাত্রি কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, তাঁহার খেয়াল থাকিত না!

স্বামী সদানন্দ স্বামীজীর সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণে—বিশেষতঃ মায়াবতী যাইবার সময় সঙ্গে যান। স্বামীজীর সুখসুবিধার ভার তিনিই গ্রহণ করেন। ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯০০ খৃঃ কাপ্তেন সেভিয়ারের পরলোকগমনে শ্রীমতী সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দেওয়া ও কাজকর্ম দেখা-শোনার জন্য স্বামীজী মায়াবতী গমন করেন—সঙ্গে স্বামী সদানন্দ। এই সময় স্বামী স্বরূপানন্দ মায়াবতীর অধ্যক্ষ ছিলেন।

স্বামী সদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে 'গুপ্ত মহারাজ' নামেই পরিচিত ছিলেন।

তিনি নিবেদিতার সহিত ভারতের বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন। স্বামী সদানন্দের জাপান পরিভ্রমণ-কালে ব্রহ্মচারী অমূল্য (স্বামী শঙ্করানন্দ) তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন।

আলাসিঙ্গা পেরুমল

দাক্ষিণাত্যে যে-সকল যুবক স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব পাণ্ডিত্য ও সাধুত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুগত শিষ্যে পরিণত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আলাসিঙ্গা পেরুমলের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজীর মাদ্রাজে থাকাকালে আলাসিঙ্গা তাঁহার সংস্পর্শে আসেন। মাদ্রাজবাসীরা স্বামীজীকে আমেরিকা যাইয়া ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম-প্রচার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উৎসাহী কর্মী আলাসিঙ্গা যুবকগণকে সঙ্গে লইয়া মধ্যবিত্তগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করেন। আলাসিঙ্গার নেতৃত্বশক্তি ছিল প্রচুর, তাঁহার নেতৃত্বে যুবকগণ মিলিত হইয়া স্বামীজীর ভাবধারা জীবনে রূপায়িত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

আলাসিঙ্গা একটি স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন এবং আদর্শবাদী শিক্ষক-হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার পাথেয় সংগ্রহের জন্য আলাসিঙ্গাকে হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, রামনাদ প্রভৃতি স্থানেও যাইতে হয়। স্বামীজীর শিষ্য হইয়া পেরুমল সর্বদা গুরুসেবায় তৎপর ছিলেন। স্বামীজীর উপর তাঁহার কিরূপ ভক্তি ও অনুরাগ ছিল, তাহা স্বামীজীর লিখিত পত্রাবলী হইতে জানা যায়।

হায়দ্রাবাদে পেরুমলের বন্ধুর গৃহে যাইয়া স্বামীজী অতিথি হন। আমেরিকা যাওয়ার সময় আলাসিঙ্গা স্বামীজীকে জাহাজে তুলিয়া দিতে বোম্বাই-এ উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকা যাত্রার পথে স্বামীজী যে পত্রাদি লেখেন, তাহাতে বোঝা যায়, আলাসিঙ্গা স্বামীজীর 'জগদ্ধিতায়' বাণীর উপযুক্ত আধার ছিলেন। ১০ই জুলাই ও ২০শে অগস্ট, ১৮৯৩ খৃঃ পত্র এবং ধর্মমহাসভায় বিজয়ী বিবেকানন্দের ২রা নভেম্বর, ১৮৯৩ খৃঃ পত্রও দ্রষ্টব্য।

একটি পত্রে স্বামীজী তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন: 'কাজ ক'রে চল—ধৈর্য, পবিত্রতা,

সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ ক'রে যাও—এই ক-টি বিষয় মনে রাখবে।'

আর একখানি পত্রে: 'আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, আবশ্যক কেবল সরলতা ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ বিস্তার; বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই জীবনের গতি-নিয়ামক। স্বার্থপরতাই মৃত্যু; জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতা প্রকৃত মৃত্যু-স্বরূপ।...পরোপকারই জীবন, পরহিত-চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বইজন নরপশুই মৃত-প্রেততুল্য; কারণ হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত ছাড়া আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর, সেই অনুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘুরিতে থাকুক, তোমাদের পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হউক।'

আলাসিঙ্গাকেই স্বামীজী তাঁহার বিদেশে অর্থাভাবের কথা জানাইয়া পত্র দেন, আবার তাঁহাকেই জানান সফলতার কথা। সঙ্গে সঙ্গে উদ্বুদ্ধ করেন কুসংস্কারের নিগড় ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিতে এবং বুকে সাহস লইয়া দেশের ও দশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে।

৩১শে অগস্ট, ১৮৯৪ খৃঃ লিখিত পত্রে স্বামীজী তাঁহাকেই মাদ্রাজে মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অর্থ-সংগ্রহের নির্দেশ দেন। সমিতি-গঠনের কাজও আরম্ভ করিতে লেখেন, পরে স্বামীজী দেশে ফিরিয়া তাঁহাদের কাজে সাহায্য করিবেন মাত্র।

ইহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, ২১শে ফেব্রুআরি, ১৮৯৩ হইতে ২০শে নভেম্বর, ১৮৯৬ পর্যন্ত স্বামীজী-লিখিত ৪১ খানি পত্র আলাসিঙ্গা পেরুমলের নামে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি পত্র উদ্দীপনাপূর্ণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পথের নির্দেশক।

বিদেশ হইতে স্বামীজীর প্রথমবার প্রত্যাগমনের পর পেরুমল তাঁহার সঙ্গে কলিকাতা আলমবাজার মঠে আসেন এবং স্বামীজীর সঙ্গেই থাকিতেন। বিদেশী শিষ্যেরা তখন কাশীপুর শীলেদের বাগানে থাকিতেন। স্বামীজী দিনের বেলা সেখানে এবং রাত্রে মঠে কাটাইতেন; প্রায় আড়াই মাইল পথ যাতায়াত করিতেন। স্বামীজী যখন বিশ্রামের জন্য দার্জিলিং গিয়াছিলেন, পেরুমল তাঁহার সঙ্গে যান। আলাসিঙ্গা প্রথমে শিক্ষকতা করিতেন, পরে মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন্'-পত্রিকার সম্পাদক হন। এই সম্পাদনা-কার্যে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকা স্বামীজীর ইচ্ছায় ও অর্থ-সাহায্যে তাঁহার মাদ্রাজী শিষ্যগণ বাহির করেন। স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে যাত্রার সময় আলাসিঙ্গা 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকা ও মাদ্রাজের কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য জাহাজে মাদ্রাজ হইতে কলম্বো পর্যন্ত গিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্লেগের জন্য মাদ্রাজে জাহাজে উঠা বা জাহাজ হইতে নামা বিষয়ে খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

'পরিব্রাজক' গ্রন্থে আলসিঙ্গা সম্বন্ধে স্বামীজীর যে মন্তব্যটি পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহার যথার্থ পরিচয়: 'আলাসিঙ্গার মতো মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প; অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ খাটুনি, অমন গুরু-ভক্ত আজ্ঞাধীন শিষ্য জগতে অল্প...।'

স্বামী অভয়ানন্দ (মেরী লুই)

বেদান্তের মূর্ত বিগ্রহ স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসিয়া পাশ্চাত্যে ত্যাগের শাশ্বত আদর্শ নিজেদের জীবনে রূপায়িত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বামী অভয়ানন্দ তাঁহাদের অন্যতম।

তিনি ছিলেন ফরাসী মহিলা। পূর্বাশ্রমের নাম মাদাম মেরী লুই। তিনি আমেরিকায় ২৫ বৎসর যাবৎ বাস করিতেছিলেন এবং ঐ দেশের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়া সেখানকার স্বাভাবিক নাগরিকে পরিণত হন। তাঁহার পূর্ব ইতিহাস বিস্ময় উদ্রেক করে। শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ কাল তিনি উদারপন্থীদিগের নিকট একজন জড়বাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী রূপে পরিচিত ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের মাত্র এক বৎসর পূর্বে তিনি 'মানহাটান লিবারেল ক্লাবে'র একজন সভ্যা ছিলেন। সে-সময় লেখনী পরিচালনে, পত্রিকায় প্রবন্ধ-প্রকাশে ও বক্তৃতামঞ্চে তিনি ভয়শূন্যা এবং প্রগতিশীল নারীরূপে সুপরিচিতা। সর্বদা সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিতেই তিনি গর্ব অনুভব করিতেন।'

মেরী লুইকে সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিয়া স্বামীজী তাঁহার নাম দেন 'অভয়ানন্দ।' সন্ন্যাস-গ্রহণের কিছু পূর্ব হইতেই তিনি স্বামীজীর শিষ্যা বলিয়া পরিচিতা ছিলেন।

স্বামীজী ইংলণ্ডে থাকাকালে তাঁহার শিষ্যেরা আমেরিকায় সাফল্যের সহিত বেদান্ত প্রচার-কার্য চালাইতে থাকেন। স্বামী অভয়ানন্দের নাম এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু নিউইয়র্কে বেদান্ত-দর্শনে নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা আহ্বান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য নগরে স্বামীজীর উদ্দীপনাময়ী বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। সভায় বেশ লোক-সমাগম হইত; সর্বত্রই তিনি উৎসুক শ্রোতা পাইতেন এবং নূতন নূতন কেন্দ্র স্থাপনে সমর্থ হইতেন, বাফেলো ও ডেট্রয়েটে তাঁহার বেদান্ত-প্রচার বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। এই কেন্দ্র-দুইটিতে সত্যান্বেষী কর্মিগণ উৎসাহ ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে কাজ চালাইতে থাকেন।

স্বামী অভয়ানন্দ স্বামীজীর আমেরিকা পরিত্যাগের পরেও স্বীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক শক্তি, উৎসাহ ও আন্তরিকতা দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্ত-প্রচারে তৎপর ছিলেন। মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যে বুদ্ধিজীবী ও সমাজের উচ্চস্তরের নরনারীরা তাঁহার বেদান্ত-ভাষণে ও শিক্ষাদান-ক্ষমতায় এতদূর মুগ্ধ হন যে, দলে দলে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে শিকাগোয় থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। জনসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে তিনি 'অদ্বৈত সমিতি' স্থাপন করেন।

স্বামী অভয়ানন্দ ১৮৯৯ খৃঃ প্রথম ভাগে ভারতে আসেন। মেরী হেলকে তাঁহার ভারতে আগমন-সম্বন্ধে স্বামীজী একটি পত্রে জানাইতেছেন :

'অভয়ানন্দ ভারতে এসেছে, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তার খুব সংবর্ধনা হয়েছে, আগামী কাল সে কলকাতায় আসবে এবং আমরাও তাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করছি।'

স্বামীজী তাঁহাকে ঢাকা পাঠাইয়া দেন। তখন স্বামী বিরজানন্দ ঢাকায় ছিলেন। ঢাকায় অভয়ানন্দের অনেকগুলি বক্তৃতা হয়। অভয়ানন্দকে লইয়া বিরজানন্দ ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ এবং পরে বরিশালে গমন করেন। স্বামী অভয়ানন্দ মাদ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি স্থানেও বক্তৃতা দেন, সর্বত্রই তাঁহার ভাষণ জনপ্রিয় হয়।

স্বামী কৃপানন্দ (ল্যাণ্ডসবার্গ)

স্বামী কৃপানন্দের পূর্ব নাম ছিল হের লিয়ন ল্যাণ্ডসবার্গ। জন্মগতভাবে রাশিয়ান ইহুদী ল্যাণ্ডসবার্গ আমেরিকার নাগরিক হইয়াছিলেন। আমেরিকায় স্বামীজীর তিনজন সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে তিনি একজন। সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজী তাঁহাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেন।

ল্যাণ্ডসবার্গ স্বামীজীর প্রচারকার্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, তবে কিছুদিনের জন্য তিনি স্বামীজীকে ছাড়িয়া চলিয়া যান। পরে স্বামীজীর পূতসঙ্গ লাভের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিলে আবার ফিরিয়া আসেন।

মিস হেলকে লিখিত স্বামীজীর একটি পত্রে ল্যাণ্ডস্‌বার্গ সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য আছে। স্বামীজী তাঁহাকে সাহসী ও মহৎ ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করেন। আর একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন : 'আমি জীবনে যে দু-চারজন অকপট লোক দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, ল্যাণ্ডসবার্গ তাদেরই মধ্যে একজন।' আমেরিকায় স্বামীজী তাঁহার বাটিতে কিছুদিন অবস্থান করেন।

ল্যাণ্ডসবার্গ নিউইয়র্কের একটি প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রে কাজ করিতেন। সাংবাদিকতায় তাঁহার দক্ষতা ছিল এবং সাংবাদিক-হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর অনুপস্থিতি-কালে কৃপানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার-কার্যে রত হন এবং অভয়ানন্দের সঙ্গে যুক্তভাবে অত্যন্ত সফলতার সহিত কাজ চালাইতে থাকেন। তাঁহাদের বেদান্ত-দর্শনের ক্লাসে শ্রোতৃবর্গ আগ্রহ সহকারে যোগ দিতেন। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে স্বামীজীর ভাবধারা প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন ও ভাষণ দিতে থাকেন। তাঁহাদের উদ্যোগে অনেকগুলি নূতন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সকল স্থানেই তাঁহারা আন্তরিক ঈশ্বরান্বেষী শ্রোতা ও কর্মী পাইতেন।

স্বামীজী সুইজরলণ্ড হইতে কৃপানন্দকে একখানি পত্রে লিখিতেছেন :

'পবিত্র হও ও সর্বোপরি অকপট হও; মুহূর্তের জন্য ভগবানে বিশ্বাস হারিও না—তা হলেই আলো দেখতে পাবে। যা কিছু সত্য, তাই চিরস্থায়ী; কিন্তু যা সত্য নয়, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

স্বামীজী লণ্ডন হইতে ফিরিয়া কৃপানন্দের সঙ্গে নিউইয়র্ক ৩৯নং রাস্তায় দুইটি বড় ঘর লইয়া থাকিতে আরম্ভ করেন। এইখানে তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিবার জন্য বহু লোক সমাগত হইত।

১৮৯৬ খৃঃ ১৯শে ফেব্রুআরি 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় কৃপানন্দের যে পত্র প্রকাশিত হয়, তাহাতে এই সময় স্বামীজীর প্রভাব কিরূপ কাজ করিতেছিল এবং বেদান্তপ্রচার কি সুন্দরভাবে চলিতেছিল, তাহা জানা যায়।

'কিডি'

কিডি—সিঙ্গারভেলু মুদালিয়র মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। প্রথম জীবনে তাহার কথা-বার্তায় নাস্তিকতার ভাব পরিস্ফুট হইত, তিনি ঈশ্বর মানিতেন না, হিন্দুধর্মের কঠোর সমালোচনা করিতেন এবং খৃষ্টধর্ম-প্রচারকগণ যে অন্যান্য ধর্ম-সম্বন্ধে অনধিকার চর্চা করে, সে-বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন।

পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে রত, তখন তাঁহার কথা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। স্বামীজী কুমারিকা হইতে ফিরিবার পথে মাদ্রাজে আসিলে সিঙ্গারভেলু

তাঁহার সহিত তর্ক করিতে আসেন। ইহা ১৮৯২-এর ঘটনা। কিন্তু আলাপের শেষে তিনি স্বামীজীর চিন্তাধারায় এতদূর প্রভাবান্বিত হন যে, তাঁহার ভ্রান্ত ধারণাসমূহ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন। পরে তিনি স্বামীজীর একজন উৎসাহী শিষ্য হইয়াছিলেন। ঘোর নাস্তিক হইতে প্রকৃত আস্তিক হওয়া যাহাকে বলে, সিঙ্গারভেলু তাহার একটি নিদর্শন। স্বামীজী তাঁহাকে পরে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন: Caesar said, 'I came, I saw, I conquered.' But Kidi came, he saw, but he was conquered. অর্থাৎ কিডি জয় করিতে আসিল, কিন্তু নিজেই বিজিত হইল।

স্বামীজী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং 'কিডি' বলিয়া ডাকিতেন। এই নামটিরও একটি সুন্দর তাৎপর্য আছে। দক্ষিণ-দেশে তামিলভাষায় 'কিডি' শব্দের অর্থ 'পাখি'। সিঙ্গারভেলু পাখির মতো অত্যন্ত কম আহার করিতেন। পাখির মতো স্বল্পাহারী এই ব্যক্তিটিকে স্বামীজী আদর করিয়া 'কিডি' বলিয়া ডাকিতেন ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন, সিঙ্গারভেলুও ইহাতে খুব আনন্দিত হইতেন।

ইহার পর স্বামীজীর নির্দেশে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকিলে কিডি ঐ পত্রিকার অবৈতনিক পরিচালক (manager) হইয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার কাজে জীবন পাত করিতে সঙ্কল্প করেন।

কিডিকে লিখিত স্বামীজীর পত্রগুলি উচ্চতত্ত্বপূর্ণ। স্বামীজীর মতে শিক্ষা কি, ধর্ম কি?—এইসব জটিল প্রশ্নের উত্তর কিডিকে লিখিত পত্রে আছে।

স্বামীজী লিখিয়াছিলেন:

১. শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।

২. ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।

এক সময়ে কিডির সন্ন্যাস-গ্রহণের বাসনা হয়, স্বামীজী তখন তাঁহাকে লেখেন: ফল পাকলে আপনি গাছ থেকে পড়ে যায়। অতএব সময়ের অপেক্ষা কর। তাড়াতাড়ি ক'রো না···ধৈর্য ধরে থাকো, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্বামীজী প্রথমবার পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে কিডি তাঁহার সহিত কলিকাতা আসেন। কিডি স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। দিনের বেলা কাশীপুরে শীলেদের বাগান-বাড়িতে তাঁহার বিদেশী শিষ্যদের কাছে থাকিয়া স্বামীজী সন্ধ্যায় আলমবাজার মঠে চলিয়া আসিতেন। কিডি তাঁহার অনুগমন করিতেন এবং রাত্রে মঠেই থাকিতেন।

কিডি মঠে ভক্তদের জন্য 'রসম্' ও 'করম্বু' রান্না করিতেন। তিনি খুব সরল ও আমোদ-প্রিয় ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া মঠের সকলে খুব আনন্দ করিতেন, তিনিও সকলকে আনন্দ দিতেন। স্বামীজীর দার্জিলিং যাইবার সময়ে কিডি সঙ্গে যান।

গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তখন আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলেও কিডি ত্যাগের জলন্ত আদর্শ অনুসরণ করিতেন। শেষ জীবনে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু-সন্ন্যাসীর মতো থাকিতেন এবং সেই অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। 'সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে' স্বামীজীর এই আশীর্বাদ যথার্থ ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

স্বামী বিরজানন্দ

পাশ্চাত্যে বেদান্তের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া ১৮৯৭ খৃঃ ভারতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে স্বামীজী আলমবাজার মঠে যে চারজনকে প্রথম সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করেন, স্বামী বিরজানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ১৮৯১ খৃঃ রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ ৬০ বৎসর মঠ-মিশনের বিকাশ ও গতির সহিত জড়িত ছিলেন।

স্বামী বিরজানন্দের পূর্ব নাম ছিল কালীকৃষ্ণ বসু। ১৮৭৩ খৃঃ ১০ই জুন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিন (২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০) তিনি কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন।

কিশোর বয়স হইতেই কালীকৃষ্ণের প্রবল ধর্মানুরাগ ছিল। ছাত্রজীবনের বন্ধু এবং নেতা খগেনের (পরে স্বামী বিমলানন্দ) প্রভাব তাঁহার উপর খুবই বেশি ছিল। সব বন্ধু একসঙ্গে মিলিয়া ধর্মচর্চা ও আদর্শ ছাত্রজীবন যাপন করিতেন। ছাত্রাবস্থার অন্য বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন সুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ), সুশীল (স্বামী প্রকাশানন্দ), হরিপদ (স্বামী বোধানন্দ), শুকুল (স্বামী আত্মানন্দ)। ইঁহারা সকলেই রামকৃষ্ণ মঠের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী।

রিপন কলেজে পাঠকালে ইংরেজীর অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত লেখক 'শ্রীম') নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যগণের কথা শুনিতে পাইয়া বন্ধুদের সহিত কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে ও বরাহনগর মঠে যাতায়াত আরম্ভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-শিষ্য রামবাবু, মনোমোহনবাবু প্রভৃতিও তাঁহাদের বিকাশোন্মুখ ধর্মভাব জাগরিত করেন।

১৭ বৎসর বয়সে কালীকৃষ্ণ বরাহনগর মঠে যোগদান করেন, সেখানে বৈরাগ্য ও তপস্যার মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রাণ ঢালিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে থাকেন।

১৮৯১ খৃঃ স্বামী সারদানন্দের সহিত জয়রামবাটী গিয়া পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহচ্ছায়ায় একমাস অতিবাহিত করিয়া তিনি অপার আনন্দ লাভ করেন। বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যান-বাটীতে থাকাকালে শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দেন।

স্বামীজী পাশ্চাত্য হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আলমবাজার মঠে আছেন। ৪।৫ দিন পরে কালীকৃষ্ণ স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করিয়া প্রণাম করিলে স্বামীজী তাঁহার গুরুভাইদের বলিলেন, 'ও, এই ছেলেটি বুঝি?' তাহাতে কালীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে, তাঁহার কথা স্বামীজীকে পূর্বেই জানানো হইয়াছে।

সেই সময়ে স্বামীজীকে দেখিয়া তাঁহার যেরূপ বোধ হইত, তাহা তাঁহার নিজের ভাষায়:

'স্বামীজীর শরীর তখন উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। সেই সম্মোহন চক্ষু—যার কথা শুনেছিলুম ও আমেরিকার কাগজের cuttings-এ পড়েছিলুম। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন একটা জ্যোতি বেরুচ্ছে। কী অপরূপ মূর্তি—একাধারে সৌন্দর্য ও মহাশক্তির খেলা! আমার first impression (প্রথম ধারণা) ভালবাসা, ভক্তি ও ভয়মিশ্রিত ভাব। ভোরবেলা ভিতরের বাড়ির ছাদের উপর লেঙটিমাত্র পরে যখন আপনার ভাবে তন্ময় হয়ে পায়চারি করতেন—বীরের মতো, সিংহের মতো—সে কি অপূর্ব দৃশ্য! মনে

হ'ত যেন ত্বনিয়াটা প্রতি পদবিক্ষেপে সরে সরে যাচ্ছে—slipping under his feet! তাঁর মুখখানা যেন সর্বদাই লাল হয়ে থাকত। যেন চোখাচোখি হ'লে চোখ ঝলসে যেত—চাওয়া যেত না। স্বামীজীর কাছে প্রথম প্রথম থাকতে কেমন একটা ভয় হ'ত—কি জানি কি অপরাধ ক'রে ফেলি ও তাঁর বিরাগভাজন হই। যতটা পারতুম তাঁর কাছে কম ঘেঁসতুম বা একটু আড়ালে থাকতুম!'

স্থূল শরীরে তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর স্বামীজীকে পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই পাঁচ বৎসর যেন পঞ্চাশ বৎসরের সমান। স্বামীজীর শিক্ষাদীক্ষা তাঁহার জীবনে তুমুল বিপ্লব আনিয়াছিল। কর্ম জ্ঞান ভক্তি ও যোগের মূর্ত বিগ্রহ স্বামীজীর শিক্ষায় তিনি ঈশ্বরলাভের সবগুলি পথের মর্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সর্ব বিষয়ে আন্তরিক নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য দেখিয়া স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'That's my man.'—এই তো আমার যথার্থ চেলা।

স্বামীজীর কর্মপরিণত বেদান্তের ভাবগুলি তিনি অভ্যাস করিতে লাগিলেন। যে-সব কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই মঠে যোগ দিয়াছেন। স্বামীজীকে পাইয়া সকলের হৃদয়-মন এক অভিনব উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছে। স্বামীজী তাঁহাদের প্রত্যেককে মনের মতো করিয়া গড়িতে লাগিলেন—ভবিষ্যতে যে তাঁহাদের বড় বড় কাজ করিতে হইবে! কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি চারজনকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়া স্বামীজী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লোকসেবাব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়া শীঘ্রই বিরজানন্দকে স্বামীজীর আদেশে দেওঘরে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবায় যাইতে হইল। এই সেবাকার্য তিনি অতি শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১৮৯৮-এর শেষভাগে ঢাকার ভক্তেরা স্বামীজীর নিকট জনসাধারণের মধ্যে বক্তৃতার দ্বারা বেদান্তের বাণী প্রচার করিতে পারেন, এমন কোন সন্ন্যাসী চাহিয়া পাঠাইলেন। স্বামীজী বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দকে মনোনীত করিলেন। বিরজানন্দ কিন্তু আপত্তি করিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'সাধন-ভজন কিছুই করলুম না, জীবনে কিছুই উপলব্ধি হ'ল না, আমি কি বক্তৃতা ক'রব?' স্বামীজী বলিলেন, 'তুই তো আচার্যের অভিমান রেখে বলবিনে—সেবার ভাবে যেমন অপর দশটা কাজ করিস, বক্তৃতাও সেই রকম করবি।' বিরজানন্দ বলিলেন, 'কিন্তু আমি কি জানি যে ব'লব?' স্বামীজী বলিলেন, 'আচ্ছা, দাঁড়িয়ে এইটাই বলবি যে, আমি কিছু জানি না।' তবু কালীকৃষ্ণ রাজী হইতেছেন না দেখিয়া স্বামীজী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'ছাখ্, নিজের মুক্তি যদি চাস তো জাহান্নমে যাবি, আর অপরের মুক্তির জন্যে যদি কাজ করিস তো এখনই মুক্ত হয়ে যাবি।' বিরজানন্দকে অবলম্বন করিয়াই সারা বিশ্ব যুগাচার্যের এই সতর্ক বাণী শুনিতে পাইয়াছে! এই কথায় বিরজানন্দ একেবারে অভিভূত হইলেন। স্বামীজীর প্রসন্ন আশীর্বাদ লইয়া প্রকাশানন্দের সহিত ঢাকা গেলেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশালে তিনি সাফল্যের সহিত বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করেন।

ক্রমাগত অমানুষিক পরিশ্রমে স্বামীজীর শরীর শীঘ্রই ভাঙিয়া পড়িতেছিল। এই সময়ে কয়েক মাস মনপ্রাণ দিয়া অক্লান্তভাবে

বিরজানন্দ তাঁহার সেবা করেন। এই সেবায় অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করেন।

১৮৯৯ খৃঃ মাঝামাঝি স্বামীজী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করেন। বিরজানন্দকে তিনি হিমালয়ে নূতন প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রমের কর্মী-রূপে পাঠাইয়া দিলেন।

স্বামীজী স্বদেশে ফিরিয়া প্রিয় শিষ্য মিঃ সেভিয়ারের দেহত্যাগের কথা শুনিলেন, তখন তিনি মিসেস সেভিয়ারকে (স্বামীজী তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন) সান্ত্বনা দিবার জন্য মায়াবতী যাইতে ইচ্ছা করিলেন। স্বামীজী আসিতেছেন জানিয়া যাবতীয় বন্দোবস্ত বিরজানন্দ করেন। মায়াবতীতে স্বামীজী যে দু-সপ্তাহ ছিলেন, তাহার ভাস্বর স্মৃতি বিরজানন্দের হৃদয়ে সারাজীবন জ্বলজ্বল করিত। ঐ গল্প বলিতে তাঁহার কখনও ক্লান্তি ছিল না। হিমালয়ের নিভৃত ক্রোড়ে কী একান্ত ভাবেই না তিনি স্বামীজীর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন!

১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই স্বামীজীর মহাসমাধির দিন 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিরজানন্দ আমেদাবাদে ছিলেন। এই মর্মান্তিক সংবাদ তাঁহার হৃদয়মন এককালে নিষ্পেষিত করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি তিনি মায়াবতী ফিরিয়া কিছুকাল একান্তমনে ধ্যান-ভজনে কাটাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময় তিনি দৈনিক ১৫।১৬ ঘণ্টা জপধ্যান করিতেন।

১৯০৬ খৃঃ মায়াবতীর তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর বিরজানন্দ উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ হন। ঐ সময়ে তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে পরিচালিত ইংরেজী মাসিক-পত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যদের সহায়তায় স্বামীজীর সুবৃহৎ ইংরেজী জীবনী প্রকাশ ও বক্তৃতাবলী সঙ্কলন করেন। ১৯১৪ খৃঃ হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিকেতন মায়াবতীর নিকটস্থ শ্যামলাতাল নামক নির্জন স্থানে 'বিবেকানন্দ আশ্রম' প্রতিষ্ঠাপূর্বক ১৯২৬ খৃঃ পর্যন্ত ধ্যান-ভজনে নিরত থাকেন।

১৯৩৪ খৃঃ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক, ১৯৩৮ খৃঃ অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

১৯৫১ খৃঃ ৩০শে মে ৭৮ বৎসর বয়সে তিনি বেলুড় মঠে মহাসমাধি লাভ করেন।

সমালোচনা

বাংলার বিবেকানন্দ (বাংলার তরুণদের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের শিক্ষা ও প্রেরণা)--স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। প্রকাশক: সম্পাদক বিবেকানন্দ-সঙ্ঘ, বজবজ, ২৪পরগনা। পৃষ্ঠা ৭২; মূল্য ২৲।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় বাংলার তরুণসমাজ স্বামীজীর নিকট হইতে কি প্রেরণা লাভ করিতে পারে, তাহার যথার্থ দিগ্‌দর্শন উপস্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে লেখা এই আলোচ্য গ্রন্থটি।

বিভিন্ন অধ্যায়ে বাংলার ছেলেমেয়েদের হৃদয় ও কর্মপ্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা এবং তেজোবীর্য, চরিত্র, দেশ ও ধর্ম সম্বন্ধে অগ্নিময়ী বাণীর উপর অভিনব আলোক সম্পাত করা হইয়াছে। ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তু—সব দিক দিয়াই গ্রন্থখানি সুন্দর।

আশা করি—বাংলার ঘরে ঘরে ও প্রতিটি স্কুল-কলেজে এই গ্রন্থ পঠিত হইবে এবং বাংলার ছেলেমেয়েরা ইহা পাঠ করিয়া জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইবে।

যুগাচার্য বিবেকানন্দ (হিন্দী)—লেখক ও প্রকাশক: স্বামী অপূর্বানন্দ, অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী। পৃষ্ঠা ১০০।

হিন্দীতে স্বামীজীর প্রামাণিক জীবন-কাহিনী—শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া সহজ সরল ভাষায় লেখা পুস্তকখানি হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চলে স্বামীজীর ভাবপ্রচারে বিশেষ সহায়ক হইবে। ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত।

অমিয়-বাণী—শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। প্রকাশক: জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ১৭৬; মূল্য ২৲।

আলোচ্য পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সন্ন্যাসী সন্তানের (সংখ্যায় মোট ১৬ জন) বাণী বিশেষ যত্ন সহকারে সন্নিবেশিত। বইটির 'অমিয়-বাণী' নাম সার্থক।

মর্মবাণী—লেখক ও প্রকাশক: শ্রীসুকুমার সুর, শ্রীঅরবিন্দ মন্দির, ৫।১০০ আউদ গর্বী শিবালয়, বারাণসী। পৃষ্ঠা ১০৪; মূল্য ২৲।

অরবিন্দ-ভাবের আলোকে প্রস্ফুটিত হৃদয়-কমলের এই কাব্যরূপ ও মর্মের বাণী সুধীচিত্ত আকৃষ্ট করবে।

বাংলায় উপনিষৎ (দ্বিতীয় খণ্ড)—অনুবাদক ও সম্পাদক: শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু। প্রকাশক: শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু, পি ৩৭৮ কেয়াতলা লেন, কলিকাতা ২৯। পৃষ্ঠা ৪৪৬; মূল্য ৭৲।

'বাংলায় উপনিষদে'র দ্বিতীয় খণ্ডে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্যগুলির মূলানুযায়ী সরল বাংলায় অনুবাদ করা হইয়াছে। প্রাচীন ও নবীন ভাষ্যকার ও টীকাকারদের ব্যাখ্যাও সন্নিবেশিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন: '…ইহাতে শুধু অনুবাদের সৌষ্ঠব বৃদ্ধিই হয় নাই, উপরন্তু উপনিষদের তাৎপর্য-নির্ণয়ের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।' —আমরাও ইহা সমর্থন করি।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—দুইটি উপনিষদ্‌ই কঠিন। ইহাদের বিষয়বস্তু সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিতে সুধী গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। আশা করি—প্রথম খণ্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খণ্ডও পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করিবে।

'নৌমি গুরু-বিবেকানন্দম্'—বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী-স্মারক গ্রন্থ। প্রকাশক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন শতবার্ষিকী সমিতি, ৭।৮, নস্করপাড়া ১ম বাই লেন, কাসুন্দিয়া, হাওড়া। পৃষ্ঠা ১৬০।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থগুলির মধ্যে আলোচ্য পুস্তকটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ: শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ-আন্দোলন ও স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামীজীর কর্মসূচী, বিবেকানন্দ ও মানবতাবাদ, শতাব্দীর আলোকে বিবেকানন্দ, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় বিবেকানন্দ, সৈনিক সন্ন্যাসী। বিচিত্র ও প্রয়োজনীয় বিষয়-সন্নিবেশে সম্পাদনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দ-শত-দীপায়ন—প্রকাশক: বিবেকানন্দ-সঙ্ঘ, বজবজ, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৩৮৫; মূল্য ৫৲।

ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতে মোট ৫৫টি সুলিখিত রচনায় সমৃদ্ধ 'বিবেকানন্দ-শত-দীপায়ন' স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকীতে সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রবন্ধ-নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যে ও বিশালতায় এই গ্রন্থ বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগীদের চিত্ত আকর্ষণ করিবে।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে নূতন প্রকাশন

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি:

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা—শ্রীতামসরঞ্জন রায়। প্রকাশক: জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ১৭০; মূল্য ৪৲।

স্বামী বিবেকানন্দ (নাটিকা)—শ্রীতামসরঞ্জন রায়। প্রকাশক: জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ৩৬; মূল্য ৫০ ন.প.।

শ্রদ্ধার্ঘ্য (স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে রচিত সঙ্গীতালেখ্য) —শ্রীসুধীরকুমার দত্ত। পৃষ্ঠা ১৮।

যুগবাণী—মালদহ বিবেকানন্দ শতবার্ষিক উৎসব-কমিটির পক্ষ হইতে স্বামী পরশিবানন্দ কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২২।

বিশ্ববিবেক—সম্পাদনা:—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শংকর। প্রকাশক: বাক্-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ৫১৮; মূল্য ১০৲।

শতবার্ষিকী বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ জানাইতেছেন :

জানুআরি, ১৯৬৩ স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবের শুভ উদ্বোধনের পর হইতে ভারতের নানাস্থানে এবং এশিয়া, ইওরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(১) ডিসেম্বর, ১৯৬৩ হইতে জানুআরি ; ১৯৬৪ পর্যন্ত কলিকাতায় শতবার্ষিকীর সমাপ্তি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাময়িকভাবে নির্ধারিত তারিখগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :

১৯শে হইতে ২২শে ডিসেম্বর, '৬৩……মহিলা-সম্মেলন
২০শে ডিসেম্বর হইতে প্রায় ৪ সপ্তাহ……প্রদর্শনী
২৩শে হইতে ২৫শে ডিসেম্বর, '৬৩……সঙ্গীত-সম্মেলন
২৬শে হইতে ২৯শে ডিসেম্বরের মধ্যে……ছাত্র-সম্মেলন ও শোভাযাত্রা
৩০শে ডিসেম্বর হইতে প্রায় ৬ দিন যাবৎ……ধর্ম-মহাসভা।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী একটি দুর্লভ অনুষ্ঠান, আমাদের মধ্যে কেহই স্বামীজীর দ্বিতীয় শতবার্ষিকী দেখিবার আশা করিতে পারি না, অতএব সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন এই সমাপ্তি-উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করিয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

(২) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রায় সকল কেন্দ্রেই স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্রের ভক্ত ও বন্ধুগণ যাহাতে কেন্দ্রীয় শতবার্ষিকী কমিটির সভ্য হন এবং শতবার্ষিক 'কুপন' ক্রয় করেন, তাহার জন্য কর্মিগণকে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

(৩) কেন্দ্রীয় শতবার্ষিকী কমিটি কর্তৃক ইতিপূর্বেই নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে এবং আরও কয়েকটি প্রকাশিত হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সকল কেন্দ্রকে ২০% কমিশনে বই দেওয়া হইবে :

১. 'ছোটদের বিবেকানন্দ'—স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রণীত, মূল্য ৫০ ন. প.
২. 'স্বামী বিবেকানন্দ'—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ প্রণীত, মূল্য ৲
৩. 'বিবেকানন্দ-লীলাগীতি—স্বামী চণ্ডিকানন্দ প্রণীত, মূল্য ১৲
৪. 'দিব্যগীতি'—স্বামী অপূর্বানন্দ সঙ্কলিত, মূল্য ৮৲

স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, স্বামী তেজসানন্দ প্রণীত 'যুগাচার্য বিবেকানন্দ' এবং স্বামী অপূর্বানন্দ প্রণীত 'যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ' (হিন্দী) অগস্ট, ১৯৬৩ মধ্যে প্রকাশিত হইতে পারে। শিশুদের সচিত্র বিবেকানন্দ প্রস্তুতির পথে।

(৪) স্বামীজীর সুন্দর প্রতিকৃতি ও বাণী সম্বলিত তিন রকমের 'লকেট' (মূল্য ৫০ ন. প., ৩৮ ন. প. এবং ২৫ ন. প) বাহির করা হইয়াছে, প্রত্যেকটিতে ৫ ন. প. কমিশন দেওয়া হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শতবার্ষিকী সংবাদ

বেলঘরিয়া ঃ রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমে স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে সপ্তাহ-ব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হয় ২২শে জানুআরি। সকালে প্রভাতফেরি দ্বারা উৎসবের সূচনা হয়। বিকালে জয়ন্তী উৎসবের প্রারম্ভিক সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ভাষণ সকলের অন্তর স্পর্শ করে। ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ছিলেন প্রধান অতিথি। মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্বামী পুণ্যানন্দ মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সভাশেষে পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সাতদিন ধরিয়া ইহা সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিয়াছে। প্রদর্শনী খুবই উচ্চাঙ্গের হয় এবং দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।

অন্যান্য দিনের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান: ২৩শে নেতাজী দিবসের সভা, ২৪শে ২৪-পরগনা জেলার ছাত্রদের মধ্যে স্বামীজীর ত্রিবর্ণচিত্র বিতরণ, ২৫শে ব্যায়াম-প্রদর্শনী ও শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী কর্তৃক মহাভারত-ব্যাখ্যা।

২৬শে জানুআরি প্রজাতন্ত্র-দিবসে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ সুচিন্তিত ভাষণ দেন ও স্বামী অমলানন্দ সুললিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শতবার্ষিক উৎসবের সঙ্গে বিদ্যার্থী আশ্রমের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের ত্রৈবার্ষিক মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিদ্যার্থী আশ্রম হইতে ৫টি পুস্তক প্রকাশ করা হয় (দ্রষ্টব্য—উদ্বোধন ফাল্গুন সংখ্যা পৃঃ ১১১)।

প্রতি সন্ধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে স্বামীজীর জীবনালেখ্য অবলম্বনে ভাষণ খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

সারগাছি (মুর্শিদাবাদ) **:** স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ-জয়ন্তীর পুণ্য বৎসরে সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে দ্বিতীয় পর্যায়ে গত ২রা ও ৩রা মার্চ বহরমপুরের আশ্রম-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে, ৪ঠা মার্চ কৃষ্ণনাথ কলেজ-হলে, ৫ই মার্চ বেলডাঙ্গার স্কুল-প্রাঙ্গণে, ৬ই মার্চ জঙ্গীপুর কলেজ-প্রাঙ্গণে, ৮ই মার্চ কান্দী রবীন্দ্র-ভবন-প্রাঙ্গণে এবং ৯ই মার্চ অপরাহ্ণে সারগাছিতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে এবং সন্ধ্যায় আশ্রমের ট্রেনিং কলেজ-হলে স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বিস্তৃত ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। বহরমপুরের জনসভায় জেলাশাসক শ্রীদিলীপকুমার গুহ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর রামচন্দ্র পাল, অধ্যাপক রেজাউল করীম এবং শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বামীজীর জীবন আলোচনা করিয়া এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

শতবর্ষজয়ন্তীর তৃতীয় পর্যায়ে বহরমপুরে ২৫শে ও ২৬শে মে দুইদিবসব্যাপী এক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া স্বামীজীর জীবন-দর্শন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন উদ্বোধনের স্বামী নিরাময়ানন্দ ও স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দ এবং ত্রিপুরা জেলার

কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর। দ্বিতীয় দিনের সভাপতি ছিলেন শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল এম. এল. সি. মহোদয়। প্রথম দিবস সভান্তে কীর্তন-রসসাগর শ্রীনন্দকিশোর দাস কীর্তন গান করেন। মধ্য-কলিকাতা স্বামীজী শতবার্ষিকী সমিতির সৌজন্যে স্বামীজী সম্বন্ধে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

এই তৃতীয় পর্যায়ে ২৭শে মে জলাঙ্গী থানার অন্তর্গত সাগরপাড়া গ্রামে এক বিরাট জনসভায় স্বামী সুখদানন্দের নেতৃত্বে ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর, স্বামী মুমুক্ষানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ গুহ সুচিন্তিত ভাষণের মাধ্যমে স্বামীজীর জীবন আলোচনা করেন। দূরবর্তী গ্রামসমূহ হইতে প্রায় দুই হাজার নরনারী সভায় যোগদান করেন।

২৯শে মে দেবগ্রামে, ৩০শে মে সারগাছি আশ্রমের পার্শ্ববর্তী শ্রীপুর ডাঙ্গা গ্রামে, ৩১শে মে ভাবতা গ্রামে এবং ১লা জুন নওদা গ্রামে অনুরূপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বত্র স্বামী সুখদানন্দ, ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর, স্বামী মুমুক্ষানন্দ, অধ্যক্ষ শ্রীগোকুলচন্দ্র দাস, অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ গুহ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন।

৩০শে ও ৩১শে মে এবং ১লা জুন সভার পরে আলোকচিত্রের সাহায্যে ডক্টর ধর স্বামীজীর জীবন-চরিত আলোচনা করেন। ইহা গ্রামবাসীদের খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

ময়মনসিংহ: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২২শে ফেব্রুআরি হইতে ১লা মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হয়।

স্থানীয় বক্তাগণ মহতী সভায় স্বামীজী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 'যুবদিবস' ও 'মহিলাদিবসে' শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর দিব্য জীবন ও ভাবধারা অবলম্বনে বিস্তৃত আলোচনা হয়। আশ্রম-ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থিবৃন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাটক অভিনয় করে।

উৎসবের শেষ দিবসে প্রভাতে শোভাযাত্রা-সহ নগর-পরিক্রমা, মধ্যাহ্নে বিশেষ-পূজা-হোমাদি ও পরে নারায়ণ-সেবা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বালিয়াটি: রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ১৪ই হইতে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব ও শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শোভাযাত্রা, বিশেষ-পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন, নরনারায়ণ-সেবা, সারদামণি বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আবৃত্তি ও পারিতোষিক-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের শেষ দুই দিন দুইটি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়, বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবন ও উপদেশ অবলম্বনে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

কার্যবিবরণী

নিউদিল্লী: রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬১-৬২ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত ধর্মালোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করা হয়। পূর্বপূর্ব বৎসরের ন্যায় জন্মোৎসবগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। স্বামীজীর উৎসবে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে নরনারায়ণ-সেবা হয়।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ১৩,৪৪৯ (নূতন স যোজিত ১,৭৯৯); পঠনার্থে প্রদত্ত সংখ্যা ১৫,০৭৬। পাঠাগারে ১৩টি দৈনিক ও ১২০টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

আশ্রমের চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৩৭,৭১৬ (নূতন ৭,৯৪৭) রোগী প্রধানতঃ হোমিওপ্যাথিক-মতে চিকিৎসা লাভ করে। আশ্রম-পরিচালিত কারোলবাগ যক্ষ্মা-ক্লিনিকে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৩৯,২৩৯ (নূতন ১,৮৩২); অন্তর্বিভাগে ৫০৫ জন রোগী পর্যবেক্ষণ করা হয়।

মহিলা সমিতির উদ্যোগে সারদা-মন্দিরে ৬-১২ বৎসরের বালক-বালিকাদের ভজন, ধ্যান, গল্প, নাটক প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

রেঙ্গুন: রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ব্রহ্মদেশে জাতিধর্মনির্বিশেষে মানব-সাধারণের সেবারত। ১৯৬১ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণীতে প্রকাশ: বর্তমানে অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে বিভিন্ন ওয়ার্ডের মোট শয্যা-সংখ্যা ১৬২। সার্জিক্যাল ও মেডিক্যাল ওয়ার্ড ছাড়া পৃথক্ ক্যান্সার, চক্ষু ও E.N.T. ওয়ার্ড আছে। বহির্বিভাগে প্রতিদিন বহুসংখ্যক রোগী চিকিৎসিত হয়, গড়ে দৈনিক রোগীর সংখ্যা ৬৫০। আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৯১,৫৭৪ (নূতন ৬৯,৮৮৭); সাধারণ অস্ত্র-চিকিৎসা ৫,৯৪৪। অন্তর্বিভাগে ৪,১০৩ রোগী চিকিৎসা লাভ করে, তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ১,২৬০ ও ৪৭১। বিশেষ অস্ত্র-চিকিৎসা ১,৩২১। ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ১১,৪৬৩ নমুনা পরীক্ষা করা হয়। সেবাশ্রমের নার্সিং ট্রেনিং স্কুল হইতে ১৮ জন নার্সিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি): নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টার সময় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বক্তৃতা দেন।

নভেম্বর, '৬২: মানুষের একটি না দুটি আত্মা? আধ্যাত্মিক-জীবন খুব সহজ অথচ খুবই কঠিন; ঈশ্বরকে কিভাবে ভালবাসিতে হইবে, কিরূপে তাঁহার কৃপা লাভ হইবে? অধিচেতন মনের জাগরণ; আত্মার মহা জাগরণ; আমাদের কি স্বাধীন ইচ্ছা আছে? অচিন্তনীয়কে চিন্তা করা, অজ্ঞাতকে জানা; শরীর এবং মন হইতে আত্মার দিকে।

ডিসেম্বর: একাগ্রতা, ধ্যান, আত্মজ্ঞান; কর্মবিধান ও পুনর্জন্ম; মন—ইহার উৎপত্তি ও লয়; যিশুখৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ; ভাব, আদর্শ ও বাস্তবতা; 'অহং' জয় করিবার উপায়; ঈশ্বরাবতারের রহস্য; খৃষ্ট—আচার্য ও মুক্তিদাতা।

জানুআরি, '৬৩: আধ্যাত্মিক সাধনা; পুরাতনের বিদায় এবং নূতনের আবাহন; তোমরাই জগতের আলো; শান্তি নয়, যুদ্ধ! বিবেক ও মন; স্বামী বিবেকানন্দ—ব্যক্তি ও ভবিষ্যদ্বক্তা; মৌনের নিরাময়-শক্তি; জড়, মন ও মানুষ; স্বামীজীর অসমাপ্ত কার্যসূচী।

ফেব্রুআরি: আত্মশক্তি কি? সত্যানুসন্ধিৎসুর শিক্ষা; অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা; যোগ-জীবনের অবলম্বন; মন যখন আত্মা হয়; মায়া কি? ঈশ্বরের মানবতা ও মানবের দেবত্ব; আত্মজয়ী কিভাবে হওয়া যায়?

পুরাতন মন্দিরে প্রতি রবিবার রাত্রি ৮টায় ধ্যান এবং কঠ ও ছান্দোগ্য উপনিষদের ক্লাস করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। নূতন মন্দিরে প্রতিদিন পূজা হয়; বেদীর সম্মুখের হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন।

বক্তৃতা-সফর

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ আহূত হইয়া নিম্নলিখিত স্থানসমূহে শতবার্ষিক উৎসবে স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন (১২ই জানুআরি হইতে ৪ঠা মে পর্যন্ত) :

কলিকাতা : কর্পোরেশন হল, কলেজ স্ট্রীট, মার্কেট ; গ্র্যাণ্ড প্রিন্সেপ হল (রোটারি ক্লাব) ; রামকৃষ্ণ সারদা সংসদ ; টালিগঞ্জ ; চক্রবেড়িয়া হাই স্কুল ; মুরলীধর গার্লস্ কলেজ ; রামকৃষ্ণ ইনস্টিট্যুট অব কালচার ; বেহালা ; দরিদ্রবান্ধব সমিতি ; লেক্ গার্লস্ হাই ইংলিশ স্কুল ; জয়পুরিয়া ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক ; সার গুরুদাস ইনস্টিট্যুট, নারিকেল ডাঙ্গা ; সিমুলিয়া এথলেটিক ক্লাব ; রামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রম ; একাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফিস, ইস্টার্ন রেলওয়ে ; ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি হল ; উইমেনস্ কলেজ, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফুড সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট ; এণ্টালি ইউনিয়ন ক্লাব ; কয়লাঘাট ইস্টার্ন রেলওয়ে অফিস ; দমদম ; সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।

২৪ পরগনা : বসিরহাট ; নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ; গোবরডাঙ্গা ; প্রীতি-নগর ; রানাঘাট ; রহড়া ; শহীদ-নগর ; ঠাকুরপুকুর ; বাঁশদ্রোণী ; নিমপীঠ ; আমিড়া ডায়মণ্ড ক্লাব।

হুগলি রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ ; ভদ্রেশ্বর ; খড়্গপুর ; হাসিমারা (জলপাইগুড়ি) ; অমরকানন, বাঁকুড়া।

শোলাপুর ; বাসবেশ্বর কলেজ, বাগাল-কোট ; ভাস্কোডাগামা হল, পাঞ্জিম ; দামোদর বিদ্যালয়, মারগাঁও, মাপসা ; স্কাউটস্ বিল্ডিংস্, দাদার ; উদয়পুর ; রুড়কী ; কনখল ; গোরখপুর ; বারাণসী ; পুনা ; নাসিক।

বিবিধ সংবাদ

স্বামীজীর শতবার্ষিকী

সিঁথি (কলিকাতা) : রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৬ই হইতে ১৫ই এপ্রিল দশদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব এবং স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী মৃন্ময়মূর্তি ও আলোকচিত্রের সাহায্যে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, প্রায় ৫০,০০০ নরনারী এই প্রদর্শনী দর্শন করে।

বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ‘শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী’, ‘শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামীজী’, ‘যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ’, ‘স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম’, ‘শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শ’, ‘স্বামীজীর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব’ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, নিরাময়ানন্দ, শ্রীবিনয়কুমার সেন, শ্রীহরিপদ ভারতী, স্বামী জীবানন্দ, শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা, ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ভাষণ দেন।

লীলাকীর্তন, নাটকাভিনয়, বিবেকানন্দ-বন্দনা, ভাগবত-কথকতা, পল্লীগীতি, ভজন-সঙ্গীত, ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

বাগনান: গত ১৫ই ও ১৬ই জুন বাগনানে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল হইতে প্রায় মধ্যরাত্র পর্যন্ত ভক্তিমূলক সঙ্গীত, প্রদর্শনী, ধর্মসভা, যোগব্যায়াম-প্রদর্শন, এ. সি. সি. প্যারেড, রামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ' ছায়াচিত্র প্রভৃতি অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রথম দিনের ধর্মসভায় সভাপতি ছিলেন ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য এবং দ্বিতীয় দিনে স্বামী নিরাময়ানন্দ। প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করিয়াও বহু ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগ দিয়া স্বামীজীর প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কামারহাটী: পৌরাঞ্চল সমিতির পরিচালনায় স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৭ই জানুআরি স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের দুই সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী শোভাযাত্রা করিয়া বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেণ্টস্ হোমে সমবেত হয় এবং আয়োজিত সভায় যোগদান করে। বিকালে স্থানীয় ছাত্রমঙ্গল-সমিতি-প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। ছাত্র ও শিক্ষকগণ বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ, আবৃত্তি প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করেন। গত ২০শে জানুআরি বেলুড় মঠ হইতে কাশীপুর পর্যন্ত যে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে এই সমিতি অংশ গ্রহণ করে। বৈকালে সাগর দত্ত বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও নিরাময়ানন্দ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেন।

রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর): স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব কমিটির যুক্ত উদ্যোগে ৮ই হইতে ১৪ই জুন সর্বসাধারণের জন্য স্বামীজীর জীবনী অবলম্বনে একটি চিত্র-প্রদর্শনী আয়োজিত হয়; ১০ই ও ১২ই জুনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, পরশিবানন্দ, গদাধরানন্দ প্রভৃতি। উৎসবে ভজন, কীর্তন, রামায়ণ-গান ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল।

ডিব্রুগড়: শ্রীসারদা সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৯ই হইতে ১১ই জুন স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনের সভায় প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা সুচিন্তিত ভাষণ দেন। মহিলা-সভায় সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীযুক্তা দেববালা ভুইঞাঁ।

গাংড়া সোনাচূড়া (মেদিনীপুর): দেশপ্রাণ পাঠাগারে গত ১১ই জুন স্বামীজার শতবার্ষিকী উপলক্ষে বেদপাঠ, শোভাযাত্রা, পূজাপাঠ, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা, বিবেকানন্দ-লীলাগীতি, 'বাংলার বিবেক' নাটকাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

হাওড়া: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের উদ্যোগে গত ২৩শে ফেব্রুআরি ২১ দিনব্যাপী স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন হয়। ২৪শে ফেব্রুআরি আয়োজিত সভায় সভাপতি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার নানা নূতন তথ্যের সাহায্যে স্বামীজীর সংঘাতময় বলিষ্ঠ জীবন সম্পর্কে ভাষণ দেন। বিভিন্ন দিনের সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ 'স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা', 'জাতীয় শিল্পজাগরণে স্বামীজীর দান', 'স্বামী বিবেকানন্দ ও মানবধর্ম', 'স্বামীজীর পত্রাবলী', 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বুদ্ধদেব', 'বিবেকানন্দ-সাহিত্য' সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: সংস্কৃতে ও বাংলায় 'যম-নচিকেতা-সংবাদ', ছাত্রদের সঙ্গীত আবৃত্তি ও বক্তৃতা, 'শ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'অঙ্কুরে বিবেকানন্দ' অভিনয়, ব্যায়াম-প্রদর্শনী, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, 'যুগাচার্য'-লীলাগীতি।

২রা মার্চ স্বামী নিরাময়ানন্দ পক্ষকালব্যাপী 'বিবেকানন্দ-প্রদর্শনী'র উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীতে পাঁচটি বিভাগ ছিল: বিবেক-মণ্ডপ, আনন্দ-মণ্ডপ, শিল্প-মণ্ডপ, মূর্তি-মণ্ডপ, বিজ্ঞান-মণ্ডপ।

১০ই মার্চ স্বামী ওঙ্কারানন্দ সভাপতির ভাষণে উপনিষদের আত্মবোধের উপর স্থাপিত স্বামীজীর বাণীর মহিমা ঘোষণা করেন।

কুচবিহার: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১৬ই হইতে ২২শে মার্চ পর্যন্ত স্বামীজীর জন্মশত-বার্ষিক উৎসব বিশেষ-পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব কারুকার্য-মণ্ডিত রথারূঢ় প্রতিকৃতি-সহ শোভাযাত্রা, বক্তৃতা, স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী-সমন্বিত চিত্র-প্রদর্শনী, বিবেকানন্দ-লীলাগীতি, মহিলা-সভা, স্থানীয় শিল্পিগণ কর্তৃক যাত্রাভিনয় এবং বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক নাটকাভিনয়, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এই উৎসবে স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, প্রণবাত্মানন্দ এবং অজজানন্দ বক্তৃতা করেন। সাতদিনব্যাপী উৎসবে শহরের সহস্র সহস্র নরনারী আগ্রহ সহকারে যোগদান করেন।

মধ্যমগ্রাম (২৪পরগনা): 'সবুজের আসরে'র উদ্যোগে গত ১২ই মে স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করা হয়। অধ্যাপক দেবজ্যোতি বর্মণ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং স্বামী জীবানন্দ প্রধান অতিথি-রূপে যোগদান করেন। সভার প্রারম্ভে শিশুকণ্ঠে 'ঐ মহামানব আসে' সঙ্গীতটি গীত হয়। বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণের পর স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে সময়োপযোগী সুন্দর আলোচনা হয়। পরে কর্মিবৃন্দ 'বিলে-নরেন' নাটক অভিনয় করেন।

কল্যাচক (মেদিনীপুর): শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির উদ্যোগে ১১ই হইতে ১৩ই এপ্রিল স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব মহিলা বিদ্যাপীঠ, জুনিয়র হাইস্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পূজা-পাঠ, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, বক্তৃতা ও ছায়াচিত্র-প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে স্বামী গোপেশ্বরানন্দ, বিশ্বদেবানন্দ ও চিদ্‌রসানন্দ যোগদান করেন।

চেতলা (কলিকাতা): শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ সমিতির উদ্যোগে গত ১১ই এপ্রিল হইতে পাঁচদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ-পূজা পাঠ, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রথম দিনের ধর্মসভায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিনে 'কথামৃত' পাঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-কীর্তন হয়। তৃতীয় দিনে স্বামী জীবানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। চতুর্থ দিন স্বামী নিরাময়ানন্দ 'যুগসমস্যা ও স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন, অন্য বক্তা ছিলেন শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত। শেষ দিন বিদ্যায়তনের পারিতোষিক-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রে প্রাক্তন ছাত্রগণ 'বিবেকানন্দ' নাটক অভিনয় করে।

ভাঙ্গামোড়া (হুগলি): শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৬ই ও ১৭ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রভাতফেরি, বিশেষ-পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, রচনা-প্রতিযোগিতা, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অমলানন্দ।

লিলুয়া (হাওড়া) ঃ বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন ও প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া ২০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ সভাপতির ভাষণে বলেন: স্বামীজী বর্তমান ভারতের জনক। আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁহার বাণী চির-প্রবহমাণ। পশ্চিমী সভ্যতার মোহে যখন এদেশ আপন ঐতিহ্য ভুলিয়া যাইতেছিল, তখন জাতির অন্তরে তিনিই শক্তি ও সাহস সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ও কর্ম হইতেই স্বাধীনতা-আন্দোলনের দেশনেতারা স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

বিভিন্ন দিনের বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ প্রভৃতি। শিশুদিবসে স্বামী নিরাময়ানন্দ গল্পচ্ছলে বলেন, শিশু নরেন্দ্র তাহার মাতা-পিতার নিকট কিভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছিল।

প্রথম দিন সকালে প্রভাতফেরি, পূজা, হোম, চণ্ডী-গীতা-উপনিষৎ-পাঠ হয়। সমাপ্তি-দিবসে হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টান্ন বিতরিত হয়।

দোমড়া (বর্ধমান) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ কুটিরে গত ১২ই মে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ-পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, বিবেকানন্দ-স্মৃতিবিদ্যালয়ের উদ্বোধন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী মহানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী' সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

বেহালা (কলিকাতা ৩৪) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ১১ই হইতে ১৩ই মে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব পূজা-পাঠ, হোম, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

অমর কানন (বাঁকুড়া) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদলের উদ্যোগে স্থানীয় আশ্রমে গত ২৩শে এপ্রিল স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ-পূজা ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে একটি সুন্দর চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্বামী মহানন্দের পৌরোহিত্যে বৈকালে একটি ধর্মসভার অধিবেশন হয়। প্রধান অতিথি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বর্তমান সময়ে সকলকে স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে বলেন।

খেজুরী (মেদিনীপুর) ঃ গত ৬ই মার্চ স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব বিশেষ আনন্দ সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী গোপেশ্বরানন্দ ও অমলানন্দ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। প্রভাতফেরি, পূজার্চনা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, জনসভা, ভজন, প্রবন্ধ-পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

নাটশাল (মেদিনীপুর) ঃ গত ৯ই হইতে ১১ই মার্চ স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে শোভাযাত্রা, বিশেষ-পূজা, হোম, চণ্ডী গীতা 'কথামৃত' ও বিবেকবাণী পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা, রামায়ণ-গান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিশোকাত্মানন্দ ও মিত্রানন্দ এই উৎসবে যোগদান করেন।

দেউলপাড়া (হুগলি) ঃ বিদ্যানিকেতনে শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গত ১৬ই মে হইতে চারদিন যাবৎ স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল মডেলের ছবির মাধ্যমে স্বামীজীর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর একটি প্রদর্শনী। ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন, কথকতা, আলোকচিত্র-সহযোগে স্বামীজীর জীবনী-আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় স্বামী গদাধরানন্দ, বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

ভবানীপুর (২৪ পরগনা): গত ১৯শে মে হাসানাবাদ থানার অন্তর্গত ভবানীপুর জুবিলি ইনস্টিটিউশনে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত সভায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ স্বামীজীর কবিতা আবৃত্তি ও বাণী পাঠ করে। এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ স্বামীজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। স্বামী যতীন্দ্রানন্দ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী জীবানন্দ শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে স্বামীজীর মহান্ ও বলিষ্ঠ আদর্শ অনুসরণে অনুপ্রাণিত করেন। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী সম্বন্ধে সুন্দর ভজনের ব্যবস্থা ছিল।

আমেদাবাদ: গত ১৭ই মার্চ গুজরাতের রাজ্যপাল শ্রীমেন্দী নওয়াজ জং 'শ্রীবিবেকানন্দ-কেন্দ্র' উদ্বোধন করেন। 'সদ্‌বিচার-সমিতি'র পরিচালনায় স্বামীজীর ভাবধারা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রত্যেক মাসের ১৭ই তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই মে আয়োজিত সভায় মন্ত্রী শ্রীরতুভাই আদানী সভাপতিত্ব করেন। শ্রীঝিনাভাই দেশাই ও সভাপতি মহোদয় স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে সুন্দর আলোচনা করেন।

তেজপুর (আসাম): গত ১৭ই জানুআরি স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে ভাষণ দেন।

হাজিগঞ্জ (কুমিল্লা): গত ১৪ মার্চ স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব বিবিধ অনুষ্ঠান-সূচী-সহায়ে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন।

মুঙ্গের: গত ২রা ও ৩রা এপ্রিল স্থানীয় পাঠচক্রের উদ্যোগে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে উদয়ন-পরিষদে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী বীতশোকানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে বাংলা ও ইংরেজীতে ভাষণ দেন। ডক্টর হরিমোহন শাস্ত্রী তাঁহার হিন্দী ভাষণে আচার্য শঙ্করের সহিত স্বামীজীর তুলনামূলক আলোচনা করেন। সভায় ভজনগানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

চৌধুরীহাট (কুচবিহার): গত ৫ই হইতে ৭ই এপ্রিল স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে তিন-দিনব্যাপী স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

বাবুপুরুয়া (কানপুর): শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ২১শে এপ্রিল প্রভাত-ফেরি, পূজা-পাঠ, ভজন-কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় কান্যকুব্জ কলেজের অধ্যক্ষ পৌরোহিত্য করেন। বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ করিয়া হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজীতে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ছিলেন অন্যতম বক্তা।

রায়পুর (দেরাদুন): বঙ্গভারতীর উদ্যোগে গত ১৭ই জানুআরি স্থানীয় অর্ডন্যাস ক্লাব-গৃহে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ভাব-গম্ভীর পরিবেশে ইংরেজী বাংলা ও হিন্দীতে স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। সঙ্গীত-শিল্পিগণ স্বামীজী সম্বন্ধে গান করেন। কিষেণপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের সন্ন্যাসিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিকানীর: শ্রীরামকৃষ্ণ টরে গত ১৭ই জানুআরি স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ-পূজা, ভজন, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে একটি বিরাট শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করে। স্বামীজীর নির্বাচিত বাণী হিন্দীতে ছাপাইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়

আজমীর: গত ৩রা মাঘ আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজস্থানের রাজ্যপাল ডক্টর সম্পূর্ণানন্দ। আজমীরে পাঁচদিনব্যাপী উৎসবের অনুষ্ঠান হইলে পর আজমীর আশ্রমের উদ্যোগে রাজস্থানের নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে স্বামীজীর শতবর্ষ-জয়ন্তী যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে:

১. গভর্নমেণ্ট দরবার কলেজ, কিষেণগঢ়; ২. পুলিস ট্রেনিং স্কুল, কিষেণগঢ়; ৩. ব্লক উন্নয়ন কেন্দ্র, শিলোড়া; ৪. ভিলওয়াড়া বাজার; ৫. বার্ এসোসিয়েশন, ভিলওয়াড়া; ৬. উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বিগোদ; ৭. উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, মণ্ডলগঢ়; ৮. মণ্ডলগঢ় বাজার; ৯. উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বিজোলিয়া; ১০. উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, মেড়তা সিটি; ১১. মিউনিসিপ্যাল পার্ক, নাগৌর; ১২. কালেক্টরের কাছারী ভবন, নাগৌর; ১৩. উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, নাগৌর; ১৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নাগৌর।

সর্বত্রই স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হয়।

রামনগর (হৃষীকেশ): গত ২৪শে ও ২৫শে জানুআরি বাবা কালী কমলীওয়ালা পঞ্চায়ত ক্ষেত্রের আত্মজিজ্ঞাসা-ভবনে এক মনোজ্ঞ পরিবেশের মধ্যে যথাক্রমে স্বামী সদানন্দ গিরিজী ও স্বামী ভক্তানন্দের সভাপতিত্বে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম দিন হৃষীকেশের বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীগণ স্বামীজীর বাণী আবৃত্তি, স্বলিখিত প্রবন্ধ-পাঠ ও ভাষণ-প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। দ্বিতীয় দিন বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন-বেদ ও বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ছাত্রছাত্রীদিগকে পুরস্কার-বিতরণের পর সভা সমাপ্ত হয় সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

রাষ্ট্রপতি-ভবনে সংস্কৃত-নাট্যাভিনয়

গত ১৬ই এপ্রিল কলিকাতার প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত-নাট্যসঙ্ঘ দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি-ভবনে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী-বিরচিত সংস্কৃত নাটক 'অমর-মীরম্' অভিনয়পূর্বক বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের বিশেষ আনন্দ বর্ধন করিয়াছেন। ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ এই অভিনয়ের প্রশংসা করেন। প্রাচ্যবাণীর পক্ষ হইতে ডক্টর চৌধুরী রাষ্ট্রপতির হস্তে জাতীয় প্রতিরক্ষা-তহবিলের নিমিত্ত এক হাজার টাকা প্রদান করেন।

নববর্ষের প্রথম দিনে নিউদিল্লীর কালী-বাড়িতে প্রাচ্যবাণী যে অভিনয় করেন, তাহাতে পাঁচ হাজারের অধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তৎপূর্বদিবসে কনস্টিটিউশন ক্লাব-হলে যে নাটক অভিনীত হয়, তাহাতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালী প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন এবং সমগ্র অভিনয় দর্শনপূর্বক প্রাচ্যবাণীর নাট্যসঙ্ঘের এবং সংস্কৃতশিক্ষা-সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এবারে নিউদিল্লীতে কনস্টিটিউশন ক্লাব-হলে 'ভারত-বিবেকম্' এবং 'মহাপ্রভু-হরিদাসম্' নামক সংস্কৃত-নাটক-দ্বয়েরও প্রাচ্যবাণী সার্থক রূপায়ণ করেন।

পরলোকে শ্রীনাথ রায়

রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী নিউইয়র্ক কেন্দ্রের স্বামী পবিত্রানন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঢাকা জেলার পীরপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীনাথ রায় গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে ধানবাদে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের বাসায় ৭৭ বয়সে সজ্ঞানে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি বহু জন-হিতকর কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শিক্ষকতা-কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

পরলোকে শচীনন্দন দত্ত

বীরভূম জেলার মুরারই-নিবাসী শচীনন্দন দত্ত গত ২৪শে মে প্রায় ৬২ বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম স্মরণ করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি শ্রীশ্রীমহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং বহুদিন ধরিয়া কথামৃতকার 'শ্রীম'র সঙ্গলাভ করেন। তাঁহার সাধুজনোচিত জীবন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

তাঁহার বিদেহ আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!! ওঁ শান্তিঃ!!!

প্রাথমিক শিক্ষা

সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ষষ্ঠ। ১৯৬১ খৃঃ ভারত সরকারের তথ্য হইতে জানা যায়, সমস্ত রাজ্যে একই ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে না। কয়েকটি কারণের উপর ইহা নির্ভর করে—ঐতিহাসিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক। ৬ হইতে ১১ বৎসরের শিশুদের শিক্ষায় কেরল প্রদেশ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। রাজস্থান প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বনিম্নে—৪২%। পশ্চিমবঙ্গে সমগ্র শিশুসংখ্যার ৬৬% শিক্ষা পাইতেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অভাবের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমগ্র রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে উপযুক্তভাবে অগ্রসর হওয়া যায় নাই।

যাহা সম্বল, তাহা লইয়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি নূতন পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন, যে-সব গ্রামে একেবারেই কোন বিদ্যালয় নাই, সেই সব গ্রামে নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। ১৯৫৯-৬০ খৃঃ শেষে পশ্চিমবঙ্গে ২৫,৯১২ অনুমোদিত বিদ্যালয় ছিল, ১৯৬০-৬১ খৃঃ সরকার নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫২১টি অতিরিক্ত বিদ্যালয়-স্থাপন অনুমোদন করিয়াছেন।

১১—১৪ বৎসরের বালক-বালিকার শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাজ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। নিম্নের তালিকায় শিক্ষামানের শতকরা হার দ্রষ্টব্য :

কেরল	৫০	পশ্চিমবঙ্গ	২১
মাদ্রাজ	৩০	বিহার	১৯
মহারাষ্ট্র	২৯	উত্তর প্রদেশ	১৬
পঞ্জাব	২৮	মধ্য প্রদেশ	১৬
জম্মু ও কাশ্মীর	২৮	অন্ধ্র প্রদেশ	১৬
আসাম	২৭	রাজস্থান	১৫
গুজরাত	২৭	ওড়িষ্যা	৮

পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগের উপাদান-সন্ধান

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ প্রধানতঃ কোন্ কোন্ উপাদান দিয়ে গঠিত, তার সন্ধান বৈজ্ঞানিকেরা বহু দিন থেকেই করছেন। কঠিন মাটি এবং প্রস্তরের স্তর ভেদ ক'রে বহুদূর পর্যন্ত খনন ক'রে তাঁরা এই সন্ধান-কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমেরিকার অন্তর্গত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পুয়ের্তো রিকোর পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে ১,০০০ ফুট গভীর পর্যন্ত খনন করা হয়েছে গত বছর ১৯৬২ খৃঃ শরৎকালে। অন্যান্য জায়গায় এই রকম খনন করবার সময় সাধারণতঃ যে পাথরের স্তর ভেদ করতে হয়ে থাকে, তার নাম বেসাল্ট্। আগ্নেয় পর্বতের নিঃসৃত লাভা থেকে এর উৎপত্তি। এই পাথর অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু পুয়ের্তো রিকোর উপকূলে খনন ক'রে যে পাথরের স্তর পাওয়া গিয়েছে, তার নাম 'সারপেণ্টাইন'। এটা তেমন শক্ত পাথর নয়। অর্থাৎ এই স্তর ভেদ ক'রে পৃথিবীর অভ্যন্তরের কেন্দ্র-অঞ্চলের উপাদান সংগ্রহ করা খুব শক্ত হবে না ব'লে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশান থেকে 'প্রোজেক্ট মোহোল' নামক পরিকল্পনায় পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগের উপাদান-অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় সমুদ্রের তলায় খনন ক'রে পৃথিবীর কেন্দ্র-অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছুবার আয়োজন করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, পুয়ের্তো রিকোয় খনন ক'রে যে সার্পেণ্টাইন পাথর পাওয়া গিয়েছে, সমুদ্রের তলায় খনন করেও সম্ভবতঃ ঐ রকম পাথরই পাওয়া যাবে। —মার্কিন বার্তা

ভ্রম-সংশোধন

আষাঢ় সংখ্যার ২৯৬ পৃঃ ১২ পঙ্‌ক্তিতে '৬ই জুলাই' স্থলে '৬ই জুন পড়িবেন



নারদীয় ভক্তি-সূত্র

[প্রথম অনুবাক্]

ওঁ অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ । ১ ॥

সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা । ২ ॥

অমৃতস্বরূপা চ । ৩ ॥

যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি । ৪ ॥

যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি, ন শোচতি, ন দ্বেষ্টি, ন রমতে, নোৎসাহী ভবতি । ৫ ॥

যজ্‌জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি, আত্মারামো ভবতি । ৬ ॥

[পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

নারদভক্তি-সূত্র

স্বামী বিবেকানন্দ-সঙ্কলিত*

১৮৯৫ খৃঃ শরৎকালে মিঃ স্টার্ডির সহযোগিতায় স্বামীজী কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত।

[নারদীয় ভক্তি-সূত্র দশটি অনুবাকে বিভক্ত, ইহাতে মোট ৮৪টি সূত্র আছে। অনুবাক্ অনুসারে সূত্রসংখ্যা যথাক্রমে—৬, ৮, ১০, ৯, ৯, ৮, ৭, ৯, ৭, ১১। স্বামীজী কয়েকটি সূত্র একসঙ্গে গ্রথিত করিয়াছেন, কয়েকটি বাদ দিয়াছেন। পাঁচটি পরিচ্ছেদে মোট ৬২টি সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে আমরা ইংরেজী অনুবাদে ব্যক্ত ভাব ও তদনুযায়ী পরিচ্ছেদ বিভাগ অনুসরণ করিয়াছি।]

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসার নাম ভক্তি।

২। ইহা প্রেমামৃত।

৩। ইহা লাভ করিলে মানুষ পূর্ণ হয়, অমর হয়, চিরতৃপ্তির অধিকারী হয়।

৪। ইহা লাভ করিলে মানুষ আর কিছুই চায় না এবং দ্বেষ- ও অভিমান-শূন্য হয়।

৫। ইহা জানিয়া মানুষ আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হয়, শান্ত হয়, এবং একমাত্র ভগবদ্‌বিষয়েই আনন্দ পাইয়া থাকে।

৬। কোন বাসনাপূরণের জন্য ইহাকে ব্যবহার করা চলে না, কারণ ইহা সর্ববিধ বাসনার নিবৃত্তি-স্বরূপ।

৭। 'সন্ন্যাস' বলিতে লৌকিক ও শাস্ত্রীয়—এই উভয়বিধ উপাসনারই ত্যাগ বুঝায়।

৮। যাহার সমগ্র সত্তা ঈশ্বরে নিবদ্ধ, সেই-ই ভক্তিপথের সন্ন্যাসী; যাহা কিছু তাহার ভগবদ্‌ভক্তির বিরোধী, তাহাই সে ত্যাগ করে।

৯। অন্য সব আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সে একমাত্র ভগবানের শরণাগত হয়।

১০। জীবন সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিতে হয়।

১১। নতুবা মুক্তির নামে অসদাচরণে বিপদ আছে।

১২। ভক্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে দেহ-রক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন, তদতিরিক্ত সমস্ত লৌকিক আচরণই পরিত্যক্ত হয়।

১৩। ভক্তির অনেক সংজ্ঞা আছে; কিন্তু নারদের মতে ভক্তির চিহ্ন এইগুলি: যখন সকল চিন্তা, সকল বাক্য, সকল কর্ম ভগবানে সমর্পিত হয়, ভগবানকে স্বল্পক্ষণ বিস্মৃত হইলেও যখন অতি গভীর দুঃখের উদয় হয়, বুঝিতে হইবে তখন প্রেম-সঞ্চার শুরু হইয়াছে।

১৪। যেমন, এই প্রেম গোপীদের ছিল।

১৫। কারণ ভগবানকে প্রেমাস্পদরূপে উপাসনা করিলেও তাঁহার ভগবৎস্বরূপ তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হন নাই।

১৬। এরূপ না হইলে তাঁহারা অসতীত্ব-রূপ পাপের ভাগী হইতেন।

১৭। ইহাই ভক্তির সর্বোচ্চ রূপ। কারণ মানুষের সব ভালবাসায় প্রতিদানে কিছু পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিন্তু ইহাতে তাহা নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ (রাজযোগ) অপেক্ষা ভক্তি মহত্তর। কারণ ভক্তিই ভক্তির ফল, উপায় ও উদ্দেশ্য।

২। খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে বা খাদ্যবস্তুর দর্শনে যেমন মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ

* বঙ্গানুবাদ: স্বামী অতন্দ্রানন্দ।

যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবানের প্রতি প্রেমের উদয় হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞান, এমনকি ভগবদ্দর্শন হইলেও মানুষ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না সেইজন্য ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। যাহা হউক, সিদ্ধ ভক্তগণ ভক্তি সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন :

২। যে ভক্তিলাভ করিতে চায়, তাহাকে ইন্দ্রিয়-সুখভোগ, এমনকি মানুষের সঙ্গ পর্যন্ত অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে।

৩। দিবারাত্র সে একমাত্র ভক্তির বিষয় ছাড়া আর অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না।

৪। যেখানে ভগবানের কীর্তন ও আলোচনা হয়, সেখানে তাহার যাওয়া উচিত।

৫। প্রধানতঃ মুক্ত মহাপুরুষের কৃপাতেই ভক্তিলাভ হয়।

৬। মহাপুরুষের সঙ্গলাভ দুর্লভ এবং আত্মার মুক্তিবিধানে তাহা অমোঘ।

৭। ভগবৎকৃপায় এরূপ গুরুলাভ হয়।

৮। ভগবান্ ও ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে কোন ভেদ নাই।

৯। অতএব এরূপ মহাপুরুষদের কৃপালাভের চেষ্টা কর।

১০। অসৎসঙ্গ সর্বদা বর্জনীয়।

১১। কারণ উহা কাম-ক্রোধ বাড়াইয়া দেয়, মায়ায় বদ্ধ করে, উদ্দেশ্যকে ভুলাইয়া দেয়, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা (অধ্যবসায়) নাশ করে এবং সব কিছুই ধ্বংস করিয়া দেয়।

১২। এই বিপত্তিগুলি প্রথমে ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে আসিতে পারে, কিন্তু অসৎসঙ্গ এগুলিকে সমুদ্রাকারে পরিণত করে।

১৩। সকল আসক্তি যে ত্যাগ করিয়াছে, যে মহাপুরুষের সেবা করে, সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া যে একাকী বাস করে, যে গুণাতীত, ভগবানের উপর যে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, সে-ই মায়ার পারে যাইতে পারে।

১৪। যে কর্মফল ত্যাগ করে, যে সর্বকর্ম, সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব, এমনকি শাস্ত্রজ্ঞানও পরিত্যাগ করে, সে-ই নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হয়।

১৫। সে ভবনদী পার হয়, এবং অপরকেও পার হইতে সাহায্য করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। প্রেমের স্বরূপ বর্ণনার অতীত—অনির্বচনীয়।

২। মূক যেমন যাহা আস্বাদন করে, তাহা কথায় প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু তাহার ভাবই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি মানুষ এই প্রেমের কথা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না, তবে তাহার আচরণে উহা প্রকাশ পায়।

৩। বিরল কোন ব্যক্তির জীবনে এই প্রেমের প্রকাশ ঘটে।

৪। সর্বগুণাতীত, সমস্ত বাসনার অতীত, চিরবর্ধমান, চিরবিচ্ছেদহীন, সূক্ষ্মতম অনুভূতি প্রেম।

৫। যখন মানুষ এই প্রেমভক্তি লাভ করে, তখন সে সর্বত্রই এই প্রেমের রূপ দর্শন করে, উহার কথাই শ্রবণ করে, উহাই কীর্তন করে এবং চিন্তা করে।

৬। গুণ ও অবস্থানুসারে এই প্রেম বিভিন্নভাবে নিজেকে বিকশিত করে।

৭। তমঃ (মূঢ়তা, আলস্য), রজঃ (চঞ্চলতা, কর্মপ্রবণতা), সত্ত্ব (শান্তি, পবিত্রতা)—এগুলি গুণ ; আর্ত (দুঃখী), অর্থার্থী (কোন কিছুর অভিলাষী), জিজ্ঞাসু (সত্যানুসন্ধী), জ্ঞানী (জ্ঞাতা)—এগুলি বিভিন্ন অবস্থা।

৮। ইহাদের মধ্যে শেষোক্তগুলি পূর্বোক্তগুলি অপেক্ষা উচ্চতর।

৯। ভক্তিই উপাসনার সহজতম পথ।

১০। ইহা স্বতঃপ্রমাণ, প্রমাণের জন্য অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না।

১১। শান্তি ও পরমানন্দই ইহার প্রকৃতি।

১২। ভক্তি কখনও কাহারও বা কোন কিছুর অনিষ্ট করিতে চায় না, এমন কি প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতিরও নয়।

১৩। ভোগ-বিষয়ক, ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ-বিষয়ক বা নিজের শত্রু-বিষয়ক প্রসঙ্গ কদাপি শুনিতে নাই।

১৪। অহঙ্কার, দম্ভ প্রভৃতি অবশ্যই পরিহার্য।

১৫। এইসব রিপুকে যদি দমন করিতে না পারো, তবে ঈশ্বরের দিকে এগুলির মোড় ফিরাইয়া দাও, সর্ব কর্ম তাঁহাতে সমর্পণ কর।

১৬। প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে এক ভাবিয়া, নিজেকে ভগবানের চিরভৃত্য—চিরবধূ ভাবিয়া ভগবানের সেবা কর,—তাঁহাকে প্রেম-নিবেদন এইভাবেই করিতে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যে প্রেম ভগবানে একাগ্র, তাহাই শ্রেষ্ঠ

২। ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে গেলে তাঁহাদের (এরূপ একনিষ্ঠ প্রেমিকদের) কথা কণ্ঠে রুদ্ধ হয়, তাঁহারা কাঁদিয়া ফেলেন; তীর্থকে তাঁহারাই পবিত্র করেন; তাঁহাদের কর্ম শুভ; তাঁহারা সদ্‌গ্রন্থকে অধিকতর সদ্‌ভাবাপন্ন করিয়া তুলেন; কারণ তাঁহারা ভগবানের সঙ্গে একাত্ম।

৩। কেহ যখন ভগবানকে এতখানি ভালবাসে, তখন তাহার পূর্বপুরুষগণ আনন্দ করেন, দেবগণ নৃত্য করেন, আর পৃথিবী একজন গুরুলাভ করে।

৪। এরূপ প্রেমিকের নিকট বংশ, লিঙ্গ, জ্ঞান, আকার, জন্ম ও সম্পদের কোন ভেদ থাকে না।

৫। কারণ এ-সবই তো ভগবানের।

৬। তর্ক বর্জনীয়।

৭। কারণ ইহার কোন শেষ নাই, কোন সন্তোষজনক ফললাভও ইহাতে হয় না।

৮। প্রেমভক্তি বর্ধিত হয়, এমন গ্রন্থ পাঠ কর এবং এমন কর্ম কর।

৯। সুখ-দুঃখের, লাভ-লোকসানের সকল বাসনা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র ভগবানের পূজা কর। একটি মুহূর্তও বৃথা নষ্ট করিও না।

১০। অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, দয়া ও দেবভাব সর্বদা পোষণ করিবে।

১১। অন্য সব চিন্তা ত্যাগ করিয়া সমস্ত মন দিয়া দিবারাত্র ভগবানের পূজা করা উচিত। এভাবে রাত্রিদিন উপাসনা করিলে ভক্তের নিকট ভগবান্ প্রকাশিত হন, এবং ভক্তকে উপলব্ধির সামর্থ্য দান করেন।

১২। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রেম অপেক্ষা মহত্তর কিছু নাই। জগতের সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভয় পরিহার করিয়া, প্রাচীন মহাপুরুষদের পন্থা অনুসরণ করিয়া আমরা এভাবে এই প্রেমভক্তির কথা প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি।

'কলিতে নারদীয়া ভক্তি—'

—শ্রীরামকৃষ্ণ

অবশ*

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নয় যে কিছুই আমার হাতে—কে পায় সে যা চায় ?
সাধব শ্যামে প্রেমে সখী, কেমন ক'রে হায় ?
নই যোগিনী, বৈরাগিনী, তাপসী কি জ্ঞানী,
ভজন পূজন জানি না তো—নই গুণী কি জ্ঞানী।
আমি প্রেমের পাগলিনী—বিকিয়েছি তাঁর পায় ॥
নয়ন আমার নয় বশ উদাস ক'রল তারে বঁধু,
শূন্য ভুবন সে বিনা—বয় তৃষাই সে আজ শুধু,
পথ চেয়ে রয় তার—দিন রাত বিফল ব'য়ে যায় ॥

প্রাণও আমার নয় বশ—সে-ই ক'রল অধিকার,
গাই মুখে নাম শ্যামের, কানে শুনি নূপুর তার,
জীবন ধরি মিলন তরে—প্রাণ সঁপেছি তায় ॥
প্রেমও আমার নয় বশে—এ-ব্যথা ব্যথাই জানে,
পায় না নাগাল যুক্তি—দিশা মেলে না তার জ্ঞানে,
(প্রেম বশে নয় আমার—শিখা অপরূপ যে তার,
যে ঠেকে সেই জানে—প্রেমের লীলা মনের পার)
প্রেমের হাতের পুতুল মীরা—খেলায় শ্যামরায় ॥

* ইন্দিরাদেবীর মীরা-ভজনের অনুবাদ।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

ত্রিপুরা রাজ্যে বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে গত ১২ই জুন সেবাকার্য আরম্ভ করা হয় এবং ১১ই জুলাই বন্ধ করা হয়। এই সেবাকার্যে মোট ২,৮২৪ ধুতি, ১,৮৫০ শাড়ি, ১,২৯৫ পাছড়া, ৩ গজী টুকরা ১,৩০০ মার্কিন (প্রধানতঃ আদিবাসীদের জন্য), ১,৪৪৪ ছোটদের পোশাক, ৫০ খানি কম্বল, ২,৪৫২ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ এবং উপযুক্ত পরিমাণে ঔষধপত্রাদি বিলোনিয়া মহকুমা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে (পাকিস্তান সীমান্তে) ৩২টি গ্রামে ৪,৪৭৮ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৫,০০০৲ টাকা।

* * * *

শিলং রামকৃষ্ণ মিশন হইতে গত জুলাই মাসে আসাম নওগাঁ জেলায় বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে ৬টি গ্রামের ১৩৫টি পরিবারকে ২৪ মণ ১৩ সের চাল এবং ৬ মণ ২॥ সের ডাল বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৩৩টি গ্রামের ৮৫২টি পরিবারকে বীজধান ক্রয় করিবার জন্য মোট ৭,৩৪৮ টাকা সাহায্য করা হইয়াছে।

'শুদ্ধা ভক্তি দাও'

'মা, আমি ধর্ম চাই না, অধর্ম চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।

আমি জ্ঞান চাই না, অজ্ঞান চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

—প্রার্থনাটি 'মন্ত্রতন্ত্রহীন' 'সাধন-শোধনহীন' মাতৃদর্শনব্যাকুল শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল ভাষায় আধ্যাত্মিক জীবনের চরম আকূতি!

এতটুকু ধর্মলাভের জন্য—এতটুকু জ্ঞান-লাভের জন্য সাধক কত চেষ্টা করে। কিন্তু এ কি প্রার্থনা?—আমি ধর্ম চাই না, জ্ঞান চাই না—আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও! আর কি এই শুদ্ধা ভক্তি, যাহার কাছে ধর্ম অধর্ম সমপর্যায়ে পড়িয়া যায়?—জ্ঞান অজ্ঞান সমতুল্য? ধর্ম বলিতেই বা এখানে কি বুঝাইতেছে? জ্ঞান শব্দেরই বা এখানে অর্থ কি?

শব্দের একাধিক অর্থ অবশ্য অভিধানে যথেষ্টই আছে—এত অর্থ আছে যে, শব্দারণ্যে মানুষ পথহারা হইয়া যায়, অর্থ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকেই আমরা ইহার অর্থ বুঝিতে পারি। স্বামীজীর ভক্তিযোগের ভাষণগুলিও আমাদের এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে।

প্রথমেই চোখে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিগত বিদ্যা অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন 'শুনেছি কত'; অর্থাৎ শ্রুতিগত বিদ্যা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, 'যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি'—অর্থাৎ শিক্ষার শেষ নাই। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মানুষকে শিখিতে হইবে। কি শিখিতে হইবে? শিক্ষাকে আমরা 'জ্ঞানলাভ' বলি। 'জ্ঞান' কি? শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'এক জ্ঞান জ্ঞান, অনেক জ্ঞান অজ্ঞান!' তবে শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে বলিতেছেন 'জ্ঞান চাই না, অজ্ঞান চাই না'—সে জ্ঞান কি ঐ একের জ্ঞান, অদ্বৈত জ্ঞান? কখনই নয়। সে জ্ঞান পুঁথিগত বিদ্যা, শাস্ত্রজ্ঞান, সে জ্ঞান নানা জ্ঞান, সে জ্ঞান অজ্ঞানেরই সমপর্যায়ে।

'জ্ঞান চাই না, ভক্তি দাও'—সাধক অনেক সময় এ-কথার অর্থ বুঝিয়া থাকেন—তবে বোধ হয় জ্ঞান নিম্নস্তরের, ভক্তি উচ্চস্তরের। তাই যদি হয়, তবে তো আগে জ্ঞানই চাই, পরে ভক্তি; নিম্নতর সোপান অধিগত করিয়া উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে হইবে।

কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যই তাই?—জ্ঞান ভক্তির মধ্যে উঁচুনীচু, ছোটবড় আছে কি? শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলেন নাই—শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক জিনিস? পরজ্ঞান ও পরাভক্তি একই পদার্থ? এই দৃষ্টি লইয়াই আমাদের ব্যাপারটা বুঝিতে হইবে। নতুবা কোন দিন ইহার অর্থ পরিস্ফুট হইবে না।

এক শ্রেণীর ভক্তির সাধক 'শুদ্ধা ভক্তি' বলিতে বুঝাইতে চান—'জ্ঞান-শূন্যা ভক্তি', তাঁহাদের মতে জ্ঞানই ভক্তিকে অশুদ্ধ করে—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি 'ভেজাল বস্তু'! যদি মিশ্রিত হইলেই ভেজাল হয়, তাহা হইলে তো খেচরান্ন, পরমান্ন—সবই মিশ্রিত পদার্থ, অতএব বর্জনীয়! পরিমাণ-মতো মিশাইতে পারাই তো সুখাদ্য প্রস্তুত করার রহস্য

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা বলিতে পারি 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি'ই সাধকের পক্ষে নির্ভরযোগ্য পন্থা। জ্ঞান-শূন্যা ভক্তি সাধককে আবেগপ্রবণ করিয়া ফেলে—জীবনের তাল সামলাইয়া চলা তাঁহার পক্ষে কঠিন হয়; তিনি একঘেয়ে একপেশে হইয়া পড়েন।

এই প্রসঙ্গে 'ভক্তি-মিশ্র জ্ঞান'-এর কথাও আসিয়া পড়ে! জ্ঞানের সাধক যতই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলুন—এবং 'নিস্তুতির্নির্নমস্কারঃ' আবৃত্তি করুন—গুরু-উপাসনা তাঁহাকে করিতেই হইবে! গুরুভক্তি বাদ দিয়া কি কেহ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন? গুরুভক্তি ঈশ্বর-ভক্তির মূল। শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব ইঙ্গিত: শেষে গুরু ইষ্টে লয় হন। এ ঐ—অর্থাৎ গুরুই ইষ্ট।

জ্ঞান ও ভক্তির কি সুন্দর সমন্বয়!—এ যে গঙ্গার জ্ঞানধারার সহিত যমুনার ভক্তিধারার প্রয়াগ-সঙ্গম! এই দ্বিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিতে শিখিলে তবেই সাধক ত্রিবেণী-সঙ্গমের ক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারেন। তৃতীয় ধারাটি যে অদৃশ্য—অলক্ষ্য!

জ্ঞান ভক্তিকে অশুদ্ধ করে না, 'শুদ্ধা ভক্তি' বলিতে 'জ্ঞান-শূন্যা ভক্তি' বুঝায় না। ভক্তিকে অশুদ্ধ করে কামনা বাসনা, অতএব 'শুদ্ধা ভক্তি' বলিতে বুঝায় নিষ্কাম ভক্তি, অর্থাৎ সর্বপ্রকার কামনা-বাসনা-শূন্য ভক্তি। নিষ্কাম ভক্তের প্রার্থনা 'আমাকে ইহা দাও, উহা দাও' নয়, 'আমাকে নির্বাসনা কর, আমাকে তোমার করিয়া লও'। 'সর্বপ্রকার কামনা-বাসনা-শূন্য' —কথাটির অর্থ বুঝিতে গেলেই আমরা ধরিতে পারিব শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রার্থনার মর্মকথা— 'আমি ধর্ম চাই না, অধর্ম চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

সংসারের মানুষ ধর্ম কর্ম করে কেন? —ভক্তি লাভের জন্য? ভগবান্ লাভের জন্য? —না সুখভোগের জন্য, স্বর্গভোগের জন্য! এখানে ধর্ম অর্থে পুণ্যকর্ম; গীতায় বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কর্তব্য কর্মকে ধর্ম বলা হইয়াছে। জীবনের এক স্তরে এই কর্তব্যই ধর্ম, কিন্তু গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, শেষ পর্যন্ত এই ধর্মও ত্যাগ কর—আমার শরণাগত হও। এই শরণাগতিই শুদ্ধাভক্তি!

এই শরণাগত-ভাব না আসা পর্যন্ত মানুষকে কর্তব্য-ধর্ম পালন করিতেই হইবে! শরণাগত-ভাব যে আসিয়াছে—তার প্রমাণ কি, তার লক্ষণ কি? অতি সুন্দর একটি উপমা দিয়া তুলসীদাসজী শরণাগতি বুঝাইয়াছেন: 'উলট জলে মছলী চলে বহি যায় গজরাজ!' মাছ জলে শরণ গ্রহণ করিয়াছে—জলই মাছের আশ্রয়—প্রবল স্রোতে সে এদিক ওদিক যায় —স্রোতের বিপরীতেও সে যাইতে পারে— সে যে জলের শরণাগত! কিন্তু গজরাজ—সে জলে পড়িয়া স্রোতের সহিত সংগ্রাম করিতেছে —সে শরণাগত নয়—তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে ভাসিয়া যায়।

বাসনা-কামনা-শূন্য হইলেই সাধক ঠিক ঠিক শরণাগত হয়। এই সংসার-স্রোতে সে বৃথা সংগ্রাম করে না। ভগবদিচ্ছার স্রোতে সে ভাসিয়া যায়—সে জানে ঈশ্বরই আমার পরমাশ্রয়। তিনিই আমার জীবন, আমার মরণ, আমার মনের মন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। শুদ্ধাভক্তি এইভাবে চরমে পরমজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। তখন আর সাধক বহু দেখে না, দুইও দেখে না, তখন সব সমরস—একমেব অদ্বিতীয়ম্।

বিবেকানন্দ

শ্রীজগদিন্দ্র বসু

সর্বদর্শী হে মহাপুরুষ অবধূত নিষ্কাম
সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ প্রণাম, লহ প্রণাম।
বেদ-বেদান্ত উপনিষদের তুমি নব ব্যাখ্যাতা,
প্রেরণার তুমি নবীন উৎস, অভয়মন্ত্রদাতা।
ধর্মসভাকে জয় ক'রে এলে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বীর ;
নয়নে জ্ঞানের অঞ্জন-রেখা টেনে দিলে পৃথিবীর।
সারা বিশ্বকে সগোত্র আর সুমিত্র ভেবে তুমি,
গেরুয়াবসন-ভূষণে রাঙালে মন ও মর্ত্যভূমি।

ধর্ম, কর্ম, জ্ঞানের পূজারী ধ্যান-নিমগ্ন শিব,
জীবের সেবায় সত্যদ্রষ্টা ছিলে সদা উদ্‌গ্রীব।
জন-কল্যাণে নিবেদিত তুমি, বলেছ সবার দ্বারে -
শ্রীভগবানের পূজার জন্য জন্মিবে বারে বারে।
ভক্তির পথে পরম মুক্তি বুঝায়েছ বারে বার
দুর্বলতাকে জয় ক'রে গেছে তোমার পুরুষকার।
মানবপ্রেমের মূর্ত প্রতীক নির্ভীক সন্তান,
প্রতিভা-দীপ্ত নয়ন-দ্যুতিতে বহুরে করেছ ত্রাণ।

নব রূপকার! শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সৃষ্টি তব—
ধর্ম, কর্ম, বিদ্যা, ভক্তি, জ্ঞানে, গুণে অভিনব।
কর্মের এক মহা স্বাক্ষর রেখেছ বেলুড় মঠে,
প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য তব ছবি আঁকা স্মৃতিপটে।
কাম-কাঞ্চন-বিজয়ী পুরুষ অমোঘ দণ্ডধর,
ঘরের ঠিকানা জানিতে না তুমি —ছিল তব উঁচু ঘর।
ধৈর্য, নিষ্ঠা, ত্যাগের প্রতীক—তুমি মহা বিস্ময়
পূর্ণ করিতে এসেছিলে তুমি, চূর্ণ করিতে নয়।

ভারতের চির শাশ্বত বাণী ব্যক্ত করেছ নিজে,
পরমাত্মাকে জানিতে বুঝিতে আঁখি তব গেছে ভিজে।
চেতনার আলো বিকীর্ণ ক'রে প্লাবিত করেছ মন
কাটায়েছ যত বাধা, বিপত্তি, মোহ, মায়া, বন্ধন।
স্বদেশ-প্রেমের অমৃত মন্ত্র দিয়েছ সবার কানে,
যুগধর্মকে পরিব্রাজক প্রচারিছ প্রাণে প্রাণে।
যুগবরেণ্য, স্মরণধন্য, কৃপাকটাক্ষ দাও
প্রাণের ভক্তি, পুষ্প, অর্ঘ্য, করপুট ভরে নাও।

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা

(পূর্বানুবৃত্তি—১৮শ শতাব্দী)

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

৬

অষ্টাদশ শতাব্দীর গাঢ় তমিস্রা ভেদ ক'রে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে যে নূতন সূর্যোদয় হ'ল, তার আলো ইওরোপীয় এক বণিক্-সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য থেকে ধার করা। ভারতেতিহাসে এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ ধারণাই আমাদের বদ্ধমূল হয়েছে যে, এই কলঙ্কিত শতাব্দীতে ভারত হারালো তার স্বাধীনতা, বিদেশী ইংরেজের কুক্ষিগত হ'ল আমাদের দেশ, বণিকের পোশাক পরিবর্তন ক'রে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অঙ্গে ধারণ করলে রাজবেশ, তার মানদণ্ড পরিণত হ'ল রাজদণ্ডে।

কিন্তু তার আগে 'ভারত'ই হারিয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে। রাজনৈতিক উত্থান-পতনকে উপেক্ষা ক'রে যে ভারত তার বিশিষ্ট সত্তা নিয়ে সহস্র সহস্র বৎসর ধরে ইতিহাসের বন্ধুর পথে চলে এসেছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তা শুধু রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের সহস্র গ্লানির আবর্জনার মধ্যে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এত বড় বিপর্যয় ভারতে আর কোন দিন বুঝি আসেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত সত্যই এক ভৌগোলিক সংজ্ঞা-মাত্র, সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্বাধীন ও প্রায়-স্বাধীন রাষ্ট্রের সমষ্টি হয়ে দাঁড়ালো, নগ্নস্বার্থ-সাধনে সদাই যারা পরস্পর-বিবদমান। ১৭৩৯ খৃঃ পারস্যের সম্রাট্ নাদির শাহ্ খেয়াল-খুশিমত দিল্লী লুণ্ঠন ক'রে গেলেন। মুঘল সম্রাট্ মহম্মদ শাহ্ তার অসহায় দর্শকমাত্র। লুণ্ঠিত বিধ্বস্ত লাল কেল্লার দেওয়ানি-খাসে বসে খেয়াল-ঠুংরির উচ্চ তানলয়ের ধ্বনিতে নাদির শাহের প্রলয়ঙ্কর বিষাণের বিকট প্রতিধ্বনিকে তিনি বুঝি আড়াল করবার প্রয়াস করলেন। —মুহম্মদ শাহের সঙ্গীতপ্রীতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

তারপর স্বামীজীর কথায় বলি। 'শত্রু ও মিত্র, মুঘল শক্তি ও তাহার ধ্বংসকারীরা এবং তৎকাল পর্যন্ত শান্তিপ্রিয় ফরাসী ইংরেজ প্রমুখ বিদেশী বণিক্‌দল এক ব্যাপক হানাহানিতে লিপ্ত হইয়াছিল। প্রায় অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল যুদ্ধ, লুণ্ঠন ও ধ্বংস ছাড়া দেশে আর কিছুই ছিল না। পরে সে তাণ্ডবের ধূম্রধূলি যখন অপসারিত হইল, তখন দেখা গেল সকলের উপর জয়লাভ করিয়া সদম্ভ পাদক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ইংরেজ-শক্তি।' (ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ)

বিভিন্ন স্তর উত্তীর্ণ হয়ে কেমন ক'রে বৃটিশ বণিক্-সংস্থা এদেশে প্রভু হয়ে ব'সল, সে কাহিনী এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়। তদুপরি এ কাহিনী অল্পবিস্তর সকলেরই জানা আছে। এ কাহিনীর স্বরূপটিই শুধু আমাদের আলোচ্য। কিন্তু তাও আবার বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিভিন্ন মতবাদের জটিলতায় আচ্ছন্ন। স্বামীজী-প্রদত্ত মূলসূত্রটির আলোয় এর জটিল স্বরূপকে বা প্রকৃতিকে খানিকটা সহজ ও স্বচ্ছ ক'রে তোলা যেতে পারে। সহজ ক'রে বলা যেতে পারে যে, ভারত তার ধর্মকে ডুবিয়ে দিয়েছিল সঙ্কীর্ণতার অন্ধকূপে,

ব্যভিচারের কলুষে এবং কুসংস্কারের আবর্জনায়। এবং ধর্মকে হারিয়েই ভারত নিজেকে হারিয়ে ফেললো।

পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কোডাগামার আবিষ্কৃত (১৪৯৮ খৃঃ) পূর্ব-পশ্চিমের সমুদ্রপথ বেয়ে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকের দল একে একে এর পূর্বেই ভারত-উপকূলে আগমন করেছে। ওরা—বিশেষ ক'রে ইংরেজ এসেছিল পরাক্রান্ত মুঘল সম্রাটের করুণার ভিখারী হয়ে, কুঠি নির্মাণ ক'রে বাণিজ্য ক'রে কিছু অর্থ সংগ্রহ করবে স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমিতে—এই ছিল ওদের প্রার্থনা। ইতিহাসের অমোঘ নিয়তির বিধানে ওই কুঠি ক্রমে পরিণত হ'ল দুর্গে, দুর্গকে ঘিরে গড়ে উঠল শহর, শহরকে কেন্দ্র ক'রে জেলা এবং জেলাগুলি নিয়ে প্রদেশ। শেষ পর্যন্ত বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে যারা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতজোড়া সাম্রাজ্য স্থাপন করলে, তারাই ইংরেজ। এবং বীরত্বে ততটা নয়, যতটা কর্মকৌশলে ইংরেজ জয়ী হ'ল। ইংরেজ-শাসন-প্রতিষ্ঠার কাহিনীতে বহু অনাচার কলঙ্ক এবং অমানুষিকতা আছে। ধর্মহীন ব্যভিচারগ্রস্ত অধঃপতিত ভারতের বিভিন্ন নবাব, বাদশাহ ও রাজন্যবর্গ তখন আত্মহত্যার পৈশাচিক উৎসবে মেতে রয়েছেন। ওই ধূর্ত শ্বেতকায় বণিকের দল এই চরম দুর্গতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলে। বিভিন্ন রাজপুরুষদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে তাদের বিলুপ্তি সাধন করালে। ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধের ফলে যে সাম্রাজ্যের সূত্রপাত, তার পরিণতি ১৮১৮ খৃঃ লর্ড হেস্টিংসের আমলে, রণজিৎ সিংহের পঞ্জাব ছাড়া সমগ্র ভারত হ'ল ইংরেজের অধীনে।

১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধ যুদ্ধই নয়, এক ছেলেখেলা মাত্র। ইংরেজ পক্ষে হয়েছিল মাত্র তেইশ জনের মৃত্যু, আহতের সংখ্যা উনপঞ্চাশ এবং নবাব সিরাজের বিপুল বাহিনীর পাঁচশো জন মৃত ও সমসংখ্যক ব্যক্তি আহত। অথচ ফলাফলের দিক দিয়ে এর চেয়ে যুগান্তকারী ঘটনা পৃথিবীতে কম ঘটেছে। অতীতের ইতিহাসে যার কোন নজির মেলে না, তেমনই ঘটনা ক্লাইভ কর্তৃক এই বঙ্গবিজয়।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর নব-প্রকাশিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে (ইংরেজীতে) প্রথম পরিচ্ছেদে ভারতের পতন-কাহিনীর এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। তখন মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে গেছে, ভারতের নানা অঞ্চলে সুযোগসন্ধানী রাজপুরুষ বা রাজকর্মচারিগণ স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলছেন। এ বিষয়ে তাঁদের প্রধান অবলম্বন ভাড়াটে সৈন্যদল। যুদ্ধক্ষেত্রে নেই কোন বীরত্ব, নেই কোন মহৎ আত্মবিসর্জন, আছে শুধু টাকার খেলা আর কূটকৌশল, যার সঙ্গে মিশ্রিত অবিশ্বাস্য লোভ আর কৃতঘ্নতা। এইভাবে গড়ে উঠল বাংলায় আলিবর্দি খানের নবাবী, অযোধ্যায় সুজাউদ্দৌলার, দক্ষিণে হায়দারাবাদে আসফজার নিজামী, আর কর্ণাটকে আনোয়ারউদ্দীনের নবাবী। পরবর্তীকালে মহীশূরের ভাগ্যবিধাতা হলেন সামান্য সৈনিক হায়দার আলি। এর মধ্যে অবশ্য অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই, যুগে যুগে এমনটিই ঘটেছে। বরং এদের মধ্যে সার্থক-নামা পুরুষও আছেন, যেমন আলিবর্দি এবং হায়দার আলি। অস্বাভাবিক ব্যাপার এই যে, ভারতের তৎকালীন রাজনীতি ও সমরনীতির নিয়ামক কোন ব্যক্তি বা জাতি নয়, ভাড়া

করা সৈনিকের দল। আনুগত্য বা প্রভুভক্তি এবং সেই কারণে আত্মবিসর্জন—অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ ছিল ব্যতিক্রম। সুতরাং অজস্র অর্থব্যয়ে বহুসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য ভাড়া ক'রে, পশ্চিমের উন্নততর অস্ত্রে তাদের সজ্জিত ক'রে এবং ইওরোপের রণ-নৈপুণ্যের নেতৃত্ব দান ক'রে যখন ইংরেজ তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করলে, তখন জয় হ'ল তার অবশ্যম্ভাবী। এ বুদ্ধি প্রথম ফরাসী গভর্নর ড্যুপ্লের মাথায় খেলেছিল। কিন্তু ইংরেজদের কতগুলি বিশেষ সুবিধে থাকায় ইংরেজ-ফরাসী সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত জয়ী হ'ল ইংরেজ। এবং বঙ্গবিজয়ের দৌলতে যে অপরিমেয় সম্পদ ইংরেজের হাতে এসেছিল, তার ফলেই ইংরেজ এত সুবিধে লাভ করেছিল। ক্লাইভের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব এ-বিষয়ে অপরিসীম। ওই যুগের কলুষিত পরিবেশে যোগ্যতম নায়ক নীতিহীন সর্ব-কুকর্মে সিদ্ধহস্ত ধুরন্ধর ক্লাইভ।

সুতরাং ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ জয় করেছে ভারতীয় ভাড়াটে সৈন্যেরা, ইংরেজ সেনাপতি কলকাঠি নেড়েছে মাত্র। ধর্মহীন ভারতের কলুষ ও ব্যভিচার বনাম ইংরেজের বাণিজ্য ও শোষণ-জনিত সমৃদ্ধি ও কুটকৌশল—এই অসম-দ্বন্দ্বে দ্বিতীয় পক্ষ জয়যুক্ত হ'ল। সীলি (Seely) সাহেব তাঁর 'Expansion of England' নামক গ্রন্থে লিখেছেন: 'India can hardly be said to have been conquered at all by foreigners. She has rather conquered herself.' অর্থাৎ এ-কথা বলা মোটেই সমীচীন হবে না যে, কোন বিদেশী ভারতকে জয় করেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারত নিজেই নিজেকে পরাজিত করেছে।

এ মন্তব্য আরও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। জাতি বলতে আমরা যা বুঝেছি এবং আজও যা বুঝি, তার কোন অস্তিত্ব বা চেতনা অষ্টাদশ শতাব্দীতে একেবারেই ছিল না। স্বামীজী ভারতীয় জাতির যে সংজ্ঞা দান করেছেন (প্রথম পর্ব—উদ্বোধন, চৈত্র ১৩৬৯) এবং যে সংজ্ঞানুসারে মধ্যযুগের ভারতেও অপূর্ব জাতীয়তার স্ফুরণ ও সার্থকতা আমরা লক্ষ্য করেছি (দ্বিতীয় পর্ব—উদ্বোধন জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৭০), সে জাতির বা জাতীয়তা-বাদের তখন পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটেছে। পুরাতন আদর্শ লুপ্ত, নূতন কিছু গড়ে উঠবার পথে আবহাওয়া প্রতিকূল, আধ্যাত্মিক কোন জাগরণ বা পুর্ণজাগরণ ঘটাবার মতো কোন ধর্মগুরু এলেন না ওই যুগে (পঞ্জাবের গুরু-গোবিন্দ সিংহ ছাড়া)। এক-কথায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মাশ্রয়ী সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং তার অনুগামী জাতীয় অভ্যুত্থান ঘ'টল না। তখনকার ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একদিকে স্বার্থমগ্ন ভারতীয় আত্মকেন্দ্রিকতা ও শক্তির অপচয়, অপর দিকে ইওরোপীয় অর্থ-গৃধ্নুতা, অসামান্য কুটকৌশল এবং জড়-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর যোগ্যতা পরস্পর তাল-ঠোকাঠুকি করছে। বিভিন্ন পক্ষ নিয়ে—তা ভারতীয়ই হোক বা বিদেশীয়ই হোক—বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করছে বা যুদ্ধের অভিনয় করছে ওই ভাড়াটে সৈন্যদল। উপঢৌকন আর উৎকোচ আর লালসার পঙ্কিল পরিবেশ সর্বত্র এই ভারতে। ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেবের ভাষায় 'ওই লোভজর্জর যুগে' মানুষের ব্যবহার এমন ছিল যে জীবিত অবস্থায় সম্মান এবং মৃত অবস্থায় পরিতাপের যোগ্য কেউ ছিল না, তা সে শ্বেতকায় ইংরেজই হোক বা কৃষ্ণকায় ভারতীয়ই হোক।

সুতরাং তখন কোথায় বা দেশ, কোথায় বা বিদেশ। একটা সামগ্রিক আত্মবিলুপ্তির

গভীরে ভারত তখন নিমগ্ন। ডঃ মজুমদারের পূর্বোক্ত গ্রন্থে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ আছে। মহাশক্তিধর মারাঠা পেশোয়া বালাজি বাজিরাও কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানির গভর্ণর ড্রেক সাহেবের নিকট একটি লিপি প্রেরণ করেছিলেন বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে মারাঠার মৈত্রী কামনা ক'রে। মহীশূরের হায়দার আলিকে দমন করতে ইংরেজ পক্ষে মারাঠার সক্রিয় সহযোগিতা তো ইতিহাসের একটি সর্বজনবিদিত ঘটনা। তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি মারাঠারই যখন এই মনোবৃত্তি ও রাজনীতি, তখন অন্য নবাব বা রাজাদের কথা আর না তোলাই ভাল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, ধর্ম সংস্কৃতি ও দেশপ্রেম তখন ভারতের সমাজ ও রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়েছে।

আর সাধারণ মানুষ—শহরে পল্লীতে যারা সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে? আচার্য যদুনাথ সরকার-সম্পাদিত বাংলার ইতিহাস ২য় খণ্ডে (ইংরেজীতে) উল্লেখ আছে যে, বাংলাদেশের মন্দিরে মন্দিরে হিন্দুরা (বিশেষ ক'রে যারা বিত্তশালী) পূজো দিত—দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর ভারতে মারাঠাশক্তি-দমনে ইংরেজ প্রয়াসের সার্থকতা কামনা ক'রে। একদা ভোঁসলা রাজার মারাঠা বর্গীর সৈন্য ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে দস্যুর বেশে বাংলায় এসেছিল। আলিবর্দি খান তখন নবাব। পৈশাচিক লুণ্ঠন ও অমানুষিক হত্যার দ্বারা তারা এদেশে চরম বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। বাংলার ছড়ায় সে নিষ্ঠুর কাহিনী অমর হয়ে রয়েছে। অসহায় বাঙালী এভাবেই বুঝি কিছুকাল পরে তার প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করেছিল, ইংরেজের 'ল অ্যাণ্ড অর্ডারের' ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে।

বাংলার কথা আরও বলি ডঃ মজুমদার বলেছেন, মোটামুটি-ভাবে এ ভারতেরই কথা। টোল ও চতুষ্পাঠীতে এবং মক্তব ও মাদ্রাসাতে গতানুগতিক-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান ছেলেদের। পাশাপাশি এ-দুটি সম্প্রদায় রয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, কথায় কথায় ঝগড়া বা পরবর্তীকালের কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় না বটে, কিন্তু সামাজিক ও নৈতিক জীবনে পরস্পর পরস্পর থেকে বহুদূরে। সংস্কৃত ও পারসীক ও আরবি ভাষার মাধ্যমে শুধু অতীতকেই পরিবেষণ করা হচ্ছে। উচ্চস্তরের হিন্দুরা পারসী অবশ্য শিখে নেয়, বৈষয়িক কাজকর্মে সুবিধে হবে ব'লে! যে শিক্ষা তখন চলেছে, জীবনের সঙ্গে তার যোগসূত্র গেছে হারিয়ে। পৃথিবী গণ্ডিবদ্ধ, সমাজ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, জাতি উপজাতিতে কণ্টকাকীর্ণ। বাইরের জগতে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে, পশ্চিমের অগ্রগতির যে কর্মময় কাহিনী বিদেশী বণিকেরা এদেশের বুকে রচনা ক'রে চলেছে, সে-সম্বন্ধে সমাজ উদাসীন। বণিকদের কীর্তি ও কুকীর্তি দেখছে, তার ফল ও কুফল ভোগ করছে, তবু কারও কোন কৌতূহল নেই, কোন প্রয়াস নেই ওদের জানবার বা জানাবার! স্ত্রীলোকের স্থান বদ্ধগৃহে। বাইরে যদি ওরা বেরোয়, যদি লেখাপড়া করে, তবেই ওরা বিয়ের পর বিধবা হবে—এই দৃঢ়বিশ্বাস। বাংলা ভাষা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে পয়ার-লাচারি ছন্দে রচিত কবিতার মাধ্যমে। কবির লড়াই, খিস্তিখেউড়, হাফ-আখড়াই প্রভৃতিতে

অমার্জিত রুচির উৎকট প্রকাশ। অবশ্য এ-যুগে ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদও এসেছিলেন, কিন্তু ও-যুগে তাঁদের যোগ্য মূল্যায়ন সম্ভব ছিল না; ওঁরা ব্যতিক্রম। ওঁদের প্রভাব তৎকালীন সমাজে অকিঞ্চিৎকর। অপরদিকে গদ্য-রচনার মাধ্যম শুধু মুদিখানার খাতা এবং চিঠিপত্র। গদ্যসাহিত্যে এই যে বর্তমান বাংলার সমৃদ্ধি ও পৃথিবীজোড়া খ্যাতি, তার অঙ্কুরোদ্গমও তখন হয়নি।

ধর্মজীবনকে পৌত্তলিকতা গ্রাস করেছে। আচার-অনুষ্ঠান সংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ডে তা আবদ্ধ। জাতিভেদের পশ্চাতে হিংসা ঘৃণা নিষ্ঠুরতা, জাত তখন 'বজ্জাতি'। অস্পৃশ্যতা সমাজের দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। স্বামীজীর ভাষায়, ধর্ম তখন ঢুকেছে হেঁসেলের হাঁড়িতে। ধর্মের নামে মৃতস্বামীর চিতায় স্ত্রীহত্যা করা হয় অবলীলাক্রমে পৈশাচিক তাণ্ডবের পরিবেশে। সতীর নাকি এই শ্রেষ্ঠ গতি। সমাজের উচ্চস্তরে কুলীন ব্রাহ্মণ বালিকা থেকে প্রৌঢ়া পর্যন্ত বহু নারীর পাণিগ্রহণ ক'রে তাদের স্বর্গে যাবার পথ সুগম করে। চড়কপূজায় যে মানুষটিকে বঁড়শিতে গেঁথে দড়ি বেঁধে সংখ্যাতীত বার চরকিতে ঘোরানো হয়, সে মহাপুণ্যবান্, ওভাবে মৃত্যু হ'লে তার অক্ষয় স্বর্গবাস। দুর্গাপূজায় পূজা গৌণ, আড়ম্বর ও আভিজাত্য মুখ্য। কী ব্যভিচার আর কী অমানুষিক নিষ্ঠুরতা তার সঙ্গে জড়িত! মানুষের স্বাভাবিক জীবনের সৌন্দর্য তখন গভীর ক্লেদে নিমজ্জিত, মানবতাবোধ অবলুপ্ত। ধর্ম ধর্মহীনতায় পর্যবসিত।

মুসলমান সমাজের দুর্গতিও কম নয়। একদা ক্ষাত্রবীর্যে আভিজাত্য এবং অন্যান্য রাজকীয় গুণাবলীতে ওই সমাজ বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। যোগ্যতার দাবিতে সাধারণ নিম্নস্তরের মুসলমানও একদা রাজদরবারে উচ্চ আসন লাভ করেছে। কিন্তু প্রধানতঃ নিম্ন-বর্ণের হিন্দুকে পাইকারি হারে ইসলামের পতাকাতলে গ্রহণ করার ফলে এদেশে মুসলমান সমাজের রূপান্তর হ'তে লাগলো। এদেশের জনসমষ্টির প্রভাবে সৃষ্টি হ'ল শ্রেণী। অসাম্যের ভিত্তিতে শক্তি অপচিত হ'ল ব্যভিচারে। কিন্তু অভিমানটুকু রয়ে গেল যে তারা রাজার জাতি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এদেশের মালিক। ইংরেজকে তাই ভারতের ইসলাম ব্যর্থ আক্রোশে বহুকাল দূরে সরিয়ে রেখেছে। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় জুড়ে যে ওয়াহাবি আন্দোলন পেশোয়ার থেকে বাংলা পর্যন্ত ইংরেজ শাসনকে বিব্রত করেছিল, তার প্রাণশক্তি জুগিয়েছে ইসলামের এই অভিমান, গৌরবলুপ্তির তীব্রক্ষোভ এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি। এই গোঁড়ামির দৃষ্টিতে ইংরেজ—হিন্দু ও শিখ ইসলামের পরম শত্রুরূপে পরিগণিত। ওয়াহাবি আন্দোলন ভারতের মুক্তি-আন্দোলন নয়, দার-উল্-ইসলাম প্রতিষ্ঠার নিষ্ফল প্রয়াসমাত্র।

বাংলার কিন্তু অফুরন্ত সম্পদ্, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অপরিমেয় সমৃদ্ধি ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। রাজধানীতে বা শহরাঞ্চলে সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের ভোগ-বিলাসেও এদেশের সম্পদের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়নি। গ্রামাঞ্চলে বা বনে-জঙ্গলে ভূগর্ভে সাধারণ মানুষেরও কম সোনা-রূপা প্রোথিত ছিল না। অরাজক দেশে দস্যুর ভয়ে এভাবে অর্থ লুকিয়ে রাখা হ'ত। বাংলার এই অপরিমেয় সম্পদ শুধু দস্যুদের নয়, অর্থগৃধ্নু বিদেশী বণিক্‌দেরও বহু প্রলোভন জুগিয়েছে। পলাশীর যুদ্ধের পর স্বর্ণ লুণ্ঠন

করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ক্লাইভ। বিলেতে তাঁর বিচার হ'ল। তিনি নিজের দোষ-স্খালনের জন্য বললেন যে, নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদের রাজপথে যখন তিনি বিজয়ীর গর্বে পরিক্রমা করেছিলেন, দু-পাশ থেকে তখন অফুরন্ত স্বর্ণভাণ্ডার তাঁকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছিল, তবু তিনি লোভে দিগ্‌বিদিক্ হারাননি। নিজের সংযম দেখে তিনি নিজেই অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন।

ধর্মহীন ব্যাধিগ্রস্ত বাংলার সমাজ, আদর্শ-চ্যুত দুর্বল বাংলার রাজশক্তি, অথচ ধনসম্পদের অন্ত নেই বাংলার। সুতরাং দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ রাখা দরকার যে, বাংলার সম্পদ্‌রাশি লাভ করেই বৃটিশ বণিক্-সংস্থার ভারত জয়ের পথ এত সুগম হয়েছিল। কী ব্যবসায় ক্ষেত্রে, কী রাজনীতি ক্ষেত্রে, কী রণক্ষেত্রে—ইংরেজের সকল কাজ-কারবার চলেছে এদেশেরই অর্থ বিনিয়োগ ক'রে। এদেশের মানুষকে এদেশের অর্থ দিয়ে ক্রয় করেছে প্রয়োজন অনুসারে। স্বদেশ থেকে ওরা এক পয়সাও আনেনি, রণক্ষেত্রে ওদের হয়ে যুদ্ধ করেছে এদেশেরই লোক। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে, ইংরেজের সৈন্যদলে প্রতি আট জনের মধ্যে একজন মাত্র ইংরেজ। তারপর ইংরেজের 'ল অ্যাণ্ড অর্ডারে' আশ্রয় পেয়ে বা আশ্রয়ের আশ্বাস পেয়ে এবং নিরাপত্তার আশায় বিশৃঙ্খল ও অরাজক ওই যুগে এদেশের লোকেরা ইংরেজের সাম্রাজ্য-বাদকে সক্রিয় সহযোগিতা দান ক'রে সংহত ক'রে তুলেছে। ইংরেজের শাসন যতই শোষণ-ভিত্তিক হোক না কেন, ব্যক্তিগত জীবনের ও সম্পত্তির পবিত্রতা-বোধ পশ্চিমের ওই জাতির মধ্যে ছিল। যে মানবতা-বোধ এদেশ থেকে তখন লুপ্ত, তার মর্যাদা ইংরেজ তার ভারত-শাসনে 'ল অ্যাণ্ড অর্ডারের' কাঠামোতে সন্নিবদ্ধ করেছিল। ব্যাপকভাবে এ সহযোগিতার ক্ষেত্রে হিন্দুই এগিয়ে এল। তার কারণ একাধিক, কিন্তু সে-কথা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক।

সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতি নেই, ধর্ম নেই, দেশও নেই। তাই তো এই অবিশ্বাস্য কিন্তু অমোঘ পরিণতি ভারতেতিহাসের। এ পটভূমিকায় কে বা দেশপ্রেমিক, কেই বা বিশ্বাসঘাতক। সিরাজ বাংলার স্বাধীনতা-রক্ষাকল্পে শেষ মহান্ বলি, আর মীরজাফর-রাজবল্লভ-উমিচাঁদের দল দেশদ্রোহী, বিশ্বাস-ঘাতক—ইতিহাসের সূক্ষ্ম বিচারে এ ধারণা একেবারে অমূলক না হলেও অবান্তর। অষ্টাদশ শতাব্দীর নারকীয় পরিবেশে যে যার নগ্নস্বার্থ-সাধনে উদ্‌গ্রীব। অবশ্য এ-কথা সত্য যে 'ক্লাইভের ভারবাহী জাব' মীরজাফরের চেয়ে হতভাগ্য সিরাজ অনেক বরণীয়। উত্তরকালে সিরাজকে কেন্দ্র ক'রে এদেশের কাব্য, নাটক—এমনকি ইতিহাস-সাহিত্যেও যে ভাবাদর্শের, যে দেশপ্রেমের জোয়ার এসেছিল, এবং রাষ্ট্রিক চেতনায় যে রসদ জুগিয়েছিল, সিরাজের ভাব-ঘনমূর্তি তার ঐতিহাসিকত্ব যত অল্পই থাক না কেন, তার মূল্য অপরদিক দিয়ে অনস্বীকার্য।

কিন্তু সিরাজের চেয়েও বড় চরিত্র মীরকাশিম, যদিও বাংলার সিংহাসন-প্রাপ্তি তাঁর ইংরেজ অনুগ্রহে এবং ইংরেজকে উৎকোচ দানের বিনিময়ে। মীরকাশিম আশ্চর্য বিচক্ষণতায় বুঝেছিলেন যে, ইংরেজ এ-দেশের পরম শত্রু, তার সঙ্গে সংঘর্ষ তাঁর অবশ্যম্ভাবী এবং নিজের সৈন্যকে ইওরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত না করলে এ সংঘর্ষে তাঁর পরাজয়ও হবে অবশ্যম্ভাবী। মুর্শিদাবাদ থেকে

মুঙ্গেরে সরে গিয়ে নবনির্মিত দুর্গের আড়ালে থেকে তিনি প্রস্তুতি-পর্বে মুন্সিয়ানাই দেখিয়েছিলেন। শুধু বাংলার নয়, সমগ্র উত্তর ভারতের জাতীয় কণ্টক ইংরেজ, একে উৎপাটিত করার প্রয়োজনে তিনি মুঘল সম্রাট্ শাহ আলম এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউ-দ্দৌলাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য মীরকাশিমের, দুর্ভাগ্য ভারতের যে এ সাধ ও সাধ্যের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল। ১৭৬৪ খৃঃ বক্সারের রণক্ষেত্রে মীরকাশিমের সকল আশার সমাধি হ'ল, পলাশীর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত বক্সারে হ'ল দৃঢ়ীভূত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর এক স্মরণীয় চরিত্র মহীশূরের হায়দার আলি। ইংরেজ ঐতিহাসিক তাঁর চরিত্র স্বাভাবিক কারণেই মসীলিপ্ত করেছে, কিন্তু ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে হায়দার ওই ফেরুপালের বিচরণক্ষেত্রে সিংহ-সদৃশ। কিন্তু যে ভারত তখন সামগ্রিক-ভাবে ঘোর তামসিকতায় আচ্ছন্ন, গভীর অমানিশার আঁধারে আবৃত, সাধ্য কি শুধু মীরকাশিমের মতো একজন বিচক্ষণ রাজপুরুষের কিংবা হায়দারের মতো একজন রণনিপুণ কূটকুশলী নায়কের যে তাকে টেনে তুলবে। শুধু রাজকীয় বা সামরিক যোগ্যতায় শাশ্বত ভারতের ইতিহাস রচিত হয়নি—স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিতে এ-কথাটাই পরিপুষ্ট হয়েছে। আধ্যাত্মিক জাগরণের সোনার কাঠিটি হাতে নিয়ে কেউ এলেন না ওই যুগে, শাশ্বত ভারতকে কেউ তুলে ধরলেন না আদর্শরূপে। এমনকি ভারত যে পরাধীন হয়েছে, সে বোধও জনগণের মানস থেকে তখন অবলুপ্ত

অবশ্য ইংরেজ-শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদে বিশেষ ক'রে কৃষিপ্রধান এই দেশের রাজস্ব-আদায়ের জুলুমের প্রতিক্রিয়ারূপে কিংবা ইংরেজ-দত্ত কোন বিশেষ বিধানের প্রতিকার-কল্পে অথবা গোঁড়া ধর্মান্ধতার উন্মাদনায় খণ্ডখণ্ডভাবে ভারতে তখন নানা বিদ্রোহ জেগেছে। ডক্টর শশিভূষণ চৌধুরী তাঁর দুটি গ্রন্থে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন (Civil Disturbances during the British Rule in India (1765-1857) এবং Civil Rebellions during the Mutiny)। বাংলা ও ছোটনাগপুরের চুয়াড়-বিদ্রোহ, উড়িষ্যার পাইক-বিদ্রোহ, উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী ও পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ, দক্ষিণ ভারতে পলিগারদের আন্দোলন এবং সর্বোপরি উত্তর ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এদের কোনটাই মুক্তি-আন্দোলন নয়, ইংরেজের বিশেষ কোন কার্যের বিরুদ্ধে ব্যর্থ আক্রোশের অভিব্যক্তি-মাত্র। কখন কখন চরম দুঃখবরণ, নির্ভীক আত্মত্যাগ এবং অমানুষিক দার্ঢ্য জনগণের এই বিদ্রোহসমূহকে নিঃসন্দেহে মর্যাদা দান করেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এগুলি উত্তরকালের ভারতীয় জনগণের জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ মানসলোকে কোন বার্তাই পৌঁছে দিতে পারেনি। পরবর্তী স্বাধীনতা-আন্দো-লনের ইতিহাসের প্রারম্ভিকা রয়েছে অন্যত্র। সে কাহিনী পরে আলোচ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের মারাঠা ও পঞ্জাবের শিখদের কাহিনী স্বামীজীর দেওয়া মূলসূত্রটির পরিপ্রেক্ষিতে এবার আলোচিত হবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেশ্বরের 'অমৃতানুভব'

[তৃতীয় প্রকরণ—বাণীর ঋণ-পরিশোধ]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

এই (পরাদি চার[১]) বাণীর গর্জনে আত্মার নিদ্রা (তদ্‌বিষয়ক অজ্ঞান) টুটিয়া যায়, তথাপি পূর্ণভাবে ঋণশোধ হয় না, কারণ এই জাগরণ নিদ্রারই তুল্য। ১

পরাদি চার বাণী জীবের (অবিদ্যার বন্ধন হইতে) মোক্ষ-সাধনের উপযোগী হয়, পরন্তু অবিদ্যার সহিত নিজের স্বরূপের নাশ করিয়াই মোক্ষের উপযোগী হয়। ২

দেহের সহিত হস্ত-পদাদি চলিয়া যায়, মনের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাম (লয়প্রাপ্ত হয়), সূর্যের সহিত যেমন তাহার কিরণজাল যায়। ৩

অথবা নিদ্রার শেষ হইলে স্বপ্নও সঙ্গে সঙ্গে যায়, তেমনি অবিদ্যার নাশ হইলে পরাদি বাণীরও নাশ হয়। ৪

লোহ নষ্ট হইলে রসরূপে (লোহভস্মরূপে) জীবিত থাকে, ইন্ধন জ্বলিয়া গেলে বহ্নিরূপ প্রাপ্ত হয়। ৫

লবণ স্থূলরূপে জলে গলিয়া যায়, পরন্তু স্বাদরূপে জলেই থাকিয়া যায়, নিদ্রার অন্ত হইলে জাগৃতি-রূপে নিদ্রাই জীবন্ত থাকে। ৬

তেমনি অবিদ্যার সহিত এই চার বাণী স্থূলরূপে নষ্ট হয়, পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানরূপে উৎপন্ন হয়। ৭

এই চার বাণী মরিয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপে দীপ জ্বালায়, পরন্তু বোধরূপে—ইহা পণ্ডশ্রম মাত্র। ৮

নিদ্রা আসিলে স্বপ্ন-প্রাপ্তি করায়, টুটিয়া গেলে পুরুষের আপন স্বরূপ দেখায়—স্বপ্ন ও জাগৃতি এই দুই দশাই যেমন নিদ্রা দেখায়। ৯

এইভাবে জীবন্ত অবিদ্যা ('আমি মনুষ্য' এইরূপ) অন্যথা জ্ঞান প্রাপ্ত করায়, এই অবিদ্যার নাশ হইলে ('আমি ব্রহ্মস্বরূপ' এই) যথার্থ বোধ উৎপন্ন হয়। ১০

পরন্তু জীবন্ত বা মৃত অবিদ্যা বন্ধন-কারক হয়, বন্ধন ও মোক্ষপ্রাপ্ত করাইয়া বন্ধন করে। ১১

মোক্ষও যদি বন্ধন হয়, তবে 'মোক্ষ' শব্দের অর্থ কি? অজ্ঞানের ঘরে (মোক্ষের) মিথ্যা প্রতিষ্ঠা। ১২

ভূতের মৃত্যুতে বালকদেরই সন্তোষ হয়, অন্য কাহারও হয় না, তার মৃত্যুকে কে মানিবে? ১৩

ঘটের নাস্তিত্ব (ঘট হইবার পূর্বাবস্থা) ভাঙিলে অত্যন্ত লোকসান হইল (অর্থাৎ ঘট তৈয়ারী হইলে মৃত্তিকাতত্ত্ব নষ্ট হইল) বলিয়া যে মানে, তাহাকে কি জ্ঞানী বলা যায়? ১৪

সুতরাং বন্ধনই যখন মিথ্যা, তখন কিসের মোক্ষ হইবে? অবিদ্যা মরিয়াই মোক্ষের স্বরূপ দেখাইল। ১৫

আর 'জ্ঞানই বন্ধন' এইরূপ 'শিবসূত্রের' মধ্যে স্বয়ং সদাশিবই স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। ১৬

আর বৈকুণ্ঠের সুবিজ্ঞও (স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু) 'জীব সত্ত্বগুণ দ্বারা জ্ঞানের পাশে বদ্ধ হয়'—ইহাও বহুভাবে বলিয়াছেন। ১৭

পরন্তু শিব অথবা শ্রীবল্লভ বিষ্ণু বলিয়াছেন বলিয়াই যে আমি মানিতেছি তাহা নহে, তাহারা না বলিলেও ইহাই আমার অনুভব। ১৮

শুদ্ধ আত্মজ্ঞান যদি জ্ঞানের বল ধরে (বৃত্তিজ্ঞানের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে),

১ পরা, পশ্যন্তী, বাক্, বৈখরী।

তবে সূর্যও অন্যের সাহায্যে সবল হইয়া উদয় হয়, ইহাই বা কেন হইবে না ? ১৯

আত্মজ্ঞান যদি অন্য জ্ঞানের দ্বারা শ্লাঘ্য হয়, তবে জ্ঞাতৃত্বই (মূল জ্ঞানই) ব্যর্থ হইয়া যায়, দিবা যদি অন্য দীপের অপেক্ষা করে, তবে তো আপন স্বরূপই ভুলিয়া যায়। ২০

আপনার স্বরূপ আপনার কাছেই থাকে, ইহা না জানিয়া কি দেশ-বিদেশে আপনাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে ? এমন ভ্রম কি হয় ? ২১

পরন্তু অনেক দিন পরে, যখন তাহার আত্মস্বরূপের স্মরণ হয়, তখন যদি বলে 'আমি এখানেই আছি' (ইহাই আমার আত্মস্বরূপ) ইহাতে কি তাহার আনন্দ হয় ? ২২

তেমনি নিত্য জ্ঞানরূপ আত্মা যখন সত্ত্ব-গুণাশ্রয়ী জ্ঞানের প্রভায় আপনাকে 'সোঽহং' বলিয়া জানিতে পারে, তখন ঐ জ্ঞানই ভ্রম হইয়া বন্ধন হয়। ২৩

জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ হয় ঠিকই, পরন্তু জ্ঞান আত্মস্বরূপে বিলীন হইলেই মোক্ষ হয়; এই ভাবে জ্ঞানকে জ্ঞানাজ্ঞানাতীত আত্মস্বরূপে নিমজ্জিত হইতে হয়; সুতরাং তাহার কোন মহত্ত্ব নাই। ২৪

এইজন্য পরাদি চার বাণী যাহা স্থূলাদি চার দেহের অলংকার,—তাহারা অবিদ্যামূলক জীবের জীবত্ব নষ্ট করে। ২৫

চার দেহরূপ ইন্ধন 'উদাস' (বিরক্ত) হইয়া জ্ঞানাগ্নিতে প্রবেশ করে এবং সেখানে (জ্বলিয়া) বোধরূপ ভস্মলেশে পরিণত হয়। ২৬

জলের মধ্যে ফেলিলে কর্পূর জল হইতে ভিন্ন স্থূলরূপে আর দৃষ্ট হয় না, পরন্তু গন্ধরূপে যেমন ঐখানেই থাকে। ২৭

অঙ্গে বিভূতি মাখিলে তাহার স্থূল পরমাণু-গুলি ঝরিয়া পড়ে, পরন্তু তাহার পাণ্ডুর (শ্বেত) কান্তি যেমন থাকিয়া যায়। ২৮

অথবা জমির উপর জল বহিয়া গেলে যেমন স্থূলরূপে আর দৃষ্ট হয় না, তথাপি আর্দ্রতারূপে সেখানেই থাকে। ২৯

অথবা মধ্যাহ্নকালে যেমন আপনার ছায়া পৃথক্‌ভাবে দেখা যায় না, পরন্তু পায়ের তলায়ই ঢুকিয়া থাকে। ৩০

তেমনি আত্মরূপের জ্ঞান, যাহা দ্বৈতভাব গ্রাস করিয়া (পরমাত্ম) স্বরূপেই স্বরূপাকারে অবশিষ্ট থাকে। ৩১

এই পরাদি বাণীর ঋণ-শেষ-রূপ জ্ঞান পরাদি বাণী মরিলেও থাকিয়া যায়, আমি সেই ঋণ শ্রীগুরুদেবের পায়ে পড়িয়া শোধ করিলাম। ৩২

এই জন্যই অজ্ঞানী জীবকে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও ভারতী (বৈখরী) এই চার বাণীর ঋণ হইতে মুক্ত হইতে হয়,—শুধু তাহাই নহে, সামান্য অপরোক্ষ জ্ঞানকেও বাণীর ঋণ হইতে মুক্ত হইতে হয়। ৩৩

'অমৃতানুভবে'র দুইটি 'ওবি'

না তরী মধ্যাহ্নকালীं
ছায়া দিসে বেগলী।
অসে পায়াতলীं।
　　রিগোনিয়া॥ ৩০

তৈসেँ গ্রাসূনি দুসরে
স্বরূপী স্বরূপাকারেँ।
আপুলে পণেँ উরে।
　　বোধু জো কাঁ॥ ৩১

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও মধ্যযুগীয় প্রাণ-চেতনা

শ্রীনিধুগোপাল পাল

কোন দেশের ইতিহাসের ধারাবৈচিত্র্যের পর্যালোচনা করিলে এই সত্যটি সহজেই উদ্‌ঘাটিত হয় যে, মানুষের সমাজ-জীবনে যখন সংকীর্ণ বুদ্ধিবাদের প্রাবল্য ঘটে, প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার উচ্ছল রস-প্রবাহ যখন রুদ্ধগতি হইয়া পড়ে, তখনই জাতীয় ভিত্তিমূলে চরম বৈপ্লবিক আঘাত অনিবার্য হইয়া উঠে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রাক্কালে বাংলাদেশকেও অনুরূপ বৈপ্লবিক আঘাতের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তদানীন্তন বাংলার সামগ্রিক মানব-জীবন-ধর্ম এরূপ বৈচিত্র্যহীন ও সমৃদ্ধিবিবর্জিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, নূতনের আস্বাদন-স্পৃহায় পরোক্ষভাবে মানুষ তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র জাতির এই চিত্ত-ব্যাকুলতার ফলশ্রুতিস্বরূপে সমাজের বহু-আচরিত ন্যায়-নীতি-ধর্ম-সংস্কৃতির উপর পড়িল রাজনীতির করাল ছায়া! সুলতানী শাসনের বিজাতীয় আবহাওয়া দেশের সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ভাব-পরিমণ্ডলকে করিয়া তুলিল বিষাক্ত! দেশের মধ্যে মুসলিম শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এক শ্রেণীর মানুষ তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ভয়গ্রস্তচিত্তে তাহারা ভাবিতে লাগিল যে, সুলতানী শাসন যখন দেশে কায়েম হইয়া উঠিয়াছে, তখন ভাবগত তথা ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই। তাহারা আরও ভাবিল যে, রাজসরকারের অনুগ্রহপুষ্ট দেশীয় রাজকর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা অতিমাত্রায় বিলাসপ্রবণ, তাঁহারা অত্যধিক স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবেন, এবং তাঁহাদের সেই স্বেচ্ছাচারের করুণ পরিণতি-স্বরূপে দেশের সনাতন ধর্মজীবনে ঘটিবে অভাবনীয় পরিবর্তন।

সাধারণ মানুষের মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইতেছিল, বাস্তবক্ষেত্রেও তাহা প্রকট হইয়া উঠিল। বাংলাদেশের অভিজাত সম্প্রদায় সুলতানের অনুগ্রহপুষ্ট হইতে গিয়া স্বাভাবিক-ভাবেই নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিলেন, এবং আপনাদের বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সাধারণ প্রজাবর্গের উপর নানারূপ দুর্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা ধর্মীয় বোধস্খলিত হইয়া ভোগবিলাসের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়া রহিলেন। অপরপক্ষে দেশের সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মধ্যেও নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে লাগিল। তাহাদের অনেকে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার মানসে কোন রক্ষণশীল স্থানে গিয়া আশ্রয় লইল; অনেকে আবার সুখেস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া প্রায় বাধ্য হইয়া মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিল। এই সকল কারণে মানুষের সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। যথার্থ মৌলিক ধর্ম বলিতে আর কিছুই রহিল না। 'ধর্ম কেবলমাত্র বাহ্য আচরণ ও অনুষ্ঠানের ভিতর' সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। মধ্যযুগীয় মানুষের এই কলঙ্কময় সামাজিক জীবন-চিত্রের নিখুঁত বর্ণনা আমরা বৈষ্ণব সাধক বৃন্দাবন দাস-কৃত 'চৈতন্য-ভাগবত' হইতে পাই :

ধর্ম কর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর-গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে॥
সকল সংসারমত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥

বাংলার এই চরম যুগসংকটের প্রকট প্রতিফলন তৎকালীন নগর-রাজধানী নবদ্বীপের আধুনিকপন্থী মানুষের মনেই ঘটিয়াছে সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ায় নবদ্বীপে তখন সত্যকার ধর্মপ্রাণ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরও অসদ্ভাব ছিল না। তাই দেশে ধর্মের গ্লানি যতই প্রবল হইতে লাগিল, তাঁহাদের ক্রন্দন-বিমথিত অন্তরের ভক্তিবন্যাধারার আবেগ-উচ্ছ্বাস আরও শত-গুণ বাড়িয়া গেল। পবিত্র হরিনাম-সংকীর্তনে আর সঙ্কটত্রাতা মঙ্গলময় জগদীশ্বরের আবাহন-গীতিতে মুখরিত হইয়া উঠিল তাঁহাদের ভক্তিপূত চিত্তের সুপ্রশস্ত অঙ্গন!

একদিকে উন্মার্গগামী জীবনের বিকৃত বিলাস, অপরদিকে ভক্তিধর্ম-সংস্থাপনের নীরব প্রয়াস, এই মহাযুগ-সন্ধিক্ষণে নবদ্বীপের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন এক গৌরবর্ণোজ্জ্বলতনু জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ,—তিনিই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য।

প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের শুভ আবির্ভাবে বাংলাদেশে এক নবযুগের সূচনা হইল,—সে-যুগ বাঙালীর আত্মপ্রত্যয়ের, আত্ম-বিশ্লেষণের, আত্মোপলব্ধির সুবর্ণময় যুগ। বাঙালীর এই মানস-সংস্কৃতির মূল উৎস মহাপ্রভুর দিব্য জীবন ও অমৃত-বাণী। মানবতার মূর্ত প্রতীক শ্রীচৈতন্য বাংলার স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ,—সকলকেই পরমানন্দে নিজ-আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া লইলেন। এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাহাদিগকে দান করিলেন এক নূতন ভাব-দৃষ্টি। তিনি বলিলেন, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়া এই যে মানুষের বিচিত্র জীবন-লীলা সংঘটিত হইতেছে প্রতিনিয়ত, নানাবিধ চিত্ত-দৌর্বল্যের ঘন কুয়াশার সেই লীলাময় জীবন সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। তাই জীবনকে সকল দুর্বলতার ঊর্ধ্বে স্থাপন করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জপযজ্ঞের অতন্দ্র সাধনা। শ্রীশ্রীহরিনাম-সংকীর্তনের মধ্যেই সেই জপমন্ত্রের বীজ নিহিত। সুতরাং বর্ণগত সকল ভেদবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া হরিনামের ছত্রচ্ছায়াতলে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকেই একত্র মিলিত হইতে হইবে; উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করিতে হইবে নাম-মাহাত্ম্য।

মহাপ্রভুর জীবন ও বাণীর অমৃত-স্পর্শে বাংলার তথাকথিত বিকৃত সমাজ-জীবন সার্থক সুন্দর হইয়া উঠিল। এক নবীন প্রাণ-চেতনার সুতীব্র আলোকোদ্ভাসে বাঙালীর সংকীর্ণ সমাচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অচিরেই ব্যষ্টি-প্রীতির মোহ-আবরণ সরিয়া গেল। আবার নূতন করিয়া তাহারা সমষ্টিগত প্রেম-বৈচিত্র্যের যথার্থ মূল্যায়ন উপলব্ধি করিতে শিখিল। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে অপরিসীম অজ্ঞতা তাহাদের নিকট প্রকৃত মানবধর্মে দীক্ষিত হইবার চরম বাধা-স্বরূপ ছিল, লোকশিক্ষাগুরু শ্রীচৈতন্যের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অতি অনায়াসেই তাহারা সেই বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল। মহাপ্রভুর প্রচারিত 'সর্বজীবে অহেতুক প্রেম,

কামগন্ধহীন তথা আত্মরতি-বিযুক্ত তদাত্ম-প্রেম-সাধনার মাধ্যমে সর্বজীবের ঐক্যবিধান এবং সর্বোপরি মানব-মহিমার সর্ব-নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা'—এই সার্থক ধর্মীয় উপলব্ধির ত্রিবেণী-সঙ্গমে বাঙালীর প্রাণ-প্রবাহিণী রসোদ্বেল হইয়া উঠিল! 'মিলনের মহামন্ত্রে' দীক্ষিত হইয়া সমগ্র বাঙালী জাতি তাই বিস্তৃত জীবন-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার প্রয়াস পাইল। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা তথা ধর্মগত সংস্কারের বিকৃত-বন্ধন-জালে এককালে যে-সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবন ছিল সবিশেষ জর্জরিত, সর্বাত্মক জাতীয় চৈতন্যের শুভ উদ্বোধনে সেই সমাজই অবশেষে পতিত অবহেলিত জন-জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থলরূপে পরিগণিত হইল। এইরূপে বাংলার বহুধা-বিচ্ছিন্ন সামাজিক মিলন-চর্যা সার্থক পরিণতি লাভ করিল। বাঙালীর আপাত-প্রতীয়মান এই মিলন-চর্যা সমাজগত হইলেও ইহা বাঙালীর সার্বিক মিলন-সাধনার একক প্রতিশব্দ; যথার্থ মনুষ্যধর্মের প্রতিফলন-আধার।

পরমপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গের বিচিত্র জীবন-মহিমায় সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য পূর্ণায়ত রস-সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রাক্-চৈতন্যযুগে বাংলা সাহিত্যে কোনরূপ নূতনত্বের রসাভাস ছিল না। 'সাহিত্য' বলিতে তখন শুধুমাত্র মঙ্গলকাব্য অথবা অনুবাদকাব্যই বুঝাইত। 'এই দুই শ্রেণীর কাব্যরচনা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে যে কবিপ্রতিভার পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, এ ধারণা সে-যুগের কবিদের মধ্যে জাগে নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে জাতির সুপ্ত সৃজনীশক্তি জাগিয়া উঠিল, বাঙালীর মনীষা পূর্ণ দীপ্তিতে উদ্দীপিত হইল।' বৈষ্ণবপদকর্তাগণের রচনপ্রতিভা-গুণে বাংলার কাব্য-কানন সুমধুর কল-কাকলীতে আনন্দমুখর হইয়া উঠিল! বাংলা সাহিত্যে এমন শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশ, এমন রূপ-বৈচিত্র্য, এমন ছন্দোমাধুর্যের রসবন্যা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই,—এ যেন রৌদ্রতপ্ত নিদাঘ অবসানে উদ্বেলিত বর্ষার কল-কল্লোল—'মরাগাঙে' ভাবের জোয়ার!

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের রসপ্রবাহ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গতি লইয়া উৎসারিত। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক গতিরই উৎস-মুখ মহাপ্রভুর জীবন ও বাণী। ঐ তিনটি গতির একটি 'তাঁহার প্রেমের বাণী ও জীবনকথা অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইল,—উহা চরিত-শাখা। দ্বিতীয়টি, তাঁহার জীবনের রাধাভাব-বিলসিত লীলাবৈচিত্র্য হইতে উদ্ভূত,—উহা পদাবলী-শাখা। তৃতীয় ধারাটি হইতেছে—শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবজীবনের লীলাবৈচিত্র্য অবলম্বন করিয়া রচিত। উহা গৌরচন্দ্রিকা-শাখা।' সাহিত্যের এই তিনটি রসধারা পরিপুষ্ট ও ভাবপরিমণ্ডিত হইয়াছে নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ বৈষ্ণবসাহিত্য-সাধকের কুশলরচনমাধুর্যে। একদিকে যেরূপ তাঁহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনলীলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রকৃত অধিকারী, তেমনি অপরদিকে তাঁহারা ছিলেন সত্যকার কবি-প্রতিভা-গুণান্বিত। তাই তাঁহাদের লেখনী-সঞ্চালনে বাংলা সাহিত্যে যে কেবলমাত্র ভক্তিভাবের প্লাবনই বহিয়া গেল, তাহা নয়, অধিকন্তু বাস্তবতার আলোকে সাহিত্যে মানব-জীবন-ধর্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরও একটা প্রাথমিক প্রচেষ্টা দেখা গেল। শুধু তাহাই নয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের এই কালজয়ী প্রভাব তৎকালীন মঙ্গলকাব্য এবং অনুবাদকাব্য-গুলিকেও সবিশেষ প্রভাবিত করিয়াছে। প্রাক্-চৈতন্যযুগে ঐ সকল কাব্যের নায়ক-

নায়িকাগণের চরিত্রে যথার্থ প্রেমসুলভ কোমলতা আরোপিত হইত না। বৈষ্ণব মহাজনদিগের ভাবাদর্শেই তাহা সম্ভব হইল। ষোড়শ শতকের সে কোন্ পুণ্যময় লগ্নে বাংলা সাহিত্যের প্রাণ-গঙ্গায় যে রসধারা উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা উদ্দাম-উচ্ছল গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথের ইতিহাস তাহার বিজয়-বৈজয়ন্তীর ইতিহাস, তাহার অভিনব রসলীলার স্বর্ণস্বাক্ষর।

বাংলার দুর্যোগঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অন্ধতামস-সমাচ্ছন্ন পরিবেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য আসিয়াছিলেন নবজাগরণের মন্ত্রবীণা বাজাইতে। তাইতো তাঁহার সুকোমল করস্পর্শে সেই মন্ত্রবীণার তারে তারে ধ্বনিত হইল নিখিল জনচিত্তহারী এক অপূর্ব-মোহন মূর্ছনা! বাঙালীর শূন্য হৃদয়ের ধূসর প্রান্তরে পরিব্যাপ্ত হইল তাহারই সুতীব্র অনুরণন। তাহাদের অনুর্বর মানসক্ষেত্রে অবশেষে দেখা দিল উর্বরতার রস-লক্ষণ: সার্বিক নব-জাগৃতির প্রখর আলোকচ্ছটায় মুছিয়া গেল তাহাদের অবচেতন মনের কলুষ-কালিমা। বাঙালী-চিত্তের সুপ্রসন্ন ভাব-ব্যঞ্জনায় বাংলার আকাশে-বাতাসে সঞ্চারিত হইল এক নব-নবীন প্রাণ-চেতনা; ছন্দিত হইল অনাদি-কালের সর্বাত্মক জাতীয় কল্যাণ-মন্ত্রের সেই রসঘন সুরবাণী: 'সত্যং শিবং সুন্দরম্!'

তুমি এক অসীম আকাশ

শ্রীরাধানাথ পাল

১

তুমি এক অসীম আকাশ।
তোমার উন্মুক্ত নীল চন্দ্রাতপ তলে
আমাদের এই বসুন্ধরা—
শস্য-পূর্ণ ক্ষেত দিগন্ত-বিস্তৃত,
উত্তুঙ্গ গিরির শ্রেণী ব্যাপ্ত বহুদূর,
বাঁকারেখা নদীখানি,
অথবা অশ্বত্থ-শাখা অরণ্য-বীথিকা,
সুনীল সাগর—
প্রাকৃতিক প্রতিরূপে
তোমারই প্রকাশ—
তুমি এক অসীম আকাশ!

২

অথবা এ লোকালয়
মনে হয়—
এখানেই লভিয়াছি সত্য পরিচয়—
সমাজ সংস্কার সব মিছে নয়—
মিছে নয় অশ্রু হাসি গান
তোমারই সে দান;
জীবনে বিভিন্নরূপে
তুমিই প্রকাশ—
তুমি এক অসীম আকাশ।

স্বামীজীর সন্নিধানে

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী স্বরূপানন্দ

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে মঠ স্থানান্তরিত হইবার কয়েক মাস পরে স্বামীজীর ভাবধারায় আকৃষ্ট হইয়া বহুগুণসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ যুবক মঠে যোগদান করেন—নাম অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ২৬ বৎসর। অল্প বয়সেই তিনি বিবাহিত হন, কিন্তু বহু সদনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া মানুষের সেবা করিতেছিলেন। স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসামাত্রই তিনি বুঝিলেন, এই মহাপুরুষের চরণে জীবন সমর্পণ করিলেই তাঁহার অভীষ্ট ফলপ্রসূ হইবে।

একদিন অপরাহ্নে ধর্মপ্রসঙ্গ শেষ হইলে শ্রোতারা চলিয়া গেলেন, অজয়হরি স্বামীজীকে একান্তে পাইয়া নিজের পরিচয় দিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প জানাইলেন। যুবকের স্থির উজ্জ্বল নয়নে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, আলাপে বিদ্যা বিনয় ধৈর্য ও অমায়িকতা এবং যথার্থ ধর্মজীবন লাভের দৃঢ়সঙ্কল্প প্রকটিত। স্বামীজী তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "অজয়হরি, সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম রক্ষা করতে পারবে তো? সাপের মুখে যেতে ব'লব, বাঘের মুখে যেতে ব'লব, অগ্ন্যুদ্গারী তোপের মুখে যেতে ব'লব। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বিচারমাত্র না ক'রে অবিচলিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাই করতে হবে। সুখাভিলাষী হ'লে চলবে না। কাম-কাঞ্চনের সম্বন্ধমাত্র রাখতে পারবে না। হৃদয়ের মমতা খণ্ড খণ্ড ক'রে বিসর্জন দিতে হবে। 'অভিমানং সুরাপানং, গৌরবং ঘোররৌরবং, প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা' জেনে সব ত্যাগ করতে হবে। পারবে তো? জেনে শুনে অগ্রসর হও। নতুবা এখনও নিরস্ত হয়ে সংসারে যেরূপ সদ্‌ভাবে এতদিন কাটিয়ে এসেছ, সেইভাবে আমৃত্যু থাক।"

অজয়হরি তাহাতে প্রস্তুত—কিছুমাত্র বিচলিত নহেন। অদ্ভুত ছিল তাঁহার মানসিক তেজ, উদ্যম ও অধ্যবসায়! তিনি সর্বান্তঃকরণে সম্মতি জানাইলেন।

১৮৯৮ খৃঃ ২৯শে মার্চ স্বামীজী তাঁহাকে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করিয়া 'স্বরূপানন্দ' নাম দেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যদের বলেন, 'We have made an acquisition to-day'—(আজ আমরা একটি রত্ন লাভ করেছি)। মঠাধ্যক্ষ গুরুভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'স্বরূপের শরীর খারাপ, ডাল-চচ্চড়ি সইবে না। তার জন্য দুধের বন্দোবস্ত ক'রে দাও।' অন্য সময় স্বরূপানন্দ সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তি: স্বরূপানন্দের মতো কর্মক্ষম কর্মী পাওয়া সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া অপেক্ষাও লাভজনক।

১৮৯৮ খৃঃ জুন মাসে মাদ্রাজে পরিচালিত ইংরেজী পত্রিকা প্রবুদ্ধ ভারতের কৃতী সম্পাদক বি. আর. রাজম্ আয়ার মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তখন এই মাসিকের গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় ৩,০০০। স্বামীজীর নির্দেশে প্রবুদ্ধ ভারতের কার্যালয় মাদ্রাজ হইতে মায়াবতীতে উঠাইয়া আনিয়া স্বরূপানন্দকে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক ও ১৮৯৯ খৃঃ নব-

প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করা হয়। স্বামীজীর এতই আস্থা ছিল এই শিষ্যের উপর!

মঠে যোগদানের পূর্বে স্বরূপানন্দ কয়েক বৎসর 'ডন' নামক সুবিখ্যাত ইংরেজী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, এইজন্য সম্পাদনা-কার্যে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র সম্পাদনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মায়াবতী আশ্রম ও প্রবুদ্ধ ভারতের উন্নতির জন্য স্বরূপানন্দ প্রাণপণ পরিশ্রম করেন। ভগিনী নিবেদিতাকে গীতা পড়াইবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদ স্বরূপানন্দের অক্ষয় কীর্তি।

পাশ্চাত্য দেশ হইতে আগত ম্যাকওনেল সাহেবের সহায়তায় তিনি কৃষির উন্নতি ও প্রচারের চেষ্টা করেন। হিমাচলে একটি উপনিবেশ-স্থাপনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহার চেষ্টায় মায়াবতীতে ও শোর নামক স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং মায়াবতীতে দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়। নৈনিতাল, আলমোড়া প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে গিয়া তিনি ধর্ম ও বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। ১৮৯৯ খৃঃ দুর্ভিক্ষে রাজপুতানার কিষণগড়ে দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের সেবা ও বালকবালিকাদের জন্য আশ্রম স্থাপন করেন। ঐ বৎসর ৪ঠা মে হইতে ১৯শে জুন পর্যন্ত নৈনিতালে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তিনি কনখল সেবাশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন।

১৯০৩ খৃঃ এলাহাবাদে স্বরূপানন্দ দুই মাস থাকিয়া বক্তৃতা দেন, জনসাধারণ এই বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ঐ স্থানে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনে অনুরোধ করেন। কাংড়া জেলার ধর্মশালা নামক স্থানে ভূমিকম্পে তাঁহার সেবাকার্যও উল্লেখযোগ্য।

স্বামীজীর গ্রন্থাবলী সম্পাদনা করার ব্যবস্থা স্বরূপানন্দ করিয়াছিলেন। একান্ত পরিশ্রমে বহু উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল, ছাপাইবার আয়োজনও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৬ খৃঃ ২৭শে জুন নৈনিতালে অপরিণত বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হওয়ায় স্বামীজীর গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে মিসেস্ সেভিয়ার ও স্বামী বিরজানন্দের প্রযত্নে এই কার্য সম্পন্ন হয়।

মাত্র আট বৎসরের সন্ন্যাসজীবনে স্বরূপানন্দের আধ্যাত্মিকতার যে বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে গৌরবের নিদর্শন হইয়া আছে।

মন্মথনাথ চৌধুরী

১৮৯০ খৃঃ মধ্যভাগে স্বামীজী হিমালয়-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বহির্গত হন—সঙ্গে গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ। ভাগলপুরে আসিয়া তাঁহারা কয়েকদিন বিশ্রাম করেন। তখন তাঁহারা সাধারণ সাধুদিগের ন্যায় ছিন্নমলিন-বস্ত্র-পরিহিত ও দণ্ডকমণ্ডলুধারী। কিন্তু তাঁহাদের আকৃতি ও কথাবার্তার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া স্থানীয় লোকেরা সহজেই বুঝিতে পারিল, ইঁহারা নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর সাধু নন। প্রথম দিন মধ্যাহ্নে ভাগলপুর পৌঁছিয়া তাঁহারা রাজা শিবসিংহের বাটীর সন্নিকটে গঙ্গাতীরে কাটান। তারপর কুমার নিত্যানন্দ সিংহের অতিথি হন। সেখান হইতে তাঁহারা কুমারের গৃহশিক্ষক মন্মথনাথ চৌধুরীর গৃহে যান

মন্মথবাবু একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন। স্বামীজীর বাগ্‌বিভূতি ও আধ্যাত্মিকতায়

অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তিনি পুনরায় হিন্দুধর্ম মানিতে আরম্ভ করেন, এমনকি রাধাকৃষ্ণলীলা পর্যন্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। স্বামীজী হিন্দুধর্মের বহু দিক তাঁহাকে অতি সরলভাবে বুঝাইয়া দেন। ১৯০৬ খৃঃ জুন মাসে স্বামীজীর এক শিষ্যকে মন্মথবাবু যে পত্র দেন, তাহা হইতে এই সময়ের বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে। পত্রখানির সারাংশ উদ্ধৃত হইল :

অগস্ট মাস, ১৮৯০ খৃঃ একদিন প্রাতঃকালে স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী অখণ্ডানন্দকে লইয়া আমার গৃহে অবাঞ্ছিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হন। সাধারণ সাধু মনে করিয়া আমি তাঁহাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিই নাই। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর তাঁহাদিগকে অশিক্ষিত ভাবিয়া আমি আলাপাদি না করিয়া বৌদ্ধধর্মের একখানি গ্রন্থপাঠে মগ্ন হই। কতকক্ষণ বাদে স্বামীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি বই পড়ছেন?' উত্তরে আমি বই-এর নাম বলিয়া তিনি ইংরেজী জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, 'সামান্য জানি।' ইহাতে আমি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া বুঝি যে, তিনি আমা অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশি শিক্ষিত। দানাপুরের উকীল মথুরানাথ সিংহ এবং আমি অবাক্ হইয়া তাঁহার কথা অতিশয় মনোযোগ সহকারে শুনিতে থাকি।

একদিন স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বিশেষ কোন সাধনা অভ্যাস করি কি না। যোগাভ্যাস সম্বন্ধে আমাদের বহুক্ষণ আলাপ হয়। তখন আমি বুঝি, তিনি কোন সাধারণ লোক নন। কারণ যোগ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, তাহা দয়ানন্দ সরস্বতীর নিকট আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তাহার সহিত হুবহু মিলিয়া যায় বরং তিনি এমন সব প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যক্ত করেন, যাহা পূর্বে কখনও শুনি নাই।

উপনিষদের দুর্বোধ্য অংশসকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সংস্কৃতের জ্ঞান পরখ করিতে গিয়া দেখি, সমভাবে ইংরেজী সংস্কৃত ও যোগ সম্বন্ধে তাঁহার আশ্চর্য জ্ঞান! তাঁহার উপনিষদ্-ব্যাখ্যা অতীব সুন্দর আলোক দান করে। শাস্ত্রে যেমন তিনি অসামান্য পারদর্শী, উপনিষদের শ্লোক-আবৃত্তিও তেমনি মনোমুগ্ধকর। এর পর তাঁহাকে আমার নিকট হইতে যাইতে দিব না, মনে মনে স্থির করিয়া ভাগলপুরে থাকিতে তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করি।

একদিন গুনগুন করিয়া গান করিতেছেন শুনিয়া অনেক পীড়াপীড়ি করায় স্বামীজী গান শোনান। কী আশ্চর্য সঙ্গীত-প্রতিভা! তাঁহার অনুমতি লইয়া পরের দিন ওস্তাদ গাইয়ে ও বাদক আমন্ত্রণ করি। রাত্রি ৯টা।১০টায় গান-বাজনা শেষ হইবে মনে করিয়া আমি অতিথিদের রাত্রির আহারের ব্যবস্থা করি নাই। স্বামীজী অবিরত রাত্রি ২টা।৩টা পর্যন্ত গান করেন। সকলে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া গানে মুগ্ধ হইয়া বসিয়াছিল। কৈলাসবাবু স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গত করিতেছিলেন, তাঁহার আর আঙুল চলে না বলিয়া থামিতে বাধ্য হন। এইরূপ অতি-মানবীয় শক্তি আমি কাহারও দেখি নাই বা দেখিবার আশাও রাখি না।

অন্য একদিন আমি স্বামীজীকে ভাগলপুরের ধনীদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে চাই। স্বামীজী বলেন, ধনীদের সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়া সন্ন্যাসীদের ধর্ম নহে। তাঁহার জ্বলন্ত ত্যাগ আমার উপর গভীর রেখাপাত করে। সত্য বলিতে কি, তাঁহার সঙ্গ আমাকে অনেক

কিছু শিক্ষা দেয়, যাহা আমার আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শরূপে রহিয়াছে।

আমি বাল্যকাল হইতেই নির্জনে সাধনা করার পক্ষপাতী ছিলাম। স্বামীজীকে আমার সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়া নির্জনে ধ্যান করার জন্য বার বার বলি। তাঁহার সঙ্গলাভে আমার এই বাসনা অত্যন্ত প্রবল হয়। আমি শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে আমাদের উভয়ের জন্য তিন শত টাকা জমা দিয়া প্রসাদের ব্যবস্থা করিয়া বাকী জীবন যমুনাতীরে ধ্যান করিয়া কাটাইব, স্থির করি। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, কোন কোন লোকের পক্ষে ইহা বেশ ভাল ব্যবস্থা, সকলের পক্ষে নহে।' তিনি নিজে সর্বত্যাগী —তাহাই ইঙ্গিত করেন।

তাঁহার বহু নূতন ভাবের মধ্যে যে-দুইটি আমার মনে বিশেষ রেখাপাত করিয়াছে, তাহা হইতেছে :

(১) প্রাচীন আর্যগণের জ্ঞান মেধা এবং প্রতিভার যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা শুধু গঙ্গা-নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহেই দেখা যায়। গঙ্গা হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই ও-সব নজরে কম পড়ে। ইহাই শাস্ত্রে বর্ণিত গঙ্গা-মাহাত্ম্য প্রমাণ করে।

(২) নিরীহ (mild) হিন্দু এই সংজ্ঞা দোষের না হইয়া বরং আমাদের গৌরবের—ইহা আমাদের চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশ করে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানব-ভ্রাতার সর্বনাশ-সাধনে উদ্যত যে পশুশক্তি, তাহা ত্যাগ করিতে হইলে কতখানি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রয়োজন—ভাবিবার বিষয়।

স্বামীজী জানিতেন, আমি স্বেচ্ছায় বা সহজে তাঁহাকে ভাগলপুর ত্যাগ করিতে দিব না। একদিন আমি যখন প্রয়োজনীয় কাজের জন্য অনুপস্থিত, সুযোগ বুঝিয়া বাড়ির অন্য সকলের নিকট বিদায় লইয়া স্বামীজী চলিয়া যান। বহু খোঁজ করিয়াও তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই। স্বামীজীর কার্যক্ষেত্র সমগ্র পৃথিবী, তিনি কিরূপে কূপমণ্ডূকের ন্যায় হইবেন!

স্বামীজী বদরিকাশ্রম যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ভাগলপুর ত্যাগ করিলে আমি আলমোড়া পর্যন্ত তাঁহার খোঁজে যাই। সেখানে লালা বদ্রীশাহের নিকট জানিতে পারি, তিনি কিছু পূর্বে আলমোড়া ত্যাগ করিয়াছেন। স্বামীজী বহুদূর চলিয়া গিয়াছেন বুঝিয়া আমি তাঁহার খোঁজে নিরস্ত হই।

আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর একবার তাঁহাকে ভাগলপুরে আনার আমার আন্তরিক বাসনা ছিল। কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই, হয়তো তখন তাঁহার সময় ও সুযোগের অভাব ছিল।

স্বামীজী এক সপ্তাহ মন্মথবাবুর গৃহে অবস্থান করেন; উপরের লেখা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, মন্মথবাবু স্বামীজীর কিরূপ অনুরাগী হইয়াছিলেন এবং এই অল্প সময়ে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনে কী পরিবর্তন ঘটে!

'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥'

খেতড়িরাজ অজিতসিংহ

সে ১৮৯১ খৃঃ পরিব্রাজক জীবনের ঘটনা। আবুপাহাড়ে থাকাকালে অদ্ভুত উপায়ে খেতড়ির মহারাজা অজিতসিংহের সহিত স্বামীজীর পরিচয় ঘটে। উক্ত পর্বতের এক গুহায় স্বামীজী তপস্যারত ছিলেন। সেই সময় এক মুসলমান উকিল তাঁহাকে দেখিতে পান এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হন। ফলে স্বামীজী সেই উকিলের সঙ্গে এক বাংলোতে বাস করিতে থাকেন। এই সময় স্বামীজীর সঙ্গে খেতড়ি-মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি মুন্সী জগমোহনলালের আলাপ হয় এবং তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া স্থির করিলেন, মহারাজার সহিত স্বামীজীর আলাপ করাইয়া দিতে হইবে। রাজার নিকটে জগমোহনজী আদ্যোপান্ত সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিলে মহারাজা স্বামীজীর দর্শনলাভের জন্য এতদূর ব্যগ্র হন যে, স্বয়ং তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন। স্বামীজীর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি নিজে আসিয়া মহারাজাকে দর্শন দেন।

খেতড়িরাজ মহাসমাদরে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং যথাবিহিত শিষ্টালাপের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীজী, জীবন কি?' স্বামীজী উত্তর দিলেন, 'প্রতিকূল অবস্থাচক্রের মধ্যে জীবের আত্মস্বরূপ-প্রকাশের নামই জীবন।' পুনরায় প্রশ্ন হইল, 'আচ্ছা স্বামীজী, শিক্ষা কি?' স্বামীজী বলিলেন, 'কতকগুলি সংস্কারকে অস্থিমজ্জাগত করার নামই শিক্ষা, যতক্ষণ না কোন চিন্তা বা ভাব মনের মধ্যে দৃঢ় সংস্কারের আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতি স্নায়ু ও শিরায় তাহার কার্য প্রকাশ পায়, ততক্ষণ সেই চিন্তা বা ভাবকে প্রকৃত পক্ষে মনের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না।' উদাহরণস্বরূপ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করিলেন—বলিলেন, 'একখণ্ড ধাতু তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করা মাত্র অঙ্গটি এমন কি নিদ্রাবস্থাতেই বেঁকে যেত, কাঞ্চনত্যাগে তিনি এমনি সিদ্ধ হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবন পবিত্রতার পূর্ণ বিকাশ ও মানব-মনের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষার আদর্শ দৃষ্টান্তস্বরূপ।'

এইরূপে দিনের পর দিন স্বামীজীর জ্ঞানগর্ভ বাণী শ্রবণ করিয়া মহারাজা তাঁহার এতদূর অনুরাগী হইয়া উঠিলেন যে, একদিন প্রস্তাব করিলেন, 'স্বামীজী, আমার রাজ্যে চলুন। সেখানে আমি পরমযত্নে আপনার সেবা ক'রব।' স্বামীজী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা মহারাজ, তাই হবে। আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

কয়েকদিন পরে মহারাজা সপার্ষদ আবু ত্যাগ করিয়া স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া ট্রেনে জয়পুর যান। জয়পুর হইতে খেতড়ি ৯০ মাইল রাস্তা উষ্ট্র-যানে আরোহণ করিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। খেতড়ি পৌঁছিবার কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীজী মহারাজাকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য! মনে হয় রাজা হইয়া এরূপভাবে গুরুসেবা অল্পলোকেই করিয়াছে। গভীর রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি নিদ্রিত গুরুর পদসেবা করিতেন। প্রথম দিন যখন নিদ্রাভঙ্গে স্বামীজী রাজাকে ঐভাবে দেখিলেন, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না মহারাজা বলিলেন, 'স্বামীজী, আমি আপনার দাসানুদাস শিষ্য। আপনি আমায় এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না।' এমন কি রাজসভাতেও গুরুর সেবার জন্য উৎকণ্ঠা বোধ করিতেন। স্বামীজী

কিছুতেই সভাসদ্‌গণের সম্মুখে তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতেন না, বলিতেন, 'এতে প্রজার চক্ষে রাজার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।'

স্বামীজী এই শিষ্যের অকপটতা ও ভক্তির গভীরতা দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহার মাধ্যমে দেশের উন্নতি-সাধনের বহু আশা পোষণ করিতেন। খেতড়িতে স্বামীজী কিছুদিন ছিলেন, মহারাজ স্বামীজীর নিকট আইন ও বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার প্রজাদের অবস্থা-উন্নয়ন-কল্পে বিজ্ঞানের যে বিশেষ প্রয়োজন তাহাও বুঝিতে পারেন।

মহারাজার পুত্রসন্তান ছিল না। পুত্র-লাভের জন্য তিনি স্বামীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন—কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল স্বামীজীর আশীর্বাদ নিষ্ফল হইবার নয়। তাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া স্বামীজী তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে যখন স্বামীজী আমেরিকা ধর্মমহাসভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত, সে-সময় মুন্সী জগমোহনলাল মাদ্রাজে মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের গৃহে আসিয়া স্বামীজীকে খেতড়ি যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীজীর আশীর্বাদে খেতড়ি মহারাজার একটি পুত্রসন্তান হওয়ায় সেখানে উৎসবে যোগদান করিয়া স্বামীজী নবজাত শিশুকে আশীর্বাদ করিবেন—এই মহারাজার বাসনা। মহারাজা স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন—এই আশ্বাস দিয়া মুন্সীজী তাঁহাকে খেতড়ি লইয়া যান। সেখানে আনন্দ-উৎসবের মধ্যে কয়েকদিন কাটাইয়া ও নবজাত শিশুকে আশীর্বাদ করিয়া স্বামীজী আমেরিকা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। মহারাজা জয়পুর পর্যন্ত সঙ্গে যান। মহারাজার আদেশে মুন্সীজী স্বামীজীর সঙ্গে বোম্বাই পর্যন্ত গিয়া পাথেয় ও সমুদ্রযাত্রার অন্যান্য ব্যবস্থা করিয়া দেন। স্বামীজীর জামা কাপড় আলখাল্লা পাগড়ি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও টিকিটের বন্দোবস্তও করা হয়।

পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করিতেন। কথিত আছে, মহারাজার অনুরোধে খেতড়ির রাজসভায় স্বামীজী 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি আর নাম পরিবর্তন করেন নাই।

১৮৯৪ খৃঃ আমেরিকার বিভিন্ন বিষয় ও ধর্মমহাসভার বর্ণনা করিয়া স্বামীজী খেতড়ির মহারাজাকে এক পত্র লেখেন।

রাজপুতানায় থাকাকালে স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত মহারাজ অজিত সিংহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। স্বামীজীর প্রেরণায় ও রাজার সাহায্যে তিনি খেতড়ি রাজ্যে বহু জনহিতকর কার্যের প্রবর্তন করেন।

স্বামীজী বিদেশ হইতে ভারতে প্রথমবার প্রত্যাবর্তন করিলে মুন্সী জগমোহনলালের সঙ্গে খেতড়িরাজ কলিকাতা আসিয়া আলমবাজার মঠে স্বামীজীকে দর্শন করেন। বহুদিন পরে গুরুদর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত প্রশান্তিতে পূর্ণ হয়। এই সময়ে মেঝেয় ঢালা সতরঞ্চের উপর স্বামীজীর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মহারাজা কথাবার্তা বলেন—ইহা সকলকে মুগ্ধ করে। তাঁহার সাদাসিধা পোশাক ও অত্যন্ত বিনীতভাব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৮৯৮ খৃঃ ১৩ই মে স্বামীজী যখন তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যদের লইয়া নৈনিতাল যান, তখন খেতড়ির মহারাজা শৈলাবাসে ছিলেন।

সেখানে সশিষ্য স্বামীজীর সহিত তাঁহার দেখা হয়।

নিজব্যয়ে মোগল যুগের একটি প্রাচীন কীর্তির সংস্কারকার্য পরিদর্শন-কালে মিনারের উপর হইতে পড়িয়া গিয়া ১৯০০ খৃঃ অজিত সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই মৃত্যু সংবাদে স্বামীজী মর্মাহত হন।

হেল-পরিবার

অধ্যাপক রাইটের পরিচয়-পত্র লইয়া স্বামীজী শিকাগো যাত্রা করিলেন, কিন্তু শিকাগো স্টেশনে নামিয়া বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, কারণ রাইট সাহেব ধর্মমহাসভার সভাপতি ডক্টর ব্যারোজের যে ঠিকানা দিয়াছিলেন, স্বামীজী দেখিলেন তাহা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। কোথায় যাইবেন ঠিক করিতে পারিলেন না, দু-চারজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহ বলিতে পারিল না। শিকাগো প্রকাণ্ড শহর, কে কাহার খবর রাখে? তাহার উপর এ স্থানটি শহরের উত্তর-পূর্ব দিক—এখানে কেবল জার্মানদিগের বাস। তাহারা তো স্বামীজীর কথাই বুঝিতে পারিল না, অধিকন্তু তাঁহাকে কাফ্রী বিবেচনা করিয়া অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। স্বামীজী জনে জনে জিজ্ঞাসা করিয়া ফিরেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিল না!

এদিকে সন্ধ্যাও আগতপ্রায়। তিনি মহা সমস্যায় পড়িলেন, কোন লোক তাঁহাকে একটা হোটেল পর্যন্ত দেখাইয়া দিল না! অগত্যা তিনি নিরাশভাবে স্টেশনে মালগাড়ি রাখিবার প্রাঙ্গণে একটা প্রকাণ্ড খালি বাক্সের মধ্যে সারা রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। হায়, ঈশ্বরের লীলা বুঝা কঠিন! দুই দিন পরে সমগ্র আমেরিকার লোক যাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটাছুটি করিবে, আজ তাঁহার কি অবস্থা!

যাহা হউক, রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি হ্রদের উপকূলবর্তী রাস্তা দিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। সে রাস্তায় ক্রোরপতিদের প্রাসাদ। স্বামীজী অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়াছিলেন। অনন্যোপায় হইয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী তো চিরদিন ভিক্ষুক! ইহাতে আর লজ্জা কি? তিনি খাদ্য ভিক্ষা করিয়া এবং মহাসভার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া বিফল-মনোরথ হইলেন। ক্রোরপতিদের ভৃত্যেরা তাঁহার মলিন বস্ত্র ও শ্রান্ত ক্লান্ত ধূলিধূসরিত মূর্তি দেখিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞাভরে দেখিতে লাগিল। কেহ কেহ অপমানও করিল, কেহ বা তাঁহাকে দেখিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অবসন্ন হৃদয়ে তিনি পথের ধারে বসিয়া পড়িলেন।

এমন সময়ে সম্মুখের সুরম্য অট্টালিকা হইতে মূর্তিমতী জননী-স্বরূপা এক মহিলা বাহির হইয়া আসিয়া স্বামীজীকে সেই অবস্থায় দেখিয়া সুমিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি?' স্বামীজী বলিলেন, 'হ্যাঁ, তাই বটে, কিন্তু আমি ঠিকানা হারিয়ে ফেলে এই দুর্দশায় পতিত হয়েছি।'

মহিলা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে বলিলেন, গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বামীজীর যথোচিত সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন এবং আহারাদির পর শরীর সুস্থ হইলে স্বামীজীকে লইয়া স্বয়ং ধর্মসভার কার্যস্থলে যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

মাতৃস্বরূপিণী এই মহিলা শ্রীমতী

হেল—মিঃ জর্জ ডব্লিউ হেল নামক শিকাগোর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী। স্বামীজী বিধাতার অদ্ভুত কার্য দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইল—শ্রীরামকৃষ্ণ অনুক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন।

যথাকালে মিসেস্ হেল স্বামীজীকে লইয়া মহাসভার কার্যালয়ে গমন করিলেন। স্বামীজী তাঁহার পরিচয়-পত্র দেখাইয়া প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হইলেন এবং মহাসভার অপর প্রাচ্য প্রতিনিধিগণের সহিত একত্র থাকিতে পাইলেন।

ধর্মমহাসভার পর স্বামীজী হেল-পরিবারে আসিলেন—৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, শিকাগো—এই ঠিকানায় বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে হেল-পরিবারের সহিত স্বামীজীর পরিচয় বিশেষ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। মিস্টার হেল, মিসেস হেল এবং তাঁহাদের সন্তানাদির সহিত স্বামীজী প্রগাঢ় প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

স্বামীজী মিসেস হেলকে 'মা' এবং তাঁহার কন্যাদের 'ভগিনী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন; কখন কখন মিসেস হেলকে 'মাদার চার্চ' এবং মিঃ হেলকে 'ফাদার পোপ' বলিতেন। এই আদর্শ দম্পতীও স্বামীজীকে পুত্র-তুল্য মনে করিতেন। হেলদের দুইটি কন্যা ও দুইটি আত্মীয়া-কন্যা ছিলেন। মেয়েদের নাম মেরী, হ্যারিয়েট, ইসাবেল ও জিন। তাঁহারা সকলেই স্বামীজীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো দেখিতেন, স্বামীজীও তাঁহাদিগকে ছোট বোনের মতো স্নেহ করিতেন। মেরী তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। স্বামীজী যেন হেল-পরিবারের একজন হইয়া গিয়াছিলেন, একই পরিবারের লোকের মতো তাঁহার উপর স্নেহ ভালবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পিত হইত, তিনিও তাঁহাদের সুখদুঃখের ভাগী হইয়াছিলেন।

স্বামীজী যখন অন্যত্র যাইতেন, তাঁহার জিনিসপত্র হেল-ভগিনীদের জিম্মায় রাখিয়া দিতেন। মিস মেরী হেল ও মিস হ্যারিয়েট হেলকে স্বামীজী লিখিত ১১ খানি পত্র পাওয়া যায়। কোন চিঠি দুই ভগিনীকে এক সঙ্গে লিখিত, কোনটি শুধু এক জনকে। এই সকল পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়, এই পরিবারের সহিত স্বামীজীর কিরূপ অন্তরঙ্গতা হইয়াছিল।

হেল-দম্পতী এবং হেল-পরিবারের ভগিনী-চতুষ্টয় স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ভাবধারায় খুবই অনুপ্রাণিত হন। স্বামীজীর চিঠিপত্রে তাঁহাদের মানসিক পবিত্রতা উদারতা ও সরলতার কথা বেশী পাওয়া যায়। স্বামীজী যখন শিকাগো আসিতেন, হেল-পরিবারেই থাকিতেন।

১৯০০ খৃঃ জর্জ হেলের দেহাবসান ঘটে। স্বামীজী তখন ক্যালিফর্নিয়ায়। এই শোকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি মেরী হেলকে পত্র দেন ২০শে ফেব্রুআরি।

দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যাইয়া স্বামীজী কয়েকদিন হেল-পরিবারে বাস করেন। বিদায়ের দিন মেরী স্বামীজীর ঘরে গিয়া দেখেন, তিনি বড়ই দুঃখিত এবং রাত্রে বিছানায় শয়ন করেন নাই মনে হইল। মেরীর প্রশ্নে স্বামীজী বলেন, রাত্রে তিনি না ঘুমাইয়া কাটাইয়াছেন। অনুচ্চস্বরে বলিলেন, মানুষের মায়া কাটানো বড় শক্ত। তিনি জানিতেন, এই অনুরক্ত বন্ধু-পরিবারের সহিত ইহাই তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ।

স্বামী বিমলানন্দ

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত বাগাণ্ডা গ্রামনিবাসী ধর্মনিষ্ঠ বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র খগেন্দ্রনাথ উত্তরকালে স্বামী বিমলানন্দ রূপে প্রসিদ্ধ হন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আন্দুল গ্রামে উঠিয়া আসেন এবং কলিকাতা পটলডাঙ্গায় ক্রীত বাটীতেও কখন কখন বাস করিতেন।

খগেন্দ্রনাথ মাতাপিতার দ্বিতীয় পুত্ররূপে ১৮৭২ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সরলতা বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া সকলে বুঝিতে পারিত, বালক ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ মানুষ হইবে, আবার চিররুগ্ন বালকের স্বাস্থ্য দেখিয়া আত্মীয়-স্বজনগণ ভাবিতেন, হয়তো ইহার জীবনপুষ্প পূর্ণ বিকশিত হইবার পূর্বেই ঝরিয়া যাইবে। অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ মাতাপিতা পুত্রের ধর্মভাব-বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন।

তরুণ খগেন্দ্রনাথের চক্ষু-দুইটিতে প্রখর বুদ্ধিমত্তা। যুবকের শান্ত স্বভাব, অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতি। সদাচার, ব্রহ্মচর্য, আদর্শনিষ্ঠা—এই সব লইয়া বন্ধুগণের সহিত আলোচনা করেন। ধর্মজীবন যাপনের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ। বহুগুণের অধিকারী খগেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ভাবেই সহপাঠীদের নেতা হইয়াছিলেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া যে বন্ধুচক্র গড়িয়া উঠে, তাহার পাঁচজন স্বামীজীকে গুরুপদে বরণ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করেন। ঐ দলের অপর দু-একজন সংসারে থাকিলেও আজীবন কৌমার-ব্রত অবলম্বন করেন। সহানুভূতি, ভালবাসা ও সদুপদেশে বহু যুবককে তিনি সৎপথে আনিয়াছিলেন।

রিপন কলেজে পাঠকালে অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ('কথামৃত'কার শ্রীম) সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। তিনি শ্রীম-র নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যগণের কথা জানিতে পারেন। ভগবান-লাভের জন্য সর্বস্ব-ত্যাগের ইঙ্গিত করিয়া শ্রী-ম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'যদি ত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখতে চাও তো একদিন বরাহনগর মঠে যাও, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী শিষ্য-মণ্ডলী থাকেন।' কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে যাতায়াত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিতও তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হন।

১৮৯২ খৃঃ সুযোগ ও সুবিধামত বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া খগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, যাহা এতদিন তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার সন্ধান মিলিয়াছে। সংসার ত্যাগ বিনা ঈশ্বরলাভ অসম্ভব—তাঁহার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইল।

১৮৯৪।৯৫ খৃঃ বি.এ. পরীক্ষার পূর্বে তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন এবং স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করেন।

১৮৯৭ খৃঃ ভারতের সর্বত্র সাড়া পড়িয়া গেল। লোকমুখে, সংবাদ-পত্রসমূহে সর্বত্রই একই কথা—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য বিজয় করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিতেছেন। আজ তিনি জাহাজ হইতে কলম্বোতে নামিয়াছেন, কাল মাদ্রাজের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জানায়—তিনি জনসাধারণের সমক্ষে অদ্ভুত ধর্মব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইত্যাদি। খগেন্দ্র-নাথের শরীর অজীর্ণ রোগের আক্রমণে অসুস্থ।

স্বামীজীর আগমনবার্তা শুনিয়া তিনি প্রাণে প্রাণে দিব্য আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অবশেষে যথাকর্তব্য নিরূপণ করিয়া সহপাঠী এবং ছাত্রমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দিক হইতে স্বামীজীকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য পুষ্প ও মাল্যোপহার বর্ষিত হইতেছে—খগেন্দ্রনাথ মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই অপূর্ব সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। স্বামীজী গাড়িতে আরোহণ করিবামাত্র স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা আগাইয়া আসিয়া ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই গাড়ি টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। রুগ্ন শরীর—ভ্রূক্ষেপ নাই, খগেন্দ্রনাথও ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া স্বামীজীর গাড়ি টানিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহ উদ্দীপনা যেন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে—প্রতিটি শিরায় উপশিরায় প্রাণচাঞ্চল্য অনুভূত হইতেছে!

কলিকাতায় যেখানে স্বামীজীর ভাষণ ও বক্তৃতা হইত, সেখানেই উপস্থিত হইয়া খগেন্দ্রনাথ তাঁহার পুণ্যদর্শন লাভ ও ওজস্বিনী বাণী শ্রবণ করিয়া নয়ন মন ধন্য করিতেন। আলমবাজার মঠে ও কাশীপুর গোপাললাল শীলের বাগান-বাড়িতে স্বামীজীর কথাবার্তা ও ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিতে যাইতেন।

মাতাপিতার অনুমতি লইয়া খগেন্দ্রনাথ চিরদিনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া মঠে আসিয়া স্বামীজীর শরণ লইলেন। তাঁহার ত্যাগ বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়া স্বামীজী তাঁহাকে সাদরে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়া 'বিমলানন্দ' নামে অভিহিত করিলেন। বিমলানন্দও 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' নিজেকে উৎসর্গ করিলেন।

স্বামীজীর নির্দেশে স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদিগকে উপনিষদাদি বেদান্তশাস্ত্র পড়াইতেন। নবীন সন্ন্যাসী বিমলানন্দও স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট শাস্ত্র-পাঠ, গুরুনির্দেশে জপধ্যান ও সাধুসেবায় মগ্ন হইলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বভাগে স্বামীজী বেলুড়ে নূতন মঠবাটী প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিমলানন্দ তখন হইতে কিছু কাল বেলুড়মঠে শ্রীগুরুর পূতসঙ্গে মঠে অবস্থান করেন। ইহার পর হিমালয়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে সেখান হইতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকা মুদ্রিত হইতে লাগিল। মায়াবতী আশ্রমে ইংরেজী-জানা লোকের প্রয়োজন হওয়ায় স্বামীজী অন্য দু-একজনের সহিত বিমলানন্দকেও সেখানে পাঠাইবার জন্য মনোনীত করিলেন। স্বামীজী তাঁহার ইংরেজী রচনার খুব সুখ্যাতি করিতেন।

বিমলানন্দ মায়াবতীতে প্রথমে উক্ত পত্রিকার ম্যানেজার হন। পরে সহকারী সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করিয়া এতদিন মঠে থাকিয়া স্বামীজীর প্রসাদে যাহা শিখিয়াছিলেন, জগৎকে তাহাই দিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। শরীর দুর্বল হইলেও তিনি কখনও অলস বা নিরুদ্যম থাকিতেন না। বাজে কথায় কালক্ষেপ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বেলুড় বা মায়াবতী—যেখানেই থাকিতেন, জপ ধ্যান পাঠ ইত্যাদি মানসিক পরিশ্রম ভিন্ন গৃহকর্ম, রন্ধনের বন্দোবস্ত, রোগীর সেবা ইত্যাদি কিছু না কিছু শারীরিক পরিশ্রমেও নিযুক্ত থাকিতেন। শরীরে না কুলাইলেও অনেক সময় জোর করিয়া উহা করিতেন। রোগীর প্রতি তাঁহার চিরদিন বিশেষ সহানুভূতি লক্ষিত হইত, মঠের কেহ পীড়িত হইলে তিনি অতি যত্নে সেবা করিতেন।

নিজে বহুকাল রোগের যন্ত্রণা অনুভব করাতেই বোধ হয় পীড়িতের যন্ত্রণা তিনি এমন করিয়া উপলব্ধি করিতেন। আবার লোকাভাবে কাহাকেও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দেখিলে তিনি নিজের শারীরিক দুর্বলতার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইতেন—অনেক সময় ঐ জন্য তাঁহাকে ভুগিতেও হইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল বিমলানন্দ সর্বত্র সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন।

হিমালয়ে যাইয়া প্রথম দুই বৎসর তাঁহার শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল হয়। ১৯০০ খৃঃ তাঁহাকে কার্যের জন্য কলিকাতা আসিতে হয়। তখন মঠের সকলে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখিয়া আশা করেন—প্রতিভাশালী যুবক বিমলানন্দ দীর্ঘকাল গুরুনির্দিষ্ট কার্যে ব্রতী থাকিতে পারিবেন।

১৯০১ খৃঃ স্বামীজী কিছুদিনের জন্য মায়াবতী আশ্রমে যান। তাঁহার অনুগত বন্ধু ভক্ত ও শিষ্য কাপ্তেন সেভিয়ারের মৃত্যু হওয়ায় কাপ্তেনের সহধর্মিণী শ্রীমতী সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দেওয়াই এই মায়াবতী গমনের উদ্দেশ্য ছিল। স্বামীজীর নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার সাধ—বিমলানন্দের বহু দিন হইতে ছিল। স্বল্প কালের জন্য হইলেও এই সুযোগে তাহা পূর্ণ হইল। তিনি প্রাণ ঢালিয়া গুরুসেবা করিয়া মনের সাধ মিটাইলেন, স্বামীজী তাঁহার সেবায় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন।

* * *

১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই স্বামীজীর মহাসমাধি-লাভের পর বিমলানন্দ অধিকাংশ সময় স্বামীজীর চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। মায়াবতী আশ্রমে শীতের প্রকোপ অত্যধিক। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় এই শীত সহ্য করা কঠিন হইল, বিমলানন্দ ১৯০৩ খৃঃ অগস্টমাসে হিমালয় হইতে বেলুড় মঠে আসিলেন। তারপর কিছুদিন ওয়ালটেয়ারে থাকিয়া চিকিৎসার জন্য মাদ্রাজ মঠে যান। সেখান হইতে বাঙ্গালোরে যাইয়া কিছুকাল থাকেন। তখন বাঙ্গালোর আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহার পাঠ্যাবস্থার বন্ধু শুকুল মহারাজ—স্বামী আত্মানন্দ।

এত চেষ্টা করিয়াও তাঁহার স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হইতেই থাকিল। তার উপর ১৯০৬ খৃঃ স্বামী স্বরূপানন্দের দেহত্যাগে তিনি মর্মাহত হন, স্বরূপানন্দের সহিত তাঁহার অত্যন্ত সৌহার্দ্য ছিল।

১৯০৮ খৃঃ ২৪শে জুলাই মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে এই মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁহার আদর্শ জীবন সাধুসন্তকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করিবে।

জনগণের উদ্‌বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীঅমৃতকুমার বিশ্বাস

ভিন্ন ভাব, ভিন্ন আশ্রয় অবলম্বনে আমরা গড়ে উঠেছি; আমাদের মজ্জায় ভিন্ন ধাতু—এ বিশ্বাস যেন আমাদের এমন বিচারে প্রমত্ত না ক'রে যে, ইওরোপীয় সভ্যতায় আমাদের শিক্ষণীয় কিছুই নেই। সহজেই দেখতে পেয়েছি, ইওরোপীয় ভাবের পতাকা কেবল ভারতে নয়, বহুদেশে উড়ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার জয়জয়কার চারিদিকে। নিশ্চয়ই তার অন্তর্নিহিত গুণ কিছু আছে, যার প্রভাবে সে সভ্যতা দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত। তার চরম রূপ আমাদের লোভনীয়, আমাদের গ্রাহ্য না হ'তে পারে। কিন্তু যে গুণরাশিকে অবলম্বন ক'রে সেই সভ্যতার বিকাশ, তার কিছু আমাদের বাঞ্ছিতকে পাবার পথ সহজ করতে পারে। আমরাও কিছু নিশ্ছিদ্র নিখুঁত নই। পতন যখন অস্বীকার করতে পারি না, তখন এটাও মানতে হয়, আমাদের অভাবও কিছু আছে বা ছিল। জটিল সর্বগ্রাসী বিপুল-ঐশ্বর্যমণ্ডিত পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন্ গুণ অবলম্বনে আমরা আত্মরক্ষায় সমর্থ হবো এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ঐশ্বর্য ফিরে পাবো, তার বিচার সহজ নয়। দুই সভ্যতা এবং তার ঐশ্বর্য ও সভ্যতা-নির্ভর মানুষ—সর্বস্তরের মানুষ-সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে প্রকৃত দোষ গুণ বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় তৎকালীন প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন; কাজেই সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোক বিদেশী শিক্ষকের কাছে এবং বিদেশী শাসনের কেন্দ্রে[১] আকাঙ্ক্ষিত ভাবেই পেয়েছিলেন। আবার পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে প্রাচীন ভারতীয় বৈভবের স্পর্শ পেয়ে সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোক-দর্শনে তৎপর হয়েছিলেন। পশ্চিম যাত্রার পূর্বে বর্তমান ভারতবাসীর দুর্দশা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার অবকাশ পেয়েছিলেন; তারপর বিদেশী সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে সেই সভ্যতা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ লাভ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার ভারবাহী মানুষদেরও। ক্ষণজন্মা পুরুষ তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞায় দর্শন করলেন: ইওরোপ আমেরিকা যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন।[২] অনুভব করলেন—সাত্ত্বিকতার নামে দেশ তমোগুণ-সমুদ্রে নিমজ্জমান। এই মুহ্যমান মোহগ্রস্ত জাতিকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমানে রজোগুণের চর্চা চাই। সত্ত্বগুণসম্পন্ন মানুষের যে একান্ত অভাব ভারতে—তা নয়। তাঁদের সাত্ত্বিকতার প্রভাব দীর্ঘকাল পরাধীনতার শৃঙ্খল-পরিহিত নিবীর্য জাতির উপর ক্রিয়াশীল নয়। পরবশ্যতাজনিত দুর্বলের কাছে সাত্ত্বিক আচার তমোভাব উদ্রেক করে এবং সমাজে 'নেতি'-বাচক গুণের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। আর নিজেরই অজ্ঞাতে আপনার বিকাশের প্রসারের পথ

১ কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী

২ ভাববার কথা

রুদ্ধ করে নানা বিশ্বাসে, নানা আচারে, নানা অনুষ্ঠানে। তাঁরই তন্দ্রাজয়ী ভাষায় শোনা যাক:

'দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?

'অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর।······ রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়?'[৩]

'বর্তমান ভারত'-এ পাশ্চাত্য-প্রভাবিত নবীন ভারত ও প্রাচীন ভারতের দ্বন্দ্ব-রূপকের মাধ্যমে পাশ্চাত্যভাব অনুকরণেচ্ছাকে 'দাস-সুলভ দুর্বলতা' ব'লে উল্লেখ করেছেন স্বামীজী। কিন্তু প্রশ্নও উপেক্ষা করেননি— 'তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই?' যদিও পরক্ষণেই যোগ করছেন, 'শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে,···শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যতদিন বাঁচি, যতদিন শিখি', তবুও পাশ্চাত্য জগৎ থেকে প্রকৃত শিক্ষণীয় কী, তা তিনি উল্লেখ করেননি ঐ গ্রন্থে। এ বিষয়ে মনে হয়, তাঁর 'ভাববার কথা'[৪] গ্রন্থ আমাদের সহায় হবে। তারই একস্থানে উল্লেখ করছেন পশ্চিমী সভ্যতা থেকে অন্যতম কী আমরা গ্রহণ করতে পারি—

'যাহা আমাদের নাই, বোধহয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘনঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া, অনন্ত সম্মুখ-সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদ-মস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।'

কিন্তু রজোগুণ বিকাশের চেষ্টা করো বললেই তো হ'ল না। প্রসুপ্ত, বন্ধ্যা সমাজ—যে সমাজ নানা বিধি-নিষেধের বেড়াজালে, নানা অকারণ অন্যায় অজুহাতে মানুষের স্বাধীন কর্মস্পৃহার অন্তরায়, সেখানে রজোগুণের উৎকর্ষসাধনের চিন্তা বিলাসিতা মাত্র। এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের সম্যক্ ধারণা ছিল বলেই মনে হয়। নয়তো বলতে পারতেন না যে, 'স্বাধীনতা ব্যতীত কোনরূপ উন্নতিই সম্ভব নহে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, ফলে আমরা এই অপূর্ব ধর্ম পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি কঠিন শৃঙ্খল পরাইলেন, এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের সমাজ ভয়াবহ, পৈশাচিক, পাশ্চাত্যদেশে চিরকাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে—তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ।···

৩ ভাববার কথা

৪ অবশ্য একাধিক কথোপকথনে ও বক্তৃতায় এ সম্পর্কে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

'স্বাধীনতা উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার, কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তাহার আহার পোশাক বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন…।'[৫]

অতি প্রাচীনকালে ভারতেও চিন্তার স্বাধীনতা এবং কর্মের স্বাধীনতা ছিল—তা তিনি নিজেও জানতেন। মহাভারত রামায়ণেই তার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। কালে বিভিন্ন বৈদেশিক আক্রমণে সমাজ যখন বিক্ষিপ্ত, তখন সমাজকে সমূলে বিনষ্ট হওয়ার থেকে রক্ষা করবার জন্যই ক্রমাগত যেমন যেমন আক্রমণ, তেমন তেমন রক্ষাকবচ-স্বরূপ নিয়ম-কানুনের উদ্ভব হয়। যেমন হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য গৃহপালিত পশুকে খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করা হয়। খোঁয়াড়ের মধ্যেও আবার ছোট ছোট নানা অংশ থাকে গরু, ভেড়া, ছাগল বা একই পশুর সবল, দুর্বল অথবা ছোটবড়গুলোকে আলাদা রাখবার মতো। এ সবই তাদের সযত্ন রক্ষার জন্য। বিপন্মুক্ত হলেই তাদের স্বেচ্ছায় চরে বেড়াবার সুযোগ দেওয়া হয়। তা যদি না হ'ত তো পশুগুলো ঐ খোঁয়াড়েই পঞ্চত্ব পেত। কিন্তু আমরা আমাদের সমাজের সাময়িক বন্ধন-গুলিকে স্থায়ী করেছি—শাশ্বত ব'লে ব্যাখ্যা করার বুদ্ধিও ধরেছি। এর জন্যে দোষ—যাঁরা সেই বন্ধন রচনা করেছেন, তাঁদের আমরা কখনই দিতে পারি না। তাঁদের করণীয় তাঁরা সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের চিন্তা-নায়ক যাঁরা, সমাজনেতা যাঁরা, তাঁরা—হয় আমাদের এই বন্ধনগুলির উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি, নয় প্রকৃত মঙ্গলচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হননি। যে বন্ধন সাময়িক উদ্দেশ্যে, তাকে তাঁরা আরও পাকা করবার আত্মপ্রসাদে নিমগ্ন হলেন—পতন আমাদের সেখানেই। সেই থেকেই নানা কুসংস্কার সমাজ-গাত্রে আগাছার মতো ছেয়ে আমাদের সমাজের শ্বাসরোধ করবার উপক্রম করছে। সুতরাং প্রয়োজন এখন বন্ধনমুক্ত হওয়া, কুসংস্কার বর্জন করা। সমাজে বন্ধন-মুক্তির অভাবই নানাভাবে নানাদিকে নিত্যধর্মকে মানবধর্মকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এভার রবীন্দ্র-চিন্তারও অংশ।[৬]

'প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতি-ধর্ম আছে তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহা মানব-সাধারণের। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম যখন সেই উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল, তখন ধর্ম তাহাকে আঘাত করিল—ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

'এক সময়ে আর্য সভ্যতা আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণশূদ্রে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সেই ব্যবধান বর্ণাশ্রমধর্মের উচ্চতর ধর্মকে পীড়িত করিল। বর্ণাশ্রম আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু ধর্মকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিল না। সে যখন উচ্চ অঙ্গের মনুষ্যত্ব-চর্চা হইতে শূদ্রকে একেবারে বঞ্চিত করিল, তখন ধর্ম তাহার প্রতিশোধ লইল। তখন ব্রাহ্মণ আপন জ্ঞান ধর্ম লইয়া পূর্বের মতো আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অজ্ঞান জড়ের শূদ্র-সম্প্রদায় সমাজকে গুরুভারে আকৃষ্ট করিয়া নীচের দিকে টানিয়া রাখিল। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ উপরে উঠিতে দেয় নাই, কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণকে নীচে নামাইল। আজিও ভারতে ব্রাহ্মণ-প্রধান বর্ণাশ্রম থাকা সত্ত্বেও

৫ পত্রাবলী ; স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড

৬ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা—রবীন্দ্ররচনাবলী ৪র্থ খণ্ড

শূদ্রের সংস্কারে, নিকৃষ্ট অধিকারীর অজ্ঞানতায় ব্রাহ্মণ-সমাজ পর্যন্ত আচ্ছন্ন—আবিষ্ট।

'ইংরাজ আগমনে যখন জ্ঞানের বন্ধন-মুক্তি হইল, যখন সকল মনুষ্যই মনুষ্যত্ব-লাভের অধিকারী হইল, তখনই ব্রাহ্মণ-ধর্মের মূর্ছা-পগমের লক্ষণ প্রকাশ পাইল।

'......আমাদের বর্ণাশ্রমের সঙ্কীর্ণতা নিত্যধর্মকে নানাস্থানে খর্ব করিয়াছিল বলিয়াই তাহা উন্নতির দিকে না গিয়া বিকৃতির পথেই গেল।......'

তাই সমাজকে সাবেকী জঘন্য বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে সমাজদেহে সদ্‌রক্ত-প্রবাহের জন্য সকলকে সদাচার অনুশীলনের জন্য স্বামীজী আহ্বান জানিয়েছেন। দুয়েকটি নিদর্শন নেওয়া যেতে পারে। এর আগেই সমাজমুক্তির জন্যে তাঁর যে উক্তি তোলা হয়েছে, সেখানে উল্লেখ আছে, সমাজে বৈবাহিক স্বাধীনতাও প্রয়োজন। বাঙালী সমাজকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বলেছেন, ভিন্ন ভিন্ন 'জাতি' (caste)-র মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তিনি জানতেন, এ-বিষয়ে ধীরে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়। তাই তিনি বলতেন, একই 'জাতি'র ভিন্ন অঞ্চলের গোষ্ঠীর[৭] মধ্যে বিবাহগত যে বাধা, তা আগে অপসারিত হোক; তবেই এই কুসংস্কার যাবে। পরে সহজেই স্বজাতি-বিবাহ-প্রথা লোপ পাবে।

খাদ্যাখাদ্য ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে যে আমাদের দেশে ভ্রান্ত বাড়াবাড়ি চলে আসছে, তার মীমাংসাও তিনি অতি সুন্দররূপে করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর নিজস্ব বিচার-ধারা অবশ্য উদ্ধারযোগ্য :

'আহার শুদ্ধ হ'লে মন শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হ'লে আত্মসম্বন্ধী অচলা স্মৃতি হয়—......

'রামানুজাচার্য ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তিনটি দোষ বাঁচাতে বলছেন। জাতিদোষ অর্থাৎ যে দোষ ভোজ্যদ্রব্যের জাতিগত; যেমন প্যাঁজ লসুন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে মনে অস্থিরতা আসে অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হয়। আশ্রয়-দোষ অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তি-বিশেষের স্পর্শ হ'তে আসে; দুষ্ট লোকের অন্ন খেলেই দুষ্ট বুদ্ধি আসবেই, সতের অন্নে সদ্‌বুদ্ধি ইত্যাদি। নিমিত্ত-দোষ অর্থাৎ ময়লা কদর্য কীট কেশাদি-দুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে। এর মধ্যে জাতিদোষ এবং নিমিত্ত-দোষ থেকে বাঁচবার চেষ্টা সকলেই করতে পারে, আশ্রয়-দোষ হ'তে বাঁচা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এই আশ্রয়-দোষ থেকে বাঁচাবার জন্যই আমাদের দেশে ছুঁৎমার্গ 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা'। তবে অনেক স্থলেই 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হয়ে যায় এবং মানে না বুঝে একটা কিম্ভূতকিমাকার কু-সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। এ-স্থলে লোকাচার ছেড়ে লোকগুরু মহাপুরুষ-দেয় আচারই গ্রহণীয়। শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি জগদ্‌গুরুদের জীবনী পড়ে দেখ, তাঁরা এ সম্বন্ধে কি ব্যবহার ক'রে গেছেন।'[৮]

আমিষ-নিরামিষ খাদ্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর বিচার—মনে হয়, সমাজে রজোগুণ উদ্ধারের ক্ষেত্রে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রেও তাঁরই অনবদ্য বিচার-সিদ্ধান্ত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

কথায় কথায় তিনি নির্ভয় হবার উপযোগিতা বোঝাতেন; ভয়শূন্য বীর্যবান্‌ জীবনই জীবন। ফলতঃ এক-রকম দেখতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন এবং বাণী জাতিকে নির্ভীকতা ও সাহসিকতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে

৭ যেমন রাঢ়ী, বাগ্‌ড়ি, বঙ্গজ, বারেন্দ্র ইত্যাদি।

৮ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য —স্বামী বিবেকানন্দ।

গেলেন। যদি কেউ বলেন, কোন্ রসে বিবেকানন্দ-সাহিত্য পূর্ণ, তবে তার একমাত্র উত্তর—বীররস। কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁর একাধিক কবিতা ও গানে এই ভয়-বিহ্বল ভাব কাটাতে আহ্বান জানিয়েছেন, দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলতে বলেছেন। উল্লেখনীয় যে, সমাজে বীরভাব জাগাতে স্বামীজী বীর হনুমানের পূজার প্রশংসা করেছেন এবং যাতে তাঁর পূজা আরও ব্যাপক হয়, তার উদ্যোগের জন্য আহ্বান করেছেন। বার বার বলেছেন—'সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু'। সেই 'সম্প্রসারণে'র ভাবের প্রতীক বীর হনুমান। তাই আচার্য বিনোবা ভাবে ভারতীয় ঋষিগণের অন্যতম উত্তরপুরুষ বিবেকানন্দের নামোল্লেখ ক'রে এই হনুমান-পূজা প্রচারের উপদেশ দিচ্ছেন। এ-ও রজোগুণ-চর্চায় সহায় হবে, তা বলাই বাহুল্য।

এই রজোগুণ এবং মুক্ত সমাজের দৃষ্টান্ত আমরা যে কেবল পশ্চিমী সভ্যতা থেকেই গ্রহণ করতে পারি, তা নয়। ইসলামেও এ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সাম্য ও স্বাধীনতা সাম্যেরই নামান্তর। একের অভাবে অন্য অপূর্ণ অস্পষ্ট এবং ধারণার ও প্রবর্তনার অতীত। ইসলামি-সমাজে এ ভাব আছে, তাই হিন্দু সমাজের চেয়ে এ সমাজ শক্তিমান্ গতিমান্—প্রসারশীল। কাজেই সেই বৈদান্তিক নির্দেশ করেছেন—ভবিষ্যৎ ভারতের আদর্শ Islamic body and Vedantic brain—ইসলামি দেহে বৈদান্তিক মাথা অর্থাৎ সমাজ-স্বাধীনতা ও অধ্যাত্ম-স্বাধীনতা—এ-দুয়ের গঙ্গা-সিন্ধু সঙ্গম ভারতকে মহিমান্বিত করবে। হিন্দুর সমাজে অধ্যাত্ম-চিন্তার ধর্ম-চিন্তার ঈশ্বর-চিন্তার অফুরন্ত স্বাধীনতা আছে; ঈশ্বর-উপাসনার তাই এত বিচিত্র পদ্ধতি এ সমাজে দেখা যায়। তাই হিন্দু সমাজে মুক্ত পুরুষের প্রাবল্য এত বেশী যাঁদের উদ্ভব সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। এক্ষেত্রে সামাজিক বর্ণাশ্রম-বিধি বাধা হয় না, কারণ এই সাধু-সন্ন্যাসিবৃন্দ সংসারত্যাগী, ফলে—সমাজবহির্ভূত। 'জাতি'-বিচার তাঁদের স্পর্শ করে না। যে স্বাধীনতার—যে সাম্যের ফলে এই উদার ধর্ম[৯] আমরা পেয়েছি, সে ধর্মে কোন বিশেষ মতে বিশ্বাস (creed) না থাকায় সকলেই নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী আশ্রয় লাভ করতে পারে। ঠিক সেই স্বাধীনতা সেই সাম্য যদি আমরা আমাদের সমাজে অনুপ্রবেশ করাতে পারি, যদি চিন্তার স্বাধীনতার সঙ্গে কর্মের স্বাধীনতার সঙ্গম ধর্মের নামে সংসাধিত করতে পারি, তবেই আমরা সেই আর্যকুলের গৌরব ঘোষণার অধিকার, রিকৃথ—ফিরে পাব।

(ক্রমশঃ)

৯ হিন্দু ধর্ম স্বভাবজ, শাশ্বত, ঋতম্ভর এবং বিশ্বন্ধর (all inclusive)—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ভারত-সংস্কৃতি)।

বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ

ডক্টর শ্রীতারকনাথ ঘোষ

সূচনা বিবেকানন্দের গদ্যভঙ্গি

"সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মতো হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশানো —ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আঁব-নিচু-জাম-কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্চে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে, দুলছে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দি ইরানী তুর্কিস্তানি গালচে-দুলচে কোথায় হার মেনে যায়! সেই ঘাস, যতদূর চাও—সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে-ছুঁটে ঠিক ক'রে রেখেছে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, সে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা! একটি রঙে কত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি— যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?"

প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' প্রকাশ করবার আগে বা রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষা গ্রহণ করবার আগে অপর কোন লেখক যে এই ধরনের বাংলা গদ্য লিখেছিলেন, এটি প্রথমে অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই রচনাটির জন্মকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত, এটি কোন সাহিত্যযশঃপ্রার্থী লেখকের হাত থেকে বার হয়নি, এর রচয়িতা পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বৎসরে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করতে যাওয়ার সময় গোলকোণ্ডা জাহাজে বসে এমন স্বচ্ছন্দ গতিময় গদ্য লিখেছিলেন। দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার সময় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখতে শুরু করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত পত্রাকারে লেখা – প্রথমে এটি 'বিলাতযাত্রীর পত্র' নামে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, পরে 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয়েছিল।

'পরিব্রাজক'-এর মধ্যে বিবেকানন্দের নিজস্ব গদ্যভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী সরসভাবে চলিত-ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু সে যুগে ঐ গদ্যভঙ্গি অনেকের মনঃপূত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গি সম্পর্কে সম্ভবতঃ কোন মন্তব্য প্রকাশিত হয়নি, তবে বিবেকানন্দের গদ্য সম্পর্কে উষ্মা প্রকাশ ক'রে সেকালের কোন এক সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক বিবেকানন্দকে সারদানন্দের কাছে গদ্য লেখা শিখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

বাংলা গদ্যের মধ্যে যে কতখানি গতিশীলতা থাকতে পারে, বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে যেন তারই পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন।

কিছুটা দীর্ঘ হলেও সুয়েজখালে হাঙ্গর-শিকারের বর্ণনার এক অংশ ঐ গদ্যের নিদর্শন হিসাবে উদ্ধার করা যেতে পারে।

"এবার সব—চুপ—নোড়ো চোড়ো না, আর দেখ—তাড়াতাড়ি ক'রো না। মোদ্দা—কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ, বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরছে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখছে! দেখুক। চুপ চুপ এইবার চিৎ হ'ল—ঐ যে আড়ে গিলছে; চুপ—গিলতে দাও। তখন 'থ্যাবড়া' অবসরক্রমে, আড় হয়ে, টোপ উদরস্থ ক'রে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়ল টান! বিস্মিত 'থ্যাবড়া' মুখ ঝেড়ে চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উলটো উৎপত্তি!! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর ওপারে ছেলে, বুড়ো, জোয়ান, দে টান—কাছি ধ'রে দে টান। ঐ হাঙ্গরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠল—টান্ ভাই টান্। ঐ যে প্রায় আধখানা হাঙ্গর জলের ওপর! বাপ্, কি মুখ! ওটা যে সবটাই মুখ আর গলা হে! টান্ ঐ সবটা জল ছাড়িয়েছে। ঐ যে বঁড়শিটা বিঁধেছে—ঠোঁট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়—টান্। থাম্ থাম্—ও আরব পুলিস-মাঝি, ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও তো—নইলে এত বড়ো জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও ল্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙে যায়। আবার টান্—কি ভারি হে? ও মা, ও কি? তাইতো হে, হাঙ্গরের পেটের নীচে দিয়ে ও ঝুলছে কি? ও যে নাড়ি-ভুঁড়ি। নিজের ভারে নিজের নাড়ি-ভুঁড়ি বেরুল যে! যাক্, ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক, বোঝা কমুক; টান্ ভাই টান্। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে! আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না। টান্—এই এল। এইবার জাহাজের ওপর ফেলো; ভাই হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার—আর ঐ ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি ছাড়—ধুপ!—বাবা কি হাঙ্গর! কি ধপাৎ করেই জাহাজের উপর প'ড়ল! সাবধানের মার নেই—ঐ কড়িকাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মারো। ও হে ফৌজিম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কাজ। 'বটে তো।' রক্তমাখা গায়-কাপড়ে ফৌজী যাত্রী কড়িকাঠ উঠিয়ে দুম্ দুম্ দিতে লাগল হাঙ্গরের মাথায়, আর মেয়েরা 'আহা কি নিষ্ঠুর! মেরো না' ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগলো—অথচ দেখতেও ছাড়বে না। তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এখানেই বিরাম হোক। কেমন ক'রে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হ'ল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগলো, কেমন সে হাঙ্গর ছিন্ন-অন্ত্র ভিন্ন-দেহ ছিন্ন-হৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগলো, নড়তে লাগলো; কেমন ক'রে তার পেট থেকে অস্থি, চর্ম, মাংস, কাঠ-কুটরো একরাশ বেরুলো—সে সব কথা থাক। এই পর্যন্ত যে, সেদিন আমার খাওয়াদাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল। সব জিনিসেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হ'তে লাগলো।"

বাংলা গদ্য ভাষার এই সাবলীল সহজ গতির তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের হাতে বাংলা গদ্যভাষা যেন আপন সুপ্ত শক্তি ফিরে পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের প্রয়োজনে যে গদ্যকে অবলম্বন করেছিলেন, বিবেকানন্দের হাতে পূর্বেই তা পরিণতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের রচনা 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' বা 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি'র মধ্যে অবশ্যই গদ্য-ভাষার এই পরিণত বেগময় রূপ ছিল না।

ভাষা সম্পর্কে বিবেকানন্দের বিশিষ্ট চিন্তা ছিল। একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন:

"চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে আর একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন চিন্তা কর, দশ জনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে দিকে ফেরাও সে-দিকে ঘোরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছা কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়—দাঁত পড়ে না।"

কোন্ অঞ্চলের মুখের ভাষাকে গদ্যের বাহন করতে হবে, সে সম্পর্কেও তাঁর নির্দেশ আছে। তিনি এ সমস্যার সমাধান ক'রে বলেছেন:

প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকাতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক থেকেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল ও গতাগতির সুবিধা হবে, যত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হ'তে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতের বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙলা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করবেন।

বিবেকানন্দ যে সাফ ইস্পাতের মতো ভাষার কথা বলেছিলেন, তাঁর নিজের রচনা তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। এই সহজ বেগবান্ গদ্যভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়—কেবল বিনয় সরকারের রচনায় এর কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরী যে চলিত ভাষায় লিখেছিলেন, তার মধ্যে শাণিত ভাব আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে এই গদ্যের স্বচ্ছন্দতা নেই—ঐ গদ্যের প্রতি ছত্র স্মরণ করিয়ে দেয় যে ঐটি শিল্পকৃতের রচনা।

বিবেকানন্দ কেবল চলিত ভাষায় লেখেননি। তিনি সাধু ভাষাতেও লিখেছিলেন। তাঁর 'পরিব্রাজক' আর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' চলিত ভাষায় লেখা। 'ভাববার কথা' গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলির কয়েকটি সাধু ভাষায় লেখা, কয়েকটি চলিত ভাষায় লেখা; 'পত্রাবলী'তে সংকলিত বাংলায় লেখা পত্রগুলির বেশির ভাগই চলিত ভাষায় লেখা, প্রথম দিকের কয়েকটি সাধু ভাষায় লেখা। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থ সাধু ভাষায় লেখা। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তাঁর সাধু গদ্যের কয়েকটি নিদর্শন উদ্ধার করা যেতে পারে।—

ক) সাধুদের সেবা করিয়া কি হইল বলিয়া আপসোস করিয়াছেন। কথা ঠিক বটে, অথচ নহে বটে। Ideal bliss-এর দিকে চাহিতে গেলে এ কথা ঠিক বটে, কিন্তু যে স্থান

ছাড়িয়া আসিয়াছেন, সেদিকে তাকাইলেই দেখিতে পাইবেন—ছিলেন গুরু, হইয়াছেন মানুষ, হইবেন দেবতা এবং ঈশ্বর। পরন্তু ঐ প্রকার 'কি হইল', 'কি হইল' অতি ভাল - উন্নতির আশাস্বরূপ, নহিলে কেহ উপরে উঠিতে পারে না। 'পাগড়ি বেঁধে ভগবান্' যে দেখে, তাহার ঐখানেই খতম। আপনার সর্বদাই যে মনে পড়ে 'কি হইল', আপনি ধন্য নিশ্চিত জানিবেন—আপনার মার নাই।

[পত্রাবলী]

(খ) এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড —দুই ভাগে বিভক্ত। কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফল মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে বলিয়া দেশকাল-পাত্রাদি-নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতিনীতি ও এই কর্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবে। লোকাচারসকলও সৎশাস্ত্র এবং সদাচারের অবিসংবাদী বলিয়া গৃহীত হইবে। সৎশাস্ত্র-বিগর্হিত ও সদাচার-বিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হওয়াই আর্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ। [ভাববার কথা]

(গ) বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান্, দেবগণ তাঁহার মন্ত্রবলে আহূত হইয়া পান-ভোজন গ্রহণ করেন ও যজমানকে অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। ইহলৌকিক মঙ্গলের কামনায় প্রজাবর্গ, রাজন্যবর্গও তাঁহার দ্বারস্থ। রাজা সোম পুরোহিতের উপাস্য, বরদ ও মন্ত্র-পুষ্ট; আহুতি-গ্রহণেপ্সু দেবগণ কাজেই পুরোহিতের উপর সদয়; দৈব বলের উপর মানব-বল কি করিতে পারে? মানব-বলের কেন্দ্রীভূত রাজাও পুরোহিতবর্গের অনুগ্রহ-প্রার্থী। তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টিই যথেষ্ট সাহায্য; তাঁহাদের আশীর্বাদ সর্বশ্রেষ্ঠ কর; কখন বিভীষিকা-সংকুল আদেশ, কখন সহৃদয় মন্ত্রণা, কখন কৌশলময় নীতিজাল বিস্তার রাজশক্তিকে অনেক সময়েই পুরোহিতকুলের নির্দেশবর্তী করিয়াছে। সকলের উপর ভয়—পিতৃ-পুরুষদিগের নাম, নিজের যশোলিপি পুরোহিতের লেখনীর অধীন। মহাতেজস্বী, জীবদ্দশায় অতি কীর্তিমান্, প্রজাকুলের পিতৃ-মাতৃস্থানীয় হউক না কেন, মহাসমুদ্রে শিশির-বিন্দুপাতের ন্যায় কাল-সমুদ্রে তাঁহার যশঃসূর্য চিরদিন অস্তমিত; কেবল মহাসত্রানুষ্ঠায়ী, অশ্ব-মেধযাজী, বর্ষার বারিদের ন্যায় পুরোহিতগণের উপর অজস্র-ধন-বর্ষণকারী রাজগণের নামই পুরোহিত-প্রসাদে জাজ্বল্যমান। দেবগণের প্রিয়, প্রিয়দর্শী ধর্মাশোক ব্রাহ্মণ্য-জগতে নাম-মাত্র শেষ; পারীক্ষিত জনমেজয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চিরপরিচিত।

[বর্তমান ভারত]

উদ্ধৃতি-তিনটির রচনাভঙ্গির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। 'পত্রাবলী'র উদ্ধৃতিটির মধ্যে সহজ ও স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আছে—এর মধ্যে প্রসাদগুণ ফুটে উঠেছে। কিন্তু পরবর্তী দুটি উদ্ধৃতির মধ্যে ওজোগুণই প্রাধান্য লাভ করেছে। 'বর্তমান ভারত' থেকে উদ্ধৃতিটি গাঢ়বদ্ধ। সংস্কৃত গদ্যের ঘননিবদ্ধ রূপটি এখানে সুপরিস্ফুট।

চলিত ভাষা বা সাধু ভাষা সব ক্ষেত্রেই বিবেকানন্দের গদ্যরচনার মধ্যে বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজীতে যাকে স্টাইল বলে, রচনার সেই বিশেষ গুণটি তাঁর রচনার মধ্যে ফুটে উঠেছে। তাঁর চরিত্রের মধ্যে যে প্রবল ব্যক্তিত্ব যে বলিষ্ঠ স্বকীয়তা ছিল, তাঁর প্রকৃতির মধ্যে যে সুগম্ভীর ঔদার্য ছিল, তা তাঁর রচনাবলীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর রচনার মধ্যে যে গতিশীলতা আছে, তার মধ্যে

তাঁর অন্তরের গতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের রচনার স্টাইলের মধ্য থেকে মানুষ বিবেকানন্দের পরিচয় সহজেই পাওয়া যেতে পারে।

বিবেকানন্দ সাহিত্যব্রতী বা সাহিত্যজীবী ছিলেন না। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করা তাঁর অভীষ্ট ছিল না। তিনি প্রধানতঃ দুটি কারণে বাংলা গদ্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন—'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য বিষয়বস্তু যোগান দেওয়া আর রামকৃষ্ণের আদর্শে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা।

সাহিত্য-স্থষ্টির অভিপ্রায় না থাকলেও বিবেকানন্দের রচনাবলীর মধ্যে তাঁর যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তা প্রধানতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে নিয়োজিত হ'লে তাঁকে সাহিত্যকার-রূপেও নিরতিশয় ভাস্বর ক'রে তুলত—সন্দেহ নেই। তাঁর 'সাফ ইস্পাতের মতো' ভাষা আর স্টাইলের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষার উপর তাঁর সহজাত অধিকার ছিল। অবশ্য মৌলিক চিন্তার প্রতিফলনই তাঁর রচনার সবচেয়ে বড় গুণ। তাঁর বলিষ্ঠ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যে-কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের কাম্য বস্তু। তিনি অবলীলাক্রমে যে-কোন দুরূহ বিষয় নিয়ে বিচার ক'রে তাঁর নিজস্ব মত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যথার্থ প্রতিভা থাকায় তাঁকে পূর্ব-সুরীদের মতবিশেষের চর্বিতচর্বণ করতে হয়নি; তাঁর রচনাবলী তাঁর বিশিষ্ট স্টাইলের দ্যুতিতে উজ্জ্বল, তেমনই মনস্বিতায় সমৃদ্ধ। তাঁর রচনাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্ সন্দেহ নেই।

বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের স্থান নির্দেশ করতে হ'লে তাঁর রচনার প্রভাব অপর কয়জন লেখকের উপর পড়েছে, সে বিচার করবার প্রয়োজন নেই। এই বীর সন্ন্যাসীর রচনাবলী লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেনি, মানুষের সমগ্র চিত্তবৃত্তির বিকাশের সুমহৎ দায়িত্ব-পালনেই বিবেকানন্দের রচনাবলীর সবচেয়ে বেশি মূল্য।

বিবেকানন্দের বাংলা গ্রন্থ চারটি—(১) ভাববার কথা, (২) পরিব্রাজক, (৩) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, (৪) বর্তমান ভারত। এ ছাড়া 'পত্রাবলী'তে সংকলিত তাঁর অজস্র পত্রও বিশেষ মূল্যবান্। 'বীরবাণী' নামে একটি গ্রন্থে তাঁর কয়েকটি সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী কবিতা সংকলিত হয়েছে।

(১) ভাববার কথা

'ভাববার কথা' বিভিন্ন কালে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। এতে সাতটি প্রবন্ধ আছে—'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি', 'বর্তমান সমস্যা', 'বাঙ্গালা ভাষা', 'জ্ঞানার্জন', 'ভাববার কথা', 'পারি প্রদর্শনী'। এ ছাড়া 'ঈশা-অনুসরণ' নামে একটি অসমাপ্ত অনুবাদ আর 'শিবের ভূত' নামে একটি অসমাপ্ত গল্প আছে।

'হিন্দু-ধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে প্রবন্ধটি ১৩০৪ সালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসবের সময় 'হিন্দুধর্ম কি?' -নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। বিবেকানন্দ এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে বেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। বেদের কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ বেদান্তকেই তিনি হিন্দুধর্মের ভিত্তি বলেছেন। তাঁর মতে 'সৎশাস্ত্র-বিগর্হিত ও সদাচার-বিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হওয়াই আর্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।'—'কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোক-সমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপ

আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।' তিনি পরমহংসদেবকে অবতাররূপে কল্পনা করেছেন, অবশ্য এজন্য যুক্তিজাল বিস্তার করেননি, ধর্মের গ্লানি দূর করার জন্য ভগবান্ আবির্ভূত হন, এই কথা বলেছেন মাত্র। তিনি ভারতের নবীন অভ্যুদয় কল্পনা ক'রে বলেছেন :

'এই নবোত্থানে নববলে বলীয়ান্ মানব-সন্তান বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টীকৃত করিয়া ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে ; ইহার প্রথম নিদর্শন-স্বরূপ শ্রীভগবান্ পরমকারুণিক, সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাবসমন্বিত, সর্ববিদ্যাসহায় যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।'

'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' অধ্যাপক ম্যাক্স-মূলার-লিখিত 'Ramakrishna : His life and sayings' (১৮৯৮) গ্রন্থের আলোচনা। প্রবন্ধটির প্রথম দিকে বিবেকানন্দ ম্যাক্সমূলারের প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ও ঐ সম্পর্কে গবেষণার প্রশংসা করেছেন। সমালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি ভারতের ধর্মমত-প্রসঙ্গে ম্যাক্সমূলারের অভিমতের উল্লেখ ক'রে রামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ-সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি অধ্যাপকের কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধার ক'রে রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে এদেশে উত্থাপিত কয়েকটি অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন।

'বর্তমান সমস্যা'—উদ্বোধনের প্রস্তাবনা-রূপেই লিখিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে বিবেকানন্দ প্রথমে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-সম্পর্কে মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'রে ভারতের গৌরবময় অতীতের কথা বলেছেন। এরপর তিনি গ্রীক সভ্যতার প্রশংসা ক'রে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার মিলনের ফলে ইওরোপীয় সভ্যতার সমৃদ্ধির উল্লেখ করেছেন। বিবেকানন্দ অনুভব করেছেন, 'আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলন-কাল উপস্থিত। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।' ভারতীয় ও ইওরোপীয় বা গ্রীক সভ্যতার প্রকৃতি-সম্পর্কে তাঁর অভিমত উদ্ধারযোগ্য।

"ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান ; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা ; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ', একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী ; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত ; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ ; একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।"

এই দুই সভ্যতার মিলনে মহৎ অভ্যুদয় সম্ভবপর। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার তরঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। বিবেকানন্দ ঐ আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষের ফলে আমাদের জীবনে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, সেগুলির সমাধানের জন্য 'উদ্বোধন' প্রয়াসী হবে, এই তাঁর বক্তব্য।

'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধে বিবেকানন্দ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুর প্রয়োজন-সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। জ্ঞানার্জন-সম্পর্কে তিনি তিনটি মতের পরিচয় দিয়েছেন—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন

গুরুর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করা যায়; বৈদান্তিকের মতে 'জ্ঞান মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধন—আত্মার প্রকৃতি', কেবল জ্ঞানের বিকাশের জন্য সদাচার প্রয়োজন; আধুনিক যুগে শিক্ষার মূলে দেশকালের প্রভাবই স্বীকৃত। বিবেকানন্দ এই তিনটি মতের আলোচনা ক'রে এগুলির যে-কোন একটি যে সম্পূর্ণ নয়, সে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুর স্থান ও প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেছেন। পরিশেষে তিনি বলেছেন :

'মহাপুরুষত্ব, ঋষিত্ব, অবতারত্ব বা লৌকিক বিদ্যায় মহাবীরত্ব সর্বজীবের মধ্যে আছে, উপযুক্ত গবেষণা ও কালাদি সহায়ে তাহা প্রকাশিত হয়। যে সমাজে ঐ প্রকার বীরগণের একপ্রকার প্রাদুর্ভাব হইয়া গিয়াছে, সেথায় পুনর্বার মনীষিগণের অভ্যুত্থান অধিক সম্ভব। গুরুসহায় সমাজ অধিকতর বেগে অগ্রসর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু গুরুহীন সমাজে কালে গুরুর উদয় ও জ্ঞানের বেগপ্রাপ্তি তেমনই নিশ্চিত।'

'পারি প্রদর্শনী' ১৯০০ খৃঃ পারিতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর বিশদ বিবরণ বা বর্ণনা নয়। বিবেকানন্দ প্রথম দু-তিনটি অনুচ্ছেদে প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত ধর্মেতিহাস-সভার উদ্দেশ্য বলেছেন। এর পর তিনি তাঁর নিজের দেওয়া দুটি বক্তৃতার সারাংশ দিয়েছেন। প্রথম বক্তৃতায় তিনি 'শালগ্রাম ও শিবলিঙ্গ—উভয়ই লিঙ্গ-যোনি পূজার অঙ্গ' জনৈক জার্মান পণ্ডিতের এই মত খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন যে, অথর্ববেদ সংহিতার যূপস্তম্ভের প্রসিদ্ধ স্তোত্র থেকে শিব-লিঙ্গ-পূজার উৎপত্তি হয়েছে, তিনি এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধ স্তূপ-পূজার উল্লেখ ক'রে বলেন :

'বৌদ্ধ স্তূপের অপর নাম ধাতুগর্ভ। যূপ-মধ্যস্থ শিলাকরণ্ড মধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ভস্মাদি রক্ষিত হইত। তৎসঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতুও প্রোথিত হইত। শালগ্রাম শিলা উক্ত অস্থিভস্মাদি-রক্ষণ-শিলার প্রাকৃতিক প্রতিরূপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধ-পূজিত হইয়া বৌদ্ধমতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।'

অপর বক্তৃতার বিষয়-বস্তু—ভারতীয় ধর্ম-মতের বিস্তার। বিবেকানন্দ বলেন যে, বেদ থেকে ভারতের সমস্ত ধর্মমতের উৎপত্তি। এর পর তিনি ভারত-সংস্কৃতির উপর গ্রীক প্রভাব সম্পর্কে প্রচলিত মতটি বিচার ক'রে ঐ মতের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। পরিশেষে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী গীতা ও তার আধার মহাভারতের উৎকর্ষের কথা বলেন। পাশ্চাত্য সমাজে মহাভারতের উপযুক্ত আলোচনা হয়নি।

বিবেকানন্দ 'শিবের ভূত' নামে একটি গল্পের পত্তন করেছিলেন। গল্পটির মোট তিনটি অনুচ্ছেদ লেখা হয়েছিল। শেষ অনুচ্ছেদে পারি প্রদর্শনীর উল্লেখ আছে। গল্পটি সমাপ্ত হ'লে কথাসাহিত্যে বিবেকানন্দের প্রতিভার একটি নিদর্শন পাওয়া যেত।

'বাঙালা ভাষা' প্রবন্ধটি 'উদ্বোধন' সম্পাদক-কে লেখা পত্রের একাংশ। বিবেকানন্দ সংস্কৃতের অনুসারী বা সাধুভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষায় লেখার পক্ষপাতী। তিনি চলিত ভাষাকেই স্বাভাবিক, শক্তিশালী, ভাবময় আর প্রাণময় ব'লে নির্দেশ করেছেন—কলকাতার ভাষাই তাঁর আদর্শ, কারণ কলকাতার ভাষাই সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করছে। সাফ ইস্পাতের মতো স্বচ্ছন্দ অথচ শক্তিগর্ভ ভাষাই তাঁর লক্ষ্য।

'ভাববার কথা' স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র

কয়েকটি অনুচ্ছেদের সমষ্টি। এগুলি নূতন ধরনের রচনা। এগুলির মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ তীব্রভাবে ধর্মের নামে অনাচার বা তামসিকতাকে কশাঘাত করেছেন। এই ছোট ছোট রচনাগুলির মধ্যে বিবেকানন্দের গভীর ধর্মদৃষ্টি ও সমাজদৃষ্টির পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। এগুলির রচনাভঙ্গিও প্রাণবন্ত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধার করা হ'ল :

"সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত। আর সেথা নাই বা কি? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম হ'তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সুয্যিমামা, ইঁদুর-চড়া গণেশ, আর কুচোদেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি—নাই কি? আর বেদ-বেদান্ত দর্শন পুরাণ তন্ত্রে তো ঢের মাল আছে, যার এক একটা কথায় ভব-বন্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটি লোক সে দিকে দৌড়েছে। আমারও কৌতূহল হ'ল আমিও ছুটলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশমুণ্ডু, একশত হাত, দু-শ পেট, পাঁচ-শ ঠ্যাঙওয়ালা মূর্তি খাড়া; সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভিতরে যে সকল ঠাকুর দেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুঁড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই—যিনি দ্বারদেশে; আর ঐ যে বেদ-বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ—শাস্ত্রসকল দেখছ, ও মধ্যে মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে হবে এঁর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলুম—তবে এ দেবদেবের নাম কি? উত্তর এল—এঁর নাম 'লোকাচার।' আমার লক্ষ্ণৌ-এর ঠাকুর-সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল: 'ভল্ বাবা লোকাচার, অস্‌মারো' ইত্যাদি।"

'ঈশা-অনুসরণ' টমাস আ কেম্পিস-রচিত' 'Imitation of Christ'-এর ছটি পরিচ্ছেদের অনুবাদ—বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ গ্রন্থটির অনুবাদ করবার সময় পাননি। এই প্রবন্ধের 'সূচনা'য় তিনি বলেছেন:

'খ্রীষ্টের অনুসরণ' নামক এই পুস্তক সমগ্র খ্রীষ্ট জগতের অতি আদরের ধন। এই মহাপুস্তক কোন 'রোম্যান কাথলিক' সন্ন্যাসীর লিখিত—লিখিত বলিলে ভুল হয়, ইহার প্রত্যেক অক্ষর উক্ত ঈশাপ্রেমে সর্বত্যাগী মহাত্মার হৃদয়ের শোণিত-বিন্দুতে মুদ্রিত।

বিবেকানন্দ গ্রন্থটির কেবল অনুবাদই করেন-নি, অনুবাদের সঙ্গে পাদটীকা সংযোগ করেছেন। পাদটীকায় বাইবেলের উক্তি বা ঘটনার উল্লেখ বা ব্যাখ্যা আছে। পাদটীকায় গীতা, বিবেকচূড়ামণি, মণিরত্নমালা, মহাভারত, উপনিষদ্, মনুসংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অনুরূপ শ্লোক-উদ্ধার বিশেষ মূল্যবান্ ও তাৎপর্য পূর্ণ সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ ধর্মানুরাগীর চিন্তার সার্বভৌমত্ব দেখানো বিবেকানন্দের অভিপ্রেত ছিল।

(২) পরিব্রাজক

'পরিব্রাজক' বিবেকানন্দের অখণ্ড বিষয় নিয়ে লেখা প্রথম গ্রন্থ—অবশ্য প্রথমে এটি টুকরো টুকরো ক'রে 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্যে লেখা হয়েছিল। এটি ভ্রমণ-কাহিনী। ১৮৯৯ খৃঃ ২০শে জুন তারিখে বিবেকানন্দ কলকাতা থেকে গোলকোণ্ডা জাহাজে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যাত্রা করেন। এই সময় 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদক ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী পত্র বা

ডায়েরির আকারে লেখেন। ঐ রচনা প্রথমে 'বিলাতযাত্রীর পত্র' নামে উদ্বোধন-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; শেষের দিকের কিছু অংশের নাম ছিল 'পরিব্রাজক'। পরে সারদানন্দ এই রচনাগুলি একত্র ক'রে 'পরিব্রাজক' নামে প্রকাশ করেন।

'পরিব্রাজক' গ্রন্থের প্রথম থেকেই যে বিষয়টি আমাদের আকর্ষণ করে, সেটি এর অন্তরঙ্গ রচনাভঙ্গি। এই ধরনের রচনাভঙ্গি সে সময়ে প্রায় অভাবিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ডযাত্রা বা ইংলণ্ডে অবস্থিতির বর্ণনা ছাড়া অন্যত্র এই ধরনের রচনা সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয়নি। তবে রবীন্দ্রনাথের ঐ রচনা সরস হলেও তার মধ্যে এতটা গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল না—বিষয়বস্তুর গভীরতা তো নয়ই। অন্তরঙ্গ রচনাভঙ্গির দৃষ্টান্ত-হিসাবে আরম্ভের কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করা যেতে পারে:

"স্বামীজী! ওঁ নমো নারায়ণায়—'মো'-কারটা হৃষীকেশী ঢঙের উদাত্ত ক'রে নিও ভায়া। আজ সাত দিন হ'ল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্চে না হচ্চে, খবরটা লিখব মনে করি, খাতাপত্র কাগজ-কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু—ঐ বাঙালী 'কিন্তু' বড়ই গোল বাধায়। একের নম্বর—কুঁড়েমি। ডায়েরি, না কি তোমরা বলো, রোজ লিখবো মনে করি, তারপর নানা কাজে সেটা অনন্ত'কাল' নামক সময়েতেই থাকে; এক পা-ও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ ক'রে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তো, মনে ক'রো যে, মহাবীরের মতো বার তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না—রাম হৃদয়ে ব'লে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্চে এই যে, সেটা বুদ্ধির দোষ এবং কুঁড়েমি। কি উৎপাত! 'ক সূর্যপ্রভবো বংশঃ'—থুড়ি হ'ল না 'ক সূর্যপ্রভববংশচূড়ামণিরামৈকশরণো বানরেন্দ্রঃ' আর কোথা আমি দীন—অতিদীন। তবে তিনিও শত যোজন সমুদ্র পার এক লাফে হয়েছিলেন, আর আমরা কাঠের বাড়ীর মধ্যে বন্ধ হ'য়ে, ওছল পাছল ক'রে, খোঁটাখুঁটি ধরে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্চি। একটা বাহাদুরি আছে—তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষসরাক্ষসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস-রাক্ষুসীর দলের সঙ্গে যাচ্চি! খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি আর শত কাঁটার ঠকঠকানি দেখে শুনে 'তু'-ভায়ার তো আক্কেল গুড়ুম! ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাঁচ ক'রে ছুরিখানি তাঁরই গায়ে বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছে কি না!"

'পরিব্রাজক' গ্রন্থটিকে মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—প্রথম ভাগে সমুদ্রযাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে ইওরোপ-ভ্রমণ। অবশ্য বিবেকানন্দ কেবল ভ্রমণের কাহিনীই রচনা করেননি, ভ্রমণকালে তাঁর অন্তরে যে-সব চিন্তা উঠেছে, তাই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে সারদানন্দের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। গ্রন্থ-প্রকাশকালে তিনি বলেছেন:

তাঁহার ভ্রমণ উদ্দেশ্যবিহীন নহে। কিসে ভারতের বর্তমান অমানিশার অবসান হইয়া পূর্বগৌরব পুনরায় উজ্জ্বলতর বর্ণে উদ্ভাসিত হইবে—এই চিন্তা ও চেষ্টাই তাঁহার প্রতি পদক্ষেপের মূলে। আবার ভারতের দুর্দশা কোথা হইতে আসিল, কোন্ শক্তিবলে উহা অপগত হইবে, কোথায়ই বা সে সুপ্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে

এবং উহার উদ্বোধন ও প্রয়োগের উপকরণই বা কি,—এ সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াই যে তাঁহাকে ক্ষান্ত দেখিবে, তাহা নহে ;—কিন্তু বদ্ধপরিকর যতি স্বদেশে বিদেশে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মীমাংসিত বিষয়-সকলের সত্যতাও যথাসম্ভব প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহার নিদর্শনও প্রাপ্ত হইবে।

প্রকৃতপক্ষে ভ্রমণবৃত্তান্তের চেয়ে প্রাসঙ্গিক বর্ণনা, আলোচনা বা মন্তব্যই মূল্যবান্। অবকাশ পেলেই বিবেকানন্দ কোন বিষয় তাঁর সহজাত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং ভারতের ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োগের কথাও অনেক সময় চিন্তা করেছেন।

'ভূমিকা'র পরই তিনি গঙ্গার শোভা আর বাংলার রূপ বর্ণনা করেছেন। গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর একটি মন্তব্য স্মরণীয় :

'গীতা গঙ্গা হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেল বারে আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি! বাগে পেলেই এক-আধ বিন্দু পান করতাম। পান করলেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে সে কোটি কোটি মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুত পদসঞ্চারের মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত!'

গঙ্গার শোভা ও বাংলার রূপ সম্পর্কে একটি বর্ণনা প্রবন্ধের প্রথমে উদ্ধার করা হয়েছে। ঐ বর্ণনার পর তিনি গঙ্গার তীরে কলকারখানা হয়ে সৌন্দর্যহানি ঘটাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। বঙ্গোপসাগরের সৌন্দর্য বর্ণনা ক'রে তিনি গঙ্গার বর্তমান পথের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। মধ্যে সমুদ্রপীড়ার প্রসঙ্গে কৌতুক-গল্পের অবতারণাও করেছেন।

জাহাজের বর্ণনা কিছুটা বিস্তৃত—এর মধ্যে বিবেকানন্দ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি আদিম কালের যন্ত্র থেকে আধুনিক যুগের যান্ত্রিকতার বিকাশের ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, সেই সঙ্গে যান্ত্রিকতার কুফলও উল্লেখ করেছেন। 'জড়ের মতো একঘেয়ে কাজ করতে করতে জড়বৎ হয়ে যায়'—এই তাঁর সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গক্রমে তিনি কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি শ্বেতাঙ্গের অবজ্ঞার আলোচনাও করেছেন। আর্যামির বড়াই উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশের এক শ্রেণীর শিক্ষিত সমাজে প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই মনোবৃত্তির প্রতি কটাক্ষ ক'রে বিবেকানন্দ বলেছেন :

এখন সকল জাতির মুখে শুনছি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য! তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে,—কেউ চার পো আর্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা! তবে সকলেই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে একবাক্য! আর শুনি, ওঁরা আর ইংরেজেরা নাকি একজাত, মাসতুতো ভাই; ওঁরা কালা আদমী নন। এদেশে দয়া ক'রে এসেছেন, ইংরেজের মতো। আর বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্তিপূজা, সতীদাহ, জেনানা পরদা ইত্যাদি ইত্যাদি—ও-সব ওঁদের ধর্মে আদৌ নেই। ও-সব কায়েত-ফায়েতের বাপ-দাদা করেছে। আর ওঁদের ধর্মটা ইংরেজদের ধর্মের মতো। ওঁদের বাপ-দাদা ঠিকই ইংরেজের মতো ছিল; কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কালো হয়ে গেল।

জাহাজের দেশী মাল্লাদের প্রশংসা ক'রে বিবেকানন্দ ভারতের শ্রমজীবীদের প্রশস্তি গেয়েছেন। ভারতের শ্রমজীবীদেরই তিনি দেশের কাঠামো, দেশের ভবিষ্যৎ বলেছেন। উচ্চ বর্ণের লোকেদের 'দশ হাজার বছরের মমি', 'এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা,

আসল মরুমরীচিকা', 'ভূত-ভারতশরীরের রক্ত-মাংসহীন কঙ্কালকুল' ব'লে তিরস্কার ক'রে তিনি শ্রমজীবীদের মধ্য থেকে নূতন ভারতের অভ্যুদয়-সম্পর্কে যে-কথা বলেছেন, তা তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক বিশেষ স্মরণীয় উক্তি সন্দেহ নেই। তিনি বলেছেন:

তোমরা শূন্যে বিলীন হও আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি খেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ ক'রে খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। তোমার ঐ রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পারো ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি-জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য-কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি—'ওয়াহ্‌ গুরু কি ফতে।'

বিবেকানন্দের জাহাজ মাদ্রাজ আর সিংহলের কলম্বো বন্দরে লেগেছিল। বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি দক্ষিণ ভারতের সভ্যতা আর সিংহলের সভ্যতা-সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। দক্ষিণ ভারতের নিরতিশয় আচার-নিষ্ঠা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি সিংহলের বৌদ্ধদের তথাকথিত অহিংসা নিয়ে কৌতুক করেছেন।

এডেন আর লোহিত-সাগরের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ আরবের সভ্যতা-সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। এই অংশে তিনি মধ্য-যুগের খ্রীষ্টান ধর্মের গোঁড়ামির নিন্দা করেছেন। সুয়েজখালে হাঙ্গর-শিকারের বর্ণনা আকর্ষণীয়। তিনি সুয়েজখালের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 'ভারতের চিরপদদলিত শ্রম-জীবী'র 'অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা'র কথা স্মরণ ক'রে তাদের প্রণাম জানিয়েছেন।

ভূমধ্যসাগরে এসে বিবেকানন্দ প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের কথা স্মরণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সভ্যতার ইতিহাস আর ঐতিহাসিক সত্য-নির্ধারণের উপায় সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তা বিশেষ মূল্যবান্। তিনি নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে মানবের জাতিভেদের কথাও বলেছেন। তিনি প্রাচীন মিসর আর য়াহুদী (ইহুদী)-দের ইতিহাস সংক্ষেপে হলেও যে-ভাবে আলোচনা করেছেন, তা উল্লেখ-যোগ্য।

এতক্ষণ সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা; ইওরোপের বর্ণনা গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায় বলা যেতে পারে। বিবেকানন্দ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বর্ণনা করেছেন, বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন, ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক বৃত্তান্ত-সম্পর্কেও সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

স্বামী বিবেকানন্দ-স্মারক গ্রন্থ—প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ২৮০+৬০ ; মূল্য ৫৲।

আলোচ্য স্মারক গ্রন্থে প্রথম পর্বে ৩২টি এবং দ্বিতীয় পর্বে ১২টি রচনা দ্বারা স্বামীজীর সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিবার প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে। সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষাচিন্তার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে মানুষ বিবেকানন্দ, সংস্কারক বিবেকানন্দ, সাধক ও প্রচারক বিবেকানন্দ, সর্বোপরি আত্মজ্ঞান-দীপ্ত বিশ্ব-প্রেমিক বিবেকানন্দের অনুধ্যান করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ ও কবিতা সুনির্বাচিত। স্বামীজীর অনেকগুলি চিত্র গ্রন্থটির শোভা বর্ধন করিয়াছে। এই স্মারক গ্রন্থখানি গ্রন্থাগারের অলঙ্কাররূপে সমাদৃত হইবার যোগ্য।

Comparative Studies in Philosophy—শ্রীঅনাদিকুমার লাহিড়ী, ৯।১।১ আরপুলি লেন, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯৫ ; মূল্য ৫৲।

আলোচ্য পুস্তক লেখকের মূলগ্রন্থের প্রথম ।। এই খণ্ডে প্রাচ্যের চার্বাক দর্শন, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন, সাংখ্য-দর্শন, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, সুফীবাদ প্রভৃতি চিন্তাধারার সহিত প্রতীচ্যের হিউম, লাইবনিৎস্, বার্গসঁ, কাণ্ট্, স্পিনোজা, রয়েস্ প্রমুখ দার্শনিকগণের চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা সংক্ষেপে করা হয়েছে। এই পুস্তক তুলনামূলক আলোচনায় উৎসাহী পাঠকবর্গের বিশেষ সহায় হবে ব'লে মনে হয়। যদিও সাধারণ দর্শনের ছাত্রদেরও প্রতি লক্ষ্য রেখে এই পুস্তক রচিত হয়েছে, তথাপি প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের সহজপাঠ্য হবে ব'লে মনে হয় না।

আজকের বিশ্বে যখন সকল বৈষয়িক সমস্যা সমাধানের উপায় 'একবিশ্ব-একরাষ্ট্র'-গঠনে, তখন নানাদেশের ও নানাকালের বিভিন্ন চিন্তা-ধারার আপাতঃ বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত মৌল ঐক্যের অনুসন্ধান নিঃসন্দেহে অভিনন্দন-যোগ্য। তবে সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস কোন কোন ক্ষেত্রে কঠিনতর হয়ে বড় বেশী সংক্ষেপণের বাঁধনে আলোচ্য বিষয়কে সীমিত করেছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে আলোচনার উৎসের সন্ধান দিলে পাঠকগণের বিশেষ উপকার হ'ত ব'লে মনে হয়। পরিকল্পনার প্রসার আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার রূপায়ণে যথা-যোগ্য প্রচেষ্টার অভাব আছে ব'লে অনেকে অনুযোগ করতে পারেন। সাধারণ পাঠকবর্গ এবং ছাত্র-সাধারণকে স্মরণ রেখে লেখক তাঁর রচনাবিন্যাসে ব্রতী হয়েছেন বলেই বোধ হয়, তিনি বিশেষ গভীর ভাবে সব সমস্যার আলোচনায় প্রয়াসী হননি। 'সুফীবাদ ও মিস্টিসিজ্ম্' এবং 'হিন্দু দর্শন ও ঐস্লামিক দর্শন' শীর্ষক আলোচনায় নব্যভারতের শ্রেষ্ঠ মরমীয় সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার তাৎপর্যের উল্লেখ না থাকায় আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'এখানকার অনুভব সকল বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।' আশা করি পরবর্তী খণ্ডে লেখক এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করবেন। এ-ছাড়া আজকের ভারতীয় দর্শন আলোচনায় শ্রীঅরবিন্দের দর্শন স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডারের চিন্তার সঙ্গে

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা শ্রীলাহিড়ীর মতো গবেষকের কাছে আমরা আশা করতে পারি। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে উপরি-উক্ত অভাবগুলি পূরণ করা হবে। তবে এ-ক্ষেত্রে এও স্বীকার ক'রব যে, এই পুস্তকের 'চার্বাক ও হিউম', 'সাংখ্য ও কাণ্ট্' এবং 'শঙ্কর ও স্পিনোজা'—এই তিনটি অধ্যায় জ্ঞান-চিন্তার গভীরতা ও প্রসারের জন্য এবং স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীর মৌল-স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে অবশ্যই প্রশংসনীয়। এক-কথায় এই পুস্তকে লেখক প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শনে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং পাঠকসাধারণের একটি দীর্ঘ অভাব পূরণ করেছেন। জ্ঞান ও বোধের সুষ্ঠু সমন্বয়ে সমৃদ্ধ এই পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

—ধনঞ্জয়কুমার নাথ

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীবিজয়কুমার সিংহ, ৫৪ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১৬৭; মূল্য ৩৲।

স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টায় শত শত পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। স্বামী সোমেশ্বরানন্দের 'স্বামী বিবেকানন্দ' পুস্তকখানিও এই উপলক্ষে প্রকাশিত। অল্পাধিক দেড়শত পৃষ্ঠার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, বাণী, কর্ম, ধর্ম, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, প্রচার-পরিভ্রমণ—মোট কথা ঐ মহাজীবনকে সংক্ষেপে সম্পূর্ণ ক'রে তোলা হয়েছে। রচনাভঙ্গি ও ভাষার চমকে পাঠককে মুগ্ধ করার বৃথা চেষ্টা নেই। পাঠকের ধৈর্যচ্যুতিরও ভয় নেই। রচনা সাবলীল অথচ বিষয়বস্তুর উপযুক্ত। পুস্তকটির মধ্যে ত্রুটি যা কিছু আছে, তা এর মুদ্রণ-প্রমাদ; অবশ্য সে ত্রুটি লেখকের নয়।

—সুধাংশুশেখর হালদার

Spiritual teachings of Swami Abhedananda –Translated into English by P. Sheshadri Aiyer. Published by Ramakrishna Vedanta Math, 19B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta 6 Pp.55 ; Price Rs. 3/-.

স্বামী অভেদানন্দের জীবন্ত ও উদ্দীপনাময় উপদেশাবলী মানুষের চরম লক্ষ্য—চরম কল্যাণের সন্ধান দেয়।

আলোচ্য পুস্তকখানি অভেদানন্দ মহারাজের বাংলা পত্রসঙ্কলনের ইংরেজী অনুবাদ। অনুবাদে বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট ও যথাযথভাবে রক্ষিত।

গ্রন্থের প্রারম্ভে অভেদানন্দ মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থাবলীর পরিচিতি এবং শেষে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-লিখিত নির্দেশিকা সংযোজিত।

Mira in Brindaban (a play in two acts) Dilip Kumar Roy, Hari Krishna Mandir, Poona 5. Pp. 65 ; Price Re 1/-.

প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক দিলীপকুমার রায়ের ইংরেজী ও বাংলা–উভয় ভাষার রচনাই জনপ্রিয়। 'বৃন্দাবনে মীরা' নামে দুই অঙ্কের নাটিকায় ভক্তির পরাকাষ্ঠা। রাসপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নৃত্যরতা মীরা গোপালের সম্মুখে গান গাহিতে গাহিতে ভাবে সমাধিমগ্না হইতেছেন, পার্শ্বে গুরু শ্রীসনাতন, মন্দিরের পূজারী পুণ্ডরীক এবং আত্মাভিমানী পণ্ডিত অজিত। ইংরেজীতে এই ধরনের নাটিকার প্রাচুর্য নাই, বইটিতে

সুধীবৃন্দ ভক্তিরসের আস্বাদন করিতে পারিবেন।

Vedanta in Practice—Ramgopal Mohatta, 20 Ferozeshah Road, New Delhi. Pp. 152 ; price Rs. 2·50.

আলোচ্য পুস্তকটি মূল হিন্দী হইতে ইংরেজীতে অনূদিত। আমাদের শাস্ত্রে আছে, সকলের ভিতর এক আত্মা আছেন, সুতরাং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া এবং কাহাকেও ঘৃণা না করা শাস্ত্রের আদেশ—এই কথা শুনিয়া লোকে উত্তর দেয়, পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব সমান বটে, কিন্তু ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে পৃথক্। এই ভেদ-দৃষ্টি দূর করিবার চেষ্টা না করাতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত দ্বেষ-হিংসা বর্তমান। সেইজন্য 'কর্ম-জীবনে বেদান্ত' সম্বন্ধে আলোচনা ও পুস্তক-প্রকাশ যত হইবে, ততই জনসাধারণের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আলোচ্য পুস্তকে বিভিন্ন দিক হইতে বিষয়টি আলোচিত—আমরা ইহার বহুল প্রচার আশা করি।

ভারতীয় দর্শন—ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী। প্রকাশক: সংস্কৃতি ভবন, ৩৭এ কলেজ রো, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ২৮৫; মূল্য ৬৲।

ভারতীয় দর্শন বিপুল এবং বিরাট। একখানি গ্রন্থে তাহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। গ্রন্থকার এই দুরূহ কার্যে সফলকাম হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন দর্শনের মূল বক্তব্য চলিত ভাষায় প্রকাশ করিয়া তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

মোট ১১টি অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়গুলি: ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, দর্শন-সম্প্রদায়, দর্শনে যুক্তির স্থান, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মূলগত ঐক্য, বিভিন্ন দর্শন যথা: চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত। পরিশিষ্টে ভগবদ্গীতায় নৈতিক স্বাধীনতার রূপ ও জগতের মিথ্যাত্ব শীর্ষক প্রবন্ধ-দুটি সুলিখিত।

সংস্কৃতে মূলগ্রন্থগুলি পড়িতে না পারিলেও এই গ্রন্থপাঠে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা হইবে।

শ্রদ্ধার্ঘ্য (স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত সঙ্গীতালেখ্য): শ্রীসুধীরকুমার দত্ত। পৃষ্ঠা ১৮। মূল্যের উল্লেখ নাই।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে কয়েকটি গীতি-আলেখ্য রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আলোচ্য পুস্তকটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—সংক্ষেপে বিষয়বস্তু-পরিবেষণে। সঙ্গীতাংশ ও কথকতাংশ উভয়েই নূতনত্ব আছে।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ স্মরণে—শ্রীকরালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: ৬৬বি, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৩৪; মূল্য ১৲।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের সান্নিধ্য ও কৃপা লাভ করিয়া শত শত ব্যক্তি ধন্য হইয়াছেন, তাঁহার সৎপ্রসঙ্গ শুনিয়া বহু অশান্ত চিত্ত শান্ত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে এইরূপ নিঁখুত একটি চিত্র পরিবেশিত হইয়াছে। ভক্তবৃন্দ পুস্তকটি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীম-দর্শন : (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীম-র কথামৃত—দ্বিতীয় ভাগ)—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। প্রকাশক : জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ৩৩৮ ; মূল্য ৫৲।

'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'কার শ্রীম (শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) সাধু ও ভক্তগণের সহিত অবসর সময়ে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন। আলোচ্য পুস্তকের লেখক বহুদিন 'শ্রীম'র সঙ্গ করেন এবং এইসব আলাপ-আলোচনা ডায়েরিতে লিখিয়া রাখিতেন। 'শ্রীম-দর্শন' সেই ডায়েরিরই মুদ্রিত রূপ। ইতিপূর্বে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়া ভক্তবৃন্দের বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে, আশা করি দ্বিতীয় খণ্ডটিও অনুরূপ সমাদৃত হইবে। এই খণ্ডে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও তাঁহাদের অন্তরঙ্গ সন্তানদের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে গীতা উপনিষদ্ ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণের জন্মকুণ্ডলী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান : নব ভারত পাবলিশার্স, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ৬৭ ; মূল্য ১৲।

মহাপুরুষগণের জন্মতারিখ ও সময় সংগ্রহ করা যে কত কঠিন, তাহা যাঁহারা এই দুরূহ কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। সুধী গ্রন্থকার এই কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রচেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে ২৪টি জন্মকুণ্ডলীর বিবরণ ও চিত্র দেওয়া হইয়াছে—এই গুলির ২২টি শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যগণের। জন্মকুণ্ডলী-বিচারে আগ্রহশীল ভক্তগণ পুস্তকখানিতে নূতন অনেক কিছু জানিতে পারিবেন এবং এ-বিষয়ে তাঁহাদের গবেষণারও সুবিধা হইবে। পুস্তকের বিষয়বস্তুর তুলনায় দাম অনেক কম।

পাঞ্চজন্য (বিবেকগীতি)—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। প্রকাশক : স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল, বর্ধমান। পৃষ্ঠা ৪৮ ; মূল্য ৫০ ন. প.।

গ্রন্থকার সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত। স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত 'বিবেকগীতি' সময়োচিত সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি। 'পাঞ্চজন্যে'র মতো ইহা জনসাধারণের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করুক।

বিবেক-রশ্মি—প্রকাশক : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা পৃষ্ঠা ৫৪ ; মূল্য ৫০ ন. প.।

পকেট-সাইজ বইটিতে 'ত্যাগ বৈরাগ্য', 'সেবা ও মুক্তি', 'বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা', 'শিক্ষা ও সমাজ', 'ভারত : পতন ও অভ্যুদয়' প্রভৃতি বিষয়ে স্বামীজীর যুগোপযোগী জীবনপ্রদ বাণীগুলি সর্বদা সঙ্গে রাখিবার যোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বাগেরহাট ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৪ঠা বৈশাখ শ্রীরামকৃষ্ণের বার্ষিক জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, ঊষাকীর্তন, গীতা ও 'কথামৃত' পাঠ, ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক শত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্নে আয়োজিত ধর্মসভায় বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ও শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস (সভাপতি) শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। রাত্রে ছায়াচিত্র-সহযোগ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আলোচিত হয়।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী

সারগাছি ঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে চতুর্থ পর্যায়ে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৯শে ও ৩০শে জুন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ-হলে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর রামচন্দ্র পালের সভাপতিত্বে অধ্যাপক রেজাউল করীম এবং স্বামী স্বাহানন্দ 'ধর্মই ভারতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড' বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল: 'আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান'। দুইটি সভায়ই শ্রোতৃসংখ্যা প্রায় ৫০০।

বাগেরহাট ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৫ই বৈশাখ পূজা পাঠ, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১টা হইতে ৫টা পর্যন্ত প্রসাদ দেওয়া হয়, প্রায় ৩,০০০ নরনারী প্রসাদ পান। মহকুমা-শাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সাধারণ হাসপাতাল ভবন উদ্বোধন

সেবাপ্রতিষ্ঠান ঃ কলিকাতা গত ১লা জুলাই ৯৯, শরৎ বসু রোডে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণ হাসপাতাল ভবন উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু।

পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রের গভর্নর এবং মুখ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সহ শ্রীনেহরু অপরাহ্ন ৩-৩০ মি. সময়ে উপস্থিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, সেবাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দ ও চিকিৎসকগণের সহিত শ্রীনেহরুর পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়।

মাননীয় অতিথিবৃন্দ অপারেশন থিয়েটার এবং নূতন ও পুরাতন ব্লকের ওয়ার্ডগুলি পরিদর্শন করেন। চা-পানের পর মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে মাল্যভূষিত করা হয়। বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক বেদপাঠের পর সেবাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক কমিটির সভাপতি অভিনন্দন পাঠ করেন। সম্পাদক স্বামী গহনানন্দ সেবা-প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করিয়া বিবরণী পাঠ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু তাঁহার ভাষণে বলেন : আমি এখানে আসিয়া আনন্দিত হইয়াছি, আপনারা শুনিলেন, আমি পূর্বে এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়াছি, সে অবশ্য ২৫ বৎসরেরও আগের কথা, ইহার তখন প্রাথমিক অবস্থা। বর্তমানে পাঁচতলা সুন্দর হাসপাতাল গৃহ নির্মিত হইয়াছে। আমি এখানে আসিয়া আনন্দিত হইয়াছি, কারণ কলিকাতা নগরীর

কেন্দ্রস্থলে এইরূপ সুন্দর হাসপাতাল নির্মাণের প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন অংশে এবং বাহিরেও রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতাল ও বিভিন্ন সেবার কার্য আমি দেখিয়াছি। প্রচারবাহুল্য-বর্জিত নীরব কর্ম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যে আমাদের সাহায্য করা উচিত। আমি আশা করি, সেবাপ্রতিষ্ঠানের আরও উন্নতি হইবে এবং ইহা কলিকাতা ও বাহিরের জনসাধারণের সেবা করিতে থাকিবে।

স্বামী পুণ্যানন্দ মাননীয় অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীনেহরু সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে একটি দুর্লভ ফুলগাছের চারা রোপণ করিয়া বনমহোৎসবের উদ্বোধন করেন।

কার্যবিবরণী

সেবাপ্রতিষ্ঠান (৯৯, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা ২৬) : এই কেন্দ্রের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল '৬১—মার্চ '৬২) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩২ খৃঃ স্বামী দয়ানন্দের উদ্যোগে শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান নামে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৭ খৃঃ কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া নাম পরিবর্তিত হয়। দক্ষিণ কলিকাতায় প্রায় ৫ বিঘা জমির উপর সেবা-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে : স্ত্রী পুরুষ ও শিশুদিগের জন্য সাধারণ হাসপাতাল, প্রসূতি-সদন, পরিচর্যা ও ধাত্রী-বিদ্যা (Nurses' Training Centre) আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত ল্যাবরেটরি, এক্স-রে প্ল্যাণ্ট, বৈদ্যুতিক লন্‌ড্রি, সার্জিক্যাল ইউনিট প্রভৃতি।

আলোচ্য বর্ষে সেবাপ্রতিষ্ঠানের মোট শয্যা-সংখ্যা ছিল ২১০ ; অন্তর্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৬,৭৮০। বহির্বিভাগে নূতন ১৮,৮৫০ ও পুরাতন ২৭,০৪৮ রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

সালেম : রামকৃষ্ণ আশ্রমের (১৯৬১-৬২) খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশ : আশ্রমে প্রতিদিন পূজা ভজন এবং রবিবারে গীতা রামায়ণ ভাগবত প্রভৃতির ক্লাস হয়। ইংরেজী, তামিল, তেলুগু, মালয়লম্‌, কানাড়া ও হিন্দী ভাষার নির্বাচিত পুস্তক-সংখ্যা ১,০৪৭। বিভিন্ন ভাষার পত্র-পত্রিকাও নিয়মিত রাখা হয়। একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার-ভবনের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৫০,৮২৩ (নূতন ২১,৪২৩) রোগী চিকিৎসিত হয়। জরুরী অবস্থার জন্য ৬টি শয্যাযুক্ত একটি অন্তর্বিভাগ (Emergency Ward) খোলা হইয়াছে। স্থানীয় দরিদ্র শিশু ও দুঃস্থদিগকে গোদুগ্ধ দেওয়া হয়। আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং জেলার বিভিন্ন স্থানে উৎসবানুষ্ঠানে সহযোগিতা করা হয়।

বলরাম-মন্দির : (৫৭, রামকান্ত বসু স্ট্রীট, কলিকাতা ৩) : ১৯৬২ খৃঃ জানুআরি হইতে '৬৩ জুলাই পর্যন্ত প্রতি শনিবার গীতা, চণ্ডী, ভাগবত, মহাভারত, চৈতন্য-চরিতামৃত এবং 'কথামৃত' অবলম্বনে ৩০টি আলোচনা, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে ১৫টি বক্তৃতা, বিভিন্ন বিষয়ে কথকতা গীতি-আলেখ্য ও কালীকীর্তন প্রভৃতি ১০টি এবং ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা, বুদ্ধের জীবন ও বাণী, গীতা ও চণ্ডী (তুলনা), ভারতের জাতীয় বিশেষত্ব, যীশুখৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ, তুলসী-রামায়ণ, বুদ্ধপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ, দেহতত্ত্ব, স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামীজীর কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ অবলম্বনে বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সাধুবৃন্দ, বিশিষ্ট অধ্যাপক ও কথকগণ।

আমেরিকায় বেদান্ত

হলিউড বেদান্ত সোসাইটি: কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী স্বামী বন্দনানন্দ। রবিবারের বক্তৃতা:

নভেম্বর, '৬২: জীবনের উদ্দেশ্য; চরম সুখ; রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাধারা; শান্তিতে থাকো এবং জানো—'আমিই ঈশ্বর'।

ডিসেম্বর: আধ্যাত্মিকতার সহায়; শ্রীশ্রীমা; শিব ও শক্তি; আমার নিকট 'খৃষ্ট' মানে কি? স্বর্গীয় পিতা ও দিব্য পুত্র।

জানুআরি, '৬৩: নৈর্ব্যক্তিক জীবন; স্বামী বিবেকানন্দ; আধ্যাত্মিক বিকাশের স্তর; মদীয় আচার্যদেব।

মার্চ: মানুষ কখন ঈশ্বরীয় কথা কয়? শ্রীরামকৃষ্ণ; ভগবানের নাম; যথার্থ অনুভূতিই শান্তি; একাগ্রতা।

এপ্রিল: অনন্ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত কূপ; যীশুর পুনরভ্যুত্থানের তাৎপর্য; সত্যকে জানো, সত্যই তোমাকে মুক্ত করিবে; ভাব ও আদর্শ।

মে: বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম; দেবতার রূপ; সাধু ও অলৌকিক ঘটনা; কাজ ও চিন্তা।

জুন: অবচেতন মন ও ইহার সংযম; পথ অনেক, লক্ষ্য এক; দিব্য দর্শন; বিশ্বাস যুক্তি ও অনুভূতি; উপাসনা ও ধ্যান।

এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবারে ভাগবত এবং বৃহস্পতিবারে উপনিষদের ক্লাস হয়।

সান্টা বারবারা শাখাকেন্দ্রে:

নভেম্বর, '৬২: ঈশ্বর ও আত্মা; ধর্ম ও দর্শন; মোক্ষ; দেবত্ব ও মানুষের স্বভাব।

ডিসেম্বর: শান্ত হও এবং জানো—'আমিই ঈশ্বর'; ঈশ্বরানুভূতির স্তর; শ্রীশ্রীমা; স্বর্গরাজ্য ও মানুষের গির্জা; 'খৃষ্ট' বলিতে কি বুঝি?

জানুআরি, '৬৩: নববর্ষের সঙ্কল্প; নৈর্ব্যক্তিক জীবন; স্বামী বিবেকানন্দ।

মার্চ: মুক্তির পথে; ভক্তি ও ভাব; শ্রীরামকৃষ্ণ; মনের শক্তি; প্রকৃত অনুভূতিই শান্তি।

এপ্রিল: যোগের প্রণালী; অনন্ত-জীবনের সঙ্গে যুক্ত কূপ; বিশ্বাস ও যুক্তি; সত্য উপলব্ধি করো, ইহাই তোমাকে মুক্ত করিবে।

মে: গুরু ও শিষ্য; বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম; বেদান্ত ও বর্তমান জীবন; সাধু ও অলৌকিক ঘটনা।

জুন: উপায় ও লক্ষ্য; অবচেতন মনের সংযম; ঈশ্বর, মানব, প্রকৃতি; দিব্য দর্শন; যোগের প্রণালী।

রবিবারে বক্তৃতা ও মঙ্গলবারে নারদীয় ভক্তিসূত্রের ক্লাস হয়।

বিশ্বসংস্কৃতি অধ্যয়ন

আগামী ২রা অগস্ট, '৬৩ হইতে ১৬ই মার্চ, '৬৪ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারে (Gol Park, Cal. 29) বিশ্বসংস্কৃতি অধ্যয়নের (The study of cultures of the world) ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নির্ধারিত সূচী:

প্রথম গ্রুপ (৬২টি বক্তৃতা) ভারত	২.৮.৬৩—১১.১১.৬৩
দ্বিতীয় গ্রুপ (৬৩টি বক্তৃতা) এশিয়া (ভারত ব্যতীত), ইওরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা	১৩.১১.৬৩—১৭.১.৬৪
তৃতীয় গ্রুপ (২৪টি বক্তৃতা) আগামী বিশ্বসংস্থা: সমস্যা ও আশা	১৯.২.৬৪—১৬.৩.৬৪

ক্লাসে যোগদান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ ইনস্টিট্যুট অব কালচারে অনুসন্ধান করিবেন।

বিবিধ সংবাদ

শতবার্ষিকী সংবাদ

খুলনা : শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৩ই হইতে ১৬ই মার্চ চারদিনব্যাপী স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে স্বামীজীর চিত্র-প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, পুরস্কার-বিতরণ, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, বক্তৃতা, পূজা-পাঠ প্রভৃতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রায় ৭।৮ হাজার নরনারী প্রসাদ পান। রাত্রে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচিত হয়।

দুই দিনের দুইটি সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব দিলদার সাহেব এবং জনাব আবদুল হামিদ সাহেব। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর ভাবধারা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করেন।

নানা স্থানে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি :

কয়লাঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা (পি. এণ্ড টি. একাউণ্টস লাইব্রেরি ও রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে); সুবোধ মল্লিক স্কয়ার, কলিকাতা ('শতরূপা'র উদ্যোগে); নবদ্বীপ (রবীন্দ্র গ্রন্থাগারের উদ্যোগে); অশোকনগর (পূর্বাচল সঙ্ঘের উদ্যোগে); নওদাপাড়া, ২৪ পরগনা (বাণীবিতান গ্রন্থাগারের উদ্যোগে); হুগলি — বাবুগঞ্জ রথতলা; নব-বারাকপুর ('বিবেক-বাণীর উদ্যোগে); বার্নপুর ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানি (নিউ টাউন ইউনাইটেড ক্লাবের উদ্যোগে); বর্ধমান (ইলেকট্রিক রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে); কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল (কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা প্রাক্তন ছাত্রসংসদের উদ্যোগে); ধুবড়ি (আসাম); কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়; রাজকোট; পুনা; হায়দরাবাদ।

কার্যবিবরণী

আজমীর : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ১৯৪৪ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধ্যমত সেবাকার্য করিয়া আসিতেছে। আশ্রম-পরিচালিত দাতব্য ঔষধালয়ে ১৯৬১-৬২ খৃঃ চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৪০,০০৬। গ্রন্থাগারে ৪,১৯৮ পুস্তক আছে। একটি ক্ষুদ্র ছাত্রাবাস পরিচালিত হইতেছে। নিত্য পূজা ও সাময়িক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং নানা স্থানে ধর্মমূলক বক্তৃতা দেওয়া হয়। স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

তুলসীগাছের গুণ

২৬শে মে নয়া দিল্লীর পি. টি. আই. সংবাদে প্রকাশ : তুলসীগাছের দৈবশক্তি আছে বলিয়া হিন্দুরা মনে করে, কিন্তু উহার যক্ষ্মারোগ-জীবাণু প্রতিরোধেরও ক্ষমতা আছে বলিয়া দেখা গিয়াছে। ভারতে তুলসীগাছের ভেষজগুণ আছে বলিয়া যুগ যুগ ধরিয়া গণ্য করা হয় এবং উহা নানা রোগ-প্রশমনে ব্যবহার করা হয়। বল্লভভাই প্যাটেল চেস্ট ইনস্টিট্যুট পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে, তুলসী-পাতার রস যক্ষ্মা-জীবাণুনাশক।



শ্রী শ্রী দুর্গা



অম্বা-স্তোত্রম্

স্বামী বিবেকানন্দ

কাম্বা শিবা ক্ব গৃণনং মম হীনবুদ্ধেঃ
দোর্ভ্যাং বিধর্তুমিব যামি জগদ্বিধাত্রীম্।
চিন্ত্যং শ্রিয়া সুচরণং ত্বভয়প্রতিষ্ঠং
সেবাপরৈরভিনুতং শরণং প্রপদ্যে॥ (৬)

সেই মঙ্গলময়ী মাতাই বা কোথায় এবং হীনবুদ্ধি আমার এই স্তব-বাক্যই বা কোথায়? আমি আমার এই ক্ষুদ্র দুই বাহু দ্বারা জগতের বিধাত্রীকে যেন ধরিতে উদ্যত হইয়াছি। লক্ষ্মী যাঁহার চিন্তা করেন, যাঁহার সুন্দর পাদপদ্মে মুক্তি প্রতিষ্ঠিত, সেবাপরায়ণ জ্ঞানী ও ভক্তগণ যাঁহার বন্দনা করেন, আমি সেই জগন্মাতার আশ্রয় লইলাম।

কথাপ্রসঙ্গে

শক্তি ও শান্তি

শক্তি ও শান্তি—শব্দরূপে দুটি, কিন্তু অর্থবোধে একই! প্রকৃত শক্তি শান্তিরই নামান্তর; প্রকৃত শান্তি শক্তিরই রূপান্তর! এ-তত্ত্ব ভারতীয় দার্শনিক মনে সভ্যতার উষাকালেই প্রতিভাত হইয়াছিল, তাই তো দেখা যায় এই শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে শক্তির সাধনা, এবং শক্তি-উপাসনার শেষে শান্তিজলের ব্যবস্থা।

শক্তি অন্তরে ও বাহিরে! বাহিরের শক্তি আয়ত্ত করিয়া মানুষ বাহিরের দুঃখকষ্ট দূর করিয়া ঐহিক সুখ-শান্তি লাভের চেষ্টা করিতেছে। অন্তরের শক্তি জাগ্রত করিয়া সাধক ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। শান্তির জন্য শক্তির সাধনা একান্ত প্রয়োজন, প্রথমেই প্রয়োজন।

জীবনে অশান্তি দুঃখ বা পরাজয় কেহই চাহে না, কিন্তু এগুলি তো দিনের পর রাত্রির মতো আসিয়া থাকে—শুধু সাধারণ মানব-জীবনে নয়, উন্নততর জীবনেও এগুলি আসিয়া থাকে। পুরাণে কথিত আছে ঃ দেবতারাও দানব-শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া মর্ত্যমানবের মতো ম্লানমুখে বিচরণ করেন, কিন্তু তাঁহারা এই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন না। এরূপ অবস্থায় আত্মসন্তুষ্ট থাকাই তামসিকতা, তাঁহারা ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন, সকলে মিলিত হইয়া অন্তর্নিহিত মহাশক্তিকে জাগ্রত করেন। সত্ত্বগুণান্বিত দেবগণের এই একাগ্র মিলিত শক্তিই রজোগুণান্বিত বিচ্ছিন্ন দানব-শক্তিকে পরাভূত করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। পৃথিবীর ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় এই চিরন্তন রূপ ঋষিদের অল্প কথায় এইভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শান্তির জন্য চাই শক্তির সাধনা—কি বাহ্য প্রকৃতিতে, কি অন্তঃপ্রকৃতিতে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজে বা রাষ্ট্রে। এই মূলতত্ত্ব স্বীকার করিয়া জীবনের জয়যাত্রার পথে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে; অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে ঃ

যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে সংস্থিতা, তিনিই সর্বভূতে শান্তিরূপে বিরাজিতা।
তাঁহাকেই আমাদের প্রণাম, প্রণাম, বার বার প্রণাম।

আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী

[ভগিনী নিবেদিতা লিখিত ভূমিকার অনুবাদ: স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ]

স্বামী বিবেকানন্দের যে চারিখণ্ড[১] গ্রন্থাবলী বর্তমান সংস্করণে নিবদ্ধ হইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া আমরা জগতের জন্য সাধারণভাবে শুধু যে একটি দিব্যবাণী পাইয়াছি তাহা নহে, হিন্দুধর্মের সন্তানদের জন্য হিন্দুধর্মের একটি সনদও লাভ করিয়াছি। বর্তমান যুগের ব্যাপক অবক্ষয়ের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল এমন এক শৈলদৃঢ় আশ্রয়, যেখানে হিন্দুধর্ম একটি স্থিরভূমি লাভ করিতে পারে, প্রয়োজন ছিল একটি প্রামাণিক আপ্তবাক্য, যাহার মধ্য দিয়া সে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার মধ্য দিয়া ইহাই তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।

অন্যত্র যেমন বলা হইয়াছে, ইতিহাসে এই প্রথম হিন্দুধর্ম সমগ্রভাবে এক শ্রেষ্ঠ হিন্দু-মনীষার দ্বারা বিবৃত হইল। অনাগত যুগে বহুদিন ধরিয়া যখন হিন্দুধর্মাবলম্বী কেহ হিন্দু-ধর্মের প্রমাণ চাহিবে, যখন কোন হিন্দুজননী তাঁহার সন্তানগণকে শিক্ষা দিবেন, পূর্বপুরুষ-দিগের ধর্ম কি ছিল, তখন প্রমাণ ও আলোকের জন্য তিনি এই গ্রন্থাবলীর উপরই নির্ভর করিবেন। ভারত হইতে ইংরেজী ভাষা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার বহুকাল পরেও ঐ ভাষার মাধ্যমে জগতের কাছে যে উপহার প্রদত্ত হইল, তাহা এখানে স্থায়িভাবে বিরাজ করিবে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে ফলপ্রসূ হইবে। হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল নিজের ভাবাদর্শের সংগঠন ও সামঞ্জস্য-বিধান; পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল এমন একটি ধর্মের—যাহা সত্যসম্পর্কে বিগতভী। এই উভয় বস্তুই এখানে পাওয়া গিয়াছে। সঙ্কটমুহূর্তে যিনি জাতীয় চেতনাকে আহরণ করিয়া বাঙ্ময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিবিশেষের অভ্যুদয় অপেক্ষা সনাতন ধর্মের শাশ্বত বীর্যের এবং অতীতের মতোই ভারত যে বর্তমানে মহিমময়, সে-বিষয়ের মহত্তর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল না।

নিজের সীমান্তের বাহিরে অবস্থিত মানব-সাধারণের নিকট প্রকৃত জীবনধারণের অন্ন পরিবহণের মধ্য দিয়াই যে ভারত তাহার নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে, ইহা যেন পূর্ব হইতেই অনুমিত। ইহা যে এইবারই প্রথম সংঘটিত হইল তাহা নয়, পূর্বে আরও একবার প্রতিবেশী দেশসমূহে জাতিগঠনকারী ধর্মের বাণী প্রেরণের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষ নিজের চিন্তা-ধারার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিল—সেই আত্মগত একীকরণের ফলে বর্তমান হিন্দুধর্মই যেন নূতন-ভাবে সৃষ্ট হইল। আমরা কখনই ভুলিয়া যাইতে পারি না যে, এই ভারতের মাটিতেই প্রথম শ্রুত হইয়াছিল গুরু হইতে শিষ্যের নিকট সেই আদেশ: 'তোমরা সমগ্র পৃথিবীর দেশে দেশে যাও এবং এই ধর্মদেশনা সকল জীবের নিকট প্রচার কর।' ইহা সেই একই চিন্তা, একই প্রেমের অনুপ্রেরণা, নবরূপে রূপায়িত, হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ হইতে উদ্গত হইয়াছিল, যখন পাশ্চাত্যের একটি বিরাট সম্মেলনে তিনি বলিতেছিলেন, 'একটি ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে সবগুলিই সত্য হইবে।...সেইজন্য হিন্দুধর্ম যতটা আমার, ততটা তোমাদেরও।' এবং তিনি নিজের বক্তব্যের ভাব-সম্প্রসারণ করিয়া বলেন, 'আমরা হিন্দুরা কেবল যে

১ ইংরেজীতে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী প্রথমে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হয়, বর্তমানে আট খণ্ডে প্রকাশিত। বাংলায় এই গ্রন্থাবলী দশখণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে।—সম্পাদক

পরমত সহ্য করি, তাহা নয়, আমরা সকল ধর্মের সঙ্গে নিজেদের মিলিত করি। আমরা মুসলমানদের মসজিদে প্রার্থনা করি, পার্শীদিগের অগ্নি পূজা করি এবং খ্রীষ্টানদের ক্রুশের সম্মুখে নতজানু হই। আমরা জানি নিম্নতম বস্তুরতি হইতে উচ্চতম অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত, সকল ধর্মই সমভাবে, অসীমকে উপলব্ধি এবং অনুভব করিবার বিভিন্ন প্রচেষ্টামাত্র। সেইজন্য এই সকল কুসুম চয়ন করিয়া প্রেমের সূত্রে একত্র গ্রথিত করিয়া পূজার জন্য একটি অপূর্ব স্তবক রচনা করি।' এমন কেহই ছিল না যে এই বক্তার হৃদয়ে বিদেশী বা পর; তাঁহার নিকট কেবল মানব এবং সত্যেরই অস্তিত্ব ছিল।

ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—যখন তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল 'হিন্দুদের ধর্মভাব-সমূহ', কিন্তু যখন তিনি শেষ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। সেই ক্ষণটি ছিল সেই সম্ভাবনায় পূর্ণ। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত বিরাট শ্রোতৃবৃন্দ ছিল সম্পূর্ণ-ভাবে পাশ্চাত্য মনেরই প্রতিনিধি, কিন্তু উহাতে কিছু নূতন অভিব্যক্তি ও অগ্রগতি ছিল। ইহাই ছিল সেই শ্রোতৃমণ্ডলীর সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য। ইওরোপের প্রত্যেক জাতিরই মানুষ আমেরিকায় মিলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ চিকাগোতে—যেখানে মহাসভা অনুষ্ঠিত হইয়া-ছিল। আধুনিক কালের প্রযত্ন এবং সংঘর্ষের মহত্তম ও নিকৃষ্টতম যাহা কিছু, তাহার অধিকাংশই পাশ্চাত্যের এই পুররাজ্ঞীর এলাকার মধ্যে পাওয়া যাইবে—এই নগর-রানীর পদযুগল মিশিগান হ্রদের তটের উপর বিস্তৃত—উত্তরের দ্যুতিতে ভাস্বর চক্ষু লইয়া তিনি যেন চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। আধুনিক চেতনায় এমন কিছু নাই, ইওরোপের ঐতিহ্য হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে এমন কিছু পাওয়া যায় নাই, যাহা চিকাগো নগরীতে আশ্রয়লাভ করে নাই। এবং এই কেন্দ্রের সৃজনশীল জীবন এবং ব্যগ্র কৌতূহল বর্তমানে আমাদের কাহারও কাহারও নিকট প্রধানতঃ বিশৃঙ্খল মনে হইলেও ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে মানবের মহিমায় পূর্ণ এবং ধীরে পরিণত এক ঐক্যাদর্শ প্রকাশের অভিমুখে সঞ্চরমাণ।

এইরূপ ছিল সেই মানসক্ষেত্র, এইরূপই সেই চিত্তসাগর—তারুণ্যপূর্ণ, উচ্ছল, আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বেল; অধিকন্তু উহা ছিল অনুসন্ধিৎসু এবং সজাগ। বিবেকানন্দ যখন বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন তিনি ঐ পরিবেশেরই সম্মুখীন হইয়াছিলেন। অপরদিকে তাঁহার পশ্চাতে ছিল এক মহাসাগর—বহুযুগের অধ্যাত্মসাধনায় প্রশান্ত; তাঁহার পশ্চাতে ছিল এমন একটি জগৎ, যাহার কালপঞ্জী আরম্ভ হইয়াছে বেদ ও উপনিষদ্ হইতে—এমন একটি জগৎ, যাহার তুলনায় বৌদ্ধধর্মও প্রায় সে-দিনের—এমন একটি জগৎ, যাহা ধর্মীয় মতবাদ সম্প্রদায়সমূহে পূর্ণ—একটি শান্ত ভূখণ্ড গ্রীষ্মমণ্ডলের সৌরকরাচ্ছন্ন, যে দেশের পথের ধূলিকণা যুগ যুগ ধরিয়া সাধুসন্তের পাদস্পর্শে পবিত্র। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাঁহার পশ্চাতে ছিল ভারতবর্ষ—তাহার বহু সহস্র বৎসরের জাতীয় জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি লইয়া, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে সে পরীক্ষা করিয়াছে বহু বস্তু, প্রমাণ করিয়াছে অনেক কিছু, এবং দেশ ও কালের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছে প্রায় সব কিছু—শুধু তাহার নিজস্ব সম্পূর্ণ ঐকমত্য ছাড়া, যে ঐকমত্য সে-দেশের অধিবাসিগণের সকলেই কতিপয় মৌল ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

সুতরাং এইগুলি ছিল দুইপ্রকার চিন্ত-প্রবাহ, যেন দুইটি বিশাল চিন্তা-তরঙ্গিণী—প্রাচ্য ও আধুনিক; ধর্ম-মহাসভার বক্তৃতা-মঞ্চে দণ্ডায়মান গৈরিক-পরিহিত পরিব্রাজক সেই সময়ের জন্য হইয়াছিলেন ইহাদেরই সঙ্গমক্ষেত্র। ব্যক্তিত্বাভিমানশূন্য এই ব্যক্তির আধারে সংঘটিত এই অভিঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফল হইয়াছিল হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহের নির্দিষ্ট রূপদান। কেন-না সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে তাঁহার নিজের কোন অনুভূতির কথা উদ্‌গত হয় নাই,—এমন কি এই অবসরে নিজ গুরুর প্রসঙ্গ অবতারণা করিবার সুযোগও তিনি গ্রহণ করেন নাই। এই দুইটি বিষয়ের পরিবর্তে ভারতের ধর্মচেতনাই তাঁহার মধ্য দিয়া বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল—ভারতের সমগ্র অতীতের দ্বারা সুনির্দিষ্ট।তাঁহার দেশের সকল মানুষের বাণী! যখন তিনি পাশ্চাত্যের যৌবনকালে—মধ্যাহ্নসময়ে বক্তৃতা করিতে-ছিলেন, তখন প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্তে, পৃথিবীর তিমিরাচ্ছন্ন গোলার্ধের প্রচ্ছায়ে সুপ্ত একটি জাতি তাহাদের দিকে সঞ্চরমাণ ঊষার দ্বারা পরিবাহিত বাণীর জন্য মনে মনে অপেক্ষা করিতেছিল—যে বাণী তাহাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিবে তাহাদের নিজস্ব মহিমা ও শক্তির গূঢ় রহস্য।

একই বক্তৃতামঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন আরও অনেকে—বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রবক্তারূপে। কিন্তু এ গৌরব তাঁহারই, যে তিনি প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এমন একটি ধর্ম, যাহার নিকট—তাঁহার নিজেরই ভাষায়—ইহাদের প্রত্যেকটি ছিল 'বিভিন্ন নরনারীর বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়া একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার অভিযাত্রা বা অগ্রগতির প্রচেষ্টা'। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন এমন একজনের বিষয় বলিবার জন্য, যিনি তাহাদের সকলের কথাই বলিয়াছেন; তাহাদের একটি বা অপরটি—এ-বিষয়ে বা ও-বিষয়ে, এই কারণে বা অন্য কারণে যে সত্য, তাহা নহে, পরন্তু 'এগুলি সবই সূত্রে মণিগণের মতো আমাতেই অনুস্যূত।......যেখানেই দেখিবে, কোন অলৌকিক পবিত্রতা ও অসামান্য শক্তি মানুষকে উন্নত ও পবিত্র করিতেছে, জানিও সেখানে আমারই প্রকাশ।' বিবেকানন্দ বলেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে 'মানুষ অসত্য হইতে সত্যে গমন করে না, বরং সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।'...এই শিক্ষা এবং মুক্তির উপদেশ—সেই আদেশ: 'ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া মানুষকে ব্রহ্ম হইয়া যাইতে হইবে'—ধর্ম তখনই আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন উহা আমাদিগকে তাঁহার কাছে লইয়া যায়, যিনি মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবন, যিনি নিয়তপরিবর্তনশীল বিশ্বের নিত্য অধিষ্ঠান, যিনি একমাত্র আত্মা, জীবাত্মা-সমূহ যাঁহার মায়াময় প্রকাশ মাত্র। এই দুইটি উপদেশকেই দুইটি পরম ও বিশিষ্ট সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, মানবেতিহাসের চিরায়ত এবং জটিলতম অনুভূতির দ্বারা প্রমাণিত এই সত্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ প্রচার করিয়াছে আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের কাছে।

ভারতবর্ষের নিজের দিক দিয়া এই ক্ষুদ্র ভাষণটি ছিল স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার এক সংক্ষিপ্ত প্রমাণপত্র। বক্তা হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু 'বেদ' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার ধারণাকে অধ্যাত্ম-তাৎপর্যে তিনি পূর্ণ করিয়া দেন।

তাঁহার নিকট—যাহা সত্য তাহাই 'বেদ'। তিনি বলেন, 'বেদ-শব্দের দ্বারা কোন গ্রন্থ বুঝায় না। উহা দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত সত্যসমূহের সঞ্চিত ভাণ্ডারই বুঝায়।' প্রসঙ্গতঃ তিনি সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও ব্যক্ত করিয়াছেন: 'যাহার তুলনায় বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্কারসমূহও প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়, সেই বেদান্তদর্শনের আধ্যাত্মিকতার উত্তুঙ্গ সঞ্চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন পুরাণ-সমন্বিত নিম্নতম মূর্তিপূজা, বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়-বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ পর্যন্ত সব কিছুই হিন্দুধর্মে স্থান পাইয়াছে।' তাঁহার চিন্তায় এমন কোন সম্প্রদায়, এমন কোন মতবাদ—ভারতবাসীর এমন কোন অকপট আধ্যাত্মিক অনুভূতি থাকিতে পারে না, যাহা যথার্থভাবে হিন্দুধর্মের বাহুপাশের বহির্ভূত হইতে পারে—ব্যক্তিবিশেষের নিকট ঐ সম্প্রদায়, মতবাদ বা অনুভূতি যতই বিপথগামী বলিয়া মনে হউক। তাঁহার মতে ইষ্টদেবতা-বিষয়ক শিক্ষাই হইল ভারতের এই মূল ধর্মভাবের বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের পথ বাছিয়া লইবার এবং নিজের পথে ভগবানকে অন্বেষণ করিবার অধিকার আছে। তাহা হইলে এই সংজ্ঞা অনুসারে হিন্দুধর্মের বিশাল সাম্রাজ্যের পতাকা কোন সৈন্যবাহিনী বহন করিতে পারে না, কারণ হিন্দুধর্মের যেরূপ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হইতেছে ঈশ্বরলাভ, সেইরূপ উহার আধ্যাত্মিক অনুশাসন হইতেছে—স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি-বিষয়ে প্রত্যেক আত্মারই পূর্ণ স্বাধীনতা।

কিন্তু এই সর্বাবগাহিত্ব—প্রত্যেকের এই স্বাধীনতা হিন্দুধর্মের মহিমা বলিয়া পরিগণিত হইত না, যদি না মধুরতম আশ্বাসপূর্ণ এই পরম আহ্বান তাহার শাস্ত্রে ধ্বনিত হইত: 'শোন অমৃতের পুত্রগণ! যাহারা দিব্যধামবাসী তাহারাও শোন! আমি সেই মহান্ পুরাণ পুরুষের দর্শন পাইয়াছি—যিনি সকল অন্ধকারের পারে—সকল অজ্ঞানের ঊর্ধ্বে! তাঁহাকে জানিয়া তোমরাও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবে।' এই তো সেই বাণী, যাহার জন্যই বাকী সব কিছু আছে, এবং চিরদিন রহিয়াছে। ইহাই হইতেছে সেই পরম উপলব্ধি, যাহার মধ্যে অন্য সব অনুভূতি মিশিয়া যাইতে পারে। 'আমাদের বর্তমান কর্তব্য' বিষয়ক ভাষণে স্বামীজী যখন সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান—এমন একটি মন্দির-গঠনে সাহায্য করিতে হইবে, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি উপাসক উপাসনা করিতে পারে, যে মন্দিরের পবিত্র বেদীতে শুধু 'ওঁ' এই শব্দব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বাণীর মধ্যে আরও বিরাট একটি মন্দিরের আভাস পাইয়া থাকেন, সে মন্দির স্ব-স্বরূপে বিরাজিতা আমাদের দেশমাতৃকা ভারতবর্ষ স্বয়ং—এবং উহাতে শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মানবজাতির ধর্মসাধনার পথগুলি কেন্দ্রাভি-মুখী হইতেছে, সেই পুণ্যপীঠের পাদমূলে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই প্রতীক, যাহা কোন প্রতীকই নয়, সেই নাম যাহা শব্দাতীত। সকল উপাসনা, সকল ধর্মপদ্ধতি চলিয়াছে ইহারই অভিমুখে—ইহার বিপরীত দিকে নয়। পৃথিবীর অতি নিষ্ঠাপরায়ণ ধর্মগুলির সহিত ভারত সমস্বরে ঘোষণা করে: সাধনার অগ্রগতি দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টে, বহু হইতে একে, নিম্ন হইতে উচ্চতর স্তরে, সাকার হইতে নিরাকারে—কখনও ইহার বিপরীত নয়। ভারতের বৈশিষ্ট্য এইখানেই যে, যে-কোন স্থানের এবং যে-কোন প্রকারের হউক না কেন, প্রতিটি অকপট ধর্মবিশ্বাসকেই সে মহান্

ঊর্ধ্বগতির সোপান-স্বরূপ মনে করে এবং প্রত্যেকটিকেই সে সহানুভূতি জানায় ও আশ্বাস দিয়া থাকে।

হিন্দুধর্মের এই প্রবক্তার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকিত, যাহা তাঁহার নিজস্ব, তবে স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ মান ক্ষুণ্ণ হইত। গীতার কৃষ্ণের ন্যায়, বুদ্ধের ন্যায়, শঙ্করাচার্যের ন্যায়—ভারতীয় চিন্তাজগতের সকল আচার্যের ন্যায় তাঁহার বাক্যসমূহ বেদ ও উপনিষদের উদ্ধৃতি-দ্বারাই সমৃদ্ধ। যে রত্নরাজি ভারত নিজেরই মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কেবলমাত্র সে-গুলির প্রকাশকরূপে—ব্যাখ্যাতারূপেই স্বামীজী বিরাজমান। যদি তিনি জন্মগ্রহণ নাও করিতেন, তথাপি তাঁহা দ্বারা প্রচারিত সত্যসমূহ সত্যরূপেই থাকিত; না আরও বেশী—ঐগুলি সমভাবেই প্রমাণীভূত হইত। তবে পার্থক্য একটু থাকিত, ঐগুলি পাওয়া কঠিন হইত, ঐগুলিতে আধুনিক স্বচ্ছতা ও বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা থাকিত না, পারস্পরিক সঙ্গতি ও ঐক্যের হানি ঘটিত। যদি তিনি আবির্ভূত না হইতেন, তবে যে শাস্ত্রবাণীগুলি আজ সহস্র সহস্র মানবের নিকট জীবনের পরমান্নরূপে পরিবাহিত হইতেছে, সেগুলি পণ্ডিতদের দুর্বোধ্য তর্কবিচারেই পর্যবসিত থাকিয়া যাইত। তিনি আধিকারিক পুরুষ-রূপেই শিক্ষা দিতেন, পণ্ডিতদের মতো নয়। কারণ তিনি যে-বিষয়ে শিক্ষা দিতেন—সে বিষয়ের উপলব্ধির গভীরে তিনি অবগাহন করিয়াছেন এবং রামানুজের মতো তিনি সেই অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—শুধু পারিয়া, অন্ত্যজ ও বিদেশীদের নিকট ঐ উপলব্ধির রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য।

তাঁহার উপদেশে নূতন কিছু ছিল না—এ উক্তি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। এ-কথা কখনও ভুলিলে চলিবে না যে 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' অনুভূতি যাহার অন্তর্গত, সেই অদ্বৈত-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মে এই শিক্ষা সংযুক্ত করিয়া দিলেন যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত একই বিকাশের তিনটি অবস্থা বা ক্রমিক স্তর মাত্র, এই বিকাশের চরম লক্ষ্য হইতেছে শেষোক্ত অদ্বৈত তত্ত্ব। ইহা আর একটি আরও মহৎ ও আরও সরল তত্ত্বেরই অপরিহার্য অঙ্গ। বহু এবং এক—একই সত্তা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় মনের দ্বারা অনুভূত একই সত্তার বিভিন্ন বিকাশ অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, 'ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুইই', তিনি এমন এক তত্ত্ব যাহাতে সাকার নিরাকার দুইই আছে।

ইহাই আমাদের গুরুদেবের জীবনের চরম তাৎপর্য, এইখানেই তিনি যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র হইয়াছেন, তাহা নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতেরও। বহু এবং এক—যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি—সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই প্রার্থনা; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধর্মকার্য হইয়া যায়। যোগ ও ক্ষেম—ত্যাগ ও বর্জনের মতোই দায়স্বরূপ।

এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান্ প্রচারকে পরিণত করিয়াছে, তবে এই কর্ম—জ্ঞান ও ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, পরন্তু উহাদের প্রকাশক। তাঁহার নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত—সাধুর কুটিয়া ও মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই, তাঁহার নিকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে—যথার্থ সদাচারে ও ও অধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নাই। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার সকল বাণীই এই মুখ্য প্রত্যয়ের ভাষ্য বলিয়া বোধ হয়। এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, 'চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়। কিন্তু ইহা বুঝিতে গেলে আমাদিগকে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে হইবে।'

যে গঠনমূলক প্রভাব দ্বারা তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টি নিরূপিত হইয়াছিল, তাহার তিনটি সূত্র আছে, মনে করা যাইতে পারে।

প্রথমত: তাঁহার সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষা—সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় দুইটি ভাব-জগতের যে বৈষম্য এই ভাবে তাঁহার চক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের ধর্ম-গ্রন্থগুলির বিষয়ীভূত বিশেষ অনুভূতি সম্বন্ধে একটি দৃঢ় ধারণা তাঁহার মনে সঞ্চারিত করিয়াছিল ; ইহা তাঁহার নিকট স্পষ্টই প্রতিভাত হইয়াছিল যে, এই অনুভূতি যদি সত্য হয়, তবে ভারতের ঋষিগণ আকস্মিক-ভাবে ইহা লাভ করেন নাই, যেমন (অন্যত্র) অনেকে করিয়াছেন। পরন্তু ইহা ছিল বিজ্ঞান-প্রতিপাদ্য বিষয়-সেই যৌক্তিক বিশ্লেষণের বিষয়ীভূত, যাহা সত্যানুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় কোন ত্যাগ-স্বীকারেই সঙ্কুচিত হয় নাই।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানে থাকিয়া যখন রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার ভাব শিক্ষা দিতে-ছিলেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ—তদানীন্তন 'নরেন'—তাঁহার গুরুর মধ্যে পুরাতন শাস্ত্র-সমূহের সেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার হৃদয় ও মস্তিষ্ক খুঁজিতেছিল। এইখানে তিনি সেই তত্ত্বই পাইয়াছিলেন, যাহা গ্রন্থসমূহে অস্ফুটভাবে বর্ণিত। এইখানে ছিলেন এমন একজন, সমাধিই যাঁহার জ্ঞানলাভের নিত্য-পদ্ধতি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখা যাইত—মনের গতি বহু হইতে একের দিকে ঝুঁকিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে শোনা যাইত সমাধিলব্ধ জ্ঞানের উপদেশ। তাঁহার চারিপাশে যাহারা সমবেত হইত, তাহারা প্রত্যেকেই দিব্যদর্শন লাভ করিত। 'জ্বরভাবের মতো' পরম জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা এই শিষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তথাপি যিনি এইভাবে গ্রন্থসমূহের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন, তিনি অজ্ঞাতসারেই এরূপ ছিলেন, কারণ তিনি কোন গ্রন্থই পাঠ করেন নাই। গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে বিবেকানন্দ জীবন-রহস্যের কুঞ্জিকা লাভ করিয়াছিলেন।

তথাপি এখনও তাঁহার নিজের নির্ধারিত কর্মের জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার পরও তাঁহাকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল—সমভাবে সাধু, পণ্ডিত ও সরল সাধারণ মানুষের সহিত মিশিতে হইয়াছিল, সকলের নিকট শিখিতে হইয়াছিল, সকলকে শিখাইতে হইয়াছিল, সকলের সহিত বাস করিতে হইয়াছিল—এবং ভারতমাতা যেরূপ ছিলেন, যেরূপ হইয়াছেন, তাহা দেখিতে হইয়াছিল—এই ভাবেই বিশাল সমগ্রতার সর্বাবগাহিত্ব তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইয়া-ছিল, ইহারই সংক্ষিপ্ত ঘনীভূত প্রতিরূপ ছিল তাঁহার গুরুর জীবন ও ব্যক্তিত্ব।

সুতরাং শাস্ত্র, গুরু এবং মাতৃভূমি—যেন তিনটি সুর, এইগুলিই মিলিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর মহান্ সঙ্গীত। এই রত্নগুলিই তিনি দান করিতেছেন। এইগুলি হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন পৃথিবীর সকলের জন্য তাঁহার আধ্যাত্মিক করুণার এক সর্বরোগহর মহৌষধি। এগুলি হইতেছে যেন তিনটি দীপশিখা—একই দীপাধারে প্রজ্বলিত, ভারতবর্ষ তাঁহার হাত দিয়া উহা জ্বালাইয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন—তাঁহার সন্তানগণের ও সমগ্র মানবজাতির পথ নির্দেশ করিবার জন্য—১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ হইতে ৪ঠা জুলাই ১৯০২ পর্যন্ত মাত্র কয়েক বৎসরের কর্মের মাধ্যমে। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা এই দীপ প্রজ্বালনের জন্য ও এই যে লেখমালা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য—স্বস্তিবাদ জানাই সেই দেশকে, যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; ধন্যবাদ জানাই তাঁহাদের, যাঁহারা তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন : তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন, এখনও তাঁহার বাণীর বিশালতা ও তাৎপর্য বুঝিয়া উঠার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা

৪ঠা জুলাই, ১৯০৭ (N. of Rk-V.)

ব্যথার পূজা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

'শ্রীশ্রীচণ্ডী' গ্রন্থের উপসংহারে আমরা দেখিতে পাই—রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি দেবীর দর্শনমানসে তিন বৎসর তন্মনস্ক হইয়া আরাধনা করিয়াছিলেন। আহারসংযম এবং জপধ্যান তো ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল মাটির প্রতিমা গড়িয়া পূজা। পূজার উপকরণের মধ্যে যেমন পুষ্প ধূপ নৈবেদ্য হোম ছিল, তেমনি ছিল আর একটি বিশেষ উপহার—'নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্'—নিজদের বুক চিরিয়া সেই ক্ষত হইতে নির্গত রক্ত। নিজহাতে নিজের দেহ হইতে রক্তমোক্ষণের মধ্যে যে শারীরিক যন্ত্রণা নিহিত আছে, ঐ যন্ত্রণাকেই যেন ভক্ত এখানে উপাস্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছেন। সব সময়ে আমরা ভগবানকে নিজের রক্ত দিতে না পারিলেও প্রকারান্তরে তাঁহার প্রীতির জন্য কোনও কৃচ্ছ্রতা বা কষ্ট-স্বীকারকে অনেক সময়ে আমরা সাধনার অঙ্গ বলিয়া মনে করি। আমরা না খাইয়া ব্রত উপবাস করি, না ঘুমাইয়া সারা-রাত্রি জপ করি, পায়ে হাঁটিয়া তীর্থ পরিক্রমা করি। এই সব কৃত্যে শারীরিক কষ্ট আছে, কিন্তু সেই কষ্টকে আমরা গ্রাহ্য করি না। ঐ কষ্ট আমাদের তপস্যা, পুণ্য; উহা আমাদের সমাদরণীয়। নিজেরাই সেই কষ্টকে বরণ করিয়াছি বলিয়া উহাতে আমাদের তৃপ্তি, আনন্দ। কোন কোন ভক্ত যাচিয়া মানসিক কষ্টও বরণ করেন ভগবানের জন্য। যেমন তুলসীদাস একটি দোঁহাতে বলিয়াছিলেন—'হে তুলসী, যেখানে তোমাকে কেহ সম্মান ও আদর করিবে না, সেইখানে যাইও; তাহাতে দুরন্ত অভিমান খর্ব হইবে এবং অভিমান খর্ব হইলে রামভক্তি জাগিবে।' অপমান ও লাঞ্ছনা মনের নিদারুণ কষ্ট বই কি! কিন্তু এই মনের কষ্ট ভক্ত এখানে ভগবদ্‌ভক্তির উপায়রূপে বরণ করিতেছেন। যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার ভক্তগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন—'যাহা-দিগকে শোক করিতে হয়, তাহারা ধন্য, কেননা তাহাদেরই মিলিবে দৈবী সান্ত্বনা।' সাধারণ লোকের কাছে শোক তো কাম্য নয়, কিন্তু ভক্তের কাছে শোক কখন কখন বরণীয়; শোকের ভিতর দিয়া সর্বশোকাতীত ভগবানের স্পর্শ পাওয়া যাইতে পারে।

ভগবানের জন্য শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ নিজে বরণ করিলে উহা যদি তপস্যা হয় এবং ঐ তপস্যা দ্বারা যদি আধ্যাত্মিক সার্থকতা লাভ করা যায়, তাহা হইলে না চাহিতে যে দুঃখকষ্ট আমাদের শরীর-মনকে আচ্ছন্ন করে, সেই দুঃখকষ্টকেও আধ্যাত্মিক সাধনায় রূপান্তরিত করা চলিবে না কেন? ইহা যে সম্ভবপর, শাস্ত্রে তাহার ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের একাদশ ব্রাহ্মণটি এই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

'এতদ্বৈ পরমং তপো যদ্ ব্যাহিতস্তপ্যতে, পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ।'—ব্যাধি দ্বারা যদি কেহ সন্তপ্ত হয়, তবে তাহা তো সেই ব্যক্তির পরম তপস্যা। যিনি এইরূপ দৃষ্টি অভ্যাস করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

'এতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেতমরণ্যং হরন্তি, পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ।'—মৃত্যু হইলে মৃতদেহকে সৎকার করিবার জন্য যে অরণ্যে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা তো সেই ব্যক্তির পরম তপস্যা। যিনি মৃত্যুর প্রতি এইরূপ দৃষ্টি সাধিতে পারেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

'এতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেতমগ্নাবভ্যাদধতি, পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ।'—কাহারও মৃতদেহকে যখন অগ্নিসাৎ করা হয়, উহা তো সেই ব্যক্তির পরম তপস্যা। যিনি এইরূপ দৃষ্টি অভ্যাস করেন, তাঁহার পরমগতি লাভ হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ ব্যাধিকে আমরা ভয় পাই, দুঃখদায়ক বলিয়া উহাকে দূরে রাখিতে চাই। নিজের সুন্দর সবল শরীর মৃত্যুর স্পর্শে ঢলিয়া পড়িয়াছে, প্রাণহীন দেহটি বিকৃত হইয়া গিয়াছে, উহাকে চিতায় চড়াইয়া জ্বালানো হইতেছে—এই দৃশ্য সাধারণতঃ ভাবিতে পারা কঠিন। তবুও উপনিষদ্ বলিতেছেন, ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রতি এই স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ও আতঙ্কের পরিবর্তে যদি একটি প্রীতি ও স্থৈর্যের দৃষ্টি আনিতে পারি, তাহা হইলে উহা তপস্যার সামিল হইবে। অপরিহার্য দুঃখকে বিধাতার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে দুঃখভোগ ধ্যান-ধারণার মর্যাদা লাভ করিবে।

ভগবানকে গভীরভাবে ভালবাসিতে পারিলে দুঃখকে, আমরা আর বড় করিয়া দেখি না। 'হে ভগবান, আমার দুঃখ নিবৃত্তি কর'—এ প্রার্থনাও করিতে তখন ভাল লাগে না। তখন আমরা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-স্তোত্রের রচয়িতা রাজা কুলশেখরের ভাষায় বলি—

'নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভাব্যং তদ্ ভবতু ভগবন্ মে পূর্বকর্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
তৎপাদাম্বুরুহযুগলে নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥'

—পুণ্যকর্মে আমার আস্থা নাই, ধনসম্পদ্‌লাভ বা বিষয়ভোগেও রুচি নাই। পূর্বকর্মানুসারে সুখ দুঃখ যাহা আসে আসুক—কিছু আসিয়া যায় না। হে ভগবান, প্রার্থনা শুধু এই যে, জন্মজন্মান্তরে যেন তোমার পাদকমলযুগলে আমার অচলা ভক্তি থাকে।

সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছিলেন, 'কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এতদিনে, সুখদুঃখ সমান হ'ল আনন্দসাগর উথলে।' জগজ্জননীর দর্শনে যে আনন্দের উপলব্ধি হয়, উহা সুখদুঃখ দুয়েরই পারে। এই আনন্দ বিশ্বসংসারের অধিষ্ঠান, উহা সত্যস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ। সুখ ও দুঃখ দুইটিই সেই আনন্দে অধিশ্রিত। অতএব জগজ্জননীকে যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি আর সুখদুঃখের হিসাব করেন না; সাধারণ মানুষের মতো দুঃখ-পরিহার ও সুখসন্ধান তাঁহার কর্ম ও চেষ্টার প্ররোচক নয়। তাঁহার জীবনদর্শন হইল—'যো কুছ হ্যায়, সো তুঁহী হ্যায়।' সুখ ও দুঃখ দুইই তাঁহার নিকট মায়ের পদ্মহস্তের আশীর্বাদ। সুখেও তাঁহার আনন্দ, দুঃখেও আনন্দ। সুখ ও দুঃখ বাহিরের কোনও নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হয়, ইন্দ্রিয়-মনের মাধ্যমে উপস্থিত হয়। আনন্দ কিন্তু জগজ্জননীর নিত্যস্বরূপ, উহার আবির্ভাব, তিরোভাব নাই; আনন্দের উপলব্ধির জন্য ইন্দ্রিয় ও মনের প্রয়োজন হয় না।

সুখ দুঃখ এবং শ্রীভগবানের সত্য ও আনন্দ সম্বন্ধে সিদ্ধ সাধকদের উপর্যুক্ত উপলব্ধি পর্যালোচনা করিলে 'ব্যথার পূজা'র সারবত্তা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। হাঁ, ব্যথা দিয়া, নিদারুণ দুঃখ, মর্মন্তুদ শোক ও হৃদয় বেদনা

দিয়াও প্রিয়তম আরাধ্য দেবতার পূজা করা যায়। কালীয় নাগ—এই পূজার একজন শ্রেষ্ঠ উপাসক। নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণকে সে বলিতে পারিয়াছিল, 'আমার মুখের হলাহল তো তোমারই দান, হলাহল ছাড়া আর তো কিছু তুমি আমাকে দাও নাই—তাই তোমাকে এই হলাহলই উপহার দিয়াছি।' কখন কোন্ দুঃখ আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করিবে, আমাদের জানা নাই। হয়তো আসিবে দারিদ্র্য, প্রিয়-বিচ্ছেদ, অপমান; হয়তো আসিবে ব্যাধি, জরা, মৃত্যু; একটি বিপদ কাটিতে না কাটিতে হয়তো আর দশটি বিপদ জটলা করিবে। কিন্তু আমরা যেন না কাঁদিয়া হাসিয়া উঠিতে পারি। আমরা যেন বলিতে পারি, প্রভু, ইহারা আমার পূজার থালির পুষ্পসম্ভার। ইহাদের আজ তোমার চরণে অর্পণ করিব। ভক্ত গাহিয়াছেন—

'আমার ঘরে তোমার প্রভু সহজ আরাধন,
চোখের জলে প্রাণের ব্যথা নীরব নিবেদন।'

কবি রবীন্দ্রনাথের—

'জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।'

—এই প্রসিদ্ধ গানটিতে ব্যথার পূজার ভাবটি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের যাহা কিছু অসম্পূর্ণতা, তাহা নিরর্থক নয়, তাহাও জীবন-দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা। যে ফুল ফুটিবার পূর্বে পৃথিবীতে ঝরিয়া পড়ে, যে নদী সমুদ্রে পৌঁছিবার আগেই মরুপথে শুকাইয়া যায়, তাহারাও ভগবানের সৃষ্টিতে ব্যর্থ নয়। যাহা পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, সম্মুখে আসিতে পারে নাই, তাহাও মূল্যবান্। মানুষের দৃষ্টিতে যাহা সুরহীন ছন্দোহীন, তাহা ভগবানের বীণায় ঝঙ্কৃত হইতে পারে। চাই শুধু সমর্পণের দৃষ্টিভঙ্গী।

গাজীপুরের মহাপুরুষ পওহারী বাবা তাঁহার গুহাতে বিষধর কৃষ্ণসর্পের সম্মুখে পড়িয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—'এ আমার প্রিয়তমের দূত।' কবি বিদ্যাপতি ব্রজগোপিনীর মুখে ব্যথার পূজার পটভূমিকা কী সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন!—'হে সখি, অন্তহীন দুঃখের মাঝ-খানে বসিয়া শূন্য মন্দিরে আমার কান্তের প্রতীক্ষা। ভাদ্রের ভরা বাদল রাত্রি, বিরাম-হীন বৃষ্টি, আকাশে শত শত বজ্রের গর্জন, দিগ্-দিগন্তে ঘন অন্ধকার।' মীরাবাঈ গাহিয়া-ছিলেন, 'স্থলকে উপর সেজ পিয়াকী কিস্‌বিধ মিলন হোই।' ভক্ত জীবনের বাধা বিপত্তি দুঃখ দুর্বিপাককে তাঁহার সাধনার সহচর বলিয়া মনে করেন। পুঞ্জীভূত ব্যথার মধ্যে তিনি আশ্চর্য মাধুর্য উপলব্ধি করেন। কোন দুঃখই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, কোন মেঘই তাঁহার চিত্তের আলোককে ঢাকিতে পারে না।

'প্রেমিকের চালটা বেয়াড়া
　　কিছু বেদবিধি ছাড়া
আঁধার কোলে চাঁদ গেলেও
　　তার মুখে নাই সাড়া,
(আবার) চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও
　　আসমানেতে বানায় ঘর।'

(ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল রচিত বাউল-সঙ্গীত)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুর বাগানে তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় একদিন ভক্তদের বলিলেন, 'কি দেখছি জানো? তিনি সব হয়েছেন।...দেখছি সে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়িকাঠ হয়েছে।'

(শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ৩।২৪।২)

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থে বলিতেছেন—

'জগৎসংসার তাঁহার খেলামাত্র। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আমাদের কাছে যাহাই হউক,

ভগবানের নিকট একটি চমৎকার তামাসা ছাড়া আর কিছু নয়। আমরাও তাঁহার এই খেলার সাথী। যদি তুমি দরিদ্র হও, দারিদ্র্যকে তামাশা বলিয়া দেখিতে শিখ, যদি ধনসম্পদ্ জুটে তাহাও আর এক তামাশা। বিপদ্ যদি আসে তাহা তো দিব্য মজার ব্যাপার, সুখ যদি আসে তাহাতে অধিকতর কৌতুক বোধ কর। এই পৃথিবী একটি খেলার মাঠ। ভগবান্ সর্বক্ষণ আমাদের লইয়া খেলা করিতেছেন। কী সুন্দর তাঁহার খেলা!'

দুঃখ আমাদের জীবনে একটি অপরিহার্য ঘটনা। দুঃখকে পরিহার করিবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ লৌকিক অলৌকিক --কতই না চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। যেখানে কোন প্রকার দুঃখ নাই, এমন একটি স্থানও মানুষ কত ভাবেই না কল্পনা করিয়াছে—তাহার বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গ এবং সেই স্বর্গে বাস করিবার অধিকার পাইবার জন্য তাহার কতই না উদ্যম পরিলক্ষিত হইয়াছে। মানুষের চিন্তা, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যের সহিত দুঃখের প্রসঙ্গ ঘনিষ্ঠভাবে সর্বদা জড়িত। আধ্যাত্মিক সত্য লাভের জন্য মানুষের যে বহু বিচিত্র অভিযান, তাহারই কোন এক ধাপে মানুষ দুঃখকে এক অভিনব রূপে দেখিতে শিখিয়াছিল—দুঃখকে হৃদয়দেবতার পূজার আশ্চর্য উপকরণ-রূপে। এই পূজার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগিলে এবং এই পূজা অভ্যাস করিতে পারিলে দুঃখ আর আমাদিগকে অভিভূত করে না।

জগন্মাতার যে প্রসন্ন হাস্য আমরা চন্দ্র-সূর্যের আলোকে, নভোতারকায়, বৃক্ষলতা পত্র-পুষ্পে, প্রিয়জনের মুখমণ্ডলে দেখিতে পাই, সেই হাসিই তখন ফুটিয়া উঠে আমাদের প্রত্যেকটি ব্যথা-বেদনার মধ্য দিয়া।

'জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥'

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্র-সাধনা*

স্বামী নির্বেদানন্দ

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের বা তার কাছাকাছি কোন এক সময় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির বকুলতলার স্নানের ঘাটে একখানা যাত্রীবাহী নৌকা এসে ভিড়ল। এক সুরূপা দীর্ঘদেহা রমণী নৌকা থেকে অবতরণ করলেন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। নেমে, চাঁদনির দিকে সোজা এগিয়ে চললেন তিনি। তাঁর দীর্ঘ কেশদাম আলুলায়িত, বসন গৈরিক; দেখেই বোঝা গেল তিনি ভৈরবী, তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। অনুসন্ধানে জানা গেল—তিনি পরিব্রাজিকা, তান্ত্রিক বিদ্যায় ও ভক্তি-শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং সাধন-ক্রিয়াতেও তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞা; পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে কোন ব্রাহ্মণ-পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তিবিশেষকে ধর্ম-সাধনায় সহায়তা করার জন্য ঈশ্বরাদিষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বর-কৃপার অধিকারী সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ ব'লে চিনতে পেরে তিনি আনন্দে রোমাঞ্চিত-কলেবর হলেন; হৃদয়ে মাতৃস্নেহ উথলে উঠল।...

মায়ের সরল শিশু শ্রীরামকৃষ্ণ অভ্যাসমত সরলভাবে মা-কালীর অনুমতি নিয়ে ভৈরবীর হাতে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কেনারাম ভট্টাচার্যের নিকট তান্ত্রিকমতে দীক্ষালাভ করেছিলেন। তন্ত্র-শাস্ত্রের নির্দেশমত অধ্যাত্ম-সাধনার পথে পরিচালিত করার জন্য ভৈরবীকে তিনি গুরুরূপে বরণ করতে চাইলেন। ভৈরবী সানন্দে সম্মত হলেন।

তান্ত্রিক সাধনার উপযোগী দুটি আসন (সাধনপীঠ) তৈরী হ'ল। একটি পঞ্চবটীতে, অপরটি কালীবাড়ির উত্তর প্রান্তে বেলতলায়। বিভিন্ন তান্ত্রিক সাধনার জন্য প্রয়োজনীয় বিবিধ দুর্লভ উপকরণ দিবাভাগে সংগ্রহ ক'রে এনে ভৈরবী এ-দুটি আসনের একটির কাছে সাজিয়ে রাখতেন। নিশাকালে সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নির্দেশমত প্রক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান করতেন। এভাবে চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সমস্ত সাধনা ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন।

বেদান্তমতে ভক্ত ও ভগবান্ স্বরূপতঃ এক। এই চরম সত্যোপলব্ধির পথেই তন্ত্র সাধককে নিয়ে যায়। এই উপলব্ধি লাভের ব্যাবহারিক পদ্ধতিগুলিই তন্ত্রে নিবদ্ধ আছে। কিন্তু স্বরূপগত একত্বের উপলব্ধিলাভের জন্য অদ্বৈত-বেদান্ত যে-পথে চলতে বলে, সেই জ্ঞানপথের সঙ্গে তন্ত্রনির্দিষ্ট পথের পার্থক্য আছে। জ্ঞানমার্গে কর্মের স্থান নেই। কিন্তু তন্ত্রোক্ত সাধন জ্ঞান ও কর্মের সমবায়ে গঠিত। ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানই এ-পথের বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরকে সাকার-রূপে চিন্তা ক'রে তাঁর মূর্তির বিধিমত পূজা ও ধ্যানের মাধ্যমে ভক্তের অকপট মনকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে তুলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে তান্ত্রিক সাধনায়। ক্রমোন্নতির পথ এটি। তন্ত্রে পূজার যে বিধান আছে, তাতে প্রথমে নিজেকে নিরাকার চরম সত্তার সঙ্গে এক ভেবে ধ্যান করতে হয়; তারপর ভাবতে হয়, ভগবানের সেই নির্গুণ নিরাকার সত্তা থেকে দুটি স্বতন্ত্র রূপের বিকাশ

* মূল গ্রন্থ 'Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance' হইতে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক অনূদিত।

হ'ল, নিরাকার সত্তাই যেন পূজকের ও আরাধ্যা দেবীর জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করলেন। তখন ভাবতে হয়, সেই চিন্ময়ী দেবী বাইরে সাধকের সম্মুখস্থ পূজার পীঠে এসে বসেছেন। তারপর ভগবতীজ্ঞানে পূজা করতে হয় সেই সাকার চিন্ময়ী দেবীকে

তন্ত্রনামে প্রসিদ্ধ হিন্দুধর্মের এই শাখাটি অতি উচ্চতত্ত্বে পৌঁছবার যে-পথটির সন্ধান দিয়েছে, সে-পথটি ক্রমোন্নত এবং খুবই ঢালু; স্বল্পায়াসে ওপরে ওঠা যায় এ-পথ ধরে। নিম্নের অতি স্থূল ইন্দ্রিয়জগৎ থেকে শুরু হয়ে এ-পথ গিয়ে শেষ হয়েছে ভাবরাজ্যের সর্বোচ্চ প্রদেশে, চরম সত্তায়। আধ্যাত্মিক বিবর্তনের যে-কোন স্তরে অবস্থিত মানুষের পক্ষেই এ-পথ উপযোগী। বিভিন্ন স্তরের লোকের জন্য তন্ত্রে বিভিন্ন অধ্যাত্ম-সাধনপদ্ধতি নির্দিষ্ট আছে। তম বা জড়তায় মগ্ন লোকের জন্য আছে পশুভাবের সাধন; রজ বা প্রাণশক্তি ও বাসনার প্রাচুর্য যাদের মধ্যে, তাদের জন্য রয়েছে বীরভাবের সাধন; আর শান্তস্বভাব, পবিত্র, সর্ববিষয়ে সন্তুষ্টচিত্ত ও শুদ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য, সত্ত্বপ্রধান লোকের জন্য, নির্দিষ্ট আছে দিব্যভাবের সাধন-প্রণালী।

তান্ত্রিক ক্রিয়ার ব্যবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সুখদ বস্তুগুলিকে সাধকের সামনে এনে রাখতে হয়। সাধনকালে সাধককে মনে মনে চিন্তা করতে হবে যে, এ বস্তুগুলি সবই দিব্যভাবময়। এই চিন্তা অবলম্বনে সাধনপথে চলতে চলতে সাধকের মনোবৃত্তি ক্রমে পরিশুদ্ধ হয়ে আসে; তাঁর ইন্দ্রিয়ানুরাগ ক্রমে রূপায়িত হয় ঈশ্বর-প্রেমে। যেমন, কতকগুলি তান্ত্রিক ক্রিয়ায় পুরুষ সাধকের নিকট কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিতে স্ত্রীলোকের উপস্থিতির বিধান আছে। বিধান আছে, সাধক সে-সব দেখবে, কিন্তু কামানার দৃষ্টি দিয়ে নয়; সে-সময় এগুলিকে জগন্মাতার পবিত্র লীলাবিলাস ব'লে তাঁকে ভাবতে হবে। সাধককে এভাবে নিজ পাশবিক কামনা সংযত ক'রে তার ঊর্ধ্বে উঠে যেতে হয়। তন্ত্রশাস্ত্র সাধককে জ্ঞান-যোগীর মতো প্রলোভনকে এড়িয়ে চলতে বলে না, কাম্যবস্তুর সম্মুখীন হয়ে বীরের মতো বুক ফুলিয়ে তাকে অতিক্রম ক'রে যেতে বলে। তান্ত্রিক সাধনায় এভাবে দেহকে জয় ক'রে মনকে আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভের উপযোগী ক'রে তুলতে হয়।

সেজন্য তান্ত্রিক সাধনায় কয়েকটি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান খুবই বিপজ্জনক। সাধন-পথের এসব অংশে সাধকের মন অল্প সময়ে অনেক উঁচুতে উঠে যায় বটে, কিন্তু এদিকে চলার বিপদও তেমনি অনেক বেশী। ইন্দ্রিয়াসক্ত মনকে টেনে নামিয়ে আনার জন্য চোরা গর্ত ও ফাঁদের অভাব নেই এখানে; একটু অসাবধান হলেই সাধকের পদস্খলন হবার ও ভ্রষ্টতার গহ্বরে তলিয়ে যাবার ভয় খুব বেশী। শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য তাঁর মায়ের কৃপায় স্ত্রীলোকমাত্রেই মাতৃজ্ঞান থেকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে, এবং তন্ত্রসাধনার সঙ্গে অতি-জড়িত কারণ-বারি বিন্দুমাত্রও পান না ক'রে তন্ত্রসাধনার সমস্ত ক্রিয়াগুলিই সমাধা ক'রে গেছেন। প্রতিবারেই ক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠানের পর জপ করতে বসা মাত্র তাঁর দিব্য ভাবাবেশ হ'ত, আর সঙ্গে সঙ্গে গভীর সমাধিতে মগ্ন হয়ে যেতেন তিনি। ইন্দ্রিয়োদ্দীপক বিষয়গুলি তাঁর ঊর্ধ্বগামী মনের নাগাল কোন কালেই পায়নি; কোন বিপথগামিত্বই তার ঊর্ধ্ব-গমনে মুহূর্তের জন্যও বাধা দিতে পারেনি। তাছাড়া, বিহিত সাধনগুলির যে-কোনটিতে সিদ্ধ হ'তে কখনও তিন দিনের বেশী

সময় তাঁর লাগেনি। এটিও কম আশ্চর্যের কথা নয়।

তন্ত্রসাধনার ফল তিনি হাতেহাতে পেয়েছিলেন। এই সময় অতি অল্পকালের ব্যবধানে একের পর এক বহুবিধ দর্শনলাভ করেছিলেন তিনি। অসংখ্য দেবীমূর্তির দর্শন পেয়েছিলেন; শাস্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে তাঁদের চেহারা হুবহু মিলে যায়। দর্শনকালে অনেকেই তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, উপদেশ দিয়েছেন বহুভাবে। এ-সময় তিনি যে-সব দেবীর দর্শন লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরীর রূপলাবণ্যই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী ব'লে মনে হয়েছিল। একদিন সৃষ্টির প্রতীকরূপে একটি বিরাট জ্যোতির্ময় ত্রিকোণ দেখেছিলেন, দেখেছিলেন, তার ভেতর থেকে অসংখ্য জগৎ বেড়িয়ে আসছে। আর একদিন অচিন্ত্য মহাশক্তি মায়ার সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের প্রতীকরূপে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলেন। দেখেন যে, গঙ্গাগর্ভ থেকে ধীরপদক্ষেপে একজন পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক উঠে এলেন। উঠে এসেই একটি সন্তান প্রসব করলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরম আগ্রহ নিয়ে সন্তানটিকে আদর করার পর ভীষণা মূর্তি ধারণ ক'রে সন্তানটিকে নিজের মুখে পুরে চিবিয়ে খেয়ে ফেললেন। শেষে আবার গঙ্গাগর্ভে ফিরে গিয়ে গঙ্গায় লীন হ'য়ে গেলেন।

এই সময় তিনি তন্ত্র- ও যোগশাস্ত্র-বর্ণিত কুলকুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেকেরই মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে কেন্দ্রস্থ নালীর সর্বনিম্ন প্রান্তে এই দৈবীশক্তি কুণ্ডলীকৃতা হয়ে অবস্থান করেন। অধ্যাত্ম-সাধনার ফলে যখন এই কুণ্ডলিনী শক্তি উপরের দিকে উঠতে থাকেন, তখন তাঁর উর্ধ্বগমনের বিভিন্ন অবস্থায় সাধকের বিভিন্ন প্রকার অধ্যাত্ম-অনুভূতি আসতে থাকে। চরম সত্তার সঙ্গে একাত্মবোধই এই অনুভূতির পরিসমাপ্তি। তাছাড়া শাস্ত্রে আছে, বিভিন্ন কালে উর্ধ্বগমনের সময়ে কুলকুণ্ডলিনী পাঁচপ্রকার বিভিন্ন গতি অবলম্বনে সঞ্চরণ ক'রে থাকেন। এই পাঁচপ্রকার গতির সবগুলিই শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কুণ্ডলিনী শক্তির উত্থানের সময় গমনপথের বিভিন্ন স্থানে তাঁর অবস্থানকালে সাধকের যত রকম ভাব ও দর্শনের বর্ণনা শাস্ত্রে আছে, তার সবগুলিরই উপলব্ধি হয়েছিল তাঁর। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সব উপলব্ধি শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা প্রমাণিত করেছে।

তাছাড়া, তান্ত্রিক সাধনার ফলে যে অষ্ট-সিদ্ধি বা অলৌকিক শক্তিলাভের কথা শাস্ত্রে আছে, সে-সব শক্তিও এসেছিল তাঁর মধ্যে। কিন্তু মা-কালীর কৃপায় সেগুলিকে অতি তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞানে উপেক্ষা করতে শিখেছিলেন তিনি। সাধনকালে তাঁর শরীর সর্বরোগ-বিনির্মুক্ত ছিল, দেহবর্ণ হয়েছিল সোনার মতো। তাঁর রূপ দেখে লোকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকত; সাধারণের দৃষ্টি এড়াবার জন্য মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখতেন তিনি। বাইরের এই রূপ ফিরিয়ে নেবার জন্য জগন্মাতার কাছে প্রার্থনাও করেছিলেন।

কাম ও সুরাপানের সঙ্গে ঈষন্মাত্র সম্পর্ক না রেখেও তান্ত্রিক সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ যে অপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে এই সব প্রাচীন সাধনাগুলির পবিত্র ভাবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ভগবান্-লাভের নিশ্চিত ও স্বতন্ত্র পথ ব'লে সদ্য-সমর্থনও দিয়েছে এগুলিকে।

উদ্বোধন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমরা কর নূতন যুগের উদ্বোধন,
স্বাধীন সবল দিব্য হউক দেহ মন।
তুষ্টিতে যাঁর তুষ্ট জগৎ,
খোঁজ তাঁকে, পাবার কি পথ ?
কুটুম্বিতায় তোমরা ভর এই ভুবন।

মানুষ হউক মনুষ্যত্বে পূর্ণ হে,
দম্ভ দ্বেষ ও দর্প হউক চূর্ণ হে।
আত্মীয় হোক সকল জাতি,
সব ঘরেতেই পূজার বাতি,
দৈন্য হউক দূরীভূত তূর্ণ হে।

মানব-জাতি ব্রাহ্মণ হোক ভক্তিতে,
উদারতা পবিত্রতা নিষ্ঠা অনুরক্তিতে।
অমৃতের হোক অংশ-ভাগী,
যেমন ভোগী, তেমনি ত্যাগী,
মিলিত হোক সংযম এবং শক্তিতে।

বিজ্ঞানী মন উড়াক রকেট ফানুষ গো,
সৃষ্টিনাশক না হয় যেন মানুষ গো।
গ্রহে গ্রহে নিমন্ত্রণে
যাউক সুধার অন্বেষণে,
অহঙ্কারে হয় না যেন বেঁহুস গো।

যাঁহার দেওয়া শক্তিতে যে শক্তিমান্,
অপব্যয় না করে যেন তাঁহার দান।
ঐশ্বর্য তার বাড়ুক যত
বিনয়ে রয় মাথা নত,
প্রীত রহেন দর্পহারী ভগবান্।

এত বিপদ্ বিড়ম্বনা বাড়ত না,
চললে তাঁহার বিরামবিহীন অর্চনা।
জোড় হাতে ও হাঁটু গাড়ি,
নিতে হবে কৃপা তাঁরি,
দিতে পারে তপ-ফল তাঁর প্রার্থনা।

স্বামী বিবেকানন্দ ও মাতৃপূজা

ডক্টর রমা চৌধুরী

আজ পুনরায় পরমশুভ মাতৃপূজার কাল সমাসন্ন, যখন আমরা সকলে আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে সর্ব প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ করছি সেই মহামাতৃগাথা :

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫। ৭৩)

বস্তুতঃ শ্রীভগবান্‌কে নানারূপে ধ্যান-ধারণা করা যায়—পিতা-রূপে, মাতা-রূপে, পতি-রূপে, সখা-রূপে, সন্তান-রূপে ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের ভারতীয় মতে সাংসারিক ক্ষেত্রে যেরূপ, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সেরূপ মাতৃরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ। সেজন্যই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা মাতৃপূজা, সেজন্যই আমাদের পুণ্যশ্লোক অবতার, মুনি, ঋষি, জ্ঞানী ও গুণিগণ যুগে যুগে এই মাতৃলীলাই প্রকটিত করেছেন পূর্ণতম গৌরবে। তাঁদেরই মধ্যে একজন বরেণ্য অগ্রগণ্য ছিলেন যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর তেজোদৃপ্ত ভাষণে ও রচনায় কি মধুরভাবেই না তিনি মাতৃতত্ত্ব প্রপঞ্চিত করেছেন নানাভাবে। একটি মাত্র উদাহরণই নেওয়া যাক :

'She is Life, She is Intelligence, She is Love'. (7-24) তিনি প্রাণ, তিনি জ্ঞান, তিনি প্রেম।

অর্থাৎ ভারতীয় দর্শনের ভাষায় তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপা।

প্রথমতঃ তিনি সৎ বা প্রাণ। বস্তুতঃ এরূপ সত্তা, স্থিতি বা অস্তিত্বই পারমার্থিক বা ব্যাবহারিক যে-কোন বস্তুর বা তত্ত্বের প্রথম কথা। সেজন্য সুবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন বৃহদারণ্যকোপনিষদে অতি সুন্দরভাবে বলা আছে :

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যহরৎ।

—এই জগৎ পূর্বে পুরুষরূপ আত্মারূপে বর্তমান ছিল। সেই আত্মা চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে নিজেকে ভিন্ন আর কিছুই দেখলেন না। তিনি প্রথমেই বললেন, 'আমি আছি'।

এই 'আমি আছি'ই হ'ল সর্ববস্তুর, সর্বসত্তার, সর্বতত্ত্বের, সর্বসত্যের সর্বপ্রথম কথা।

ভারতীয় মতে—এরূপ অস্তিত্ব নিত্য নির্বিকার নিরঞ্জন অস্তিত্ব। তাঁর হ্রাস নেই, বৃদ্ধি নেই; সুখ নেই, দুঃখ নেই; পাপ নেই, পুণ্য নেই; আকৃতি নেই, প্রবৃত্তি নেই। তবে কি আছে? আছে কেবল পরিপূর্ণ সত্তা, শাশ্বত শান্তত্ব। সেজন্যই তিনি 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' (মাণ্ডূক্যোপনিষদ্)—শান্ত, শিব, অদ্বৈত। তিনি 'শান্ত' কেন? কারণ তাঁর কামনা করবার কিছুই নেই, প্রচেষ্টা করবার কিছুই নেই, আশা করবার কিছুই নেই—অর্থাৎ চঞ্চল হবার কিছুই নেই। তিনি নিত্যপূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যমুক্ত। শঙ্কর প্রভৃতির বিবর্তবাদ-মতে তাঁর পরিণাম নেই, রামানুজ প্রভৃতির পরিণামবাদ-মতে তাঁর পরিণাম আছে। কিন্তু উভয়মতেই তাঁর বিকার নেই, পরিণাম থাকলেও পরিবর্তন নেই। সেজন্যই ভারতীয় মতে 'সত্য' ও 'নিত্য' সমার্থক—যা সত্য, তা চিরস্থায়ী—সত্য অস্থায়ী, অল্পস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী হতেই পারে না। এই অর্থেই তিনি 'সৎ'!

কিন্তু তিনি অজড়, জড় নন। এই অর্থেই তিনি 'চিৎ'। তিনি চির-উজ্জ্বল। 'উজ্জ্বলতা' কি? উজ্জ্বলতা আত্মস্থিতি, আত্মশক্তি, আত্মপূর্ণতা। কারণ 'জ্ঞানের' অর্থ আত্মদীপন, যেস্থলে জ্ঞাতা নেই, জ্ঞেয় নেই, কোন কিছুকে জানা নেই, অথচ জ্ঞান আছে, পূর্ণ নিত্য জ্ঞান আছে,—যেমন সূর্য। আলোকই তার স্বরূপ—তার কার্য নয় নিজেকে প্রকাশ করা, অন্যদের প্রকাশ করা, কিন্তু তার স্বরূপ কেবলই দেদীপ্যমান হওয়া; যেহেতু তার প্রকাশ দেখবার জন্য কেউ থাকুক বা না থাকুক, তার দ্বারা প্রকাশিত হবার কোন কিছু থাকুক বা না থাকুক, তা চিরকালই প্রকাশশীল। একই ভাবে যিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাঁরও কার্য নয় নিজেকে জানা, অথবা অপরকে জানা। কিন্তু তাঁর স্বরূপ কেবলই চির-ভাস্বররূপে বিরাজ করা।

এরূপ ভাস্বরত্বই আনন্দস্বরূপত্ব এবং আনন্দস্বরূপত্বই প্রেমস্বরূপত্ব। এস্থলেও পূর্ববৎ কেবল আনন্দই আছে, আনন্দোপভোগও নেই, আনন্দ-যোগ্য কোন কিছুই নেই; কেবল প্রেমই আছে, প্রেমলীলাও নেই, প্রিয়ও নেই।

কিন্তু এ কি এক অত্যাশ্চর্য, অচিন্তনীয়, অসম্ভব অবস্থা নয়? স্থিতি আছে, অথচ পরিবর্তন নেই; জ্ঞান আছে, অথচ জানা নেই; প্রেম আছে, অথচ ভালবাসা নেই—এ কি ক'রে সম্ভব? তা হ'লে সংসারই বা কি, এবং তার সঙ্গে এই নিরপেক্ষা সচ্চিদানন্দময়ী জননীর সম্বন্ধই বা কি?

স্বামীজী বলেছেন: 'She is in the universe, yet separate from it.' (7-24)

—তিনি জগতেই আছেন, অথচ জগৎ থেকে ভিন্ন।

এ হ'ল সৃষ্টির দিকের কথা, সংসারের দিকের কথা, পরিণামবাদের দিকের কথা। এই দিক্ থেকে তিনি কারণরূপে কার্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হয়েছেন। সেজন্য তিনি কার্যে ওতপ্রোত হয়ে আছেন, অথচ কার্য থেকে ভিন্ন, যেহেতু কার্য-কারণ-সম্বন্ধ ভিন্নাভিন্ন-সম্বন্ধ। এই দিক্ থেকে তিনি যেন লীলাভরে নিজেকে দুই অংশে বিভক্ত ক'রে নিজেকেই নিজের থেকে যেন মায়া দ্বারা আবৃত করছেন, নিজেকেই নিজের থেকে যেন বিচ্ছিন্ন করছেন, নিজেকেই নিজের সঙ্গে যেন সংযুক্ত করছেন। এই তো হ'ল তাঁর লীলা, এই তো হ'ল তাঁর মায়া।

এরূপে জগজ্জননী একাধারে সচ্চিদানন্দস্বরূপা ও লীলা-মায়াময়ী। একদিকে তিনি ব্রহ্ম, অন্যদিকে তিনি শক্তি। কিন্তু পরিশেষে সবই তিনিই, একমাত্র তিনিই, শাশ্বতকাল তিনিই। সংসারই বা কি, আর বন্ধই বা কি; জীবই বা কি, আর জগৎই বা কি, কিছুই মিথ্যা নয়, কিছুই মায়া নয়, সবই তিনি।

'There is neither existence, nor non-existence, all is Atman. Shake off all ideas of relativity, shake off all superstition; let caste and birth and Devas and all else vanish. Why talk of being and becoming? Give up talking of Dualism and Advaitism. When were you two, that you talk of two or one? The Universe is this Holy One and He alone. Talk not of Yoga to make you pure: you are pure by your own nature. None can teach you.' (7-71).

—সৎও নেই, অসৎও নেই, সবই আত্মা। আপেক্ষিকতার সমস্ত ধারণা দূর ক'রে দাও; সমস্ত কুসংস্কার দূর ক'রে দাও; সমস্ত জাতি জন্ম, দেবতা এবং আর সব কিছুই তিরোহিত হয়ে যাক। সত্তা ও পরিণাম বিষয়ে ব'লছ কেন?

দ্বৈত, অদ্বৈত সম্বন্ধে বলা ত্যাগ কর। তুমি কবে দুই ছিলে যে, দুই বা এক সম্বন্ধে তুমি ব'লছ? জগৎ সেই পবিত্র আত্মা, সেই পবিত্র আত্মাই কেবল। যোগের কথা ব'লো না, যা তোমাকে শুদ্ধ করবে। তুমি স্বভাবতই শুদ্ধ। তোমাকে কেউ শেখাতে পারে না।

কিন্তু সবই যদি এক হয়, তা হ'লে পূজার সম্ভাবনা কোথায়, এবং সার্থকতাই বা কি?

'Whom to worship? Who worships? All is Atman'. (7-72)

—কাকেই বা পূজা করবে? কেই বা পূজা করবে? সবই তো আত্মা।

তা হ'লে মাতৃপূজা কি অসম্ভব, অসার্থক? না, তা নয়, যেহেতু এরূপ পূজার মাধ্যমেই ক্রমশঃ উদয় হয় 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-রূপ মহোপলব্ধি। আমরা জগজ্জননী থেকে ভিন্ন নই, ভিন্নাভিন্ন; আমরা জগজ্জননী থেকে ভিন্নাভিন্নও নই, অভিন্ন—এরূপ উপলব্ধি হয় ক্রমশঃ; এবং এতেই পূজার সার্থকতা ও পরম-চরম বিকাশ।

Stand up, then. This is the highest worship. You are one with the Universe···the highest creed is Oneness.' (1-340)

—দণ্ডায়মান হও। এই তো হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা। তুমি বিশ্বের সঙ্গে অভিন্ন। একত্বই সর্বোচ্চ ধর্ম।

অনেক দিয়েছ তুমি

শ্রীশান্তশীল দাশ

অনেক দিয়েছ তুমি। কতটুকু যোগ্যতা আমার।
রিক্ত আমি, তাই বুঝি দয়াময়, আমার ভাণ্ডার
ভরে দিলে কত আলো, কত গান, কত ধন জনে;
কত না ঐশ্বর্য—যার এতটুকু পাব যে তা মনে
কোনদিন ছিল না তো! পাব যে সে-পাওয়ার যোগ্যতা
কোথায় আমার বলো? এক পাশে তাই এ দীনতা
নিয়ে আমি জনতার কাছ হ'তে দূরে, বহুদূরে
আমার নিভৃত নীড় রচেছিনু; আর মৃদুস্বরে
আমার মনের কথা বলেছিনু, কারো কাছে নয়;
অভিযোগ ছিল না তো, তার মাঝে মোর পরিচয়
ছিল শুধু—অনেকের মাঝে আমি অতি সাধারণ
ছিলাম দীনতা নিয়ে এক কোণে, কোন আভরণ
ছিল না কো, কোন চিহ্ন; তুমি ভেঙে দিলে সেই ঘর,
নিয়ে এলে এ আমাকে সুবিশাল এই বিশ্ব'পর
অনেকের কাছে; আর দিলে ভ'রে আমার ভাণ্ডার
কত আলো, কত গানে—অহেতুকী তোমার কৃপার
অজস্র ঐশ্বর্য দিলে পূর্ণ ক'রে রিক্ত এ জীবন:
অনন্ত কৃপার খনি প্রেমময় তুমি নারায়ণ।

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা

[দ্বিতীয় পর্ব—পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

৮ (মারাঠা)

অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠা ও শিখ—ভারতের এই দুটি সম্ভাবনাময় জাতির উত্থানের কাহিনী যেমন বিচিত্র ও বিস্ময়কর, অবলুপ্তির কাহিনীও তেমনই আকস্মিক ও বেদনাদায়ক। সংশ্লিষ্ট ইতিহাস-গ্রন্থসমূহে বর্ণিত এই উত্থান-অবলুপ্তির বহিরঙ্গ ঘটনাবলীর পশ্চাতে যথাক্রমে যে ভাবসমৃদ্ধি এবং ভাবগত দৈন্য রয়েছে, স্বামীজীর ইতিহাস-চেতনায় তারা প্রতিবিম্বিত। তাঁর এই অভিনব দিগ্‌দর্শন ভারতের সামগ্রিক ইতিহাস-অনুশীলনের যে অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ, সে-কথাই অতীত ও মধ্যযুগের ধারাবাহিক বিশ্লেষণে বলতে প্রয়াস করেছি। বলা বাহুল্য যে, এই বিশ্লেষণের পশ্চাতে বর্তমান লেখকের স্বয়ংসম্পূর্ণতার বা ত্রুটিশূন্যতার কোন দাবি নেই।

পুনার পেশোয়ার অধিনায়কত্বে মারাঠার নব অভ্যুত্থানের এবং শেষ পরিণতির খুঁটিনাটি এ-স্থানে আলোচ্য নয়। দু-একটি ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে মাত্র। ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে দীর্ঘ-কালস্থায়ী সংগ্রাম মারাঠার জাতীয় জীবনেও কম বিপর্যয় ঘটায়নি। স্বাধীনতা তার বজায় রইল বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্রের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে নামলো বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য আর অরাজকতা। এ থেকে মারাঠাজাতিকে উদ্ধার করলেন পুনার চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-বংশের সন্তান বালাজি বিশ্বনাথ। শিবাজীর পৌত্র ছত্রপতি শাহু তাঁকে পেশোয়া-পদে বরণ করলেন ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে। কাগজে-কলমে যাই হোক না কেন, তখন থেকে ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন শক্তির দৌলতে পুনার পেশোয়া হলেন মারাঠা রাষ্ট্রের পুরোধা। সাতারায় বসে ছত্রপতি তাঁকে মাঝে মাঝে পরামর্শ দিয়ে এবং তাঁর সর্বকার্যে অনুমোদন দান ক'রে প্রভুত্ব বজায় রাখছেন মাত্র। শাহুর মৃত্যুর (১৭৪৯) পরে সাতারার সকল মর্যাদা এমনকি নাম পর্যন্ত মারাঠা-রাজনীতি থেকে মুছে গেল।

১৭২০ খৃঃ পিতার মৃত্যুর পর পেশোয়া হলেন বাজিরাও। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতির বদ্ধ জলাশয়ের গভীর পঙ্কে এই একটি পঙ্কজ। মারাঠা-জাতির ইতিহাসে শিবাজীর পরেই বাজিরাও-এর স্থান। তৎকালীন জটিল রাজনীতির ও কূটনীতির আবর্তে আন্দোলিত হয়েও পেশোয়া বাজিরাও মারাঠা-জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষার বলিষ্ঠ ও ধর্মনিষ্ঠ রূপায়ণে সফলতা অর্জন করেছিলেন। শিবাজীর স্বপ্ন ও সাধনাকে ব্যাপকতর রূপ আরোপ করতে গিয়ে তিনি পরিকল্পনা করলেন ভারতজোড়া 'হিন্দুপদ-পাদশাহী'র। তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা জাতির এই মহা-শক্তিধর অধিনায়কের উচ্চাভিলাষের অনুকূল ছিল। তাঁর নিজের এবং সিন্ধিয়া হোলকার গাইকোয়াড় ভোঁসলে প্রমুখ মারাঠা-নায়কদের কর্মতৎপরতায় দাক্ষিণাত্যের সঙ্ঘবদ্ধ মারাঠা-জাতি প্রাধান্য স্থাপন করলে ভারতের সর্বদিকে, উত্তরে, দক্ষিণে ও পূর্বে। দুর্বল পরমুখাপেক্ষী দিল্লীর মুঘল সম্রাট্ মারাঠার এই অপূর্ব প্রসার-লাভের অসহায় দর্শক-মাত্র। এই নায়কদের

কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল মারাঠা সামন্তচক্র। উত্তরকালে ইতিহাসের অমোঘ নিয়তির বিধানে তৎকালীন ব্যাপক দুর্নীতির পঙ্কিলতায় কলঙ্কিত এই সামন্তচক্রই জাতীয় অনৈক্যের প্রতিভূ হয়ে দারুণ স্বার্থের কোলাহলে মারাঠার পতন ও অবলুপ্তিকে অনিবার্য ক'রে তুলেছিল।

রাজতন্ত্রে বা একনায়ক-তন্ত্রে রাজধানী ও রাজদরবারের আবহাওয়া সমগ্র দেশের আবহাওয়ার চাবিকাঠি-স্বরূপ। জাতি প্রভাবিত হয় নেতৃত্বের চরিত্র দ্বারা। জাতির নেতৃত্বে শুধু সামরিক প্রতিভা এবং কূটনৈতিক দক্ষতা থাকলে সে-জাতি সাময়িক-ভাবে প্রাধান্য স্থাপন হয়তো করতে পারে, কিন্তু সে-প্রাধান্য বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী। কোন জাতি বা দেশের বড় হবার এবং আঘাতের পর আঘাত খেয়েও নত হয়ে না পড়ার পেছনের রহস্য তার ধর্মপ্রাণতা এবং আদর্শনিষ্ঠা। ভারতের ইতিহাসে এর সত্যতা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। তুকারাম - নামদেব - রামদাসের আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ মারাঠা-জাতির বলিষ্ঠ নায়ক শিবাজীর ভাবাদর্শ বাজিরাও-এর আমলেও একেবারে ফিকে হয়ে যায়নি। যে উদার ধর্ম এদেশের ইতিহাস গড়েছে, সে-ধর্ম তাঁর শক্তির উৎস-স্বরূপ ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর দিগন্ত-বিস্তৃত আঁধারে তখনও তা মারাঠা-চরিত্র থেকে হারিয়ে যায়নি।

প্রমাণ-স্বরূপ একটি ক্ষুদ্র কিন্তু তাৎপর্যময় কাহিনীর অবতারণা করা যেতে পারে।

পারস্য-সম্রাট্ নাদিরশাহের ভারত-আক্রমণ ও দিল্লী-লুণ্ঠন বাজিরাও-এর মৃত্যুর একবছর আগের ঘটনা। বাজীরাও মুঘলের শত্রু, কিন্তু বিদেশী নাদিরের বিরুদ্ধে মুঘলের পরম মিত্র। বাজিরাও-এর 'হিন্দুপদ-পাদশাহী'র পরিকল্পনায় ভারত থেকে মুসলমান উৎসাদনের অবান্তর কর্মসূচি কখনও স্থান পায়নি। একদা মুঘল আকবরের অধিনায়কত্বে যে মহাভারত হিন্দু-মুসলমান-মিলনে গড়ে উঠেছিল, মনে হয় মারাঠা পাদশাহীতে সেই ভারতকেই জাগ্রত করার প্রয়াস তিনি করেছিলেন। হায়দারাবাদের নিজাম তখন মুঘলশক্তির একমাত্র নির্ভরস্থল, তিনিই প্রধান উজীর মুঘল সম্রাটের। আবার দাক্ষিণাত্যে হায়দারাবাদই সবচেয়ে বড় মুস্লিম-রাজ্য, মারাঠা-রাজ্যের প্রতিবেশী ও আজন্ম-প্রতিদ্বন্দ্বী। পরমশত্রু এই নিজামের সঙ্গে এবার মৈত্রীর প্রস্তাব ক'রে লিপি প্রেরণ করলেন পেশোয়া বাজিরাও, যিনি ভেবেছিলেন যে, বৈদেশিক নাদিরের আক্রমণে শুধু উত্তর ভারত নয়, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতাই বিপন্ন। সেই লিপির বার্তা ছিল এইরূপ: দাক্ষিণাত্যের হিন্দু ও মুসলমান, এই পরম সংকটে এসো আমরা চিরাচরিত বিবাদ ভুলে গিয়ে সম্মিলিত হই, আমাদের সংহত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি নাদিরের সেনাবাহিনীর উপর। আমি আমার বিপুল মারাঠা-বাহিনী দিয়ে দাক্ষিণাত্যের নর্মদা থেকে উত্তর ভারতের চম্বল পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড ছেয়ে ফেলব।

শ্রেষ্ঠ মারাঠা-সেনাপতি চিমনাজি (বাজিরাও-এর ভ্রাতা) তখন পর্তুগীজদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বেসিন অবরোধ করেছিলেন। বাজিরাও তৎক্ষণাৎ আদেশ পাঠালেন, ও-কাজ অসমাপ্ত রেখে চিমনাজি যেন সর্বশক্তি নিয়ে উত্তর ভারতে অগ্রসর হন, বিপন্ন মুঘলের সাহায্যে—দস্যু নাদিরশাহের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে বেসিনের পতন হয়েছে, পর্তুগীজ চিমনাজির হাতে পর্যুদস্ত। দেরিতে আদেশ পেয়ে চিমনাজি সসৈন্যে যাত্রা করলেন উত্তর ভারতে। কিন্তু তাঁর পৌঁছানোর পূর্বেই মুঘলের তথা ভারতের বহু মণি-মাণিক্য লুণ্ঠন

ক'রে দিল্লী ছারখার ক'রে দিয়ে নাদির স্বদেশে ফিরে গেছেন। তারপর ১৭৪০ খৃঃ বাজিরাও-এর মৃত্যু হ'ল। পেশোয়া হলেন পুত্র বালাজি বাজিরাও।

বাজিরাও-এর উদার জাতীয়তাবাদ ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে তৎকালীন রাজনীতির আকাশজোড়া নিবিড় কৃষ্ণমেঘের কোলে ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুৎ-ঝলকানি মাত্র। শিবাজীর বলিষ্ঠ কর্মযোগের আংশিক উত্তরাধিকারী বাজিরাও পুত্র বালাজি বাজিরাওকে দিয়ে গেলেন বিরাট্ সাম্রাজ্যের সম্ভাবনা আর বিপুল সম্মান। কিন্তু দিয়ে যেতে পারলেন না সেই ধর্মাশ্রয়ী আদর্শ, যা মারাঠা-জাতিকে প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে (শিবাজীর আবির্ভাব কাল থেকে) অসামান্য বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল রেখেছিল। ছত্রপতি শিবাজীর রায়গড়ে গুরু রামদাস ছিলেন, ছিল গৈরিক পতাকা ; পেশোয়া বাজিরাও-এর পুনায় আর কোন রামদাস এলেন না আধ্যাত্মিক চৈতন্যের শক্তিমন্ত্রে 'হিন্দুপদ-পাদশাহীকে' অভিষিক্ত করতে, জাতিকে নূতন ক'রে দীক্ষা দিতে। নামদেব-তুকারাম-রামদাসের ভাবসমৃদ্ধির ভাণ্ডারে আর কিছু জমা প'ড়ল না, ব্যয়ের আধিক্যে তা বুঝি নিঃশেষ হবার উপক্রম হ'ল।

১৮৯৪ খৃঃ মাদ্রাজবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে আমেরিকার বস্টন শহর থেকে স্বামীজী একটি দীর্ঘ লিপি প্রেরণ করেন। ভারতেতিহাসের ধারার সূত্রকার স্বামী বিবেকানন্দ তাতে হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতার পটভূমিকায় ভবিষ্যৎ ভারতের এক উজ্জ্বল ছবি এঁকেছেন। 'ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে। বিনাশের বিজয়-পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ-সহায়ে। অর্থের শক্তিতে নয়, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে।'—জানি না, এভাবে ভারত কবে আবার উঠবে। এটুকু জানি, একদা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে গুরু রামদাসের গৈরিক পতাকাতলে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে শিবাজী এসেছিলেন, মারাঠা জেগেছিল চৈতন্যের শক্তিতে।

বালাজি বাজিরাও-এর আমলে মারাঠা-জাতির এই চৈতন্যশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। আপাতদৃষ্টিতে বালাজি বাজিরাও বাজিরাও-এর যোগ্য উত্তরাধিকারী, পিতার আরব্ধ কার্যের সন্তোষজনক সমাপ্তি-সাধনকারী। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে প্রসারিত মারাঠা-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ পুনার পেশোয়া বালাজি বাজিরাও, দিল্লীর মুঘল সম্রাট্ মারাঠার আদেশের অপেক্ষায় নতমস্তক, চৌথ ও সরদেশমুখীর ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে বা তার ভয়ে অন্যান্য ভারতীয় রাজা ও নবাবগণ অবনত ও সন্ত্রস্ত। কিন্তু এই অপূর্ব সাফল্যের পশ্চাতে ছিল জড়শক্তির খেলা, বালাজি বাজিরাও-এর হিন্দুপদ-পাদশাহীর রূপায়ণে ছিল প্রচণ্ড ফাঁকি বা কূটনৈতিক চালাকি।

কিন্তু চালাকির দ্বারা কোন মহৎকার্য সম্পন্ন হয় না—এ স্বামীজীরই কথা। তাই প্রচণ্ড আকস্মিকতায় হিন্দুপদ-পাদশাহীর সমাধি রচিত হ'ল পানিপথের রণক্ষেত্রে ১৭৬১ খৃঃ, বাজিরাও-এর পরিকল্পনা ইতিহাসের ব্যর্থ পরিহাস হয়ে রইল। বালাজি বাজিরাও আর বেশিদিন বাঁচেননি।

একটা রণক্ষেত্র কেমন ক'রে এতবড় একটা শক্তিকে একেবারে ধরাশায়ী করলে! ইতিহাস বাইরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার খুঁটিনাটি বিচার করেছে। স্বামীজী করেছেন অন্তর্দৃষ্টি

দিয়ে বিচার। তাঁর মতে মারাঠা-জাগরণ (এবং শিখেরও জাগরণ) 'প্রতিক্রিয়াশীল' ছিল, এ ছিল 'ধর্মান্ধ গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধি-স্বরূপ, উভয়েই (মারাঠা ও শিখ) মুসলমান রাজত্ব-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সকল প্রেরণা ও কর্মপ্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল।' স্বামীজীর দেহাবসানের আট বছর পরে ১৩১৬ সালে চৈত্রমাসের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের দেশে বারংবার ইহাই দেখা গিয়াছে যে, এখানে শক্তির উদ্ভব হয়, কিন্তু তাহার ধারাবাহিকতা থাকে না। মহাপুরুষেরা আসেন এবং তাঁহারা চলিয়া যান—তাঁহাদের আবির্ভাবকে ধারণ করিবার, পালন করিবার, তাহাকে পূর্ণ পরিণত করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক সুযোগ এখানে নাই।—ইহার কারণ আমাদের বিচ্ছিন্নতা। যে মাটিতে আঠা একেবারেই নাই, সেখানেও বায়ুর বেগে বা পাখির মুখে বীজ আসিয়া পড়ে, কিন্তু তাহা অঙ্কুরিত হয় না, অথবা দু-চারটি পাতা বাহির হইয়া মুষড়িয়া যায়।'

ভারতের এই অভিশাপ মহা-কবির লেখনীতে অপূর্ব ভাষা পেয়েছে! মারাঠা ও শিখ ইতিহাসে এ-কথা নির্মমভাবে সত্য। ওই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, 'শিবাজীর মনে যাহা বিশুদ্ধ ছিল, পেশোয়াদের মধ্যে তাহা ক্রমে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতারূপে কলুষিত হইয়া উঠিল।'

এ মন্তব্য বিশেষভাবে বালাজি বাজিরাও-এর কর্মধারায় প্রযোজ্য। যে ঐক্য রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ভাবের বাহন', সে ঐক্য বাজিরাও-এর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও বিচক্ষণতা-গুণে কিছুকাল মহারাষ্ট্রে বজায় ছিল। অদূর অতীতের আধ্যাত্মিক জাগরণ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ভাবগত দৈন্যে তখনও ততটা প্রকট হয়নি, যদিও ভিতরে ভিতরে তার আয়োজন চলছিল। বাজিরাও-এর চরিত্র সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি মারাঠী সংহতি বা ভাবগত ঐক্যের উপর জোর না দিয়ে সাম্রাজ্য-বিস্তার ও ব্যক্তিগত প্রাধান্য-স্থাপনের কুটিল পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। শিবাজীর সংযম, বাস্তব বুদ্ধি এবং ঔদার্য বাজিরাও-এর ছিল না। বালাজি বাজিরাও-এর শাসন-পদ্ধতিতে এবং ব্যক্তিগত চরিত্রে এর প্রতিক্রিয়া নগ্ন হয়ে দেখা দিল। পুনার রাজদরবার থেকে ধর্ম নিল বিদায়। আকাশস্পর্শী দম্ভ, জটিল কূটনীতি আত্মসর্বস্বতা ও আদর্শহীনতার ফলে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য আত্মপ্রকাশ করলে।

বাইরের দৃষ্টিতে যদিও তখন মারাঠা-সাম্রাজ্য ক্ষমতার শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছে, তবু ভিতরে যে ঐক্যের বাঁধন, তা ছিল একেবারে বালির বাঁধ। নিজের প্রাধান্য সুরক্ষিত করতে বাজিরাও মারাঠা-সামন্তদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। ঐক্যবদ্ধ সুসংহত আদর্শনিষ্ঠ মারাঠা-জাতির প্রাধান্য তাঁর কাম্য ছিল না, ছিল নিজের একচ্ছত্র সম্রাট্ হবার অপরিসীম লোভ। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে ভাড়াটে ফিরিঙ্গিদের প্রাধান্য, নির্ভরতা জড়শক্তিতে—সমরনৈপুণ্যে এবং কূটকৌশলে। মারাঠা-নৌসেনাপতিদের অগ্রগণ্য আংরিয়াকে ব্যক্তিগত কারণে পর্যুদস্ত করাতে পেরে তিনি উল্লসিত। বিভিন্ন মারাঠা-নায়ক তাঁর শক্তির স্তম্ভ নয়, এক একটি পথের কণ্টক। সামন্ত-চক্রের অন্যান্য প্রধানেরাও এ ভাবগত দৈন্যে ব্যতিক্রম নন। একদা মুঘলের পদানত

রাজপুতেরা গোয়ালিওরের সিন্ধিয়া এবং ইন্দোরের হোলকারের আশ্রয় লাভ ক'রে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে ভেবেছিল, কিন্তু তাদের ভুল ভাঙতে দেরি হ'ল না। মারাঠার অত্যাচার ও শোষণ মুসলমানের কীর্তিকেও ছাপিয়ে গেল। মারাঠার 'হিন্দুপদ-পাদশাহী' অপর হিন্দুদের কাছে একটা বিভীষিকায় পরিণত হ'ল। নাগপুরের ভোঁস্‌লে রাজার বর্গির সৈন্যদল নিষ্ঠুর ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বাংলার বুকে যে তাণ্ডবনৃত্য করেছিল, তা বুঝি তৈমুর-নাদিরের দস্যুতাকেও হার মানায় বাংলার হিন্দুজনগণ নবাব আলিবর্দিখাঁকে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করেছিল, যখন তিনি ছলে বলে কৌশলে বর্গি-দস্যুদের পৈশাচিক অত্যাচার থেকে শেষপর্যন্ত তাদের রক্ষা করতে পেরেছিলেন। চৌথ ও সরদেশমুখী নিছক রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিবাজীও আদায় করতেন অপর ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট থেকে আকস্মিক আক্রমণ দ্বারা কিংবা ভীতি প্রদর্শন দ্বারা। কিন্তু পেশোয়াশাহী এই নিষ্ঠুর কর-আদায়কে একটানা দস্যুতা ও লুণ্ঠনের নামান্তরে পরিণত ক'রে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সহানুভূতি বা আনুগত্য হারিয়ে ফেলল।

সুতরাং মুক্তির বার্তা নেই বালাজী বাজিরাও-এর হিন্দুপদ-পাদশাহার রূপায়ণে, আছে দম্ভ, ধর্মান্ধতা, বিচ্ছিন্নতা আর পরপীড়ন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে যে বিরাট মারাঠাবাহিনী অনভিজ্ঞ যুবরাজ বিশ্বাসরাও এবং সদাশিবরাও ভাও-এর নেতৃত্বে প্রেরিত হ'ল, তা হিন্দুর শাশ্বত আদর্শে উদ্বুদ্ধ কোন সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয় বাহিনী নয়। পঞ্চমবার ভারতে অভিযানকারী আফগানরাজ আহ্‌মেদশাহ দুর্‌রানির সঙ্গে যে পঞ্জাবের অধিকার নিয়ে মারাঠাদের সংঘর্ষ, খাইবার গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত সেই পঞ্জাব-বিজয়ী মারাঠা নায়ক রঘুনাথরাও (বালাজি বাজিরাও-এর ভ্রাতা, পরবর্তীকালে জাতির শত্রু রাঘোবা নামে ইংরেজের মিত্র) এই যুদ্ধে অনুপস্থিত। বিভিন্ন নায়ক যাঁরা উপস্থিত, তাঁদের মধ্যেও রেষারেষির অন্ত নেই; অনভিজ্ঞ তরুণ বিশ্বাসরাও-এর পদাধিকার-বলে অধিনায়কত্ব প্রধান মারাঠা যোদ্ধাদের মনঃপূত ছিল না! পঞ্জাবের শিখেরা তখন গুরুগোবিন্দ সিংহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমান দুর্‌রানির পঞ্জাব অধিকারকে পদে পদে বিঘ্নিত করছে, তবুও তারা পানিপথের প্রান্তরে একই শত্রুর বিরুদ্ধে মারাঠার পাশে এসে দাঁড়ালো না। এল না রাজপুত তার শৌর্য আর দার্ঢ্য নিয়ে মারাঠাকে সাহায্য করতে। অথচ বিদেশী দুর্‌রানি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে পক্ষে টেনেছেন, দিল্লীর মুঘল সম্রাটের শুভেচ্ছা লাভ করেছেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ একটা বিরাট সম্ভাবনাময় জাতির আশাভরসা নির্মূল ক'রে দিয়ে ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা হয়ে রইল। বিজয়ী আহ্‌মেদশাহ দুর্‌রানি কিন্তু ফিরে গেলেন শুধু পঞ্জাবে তাঁর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে। ভারতীয় কোন নরপতিই এর কোন সুযোগ নিতে পারলেন না। পরোক্ষ সুবিধে হ'ল ইংরেজ-শক্তির, যা বঙ্গদেশ থেকে এবার পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে ক্রমে ভারতজোড়া সাম্রাজ্য-স্থাপনের সুবর্ণ সুযোগকে কার্যকর ক'রে তুলবে।

একটা কথা এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। হিন্দুপদ-পাদশাহীর স্বপ্ন বিলীন হয়ে গেল বটে, কিন্তু মারাঠাশক্তি তৎকালীন ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠশক্তিরূপে আরও অন্ততঃ চল্লিশ বছর টিকে রইল। এই অসামান্য কৃতিত্বের পশ্চাতে

যে কয়েকজন মারাঠা-নায়কের বলিষ্ঠ দান রয়েছে, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় বালাজি বাজিরাও-এর প্রতিভাবান্ পুত্র পরবর্তী পেশোয়া তরুণ মাধব রাও। মাধব রাও অসাধ্য-সাধন করেছিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, এই যুবকের অকালমৃত্যু মারাঠাদের ইতিহাসে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের চাইতেও বেশী বিপর্যয়কারী ঘটনা। আর একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি পরবর্তী পেশোয়াদের প্রধান অমাত্য নানা ফড়নবিশ। তিনিই মারাঠা-জাতির শেষ আলোক-রশ্মি। ১৮০০ খৃঃ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মারাঠার যেটুকু সংহতি ও বিচক্ষণতা ছিল, তা বিলীন হ'ল। তাঁরই জন্যে বাংলার প্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে মারাঠার জন্য ইংরেজের আধিপত্য-বিস্তারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। মাধব রাও ও নানা ফড়নবিশ জাতির সকল গ্লানি ও গলদকে ব্যক্তিগত বলিষ্ঠতা ও বিচক্ষণতা দ্বারা আড়াল করেছিলেন। অপূর্ব সংগঠন শক্তি দ্বারা অভ্যন্তরে ক্ষয়ে যাওয়া মারাঠা-রাষ্ট্রের বহিরঙ্গকে এমন ক'রে তাঁরা সাজিয়ে ছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদনীতি-রূপায়ণে অপূর্ব সাফল্যের অধিকারী লর্ড ওয়েলেসলির আমলেও ইংরেজের ধারণা ছিল যে, শেষ পর্যন্ত সমগ্র ভারতের আধিপত্য বিভক্ত হবে ইংরেজ আর মারাঠাদের মধ্যে। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ তখন আসন্ন। এই যুদ্ধে যখন মারাঠার অনৈক্য ও দুর্নীতি ইংরেজ-সাফল্যের পথ এত সুগম ও সহজ করলে, তখন ইংরেজও কম বিস্মিত হ'ল না। ১৮১৮ খৃঃ তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের ফলে লর্ড হেস্টিংস শতদ্রু নদী পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত ইংরেজ-অধিকারে আনলেন। মারাঠা-জাতির পতন সম্পূর্ণ হ'ল। এ-কথা সন্দেহাতীত যে ধর্মচ্যুত মারাঠা-জাতি নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে, ইংরেজ উপলক্ষ-মাত্র।

৯ (শিখ)

'……কোন সেনাপতি বা রাজা কোন কালে আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না, ঋষিগণই চিরকাল সমাজের নেতা।…… আমাদিগকে ধর্ম প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে। তখনই আমাদের মুখ হইতে যে-বাণী নির্গত হইবে, তাহা অব্যর্থ, অমোঘ ও শক্তিসম্পন্ন হইবে।'
(মাদুরা-অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিখ-জাগরণের গুরু গোবিন্দ সিংহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব-নিরূপণে স্বামীজীর এই বাণী স্মরণীয়। স্বামীজীর বাণী ও রচনায় একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি স্বভাবতই সর্বত্র ধর্মের কথা বলছেন, শাস্ত্র আলোচনা করছেন এবং তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও উপলব্ধি দ্বারা অতীতকে আশ্চর্যভাবে, বর্তমানের পটভূমিকায় জীবন্ত ক'রে তুলছেন। তাঁর ধ্যানে ও মননে চিন্ময় ভারত যেন মূর্ত হয়ে উঠছে। ভবিষ্যৎ ভারতের ছবি আঁকছেন তিনি শাশ্বত ভারতের এই মূর্তির ছকে। ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বল ছবিটি এই যে তিনি প্রসঙ্গক্রমে এঁকে যাচ্ছেন, তার পটভূমিতে রয়েছে তাঁর অমোঘ ধর্ম-সূত্রটি, যার ভাষ্য-হিসেবে অনায়াসে অতীত ও মধ্য-যুগের ইতিহাসের বহু ঘটনা উপস্থাপিত করা যায়। উপরি-উক্ত বাণীটি তাঁর আরও অনেক বাণীর মতো ইতিহাসের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে একটি উপলব্ধ সত্য। শিখদের উত্থানকাহিনী এই বাণীর একটি সুষ্ঠু প্রকাশ।

'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশে' স্বামীজী লিখেছেন : এইকালে একজন শক্তিমান্ দিব্য-পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। সৃজনী-প্রতিভা-সম্পন্ন শেষ শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর ফলেই শিখসম্প্রদায়ের সর্বজনবিদিত রাজনৈতিক সংস্থা গড়িয়া

শিখদের ইতিহাস প্রধানতঃ তাদের দশজন গুরুর ইতিহাস। গুরু নানকের বিশ্বোদার প্রেম-ধর্মের উপদেশে ও আকর্ষণে একদা জাতিধর্মনির্বিশেষে বহু ব্যক্তি তাঁর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। কালক্রমে এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এই নিরীহ নানক-পন্থীরা আলাদা এক সম্প্রদায়ে পরিণত হ'ল। নানকের পরবর্তী গুরুদের নেতৃত্বে পঞ্জাবের এই শিখ (শিষ্য)-সম্প্রদায় মুসলমানের অত্যাচার ও উপদ্রব থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কেমন ক'রে ধীরে ধীরে এক দৃঢ়বদ্ধ জাতিতে সংহত হ'ল, সে-কথা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। দশম বা শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ দুই শিখ-সম্প্রদায়কে এক বলিষ্ঠ দৃঢ়বদ্ধ সামরিক জাতিরূপে গড়ে তোলার কাজ সম্পন্ন করলেন। আত্মরক্ষার জরুরী তাগিদে এই ধর্মগুরু নিছক ধর্মপ্রচারের কাজকে সংহৃত করলেন, অবলীলাক্রমে সেনানায়ক ও রাজনীতিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তাঁর আদেশে গুরুর আসন শূন্য হ'ল, শিখধর্ম কেন্দ্রীভূত হ'ল দশজন গুরুর বাণী-সংবলিত 'গ্রন্থসাহেবে'। তাঁর দেহাবসানের পর (১৭০৮) তাঁরই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ শিষ্য বান্দা হলেন শিখজাতির নায়ক। গোবিন্দ সিংহের জীবন ও বাণীর পটভূমিতে সন্নিবদ্ধ অষ্টাদশ শতাব্দীর অমিততেজা শিখদের কর্মধারা বিচিত্র খাতে প্রবাহিত হ'ল। তখন মুঘল সাম্রাজ্যের জীবন-সন্ধ্যা। কিন্তু পঞ্জাবের সুবাদারগণ একটি নীতিতে তখনও দৃঢ় ছিলেন—সে-নীতি শিখ-উৎসাদনের। কী অমানুষিক অত্যাচার, নিষ্ঠুর হত্যার কী তাণ্ডবলীলা পঞ্জাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুরু গোবিন্দের শিক্ষায় ও দীক্ষায় অনুপ্রাণিত বান্দা ও অন্যান্য শিষ্যেরা অনায়াসে শির দিয়েছে, কিন্তু স্বধর্ম বিসর্জন দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ একাধিক বিখ্যাত কবিতায় সে নীরব আত্মবিসর্জনের কাহিনীকে অমর ক'রে রেখেছেন। গুরু গোবিন্দের জীবনে জীবন লাভ ক'রে সত্যই শিখভূমি পঞ্জাব জেগে উঠেছিল,—কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় যে দৃঢ়তা ও তিতিক্ষা শিখেরা দেখিয়েছিল, তার সঙ্গে তুলনা হ'তে পারে শুধু ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে মারাঠাদের জন-যুদ্ধের। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পঞ্জাবে মুঘলদের সকল অধিকার লোপ পেল, কিন্তু শিখদের পরীক্ষা শেষ হ'ল না। আহ্মেদ শাহ দুররানি পর পর ভারত-আক্রমণের পথে পঞ্জাবের চরম দুর্গতি ঘটিয়েছিলেন। দুর্গতি শিখেরাও কম ঘটায়নি—ওই দুর্ধর্ষ অপরাজেয় অভিযানকারীদের। 'গেরিলা' যুদ্ধে সিদ্ধহস্ত শিখেরা ঘোড়ার উপর জিন চাপিয়েই থাকত। দুররানির বারবার অভিযান করার একটি প্রধান কারণ ছিল শিখদের শায়েস্তা করা। পঞ্জাবে তাঁর আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু শিখজাতি কিছুতেই সেই আধিপত্য মেনে নিল না। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর দুররানি ভেবেছিলেন এবার তাঁর পঞ্জাবের অধিকার দৃঢ়তর হবে, কিন্তু বৃথাই হ'ল সে আশা। না পারা গেল শিখদের বশ্যতা স্বীকার করাতে, না হ'ল তাদের ধ্বংস-সাধন। ১৭৬২ খৃঃ লুধিয়ানার কাছে এক খণ্ড-যুদ্ধে তিনি বারো হাজার শিখ মেরে ফেললেন,

তবুও যুদ্ধজয়ের কোন ফল তিনি লাভ করতে পারলেন না। তার পাঁচ বছরের মধ্যে দুররানি স্বীকার করলেন যে, তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, পঞ্জাব তাঁর নয়, পঞ্জাব শিখদের

জনগণের এ এক আশ্চর্য স্বাধীনতা-যুদ্ধ অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরে। মারাঠাদের জনযুদ্ধের গৌরবকেও এ যেন ম্লান ক'রে দেয়। রাজা নেই, রাষ্ট্র নেই, সংগঠিত সৈন্যদল নেই, আছে শুধু দুর্ধর্ষ এক জাতি—যার প্রতিটি ব্যক্তি খালসা (পবিত্র) সৈনিক। ঐতিহাসিক কীন সাহেবের ভাষায়—'The famous Khalsa was to settle down, like a wall of concrete, a dam against the encroachments of the northern flood.' অর্থাৎ প্রখ্যাত খালসা-সঙ্ঘ নিরেট কংক্রিটের দেয়ালের মতো, উত্তরের বন্যার প্লাবনের বিরুদ্ধে দৃঢ় বাঁধের মতো অচঞ্চল।

শিখদের এ অপূর্ব ইতিহাস রচনার পশ্চাতে ছিল গুরু গোবিন্দ সিংহের মন্ত্র ও প্রেরণা। দুররানি এদের সম্বন্ধে একবার নাকি মন্তব্য করেছিলেন যে, যতদিন এ ধর্মোন্মাদনা থাকবে, ততদিন শিখদের পরাজিত করা অসম্ভব।

মারাঠা-জাগরণের পশ্চাতে যেমন শিবাজী, শিখ-জাগরণের পশ্চাতে তেমন গোবিন্দ সিংহ। উভয়ে অত্যাচারী মুসলমানের শত্রু, কিন্তু উভয়ে সনাতন ভারতীয় ধর্মের সংজ্ঞানুসারে যেমন স্বধর্মনিষ্ঠ, তেমনই উদার ও পরধর্মে শ্রদ্ধাশীল, গুরু গোবিন্দ সিংহ বোধ হয় শিখদের কাছে আরও বেশি। তিনি যেন গুরু রামদাস ও শিবাজীর একীভূত সত্তার ভাবঘন মূর্তি। সুদূর দাক্ষিণাত্যে ১৭০৮ খৃঃ এক আফগানের ছুরিকাঘাতে মৃত্যুর সময় তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন, 'ভগবানের আশ্রয়ে তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি, নিয়ত তাঁর আশ্রয়ে থেকো। গুরুর শিক্ষা মেনে চলে এমন পাঁচজন শিখ যেখানে একত্র হবে, জেনো আমি সেখানে আছি।' গুরুর তিরোধানের পর অর্ধশতাব্দী কাল পর্যন্ত প্রতিটি শিখ এমনি ক'রে তাঁকে প্রত্যক্ষ ক'রত। তাই তারা অসাধ্য সাধন করেছিল

তারপর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি: 'যতদিন বিরুদ্ধ পক্ষ প্রবল থাকাতে আত্মরক্ষার চেষ্টাই একান্ত হইয়া উঠে, ততদিন এক বিপদের তাড়নায় নিজেদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় থাকে। বাহিরের চাপ সরিয়া গেলে এই বিজয়মদ-মত্ততাকে কিসে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে?' পরবর্তীকালে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়-কাল পর্যন্ত (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপঞ্চক) শিখদের জাতীয় জীবনে চ'লল অনৈক্য, স্বার্থমগ্নতা এবং অরাজকতা। বিভিন্ন মিছিলে বিভক্ত শিখ-জাতির সর্দারদের মধ্যে শুরু হ'ল প্রাধান্য-স্থাপনের জন্য দারুণ হানাহানি ও রেষারেষি। 'শক্তি তখন দেখিতে দেখিতে লুব্ধ এবং অসংযত হইয়া উঠিল। তখন দেবতার তিরোধানে অপদেবতার আবির্ভাব হইল, কাড়াকাড়ি ও দলাদলি উদ্দাম হইয়া উঠিল।' ধর্ম তখন শুধু উন্মাদনা ও অন্ধতা, প্রেম তার অন্তর থেকে অন্তর্হিত। ঝিলম থেকে শতদ্রু পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পঞ্জাব ভূখণ্ডে শিখেরা তখন স্বাধীন, কিন্তু সে স্বাধীনতা অপচিত হচ্ছে সর্দারদের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। একদা আহ্মেদশাহ দুররানি অমৃতসরের শিখমন্দির ভেঙেছিলেন, গো-রক্ত ঢেলে তৎসংলগ্ন সরোবরকে অপবিত্র করেছিলেন। প্রতিশোধ নিতে শিখেরা এবার মসজিদ ভাঙা শুরু করলে, মসজিদের ভিত্তি বন্দী মুসলমানদের দ্বারা শূকর-রক্তে ধৌত করালে।

সুতরাং গুরু নানকের শিখধর্ম পরিণত হ'তে লাগলো চরম ধর্মহীনতায়। শিখদের সৌভাগ্য, অসামান্য প্রতিভাবান্ রণজিৎ সিংহ এসে

ছত্রভঙ্গ শিখজাতিকে ছলে বলে কৌশলে সংহত ক'রে স্থাপন করলেন পঞ্জাব-সাম্রাজ্য, লাহোর যার রাজধানী। মারাঠাদের ইতিহাসে পেশোয়াশাহী যা করেছিল, রণজিৎ সিংহ শিখদের বেলা ক্ষুদ্রতর পরিধিতে তাই করলেন। শিখদের পতনের ধারাকে অবরুদ্ধ করলেন। ধর্মহীনতার বা প্রতিক্রিয়াশীলতার ফলে যে আভ্যন্তরিক জীর্ণতা এসেছিল, তাকে অসীম বীরত্ব, দক্ষ কূটনীতি এবং অপূর্ব রাষ্ট্রিক সংগঠন দ্বারা আড়াল করতে সমর্থ হলেন। এ এক অসামান্য ব্যক্তিগত কৃতিত্ব সন্দেহ নেই। কিন্তু এ যে বালির বাঁধ, রণজিৎ নিজেও তা জানতেন। তাই তিনি একদা বলেছিলেন,—'সব লাল হো জায়েগা',—সমগ্র ভারত (পঞ্জাব-সহ) ইংরেজের পদানত হবে। এ ভবিষ্যদ্‌বাণী ১৮৩৯ খৃঃ তাঁর মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যে দুইটি ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের মাধ্যমে কী নির্মমভাবে সত্য হয়ে উঠল! শিবাজীর মৃত্যুর (১৬৮০) পর ১৩৮ বছরের মধ্যে (১৮১৮ পর্যন্ত) ইতিহাসের বিচিত্র উত্থান-পতনের দোলায় দোল খেতে খেতে মারাঠা-জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পরে ১৮৪৮ খৃঃ মধ্যে অর্থাৎ ১৪০ বছরের মধ্যে শিখ-জাতির প্রায় অনুরূপ-ভাবেই অবলুপ্তি ঘ'টল।

মারাঠা ও শিখের ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতিতে সাদৃশ্য অনেক, বৈসাদৃশ্যও আছে। শিবাজী যে ধর্মরাজ্যের পরিকল্পনা করেছিলেন, তা কোন দলের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না। মুস্লিম অত্যাচার থেকে সমগ্র ভারতীয় হিন্দুর মুক্তি-কামনা তিনি করতেন, অসীম ঔদার্যে ইসলামকেও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। ছত্রপতির এ ভাবসমৃদ্ধিকে রূপায়িত করার জন্য ভারত-জোড়া বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের বেদী রচনা করলে পেশোয়াশাহী রাজত্ব। কিন্তু সে-যজ্ঞে 'শিব' অনুপস্থিত, যজ্ঞ পণ্ড হয়ে গেল। অপর দিকে শিখ গুরুদের বিশেষ ক'রে শেষ গুরুর ভাবাদর্শ পঞ্জাবের বাইরে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে প'ড়ল না। পঞ্জাবের অভ্যন্তরে বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে ক্রমে তা ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠল। মারাঠার বেলা হয়েছিল মহৎসম্ভাবনার বৃহৎ বিনষ্টি। শিখদের তা নয়। এমন কি রাজনৈতিক বিচারেও মারাঠার গৌরবের তুলনায় শিখের গৌরব নিম্নস্তরের।

'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ সূক্ষ্ম বিচার করেছেন আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। তিনি আরও বলেছেন যে, গোবিন্দ সিংহ নিজে শিখদের গভীর সঙ্কট-কালের সাময়িক প্রয়োজনকে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং নানকের শাশ্বত-মুক্তির বার্তাকে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন। গুরু নানকের উদার পথের পাথেয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শিখ-জাতি সুদীর্ঘকালব্যাপী শত্রু-বিনাশের রক্তাক্ত পথে চলতে গিয়ে খরচ ক'রে ফেললে। মুস্লিম অত্যাচার থেকে মুক্তিই শিখের একমাত্র কাম্য হ'ল। তাতে শেষ পর্যন্ত সাফল্য-লাভ শিখদের মধ্যে এনে দিল 'অতিলোলুপতা ও উচ্ছৃঙ্খল আত্মঘাত-সাধন'। এর মধ্যেই রণজিৎ সিংহের জন্ম। 'তিনি সকলের চেয়ে বলশালী বলিয়া সকলকে দমন করিয়াছিলেন ……কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন শিখদের এক করিয়াছিলেন।'

রণজিৎ সিংহের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, বাস্তব বুদ্ধি এবং প্রশাসনিক সাফল্য ভারতীয় ও ইওরোপীয় ঐতিহাসিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। ওই কলুষিত যুগে তিনি শ্রদ্ধেয় ভারতীয় চরিত্র, সন্দেহ নেই। তাঁর যোগ্যতা

বা দক্ষতা ও সন্দেহাতীত। তবুও প্রশ্ন জাগে, উত্তরকালের শিখ-জাতির জন্য তিনি কী রেখে গেলেন? কেন তাঁর মৃত্যুর (১৮৩৯) দশ বছরের মধ্যে শিখ-জাতির স্বাধীন সত্তা পঞ্চনদ-ভূমি থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল? সাধারণ রাজনীতির বিচারেও তাঁকে আমরা আর যাই বলি না কেন, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক (Statesman) বলতে পারি না। অথবা এটাই কি সত্য যে, ভাবের ঘরে একেবারে দেউলে হয়ে যাওয়া শিখদের উদ্ধার করা রাজনৈতিক কোন কার্যসূচির সাধ্যাতীত? সমর-নৈপুণ্যে ও কষ্ট-সহিষ্ণুতায় শিখেরা সবার ঊর্ধ্বে তখনও ছিল, এখনও রয়েছে। তবে কেন এ আকস্মিক বিপর্যয়? স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথ এর জবাব দিয়েছেন, ইতিহাসের ঘটনাবলীর মামুলি বিশ্লেষণের দ্বারা নয়, ভারতেতিহাসের গভীরে ঋষি-দৃষ্টি ও কবি-দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে যে তত্ত্বটি খুঁজে পেয়েছেন, তার আলোতে।

রবীন্দ্রনাথ উপরি-উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন, "শিখ-সম্প্রদায়ের চিত্তে তিনি (রণজিৎ সিংহ) এমন কোন মহৎভাব সঞ্চার করেন নাই, যাহাতে তাঁহার অবর্তমানেও তাহাদিগকে একত্র ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। কেবলমাত্র অপ্রতিহত চাতুরী-প্রভাব এবং স্বার্থসাধন সম্বন্ধে সতর্ক অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার লোভের সীমা ছিল না এবং তাঁহার ভোগস্পৃহা অসংযত ছিল।............ একদিকে মোগল রাজ্যাবসান ও অন্যদিকে ইংরেজ-অভ্যুদয়ের সন্ধ্যাকাশকে যাঁহার আকস্মিক প্রতাপ রক্তরশ্মিতে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি শিখদের মধ্যে কী রাখিয়া গেলেন? অনৈক্য, অবিশ্বাস, উচ্ছৃঙ্খলতা। শিখদের যাহারা (পরবর্তী) নায়ক ছিল, তাহারা এই কৃতকার্য রাজার দৃষ্টান্তে ইহাই শিখিয়াছিল, জোর যার মুলুক তার। তাহারা ত্যাগ শিখিল না, আত্মসমর্পণ শিখিল না, 'যতোধর্মস্ততো জয়ঃ' এ মন্ত্র ভুলিয়া গেল, অর্থাৎ দীন হীন নানক যে-শক্তি দ্বারা তাহাদিগকে বাঁধিয়াছিলেন, মহা প্রতাপশালী মহারাজ (রণজিৎ সিংহ) তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিলেন এবং ইতিহাসের আকাশে শিখ-জ্যোতিষ্ক ক্ষণকালের জন্য জ্বলিয়া ক্ষণকালের মধ্যে নিবিয়া গেল।"

'যতোধর্মস্ততো জয়ঃ'—চিরন্তন মানব-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারত এই সূত্রটিরই অপূর্ব ভাববিন্যাস। এ-দেশের সুদীর্ঘ ইতিকথাও তাই। আর ধর্ম কী, তা স্বামীজীর বাণী ও রচনায় বহুভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

বর্তমান লেখক অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের দিগ্‌দর্শন এ পটভূমিকায় করতে এযাবৎ ক্ষুদ্র প্রয়াস করেছে। তারপর আলোচিত হবে ভারতের নবজাগরণের কাহিনী ও স্বামীজী।

দ্বিতীয় পর্বের (ভারতের ইতিহাস ও ধর্ম) সমাপ্তি টানার পূর্বে ভারতের বিচিত্র উত্থান-পতনের তাৎপর্য-ব্যাখ্যায় স্বামীজী যে অমূল্য সূত্রটি দান করেছেন, তা মারাঠা ও শিখদের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় স্মরণ করা প্রয়োজন।

'ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়াছে যে, কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের পরে, তাহারই অনুবর্তিভাবে একটি রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে এবং ঐ বোধই আবার যথানিয়মে নিজ জনয়িত্রী যে বিশেষ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে শক্তিশালী করিয়া থাকে। কিন্তু মহারাষ্ট্র বা শিখ

সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্‌কালে যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা ছিল সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল। মালব কিংবা বিজয়নগরের কথা দূরে থাকুক, মুঘল দরবারেও তদানীন্তন কালে যে প্রতিভা ও বুদ্ধিদীপ্তির গৌরব ছিল, পুনার রাজদরবারে কিংবা লাহোরের রাজসভায় বৃথাই আমরা সে দীপ্তির অনুসন্ধান করিয়া থাকি। মানসিক উৎকর্ষের দিক হইতে এই যুগই (অষ্টাদশ শতাব্দী) ভারতেতিহাসের গাঢ়তম তমিস্রার যুগ। এবং ওই দুই ক্ষণপ্রভ সাম্রাজ্য ধর্মান্ধ গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল, সর্ববিধ সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের তাহারা একান্ত বিরোধী; উভয়েই মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সকল প্রেরণা ও কর্মপ্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল।............প্রায় অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল যুদ্ধ, লুণ্ঠন ও ধ্বংস ছাড়া ভারতে আর কিছুই ছিল না। পরে সে তাণ্ডবের ধূম্রধূলি যখন অপসারিত হইল, তখন দেখা গেল সকলের উপর জয়লাভ করিয়া সদম্ভ পদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ইংরেজ-শক্তি।'

তৃতীয় পর্ব (ভারতের নবজাগরণ ও স্বামীজী) অবতারণার ভূমিকাস্বরূপও এ উদ্ধৃতির গুরুত্ব রয়েছে।

(ক্রমশঃ)

মায়ের খোঁজে

সেখ সদরউদ্দীন

তীর্থে তীর্থে ঘুরবে কোথা ঘরের ছেলে এসো ফিরে ঘরে,
কোন্ সুদূরে ছুটছ হায়, খুঁজছ কোথা মাকে পাবার তরে?
পথে পথে ঘুরে ঘুরে হায়রে হায়, হ'ল কিবা ফল?
শুধুই ভিড়ে ঠেলাঠেলি, জীবন-ভরা হট্ট-কোলাহল!
শুধুই দেখি স্বার্থ নিয়ে চরকি হ'য়ে ঘুরছে জগৎটাই,
মাকে পাবার মানস করা, সত্য বটে, মানুষ বেশী নাই!
হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-ভেদ মনের মাঝে হয়নি আজো দূর,
মায়ের আশিস্ কামনাতে, কিন্তু দেখি, হৃদয় ভরপুর!
ভাইকে যারা 'ভাই' বলে না, অবহেলে রাখে দূরে ঠেলে,
ঘৃণা-পাপের অগ্নি যারা মনের কোণে রাখে আজো জ্বেলে,
মুচি-মেথর-চণ্ডালেরা 'মানুষ' হয়েও 'ভাই' হয়নি যার,
কেমন ক'রে মূঢ় সে-জন ব্যর্থপূজায় আশিস্ পাবে 'মা'র?
মায়ের পূজায়, তাইতো বলি, সবার আগে পূত কর মন,
নহিলে বৃথাই কাঁসর-ঘণ্টায় হবে তোমার মন্ত্র উচ্চারণ!
মন্দিরেতে নাইবা গেলে, সাড়ম্বরে তীর্থ নাইবা হ'ল,
বাহ্য আচার মন্ত্র ভুলে আজি তোমার হৃদয়-দুয়ার খোল!
দেখবে সেথা আপন ঘরে কৃপাময়ী বসে আছেন 'মা',
মায়ের খোঁজে দূর-দেশেতে ভক্ত তোমায় ছুটতে হবে না!

বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শ্রীতারকনাথ ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দ রেলপথে প্যারিস থেকে ভিয়েনা কনস্টান্টিনোপল প্রভৃতি স্থান পর্যটন করেছেন। প্রথমে তিনি এই যাত্রার সঙ্গীদের উল্লেখ করেছেন। লেখক জুল বোওয়া, গায়িকা কালভে, ভূতপূর্ব ক্যাথলিক সন্ন্যাসী পেয়র হিয়াসান্থ তাঁর যাত্রার সঙ্গী। তিনি এঁদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন, প্রসঙ্গক্রমে অভিনেত্রী সারা বার্নার্ড আর 'ম্যাক্‌সিম গান'-এর নির্মাতা ম্যাক্‌সিমের কথা বলেছেন।

যাত্রার দিন প্যারিসের প্রদর্শনীর প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ যে-ভাবে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর নাম উল্লেখ করেছেন, তা বিশেষভাবে স্মরণীয়—তাঁর উক্তিতে তাঁর স্বদেশপ্রাণতা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন :

'আর আমার জন্মভূমি—জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধ-মণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্বেগে পাশ্চাত্য-মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিক-মণ্ডলীর শীর্ষদেশীয় আজ জগদীশচন্দ্র বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী সাধ্বী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে-দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!'

বিবেকানন্দ ফরাসী-সভ্যতার বিশেষ প্রশংসা করেছেন। ফরাসীর তুলনায় জার্মানির সংস্কৃতি-চেতনার অপেক্ষাকৃত স্থূলতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তবে তিনি জার্মানির কষ্টসহিষ্ণুতা আর শক্তিমত্তার উল্লেখ করেছেন। অস্ট্রিয়া আর হুঙ্গারির প্রসঙ্গে তিনি ইওরোপের ইতিহাস আর রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিচয় দিয়েছেন। তুরস্কের প্রসঙ্গে তিনি রাজনীতি ছাড়াও ধর্মের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন।

পরিব্রাজকের ডায়েরীর পরিশিষ্ট-অংশে বিবেকানন্দ কনস্টান্টিনোপল আর লুভার মিউজিয়ামের বর্ণনা দিয়েছেন। লুভার মিউজিয়ামের বর্ণনায় তাঁর অসাধারণ শিল্পবোধ আর শিল্পের ইতিহাস-সম্পর্কে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রথমে উদ্বোধন-পত্রিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে (১৩০৬-১৩০৮) ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ্। এখানে বিবেকানন্দের ভাষার উপর অত্যাশ্চর্য অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ চলিত ভাষার মূল প্রকৃতি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন; সেজন্য তিনি ভাষাকে যেমন ইচ্ছা তেমন ক'রে প্রয়োগ করেছেন। চলিত ভাষায় লিখলেও তৎসম

শব্দের সুপ্রচুর প্রয়োগ যে কী ভাবে করা যায়, প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদ তার দৃষ্টান্ত। এখানে তিনি ভাবসংহতির জন্য ক্রিয়াপদের পরিমিত ব্যবহার করেছেন।

অবশ্য গ্রন্থের সর্বত্র তৎসমশব্দ-বহুল বাগ্‌বিন্যাস নেই। সংহতির চেয়ে প্রকাশের সাবলীলতা বিবেকানন্দের অভিপ্রেত ছিল। এখানেও তিনি প্রবন্ধকারের নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি অনুসরণ না ক'রে অন্তরঙ্গ সুরে বক্তব্য বিষয় পরিবেশন করেছেন।

উদ্বোধন-পত্রিকা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ-কালে প্রকাশক বলেছেন, 'ইহাতে শ্রীমৎ স্বামীজীর গভীর মনস্বিতা ও ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে।'—উক্তিটি সত্য। গ্রন্থটিতে বিবেকানন্দের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি আর মৌলিক চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের জীবনের বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ—দুই দিক নিয়েই আলোচনা করেছেন। যেখানে প্রয়োজন বোধ করেছেন, সেখানে ঐতিহাসিক পটভূমিকা চিত্রিত ক'রে বিষয়বস্তুকে সুপরিস্ফুট ক'রে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি স্বদেশবাসীকে তার দুর্বলতার জন্য তিরস্কার করতেও দ্বিধাবোধ করেননি—এই তিরস্কারের মূল তাঁর স্বদেশপ্রেম। তিনি তীব্র ভাষায় তিরস্কার ক'রে জাতিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মননশীলতার সঙ্গে স্বজাতি-প্রীতির মিশ্রণের ফলে তাঁর রচনা যথার্থ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা নিরতিশয় মূল্যবান্ সন্দেহ নেই।

গ্রন্থের প্রথমেই বিবেকানন্দ প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের বহিরঙ্গ-ভেদের কথা আলোচনা করেছেন। একের দৃষ্টিতে আর একজনের যে মূর্তি, তা তাঁর সংহত বর্ণনা-কৌশলে হয়ে উঠেছে।

বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছেন, 'দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না।' তবে ইওরোপীয়েরা নিজেদের যতখানি বলবান্ ব'লে কল্পনা করে, ততখানি নয়। অনেকে ইওরোপীয়দের দিয়ে ভারতের দুর্গতি দূর করার কল্পনা করে; বিবেকানন্দ এই মনোবৃত্তির নিন্দা করেছেন। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মধ্যে ভেদ তিনি প্রথমে সূত্রাকারে বলেছেন।

বিবেকানন্দ অনুভব করেছেন যে, 'এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্ম আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল।' কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মোক্ষধর্মের অনুশীলন প্রাধান্য লাভ করায় ক্রমে ধর্মের চর্যার অভাব ঘটেছে, ফলে দেশে দুর্গতি দেখা দিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে তাঁর উপদেশে তাঁর জীবনগত বীর্যের আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে :

'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি ক'রে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য—স্বধর্ম কর হে বাপু! অন্যায় ক'রো না, অত্যাচার ক'রো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর।'

মোক্ষের অতিরিক্ত চর্চার ফলে সারা দেশে নিষ্ক্রিয়তার প্রাবল্য দেখা দিয়েছে। শাস্ত্রে 'সুখদুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব-অবস্থা'র প্রশংসা-বাক্য আছে; তার অক্ষম অনুকরণে এদেশে 'প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন মহাতামসিক অবস্থা'র উদ্ভব হয়েছে।

'জাতিধর্ম' বা 'স্বধর্ম'কেই বিবেকানন্দ সামাজিক কল্যাণের উপায় ব'লে নির্দেশ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি ফরাসী আর ইংরেজের সঙ্গে হিন্দুর তুলনা করেছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী-জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড; ইংরেজ-চরিত্রের মূল কথা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। হিন্দুর চরিত্রের মূল ধর্ম—এই ধর্মে যে আঘাত করেছে, সে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনি। ধর্মের স্থানে অন্য কিছুকে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। তবে বিদেশীর কাছে শিক্ষণীয় বস্তু আছে, সন্দেহ নেই। চরিত্রের মূল—ধর্ম বজায় রেখে সব জিনিস শিক্ষা করতে হবে।

প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের তুলনা বিস্তৃতভাবে করতে গিয়ে বিবেকানন্দ প্রথমে শরীর আর জাতিতত্ত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে হিন্দুরাই 'আর্য'-নামে খ্যাত—অবশ্য তিনি আধুনিক পণ্ডিতদের গবেষণা-সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, 'স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে পাশ্চাত্যেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক সুখী।' আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে আর পাশ্চাত্যের অধিকাংশ রোগ বুকে।

পাশ্চাত্য পোশাক-সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পোশাক যে ফ্যাশনের উপর নির্ভর করে, বিবেকানন্দ সে-দিকে নির্দেশ করেছেন। 'ফ্যাশনটা কি, না ঢঙ; মেয়েদের কাপড়ের ঢঙ—প্যারিস থেকে বেরোয়; পুরুষদের লণ্ডন থেকে।' আমাদের দেশের পোশাক সুন্দর, কিন্তু কাজের পক্ষে অনুপযোগী।

পরিচ্ছন্নতা-সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ প্রথমে পাশ্চাত্য দেশে স্নানের অভাব-সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। আমাদের দেশে স্নান একটা আচারের মতো; পাশ্চাত্য দেশে বাইরের পরিচ্ছন্নতাই লক্ষ্য। আমাদের রান্নার পদ্ধতি পরিষ্কার, পরিবেশন-রীতি পরিচ্ছন্ন নয়; পাশ্চাত্য দেশে ঠিক তার বিপরীত।

বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের আহার্যের পরিচয় দেওয়ার পর ইওরোপ আর আমেরিকার বিভিন্ন অংশের আহার্য ও পানীয় বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন জাতির আহার-বিধির উল্লেখ করেছেন।

বেশভূষা-সম্পর্কে আলোচনাও তথ্যবহুল। ফরাসী পোশাক ইওরোপ আর আমেরিকার ভদ্রসমাজের পোশাক—সব জাতির পোশাকেই ফরাসীর নকল। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে পাগড়ি পরার তথ্যটি কৌতুককর। বিবেকানন্দ প্রাচীন আর্য, গ্রীক আর রোমান-দের ধুতি-চাদরের উল্লেখ করেছেন—ইরানের আদর্শেই ইজার-জামা প্রভৃতির প্রচলন—বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি আর শালীনতাবোধ সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন।

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে শক্তিপূজার যে মন্তব্য করেছেন, তা তাঁর বিশিষ্ট কল্পনার পরিচায়ক। সমাজে নারীর যে সম্মান, তাকে তিনি শক্তিপূজা বলেছেন। বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিক ধর্মে মেরীর গৌরবময় স্থান মাতৃভাবের নিদর্শন।

গ্রন্থটির শেষ অংশে বিবেকানন্দ ইওরোপ, পশ্চিম এশিয়া আর ভারতের ইতিহাসের যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা তাঁর সুগভীর ইতিহাস-চেতনার পরিচায়ক। তিনি ইওরোপের রেনেসাঁসের প্রকৃতি অনুধাবন ক'রে ইতালিতে তার উন্মেষ আর ফ্রান্সে তার বিকাশ ঘটেছে—এই সিদ্ধান্ত করেছেন। ফরাসী জাতি ও সভ্যতার প্রতি তিনি বিশেষ

শ্রদ্ধাশীল—ফ্রান্স থেকেই আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতার প্রসার ঘটেছে। তিনি পারি-শহরের এক মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন, সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের উল্লেখও করেছেন।

বিবেকানন্দ ইওরোপীয় তত্ত্বচিন্তায় পরিণামবাদের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তবে ভারতে পরিণামবাদ ধর্মদর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত আর ইওরোপে পরিণামবাদ বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক পরিণাম-বাদ (evolution)-এর সহায়তা গ্রহণ করেই ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করা হচ্ছে। সুপ্রাচীন কালের সমাজের পরিচয়-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ দেবতা আর অসুর সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্মত অভিমতের পরিচয় দিয়েছেন—নদী-উপত্যকার অধিবাসী-দের সভ্যতা আর পাহাড় বা সমুদ্রের তীরের অধিবাসীদের সভ্যতার পার্থক্য-সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত মূল্যবান্। এই দুই সভ্যতার সংঘাতে বিভিন্ন দেশের সভ্যতা নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বর্বর আর তাতারদের আক্রমণের ফলে ঐ সব জাতির সঙ্গে মিশ্রণের ফলে ইওরোপের সভ্যতার বর্তমান রূপান্তর ঘটেছে।

ইওরোপ ও ভারতের সভ্যতার তুলনা ক'রে ভারতীয় সভ্যতাই যে উৎকৃষ্ট, বিবেকানন্দ সুস্পষ্টভাবে এ ইঙ্গিত ক'রে গেছেন।

অনেক পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসকে আর্য আর অনার্যের সংঘর্ষের ইতিহাসরূপে কল্পনা করেছেন। এই কল্পনা বিবেকানন্দের মতে ভিত্তিহীন। ইওরোপীয়েরা যেভাবে সভ্যতা বিস্তার করেছে অর্থাৎ ভিন্ন জাতিকে বিনষ্ট ক'রে তার সম্পত্তি গ্রাস করেছে, সেইভাবেই ভারতবর্ষে আর্যসভ্যতা প্রসারিত হয়েছে—মনে করা অসঙ্গত।

পরিশিষ্টাংশে বিবেকানন্দ প্রথম যুগের খ্রীষ্টধর্মের অন্ধ গোঁড়ামি আর বিজ্ঞান-বিরোধিতার তুলনায় ইসলাম-ধর্মের উৎকর্ষ-সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য দেশে 'সকল কাজেই একটু সুচ্ছবি' দেখতে চাওয়ার প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন—যা ছিল তাও আমরা হারাচ্ছি, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শও আমাদের লভ্য হয়নি

(৪) বর্তমান ভারত

'বর্তমান ভারত' প্রথমে উদ্বোধন-পত্রিকার প্রথম বর্ষের (১৩০৫-০৬) পাঁচটি সংখ্যায় আর দ্বিতীয় বর্ষের (১৩০৬-০৭) দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ১৩১২ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

অনেকের মতে এইখানিই স্বামী বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থটির পরিচয়-প্রসঙ্গে যে-কথা বলেছেন, তা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে:

স্বামী বিবেকানন্দের সর্বতোমুখী প্রতিভা-প্রসূত 'বর্তমান ভারত' বঙ্গসাহিত্যে এক অমূল্য রত্ন। তমসাচ্ছন্ন ভারতেতিহাসে একটা পূর্বাপর সম্বন্ধ দেখা অতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। স্থূলদৃষ্টি সাধারণ পাঠক ইহাতে দুই-চারিটি ধর্মবীর বা কর্মবীরের মূর্তি এবং দুই-একটি ধর্মবিপ্লব বা রাজ্য-বিপ্লব অতি অসম্বদ্ধ-ভাবে গ্রথিত ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না।...আমাদের ধারণা, ভারতে ইতিহাসের যে অভাব তাহা নহে, কিন্তু উহার সম্বন্ধ-সংযোজনে ভারত-সন্তানই একমাত্র সমর্থ এবং উহার যথার্থ পাঠক্রম তাঁহাদের দ্বারাই একদিন না একদিন আবিষ্কৃত হইবে। বহুল পরিভ্রমণ, গর্বিত রাজকুল হইতে দরিদ্র প্রজা পর্যন্ত

সকলের সহিত সমভাবে মিলন, ভারত ও ভারতেতর দেশের আচার-ব্যবহার এবং জাতীয়ত্ব ভাবসমূহের নিরপেক্ষ দর্শন, অশেষ অধ্যয়ন এবং স্বদেশবাসীর প্রতি অপার প্রেম ও তাহাদের দুঃখে গভীর সহানুভূতির ফলে স্বামীজীর মনে ভারতের যে-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, 'বর্তমান ভারত' তাহারই ফলস্বরূপ।

'বর্তমান ভারত'-এর ভাষার বিশিষ্টতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিবেকানন্দ চলিত ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন, অথচ এই গ্রন্থে সাধুভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। 'পরিব্রাজক' বা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-এর ভাষার সঙ্গে এই গ্রন্থের ভাষার আকাশ-পাতাল তফাৎ। ঐ দুটি গ্রন্থে চলিত গদ্যভাষার সাবলীল গতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়—'বর্তমান ভারত'-এর গদ্য সাধুভাষার সংহতির এক অসামান্য নিদর্শন। এর ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের বাগ ভঙ্গি ফুটে উঠেছে; অনেক জায়গায় শব্দযোজনাও সংস্কৃতের অনুসারী। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার না থাকলে এই ধরনের রচনা সম্ভব নয়।

চলিত ভাষার পক্ষপাতী হয়েও এই ভাবে সাধু গদ্যে গ্রন্থ রচনার দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ এই গ্রন্থে যে গুরু-বিষয় সন্নিবেশ করা হয়েছে, তা বহন করার পক্ষে চলিত ভাষার চেয়ে সাধু ভাষাই বেশি উপযোগী ব'লে মনে করা হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে এই গ্রন্থের গদ্যে যে সংহতি ও ওজস্বিতা আছে, তা চলিত ভাষায় অসম্ভব; এখানে কয়েক পৃষ্ঠায় যে ভাব সন্নিবিষ্ট, চলিত ভাষায় তা প্রকাশ করতে গেলে গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধি ঘ'টত। ভাষার উপর তাঁর অসামান্য অধিকার ছিল। সুতরাং তিনি একযোগে চলিত ভাষা আর সাধু ভাষায় লেখনী সঞ্চালন করেছেন। যে কারণটিই প্রধান হোক না কেন, নিছক রচনাভঙ্গির দিক দিয়েও এই গ্রন্থটি সুসংহত, ওজস্বী, দ্যোতনাময় গদ্য ভাষার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন সন্দেহ নেই।

'বর্তমান ভারত' ভারত-ইতিহাসের একটি অন্তর্দৃষ্টিময় সমাক্ষা। বিবেকানন্দ ব্যক্তি-বিশেষের উত্থান-পতনের কথা বিবৃত করেন নি; তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টি জাতির বিবর্তনের ধারাটির অনুসন্ধান করেছে। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমাজ যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে এই গ্রন্থে তাই বর্ণিত। বিভিন্ন সমষ্টিগত শক্তির উত্থান-পতন, বিদেশী শক্তির সংঘর্ষ, ফলে সমাজের মধ্যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার কথা তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে অধ্যাত্মদৃষ্টি আর স্বদেশপ্রেমের সংমিশ্রণের ফলে আলোচনার সর্বাংশ ভাস্বর হয়ে উঠেছে। আত্মপরিচয়-বিস্মৃত স্বধর্মভ্রষ্ট বাঙালীর পক্ষে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য সন্দেহ নেই।

গ্রন্থের প্রারম্ভে বিবেকানন্দ বৈদিক যুগের পুরোহিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের শক্তির কথা বলেছেন। ঐ পুরোহিত-সমাজ মন্ত্রবলে বলীয়ান্ হওয়ায় 'ইহলৌকিক মঙ্গলের কামনায় প্রজাবর্গ, রাজন্যবর্গও তাঁহার দ্বারস্থ।' পুরোহিতেরা দৈববলে শক্তিমান্, তাঁদের আশীর্বাদে কল্যাণ, এই বিশ্বাস তাঁদের সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বিবেকানন্দ আর একটি কারণে পুরোহিতদের প্রতিপত্তি ঘটেছিল ব'লে নির্দেশ করেছেন। পুরোহিতরাই গ্রন্থ রচনা করতেন। সুতরাং পুরোহিতদের সন্তুষ্ট না করলে যশোলাভ সম্ভব নয়।

প্রাচীনকালে রাজ্যশাসন ব্যাপারে রাজারই সার্বভৌম অধিকার ছিল, প্রজাদের কোন শক্তি ছিল না। সমষ্টিগত শক্তি-সম্পর্কে প্রজাদের চেতনাই ছিল না। বিবেকানন্দ এর দুটি কুফলের কথা বলেছেন। প্রথমতঃ, রাজা যদি প্রজারক্ষক না হয়ে প্রজাভক্ষক হয়, তাহলে তার প্রতিবিধান করবার কোন শক্তিই থাকে না। সুরাজার চেয়ে কুরাজার সংখ্যাই বেশি। দ্বিতীয় কুফল :

হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে সর্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজে অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ পায়। সর্ব বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষাশক্তির স্ফূর্তি কখনও হয় না। সর্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়। দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজা কখনও স্বায়ত্তশাসন শিখে না; রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নিবীর্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়। ঐ 'পালিত' 'রক্ষিত'ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল।

তবে গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বায়ত্ত শাসনের অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল।

বিবেকানন্দ বৌদ্ধ বিপ্লবের ফলে ক্ষত্রিয়-শক্তির অভ্যুদয়ের কল্পনা করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের ফলে পুরোহিত-সমাজের প্রাধান্য কমে গেছে, ফলে রাজশক্তিই প্রবল হয়ে উঠেছে। এ-যুগে বিভিন্ন রাজাই নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ যুগের শেষে আবার ব্রাহ্মণ্যশক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটেছে, কিন্তু বৈদিক যুগের পুরোহিতের প্রবল প্রতাপ অন্তর্হিত। অবশ্য রাজশক্তিও অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

মুসলমান-অধিকারে পুরোহিতশক্তি নিরতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে—অপরপক্ষে রাজশক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে। মারাঠা বা শিখদের মধ্যে হিন্দু রাজশক্তির পুনরভ্যুদয়ের প্রয়াস দেখা গেছে বটে, কিন্তু ঐ প্রয়াসে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ্যশক্তির সক্রিয়তা ছিল না। মুসলমান-যুগের পর এদেশে ইংরেজ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যবাদের অন্তরালে যে ভিন্নতর শক্তিই ক্রিয়াশীল, তা বিবেকানন্দের দৃষ্টি এড়ায়নি।

ইংলণ্ড-প্রমুখ পাশ্চাত্য জাতির অভ্যুদয়ের মূলে বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী সম্প্রদায়ের সমাজ-নেতৃত্ব আছে, বিবেকানন্দ তা সহজেই অনুভব করেছিলেন। পূর্বকালে ব্রাহ্মণ্যশক্তি বা ক্ষাত্রশক্তিই প্রাধান্য লাভ করেছিল; এ-যুগে ইংলণ্ড-প্রমুখ পাশ্চাত্য জাতির অভ্যুদয়ের মূলে বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থান বর্তমান। বিবেকানন্দ ইংলণ্ড কর্তৃক ভারত-বিজয়ের যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা তাঁর যথার্থ ঐতিহাসিক বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিবেকানন্দ এই মত পোষণ করেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার বর্ণ পর্যায়-ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। প্রত্যেক বর্ণের শাসনকালে যে সুফল ও কুফল হয়, তিনি সেগুলির পরিচয় দিয়েছেন।

ব্রাহ্মণ-শাসনের প্রধান সুফল বিদ্যার চর্চা—আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য আকুলতা। সমাজ ব্রাহ্মণদের চিন্তাশীল ক'রে তোলবার অবকাশ দেয়—সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ব্রাহ্মণের প্রাধান্যকালেই ঘটে।

পুরোহিত-প্রাধান্যের কুফল এই যে, যে-শক্তি লোককল্যাণের জন্য নিয়োজিত হয়, সেই শক্তিকে হীন কার্য-সাধনে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে সংকীর্ণতা, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, কপটতা। বিদ্যা গোপন করবার প্রয়াসে বিদ্যার চর্চা কমে আসে, ফলে ক্রমে বিদ্যা

বিনষ্ট হয়। পরবর্তীকালে পৌরোহিত্য জাতিগত হয়ে পড়লে আধিপত্য রক্ষার জন্ম সংঘর্ষ দেখা যায়। বর্তমান যুগের ব্রাহ্মণকুলের বেশির ভাগই যে আচারভ্রষ্ট, বিবেকানন্দ সে-কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন।

ক্ষত্রিয়শক্তি অর্থাৎ রাজশক্তি প্রাধান্য লাভ করলে দেশের ঐহিক সমৃদ্ধি ঘটে—'ক্ষত্রিয়াধিকারে···ভোগেচ্ছার পুষ্টি ও তৎসহায়ক বিদ্যানিচয়ের সৃষ্টি ও উন্নতি।' রাজশক্তির প্রাধান্যকালেই গ্রাম-সভ্যতার পর নগর-সভ্যতার পত্তন হয়েছে। আমাদের দেশে বানপ্রস্থ আশ্রমে অনেক রাজা অধ্যাত্মবিদ্যার গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এর ফলে বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রতি অনাসক্তি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু রাজতন্ত্রে প্রজার দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা। রাজা যদি প্রজা পালন না ক'রে আত্মভোগ-পরায়ণ হন, তা হ'লে জাতির মধ্যে আত্মকলহ দেখা দেয় বা জাতি অত্যন্ত নিবীর্য হয়ে পড়ে ও ভিন্ন জাতি কর্তৃক বিজিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

বৈশ্যশক্তির প্রাধান্য-সম্পর্কে বিবেকানন্দের উক্তি :

'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াধিপত্যে যে-প্রকার বিদ্যা ও সভ্যতার সঞ্চয়, বৈশ্যাধিকারে সেই প্রকার ধনের। যে টঙ্কটঙ্কার চাতুর্বর্ণ্যের মনোহরণ করিতে সক্ষম, বৈশ্যের বল সেই ধন।···এ বৈশ্য-প্রাদুর্ভাব না হইলে আজ এক প্রান্তের ভক্ষ্য, ভোজ্য, সভ্যতা, বিলাস ও বিদ্যা অন্য প্রান্তে কে লইয়া যাইত ?'

বৈশ্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কে করতলগত বা তুষ্ট রাখতে চাইলেও শূদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। শূদ্র শক্তিমান্ হোক—বৈশ্যের এ ইচ্ছা নেই। বিবেকানন্দ অনুভব করেছেন যে, শূদ্র সুপ্রাচীন কাল থেকেই উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত, উৎপীড়িত—'চলমান শ্মশান', 'ভারবাহী পশু' ইত্যাদি তাদের সংজ্ঞা, শূদ্রদের সংখ্যাই বেশি, কিন্তু শূদ্রের মধ্যে বিদ্যা নেই, একতাবোধ নেই। শূদ্রশক্তি অর্থাৎ শ্রমজীবী সম্প্রদায় যে একদিন প্রধান হয়ে উঠবে, বিবেকানন্দ তা অনুভব করেছেন।

কার্ল মার্কস্-অনুযায়ী সমভোগবাদের আদর্শ না মানলেও তিনি শূদ্র-শাসনের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন বলা যেতে পারে। শূদ্র-শক্তির অভ্যুদয়ের প্রতিবন্ধকের কথাও তিনি আলোচনা করেছেন। প্রজাপুঞ্জই যে রাজ্যের প্রকৃত শক্তি, বিবেকানন্দ তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন—যে-শক্তি প্রজাপুঞ্জ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করেছে, তারই পতন ঘটেছে।

বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে তৎ-কালীন ইংরেজ-শাসনের দোষ-গুণের উল্লেখ করেছেন। ইংরেজ-শাসনের সর্বপ্রধান গুণ এর 'শক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র' একদিকে বিভিন্ন দেশের পণ্যরাশি অপর দিকে বিভিন্ন দেশের ভাব-রাশি সারা দেশে ব্যাপ্ত ক'রে দিচ্ছে। ইংরেজ-শাসন রাজতন্ত্র হওয়ায় শাসন-ব্যাপারে প্রজাবিশেষে ভেদ-দৃষ্টি অল্প। তবে ইংরেজ কল্যাণ-প্রয়াসের চেয়ে ভারতবাসীকে স্ববশে রাখবার চেষ্টা ও আয়োজনে বেশি শক্তি ব্যয় করছে; ভারতবাসীর মনে ইংলণ্ডের গৌরববোধ জাগিয়ে দেওয়ার প্রয়াস বিবেকা-নন্দের মতে নিরর্থক শক্তিক্ষয়।

বর্তমান ভারতবর্ষের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শগত সংঘর্ষ। একদিকে তার গৌরবময় অতীত, অপর দিকে বিজ্ঞান-লালিত পাশ্চাত্যের বিলাসময় সুখ। বিবেকা-নন্দ দুটি বাক্যে সূত্রাকারে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

'পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায় রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ।'

পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘাতে ভারতের জীবনাদর্শ বিচলিত হয়েছে। অধুনা ভারতীয়-দের অনেকেই অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ করছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক উজ্জ্বল হলেও ভারতীয় দৃষ্টিতে ক্ষণ-স্থায়ী। পাশ্চাত্যের অনুকরণ মোহকেই বিবেকানন্দ প্রবল বিভীষিকা ব'লে নির্দেশ করেছেন। কেবলমাত্র পাশ্চাত্য দেশের মত অনুসারে বলা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বিশেষত: পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় না থাকলেও পাশ্চাত্য সমাজের অন্ধ অনুকরণ করলে যে নিষ্ফলতাই ঘটবে, বিবেকানন্দ এ-কথা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। এইভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণের মূলে একজাতীয় হীনম্মন্যতা আছে।

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদ ভারতবাসীর প্রতি স্বামীজীর নির্দেশবাণী। 'স্বদেশমন্ত্র'-নামে সুপরিচিত এই অনুচ্ছেদে স্বামীজীর জীবনাদর্শ মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর স্বদেশপ্রেম, ঐতিহ্যবোধ, ত্যাগ ও সেবার আদর্শ স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর মমতা, সর্বোপরি কাপুরুষতা ও দুর্বলতা দূর ক'রে মনুষ্যত্বলাভের আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে।

(৫) বীরবাণী

বিবেকানন্দ সংস্কৃত, বাংলা আর ইংরেজীতে কয়েকটি কবিতা রচনা করেছিলেন। এই কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এই কবিতাগুলির মধ্যে শিল্পদক্ষতার চেয়ে তাঁর কল্পনাশক্তির পরিচয় বেশী ক'রে ব্যক্ত হয়েছে। ইংরেজীতে লেখা 'Kali the Mother' একটি উৎকৃষ্ট ভাবমূলক কবিতা। বিশেষভাবে কবিতা রচনা করা বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য ছিল না; তবে তিনি উপযুক্ত অবসরে যেন কুতূহলবশেই কয়েকটি কবিতা রচনা করেছিলেন। নিতান্ত অল্প বয়সে দেহত্যাগ না করলে আমরা সাহিত্যের এই শাখাতে তাঁর কৃতিত্বের ব্যাপক পরিচয় পেতাম। বর্তমান প্রবন্ধে কেবল বাংলা কবিতাগুলির পরিচয়-গ্রহণের চেষ্টা করা হবে।

বিবেকানন্দের কবিতাবলীর মধ্যে কয়েকটি গান। এই গানগুলির মধ্যে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক ভজন' সর্বজন-পরিচিত। গানটিতে সংস্কৃত-সুলভ কয়েকটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে; যেমন, 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন', 'মোচন-অঘদূষণ', 'ভক্তার্জন-যুগলচরণ', 'তারণ-ভব-পার', 'জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর', 'কৃন্তন-কলিডোর' ইত্যাদি। শব্দচয়নের নৈপুণ্যে গানটি ভাব ও ভাষা দুদিক দিয়েই গাঢ়বদ্ধ হয়েছে। গানটি গুরুবন্দনা-হিসাবে অতুলনীয়। এখানে বিবেকানন্দ সুস্পষ্টভাবে রামকৃষ্ণকে অবতার বলেছেন কি না বোঝা যায় না—'জৃম্ভিত যুগ-ঈশ্বর' (যিনি যুগের ঈশ্বররূপে প্রকাশিত) আর 'জগদীশ্বর' এই দুটি শব্দ ব্যাপক অর্থেও প্রয়োগ করা হয়ে থাকতে পারে। বিবেকানন্দ এই গানটি প্রথমে যে আকারে লিখেছিলেন, তার মধ্যে কিছুটা গতিচাঞ্চল্য আছে। প্রথম দুই ছত্র বর্তমানের মতো। মোট আট ছত্রের শেষ দুই ছত্র—

ধে ধে ধে, লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার॥

এখানে ধ্রুপদ-সঙ্গীতের বাগ্‌বিন্যাসের রীতি সুস্পষ্ট। বিবেকানন্দ সম্ভবতঃ শিববন্দনামূলক

কোন ধ্রুপদের প্রভাবে 'ধে ধে ধে ইত্যাদি' ছত্রটি রচনা করেছিলেন।

বিবেকানন্দ দুটি শিবসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এ দুটি প্রধানতঃ গানের জন্যই রচিত। দুটি গানেই নৃত্যরত শিবের বর্ণনা। শিবের ধ্যানমগ্ন শান্ত মূর্তির চেয়ে নৃত্যরত রুদ্র মূর্তিই বিবেকানন্দকে বেশী আকর্ষণ করেছিল ব'লে মনে হয়। প্রথম গানের শেষ তিনটি ছত্র—

ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক-ভাল॥

দ্বিতীয় গানটিতে হিন্দী বা ব্রজবুলির আদর্শে 'জ্বলত' 'নাচত' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। এই গানটি চারছত্র—

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাক-পাণি॥
ঊর্ধ্ব জ্বলত জটা-জাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল,
সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী॥

'শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত'টি প্রচলিত হিন্দী বা ব্রজবুলিতে লেখা 'খেয়ালের' আদর্শে রচিত হয়েছে। এর প্রথম দুই ছত্র—

মুঝে বারি বনোয়ারী সৈঁইয়া যানেকো দে।
যানেকো দে রে সৈঁইয়া, যানেকো দে
(আজু ভালা)॥

'সৃষ্টি' ও 'প্রলয়' নামে গান-দুটি কবিতা-হিসাবেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে ভাবের গভীরতাই প্রধান সম্পদ্; তবে রচনার মধ্যে গাঢ়তাও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। 'সৃষ্টি' কবিতার প্রথমে বিবেকানন্দ নির্গুণ ব্রহ্মের অবস্থার কথা বলেছেন:

একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ- অতীত-আগামি-কাল-হীন,
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়॥

সেই রূপ-নাম-বর্ণ-কাল দেশ-প্রভৃতি সর্ব বিষয়ের অতীত 'নেতি'র চিরবিরতির স্থল থেকেই এই বিশ্বের উদ্ভব।—

সেথা হ'তে বহে কারণ-ধারা
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি,
'অহমহমিতি' সর্বক্ষণ॥

কবিতা ও গানকে দর্শনের ছকে ফেললে তার মধ্যে রসগত আবেদন থাকে না, কিন্তু অদ্বৈতবাদের মূল সূত্রটি প্রকাশ করেও এই গানটির মধ্যে এক বিরাট ভাব-কল্পনার আভাস ব্যক্ত হয়েছে। 'প্রলয়' বা 'গভীর সমাধি' নামে পরিচিত গানটি সম্পর্কেও ঐ কথা বলা যেতে পারে। এখানেও বিবেকানন্দ নিছক তত্ত্ব-কথা বিবৃত করেননি, একটি নিবিড় অনুভূতিকে গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। অবশ্য এই দুটি গানের প্রকৃত রস সুর সহযোগেই আস্বাদ্য—কেবল বাগ্‌বিন্যাসে এর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর নয়। গভীর সমাধির মধ্যে প্রথমে বহির্বিশ্বের ধীরে ধীরে বিলুপ্তি কল্পনা করা হয়েছে, তখন মনের আকাশে জগৎ-সংসারের অস্ফুট চিত্র প্রতিভাত হয়—'অহং' চেতনায় বিশ্বের রূপ বিধৃত। তারপর—

ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল।
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হ'ল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্', বোঝে প্রাণ
বোঝে যার॥

'সখার প্রতি' কবিতার প্রথমাংশে জগৎ-সংসারের দুঃখ-বেদনার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। এই সংসারের প্রকৃত স্বরূপ তিনি আপন অভিজ্ঞতা থেকেই প্রকাশ করেছেন।

এখানে সকলেই স্বার্থপরায়ণ—স্বার্থ ছাড়া জগতে স্থান লাভ করবার কোন উপায় নেই। হৃদয়বান্ নিঃস্বার্থ পুরুষকে আঘাতই সহ্য করতে হয়।

কঠোর সাধনার পর তিনি যে সত্য উপলব্ধি করেছেন, তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

শোনো বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম ; 'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।

বিবেকানন্দ এই বিশ্বকে প্রেমে বিধৃতরূপে কল্পনা করেছেন—সকলের অন্তরেই প্রেম বর্তমান। প্রেমই অন্তরালে থেকে জগৎকে চালনা করছে। এই পৃথিবীতে দুঃখ সুখ আছে, তাকে অতিক্রম করার উপায় নেই। বিবেকানন্দ শুধু বৈরাগ্যের সাধনাকেই শ্রেয় ব'লে প্রচার করেননি—আধ্যাত্মিক সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেও তিনি মানুষকে প্রেমের আদর্শে, সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এই কবিতার শেষ চার ছত্রে তাঁর অধ্যাত্ম-অনুভূতি আর মানবপ্রেম সমভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

'নাচুক তাহাতে শ্যামা' ভাবগর্ভ কবিতা-হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিবেকানন্দ এই জগতের সৌন্দর্যময় ও ভয়ঙ্কর দুটি রূপ অঙ্কন করেছেন। একদিকে প্রকৃতির অপরূপ শোভা, অপর দিকে তার ভীষণা মূর্তি। একদিকে সৌন্দর্য, সঙ্গীত, প্রেম ; অপরদিকে রুদ্র রূপ—যুদ্ধ, মৃত্যু।

কিন্তু কেবল মনোহর রূপই সত্য নয়, রুদ্র রূপও সত্য। কালীরূপে দেবী মানুষের অন্তরের মিথ্যা মায়াজাল ছেদন করেন।

সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥

যে দুঃখভীত, যে সুখকামী, যার 'ভক্তি-পূজাছলে স্বার্থসিদ্ধি মনে ভরা', তাকে বিবেকানন্দ কাপুরুষ ব'লে সম্বোধন করেছেন। শেষ কয়েকটি ছত্রে বীর সন্ন্যাসী জগতের মোহজাল দূর ক'রে সত্যলাভের সাধনার জন্য উদাত্ত-কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' উপনিষদের এই প্রিয় মন্ত্রটির প্রতিধ্বনি করেই যেন তিনি বলেছেন :

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

দুটি শিব-সঙ্গীতে নৃত্যরত শিবের চিত্রের সঙ্গে নৃত্যময়ী শ্যামার কল্পনা তুলনীয়। বিবেকানন্দের অন্তরে যে একটি প্রবল বেগবত্তা ছিল, তাই এই নৃত্যমূর্তির উৎস ; 'Kali the Mother' নামক ইংরেজী কবিতার কথাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। এই কবিতাটির সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত অনুবাদের শেষ কয়েকটি ছত্র—

করালি ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু-পাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটি শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ ক'রে লেখা হয়েছে।

এই কবিতার মধ্যে বিবেকানন্দ অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণ করেছেন—প্রতি পদের অক্ষর-সংখ্যা অসমান ও যুগ্ম। সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম বিশিষ্ট ভক্ত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর পৌরাণিক নাটকের মধ্যে যে ছন্দের ব্যবহার করেছেন, বিবেকানন্দ তারই আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন।

কবিতাটির প্রথম দিকে বিবেকানন্দ 'স-শক্তিক' রামকৃষ্ণকে প্রণাম ক'রে নিজেকে তাঁর দাসরূপে পরিচিত করেছেন। তিনি রামকৃষ্ণের অসীম প্রেম ও মহিমার কথা বলেছেন। বিবেকানন্দ একবার যোগশিক্ষার উদ্দেশ্যে গাজীপুরের পওহারী বাবার কাছে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্বপ্নে রামকৃষ্ণকে দেখে ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করেন, ঐ কবিতায় ঐ ঘটনার উল্লেখ ক'রে বলেছেন—

তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা ?
প্রভু তুমি, প্রাণসখা মোর।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী।

এই কবিতার শেষ অংশে চিত্ত বাহ্যভূমি অতিক্রম করলে একটি অনাহত ধ্বনি শোনার কল্পনা ক'রে সেটিকে রামকৃষ্ণের বাণী বলেছেন। ঐ অনাহত ধ্বনির মধ্যে তিনি প্রথমে প্রলয়ের বর্ণনা করেছেন।

এই অংশে বিবেকানন্দের তত্ত্ববোধ ও কল্পনার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। প্রলয়ের ক্ষেত্রেও যেমন, প্রলয় থেকে সৃষ্টির বা বিকাশের বর্ণনাতেও তেমনই তত্ত্বদৃষ্টি ও কল্পনাদৃষ্টির সমন্বয় হয়েছে। সৃষ্টি-কল্পনার একাংশ—

আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ রচনা
জড় জীব আদি যত
আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।

'সাগর-বক্ষে' কবিতাটিও 'গৈরিশ' ছন্দে লেখা। এই কবিতায় বিবেকানন্দ ভারত-মহাসাগরের রূপ বর্ণনা ক'রে বলেছেন,

নীচে সিন্ধু গায় নানা তান ;
মহীয়ান্ সে নহে ভারত !
অম্বুরাশি বিখ্যাত তোমার ;
রূপরাগ হয়ে জলময়
গায় হেথা, করে না গর্জন।

স্বামীজীর সন্নিধানে

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী শুদ্ধানন্দ

পূর্বাশ্রমে স্বামী শুদ্ধানন্দের নাম ছিল সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী। ১৮৭২ খৃঃ তিনি কলিকাতার এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী একজন নিষ্ঠাবান্, ধর্মপ্রাণ ও উদারচেতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রবল ধর্মপিপাসার জন্য পাঠ্যাবস্থাতেই সুধীরচন্দ্র দুইবার গৃহত্যাগ করেন, একবার পদব্রজে দেওঘর পর্যন্ত গিয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সিটি কলেজে এফ-এ পড়িতে থাকেন। কিন্তু বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বে গৃহত্যাগ-পূর্বক রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন।

কলেজে পাঠকালে খগেন (পরে স্বামী বিমলানন্দ) যে 'বন্ধুচক্র' করেন, তিনিও ছিলেন তাহার সদস্য। বন্ধুগণের সহিত ধর্মালোচনার ফলে তাঁহার ধর্মানুরাগ অত্যন্ত প্রবল হয়। ১৮৯০ খৃঃ ১৮ বৎসর বয়স হইতে তিনি বরাহনগর মঠে ও কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও শিষ্যগণের সঙ্গলাভ করিতে থাকেন।

১৮৯৭ খৃঃ ফেব্রুআরি মাস, স্বামীজী পাশ্চাত্য হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। চারিদিকে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। কলিকাতায় অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, স্বামীজী স্পেশাল ট্রেনে আসিতেছেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামীজীর সংবাদ ও বক্তৃতা সাগ্রহে পাঠ করিয়া সুধীরচন্দ্র স্বামীজী-সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিয়াছেন। ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইল, স্বামীজী যে কামরায় ছিলেন, ভাগ্যক্রমে সুধীরচন্দ্র তাহার সামনেই দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বামীজী দর্শকবৃন্দকে করযোড়ে নমস্কার করাতে সুধীরচন্দ্রের হৃদয় তাঁহার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইল। স্বামীজী ঘোড়ার গাড়িতে স্টেশন হইতে রিপন কলেজের দিকে যাইতেছিলেন, কয়েকজন যুবক গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই টানিতে লাগিলেন। সুধীর তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভিড়ের জন্য পারিলেন না। রিপন কলেজে স্বামীজী সমবেত জনমণ্ডলীকে দুই চার কথা বলিলেন। তখন সুধীরচন্দ্র স্বামীজীকে ভালভাবে দেখার সুযোগ পাইলেন, দেখিলেন—স্বামীজীর মুখখানি দিব্যজ্ঞানে দীপ্ত ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, জ্যোতি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে, তবে মুখমণ্ডলে ভ্রমণের ক্লান্তি।

স্বামীজী বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়িতে উঠিলেন। সুধীর তাঁহার বন্ধু খগেনের সঙ্গে টমটমে চড়িয়া সেদিন বৈকালে স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। স্বামী শিবানন্দ তাঁহাদিগকে স্বামীজীর নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন, 'এরা আপনার খুব admirer (অনুরাগী)।'

স্বামীজী স্বামী যোগানন্দকে বলিতেছিলেন: 'সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা করছে। আমাদের বাপ-দাদারা সেইটেকে religion-এর দিকে manifest করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্য-দেশীয়েরা সেইটেকেই মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে manifest করছে। বাস্তবিক সমগ্র

জগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা মাত্র।'

সেদিন স্বামীজীর সহিত তাঁহাদের আলাপের সুযোগ হইল না। কাশীপুরে গোপাল লাল শীলের বাগানবাড়িতে থাকাকালে সুধীর স্বামীজীকে দর্শন করিতে যাইতেন। একদিন স্বামীজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'উপনিষদ্ কিছু পড়েছ?' সুধীর বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু-আধটু দেখেছি।' স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ উপনিষদ্ পড়েছ?' সুধীর বলিলেন, 'কঠ উপনিষদ্ পড়েছি।' স্বামীজী তখন তাঁহাকে কঠোপনিষৎ হইতে আবৃত্তি করিতে বলিলেন, কিন্তু মুখস্থ না থাকায় সুধীর বলিলেন, 'কঠটা মুখস্থ নেই। গীতা থেকে খানিকটা বলি।' স্বামীজী বলিলেন, 'আচ্ছা, তাই বলো।' তখন সুধীর একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগ হইতে অর্জুন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব আবৃত্তি করিলেন। তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়া স্বামীজী উৎসাহ দিয়া বলিলেন, 'বেশ, বেশ!'

পরদিন সুধীর পকেটে করিয়া উপনিষদ্ লইয়া স্বামীজীকে দর্শন করিতে যান। উপনিষদের প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি পকেট হইতে বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। স্বামীজী খুব সন্তুষ্ট হইলেন। যেদিন গুজরাটী পণ্ডিতগণ স্বামীজীর সহিত সংস্কৃতে ধর্মবিচার করেন, সেদিনও সুধীর উপস্থিত ছিলেন। বিচারান্তে পণ্ডিতগণ বলিতেছিলেন, 'স্বামীজীর চক্ষুতে এক মোহিনী শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই তিনি দেশ-বিদেশে দিগ্বিজয় করেছেন।' স্বামীজী কিন্নরকণ্ঠে সুমিষ্ট ছন্দে উপনিষদের যে-সকল শ্লোক আবৃত্তি করেন, সুধীর তাহা দীর্ঘকাল যেন দিব্যকর্ণে শুনিতে পাইতেন।

স্বামীজী যখন মঠের নিয়মাবলী রচনা করেন, তখন সুধীরচন্দ্র ছিলেন লিপিকার। নিয়মগুলি স্বামীজী বলিয়া যাইতেন, সুধীরচন্দ্র লিখিয়া লইতেন।

১৮৯৭ খৃঃ এপ্রিল মাসে সুধীরচন্দ্র আলমবাজার রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন। স্বামীজী স্নেহ করিয়া তাঁহাকে 'খোকা' বলিয়া ডাকিতেন এবং তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দেন ও ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত করেন। ঐ বৎসরই তিনি স্বামী নিরঞ্জনানন্দের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন, নাম হয়--স্বামী শুদ্ধানন্দ।

স্বামীজীর চিঠিপত্র লেখা ইত্যাদি এই নবীন সন্ন্যাসী করিতেন। স্বামীজীর সহিত উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান ও রাজপুতানা ভ্রমণ করেন। তিনি মানস-সরোবরেও যান।

স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ শুদ্ধানন্দের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। দ্বিতীয় কীর্তি স্বামীজীর আদেশে মঠের ডায়েরী রাখা। এই ডায়েরী হইতে ঐ সময়কার মঠের বহু তথ্য জানা যায়।

১৮৯৯ খৃঃ 'উদ্বোধন' পত্রিকার সূচনা হইতেই তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সহকারীরূপে উহার সম্পাদনায় যোগ দেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ পাশ্চাত্যে চলিয়া গেলে স্বামী শুদ্ধানন্দ উদ্বোধনের দ্বিতীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘ দশ বৎসর এই কার্যে ব্রতী থাকেন।

১৯২৭ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়া ১৯৩৪ খৃঃ পর্যন্ত তিনি এই গুরুদায়িত্ব বহন করেন। ১৯৩৮ খৃঃ মঠ ও মিশনের পঞ্চম অধ্যক্ষ-পদে বৃত হন এবং মাত্র ছয় মাসকাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ২৩শে অগস্ট, ১৯৩৮ খৃঃ ৬৬ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে মহাসমাধি লাভ করেন।

হরিদাস বিহারীদাস দেশাই

বাবু হরিদাস বিহারীদাস দেশাই জুনাগড়ের দেওয়ান ছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে 'দেওয়ানজী সাহেব' এবং কখন কখন 'হরিদাস ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

পরিব্রাজক অবস্থায় লিমড়ি রাজ্য ত্যাগ করিয়া স্বামীজী ভাবনগর ও শিহোর দর্শন করিয়া জুনাগড়ে আসিয়া দেওয়ানজীর অতিথি হন। স্বামীজীর সঙ্গ লাভ করিয়া দেওয়ানজী এত মুগ্ধ হন যে, প্রতি সন্ধ্যায় তিনি রাজ-কর্মচারীদিগকে লইয়া স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত কাটাইতেন। সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া স্বামীজীর কথোপকথন শ্রবণ করিতেন। কোন কোন দিন সময় কিভাবে অতীত হইয়া যাইত, কেহ বুঝিতে পারিতেন না। জুনাগড়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বামীজীর অকপটভাব, আড়ম্বরশূন্যতা, বিবিধ শিল্পবিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান, উদার মতসমূহ, ধর্মপরায়ণতা, প্রাণস্পর্শী বাগ্মিতা, সঙ্গীতে অসাধারণ ক্ষমতা এবং অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামীজীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা সর্বপ্রথম শোনেন।

জুনাগড়কে কেন্দ্র করিয়া স্বামীজী চতুর্দিকের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করেন। দেওয়ানজী দর্শনাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। গীর্নার-পর্বতে খাপড়া-খোদির গুহা 'ভৈরো ঝাম্পা' এবং হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন স্মৃতি ও ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া স্বামীজী অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। গীর্নার-পর্বত দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়া সেখানে তিনি সাধনা করিবার জন্য উৎসুক হন এবং একটি নির্জন গুহা আবিষ্কার করিয়া কিছুদিন ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করেন। জুনাগড়ে ফিরিয়া বন্ধুদিগের নিকট বিদায় লইয়া স্বামীজী ভুজ-রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিদায়কালে জুনাগড়ের দেওয়ান সাহেব ভুজরাজ্যে অবস্থানের জন্য কয়েকটি পরিচয়-পত্র দেন।

দেওয়ানজী স্বামীজীর মাতার সহিত এবং মঠের সাধুদের সহিত দেখা করেন। দেওয়ানজী স্বামীজীর মা ও ভাইদের দেখিতে গিয়াছিলেন বলিয়া ২৯শে জানুআরি ১৮৯৪ শিকাগো হইতে স্বামীজী আনন্দ প্রকাশ করিয়া দেওয়ানজীকে পত্র লেখেন। এই পত্রে মায়ের প্রতি স্বামীজীর গভীর ভালবাসার কথা প্রকাশ পায়। মঠের সাধুরা এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ দেওয়ানজীর যথোচিত সম্মান ও যত্ন করায় ১৮৯৪ খৃঃ ১৯শে মার্চ শিকাগো হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্রে স্বামীজী ঐ কার্যের প্রশংসা করেন।

হরিদাস বিহারীদাসকে লিখিত স্বামীজীর সাতখানি পত্র পাওয়া যায়। পত্রগুলি পড়িলে বোঝা যায়, স্বামীজী তাঁহাকে কতখানি শ্রদ্ধা করিতেন। কয়েকটি পত্রে অনেক উপদেশও আছে। ২০শে জুন, ১৮৯৪ চিকাগো হইতে লিখিত পত্রে স্বামীজী শিক্ষা-বিস্তারে ভারত-বাসীর কর্তব্য নির্দেশ করিতেছেন :

'জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা। আমাদের সমাজ-সংস্কারকগণ খুঁজিয়া পান না—ক্ষতটি কোথায়।...আমাদের ধর্মের কোন অপরাধ নাই, কারণ মূর্তি-পূজায় বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে

তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হইবার জন্যই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।

অধ্যাপক রাইট

ডক্টর জন হেনরী রাইট হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। বোস্টনের নিকটে 'ব্রিজি মেডোজে' স্বামীজী যখন অবস্থান করেন, তখন অধ্যাপক রাইটের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। অধ্যাপক মহোদয় একদিন চার ঘণ্টাকাল আলাপ করিয়া স্বামীজীর অত্যদ্ভুত বিদ্যা জ্ঞান ও প্রতিভা-দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হন যে, তাঁহাকে ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিলেন ও বলিলেন, সমগ্র আমেরিকাবাসীর সহিত পরিচয় লাভ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। স্বামীজী এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে যে যে অন্তরায় ঘটিয়াছে, তাহা রাইট সাহেবকে খুলিয়া বলিলেন। প্রধান অন্তরায় এই যে, তাঁহাকে কেহ চেনে না এবং তিনি যে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি, এরূপ কোন নিদর্শন তাঁহার নিকট নাই।

রাইট সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'স্বামীজী, আপনার নিকট পরিচয়-পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তাহার আলো দিবার অধিকার কি জিজ্ঞাসা করা একই কথা।' তারপর তিনি নিজে স্বামীজীকে ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইবার জন্য যে যে বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন, তাহার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহিত উক্ত সভার অনেক বিখ্যাত ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির জানাশোনা ছিল। তার উপর প্রতিনিধি-নির্বাচন-সভার সভাপতি তাঁহার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। অধ্যাপক রাইট সভার কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠি লিখিয়া দিলেন, বিশেষতঃ প্রতিনিধি-নির্বাচন-সমিতির সভাপতিকে লিখিলেন, 'ইনি এমন একজন ব্যক্তি যে আমাদের সকল বিজ্ঞ অধ্যাপকের বিদ্যা একত্র করিলেও ইঁহার বিদ্যার সমান হয় না। অর্থাৎ ইনি একযোগে আমাদের সকল পণ্ডিত অধ্যাপক অপেক্ষা বেশী পণ্ডিত।'

তারপর স্বামীজীর নিকট অধিক অর্থ নাই বুঝিতে পারিয়া রাইট সাহেব শিকাগোর একখানি টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে দিলেন।

অধ্যাপক রাইটের সহিত স্বামীজীর অত্যন্ত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, স্বামীজী কয়েকবার তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পত্রাবলীতে অধ্যাপক রাইটকে লিখিত স্বামীজীর কয়েকখানি পত্র পাওয়া যায়। ২রা অক্টোবর, ১৮৯৩ খৃঃ লিখিত পত্রে ঈশ্বরে অপূর্ব শরণাগতির কথা আছে :

'আমি এখন স্পষ্ট বুঝেছি যে, যিনি আমাকে হিমালয়ের তুষার-শৈলে কিংবা ভারতের দগ্ধ প্রান্তরে পথ দেখিয়েছেন, তিনিই এখানে পথ দেখাবেন, সাহায্য করবেন। তাঁর জয় হোক, অশেষ জয় হোক। সুতরাং আমি আবার পুরাতন রীতিতে শান্তভাবে গা ঢেলে দিয়েছি। কেউ এগিয়ে এসে আমাকে খেতে দেয়, কেউ দেয় আশ্রয়, কেউ বলে— তাঁর কথা শোনাও আমাদের। আমি জানি তিনিই তাঁদের পাঠিয়েছেন—আমি শুধু নির্দেশ পালন ক'রে যাব। তিনি আমাকে সব যোগাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।'

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥'

সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) স্বামীজী যখন ক্লাস করিতেন, তখন তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অধ্যাপক রাইটও ছিলেন। স্বামীজী মাঝে মাঝে এই অধ্যাপককে লইয়া তামাসা করিতেন, কৌতুক করিয়া তাঁহাকে 'ডকি' বলিতেন। এক একদিন অধ্যাপক রাইট স্বামীজীর ক্লাসে ধর্ম-প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, প্রত্যেক আলোচনার পরে উত্তেজিত হইয়া বারবার জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তাহলে স্বামীজী, শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ালো যে, আমি ব্রহ্ম, আমি শাশ্বত।' স্বামীজী প্রশ্রয় দিয়া স্মিত হাস্য করিতেন এবং ধীরে ধীরে উত্তর দিতেন, 'হ্যাঁ ডকি! তোমার সত্তার সত্য অস্তিত্বে তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই শাশ্বত।' পরে যখন ডক্টর রাইট ক্লাসে সামান্য দেরিতে আসিতেন, তখন স্বামীজী অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সহিত চোখে হাস্যোদ্দীপক মিটমিট ভাব আনিয়া বলিতেন, 'এই ব্রহ্ম আসছেন, এই দেখ শাশ্বত!'

ভগিনী হরিদাসী (মিস এস. ই. ওয়াল্ডো)

আমেরিকার ব্রুকলিন-নিবাসিনী মিস এস. ই. ওয়াল্ডো 'ভগিনী হরিদাসী' নামেও সুপরিচিতা। স্বামীজীর দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'রাজযোগ' ও 'দেববাণী'র সহিত তাঁহার স্মৃতি জড়িত।

১৮৯৫ খৃঃ সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) সাত সপ্তাহ অবস্থান করিয়া স্বামীজী যে ক্লাস করিয়াছিলেন, এই মহিলা ছিলেন তাহার এক উৎসাহী ছাত্রী। স্বামীজীর ধর্মপ্রসঙ্গগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, পরে ঐগুলি 'Inspired Talks' বাংলায় 'দেববাণী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। স্বামীজীকে যাঁহারা ভালবাসেন, তাঁহারা সকলেই এই অমর-বাণীর জন্য লেখিকার নিকট ঋণী।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে যাঁহারা ছিলেন, স্বামীজী তাঁহাদিগকে কি শিক্ষা দিতেন, তাহার প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল, ভগিনী হরিদাসীর লেখনী-মুখে তাহার অপূর্ব বর্ণনা : 'স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন লোকের সহিত বাস করাই অবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ ভূমি লাভ করা। প্রাতঃ-কাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত সেই একই ভাব—আমরা এক ঘনীভূত ধর্মভাবের রাজ্যে বাস করিতাম।...ঠিক দ্বাদশ জন ছাত্রী ও ছাত্র সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর অনুগমন করিয়া-ছিলেন এবং তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন তিনি আমাদিগকে প্রকৃত শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং সেইজন্যই তিনি আমাদিগকে দিবারাত্র এরূপ প্রাণ খুলিয়া তাঁহার নিকট যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু ছিল, তাহাই শিক্ষা দিতেন।...আমাদের মধ্যে দুইজন পরে সহস্র-দ্বীপোদ্যানেই সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ন্যাসের সময় স্বামীজী আমাদের পাঁচজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন, এবং অবশিষ্ট কয়েকজন পরে নিউইয়র্ক নগরে স্বামীজীর তত্রত্য অপর কয়েক-জন শিষ্যের সহিত এক সঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতিদিন স্বামীজী কোন একটি বিশেষ বিষয় নির্বাচন করিয়া লইয়া তৎ-সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উপনিষৎ, বা ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্র প্রভৃতি কোন ধর্মগ্রন্থ লইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন।'

স্বামীজীর 'রাজযোগ' গ্রন্থটির কিছু অংশ বক্তৃতাকারে প্রদত্ত হইয়াছিল, অবশিষ্ট অংশ স্বামীজী বলিয়া যাইতেন, ভগিনী হরিদাসী লিখিয়া লইতেন।

'রাজযোগ' লেখা সম্বন্ধে ভগিনী হরিদাসী এইরূপ বলেন : 'স্বামীজী যখন লিখিবার জন্য পুস্তকের বিষয়বস্তু আমার নিকট বলিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে অনুপ্রেরণা লাভ হইত। সূত্রের ভাষ্য বলিবার সময় তিনি আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিতেন এবং গভীর ধ্যানে বা আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। ঐ অবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া তিনি চমৎকার উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দিতেন। আমাকে সর্বদা কালিতে কলম ডুবাইয়া রাখিতে হইত। তিনি হয়তো দীর্ঘ সময় এইভাবে নিমগ্ন থাকিতেন, তারপর হঠাৎ তাঁহার নিস্তব্ধতা কিছু প্রাণস্পর্শী বাক্য বা দীর্ঘ সুবিবেচিত উপদেশাবলী দ্বারা ভঙ্গ হইত।'

সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতা দ্বারা এতদূর প্রভাবিত হন যে, ভগিনী হরিদাসী বলিতেন, 'আমরা এমন কি সুকৃতি করিয়াছি যে, এই সব অমূল্য সম্পদ্ পাওয়ার উপযুক্ত হইয়াছি।'

নিউইয়র্কে স্বামীজী ১৮৯৫ খৃঃ যখন 'বেদান্ত-দর্শন' শিক্ষা দিতেন, ভগিনী হরিদাসী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ গ্রহণ করিতেন। এই সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু আগ্রহশীল শিক্ষার্থীর সমাগম হইত। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ক্লাস হইত। রবিবারেও ক্লাস বন্ধ থাকিত না, প্রশ্নোত্তরও হইত।

স্বামীজী ভগিনী হরিদাসীকে সর্বাপেক্ষা কৃতী ছাত্রী এবং বেদান্ত-প্রচারে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করিতেন। স্বামীজীকে প্রচার-কার্যে ও গ্রন্থ-সম্পাদনায় তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। বেদান্ত-ব্যাখ্যায় তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। স্বামীজীর দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ও ইওরোপ-ভ্রমণের সময় স্বামী সারদানন্দ আমেরিকায় প্রচার-কার্য চালাইতে থাকেন। স্বামী সারদানন্দ ক্যাম্ব্রিজে যাওয়ায় তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ভগিনী হরিদাসী অন্যান্য কার্যের সহিত নিউ-ইয়র্ক বেদান্ত-সমিতির কার্যও অত্যন্ত সাফল্যের সহিত পরিচালনা করিতেন।

মিস্টার স্টার্ডি

উত্তর ভারত ভ্রমণ-কালে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ আলমোড়ায় গিয়াছিলেন। এই সময় একজন উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি থিয়োজফি চর্চা করিতেন—ইনিই মিস্টার স্টার্ডি। ইহা ১৮৯৩ খৃঃ শেষের দিকের ঘটনা। এই সময় স্বামীজী আমেরিকা গিয়াছিলেন। স্বামী শিবানন্দের সহিত কথোপকথনে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন, তাঁহার নিকট স্বামীজীর কথা ও পাশ্চাত্যে তাঁহার প্রচারকার্য সম্বন্ধে জানিতে পারেন এবং স্বামীজীকে ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচার করিতে আমন্ত্রণ করিবেন বলেন।

মিঃ ই. টি. স্টার্ডি ইংলণ্ডের একজন অবস্থাপন্ন বিদ্বান্ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইংলণ্ডে স্বামীজীর প্রচারকার্যে যাঁহারা সাহায্য করেন, মিঃ স্টার্ডির নাম তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নিকট হইতে পত্র পাইয়া স্বামাজী প্রথম ইংলণ্ডে যান। মিঃ স্টার্ডি স্বামীজীকে আশ্বাস দেন যে, লণ্ডন বিরাট কর্মক্ষেত্র এবং তাঁহার সাধ্যমত তিনি স্বামীজীর কার্যে সহায়তা করিবেন।

১৮৯৫ খৃঃ অগস্ট মাসের মধ্য ভাগে রওনা হইয়া ঐ মাসের শেষে স্বামীজী প্যারিস পৌঁছান। সেখানে কয়েকদিন কাটাইয়া তিনি ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন। স্টার্ডি ও মিস মূলার তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। এই সময়ে স্টার্ডি স্বামীজীর সহিত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির পরিচয়

করাইয়া দেন, পরবর্তীকালে তাঁহারা স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী বন্ধুতে পরিণত হইয়াছিলেন। লণ্ডনে স্বামীজীর ক্লাসগুলি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য স্টার্ডি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। স্বামীজীর বেদান্ত-প্রচারকার্যে তাঁহার খুব উৎসাহ ও আন্তরিকতা ছিল। শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি হিসাবে সম্মানিত মিঃ স্টার্ডি তাঁহার সম্ভ্রান্ত বন্ধুমহলে স্বামীজীর বিষয় বিশেষভাবে বলিতেন।

স্টার্ডিকে লিখিত স্বামীজীর ৩০খানি পত্র পাওয়া যায়, তাহাতে বহু বিষয় আলোচিত। একখানি পত্রে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন :

'কেবল সংখ্যাধিক্য দ্বারাই কোন মহৎ কার্য হয় না ; অর্থ, ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য কিংবা বাক্-চাতুরী—ইহাদের কোনটিরই মূল্য নাই। পবিত্র, খাঁটি এবং প্রত্যক্ষানুভূতি-সম্পন্ন মহা-প্রাণ ব্যক্তিরাই জগতে সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যদি প্রত্যেক দেশে এইরূপ দশ-বারটি মাত্র সিংহবীর্য-সম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা নিজেদের সমুদয় মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, যাঁহারা অসীমের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের সমগ্র চিত্ত ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন, অর্থ যশ ও ক্ষমতার স্পৃহা-মাত্রহীন—তবে এই কয়েকজন ব্যক্তিই সমগ্র জগৎ তোলপাড় করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট।'

লণ্ডনে কিছুকাল অবস্থানের পর স্বামীজী আমেরিকা যান, পুনরায় ১৫ই এপ্রিল, ১৮৯৬ লণ্ডনে রওনা হন। স্বামী সারদানন্দ ১লা এপ্রিল কলিকাতা হইতে আসিয়া মিঃ স্টার্ডির অতিথি হইয়াছেন। মিস্ মুলার ও মিঃ স্টার্ডির অতিথি-রূপে স্বামীজী স্বামী সারদানন্দের সহিত সেণ্ট জর্জেস্ রোডে অবস্থান করেন।

এই সময় স্টার্ডি ভক্তিযোগের 'নারদসূত্র' অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং স্বামীজী অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁহাকে সাহায্য করিতে বহু সময় ব্যয় করিতেন।

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সহিত সাক্ষাৎ-কারের সময় স্বামীজীর সঙ্গে মিঃ স্টার্ডিও ছিলেন। স্বামীজী প্রায় ছয় সপ্তাহ ইওরোপের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলে জনসাধারণ যাহাতে স্বামীজীর ভাষণ শুনিতে পায়, তাহার জন্য মিঃ স্টার্ডি ৩৯নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে একটি বড় ঘর ভাড়া করেন।

স্বামীজী যখন লণ্ডন হইতে চলিয়া আসেন, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬ খৃঃ তাঁহাকে বিদায়-সম্ভাষণ দেওয়া হয়। এই বিদায়-সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অক্লান্তকর্মী মিঃ স্টার্ডি, তিনি তাঁহার সকল বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করেন এবং নিজে সভাপতি হন। স্বামীজীর সম্বন্ধে স্টার্ডি একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন : 'আমি যে বস্তু সারা জীবন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, স্বামীজীর মধ্যে তাহা পাইয়াছি।' ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫ স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দকে জানাইতেছেন : 'মিঃ স্টার্ডি আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, সে বড়ই উদ্যমী ও সজ্জন।'

মিঃ স্টার্ডি ভারতীয় চিন্তাধারায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হন, স্বীয় জীবনে ভারতীয় ভাবধারা রূপায়িত করিতে মনস্থ করিয়া ভারতে আগমন করেন এবং হিমালয়ের নিভৃত পার্বত্যনিবাসে আলমোড়ায় বহু দিন কঠোর তপস্যায় রত থাকেন। স্বামীজী গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদা-নন্দকে লণ্ডনে রাখিয়া চলিয়া আসেন। কিছু দিন পর স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় চলিয়া গেলে ইংলণ্ডের প্রচারকার্য মিঃ স্টার্ডি একাই চালাইতে থাকেন।

দুঃখের বিষয় মিঃ স্টার্ডি শেষ পর্যন্ত স্বামীজীর উপর তাঁহার পূর্ব শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই।

রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি

পরিব্রাজক অবস্থায় ১৮৯২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী ত্রিবেন্দ্রাম্‌ ত্যাগ করিয়া রামেশ্বর অভিমুখে রওনা হন। পথে মাদুরায় রামনাদ-রাজ ভাস্কর সেতুপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্বামীজী রাজার নিকট পরিচয়-পত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। ভাস্কর সেতুপতি খুব ভক্তিমান্‌ এবং ভারতের অভিজাতদের মধ্যে খুব শিক্ষিত ছিলেন। তিনি স্বামীজীর একজন বিশেষ গুণগ্রাহী ও অনুরাগী ভক্ত হইয়া উঠিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট স্বামীজী গণশিক্ষা ও কৃষির অবস্থা উন্নয়ন সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করেন। ভারতের বর্তমান সমস্যা ও তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধেও মত প্রকাশ করেন। রাজা ভাস্কর সেতুপতি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন যে, এতদিনে সত্যই ভারতে একজন প্রকৃত ধার্মিক কর্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছে। স্বামীজী সেই ধর্মবীর—দেশজননীর সেই সুসন্তান।

স্বামীজীর কথাবার্তার উপর তাঁহার এতদূর শ্রদ্ধা জন্মিল যে, তিনি তাঁহাকে পুনঃপুনঃ শিকাগো ধর্মসভায় যাইবার জন্য বলিলেন ও সেজন্য অর্থ-সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। কারণ, তাঁহার মনে হইল, ঐস্থানে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক আলোকের প্রতি প্রতীচ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত সুযোগ ঘটিবে এবং উহা দ্বারাই ভারতে তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্যের ভিত্তি স্থাপিত হইবে। কিন্তু স্বামীজী তখন রামেশ্বর দর্শনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র, সুতরাং এ-সম্বন্ধে তিনি কি স্থির করেন, পরে তাঁহাকে জানাইবেন বলিলেন। মহারাজার নিকট বিদায় লইয়া স্বামীজী রামেশ্বর গমন করিলেন। রামেশ্বরের প্রকাণ্ড মন্দিরে দেব দর্শন করিয়া তাঁহার বহুদিনের সাধ পূর্ণ হইল।

পাশ্চাত্য দেশে যাইবার জন্য যাঁহারা স্বামীজীকে সাহায্য করিয়াছিলেন, রামনাদের রাজা তাঁহাদের অন্যতম।

আমেরিকায় স্বামীজীর বিজয়বার্তা শ্রবণ করিয়া রাজা স্বীয় গুরুর সম্মানে পুলকিত হইতেন। সংবাদ আসিল—স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।

২৬শে জানুআরি, ১৮৯৭ খৃঃ মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরের পূর্বে স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণ সহ জাফনা হইতে জলপথে জাহাজে পাম্বানে পৌছিলেন। রামনাদের রাজা স্বামীজীকে রামেশ্বরে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি রামেশ্বর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় জানিতে পারিলেন, স্বয়ং রামনাদাধিপতিই সদলবলে স্বামীজীর অভ্যর্থনার জন্য আসিয়াছেন।

রাজা অপরাহ্নে স্বামীজীকে নিজ রাজ-তরণীতে লইয়া গেলেন এবং পাত্রমিত্র সভাসদ্‌-গণের সহিত সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিলেন। স্বামীজী রাজার হাত ধরিয়া উঠাইয়া আশীর্বচন উচ্চারণ করিলেন। সন্ন্যাসী-গুরু ও সপার্ষদ রাজ-শিষ্যের সেই মিলন বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। স্বামীজী আবেগভরে বলেন, যাঁহাদের মনে প্রথমে তাঁহার পাশ্চাত্যে যাওয়ার কথা উদিত হয়, রাজা ভাস্কর সেতুপতি তাঁদের মধ্যে একজন, অতএব ভারতে প্রত্যাবর্তনের সূত্র-পাতে রামনাদরাজের সহিত সাক্ষাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। নৌকা হইতে তীরে উঠিবার পর পাম্বানবাসীরা স্বামীজীকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। জেটির নিম্নেই এক প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপ নানাবিধ পুষ্পপত্রে অতি সুন্দরভাবে শোভিত হইয়াছিল। অভি-নন্দন সভায় রাজা হৃদয়াবেগে ব্যক্তিগতভাবে

একটি স্বতন্ত্র অভিভাষণ দ্বারা স্বীয় মনোভাব নিবেদন করিলেন। স্বামীজীও যথাযোগ্য উত্তর-প্রদানে সকলকে প্রীত করিলেন। এই-খানে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভারতের জাতীয় জীবন একমাত্র ধর্মে প্রতিষ্ঠিত—রাজনীতি-চর্চায়, যুদ্ধবিদ্যা-পারদর্শিতায়, বাণিজ্যের উৎকর্ষে বা শিল্প-সমৃদ্ধিতে নয়। ধর্মই আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন এবং জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। আর ইহাই সমগ্র পৃথিবীতে আমাদের দিবার বস্তু।'

সভার কার্য শেষ হইলে স্বামীজীকে রাজ-শকটে বসাইয়া রাজার বাংলোর দিকে লইয়া যাইবার সময় রাজা ও অমাত্যবর্গ পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যান। রাজার ইচ্ছানুসারে শকটবাহী অশ্বগুলিকে মুক্তি দিয়া সকলে মিলিয়া গাড়ি টানিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাজাও তাহাতে যোগ দিলেন।

পাম্বানে স্বামীজী তিন দিন বড়ই আনন্দে কাটাইলেন। ঐ স্থানের এবং ইহার নিকট-বর্তী রামেশ্বরের অনেক অধিবাসী এই সময়ে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন স্বামীজী রামেশ্বরের মন্দির-দর্শনে যাত্রা করিলেন। পাঁচবৎসর পূর্বে ভারতের সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিয়া যেদিন শেষ এই রামেশ্বরে আসিয়াছিলেন, সেদিনের কথা মনে পড়িল, সেদিন এ মহোৎসব ছিল না, সেদিন তিনি জীর্ণ মলিন বেশে শ্রান্ত চরণে এই মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন! স্বামীজীর গাড়ি যখন মন্দিরের নিকট পৌঁছিল, তখন এক বিরাট জনতা হস্তী উষ্ট্র অশ্ব মন্দিরের চিহ্নিত পতাকা এবং অন্যান্য সম্মানের চিহ্ন লইয়া দেশী সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে উপস্থিত হইল। মন্দিরে দেবদর্শনের পর সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া স্বামীজী 'তীর্থমাহাত্ম্য ও উপাসনা' সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বলেন, 'শিবের অর্চনা শুধু মন্দিরস্থ বিগ্রহের অর্চনা নহে, কিন্তু দীন দরিদ্র আতুরের মধ্যে যে জীবরূপী শিব আছেন, তাঁহার অর্চনা।'

পরদিন স্বামীজীর উপদেশের সার্থকতা-সম্পাদনের জন্য রামনাদের রাজা শত সহস্র দুঃখী ব্যক্তিকে আহার্য ও বস্ত্র বিতরণ করিলেন এবং এই ঘটনার স্মরণার্থ সেই স্থানে ত্রিশ হাত উচ্চ এক স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া তদুপরি নিম্ন-লিখিত পঙ্‌ক্তি কয়টি খোদিত করাইলেন :

সত্যমেব জয়তে

পাশ্চাত্যে বেদান্ত-ধর্ম প্রচারে অশ্রুতপূর্ব সফলতা লাভ করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় ইংরেজ শিষ্যগণের সহিত ভারতভূমির যেস্থলে প্রথম পদার্পণ করিয়া-ছিলেন, সেই পবিত্র স্থান নির্দেশ করিবার জন্য রামনাদাধিপতি ভাস্কর সেতুপতি কর্তৃক এই স্মারক-স্তম্ভ প্রোথিত হইল। ১৮৯৭ খৃঃ ২৭শে জানুআরি।

রামনাদে অবস্থানকালে বহু ব্যক্তি স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া-ছিলেন। একদিন তিনি এখানকার খৃষ্টান স্কুলগৃহে একটি বক্তৃতা দেন। আর একদিন তাঁহার সম্মানার্থ রাজপ্রাসাদে এক দরবার হয়। এখানে স্বামীজীকে সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় অনেকগুলি অভিনন্দন দেওয়া হয়। স্বামীজীও একটি সুন্দর ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। তাহাতে বলেন, রামনাদরাজ সাংসারিক পদমর্যাদায় খুব উচ্চ, কিন্তু তাঁহার চিত্ত সর্বদা ঈশ্বরে যুক্ত এবং এই কারণে তিনি রামনাদের অধিপতিকে 'রাজর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। রামনাদের রাজা একাধারে রাজা ও ঋষি।

রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী 'ভারতে শক্তি উপাসনা' সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দেন, উহা ফনোগ্রাফে (Phonograph) তোলা হয়।

স্বামী বোধানন্দ

স্বামীজীর যে তিনজন সন্ন্যাসী শিষ্য আমেরিকায় গিয়া বেদান্ত-প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বোধানন্দ একজন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। ১২৭৭ সালে (১৮৭০ খৃঃ) অক্ষয় তৃতীয়ার দিন তিনি হাওড়া জেলার বাগাণ্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। খগেন্দ্রনাথ (স্বামী বিমলানন্দ) ছিলেন হরিপদর খুড়তুত ভাই।

'শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে আমার যোগদান' প্রবন্ধে স্বামী বোধানন্দ লিখিয়াছেন: ১৮৮৬ খৃঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর-রক্ষার পর কয়েক মাস স্বামীজী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবাজার ব্রাঞ্চ হাইস্কুলে হেড মাস্টারের কার্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি সেই স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়িতাম। স্কুল-বাড়ির প্রধান দরজার সম্মুখে খানিকটা জমি ছিল। স্বামীজী স্কুলে আসিবার সময় যখন সেই স্থানটি দিয়া যাইতেন, আমি দোতলায় জানালা দিয়া তাঁহার গতি নিরীক্ষণ করিতাম। তিনি প্যাণ্টালুন ও চাপকান পরিতেন। একহাতে এণ্ট্রান্স কোর্সের এক কপি ও অপর হাতে ছাতা থাকিত। তাঁহার ঐরূপ ধীর গতি ও জ্যোতির্ময় চক্ষু-দুইটি দেখিয়া তখনই তাঁহাকে এক অসাধারণ পুরুষ বলিয়া মনে হইয়াছিল। মঠে যাতায়াতকালে যখন শুনিলাম, তিনিই স্বামীজী, তখন তাঁহার সৌম্যমূর্তি আবার স্মরণে আসিল। পরে বুঝিলাম, কেন প্রথম দর্শন হইতে তাঁহার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। স্বামীজীর প্রতি গুরুভাইদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনিও তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন। সকলেই তাঁহার গুণবর্ণনা-কালে গদ্‌গদ হইতেন। শশী মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ, মহাপুরুষজী আমাদিগকে বলিতেন, 'নরেন মঠে ফিরিলেই তোমাদের সন্ন্যাস হইবে।'

১৮৯০ খৃঃ হরিপদ জগৎবল্লভপুর স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা রিপন কলেজে পড়িতে থাকেন। খগেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া সহপাঠী ও সমবয়সী বন্ধুদের যে দলটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, হরিপদও তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঐ সময় সকলে মিলিয়া গঙ্গাস্নান, বার-তিথি বিশেষে উপবাস, নিরামিষ-ভোজন, ভাগবত গীতা উপনিষদাদি শাস্ত্রপাঠ, রোগীর সেবা, দুঃস্থকে সাহায্য-দান, সুবিধামত সাধুদর্শন ও সংকীর্তনে যোগদান করিতেন। রিপন কলেজে পাঠকালে 'শ্রীম'র ('কথামৃত'কার মাস্টার মহাশয়) সহিত পরিচয়, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্যগণের সহিত আলাপ এবং বরাহনগর মঠে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণের পূত সঙ্গ লাভ করিয়া হরিপদর অন্তরের স্বাভাবিক ধর্মভাব উদ্দীপিত হয়। খগেন্দ্রনাথ (স্বামী বিমলানন্দ) ও কালীকৃষ্ণের (স্বামী বিরজানন্দ) বাড়িতেই তাঁহাদের বৈঠক বেশী হইত। হরিপদ নিয়মিতভাবে এইসব সভায় যোগ দিয়া ধর্মালোচনা করিতেন।

রিপন কলেজ হইতে বি-এ পাস করিবার পর কলিকাতা হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে তাঁহাদের গ্রাম জগৎবল্লভপুর স্কুলে কয়েক

বৎসর শিক্ষকতা করেন। সেই সময় তিনি মাঝে মাঝে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে ভক্তসঙ্গ ও বরাহনগর মঠে সাধুসঙ্গ করিতে আসিতেন। হরিপদর অন্তরে যাঁহারা বৈরাগ্যের অনল জ্বালাইয়া তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেন, তাঁহাদের মধ্যে ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৯৭ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে হরিপদ জগৎবল্লভপুর হইতে আলমবাজার মঠে উৎসব দেখিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া এই সময় কাশীপুর গোপাল লাল শীলের বাগান বাড়িতে থাকিতেন।

একদিন রবিবার খুব সকালে প্রায় ৬টার সময় তখনও অন্ধকার, হরিপদ গোপাল লাল শীলের বাগান-বাড়িতে উপস্থিত হইয়াছেন, স্বামীজী উপর হইতে জানালা দিয়া তাঁহাকে দেখিয়া নিচে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। হরিপদ স্বামীজীকে প্রণাম করিলে স্বামীজী তাঁহাকে যেন কত দিনের পরিচিত ভাবিলেন ও এইরূপভাবে কথা বলিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে এক গ্লাস জল আনিতে বলিলেন, হরিপদ জল আনিলে স্বামীজী মুখ ধুইলেন। মহাপুরুষ মহারাজ সেখানে ছিলেন, তিনি স্বামীজীকে হরিপদর পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'এদের দলের জনকয়েক ক-বছর ধরে মঠে যাতায়াত করছে, সঙ্ঘে যোগদান করার ইচ্ছা।' স্বামীজী শুনিয়া বলিলেন, 'আমি একে সন্ন্যাস দেব।' ইহা শুনিয়া আনন্দে হরিপদর চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপূজার দিন স্বামীজী চারজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস দেন এবং দু-একজন ভক্তকে মন্ত্র-দীক্ষা দেন। প্রায় সকাল ৮টার সময় স্বামীজী মঠে আসিলেন। স্বামীজীর আদেশে হরিপদও তাঁহার সঙ্গে গাড়িতে করিয়া আসেন

১৮৯৭ খৃঃ হরিপদ আলমবাজার মঠে যোগদান করেন এবং ১৮৯৮ খৃঃ স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'স্বামী বোধানন্দ' নামে পরিচিত হন।

স্বামী বোধানন্দ তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া স্বামী প্রকাশানন্দের সহিত কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ দর্শন করেন। ১৯০৬ খৃঃ বেদান্তপ্রচারের জন্য আমেরিকায় প্রেরিত হন। ১৯১২ খৃঃ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের স্থলে স্বামী বোধানন্দ নিউইয়র্ক বেদান্ত-প্রচার-কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করিয়া কৃতিত্ব-সহকারে আজীবন উহার কার্য পরিচালনা করেন। ১৯২৩ খৃঃ তিনি একবার ভারতে আসিয়াছিলেন। ১৯৫০ খৃঃ ১৮ই মে (১৩৫৭ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ) নিউইয়র্কে তিনি দেহত্যাগ করেন।

নাসদীয় সূক্ত

[ঋগ্‌বেদ ১০।১২৯—মূল, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা]

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥১

তখন অসৎ অর্থাৎ কার্যনামীয় কিছু ছিল না; সৎ অর্থাৎ কারণ বলিয়াও কিছু ছিল না। কার্যাভাবে অর্থাৎ আর কিছু তাহা হইতে উৎপন্ন বা প্রকাশিত না থাকায় তাহাকে সৎ বা কারণ বলিতে পারা যায় না।

তখন রজঃ অর্থাৎ স্থূল বস্তু বা যাহা দেখা যায় এবং ব্যোম অর্থাৎ সূক্ষ্ম বস্তু, যাহা দেখা যায় না এবং 'ব্যোমপরা' অর্থাৎ সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্ম বস্তু, এ-সব কিছুই ছিল না।

কি ছিল তখন? কিসের উপর তাহা ছিল ও কিসের দ্বারা তাহা আবৃত ছিল? ছিল কি শুধু তাহাই, যাহাকে গভীর গহন 'অম্ভ' বলা হয় (যাহা পুরাণে 'কারণ-বারি' নামে অভিহিত হয়)? গভীর গহন অর্থাৎ তাহা এরূপ ছিল, যাহার ভিতর দৃষ্টি চলে না ও যাহার সীমা নির্দেশ করা যায় না।

পূর্ব কল্পের জগৎ কোথায় গেল? কোন বস্তুর নিরতিশয় ধ্বংস হয় না। সূক্তের ভাব এই যে, ঋষিরা যাহা বলেন, তাহাই কি ঠিক যে পূর্ব কল্পের বস্তুসমূহ একরসত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্থানাতীত ও কালাতীত ভাবে অম্ভ-রূপে রহিয়াছে? ইহা সাধারণ রূপে কল্পিত হয় যে, প্রলয়-কালে বস্তুসমূহ একরসত্ব ও অলক্ষিতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টিকালে তাহাদের পুনঃ সমুদ্ভব হয়। সেই দ্রবীভূত অবস্থা সৃষ্টির উপাদান-রূপে কার্য করে বলিয়া জলে দ্রবীভূত শর্করার দৃষ্টান্তে তাহাকে কারণ-বারি বলা হয়। সৃষ্টির প্রাক্‌কালের এই অবস্থাকে রূপক-ভাবে অম্ভ বলা হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, তাহা স্থান-কালাতীত অবস্থা; বস্তু, আধার বা আধেয় বলিয়া তখন কিছুই ছিল না। এই মন্ত্রে বস্তু ও স্থান বলিয়া কিছুই ছিল না—তাহা বলা হইল। পরবর্তী মন্ত্রে কাল বলিয়া তখন কিছুই ছিল না—বলা হইবে।

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥২

প্রাণী সৃষ্ট হয় নাই, কাজেই মৃত্যুও সৃষ্ট হয় নাই। আর মৃত্যু সৃষ্ট হয় নাই বলিয়া অমৃতত্ব ছিল—তাহাও নহে, কারণ কোন জীবেরই সৃষ্টি হয় নাই। ঘটনা ছিল না বলিয়া, সময় বা কাল ছিল না এবং সময় ছিল না বলিয়া সময়কে দিন-রাত্রিতে মাত্রাভূত করিবার কিছুই ছিল না। অথবা এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে যে, পূর্ব কল্পের জগৎ অম্ভরূপে থাকায় ধ্বংস বা মৃত বলা যাইতে পারা যায় না, অমৃত বা প্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাও বলা যাইতে পারে না। এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে যে, প্রকৃতির সে-সময় কার্যকরী অবস্থা না থাকায় অবিদ্যা ও বিদ্যা (মৃত্যু ও অমৃত্যু) তমঃ ও রজঃ (রাত্রি ও দিবা) বলিয়া

কিছু ছিল না। (যে সময়ে এই সূক্তটি রচিত হইয়াছিল, সেই সময়ে অবিদ্যা, বিদ্যা, তমঃ, রজঃ ইত্যাদি ধারণাগুলি দানা বাঁধে নাই, তবে ব্যাখ্যার জন্য এইগুলির ব্যবহার হয়তো দূষণীয় না হইতে পারে)।

সেই সময়ে সেই এক যিনি ছিলেন, তিনি নিষ্ক্রিয় শ্বাস-প্রশ্বাসহীন (অবাতম্)। স্ব-স্বভাবে অর্থাৎ স্বরূপে, চেতন বা সম্বিৎ-রূপে বিরাজিত ছিলেন, যে চেতনে জীবনী-শক্তি ও বিকাশ-শক্তি সম্ভাব্যরূপে অন্তর্নিহিত ছিল।

তম আসীৎ তমসা গূঢমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।

তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ॥৩

অন্ধকারের ভিতর অন্ধকার অর্থাৎ সেই গভীর গহন কারণ-সলিলে, অবাঙ্‌মনসো-গোচর সম্বিৎ ওতপ্রোত-ভাবে ছিল। 'সর্ব'—সেই নির্বিশেষ মিশ্রণ-রূপে ছিলেন। (পুরাণে ইহাই চৈতন্যরূপী মহাবিষ্ণু কারণ-সলিলে শায়িত—বলা হইয়াছে।) 'এই সমস্তই' যেন সবই শূন্য, সবই অমূর্ত অবস্থা, স্থির—একভাবে ছিল।

এই বার সেই সম্বিতের ভিতর ইচ্ছারূপী চেষ্টার ধী বা বিশিষ্টজ্ঞান মূর্ত হইয়া উঠিল। জ্ঞান হইতে উপনিষদুক্ত হিরণ্যগর্ভের বা মহদ্‌ব্রহ্মের উদ্ভব হইল।

হিরণগর্ভ বা ব্রহ্মা হইতে জগৎ সৃষ্ট—কল্পিত হয়। কারণ-বারিতে প্রক্ষিপ্ত ব্রহ্ম-বীজ হইতে উৎপন্ন অণ্ড হইতে হিরণ্যগর্ভের জন্ম ও কারণ-সলিল-শায়ী নারায়ণের নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব হওয়ায় উপনিষদে ও পুরাণে এই ভাব আকারিত হইয়াছে।

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।

সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥৪

তারপর সেই ধী হইতে কামনা বা কল্পনার উদ্ভব হইল, যে কল্পনার বীজ বা জন্মস্থান-রূপে 'ঐশিক' মন কথিত হয়। ইহাই জীবের বিজ্ঞানময় কোষ হইতে স্থূলতর মনোময় কোষের উৎপত্তি বলিয়া আখ্যায়িত হয়।

নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মে ব্রহ্ম ও মায়ার বা পুরুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং 'সোঽকাময়ত বহু স্যাম্' অর্থাৎ এক হইতে বহুর উৎপত্তি ইত্যাদি কিভাবে হইয়াছে, তাহা সূক্তে এইরূপ ভাবে বলা হইল যে, ঋষিরা ধ্যানযোগে চিত্তের মনীষার দ্বারা ইহা আবিষ্কার করিলেন।

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।

রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥৫

এইবার সূক্তে বলা হইতেছে যে, ঋষিরা তাঁহাদের কল্পনার, ব্রহ্ম ও মায়া বা পুরুষ ও প্রকৃতি যে ভিন্ন, তাহা যেন আড়াআড়ি দাঁড়ি টানিয়া নির্দেশিত করিয়া দিলেন। লম্বালম্বি দাঁড়ি টানিয়া ভাগ করিয়া দিলে একজন অন্যের সমান হইয়া যাইত, সেই জন্য এক অন্যের উপর দেখাইতে দাঁড়ি টানা আড়াআড়ি ভাবে হইল—বলা হইল। কাহাকে নিম্নে ও কাহাকে উচ্চে দেওয়া হইল? স্রষ্টার শক্তি বা জীবভূতা তটস্থা শক্তিকে উপরে ও অপরা শক্তিকে অর্থাৎ অষ্টবিধা প্রকৃতি-শক্তিকে, (তাহা বিশাল শক্তি হওয়া সত্ত্বেও) সেই দাঁড়ির নিচে স্থাপন করা

হইল। শক্তিকে উপরে, আর সেই শক্তির বলে আমরা যে কাজ করি অথচ ভাবি যে আমরাই আমাদের স্বাধীন শক্তিতে কাজ করিতেছি, সেই মনোভাব-প্রসূত কাজকে নিচে রাখা হইল।

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।

অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥৬

সূক্তে এইবার বলা হইতেছে যে, ঋষিরা সৃষ্টির উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কল্পনাই, সেই জন্য সূক্তকার এই জিজ্ঞাসা করিতেছেন. কে ইহা ঠিকভাবে জানে আর কে বলিতে পারে, কোথায় এ সৃষ্টি-প্রপঞ্চের জন্ম হইল এবং কিভাবে ইহা প্রকাশিত হইল? দেবতারা ইহা জানেন না, কারণ দেবতারা এই প্রপঞ্চের ভিতর, এই প্রপঞ্চ-সৃষ্টির পর তাঁহাদের জন্ম হইয়াছে। কে বলিয়া দিবে, কখন ইহা মূর্তি পরিগ্রহ করিল?

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭

এই জগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা, সেই সগুণ ব্রহ্ম। তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভই বলা হউক বা সগুণ ব্রহ্মই বলা হউক, যিনি সর্বোচ্চ স্বর্গে স্থিত অর্থাৎ যিনি দেশকালাতীত ভাবে আছেন অর্থাৎ যিনি জগৎকে আবরণ করিয়া ও জগতে অনুস্যূত ভাবে আছেন, যিনি সর্বতশ্চক্ষু দ্বারা জগতের নিয়মন করিতেছেন, হয়তো তিনি বলিতে পারিবেন, তিনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ছিলেন কিনা। সূক্তকার বলিতেছেন যে, হয়তো বলিতে পারিবেন না। ইহার ব্যাখ্যা এইরূপে করা যায় যে. মানিয়া লইলাম--তিনি নিমিত্ত-কারণ ছিলেন, কিন্তু উপাদান-কারণ কি তিনি ছিলেন? ঈশ্বর মায়াধীশ হওয়া সত্ত্বেও মায়া-উপহিত হওয়ায় ব্রহ্ম-দর্শনে তাঁহার দৃষ্টি রুদ্ধ। বিশ্বস্রষ্টা বা সগুণ ব্রহ্ম 'সর্ব' হইতে উৎপন্ন, যে সর্ব—অন্ত ও সম্বিতের যোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মা যদি মায়া-উপহিত ব্রহ্ম হন ও মায়াই যদি বিশ্ব-প্রপঞ্চ হয়, তাহা হইলে যুক্তিতে ব্রহ্মাকে কারণ-উপাদান বলা যাইতে পারা যায় না। ঋষি দ্বারা সেই জন্য এখানে জিজ্ঞাস্য হইয়া উঠিল যে, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর জগৎটা সম্পূর্ণভাবে নিজে করিয়াছিলেন কিনা?



সূর্যবন্দনা

[বিখ্যাত তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর 'ঞায়ীরুবণক্কম্' কবিতার অনুবাদ]

শ্রীমতী বিভা সরকার

ওগো বালারুণ! আলোর ছটায় জলধির বুক ভরি
একি অপূর্ব উদয় তোমার ঊর্ধ্ব আকাশোপরি!
হেরিয়া তোমার দিব্য বিভায় উছলিত চারিধার
বিহঙ্গকুল পুলক-আকুল সঙ্গীতে একাকার!
এই জলধিও বিশাল হৃদয়ে ও-জ্যোতিপুঞ্জে গ্রাসি
কোটি আঁখিতারা সম ঝলসিছে সিন্ধু-বিন্দুরাশি!
এ মহাসাগর মহাসঙ্গীতে তব বন্দনা করে
ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া আপনার মনে অনন্ত ওঙ্কারে।

সাগর যেমন ও-পদ বন্দে অনন্তকাল ধরি
মুগ্ধ আমিও আজিকে তেমনি তব বন্দনা করি!
আমার মনের অণুতে অণুতে প্রকাশ হ'ক তোমার!
হে মোর দেবতা, মহাজীবনের দিলে মোরে অধিকার!
জ্যোতির্ময়ের বক্ষের মাঝে হে চির জ্যোতিষ্মান্,
পুণ্য প্রভাতে করুক বিশ্ব আজিকে সূর্যস্নান!
হে শক্তিমান্, মহা আকাশের সভাগৃহটিরে ঘিরে
লালন পালন শাসন করিছ তুমি সদা ধরণীরে!

বসুন্ধরার প্রেমিক কি তুমি? ধরণী তোমার প্রিয়া?
এরই মুখপানে তাই আছ চেয়ে অপলক আঁখি দিয়া!
ধরণীরও প্রেম তোমার লাগিয়া কোন বাধা নাহি মানে
প্রেমের পাথার উথলিত তার দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে।
তব দরশনে এ মহায়সীর ফুল্ল আসন হাসে
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে প্রাণ ভরি লয়ে আসে!
সৃষ্টির আদি তাইতো তোমরা মোদের জনক জননী—
লহ অঞ্জলি হে জ্যোতির্ময়! ধরণী সোনার বরণী!

শারদীয় অবসরে

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

মানবজীবনের পূর্ণতম মুহূর্তটি কর্মের না অবসরের—এ প্রশ্নের জবাবে মতভেদের আশঙ্কা কম। সব কাজেরই লক্ষ্য যখন সিদ্ধি, তখন একহিসেবে সব কাজেরই সীমা আছে। সেই সীমাকে আমরা বলি অবসর। আসলে অবসর থেকেই আবার নূতন কাজের সৃষ্টি। নিরবকাশ কর্মধারায় যাঁরা আস্থাবান্, বলা বাহুল্য, তাঁদের সঙ্গে আমাদের মতে মেলে না। তাই শৈশব-কৈশোরের 'পুজোর ছুটি', আজও মন হরণ করে।

বৈশাখের তপস্যান্তে অপর্ণা পৃথিবী একদিন ধারাস্নানের ব্রত গ্রহণ করলেন। আষাঢ়-শ্রাবণের স্নানযাত্রার অবসানে আশ্বিনের আকাশ তার সুনীলোজ্জ্বল অম্বরখানি মেলে ধরলো বিমুগ্ধ পৃথিবীর চোখের উপর। এই প্রসন্ন প্রশান্ত কনকরৌদ্র-উদ্ভাসিত ধরিত্রীর প্রাঙ্গণে আগমনীর সুর শোনা গেল, আর আমাদের মনে ঘুরে ফিরে বাজলো ছুটির রাগিণী। 'ছুটির বাঁশী বাজলো।'

কেউ কেউ বলেন, এদেশে ছুটির তালিকা বড়ো দীর্ঘ সন্দেহ নেই, অন্যান্য দেশের কর্ম-ব্যস্ততার সঙ্গে এদেশ এখনও সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে যেতে পারেনি। কাজ করতে করতে মরা অথবা (একটু পুরানো আমলের উপমায়) ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া হওয়ার আদর্শে আমাদের সিদ্ধি এখনও বহুদূরবর্তী। কিন্তু সে ঘটনা ঘটবার আগে, এখনও যখন 'ছুটি' পাওয়া আমাদের সংবিধানসম্মত, তখন বিভিন্ন ছুটির একটু তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে।

'ছুটি'-পাইয়েদের আমরা দু-ভাগে ভাগ করতে পারি—একদল অফিসযাত্রী, আর একদল বিদ্যালয়যাত্রী। বিদ্যালয়যাত্রীদের মধ্যে প্রাথমিক থেকে মহাবিদ্যালয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়—সব শ্রেণীর যাত্রীদের কথাই ধরছি। যাঁরা অফিসে যান, তাঁদের ধারণায় শিক্ষক বা অধ্যাপকদের 'ছুটি' অনেক বেশী মনে হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য অফিসের কাজকর্ম সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল, তাঁরা অফিসের মধ্যেও অবকাশরচনার অজস্র উদাহরণ দিতে পারেন। তবু দশটা-পাঁচটার নিত্য-উপস্থিতির তুলনায় মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অনেক বেশী সময় হাতে পান—এ-কথা মানতেই হবে। সে তুলনায় বহুমুখী বিদ্যালয় বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবকাশ স্বল্পতর। তবু গরমের ছুটি আর পুজোর ছুটিতে মিলিয়ে যে 'ছুটি'র পরিমাণ তাঁরা ভোগ করেন, 'অফিস'-যাত্রীদের পক্ষে তা ঈর্ষাযোগ্য। বোধ করি, এই কারণেই শিক্ষাবিভাগের আর্থিক স্বল্পতা তাঁদের চোখে পড়ে না। স্বল্প অর্থ এবং দীর্ঘ অবকাশ—শিক্ষক-অধ্যাপক-জীবনের এ আদর্শ আমরা মোটামুটি মেনে নিয়েছি।

যেহেতু বেতন-বিষয়ক সিদ্ধান্ত এ রচনার বিষয়বস্তু নয়, সেহেতু কেবল এইটুকু মনে করিয়ে দিয়েই আমরা আপাততঃ ক্ষান্ত হবো যে, 'ছুটি'-র মূল্য তখনই উপভোগ্য যখন ঐ অবকাশটিও অর্থোপার্জনের একটি গলিপথ হয়ে না দাঁড়ায়। যে শিক্ষক বা অধ্যাপককে তাঁর 'অবকাশ'কে তাঁর সমগ্র অবসরই

উদরান্নের প্রচেষ্টায় বিক্রী করতে হয়, তাঁর 'অবকাশ'কে 'ছুটি' নাম দেওয়া 'পরিহাস-বিজল্পিত' ছাড়া আর কিছু নয়। এবং এদেশের অধিকাংশ শিক্ষাব্রতীরই ঐ দশা।

তবু এখনও আমরা 'ছুটি' পাই। 'গরমের ছুটি'র প্রচলন এদেশে করেছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর। যে গ্রীষ্মাতিশয্যের দরুন তিনি এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, এখনকার অনেক ইস্কুলের 'গরমের ছুটি'র সময় দেখে মনে হয়, সেকথা আমরা ভুলে গেছি। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে এদেশে বেশ গরম পড়ে যায়, মে মাসে তো 'প্রখর তপন-তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে।' কিন্তু ছুটি হয় মে মাসের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। গরমের ছুটি দিতেই হবে—এমন একটা ধারণায় সবচেয়ে গরমের সময়টা পার ক'রে দেওয়া হয়। এই ছুটিতে যাঁরা শৈল-সমুদ্র-বিহারী হ'তে পারেন, তাঁদের কথা বাদ দিলে অধিকাংশের পক্ষেই 'গরম' যতটা, ছুটির 'আরাম' ঠিক সে পরিমাণে মেলে না।

তাই ছুটির তালিকায় সবচেয়ে স্মরণীয় এই 'শারদীয় অবকাশ'; আমাদের 'পুজোর ছুটি' ঋতুসৌন্দর্যে, পূজা-পার্বণে, আত্মীয়-সমাগমে এমন বৈশিষ্ট্য ও পরিপূর্ণতা আর কোন ছুটিতে নেই। দুর্গাপূজা থেকে ভাইফোঁটা অবধি এই ছুটি বিদ্যালয়যাত্রীদের জীবনে সবচেয়ে সোনালী মুহূর্ত। আর যাঁরা বিদ্যালয়-পরিক্রমা শেষ ক'রে জীবিকার প্রয়োজনে নানা দিগ্-দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন, তাঁদের পক্ষেও স্মরণীয়তম অতীতের এই পুজোর ছুটির দিনগুলি

বাঙালী সমাজের সবচেয়ে বড়ো দুটি পূজা —দুর্গাপূজা ও কালীপূজা—এই ছুটির অন্তর্গত। মাঝখানে কোজাগরী পূর্ণিমা। শরতের পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, ভরা নদী, শুভ্র কাশ, ঝরা শেফালি—সব কিছুতে মিলিয়ে এমন এক স্নিগ্ধগম্ভীর সৌন্দর্যশ্রী ফুটে ওঠে, যার পটভূমিতে বাঙালীর দেবতাপূজা আপনিই সার্থকতা লাভ করে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের দেবতাদের নিবিড় সম্বন্ধ। সৌন্দর্যের শতদলে যেমন দেবতার পাদপীঠ, তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির সহস্রদলপদ্মের মাঝখানেই বিকশিত আমাদের দেবকল্পনা। তাই শরতে দুর্গার আগমন, বসন্তে সরস্বতীর। আবার নিবিড় অন্ধকারের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের পটভূমিতে মহাকালীর 'চমকে ও রূপরাশি!'

কিন্তু 'পুজো'র অর্থ এখন বহুমুখী বিদ্যালয়ের মতো সর্বার্থসাধক হ'তে চলেছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 'বারোয়ারী' এসে পারিবারিক পুজোর স্থান দখল করে চাঁদায়, লাউডস্পীকারে, অগণিত জনতার ভিড়ে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সম্মেলনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং পুজোর ছুটিতে যদি কেউ বাংলাদেশ ছেড়ে পশ্চিমে বা দক্ষিণে নিঃশব্দ ছুটির নির্জনতা ভোগ করতে চান, আমরা তাঁর আচরণের প্রতিবাদ করতে পারব না। তবে সেক্ষেত্রে 'পুজোর ছুটি'র পুরো তাৎপর্য অনুভব করা যায় না। 'পুজো' না থাকলে ওই ছুটির অনেকটাই অর্থহীন। তাই তো দেখতে পাই, যাঁরা পুজোর ছুটিতে বাইরে বেড়াতে যান, তাঁরাও দূরদেশে কোথাও 'পুজো' হচ্ছে শুনতে পেলেই একবারটি অন্ততঃ প্রতিমা দেখতে যান।

এই প্রতিমাশিল্পের দিক থেকে অন্ততঃ কলকাতার জুড়ি আর কোথাও মিলবে না। প্রতিটি বৎসর কলকাতার উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে কত অসংখ্য প্রতিমা তৈরী হয়, সেকথা ভাবতে গেলে বাঙালীজাতির শিল্পপ্রাণতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত না হয়ে পারা যায় না। বিশেষভাবে উত্তর কলকাতার বিডন স্কোয়ারের

দুর্গাপ্রতিমা থেকে শোভাবাজার, কুমারটুলি, বাগবাজার অবধি আধুনিক থেকে প্রাচীন ঐতিহ্যের যে অপরূপ নিদর্শনগুলি প্রত্যেক বৎসরই অগণিত দর্শকদের আহ্বান করে—তাদের দ্বারা এই সত্যই কি প্রমাণিত হয় না যে, শিল্প ও ধর্মচেতনায় আজও এই দেশ কত সচেতন ও সজাগদৃষ্টিসম্পন্ন! অথচ এই অপূর্ব শিল্পসুষমার উদাহরণগুলি মাত্র তিনদিন পরেই বিসর্জিত হয়। আর বিসর্জন আছে বলেই তো প্রতি বৎসর নিত্য নূতন সৃষ্টি।

পূজোর ভিড় অনেকের মতো আমারও আতঙ্কজনক মনে হয়। কিন্তু এও সত্য যে; জনতা ও কোলাহল—এ দুইকে বাদ দিতে হ'লে আমাদের পূজার মূল উদ্দেশ্যই অনেকটা বাদ পড়ে যায়। পূজা-উৎসবের মধ্য দিয়ে সর্বজনের হৃদয়ে ধর্মভাব ছড়িয়ে পড়ারও সার্থকতা আছে। নির্জনে তপস্যার সার্থকতা মেনে নিয়েও এ-কথা যেন আমরা না ভুলে যাই—'বহুরূপে সম্মুখে তোমার…।'

উপরের এই কথাগুলি লিখতে লিখতেই 'পূজার' অন্য একটি দিক সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন জাগলো। উৎসব-কোলাহলের সার্থকতা স্বীকার করলেও সত্যিকার পূজো আমরা কটি জায়গায় আজকাল দেখতে পাই? প্রতিমা-নির্মাণ, প্যাণ্ডেলের সাজসজ্জা, মাইকের বন্দোবস্ত, সেইসঙ্গে বারোয়ারীপূজার প্রদর্শনী-গুলির বিপুল অর্থব্যয়—এর পাশাপাশি নিষ্ঠা-সম্মত পূজোপকরণ, শ্রদ্ধাবনত পরিবেশ-রচনা এবং ভক্তিতন্ময় পূজারী—তুলনামূলকভাবে প্রথমোক্ত বিষয়গুলির দিকেই আমাদের দৃষ্টি যায় বেশী। অনেক সুসজ্জিত প্রতিমামণ্ডপে গিয়ে পূজাব্যবস্থার দৈন্য দেখে লজ্জিত হ'তে হয়। আর তিনদিনের পূজাসমাপনান্তে পুরোহিতের প্রাপ্য-সম্বন্ধে স্বভাবকার্পণ্য আমাদের কিছুতেই ঘোচে না। একজন সঙ্গীতশিল্পী বা অভিনেতার পক্ষে কয়েকমুহূর্তের নৈপুণ্য-প্রদর্শনের বিনিময়ে যে অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব, তার সামান্য অংশ পেলেও তিনদিনের পূজার পরিশ্রমান্তে তৃপ্ত পুরোহিত যথার্থই পুরজনের হিতকামনা করতে পারেন।

তাই পুজোর ছুটিতে যাঁরা সত্যিকার পূজো দেখতে চান, বারোয়ারীতলায় তাঁদের নৈরাশ্য-সম্ভাবনাই বেশী। হয়তো পারিবারিক পূজার পরিবেশে সত্যিকার পূজার আনন্দ ও শান্তির কিছুটা অনুভূতি পাওয়া সম্ভব। সে সুযোগ যাঁদের নেই, তাঁদের পক্ষে অন্ততঃ একটি পূজা-মণ্ডপ অশেষ সান্ত্বনার স্থল—সেটি বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির। বেলুড় মঠের এই মন্দিরে পূজোর কটি দিন খুব ভোরে এসে আপনাকে আসন নিতে হবে। যে শ্রদ্ধা, তন্ময়তা, ভক্তি ও ভগবৎপ্রীতির পরিবেশে যথার্থ পূজা সম্পন্ন হয়, সে পরিবেশ ওই মন্দির-প্রাঙ্গণে আপনিই রচিত হয়ে আছে। পূজারা ব্রহ্মচারী, তন্ত্রধারক প্রবীণ সন্ন্যাসী—তাঁদের মিলিত মন্ত্রোচ্চারণে, সুগম্ভীর ধ্যানে ও দেবতার প্রতি সমগ্র অন্তরের আকুতি-নিবেদনে বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যে গড়া দেবীপ্রতিমা প্রাণজ্যোতিতে পরিপূর্ণ। আর সামনে স্থির মর্মরমূর্তিতে নির্ণিমেষনেত্রে সেই পূজা দর্শন করছেন এযুগের শ্রেষ্ঠ পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই তো নতুন যুগের মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে দেবীর নবপ্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন—আর সেই পরমপূজায় পূজ্য ও পূজারী এক হয়ে গেছে।

মঠপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আপনার অতীত ইতিহাসের কথাও মনে পড়বে। বেলুড় মঠের এই দুর্গাপূজার সূচনা স্বামী বিবেকানন্দের আন্তরিক আগ্রহে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেই

প্রথম পূজায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদামণি। মায়ের নামেই পূজার সঙ্কল্প করা হয়েছিল। তিনটি দিনের পূজায় স্বামীজীর উদ্যোগ উৎসাহ আর শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতি—সেই অপূর্ব যোগাযোগ একটিবারের মতোই ঘটেছিল—সেই শুভযোগ স্বামীজীর জীবনের শেষ আর বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজা। এমন সূচনা বলেই তো বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা সার্থক ও ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ে দিনে দিনে এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

শুধু বেলুড় মঠেই নয়, মঠ ও মিশনের অন্যান্য শাখাকেন্দ্রেও—যেখানেই দুর্গাপূজা হয়, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শ্রদ্ধাশীল ভক্তজনের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে মঠ ও মিশনের পূজামণ্ডপের অভিমুখে।

এ থেকে অন্ততঃ এই সত্যটি প্রমাণিত হয় যে, আমাদের সমাজ-মানস থেকে রুচি, কল্যাণ-বোধ ও আন্তরিক ভক্তি একেবারে নির্বাসিত হয়নি। বর্ষার অবসানে শরতের মতো, সব কর্মব্যস্ততার আড়ালে অবসরের মতো, আমাদের মনে কোথাও বেঁচে আছে সেই সব মুহূর্ত—যেগুলি অনন্তের আস্বাদ এনে দেয় আমাদের প্রাণে। তাই এই পূজো বা পূজোর ছুটির মতো, যতিস্থাপনেরও প্রয়োজন আছে আমাদের দ্রুতসঞ্চারী সভ্যতার জয়যাত্রায়। শারদীয় অবকাশ আমাদের সেই কথাই মনে করিয়ে দিক যে, সৃষ্টির মূলে আছে ধ্যান।

মা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহার স্নেহের ধারায় ভেসে এলাম এইখানে ?
কাহার করুণ নয়ন-দুটি চাইল মুখের পানে ?
কে দেখাল এই পৃথিবী, কে শেখাল বাণী ?
সে যে আমার মা-জননী পুণ্য প্রভাখানি !

তিনিই আমার সকল পূজা, তিনিই ভগবান্ !
কে আছে রে এ জগতে তাঁহার সমান ?
আহার নিদ্রা পরিহরি
কে রাখিত বক্ষে ধরি
কে মুছাত অশ্রুধারা কে ঘুচাত গ্লানি ?
সে যে আমার মা-জননী পুণ্য প্রভাখানি !

নিউইয়র্কে দুর্গাপূজা

শ্রীমতী শান্তি সেন

প্রিন্সটন শহরটি নিউইয়র্ক থেকে ৫০ মাইল দূরে। এটি একটি অপূর্ব সুন্দর শহর। এখানে বিখ্যাত প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি আমেরিকার একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। এখানকার অ্যাডভান্স ইনস্টিট্যুটে, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন, তাঁর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কাজ ক'রে গেছেন। এ ছাড়াও প্রিন্সটনের বিশেষ ঐতিহ্য আছে। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময়, ১৭৭৫ খৃঃ জর্জ ওয়াশিংটন এই স্থানেই ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম জয়লাভ করেন। এইসব কারণে আমেরিকায় প্রিন্সটনের একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা এই প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬২ খৃঃ অগস্ট মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ছিলাম।

এই সময়ে একদিন সেপ্টেম্বর মাসের দুপুরে আমরা খেতে বসেছি, এমন সময় ফোন বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে ফোন ধরলাম। ওপার থেকে কথা ভেসে এল, 'আমি নিখিলানন্দ, নিউইয়র্কের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার থেকে বলছি।' শুনে তো আমি খুবই খুশী হলাম। আমি আমার নিজের পরিচয় দিলে উনি বললেন, 'নিউইয়র্কে আমরা প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা করি। প্রত্যেক বছর মা আমেরিকান cookies (মিষ্টি) খান। এবারে বাঙালী মেয়ে এসেছ, মাকে সন্দেশ ক'রে খাওয়াতে পারবে? ভোরে উঠে পূজোর যোগাড় করতে পারবে? সকাল আটটার সময় পূজো। আগের দিন এসে আমার অতিথি হয়ে আশ্রমের কাছেই হোটেলে থাকবে। খাওয়া-দাওয়া করবে আশ্রমে। হোটেলে তোমাদের জন্য একটি স্যুইট (Suite) আমি বুক্ ক'রে রাখব। কী বল? রাজী?' আমি তো তখনই আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম।

আমরা ভেবেছিলাম প্রিন্সটনে বসে আমরা এবার দুর্গাপূজা টেরই পাব না। অথচ অযাচিত ভাবে পূজায় যোগদান করার এই নিমন্ত্রণ পেয়ে আমি তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। তারপর তো তোড়জোড় ক'রে লেগে গেলাম সন্দেশ তৈরী করতে। বার-কয়েক চেষ্টা ক'রে সন্দেশ তৈরী করা হ'ল। স্বামী নিখিলানন্দ বলেছিলেন ৭০।৮০ জন লোক প্রসাদ পাবে। সেই অনুপাতে সন্দেশ তৈরি ক'রে পূজার আগের দিন ওঁর কথামত বেলা দশটার সময় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারে উপস্থিত হয়েছিলাম।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারটি নিউইয়র্কের ইস্ট ৭৪নং স্ট্রীটে অবস্থিত, বাড়ির নং ১৭। সেণ্ট্রাল পার্কের কাছে একটি বিরাট বাড়ি। রাস্তা থেকে গেলে সিঁড়ি উঠেছে দরজা পর্যন্ত। দরজাটি কাঠের, বিরাট এবং মজবুত। দরজার হাতলটি সোনার মতো ঝকঝক করছে। বাড়িটি চারতলা। প্রথমেই দরজা খুলে ঢুকে কোট রাখার জায়গাটি। তারপরে বিরাট হল। সপ্তাহে দু-তিন দিন এখানে বক্তৃতা হয়। রাজযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতি সম্বন্ধে। বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বলা হয়।

হলঘরটির একধারে দেওয়ালের কাছে প্রশস্ত বেদী, তার ওপরে শ্রীরামকৃষ্ণের আবক্ষ প্রস্তর-মূর্তি তাঁর সামনে ও দুই পাশে বিচিত্র সুন্দর ফুল দিয়ে সাজানো বৃহৎ ফুলদানিগুলি। একপাশে বক্তৃতা দেবার স্থানটি। সামনে ডেস্ক ও একটু পেছনে একটি চেয়ার বক্তৃতা সেরে বক্তা বসে বিশ্রাম করেন দুই পাশের দেওয়ালে—একদিকে শ্রীশ্রীমায়ের একখানি অতি সুন্দর ছবি, অপর দিকে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। সামনে ও দু-দিকে শ্রেণী-বদ্ধভাবে চেয়ারের সারি। দুশোর ওপর শ্রোতার আসন। অন্যান্য কাজের জন্য আরও ছোট ঘর দু-দিকে আছে। সামনে একটি গ্যারেজ আছে, তা পার হয়ে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ির সম্মুখে শ্রীশ্রীমায়ের একটি আবক্ষ প্রস্তর-মূর্তি আছে। তারপর দোতলায় উঠে বাঁ দিকে গেলে লাইব্রেরি-ঘর, নানা বই এবং ঠাকুর ও মায়ের ছবি আছে। তারই পাশে ছোট অফিস ঘরটি আছে। লাইব্রেরি-ঘরে বসার প্রশস্ত জায়গা আছে। আর সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে ডাইনিং রুম বা খাবার ঘর, তার পাশে রান্নাঘর, যেমন আমেরিকান রান্নাঘর হয়। আর খাবার ঘরের পাশে বাথরুম ইত্যাদি, তিনতলায় স্বামী নিখিলানন্দের ঠাকুর-ঘর, তারপরে তাঁর বসবার ঘর ও পরে শোবার ঘর, বাথরুম ইত্যাদি। চার তলায় অন্যান্য সাধু, যেমন স্বামী বুধানন্দ, নিত্যস্বরূপানন্দের শোবার ঘর ও বাথরুম ইত্যাদি আছে।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজায় দাঁড়ানো মাত্র মিস ক্রুগার (একজন বয়স্কা আমেরিকান ভক্ত মহিলা) দরজা খুলে দিয়ে আমাদের সমাদর ক'রে দোতলার লাইব্রেরি-ঘরে নিয়ে গেলেন। একজন আমেরিকান সাধু স্বামী আ— এসে সন্দেশের পাত্রটি নিলেন আর বললেন, স্বামীজীরা একটু বেড়াতে গেছেন, এখনই ফিরবেন। একটু পরেই স্বামী নিখিলানন্দ, নিত্যস্বরূপানন্দ ও বুধানন্দ বেড়িয়ে ফিরে এলেন। তাদের প্রণাম করার পর যথারীতি পরিচয় করা হ'ল। স্বামী নিত্য-স্বরূপানন্দের সঙ্গে আমাদের কলকাতাতেই পরিচয় ছিল।

কুশল-প্রশ্নাদির পর স্বামী নিখিলানন্দ পোশাক পরিবর্তন করতে গেলেন। সেদিন রবিবার ছিল। রবিবার সকাল এগারটায় স্বামী নিখিলানন্দের বক্তৃতা হয়। সেদিন দুর্গা-পূজার সপ্তমী দিন ব'লে দুর্গাপূজার মর্মার্থ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। গেরুয়া বহির্বাস ও গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে তিনি বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। হলঘরটি আমেরিকান শ্রোতায় পূর্ণ ছিল। দশ পনের জন ভারতীয় এবং দু-একটি নিগ্রোও ছিলেন। তিনি দুর্গা-মূর্তি ও দুর্গাপূজা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধেও বললেন। বক্তৃতাটি অতি চমৎকার হয়েছিল। আমাদের খুব ভাল লেগেছিল। আমেরিকান সাধুটি আমাদের নিয়ে প্রথম সারিতেই বসিয়েছিলেন, যাতে আমরা ভাল ক'রে দেখতে ও শুনতে পাই। বক্তৃতার শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হ'ল। কাগজের গ্লাসে ক'রে ফলের রস ও কাগজের ছোট প্লেটে ক'রে আমেরিকান cookies (মিষ্টি)। ফলের রস এবং cookies সকলকেই আবার সাধা হ'ল। প্রসাদ খাওয়া শেষ হ'লে সকলে একে একে এসে স্বামী নিখিলানন্দের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমরা বার চৌদ্দ জন দুপুরে ওখানে খাব ব'লে দোতলায়—খাবার ঘরে গেলাম সাধুদের সঙ্গে। তখন বেলা একটা।

প্রশস্ত টেবিলে খাবার সব সাজানো রয়েছে, মুসুর ডাল, ফুলকপির তরকারি, ভাত প্রভৃতি। স্বামী বুধানন্দ সব রান্না করেছিলেন। চাটনিও ছিল। রান্না বেশ ভাল হয়েছিল। পাঁপর-ভাজা, দই এবং আমেরিকান মিষ্টিও ছিল। খাওয়ার পর স্বামী নিখিলানন্দের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হোটেল স্থইটে গেলাম। স্বামী আ— আমাদের পৌঁছে দিলেন। আবার সন্ধ্যা ছ-টায়, ডিনার টাইমে, আশ্রমে ফিরে আসতে ব'লে দিলেন। আমরা হোটেলে গিয়ে আমাদের ব্যাগ-দুটি রেখে বেরিয়ে পড়লাম বেড়াতে। সন্ধ্যা ছটায় আবার আশ্রমে ফিরে এলাম। আমরা দশ বার জন, টেবিলে খেতে বসেছিলাম। স্বামী নিখিলানন্দ তাঁর কাছেই আমাকে বসালেন। আমেরিকান ডিনার খাওয়া হ'ল। পরে যার খুশি একটু ভাত, ডাল, তরকারিও খেলেন। শেষ পাতে Melon (তরমুজ) ছিল। স্বামী নিখিলানন্দ আমাদের খুব যত্ন ক'রে এটা সেটা খাওয়াতে লাগলেন। আমি মেলন খাবো না বলায় জোর ক'রে খাওয়ালেন। বললেন, 'ভালো জিনিস নিশ্চয় খাবে। খাবে না কি ?'

খাওয়ার পর তিনতলায় তাঁর বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ ও মিঃ রায়চৌধুরী এলেন। রাত এগারটা সাড়ে এগারটা পর্যন্ত নানা রকম আলোচনা হ'ল। বেশীর ভাগ কথাই দেশের সম্বন্ধে। তারপর আমরা আমাদের হোটেলে ফিরে গেলাম। স্বামী আ— আমাদের পৌঁছে দিলেন আর একটি বয়স্কা আমেরিকান ভক্ত মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন— ঐ মহিলা পরদিন সকাল ছ-টার সময় আমাদের হোটেল লবি থেকে নিয়ে যাবেন। আমরা যেন সময়মত তৈরী হয়ে থাকি।

পরদিন ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে, স্নান ক'রে তৈরী হয়ে, আমরা হোটেল লবিতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ঐ মহিলা ছ-টার সময় এসে আমাদের একটি রেস্তরাঁয় নিয়ে গেলেন। সেখানে ফলের রস, টোস্ট ইত্যাদি খাওয়া হ'ল। মহিলাই খাবারের দাম দিলেন। আমাদের দিতে দিলেন না। বললেন, স্বামী নিখিলানন্দের হুকুম অমান্য করার সাহস ওঁর নেই। তারপর আমরা আশ্রমে গেলাম। গিয়ে দেখি—অত ভোরেই, আট-দশ জন আমেরিকান ভক্ত মহিলা ও ভদ্রলোক এসে পূজোর আয়োজনে—ফুল সাজানো প্রভৃতি নানা কাজে ব্যস্ত আছেন। মালা গাঁথা ও পুষ্পপাত্র সাজানোর ভার আমার ওপর ছিল। আমিও আমার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। একে একে বহু ভক্ত এলেন। ভারতীয় কয়েকজন, আমেরিকান ভক্তই সব। যথাসময়ে লাইব্রেরি-ঘরটিতে পটে মা-দুর্গার পুজো হ'ল। লাইব্রেরি-ঘরটি খালি ক'রে একদিকে ঠাকুর, মা ও মা-দুর্গার পট সাজানো হয়েছিল। শ্রীশ্রীমায়ের পায়ের ছাপের ছবিটিও রাখা হয়েছিল। প্রত্যেকটি ছবিতেই মালা পরানো হয়েছিল। আমেরিকান ভক্তেরা ফুলদানিতে চমৎকার ক'রে ফুল সাজিয়ে মায়ের বেদী ও ঘরটি সাজিয়েছিলেন। স্বামী নিখিলানন্দ তন্ত্রধারক ও বুধানন্দ পুজো করেছিলেন। আমেরিকান সাধুটি পূজোর যোগাড় দিচ্ছিলেন। যেমন প্রত্যেকবার নৈবেদ্যের থালাটি ও জলের গ্লাসটি সরিয়ে, জায়গাটি জল ছিটিয়ে মুছে তবে আবার আর একটি নৈবেদ্যের থালা ও জলপূর্ণ গ্লাস এনে দিচ্ছিলেন। এই

ভাবে ঠিক আমাদের দেশের মতো যোড়শোপচারে মহাষ্টমীর দিন মা-দুর্গার পূজো ও আরতি করা শেষ হ'ল। পূজো শেষ হ'লে স্বামী বুধানন্দ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছিলেন। আমেরিকান ভক্তেরা প্রত্যেকে হাঁটু গেড়ে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিলেন। সাধুরা সকলেই গেরুয়া ধুতি, গেরুয়া পাঞ্জাবি ও চাদর পরেছিলেন।

পূজা শেষ হ'লে প্রথমে স্বামী নিখিলানন্দ, নিত্যস্বরূপানন্দ, বুধানন্দ প্রভৃতি পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। তারপর আমরা ভারতীয়গণ এবং আমেরিকান মেয়ে-পুরুষ ভক্তগণ সকলে একে একে মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলাম। আমেরিকান ভক্তগণ সকলেই হাঁটু গেড়ে মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন ও মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিলেন। তার পর স্তব পাঠ হ'ল। 'খণ্ডনভববন্ধন' 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে' ইত্যাদি। সুর, তাল নিখুঁত। একেবারে মঠের মতো স্বামী আ— হারমোনিয়ম-সহযোগে স্বরলিপি-সহায়ে প্রথমে গাইলেন ; পরে সমবেত সকলে, আমরা তার সঙ্গে গেয়েছিলাম। মেয়ে পুরুষ, দেশী বিদেশী নির্বিশেষে। নিউইয়র্কে বসে এমন একটি আবহাওয়া দেখব কল্পনা করিনি। আমাদের খুব ভাল লেগেছিল।

তারপর স্বামী নিখিলানন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বেগুন বেসন দিয়ে ভেজে দিতে পারবো কিনা। আমরা দু-তিন জনে মিলে কিছু বেগুন বেসন দিয়ে ভেজে দিলাম। আর আগের দিন রাত্রে মিঃ রায়চৌধুরী, মিসেস রায়চৌধুরী ও তাঁদের রান্নার লোকটি এসে খিচুড়ি, তরকারি ও চাটনি রেঁধেছিল। স্বামী বুধানন্দ পায়েস রেঁধেছিলেন। তাছাড়া আমেরিকান cookies (মিষ্টি), ফল ও আমার আনা সন্দেশ ছিল। ৭০।৭৫ জন মহিলা ও পুরুষ ভক্ত মিলে মহানন্দে প্রসাদ খাওয়া হ'ল। সমবেত ভক্তদের মধ্যে জন পনর বোধ-হয় ভারতীয় ছিলেন, আর সবই আমেরিকান ভক্ত। আমেরিকান ভক্তেরা আবার অনেকেই বাড়ির জন্য খিচুড়ি-প্রসাদ নিয়ে গিয়েছিলেন। আনন্দ-উৎসবের শেষে, একে একে সকলে বিদায় নিলেন। স্বামী আ— এসে আমাকে মায়ের পূজার প্রসাদী রেশমের বস্ত্রটি দিলেন। আমরাও আশ্রমের সকলের নিকট বিদায় নিয়ে স্বামী নিখিলানন্দকে প্রণাম ক'রে রওনা হয়েছিলাম। স্বামী নিখিলানন্দ আমাদের বারবার ক'রে ব'লে দিলেন আবার আশ্রমে আসতে। মনে অদ্ভুত আনন্দের স্মৃতি নিয়ে প্রিন্সটনে ফিরে এলাম। মনে হ'ল যেন পূজোর সময় বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে এলাম।

শ্রীশ্রীমহারাজের পুণ্যস্মৃতি

শ্রীনরেন্দ্রভূষণ পর্বত

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের প্রথম দর্শন লাভ হয় আমার ১৯১৬ খৃঃ ময়মনসিংহ (অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত) শহরে শ্রীজিতেন দত্ত মহাশয়ের বাসাবাটীতে। শ্রীশ্রীমহারাজ আগমন করিতেছেন শুনিয়া স্কুলের ছাত্রবৃন্দ দলে দলে বাহির হইয়া পড়িল, আমিও সঙ্গে চলিলাম। রাস্তা ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ জনাকীর্ণ হইয়া গেল। এমন ভিড় আর কখনও দেখি নাই! দূর হইতে সেই ভিড়ের মধ্যে শ্রীশ্রীমহারাজের সৌম্যমূর্তি দর্শনে মুগ্ধ হইলাম এবং পিছন পিছন ছুটিলাম। এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়াতেও সেই নয়নমুগ্ধকর স্মৃতি ম্লান হয় নাই।

সন্ধ্যার পূর্বে শ্রীশ্রীমহারাজ শ্রীবাবুরাম মহারাজ প্রভৃতির সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে বেড়াইতে গেলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমারও যাওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমহারাজ যখন দাঁড়াইলেন, শত শত লোক তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। তিনি তখন বলিতে লাগিলেন, 'তোমরা জোড়হাত ক'রে দূর হ'তে প্রণাম কর, এই আমি গ্রহণ করছি।' তিনি যষ্টি-হস্তে নিজে হাত জোড় করিলেন, কিন্তু কে শোনে সে কথা! তাহাতে আবার শ্রীবাবুরাম মহারাজ বলিলেন, 'করুক না প্রণাম'। তখন তিনি নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই অবস্থায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া কিছুটা রাত্রি হইল। পরে সকলে তাঁহার পিছন পিছন প্রত্যাবর্তন করিল।

শ্রীশ্রীমহারাজ ময়মনসিংহ শহরে দুইদিন অবস্থান করিয়া ঢাকা অভিমুখে রওনা হন। তাঁহার অভ্যর্থনায় যে লোকের সমাবেশ হইয়াছিল, ঐ শহরে আমার অন্ততঃ দশ বৎসরাধিককাল বাসের মধ্যে তাহার তুলনা দেখি নাই। আর লোকের কি আনন্দ-উচ্ছ্বাস! মনে হইত—যেন কত কালের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের শুভাগমন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁর বিরাট দেহ, মন ও প্রাণ লইয়া দেখা দিয়াছিলেন। এতবড় কায়ে যে কমনীয়তার ভাব দেখিয়াছিলাম, আজ পর্যন্ত তেমনটি আর দৃষ্টিগোচর হইল না! দর্শনমাত্র যেন মন আকর্ষণ করিয়া নিলেন। ভয়, দ্বিধা, সঙ্কোচ কিছুই রহিল না। গেরুয়াবস্ত্র-পরিহিত, মাথায় গেরুয়া টুপি ও হাতে একগাছা লাঠি। সে রূপ বর্ণনাতীত! জিতেনবাবুর গৃহাভ্যন্তরের প্রবেশ-পথে একটি ছোট বালক 'বল'-হস্তে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সেই বলটা লইয়া হাতের লাঠি দিয়া একটু খেলিলেন আর বলিলেন, 'বিকেলে এসো, তোমাদের সঙ্গে খেলা ক'রব।' সেই যে বালকসুলভ ভাব ও খেলার দৃশ্যের স্মৃতি এখনও আমার মনকে অভিভূত করে।

দীর্ঘ দুই বৎসর পরে ১৯১৮ খৃঃ একদিন সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে মঠবাড়ির সম্মুখের বাঁধানো ঘাটে নৌকাযোগে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য হয়। অগ্রসর হইতে হইতে দেখিতে পাই—মঠবাড়ির পূর্ব দিকের নিম্নতলের বারান্দায় বড় বেঞ্চির উপর উপবিষ্ট কয়েকজন মহারাজের দক্ষিণে শ্রীশ্রীমহারাজ পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। বারান্দায় উঠিয়াই শ্রীশ্রীমহারাজের চরণে প্রথম প্রণত

হই। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট আর এক মহারাজকে দেখাইয়া বলিলেন, 'এই যে মহাপুরুষ মহারাজ, প্রণাম কর।' তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

শ্রীশ্রীমহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা হ'তে এলে?' বলিলাম—'কলকাতা বৌবাজার থেকে মহারাজ, আপনাকে ময়মনসিংহে দেখেছি।' বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন কত কালের পরিচিত জন পাইয়া গিয়াছেন, এমন ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। এমন ভাব যা শুধু অনুভব করা যায়, ব্যক্ত করা যায় না। অনেক কথাই হইল। মহারাজকে বলিলাম, 'মহারাজ, যখন আসবো, আপনাকে যেন একা পাই।' উত্তরে শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, 'আচ্ছা বাবা, তাই হবে।' আশ্বাস-বাণী যে আমার জীবনে কিরূপ সফল হইয়াছিল, তাহার সামান্য একটু বিবরণ দিলেই বুঝা যাইবে। তাঁহার কথা কত সত্য! জীবনে একটুও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় নাই। যখনই তাঁহার দর্শন-লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহাকে একলাটিই পাইয়াছি। বলরাম-মন্দিরেই অধিকাংশ সময় সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছে। দুপুরের পরে হলঘরে শ্রীশ্রীমহারাজের কাছে বসিয়া আছি—মাঝে ব্যবধান মাত্র দুই কি দেড় হাত। বসিয়া আছি তো, বসিয়াই আছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একেবারে নির্বাক্। মুখে কোন কথা নাই। কখন শ্রীশ্রীমহারাজের ভাবগম্ভীর বদনমণ্ডল, কখন স্মিতহাস্য মুখমণ্ডল, আবার কখন বা নিজভাবে যেন বিড়বিড় করিতেন, ঠোঁট নাড়িতেন। মনে হইত—আপন মনে কথা বলিতেছেন। এমন কি বদনমণ্ডল কখন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিত।

শ্রীশ্রীমহারাজের কথার কোন রকম ব্যতিক্রম যে আমার জীবনে কখনও ঘটে নাই, একটি ঘটনা হইতে আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব। শ্রীশ্রীমহারাজ মঠবাড়ির দোতলায় পশ্চিম বারান্দায় ছোট ঘরটিতে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তেরা একে একে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া সারিবদ্ধভাবে বারান্দা দিয়া সেই ঘরে ঢুকিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিয়া উত্তর দিকের ছাদ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের দোতলার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতেছেন। আমি ঘরে ঢুকিলাম এবং শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলের পানে চাহিয়া বসিয়া আছি। হঠাৎ খেয়াল হইল। লক্ষ্য করিয়া দেখি—সামনের লোক ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছে এবং পিছনের দিক দিয়া ঘরে কেউ ঢুকিতেছে না। আমার কেমন লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হইল। একি আজ উৎসবের দিনে আমি এভাবে বসিয়া! অমনি প্রণাম করিয়া তাড়াতাড়ি ছাদ পার হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-মন্দিরের সিঁড়ি ধরিয়া নামিয়া চলিয়া আসিলাম বাক্‌সিদ্ধ শুদ্ধাত্মা মহারাজের কথার যে ব্যত্যয় হইবে না! তিনি যে আমায় বলিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে একাকী পাইব, তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের দিনেও একাকী দর্শন দান করিয়া নিজের কথার মর্যাদা রাখিয়াছিলেন এবং আমাকে ধন্য করিয়াছিলেন।

তখন আমি বৌবাজারে বাস করি। বাগবাজারে প্রায়ই হাঁটিয়া যাতায়াত করিতাম। রাস্তায় যাইতে যাইতে কত প্রশ্নই না মনে উঠিত। কিন্তু মহারাজের সম্মুখে গেলেই যেন আর কোন প্রশ্ন মনে উঁকিও দিত না। নির্বাক্ হইয়া থাকিতাম।

১৯১৮ খৃঃ একদিন মঠে শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, 'প্রথমে বলরাম-মন্দিরে আসবে,

সেখানে না পেলে উদ্বোধনে এবং সেখানে না পেলে মঠে চলে আসবে।' এই নির্দেশ অনুসারে প্রতি শনিবার বিকালে যাইতাম। যেদিন মঠে যাইতাম, সেদিন রাত্রে মঠে থাকিতাম এবং পরের দিন সকালে ফিরিয়া আসিতাম।

একদিন বলরাম-মন্দিরে মহারাজকে না পাইয়া উদ্বোধনে যাই। সন্ধ্যা অতীত হইয়া একটু রাত্রিও হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই বলিলেন, 'যাও মাকে দর্শন ক'রে এসো।' সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরে গিয়া দেখি—শ্রীশ্রীমা পা-দুখানি ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। ডান দিকের বেদীর উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের পট। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। অপেক্ষা না করিয়া আবার নিচে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট আসিলাম।

শ্রীশ্রীমহারাজের 'যাও মাকে দর্শন ক'রে এসো'—এই আদেশ ভিন্ন আমার ভাগ্যে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভ হইত না। এই স্মৃতিটুকুই আছে এবং থাকিবে। মায়ের বাড়ি গেলে এই স্মৃতিই উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। এখন মনে হয়—শ্রীশ্রীমহারাজ বলরাম-মন্দিরে হলঘরে বসিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, 'তিনি দয়া ক'রে না বুঝালে কেউ বুঝতে পারে না, না জানালে জানতে পারে না। সময় হ'লে সব হবে।' কথা না বলার ফাঁকে ফাঁকে শ্রীশ্রীমহারাজ যে ছোট ছোট দুটি-একটি এমন কথা বলিতেন, জীবনে এখন তাহার একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি। অবাক্ হইয়া তাঁহার সেই সব কথার স্মৃতি মাঝে মাঝে মনে উঠে, এবং এক অব্যক্ত আনন্দ অনুভব করি।

১৯১৮ খৃঃ বৌবাজার অঞ্চলে ছোট একটি মেসে থাকি। এই সময়ে একদিন শ্রীশ্রীমহারাজের পদপ্রান্তে গিয়া বসিয়া আছি। তিনি বলিলেন, 'একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে নিরামিষ খাবে।' আমি নিবেদন করিলাম, 'মহারাজ, মেসে অন্যদের সঙ্গে থাকতে হয়, আমার জন্য আলাদা ক'রে কে নিরামিষ তৈরী ক'রে দেবে?' প্রত্যুত্তরে নির্দেশ দিলেন, 'মাছটা না খেলেই তো নিরামিষ হ'ল।' আমি বলিলাম, 'মাছের পাকেই তো খেতে হবে?' তিনি বলিলেন, 'তাতে দোষ কি? তুমি তো আমিষ খেলে না।' কি সুন্দর ব্যাখ্যা!

যখনই শ্রীশ্রীমহারাজের সান্নিধ্যে যাওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহার দক্ষিণ শ্রীচরণ কপালে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতাম। সঙ্গে সঙ্গে বলিতেন, 'এসো, বাবা।' এই দুইটি কথা যতবার যাতায়াত করিয়াছি, ততবারই শুনিয়াছি। এখনও কথা-দুইটি কানে বাজিতেছে!

১৯১৮ খৃঃ, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব। তখনকার মঠ-প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বাঁশবনের নিকটবর্তী স্থানে ভোগরান্নার ঘর ছিল এবং সেখানে প্রসাদ-বিতরণ অনুষ্ঠান হইত। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীমহারাজ সাজগোজ করিয়া প্রসাদ-বিতরণ পরিদর্শনে বাহির হইতেন। যেন শ্রীশ্রীরাজামহারাজ আজ 'মহারাজ-চক্রবর্তী' হইয়া আসিয়াছেন। মঠবাড়ির পশ্চিমাঞ্চলে ফল ও ফুলের বাগানের মধ্য দিয়া যে রাস্তা ছিল, সেই বরাবর শ্রীশ্রীমহারাজ ধীর পাদক্ষেপে আসিয়া প্রসাদ-বিতরণ দেখিতেছেন। সঙ্গে একজন সেবক-ভক্ত মাথার উপরে ছাতা ধরিয়া চলিয়াছেন। সেই বিরাটকায় মহাপুরুষের সদানন্দ মুখোজ্জ্বল দিব্যকান্তি যিনি দেখিবার

সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনি সে দৃশ্য জীবনে ভুলিতে পারিবেন না।

১৯১৮-১৯ খৃঃ যখন প্রায়ই বলরাম-মন্দিরে শ্রীশ্রীমহারাজের সান্নিধ্যে চরণতলে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, অনেক দিন ভুবনেশ্বর-মন্দিরের নির্মাণ-সম্বন্ধে কত সুন্দর নির্দেশ দিতে শুনিয়াছি। তখনও নির্মাণ-কার্য চলিতেছিল। কোন্ গাছটি কোন্ স্থানে লাগাইলে ভাল হয়, কোন্ ফুল-গাছটি কোথায় রোপণ করিলে শোভা পাইবে, সেই ভাবে লিখিয়া পাঠাইবার নির্দেশ দিতেছেন। মনে হইত—যেন তিনি তখন সেই মঠ-উদ্যানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন আর মালিকে নির্দেশ দিতেছেন

১৯১৯ খৃঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-উৎসব। আমরা কয়েকজন বন্ধু এক সঙ্গে বেলুড়ে গিয়াছি। স্বেচ্ছাসেবক হইয়া কাজ করিলাম। সন্ধ্যার সময় কলিকাতা ফিরিব। শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিতে মঠবাড়ির পূর্ব বারান্দায় নিচের তলায় গিয়া হাজির হইয়াছি। শ্রীশ্রীগৌরী-মা তখন কয়েকটি মেয়ে-ভক্ত লইয়া সেখানে উপস্থিত। প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছি, তখন শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদের বলিলেন, 'এদের নিয়ে এক সঙ্গে যাও, আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে যেও।' নৌকাযোগে বাগবাজার ঘাটে পৌঁছিলাম। নৌকায় বসিয়া গৌরী-মা শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। আমরা সবাইকে আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

১৯২২ খৃঃ, চৈত্রমাস।—শরীর অসুস্থ। দেশের বাড়িতে আছি। একদিন অপরাহ্নে আনন্দবাজার পত্রিকা খুলিয়া ধরিতেই চোখে পড়িল সেই বিরাট পুরুষ শ্রীশ্রীমহারাজের প্রতিকৃতি। ছবিটি হঠাৎ চোখের সামনে পড়িতে খুব আনন্দ হইল। পর মুহূর্তেই বিষাদে মনটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমহারাজের দেহরক্ষার সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে কাগজখানা। কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হইয়া থাকিলাম। যেন কতকালের আপনজন হারাইয়াছি!

১৯২৩ খৃঃ, একদিন সন্ধ্যার পর কলেজ স্ট্রীটে এসপ্ল্যানেডগামী ট্রামে উঠিয়াছি—সামনে কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) উঠিয়াছেন। মুখামুখি দাঁড়াইতেই প্রণাম করিলাম। বলিলাম, 'মহারাজ, শ্রীশ্রীমহারাজ তো চলে গেলেন, এখন আমি কি করি?' এইটুকু বলিতেই কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। কৃষ্ণলাল মহারাজ বলরাম-মন্দিরে বহুবার আমাকে দেখিয়াছেন, তাই পরিচিত আত্মীয়ের মতো বলিলেন, 'তুমি মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা করো।' এ যেন শ্রীশ্রীঠাকুরেরই ইঙ্গিত! কয়েক দিনের মধ্যেই বেলুড় মঠে গিয়া শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের চরণপ্রান্তে নিবেদন করিলাম, 'মহারাজ, শ্রীশ্রীমহারাজ তো চলে গেলেন, এখন আমি কি করি?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'এসো, হবে এখন।' ভরসা পাইয়া বলিলাম, 'কবে আসবো?' তিন চারি দিনের মধ্যেই একটি দিনের কথা বলিয়া মঠে যাইতে নির্দেশ দিলেন। তদনুযায়ী হাজির হইতেই তিনি আমায় অনুগ্রহ করিলেন। তখন বুঝি নাই, এখন অনুভব করি—কেন শ্রীশ্রীমহারাজ বেলুড়ে প্রথম দর্শনেই বলিয়াছিলেন, 'এই যে মহাপুরুষ মহারাজ, প্রণাম করো।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই যে মহাপুরুষ মহারাজ এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে অনুগ্রহ করিবেন, কল্পনাও করি নাই। তিনি পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন অধমকে চরণে স্থান দিবেন বলিয়া। সেদিন যে আমার কি আনন্দ, ভাষা নাই তাহা ব্যক্ত করিবার। এমন অহেতুক করুণা দয়াময় দীনবন্ধু ভিন্ন কে করিতে পারে? শুধু সেই অনুভূতিই আমার জীবন-যাত্রার একমাত্র পাথেয়!

সমালোচনা

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন—ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩৬৬; মূল্য টাকা ৭'৫০।

দর্শন-শাস্ত্রের মূলে রহিয়াছে মানুষের জ্ঞান-পিপাসা-নিবৃত্তির চিরন্তন চেষ্টা। মানুষের স্বরূপ কি, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য কি? মানুষ কি শুধু দেহ ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির সমষ্টিমাত্র অথবা চেতন আত্মা? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি? ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—ইহাদের কোন্‌টি পরমার্থ? সৃষ্টিতত্ত্ব জানিবার উপায় কি? দর্শনশাস্ত্রে এইরূপ বিবিধ রহস্য-পূর্ণ প্রশ্নের বিচারপূর্বক মীমাংসার চেষ্টা করা হয়।

ভারতীয় দার্শনিকগণ এই সকল প্রশ্নের বিচার ও যুক্তিসঙ্গত সমাধান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা দর্শনের বিচার্য তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়া পথনির্দেশ করিয়াছেন।

গ্রন্থটির দুইটি ভাগ। প্রথমভাগে দশটি অধ্যায়ে ভারতীয় দর্শনের মূল ভাবধারা, চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনের যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে।

ন্যায় দর্শনের প্রমা ও প্রামাণ্য বিষয়ে ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রধান প্রমাণগুলির তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের তুলনা ও সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

আলোচনায় স্থানে স্থানে সুচিন্তিত মন্তব্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি নিদর্শন: 'ঈশ্বর-প্রণিধান কেবল যোগদর্শনের একটি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ নহে। পরন্তু ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষ যোগসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে অচিরাৎ সমাধিসিদ্ধি হয়। কারণ ঈশ্বর একটি সাধারণ ধ্যেয়বস্তু নন। তিনি পরম ঐশ্বর্যসম্পন্ন পরমেশ্বর। যে যোগী ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ করিয়া নিরন্তর ঈশ্বরের স্মরণ-মনন করেন, ঈশ্বর-প্রসাদে তাঁহার চিত্তের সকল মলিনতা অপগত হয়, তাঁহার সকল বাধাবিপত্তি দূর হয়। ঈশ্বর তাঁহার সহায় হন এবং তাঁহার যোগসিদ্ধির অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেন। এরূপ যোগীর যোগসিদ্ধিও আসন্ন বুঝিতে হইবে।'

দ্বিতীয় ভাগে দশটি অধ্যায়ে পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচিত বিষয়গুলি: দর্শন এবং তত্ত্ববিদ্যা, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, প্রমা-বিজ্ঞান, মনোবিদ্যা ও অন্যান্য শাস্ত্রের সম্বন্ধ, দার্শনিক জ্ঞানলাভের পদ্ধতি এবং জ্ঞানের উৎপত্তি-বিষয়ে মতবাদ, অবধারণ ও অনুমান, মূল প্রত্যয় ও তত্ত্ব, তত্ত্ববিষয়ক মতবাদ, বহুত্ববাদ দ্বৈতবাদ ও একত্ববাদ, প্রাকৃতিক জগদ্‌বিষয়ক মতবাদ, মন ও আত্মা, ইষ্টার্থ ও তত্ত্ব, ঈশ্বর ও জীবজগৎ এবং তাহাদের সম্বন্ধ বিষয়ে বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ (Deism), বিশ্বগত ঈশ্বরবাদ (Pantheism) ও বিশ্বাতীত-ও-বিশ্বগত ঈশ্বর-বাদের (Panentheism) বিস্তৃত আলোচনা আছে।

অনেক স্থলে ভারতীয় দর্শনের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা এবং প্রয়োজনমত পাশ্চাত্য দার্শনিক মতের সমালোচনাও করা হইয়াছে।

বিশালতা ও বিপুলত্বের দিক্ দিয়া ভারতীয় ও পাশ্চাত্য—উভয় দর্শনই বিস্ময়ের বস্তু। একখানি পুস্তকে তাহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া

অত্যন্ত দুরূহ। প্রাচ্য দর্শনের মূল গ্রন্থগুলি সবই সংস্কৃতে এবং পাশ্চাত্য দর্শন-সাহিত্য অধিকাংশই ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় লিপিবদ্ধ। বাংলায় সুখপাঠ্য অথচ নির্ভরযোগ্য এইরূপ দর্শন-গ্রন্থ নাই বলিলেই হয়, যাহাতে উভয় দর্শনের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্য পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দর্শনের পাস ডিগ্রি কোর্সের পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত, দর্শনের অনার্স ডিগ্রি কোর্সেরও অনেক বিষয় ইহাতে আলোচিত। এই গ্রন্থ যাঁহাদের জন্য লিখিত, শুধু তাঁহাদেরই ইহা কাজে লাগিবে না, দর্শনে অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই আগ্রহ ইহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করিবে এবং বাংলা সাহিত্যে ইহা একটি অমূল্য সংযোজন-রূপে পরিগণিত হইবে। ভাষার স্বচ্ছতা, বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা, সর্বোপরি অবান্তর প্রসঙ্গ-বর্জন গ্রন্থখানির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইতিপূর্বে সুধী গ্রন্থকার ও ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন দত্তের লিখিত 'An Introduction to Indian Philosophy' যেরূপ বহুলপঠিত হইয়াছে, আমরা আশা করি আলোচ্য গ্রন্থখানিও অনুরূপভাবে সমাদৃত হইবে।

History of The Freedom Movement in India—Vols. 1 & 2.—Dr. R. C. Majumdar; Published by Firma K. L. Mukhopadhyaya, 6/1A, Banchharam Akrur Lane, Calcutta 12 (1962 & 1963); pp. 556 + xxi & 562 + xxiii; Price Rs. 15/- each.

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখনীপ্রসূত ভারতে স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসের (ইংরেজীতে) দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং এই আন্দোলনের ধারা বিগত কয়েক বছরের অক্লান্ত গবেষণায় লব্ধ নানা তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ১৯২০ খৃঃ পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হবে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস-আন্দোলনের ইতিহাস এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী ১৯৪৭ খৃঃ ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তি পর্যন্ত এবং তা অগৌণে প্রকাশিত হবে, এই আশ্বাস পেয়েছি।

ঠিক এ-রকম একখানি ইতিহাস-গ্রন্থের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। আজ ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ শ্রেণীতে ইতিহাসের অবশ্য-পাঠ্য বিষয় ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন। এবং এ-বিষয়ের উপর এমন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-সম্মত আলোচনা এর পূর্বে আর কোন ঐতিহাসিক-অধ্যাপক করেছেন কিনা, জানি না। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, বার্ধক্যের বাধা ও বিপত্তিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে মনীষী ভারততত্ত্ববিদ্ ডক্টর মজুমদার এমন একখানা গ্রন্থ দেশকে দিয়ে গেলেন। ভারতেতিহাসে স্বাধীনতা-আন্দোলনের ঘটনা বড় কাছের ঘটনা উচ্ছ্বাস ও আবেগ ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারকে গ্রাস করতে সদাই উদ্যত। ব্যক্তিগত মতামত ও পক্ষপাতিত্ব নির্ভীক সত্যানুসন্ধানে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। অনুগ্রহ-লাভের এবং জাগতিক প্রতিষ্ঠার গোপন লালসা ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতাকে বিনষ্ট করে। ডক্টর মজুমদার স্বয়ং স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রধান যুগের অর্থাৎ ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ঘটনাবলীর শুধু প্রত্যক্ষ দর্শক নন, ওদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার অংশীদারও। সুতরাং ভূমিকায় ডক্টর মজুমদার নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সংস্কারশূন্য নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখা বড় শক্ত।

তবু তিনি ক্লান্তিহীন প্রয়াস করেছেন বদ্ধমূল ধারণা এবং সংস্কারের রঙে না রাঙিয়ে

ইতিহাসের প্রামাণ্য তথ্যসমূহ নির্ভীক ও নিরপেক্ষ ভাবে পরিবেষণ করতে। এ-কাজ ভারতের জাতীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় করতে গিয়ে কী প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন, তা প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এই সত্যানুরাগী ইতিহাস-তপস্বী কোন প্রকার অনুগ্রহ বা ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য ক'রে ভয়শূন্য চিত্তে গভীর জ্ঞান, সূক্ষ্ম গবেষণা এবং অসামান্য অভিজ্ঞতার সাহায্যে স্বাধীনতা-আন্দোলনের তথ্যাদি এবং ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করেছেন এই ইতিহাস-গ্রন্থে। বলতে দ্বিধা নেই, তিনি সার্থক হয়েছেন। ঐতিহাসিক-রূপে তাঁর মর্যাদা ও গৌরব আধুনিক ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে রইল।

কয়েকটি বিতর্কমূলক বিষয়ে—যথা ভারতে হিন্দু-মুসলমান এবং পাকিস্তানের জন্মসূত্র বা ১৮৫৭ খৃঃ বিদ্রোহের স্বরূপ—তিনি যে দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্যাদি উদ্ধৃতি দ্বারা সিদ্ধান্ত করেছেন, তার বিরূপ সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশে। ডক্টর মজুমদারের মতে হিন্দু ও মুসলমান এদেশে স্বাভাবিক ধারায় কাছাকাছি কোন দিন আসেনি, শত শত বছর পাশাপাশি বাস করেও। এবং এই দুটি সম্প্রদায়ের যে বিভেদ, সংঘর্ষ ও কলহ —যার পরিণতি পাকিস্তান—তা পুরোপুরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি নয়, যদিও তাতে তার প্রত্যক্ষ উস্কানি স্বাভাবিক কারণেই রয়েছে। কিংবা ১৮৫৭ খৃঃ বিদ্রোহকে তিনি ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলতে রাজী নন। এ-সব কারণে তাঁকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ঐতিহাসিকদের পদাঙ্কানুসারী—এই অপবাদ কোন কোন মহল থেকে দেওয়া হয়েছে। তারপর সমগ্র ভারতের জাতীয় জাগরণে বাংলার দানকে তিনি নাকি অতিরঞ্জন-দোষে দুষ্ট ক'রে তুলেছেন, এবং সাংস্কৃতিক জাগরণের ও স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন নেতৃবর্গের বিচার ও বিশ্লেষণে তাঁর নাকি পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। সর্বোপরি ভারতে—প্রধানতঃ বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাবে এবং ভারতের বাইরে মরণজয়ী যুবকদের যে সুদূরপ্রসারী সংগঠন ও কর্মধারার বিচিত্র ও ব্যাপক প্রকাশ সশস্ত্র আন্দোলনের পথে ঘটেছিল, যাকে ব্যর্থ সন্ত্রাসবাদ ব'লে আমরা অভিহিত করি, তার সম্যক্ মূল্যায়ন ডক্টর মজুমদার করেছেন অনেক গোপন দলিল ও ইংরেজ-শাসনের অপ্রকাশিত কাগজপত্রাদির সাহায্যে; এবং নির্দ্বিধায় তিনি ভারতের এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। তৃতীয় খণ্ডে এ-সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত তথ্যাদি পাবার অদম্য কৌতূহল তিনি জাগিয়েছেন ইতিহাস-পাঠকের চিত্তে। কিন্তু যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ভারতে স্বাধীনতা এসেছে একমাত্র অহিংসা চরকা ও সত্যাগ্রহের পথ বেয়ে, তাঁদের কাছে এ অধ্যায়টি প্রীতিপদ নয়।

তথ্যাভিজ্ঞ সমালোচনার মাধ্যমেই ইতিহাস অনুশীলন সমৃদ্ধ হয়, পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়। ডক্টর মজুমদার তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এ সমালোচনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু সমালোচনার উপজীব্য হিসেবে যখন ব্যক্তিগত অসূয়া বা আক্রোশ কিংবা কতগুলি নির্বস্তুক ফর্মুলা বা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে স্বতঃসিদ্ধ কতগুলি ধারণা এসে পড়ে, তখন তার সমালোচনার গণ্ডি পার হয়ে অশালীন কথা কাটাকাটি ও কলহে পরিণত হয়। এবং তা ইতিহাস-অনুশীলনের

পরিপন্থী। কোন কোন মহলে এই প্রয়াসই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, ভয় হয়।

ডক্টর মজুমদারের এই গ্রন্থটির রচনাশৈলী বিরূপ সমালোচকদেরও স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও বিস্ময় জাগিয়েছে। আঙ্গিকের সাবলীলতা ও ভাষার স্বচ্ছতা গ্রন্থখানিকে প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে শুধু ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে নয়, সর্বশ্রেণীর পাঠকদের কাছে এ গ্রন্থটি পরম বরণীয়। এবং নিঃসন্দেহে ব'লব যে, ভারতবাসীর কাছে, বিশ্ববাসীর কাছেও বর্তমান স্বাধীন ভারতের এ জন্মকাহিনী মহৎ স্বীকৃতি লাভ করবে।

অ. স.

১। **বিবেকানন্দ-শতাব্দী জয়ন্তী গ্রন্থমালা :** উপনিষৎ-সঙ্কলন : ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্তবক। প্রকাশক : স্বামী সন্তোষানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, পোঃ বেলঘরিয়া, জেলা ২৪ পরগনা। ১ম স্তবক ১৮৩+৮ পৃষ্ঠা; ২য় স্তবক ১৭৭+৮ পৃষ্ঠা; ৩য় স্তবক ১৯৬+৮ পৃষ্ঠা; ৪র্থ স্তবক ১৯৩+৮ পৃষ্ঠা। প্রতি খণ্ডেরই মূল্য এক টাকা।

এর মধ্যে ১ম ও ৩য় স্তবক বাংলা, ২য় ও ৪র্থ স্তবক হিন্দী।

১ম স্তবকে প্রথম ৬৬ পৃষ্ঠা স্বামী বিবেকানন্দের স্বরচিত জীবনী; লিখেছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পরে ১০৮ পৃষ্ঠা বিভিন্ন উপনিষদ্ হইতে সংগৃহীত শ্লোক ও তার সরল বঙ্গানুবাদ। পরের পৃষ্ঠাগুলিতে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণী।

২য় স্তবক প্রথম স্তবকের হিন্দী-অনুবাদ।

৩য় স্তবকের প্রথম ৭৭ পৃষ্ঠা স্বামী তেজসানন্দ-লিখিত ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী। পরে ১০৮ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন উপনিষদ্ হইতে সংগৃহীত শ্লোক ও তার বঙ্গানুবাদ। শেষে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি বাণী।

স্বামী বিবেকানন্দ-শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষে এই গ্রন্থগুলির প্রকাশন সার্থক হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'বেদান্তই আমাদের জীবন, বেদান্তই আমাদের প্রাণ।' সারা ভারতকে বেদান্তের প্রাণপ্রদ শক্তিপ্রদ ভাবের বন্যায় ভাসিয়ে দেবার কথা ব'লে গেছেন তিনি।

মূল উপনিষদ্গুলি অধ্যয়ন করা যাঁদের পক্ষে অসুবিধাজনক, অথচ উপনিষদের ভাব-ধারার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হ'তে চান, এই গ্রন্থগুলি তাঁদের যথেষ্ট সহায়তা করবে। সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদও খুব সরল ও সুন্দর হয়েছে।

তাছাড়া প্রত্যেকটি গ্রন্থই শিক্ষা, জীব, ঈশ্বর, সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয় লইয়া দ্বাদশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিভিন্ন উপনিষদের বিভিন্ন স্থানে এই সব বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তা একত্র ক'রে গ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এদিক থেকে গ্রন্থটির বিশেষ অবদান রয়েছে। শ্লোকগুলি সঞ্চয়ন ক'রে দিয়েছেন সুপণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ তর্কবেদান্ততীর্থ।

২। **বিবেকানন্দ-শতাব্দী জয়ন্তী গ্রন্থমালা :** ৫ম স্তবক : আমাদের বিবেকানন্দ। প্রকাশক স্বামী সন্তোষানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, পোঃ বেলঘরিয়া, জেলা ২৪ পরগনা। ৮৪+৪ পৃষ্ঠা; মূল্য ছয় নয়া পয়সা

গ্রন্থটি লিখেছেন স্বামী সত্যঘনানন্দ। সাধারণের বোধগম্য সরল ভাষায় গ্রন্থটি লিখিত। স্বল্পায়তন হলেও স্বামীজীর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি প্রায় সবই এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা ও ভাষার সহজ গতি গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করেছে। স্বামীজীর বহু বাণীর স্থানোপযোগী উদ্ধৃতি গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, নামমাত্র মূল্যে স্বামীজীর এরূপ একটি জীবনী প্রকাশিত হওয়ায় স্বামীজীর শতবর্ষ-জয়ন্তী বৎসরে সর্বসাধারণের কাছে তা সহজলভ্য হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন কার্যালয়ের অধ্যক্ষ জানাইতেছেন যে, **'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' গ্রন্থাবলীর বাকি চারি খণ্ড** (১ম, ৩য়, ৪র্থ ও ১০ম খণ্ড) আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকগণ—যাঁহাদের ঠিকানা পরিবর্তিত হইয়াছে, অবিলম্বে গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করিয়া সঠিক ঠিকানা এখানে জানাইবেন। নতুবা চিঠি-পত্রাদি পাওয়ার গোলমাল হইবে। যাঁহাদের রসিদ হারাইয়া গিয়াছে, তাঁহারা ০·৮০ নঃ পঃ-র ডাকটিকিট ও গ্রাহক-সংখ্যা বা প্রথম রসিদ-নম্বর এখানে পাঠাইলে আমাদের খাতায় লিখিত নাম ও ঠিকানা অনুসারে ডুপ্লিকেট রসিদ ডাকযোগে রেজিস্ট্রী করিয়া পাঠানো হইবে।

* * * *

স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে **উদ্বোধন-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার** যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন—অবিলম্বে উদ্বোধন কার্যালয়ে (১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩) নির্ধারিত মূল্য (৪৲, উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে ৩৲ ; ডাকখরচ : ১৲) পাঠাইয়া দিবেন। শুধু পত্র দিয়া জানাইলে নাম তালিকাভুক্ত হইবে না।

১৫ই অক্টোবর টাকা জমা দিবার শেষ তারিখ।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে নূতন প্রকাশন

বীরবাণী (পরিবর্ধিত শতবার্ষিকী-সংস্করণ)—স্বামী বিবেকানন্দ। প্রকাশক : সম্পাদক বিবেকানন্দ সোসাইটি, ২১ বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ১০৬ ; মূল্য টাকা ১·৫০ ; শোভন সংস্করণ (শক্ত মলাটে জ্যাকেট-সহ) মূল্য টাকা ২·৫০।

বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন—অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। প্রকাশক : জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ২২০ ; মূল্য ৫৲।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা (হুগলি কলেজিয়েট স্কুল পত্রিকা, ১৯৬৩)—সম্পাদক-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের অন্যতম শিক্ষক শ্রীশৈলেন দে কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯২।

স্বামী শাশ্বতানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৭শে অগস্ট রাত্রি ১০টা ২ মিনিটের সময় স্বামী শাশ্বতানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠে ৬৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। এক বৎসরের মধ্যে গত ২৯শে জুলাই তৃতীয়বার তাঁহাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাইতে থাকে এবং সারিয়া উঠিবার সমস্ত আশা তিরোহিত হয়। তাঁহার ইচ্ছানুসারে ২৩শে অগস্ট শুক্রবার অপরাহ্নে তাঁহাকে বেলুড় মঠে আনা হয়, তখন তাঁহার জ্ঞান পুরামাত্রায় ছিল, তিনি লোক চিনিতে পারিতেন এবং অস্পষ্টভাবে কথা বলিতেন। অবস্থা দ্রুত খারাপ হয়, চিকিৎসকগণের সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার শেষ মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয়।

১৯১৯ খৃঃ তিনি বারাণসী সেবাশ্রমে যোগদান করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রদীক্ষিত ছিলেন এবং ১৯২৩ খৃঃ তাঁহার নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। ১৯২৫ হইতে ১৯২৮ খৃঃ পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের পরিচালক, ১৯২৯ হইতে ১৯৩৬ খৃঃ পর্যন্ত প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ কার্যকরী সমিতির সভ্য, ১৯৩৬ হইতে ১৯৪৪ খৃঃ পর্যন্ত মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৪ খৃঃ তিনি বেলুড় মঠে আসেন। ১৯৪৭ খৃঃ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম ট্রাস্টী ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৫৯ খৃঃ হইতে তিনি বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সভাপতি ছিলেন। বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারীদের শিক্ষণ-কেন্দ্র (Training Centre) স্থাপনের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

স্বামী শাশ্বতানন্দ ছিলেন কঠোর অথচ হৃদয়বান্ সন্ন্যাসী। বহু লোক বিশেষ করিয়া যুবকগণ তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া উপকৃত ও আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। মাদ্রাজে থাকাকালেও তিনি অনেকের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন।

তাঁহার দেহত্যাগে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামীজীর শতবার্ষিকী

বরিশাল : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে গত ১৫ই হইতে ২১শে মার্চ এই সপ্তাহকালব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। ১৫ই মার্চ অতি প্রত্যুষে স্বামীজীর বিরাট ছবি সহ এক শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করে। ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই মার্চ বিশেষ পূজা, ভোগরাগ, উপনিষদ্-পাঠ ও ভজনাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উক্ত তিন দিবস অপরাহ্ণে যে বিরাট সভার আয়োজন করা হইয়াছিল, উহাতে বিভিন্ন প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও আবৃত্তির মাধ্যমে স্বামীজীর অলোকসামান্য জীবনের সুমহান্ অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। তৃতীয় দিনের সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মাননীয় ডেপুটি কমিশনার। স্বামীজীর পূত জীবনী অবলম্বনে এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৮ই মার্চ জাতিবর্ণনির্বিশেষে যে দরিদ্রনারায়ণ-সেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, উহাতে প্রায় তিন হাজার নরনারী প্রসাদ পান। পরদিন সন্ধ্যায় ছায়াচিত্রের সাহায্যে স্বামীজীর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী শর্মানন্দ। ২০শে ও ২১শে মার্চ যাত্রাভিনয় হয়।

কার্যবিবরণী

বৃন্দাবন : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ১৯৬১-৬২ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। ১৯০৭ খৃঃ অন্তর্বিভাগে মাত্র ২৬টি রোগী লইয়া সেবাশ্রমের কাজ শুরু হয়। ১৯৬২ খৃঃ সেবাশ্রম নূতন ভবনসমূহে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে শয্যাসংখ্যা ১০০।

আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে ২,১২৯ রোগী ভরতি হয় এবং ১,৪৭৮ রোগী আরোগ্য লাভ করে। অস্ত্রচিকিৎসা ১,১৩৯। গড়ে দৈনিক ৪০টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে নূতন ৪৫,৩১৭ রোগী এবং পুরাতন ১,৩৩,৬৪৯ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা নূতন ৯০২৩ ও পুরাতন ২২,৪৫৯। এক্স-রে, ক্লিনিক্যাল লেবরেটরি ও চক্ষুবিভাগ সহ এই সেবাশ্রম একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসালয়। চক্ষু-চিকিৎসার এখানে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে চক্ষু-চিকিৎসা : অন্তর্বিভাগে—৮১৫ ; বহির্বিভাগে—৯,৭৫০।

সিঙ্গাপুর : কেন্দ্রটি ১৯২৮ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আধ্যাত্মিক ও সাধারণ শিক্ষা বিস্তার, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সমাজসেবা করিয়া আসিতেছে। ১৯৬১ খৃঃ কার্যবিবরণীতে এই কেন্দ্রের উন্নতি পরিস্ফুট।

প্রতি সপ্তাহে ক্লাস ও বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

'বিবেকানন্দ তামিল বিদ্যালয়' বালকদের জন্য এবং 'সারদাদেবী তামিল বিদ্যালয়' বালিকাদের জন্য—তামিল শিক্ষা বিস্তার করিতেছে। উভয় বিদ্যালয়ে ২৭৮ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য ইংরেজী ও তামিল শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৬১ খৃঃ লাইব্রেরিতে বিভিন্ন বিষয়ের ইংরেজী, তামিল, মালয়লম্, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় ৪,৪০৩ বই ছিল; পাঠাগারে ৬২ সাময়িক ও ৬টি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। গ্রন্থাগার ও পাঠাগার জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ৫৫টি ছাত্র ছিল, ছাত্রদের সকলেই অনাথ বা অত্যন্ত দরিদ্র, বয়স ৬ হইতে ১৭ বৎসরের মধ্যে, তাহারা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

নিউইয়র্ক বেদান্ত-সোসাইটি: ১৭ই জানুআরি স্বামীজীর তিথি-পূজার দিন সকালে সোসাইটির উপাসনা-গৃহে একটি সমবেত ধ্যান ও উপাসনার সূচী অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চল্লিশ জন সভ্য-সভ্যা উহাতে যোগ দেন। সোসাইটির নেতা স্বামী পবিত্রানন্দ প্রথমে সংক্ষিপ্ত পূজা করিবার পর সমবেত সকলে নিস্তব্ধ ধ্যান ও প্রার্থনায় কিছু সময় কাটান। তাহার পরে চলে কিছুক্ষণ কতকগুলি আবৃত্তি ও স্তোত্র-পাঠ। এই ধরনের ধ্যান, পূজা, প্রার্থনা ও আবৃত্তিতে একটি অপূর্ব শান্তির আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, পাশ্চাত্য ভক্তেরা তাহা বিশেষভাবে উপভোগ করেন। প্রাতরাশের পর পূর্বাহ্নের কার্যসূচী সমাপ্ত হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিক অনুষ্ঠিত হয়। সান্ধ্য আহারের পর সকলে লাইব্রেরিতে সমবেত হইলে স্বামী পবিত্রানন্দের সহিত 'স্বামীজীর জীবন ও বাণী'র আলোচনা চলে।

পরবর্তী রবিবারে সোসাইটি-হলে সাধারণ উৎসব হয়। স্বামী পবিত্রানন্দের বক্তৃতার বিষয় ছিল: 'স্বামী বিবেকানন্দ—বেদান্তের দীপশিখা'। ভারত হইতে আগত বৈজ্ঞানিক ডক্টর চক্রবর্তী দুইটি গান করেন। প্রথম গানটি স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর রচিত। অপর গানটি স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট গাহিয়াছিলেন। স্বামীজীর বৃহৎ আলেখ্য অতি সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। বহু নরনারী এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

নিউইয়র্ক বেদান্ত-সোসাইটি প্রতি বৎসর বসন্তকালে সভ্য ও বন্ধুদের লইয়া কোন প্রশস্ত রেস্টর্যাণ্টে একটি বার্ষিক 'ডিনার'-এর আয়োজন করিয়া থাকেন। এ বৎসর এই ডিনারটিকে স্বামীজীর শতবার্ষিকীর একটি কর্মসূচীর রূপ দেওয়া হইয়াছিল। সোসাইটির চারজন সভ্য স্বামীজীর বাণীর চারটি বিভিন্ন দিক্ লইয়া বক্তৃতা দেন। মিঃ এরিক জন্‌স্: স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর বিশ্বজনীন দিক্; মিসেস কোর্টনী অল্‌ডেন: স্বামী বিবেকানন্দ ও দৈনন্দিন জীবনে যোগের প্রয়োগ; মিঃ জন বাস: স্বামী বিবেকানন্দের মানবিকতা; আমেরিকান ঐতিহ্যে স্বামী বিবেকানন্দের স্থান। মিস্ অ্যান মারে, কুমারী সূর্যকুমারী এবং কুমারী অ্যামি ফোর্ড স্বামীজীর 'Angels Unawares' কবিতাটির তিন অংশ যথাক্রমে আবৃত্তি করেন। ইহা খুবই হৃদয়স্পর্শী হয়। উপসংহারে মিঃ জন শ্লেঙ্ক পিয়ানো বাজাইয়া স্বামীজীর উদ্দেশ্যে রচিত প্রসিদ্ধ 'মূর্তমহেশ্বর' সংস্কৃত স্তোত্রটি গান করেন। সমগ্র প্রোগ্রামটিই আগাগোড়া সমবেত সকলকে প্রভূত আনন্দ ও উদ্দীপনা দিয়াছিল। সোসাইটির সভ্য-সভ্যা ছাড়াও অনেকে ইহাতে যোগদান করেন।

১৮ই জুন বস্টন ও প্রভিডেন্স বেদান্ত-কেন্দ্রদ্বয়ের নেতা স্বামী সর্বগতানন্দ নিউইয়র্ক বেদান্ত-সমিতির স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর একটি কার্যসূচী উপলক্ষে 'স্বামী বিবেকানন্দের মানবপ্রেম' বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক ভাষণ দেন। শতবার্ষিকীর আর একটি সূচী হইল প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী পবিত্রানন্দ কর্তৃক স্বামীজীর শিক্ষার কোনও দিক্ সম্বন্ধে

আলোচনা। এই কার্যসূচীটি সারা বৎসর চলিবে।

৪ঠা জুলাই শতবার্ষিকীর আর একটি স্থচী অনুষ্ঠিত হয় শহর হইতে প্রায় ৬০ মাইল দূরবর্তী একটি পার্বত্য বনভূমিতে (মস হিল, পুটনাম কাউন্টি)। এখানে এরিক জন্স্ ও জ্যাক্ কেলী নামক সোসাইটির দু-জন ভক্তের একটি বাগান আছে। বার্চ, পাইন এবং অন্যান্য আরণ্য বৃক্ষের পটভূমিতে তাঁবু খাটাইয়া এবং বেদী সাজাইয়া উৎসব-স্থান তৈরী হয়। প্রায় ৬০ জন ভক্ত শহর হইতে যোগদান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী এবং স্বামীজীর ছবি বেদীতে সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। কুমারী অ্যামি ফোর্ড স্বামীজীর 'To the Fourth of July' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। স্বামীজীর 'যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী' নামক বক্তৃতাটির নাট্যরূপ দিয়া উহার আবৃত্তি করেন মিসেস কোর্টনী অলডেন এবং কুমারী সূর্যকুমারী।

শ্রীআর্যকুমার শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় একটি গান গাহিবার পর মিস্ অ্যান্ মারে স্বামীজীর 'The Living God' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। ইহার পর একটি অভিনব স্থচী অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক ভক্ত এক টুকরা কাগজে স্বামীজীর কোন উক্তি লিখিয়া একটি বৃহৎ আধারে স্থাপন করেন। জনৈক বালককে উহা হইতে এক মুঠা কাগজ তুলিতে বলা হয়। বালক ৯টি কাগজ তুলে। প্রত্যেকটি কাগজ খুলিয়া তখন উক্তিটি পড়া হয়। প্রত্যেক কাগজে লেখকের সই ছিল। অতঃপর কোরাসে চারটি গান গীত হইলে স্বামী পবিত্রানন্দ সমাপ্তি-বাচন পাঠ করেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনে সকলের জন্য যথেষ্ট খাদ্যসম্ভারের আয়োজন ছিল। তাঁবুর ভিতর এই ভোজন সমাধা হয়। তখনও নানা আলাপ-আলোচনা চলিয়াছিল। মনোরম আরণ্য প্রকৃতিতে স্বামীজীর স্মরণে এই উৎসব সকলকেই বিশেষ আনন্দ দিয়াছিল।

আমেরিকায় বেদান্ত

সেণ্ট লুই : বেদান্ত-সোসাইটির বার্ষিক (এপ্রিল, ৬২—মার্চ, ৬৩) কার্যবিবরণী: কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

(১) রবিবারে ধর্মালোচনা: সোসাইটিতে উপাসনা-মন্দিরে সারা বৎসর রবিবার সকালে বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন অবলম্বনে সর্বসমেত ৪৫টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। নানা ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় হইতে অনেকে যোগদান করেন।

(২) ধ্যান ও কথোপকথন: প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দেন এবং গীতার ব্যাখ্যা করেন। মঙ্গলবারের ক্লাসের সংখ্যা ৪২।

(৩) অতিরিক্ত সভা: গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে 'পুনরভ্যুত্থান' সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং গীতা ও বাইবেল হইতে পাঠ হয়। খৃষ্ট-জন্ম-সন্ধ্যায় 'যিশুখৃষ্ট সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা' বিষয়ে বক্তৃতা হয়। একটি সভায় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেন।

(৪) উৎসব: শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মদিবসে এবং অন্যান্য উৎসব-দিনে পূজা ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি উপলক্ষে সমবেত সকলকে ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়।

(৫) গ্রীষ্মাবকাশের সময় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ লস এঞ্জেলিস ও সাণ্টা বারবারা

বেদান্ত-মন্দিরে 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ বাণী' সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

(৬) পরিদর্শকবৃন্দ: আলোচ্য বর্ষে স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ ও স্বামী বুধানন্দ সোসাইটি পরিদর্শন করেন। আয়োজিত সভায় তাঁহারা বক্তৃতা দেন। এতদ্ব্যতীত এই বৎসর ৩০ জন বিশিষ্ট অতিথি সোসাইটি পরিদর্শন করেন।

(৭) ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রাধ্যক্ষ এই বৎসর ৮০ জনকে সাধন-নির্দেশ দেন।

(৮) গ্রন্থাগার: সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

(৯) ক্যানসাস শহর, মিজূরী ও ইহার পার্শ্ববর্তী বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রচার-কার্য ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

(১০) স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী: স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৭ই জানুআরি প্রাতঃকালে উপাসনা-মন্দিরে ধ্যান ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ভক্তগণ যোগদান করেন, সকলকে ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। ২০শে জানুআরি, রবিবার উপাসনা-মন্দিরে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে প্রার্থনার পর সংস্কৃতে বিবেকানন্দ-স্তোত্র গীত হয়। স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের বাণী-পাঠের পর স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ 'যুগমানব স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে স্বামীজীর গাওয়া দুটি গান গীত হইলে 'Song of the Sannyasin' (সন্ন্যাসীর গীতি) কবিতাটির পাণ্ডুলিপির মুদ্রিত প্রতিলিপি এবং 'স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন বাণী' শীর্ষক পুস্তিকা বিতরিত হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও গ্রন্থাগারসমূহে স্বামী নিখিলানন্দ-সংকলিত ১০ ডলার মূল্যের 'Vivekananda: The Yogas and Other Works' ৯৯০ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ উপহার দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্বে ১৩৪ খানি গ্রন্থ বিতরিত হইয়াছে।

স্বামী অক্ষতানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৩রা অগস্ট রাত্রি ১০টা ৫ মিনিটের সময় স্বামী অক্ষতানন্দ (গোপাল মহারাজ) ত্রিবান্দ্রাম্ হাসপাতালে ৪২ বৎসর বয়সে যকৃতের পীড়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৯৩৯ খৃঃ তিনি কালাডি আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের মন্ত্রদীক্ষিত ছিলেন এবং ১৯৪৮ খৃঃ তাঁহার নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলেও তিনি খুব কর্মঠ ও উৎসাহী ছিলেন। ত্রিচুরে বিবেকানন্দ বিজ্ঞান-ভবন গ্রন্থাগার প্রধানতঃ তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছে। স্বামী অক্ষতানন্দের ক্লাস বক্তৃতা প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয় হইত। কেরলে তাঁহার অনেক অনুরাগী বন্ধু আছেন। তাঁহার দেহত্যাগে ভবিষ্যতের আশাস্থল একজন তরুণ সন্ন্যাসীর অভাব ঘটিল। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

স্বামীজীর শতবার্ষিকী

ডিগবয় : রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী উৎসব-সমিতির উদ্যোগে গত ৩১শে জুন হইতে ৫ই জুলাই পর্যন্ত ছয়দিনব্যাপী অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর চিত্র-সহ একটি মনোরম প্রদর্শনী সপ্তাহকাল দর্শকগণের বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল। ছাত্র ও যুবকগণের প্রবন্ধ আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কৃতী যুবক ও ছাত্র-ছাত্রীগণকে পুরস্কৃত করা হয়। সভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও অজ্জজানন্দ প্রমুখ বক্তাগণ স্বামীজীর জীবনের বিশেষ বাণী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। উৎসবের তৃতীয় দিন রবিবার আশ্রমে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ ও ভজনের অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কয়েক সহস্র ছাত্রছাত্রীর এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা সমস্ত শহর সুশৃঙ্খলভাবে পরিক্রমা করিয়া আসে।

উৎসবের চতুর্থ দিবসে একটি মহিলাসভার অনুষ্ঠান হয়। স্থানীয় ইণ্ডিয়া ক্লাব, ডিগবয় ক্লাব, দুলিয়াজান ও ডুমডুমাতেও এক একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সব সভাতে স্বামা সম্বুদ্ধানন্দ, অজ্জজানন্দ, ভব্যানন্দ, সৌম্যানন্দ, শিবরামানন্দ প্রমুখ মহারাজগণ বক্তৃতা করেন। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ আশ্রম-প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দ-লাইব্রেরির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে ডিগবয়ে ৩টি এবং তিনসুকিয়া, মার্ঘারিটা ও ডুমডুমা প্রভৃতি অঞ্চলে ৬টি বক্তৃতা দেন।

গত ১২ই এবং ১৩ই জুন প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম-সংলগ্ন বিবেকানন্দ-হলে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী অবলম্বনে একটি জনসভায় ও একটি মহিলা-সভায় বক্তৃতা করেন।

বিবেকানন্দ-জন্ম-শতবার্ষিক উৎসবের পরবর্তী পর্যায়ে ১২ই অগস্ট বিবেকানন্দ-হলে স্বামী সৌম্যানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ সহস্রাধিক নরনারীর সমক্ষে স্বামীজীর জীবন ও অবদান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন।

১৩ই অগস্ট স্বামী নিরাময়ানন্দ বিবেকানন্দ-বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া একটি শিক্ষামূলক বক্তৃতা দেন।

তিনসুকিয়া : গত ১০ই ও ১১ই অগস্ট তিনসুকিয়া রেলওয়ে উৎসব-সমিতির উদ্যোগে স্বামীজীর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান বিপুল উদ্দীপনায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়।

প্রথম দিন ভোরে স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি-সহ নগর পরিক্রমা করা হয়। অপরাহ্ণে শ্রী সি. ভি. রাও-এর সভাপতিত্বে এক মহতী সভায় স্বামীজীর সর্বতোমুখী প্রতিভার উল্লেখ করিয়া ভাষণ দেন অধ্যাপক মণীন্দ্র নাথ। স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এতৎ-প্রসঙ্গে তিনি ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ ও কর্মযোগ—এই যোগ-চতুষ্টয়ের আলোচনা-ক্রমে স্বামীজীকে সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রচারক ও বিশ্বমানবতার পূজারীরূপে বর্ণনা করেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দ কঠোপনিষদ্ পাঠ করেন। অপরাহ্ণে শ্রী পি. আর. নরসিংহমের পৌরোহিত্যে মহতী সভায় অধ্যাপক তামুলী ও শ্রীদেবব্রত ঘোষ স্বামীজীর মহান্ আদর্শের কথা আলোচনা

করেন। প্রধান বক্তা স্বামী নিরাময়ানন্দ বলেন, স্বামীজীই 'শিবজ্ঞানে জীবপূজা' অধ্যাত্ম-সাধনার অন্যতম পথ বলিয়া নির্দেশ করেন। স্বামী সৌম্যানন্দ গল্পের মাধ্যমে স্বামীজীর আদর্শ ও কর্মজীবনের উল্লেখ করিয়া তৎপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন। সর্বশেষে শ্রীরমেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদকের বিবরণী পাঠ করেন।

দুই দিনই রামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন ও রামনাম-কীর্তন হয়। স্বামীজীর জীবনী অবলম্বনে ছায়ানাট্যাভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে।

গত ৩রা ও ৪ঠা জুলাই স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে স্বামীজীর জীবনী ও আদর্শ আলোচনা করিয়া মূল অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করেন।

কালিয়াগঞ্জ (পঃ দিনাজপুর): গত ৩রা মাঘ স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে স্তোত্রপাঠ, ভজন, বিশেষ-পূজা বৃহদারণ্যকোপনিষৎ হইতে পাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় আবৃত্তি, 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'গীতা' পাঠ হয়। স্বামীজী-সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্থানীয় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিজয়কুমার ঘোষ ও একজন সহকারী শিক্ষক। পরিশেষে ভক্তদের সমবেতকণ্ঠে নামকীর্তন হওয়ার পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

স্বামীজীর পুস্তকাবলীর জাপানী অনুবাদ

টোকিও: রামকৃষ্ণ বেদান্ত-সোসাইটির উদ্যোগে জাপানী ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে:

(১) 'স্বামীজীর বাণী'—ইহাতে আছে 'চিকাগো বক্তৃতা', 'মদীয় আচার্যদেব', 'ভারতের মহাপুরুষগণ' প্রভৃতির অনুবাদ।

(২) 'জীবনের রহস্য'—এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে সম্পূর্ণ 'কর্মযোগ', 'কর্মপরিণত বেদান্ত', 'মানুষের প্রকৃত স্বরূপ', 'সর্বত্র ঈশ্বর-দর্শন', 'অনুভূতি', 'বহির্জগৎ', 'ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড'।

এইগুলি অনুবাদ করিয়াছেন ডক্টর শো সাইটো।

কার্যবিবরণী

বিবেকানন্দ-সোসাইটি (২১, বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা ৬): স্বামীজীর ভাবধারা রূপায়িত করিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে যে-সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ-সোসাইটির নাম প্রাচীনতার দিক্ হইতে উল্লেখযোগ্য। ১৯০২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির ১৯৬২ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সাপ্তাহিক ও সাময়িক ধর্মসভায় গীতা, চণ্ডী, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও পুঁথি, তুলসী-রামায়ণ এবং স্বামীজীর 'কর্মযোগ' ও 'কলম্বো হইতে আলমোড়া' আলোচিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

সোসাইটি-পরিচালিত দাতব্য হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসালয়ে ১৯৬২ খৃঃ ১৩,০৪৭ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারে ইতিহাস, জীবনী, ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ে ৫,১২৪ খানি পুস্তক আছে; আলোচ্য বর্ষে ২,৮৮২টি পুস্তক পাঠকদিগকে পড়িতে দেওয়া হয়। পাঠাগারে অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা নিয়মিত আসে। সোসাইটির বর্তমান সভ্য-সংখ্যা ৩৮০।

কলিকাতায় ১৫১নং বিবেকানন্দ রোডে নিজস্ব জমিতে সোসাইটির বহু-ঈপ্সিত 'বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দির' (Swami Vivekananda Memorial Hall)-এর নির্মাণ-কার্য চলিতেছে। এতদর্থে সোসাইটির সম্পাদক অর্থ-সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছেন।



মৃত্যুরূপা মাতা

স্বামী বিবেকানন্দ

Kali the Mother : অনুবাদ : কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগ !
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে !
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায় ! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায় ।

লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর ! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !

করালি ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে ।

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে ।

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গকে আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেদন করিতেছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : পরবর্তী মাসের উদ্বোধন পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটিবে।

বিবেকানন্দ-মানসে কালী-চেতনা

'নরেন্দ্র অখণ্ডের ঘর'—এ-কথা বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যাহা বুঝাইতে চাহিতেন, শ্রোতারা তাহা কে কিভাবে বুঝিত, সে তত্ত্ব আজও জল্পনা-কল্পনার বিষয়। 'অখণ্ডের ঘর' বলিতে তিনি কি বুঝিতেন - নরেন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ ভাব অদ্বৈত, অরূপ বা নিরাকারই তার ধ্যানের বিষয়? তাই যদি হয়, তবে তাহাকে আবার 'কালী' মানাইবার জন্য তাঁহার এত মাথা ব্যথা কেন?

জগন্মাতার যে মূর্তির দর্শনলাভের জন্য একদিন তিনি স্বীয় গলদেশে সত্য-সত্যই খড়্গাঘাত করিতে গিয়াছিলেন, যে জগন্মাতাকে লইয়া তাঁহার কত মধুর লীলা—অদ্বৈত সাধনার সময় তো মহামায়ার সেই কালীরূপকেই মায়া মনে করিতে হইয়াছে। জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা মনে মনে তাহা কাটিবার পরই তাঁহার মন অরূপের ধ্যানে—নির্বিকল্প সমাধিতে লীন হইয়া যায়।

তবে কেন তিনি নরেন্দ্রকে বার বার কালী-ঘরে পাঠাইতেছেন? সে ব্রাহ্মসমাজে যায়, মূর্তিপূজা মানে না; অপরে প্রতিমাকে প্রণাম করিলে সে বিদ্রূপ করে, তিরস্কার করে; তাহাকে কেন ভবতারিণীর মন্দিরে পাঠানো? নরেন্দ্রের অপূর্ণতা দূর করিবার জন্য? তাহাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া সমন্বয়-ধর্মের আচার্যরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—নরেন মানলে সবাই মান্‌বে। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'তিনি আমাকে মা কালীর কাছে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন—কি ভাবে কি হইল, এ-কথা কেহ কোনদিন জানিবে না। ইহার গোপন তথ্য আমার সাথেই চলিয়া যাইবে।'

এ তত্ত্ব অতি গভীর, অতি গুহ্য! তবে বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যায়—সংসারের দারিদ্র্যপীড়নে নরেন্দ্র গিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ধর্মলাভের পূর্বে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবার জন্য, তাহার বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে ইহা সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে পাঠাইলেন জগন্মাতা কালীর কাছে: 'মায়ের কাছে আজ যা চাইবি, তাই পাবি।' নরেন্দ্র তথাপি মন্দিরে যাইতে রাজী নয়, পীড়াপীড়ি করে, 'আপনি চেয়ে দিন'। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'তুই যে মাকে মানিস না, তাই তো মা তোকে পরীক্ষা করছে!'

আবার পরোক্ষে বলিতেছেন, 'মা ওকে দুঃখকষ্ট দিয়েছেন—ও জগতের দুঃখকষ্ট বুঝবে ব'লে।'

নরেন্দ্র কিন্তু মন্দিরে গিয়া কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন—তাহা কখনও ব্যক্ত হয় নাই, শুধু এইটুকু জানা যায়—বারবার চেষ্টা করিয়াও তিনি জাগতিক অভাব দূর করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন নাই, তিনি চাহিলেন, 'মা, আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক বৈরাগ্য দাও'—ইহাই নরেন্দ্রের প্রার্থনা; ইহারই বলে তিনি পরিণত হইলেন বিবেকানন্দে।

এই অপূর্ব প্রার্থনার কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী হইলেন, নিশ্চিন্ত হইলেন, বলিলেন, 'মা তোর কপালে সংসারসুখ লেখেনি, তবে আমি বলছি, তোদের সংসারে ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।' ইহার পরই শুরু হইল বিবেকানন্দ-জীবননাট্যের পরবর্তী অঙ্ক! সেই মহারাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণকে আবদারের সুরে নরেন্দ্র বলিল, 'একটা মায়ের গান শিখিয়ে দিন না।' সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কি আনন্দের দিন! তিনি সাদরে শিখাইয়া দিলেন এমন একটি গান যাহাতে নরেন্দ্রের উপলব্ধি হইল: এই কালী সাকার আকার নিরাকারা! তিনি সারা রাত্রি গাহিলেন, 'আমার মা ত্বং হি তারা'।

সকালে শ্রীরামকৃষ্ণ যাহাকে কাছে পান, তাহাকেই বলিতেছেন, 'নরেন কালী মেনেছে, নরেন কালী মেনেছে'—এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণের এক মহাবিজয়ের দিন—পরম সার্থকতার দিন! যে মহাকালীকে—যুগের যে কুণ্ডলিনী শক্তিকে তিনি স্বীয় সাধনা দ্বারা জাগাইয়াছেন—সেই মহাশক্তিকে ধারণ করিবার, বহন করিবার এবং সারা বিশ্বে সেই আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত করিবার যুগপ্রতিনিধি আধার আজ আসিয়া উপস্থিত।

তন্ত্রে পুরাণে, সাহিত্যে কাব্যে কালীর শত সহস্র রূপ! নরেন্দ্র-মানসে বা বিবেকানন্দ-চেতনায় কালীর কোন্ রূপটি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাই এখানে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়!

স্পষ্টভাবে না বলিলেও অদ্বৈতবেদান্ত-কেশরী মাঝে মাঝে ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন—তাঁহার চরম অনুভূতি অতি গম্ভীর কাব্যপূর্ণ ভাষায়; বিবেকানন্দ-রচনায় কালী-ব্যঞ্জনা ব্যাপ্ত হইয়া আছে—আদি হইতে অন্ত! আজন্ম শিবোপাসক বীরেশ্বর যেন ধীরে ধীরে পিতৃক্রোড় হইতে মাতৃক্রোড়ে স্থানান্তরিত হইতেছে। আপসহীন অদ্বৈত বেদান্তী মাতৃভাবের মধুর রসে অভিষিক্ত হইতেছেন! কিন্তু এ মাধুর্য কান্তকোমল মাধুর্য নয়, এ রুদ্র-মধুরের দ্বন্দ্বনৃত্য—শান্ত-চঞ্চলের—গতি-স্থিতির দ্বৈত সমাবেশ! এ শিবের উপর কালীর নৃত্য, এ সাংখ্য বেদান্ত ও যোগ-দর্শনের চরম প্রতীক!—পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈত সত্তা ব্রহ্ম-মায়ার অনির্বচনীয় ভাবে অথবা চৈতন্য-শক্তির অভিন্নতায় বিলীন হইতেছে।

একের পর এক বহু রচনায়—কখন সংস্কৃত স্তোত্রাকারে, কখন বাংলা কবিতায়, কখন বা ইংরেজী ভাষায়—গলিত লাভাস্রোতের মতো বাহির হইয়াছে স্বামীজীর এই বিচিত্র অনুভূতি! 'কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে'—এই 'অম্বাস্তোত্রে' যাহা বীজাকারে, তাহাই পল্লবিত হইয়াছে 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'র বিরাট্ ছন্দে। আবার 'Kali the Mother' কবিতায় ঘনীভূত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার জীবনের এক পরম অনুভূতি! এই মহা-মাতাকে তিনি শুধু কল্যাণী দয়াময়ীরূপে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন—এই মায়াতীতাই মহামায়া; ইনি সুখদুঃখ—উভয়বিধাত্রী, মঙ্গল-অমঙ্গল-উভয়দাত্রী; দিন ও রাত্রির যেমন দুইটি বিভিন্ন কারণ হয় না, সুখ-দুঃখ—মঙ্গল-অমঙ্গল—জন্ম-মৃত্যুর কারণও সেইরূপ এক, 'একমেব'। তিনিই জন্ম, তিনিই জীবন; তিনিই মৃত্যু, তিনিই অমৃত! এই অদ্বৈতপর অনুভূতিই বিবেকানন্দের কালী-চেতনার মূল সুর।

এই কালীকে শুধু 'মঙ্গলা' ভাবিলে চলিবে না। আমার মনের মতো ভাবে তুমি চলো—এভাবে কালী-উপাসনা করা চলে না! কালী-উপাসনার ইঙ্গিত দিয়াছেন বিবেকানন্দ:

'চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান—
নাচুক তাহাতে শ্যামা'

Who dares misery love—
And hug the form of Death
Dance in destruction's dance,
To him the Mother comes

এ ক্রন্দনরত দুর্বল শিশুর মাতৃ-আহ্বান নয়—এ দুরন্ত শিশুর মাতৃ-সঙ্গে তরঙ্গলীলা—বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে! ইহাই এ যুগের নবতম শক্তি-সাধনার সূত্রপাত! মহাপ্রকৃতির মাতৃরূপ আজ অনবগুণ্ঠিত, অনাবৃত সত্তা আজ শান্ত শিববক্ষে নৃত্যপরা! সৃষ্টিস্থিতিলয়ের এই নগ্ন নিষ্ঠুর সমগ্র সত্যের রুদ্র-মধুর রস একই কালে আকণ্ঠ পান করিতে হইবে—কোন সুখের কামনায় নয়, কোন দুঃখ এড়াইবার জন্যও নয়, সত্যকে সত্যরূপে জানিবার জন্য, আত্মাকে আত্মা-রূপে বুঝিবার জন্য। 'সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখ-বনমালী তোমার মায়ার ছায়া'—এই অনুভূতিই আমাদিগকে আভাস দেয়—বিবেকানন্দ কালী বলিতে কি বুঝিতেন!

শেষ যবনিকা উঠিয়াছে কাশ্মীরে ক্ষীর-ভবানী-মন্দিরে। ভগ্ন মন্দির দেখিয়া বীরসন্তান বিবেকানন্দ মনে মনে বলিতেছেন, 'আমি থাকিলে প্রাণ দিয়া তোমায় রক্ষা করিতাম!' অন্তরের অন্তরে স্পষ্ট দৈববাণী ধ্বনিত হইল মহাকালীর অট্টহাস্যে: তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি?

নেতা, আচার্য, জগদ্‌গুরু বিবেকানন্দের অভিমানলেশ—জগজ্জননী স্বহস্তে দূর করিয়া দিলেন। 'অখণ্ডের ঘরের ঋষি'—মায়ার জগতের খেলা শেষ করিয়া ধীরে ধীরে মহামায়ার কোলেই ঢলিয়া পড়িলেন—ক্লান্ত কণ্ঠে শুধু ধ্বনিত হইল: 'মা, মা'—মহালয়ের মহামন্ত্র।

পূজা-তত্ত্ব

শ্রীঅমূল্যনাথ চক্রবর্তী

মানুষ সাংসারিক অভাব, অভিযোগ, রোগ-শোকাদির পীড়ন হইতে মুক্তি ও পারলৌকিক স্বর্গাদি লাভের জন্য দেবতার পূজা করে। এই পূজা হইল সকাম পূজা। আমরা সাংসারিক জীবনে কাহারও নিকট হইতে উপকার পাইলে কৃতজ্ঞ থাকি। জগন্মাতার স্নেহময়ী ক্রোড়ে আমরা নিত্যস্থিত, ও লালিত-পালিত হইয়া তাঁহার অযাচিত দান আমরা সর্বদাই পাইতেছি। পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি বা জগন্মাতার প্রতি অন্তরের ভালবাসা প্রকাশ করা হইল পূজার অপর একটা দিক। এই পূজা হইল নিষ্কাম পূজা। পরমেশ্বরের বা জগন্মাতার করুণা অসীম। আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশের জন্য যে পূজা করা হয়, তাহা হইল নিষ্কাম পূজা বা পরাপূজা। আর আমাদের অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য ও স্বর্গ-প্রাপ্তির জন্য পরমেশ্বর বা জগন্মাতার যে পূজা করা হয়, তাহাই হইল সকাম পূজা। অকপট অন্তর্নিহিত ভক্তি সহকারে সামান্য জিনিসও যদি পরমেশ্বরকে নিবেদন করি, তাহা হইলে তিনি যে অতি আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করেন, তাহা আমাদিগকে জানাইবার জন্যই শ্রীভগবান্

অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

অতি মূল্যবান্ জিনিস আমরা ভগবানকে প্রদান না করিতে পারিলেও আমরা যদি ভক্তির সহিত সামান্য পত্র এবং ফল ও জল ভগবান্‌কে অর্পণ করি, তাহা হইলে তিনি আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করেন। পূজায় মূল্যবান্ উপকরণ প্রয়োজন হয় না, ভগবান্ ভক্তি চান, 'ভক্ত্যুপহৃতম্' শব্দটি লক্ষণীয়। পূজা বলিতে আমরা সাধারণতঃ পুষ্প, গন্ধ, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ইত্যাদি উপচার দ্বারা প্রতিমার অর্চনা বুঝিয়া থাকি ; কিন্তু পূজা হইল একটি জীবন্ত অধ্যাত্ম-সাধনা এবং এই সাধনা হইল পূজার প্রাণবস্তু। কিন্তু এই দিকটি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, অথচ অধ্যাত্ম-সাধনাকে অনুসরণ করিয়াই পূজা-পদ্ধতি রচিত হইয়াছে। বাহ্য উপচার-সহ পূজা মানস-পূজার সাহায্যকারী। উপচার-সহ যে পূজা করা হয়, সেই পূজার ক্রম মোটেই বিক্ষিপ্ত ধারা নয়। এই পূজার ভিতর একটি অখণ্ড সাধনা বিদ্যমান রহিয়াছে। উপচার-সমর্পণ-তত্ত্ব, ন্যাসতত্ত্ব, প্রাণপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব, চক্ষুর্দানতত্ত্ব, প্রণামতত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন তত্ত্ব বাহ্য পূজার অন্তর্নিহিত। আমরা প্রথমতঃ এই প্রবন্ধে এগুলি ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দেবতা যথা—শিব, কৃষ্ণ ইত্যাদি সকল দেবতাই এক পরমতত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ। এই সকল দেবতার পূজা মোটেই পরস্পর-বিরোধী নয়।

পূজার উদ্দেশ্য হইল—আমাদের অন্তর্নিহিত ভগবৎ-শক্তির অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করিয়া এই ভাগবত তত্ত্বকে অনুভব করা। আমরা দেখিতে পাই, অগ্নির নিকট অবস্থান করিলে দেহ গরম হয় এবং বরফের নিকট অবস্থান করিলে দেহ শীতল হয়, সেইরূপ উচ্চস্তরের সাধক ইষ্টের সান্নিধ্যে অবস্থান-পূর্বক ইষ্টের তন্ময়তা লাভ করেন। ইষ্টের এই তন্ময়তা লাভ করাই হইল পূজার প্রধান উদ্দেশ্য।

দেবীসূক্তে এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিষ্ণুমায়া-স্তবে জগন্মাতা যে সর্বভূতে বিদ্যমান, তাহার নিদর্শন পাই। কিন্তু জগন্মাতা যে আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী ও প্রেরয়িত্রী, এবং বিশ্বব্যাপিনী তাহা আমরা অনুভব করি না। গলায় হারের দিকে না তাকাইয়া মানুষ যেমন হার অনুসন্ধান করে, সেইরূপ জগন্মাতা আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার শক্তিতেই আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রিয়াশীল, কিন্তু আমরা তাহা ভুলিয়া তাঁহার অনুসন্ধান বাহিরে করিয়া থাকি। পূজার উদ্দেশ্য হইল—আমাদের ভিতরে লুক্কায়িত শক্তিকে সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করা।

চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা

আমাদের দর্শন-ইন্দ্রিয় হইল চক্ষু। এই চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের অন্তঃশক্তি প্রকাশিত। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুই হইল প্রধান। আমাদের পূজার উদ্দেশ্য হইল—মৃন্ময়ী মূর্তিকে চিন্ময়ী করা। কাজেই মৃন্ময়ী মূর্তিকে চিন্ময়ী করিতে হইলে চক্ষুর্দান প্রয়োজন। 'ইদং নেত্রত্রয়ং দেবী বহ্নিজ্যোতিসমন্বিতম্' ইত্যাদি এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পূজক প্রার্থনা করিতেছেন যে, প্রতিমার চক্ষু বহ্নির ন্যায় জ্যোতিঃসম্পন্ন হউক।[১]

'তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাৎ'—এই মন্ত্রে দেবতার চক্ষুর্দান করিবার সময় পূজক স্বীয় চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ মন্ত্র পাঠ দ্বারা প্রতিমাতে স্বীয় চক্ষু আরোপ করিবেন এবং

১ ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব-প্রণীত 'পূজাতত্ত্ব' গ্রন্থের ১৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অবশেষে প্রতিমার চক্ষু দ্বারাই পূজক দৃষ্টি-শক্তিমান্ হইবেন। এইরূপ চক্ষুর্দান ঠিকমত করিতে পারিলে মৃন্ময়ী মূর্তি চিন্ময়ী হইয়া থাকেন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা

প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় শাস্ত্রবিধি অনুসারে পূজক বিভিন্ন স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের মাধ্যমে 'আং হ্রীঁ ক্রোঁ' ইত্যাদি বর্ণ উচ্চারণ-পূর্বক দেবতার হৃদয়ে হস্তস্থাপন করিয়া শেষে 'বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্র-ঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা' বলিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। পূজক যদি মন্ত্রে ঠিক ঠিক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তাহা হইলে দেবী পূজকের হৃৎপদ্মাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। প্রাণপ্রতিষ্ঠা দ্বারাই মৃন্ময়ী মূর্তি চিন্ময়ী হন। আমাদের জামা যেমন দেহের বাহিরের আবরণ, সেইরূপ পূজক ঠিক ঠিক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে পূজকের নিকট স্বীয় দেহ বাহিরের আবরণের ন্যায় মনে হইবে। মৃন্ময়ী বা প্রস্তরময়ী মূর্তিতে দেবতার আবির্ভাব আনয়ন করা হইল প্রাণপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। পূজক পূজা দ্বারা দেবতার প্রসন্নতা উৎপাদন করিতে পারিলেন কিনা, তাহার উপর দেবতার মূর্তিতে আবির্ভাব হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে। পূজক কাতরভাবে প্রার্থনা করিবেন। মূর্তিতে দেবতার যেন অধিষ্ঠান হয়, সেজন্যই প্রার্থনা। দেবতার বা দেবীমূর্তির ঠিকমত প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা অতি উচ্চস্তরের সাধকের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ পূজকের পক্ষে প্রক্রিয়া অপেক্ষা দেবদেবীর কৃপার উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ যথাসম্ভব ঠিকমত প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা দ্বারা পূজক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার যোগ্যতা অর্জন করেন।

উপচার-সমর্পণ

'উপ'শব্দের অর্থ সমীপে। 'উপ'পূর্বক 'চর্' ধাতু ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'চর্' ধাতুর অর্থ বিচরণ করা। কাজেই 'উপ'পূর্বক 'চর্' ধাতুর অর্থ যাহা আমাদের সম্মুখে বিচরণ করিতেছে অর্থাৎ শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি পঞ্চ-তন্মাত্রের প্রতীক হইল উপচার। আমরা যে সকল দ্রব্য ভোগ করি, ব্যবহার করি—সকল জিনিসই পূজার উপচার বা উপকরণ। যোগ্যতা অনুসারে সাধকগণ পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত হন, সেইরূপ উপচারেও শ্রেণীভেদ আছে।

সাধারণ লোক স্থূল ভোগের জিনিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট উপচার হইল পূজার স্থূল উপকরণ, যথা পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, পত্র, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানার্থোদক, পুনরাচমনীয় তাম্বুল ইত্যাদি। যাঁহারা উচ্চস্তরের সাধক, তাঁহাদের স্থূল উপচারের প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা মানস-পূজার মাধ্যমে বিভিন্ন মনোবৃত্তি দ্বারা পূজা সম্পাদন করেন। তাঁহাদের নিকট আসন হৃৎপদ্ম, শিরঃস্থ অধোমুখ সহস্রদল পদ্ম হইতে গলিত যে অমৃত, তাহাই পাদ্য। অর্ঘ্য—মন। আচমনীয়—উক্ত অমৃত। স্নানীয় জল—উক্ত অমৃত। বস্ত্র আকাশতত্ত্ব। গন্ধ—ক্ষিতিতত্ত্ব, পুষ্প – চিত্ত, (বুদ্ধি)। ধূপ—পঞ্চপ্রাণ, দীপ তেজস্তত্ত্ব, নৈবেদ্য—হৃদয়ের কল্পিত সুধা-সমুদ্র। যে ভাগ্যবান্ সাধক সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি ইষ্টে নিয়ত সমাহিত থাকেন, তিনি মানস-পূজার স্তরও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিয়ত আত্মাতে সমাহিত থাকেন কাজেই একমাত্র আত্মাই তাঁহার পূজার উপকরণ এবং আত্মাই তাঁহার ইষ্টদেবতা। জীব উপচারের ভোক্তা। শোধন করিয়া উপচার দেবতার পূজায় নিবেদন করা হয়। কাজেই দেবতা হইলেন—

নিবেদিত উপচারের মুখ্য ভোক্তা এবং জীবগণ হইল উপচারের গৌণ ভোক্তা। পূজার সময় আমরা দেবতা বা দেবী মূর্তিকে সুসজ্জিত করিয়া শোধিত উপচার নিবেদন করি। ব্রহ্মের প্রতীক হইলেন বিভিন্ন দেবতা, কাজেই পূজার সময় নিবেদিত উপচার ব্রহ্মকেই অর্পণ করা হয়।

প্রাচীন ঋষিগণ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তিকে সর্বব্যাপী বিশ্বাস করিতেন, শুধু বিশ্বাস নয়—সর্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন করিতেন। তিনি বিভিন্ন দেব-দেবীর মধ্য দিয়া আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন এবং আমাদের মঙ্গলের বিধান প্রতিনিয়ত করিতেছেন। এ-বিষয়ে এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে কিছু আলোচনা করিয়াছি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে নারায়ণী-স্তবে আমরা দেখিতে পাই দেবতাগণ জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন :

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ
আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে।

আমরা দেখিতে পাই—জীব জগৎ, সর্বভূতে ব্রহ্ম-দর্শনের ফলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য বলিয়াছিলেন, 'যদ্ যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্' ইত্যাদি। মাতৃসাধক রামপ্রসাদও গাইয়াছেন :

শয়নে প্রণাম-জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা-মারে।
যত শুন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে,
(মা যে) ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে—
(ওরে) আহার কর মনে কর
আহুতি দিই শ্যামা মারে।

উপরি-উক্ত আলোচনাতে তন্ত্রের দিক দিয়া সাধারণ-ভাবে দেব-দেবীর পূজায় উপচার-সমর্পণের তাৎপর্য আলোচনা করা হইল।

উচ্চস্তরের সাধক যখন জগন্মাতার লীলা-রহস্য দর্শন করিয়া প্রতিনিয়ত ইষ্টে সমাহিত অবস্থায় থাকেন, সেই সময় তাঁহার সকল কাজই ভগবদ্ধ্যানে ও জগন্মাতার পূজায় পর্যবসিত হয়। এই স্তরের সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়াও নিয়ত আত্মাতে সমাহিত থাকেন। এই স্তরের সাধকের বাহ্যপূজার কোন প্রয়োজন নাই। এই সকল ভাগ্যবান্ সাধকের নিকট লীলাচ্ছলে জগন্মাতা দ্রষ্টা, দৃশ্য, কর্ম ও কারণ-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। যথা :

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যংব্রহ্মকর্ম সমাধিনা।

উপরি-উক্ত শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই, যাহা দ্বারা অর্পণ করা হয় তাহা ব্রহ্ম, অর্পণের দ্রব্য ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-রূপ অগ্নিতে হোম করা হয়। এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা হবনকারী ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ব্রহ্মই সর্বব্যাপী এবং তিনি ভিন্ন অন্য কিছু নাই। পূর্বে আলোচিত আচার্য শঙ্করের উক্তি ও মাতৃসাধক রামপ্রসাদের সঙ্গীতের তাৎপর্য ঠিক একই বস্তু।

পূজা—পঞ্চোপচারে, দশোপচারে, ষোড়শ উপচারে এবং চতুঃষষ্টি উপচারে সম্পন্ন হইয়া থাকে ; শত সহস্র উপচারও সম্ভব। এ-বিষয়ে পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। প্রার্থনা ও প্রণাম বিষয়ে আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করা হইল।

প্রার্থনা ও প্রণাম

ভাগ্যবান্ সাধক উপচার-সমর্পণের পর ইষ্টের দর্শন লাভ করেন ও আনন্দে বিভোর হন। ইষ্টের বিচার যে নির্ভুল, তাহা তিনি নিজে অনুভব করেন। তিনি আরও অনুভব করেন, তাঁহার দয়া অসীম এবং তিনি সদা মঙ্গলময়। নিষ্কাম সাধক সাধারণতঃ এরূপেই সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ইষ্টের নিকট কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করেন না। তিনি ইষ্টের চরণে অচলা ভক্তি ও অনুরাগ যেন অক্ষুণ্ন থাকে—ইহাই প্রার্থনা করেন।

নিম্নে একটি বিখ্যাত প্রার্থনা মন্ত্র উদ্ধৃত হইল :

ওঁ অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্মএধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥
ইতি।

রাজেন্দ্রাণী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

রাজেন্দ্রাণী মা আমার, আজি তব নব-উদ্বোধনে
মন্দিরে মন্দিরে তোল রণ-বাদ্য তূর্যের নিনাদ,
সূর্য-সম্ভাবিতা উষা সংশয়-আঁধার নিরসনে
নিঃশেষ করিয়া দিক ভীরুতার বাদ-বিসম্বাদ।
কল্পারম্ভে সংকল্পের উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রপাঠ
ঘরে ঘরে খুলে দিক মোহ-নিদ্রা-নিরুদ্ধ কপাট।

কৈলাস-আবাসে তব মদগর্বী দানবের দল
অতন্দ্র প্রহরী নন্দী-ভৃঙ্গীরে কি করি সম্মোহিত ;
দুঃসাহসে উচ্ছৃঙ্খল তুলিছে উন্মত্ত কোলাহল
তারা কি জানে না তব দশহস্তে অস্ত্র অস্খলিত ?
ভীমা ভয়ঙ্করী তুমি স্বা-কাল অতীত বোধনে
জাগো তুমি মহাকালী, রণাঙ্গনে শত্রুর নিধনে।

অপরাজিতার অর্ঘ্যে অধিষ্ঠিত রাজীব চরণ,
হিমালয়-শিরোশোভা অভ্রভেদী সুবর্ণ-মুকুট,
অসংখ্য তারকাদীপ্ত মহাকাশ করিছে বরণ
তব কৃপালাভ-তরে প্রসারিত লক্ষ করপুট।
তোমার প্রসাদী-ফুলে ত্রিভুবন-বিজয়ী রাঘব
মৃত্যুঞ্জয় সে কবচে চিরশত্রু মানে পরাভব।

নিরুক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যা আগ্নেয় অক্ষরে দাও লিখে
চিত্তের বিভ্রান্তি আজ ঘুচে যাক প্রসন্ন হাসিতে,
জ্যোতির্ময়ী ধ্রুবজ্যোতি বিকীর্ণ হউক দিকে দিকে
আবির্ভূতা হও তুমি রণচণ্ডী অরাতি নাশিতে।
রাজেন্দ্রাণী মা আমার, জাগো জাগো এ সঙ্কটকালে
তব মহিমার দ্যুতি উদ্‌ভাসিয়া দিক্‌চক্রবালে।

নিবেদিতা

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

তীর্থ করি একদিন জন্মভূমি, শরতের শুচিস্নাত এমনি প্রভাতে,
জন্ম নিলে মহাশ্বেতা, স্বর্ণঝরা সিন্ধুতটে ধরণীর জ্যোতিষ্ক-সভাতে
নিঃশ্রেয়স-বাণীরে শুনাতে। মহীয়সী মার্গারেট! যাজক দুহিতা তুমি,
কেল্‌টিক-শোণিতে গড়া, আইরিশ বিপ্লবের পরিবেশে, এই দিনে চুমি
জন্ম-মৃত্তিকারে তব, আনন্দের অশ্রুসম স্যামুয়েল-পরিবারে এলে,
সপ্তর্ষি-মণ্ডল হ'তে নেমে এল দেবদূত, অগোচরে গেল দীপ জ্বেলে।
তাই আজি শরতের আগমনী-সুরে সুরে কানে আসে পদধ্বনি নব,
বিবেক-স্বামীর জন্ম-জয়ন্তীর সমারোহ-ক্ষণে, বাজে জয়-শঙ্খ তব।

সেদিন ভাবেনি কেহ সিন্ধু-পারাবারে হবে সেতু-বন্ধনের আয়োজন
কেন্দ্র করি তোমারে ভগিনি! পথে পথে অদ্বৈতের অমৃতের সত্যধন
বিলাইতে জনে জনে সেদিন এসেছে প্রভু সর্বধর্ম সমন্বয় করি—
'যত্র জীব তত্র শিব' শুনাতে সবারে বিশ্বে; তারি তরে চিরকাল ধরি
ছুটেছে কি সর্বজন অনন্তের পানে? শৈশবের খেলাঘরে স্বপ্নাবেশে
তুমি কি জেনেছ দূরে তোমার জীবন-কাব্য মহিমার গৌরীশৃঙ্গে এসে,
প্রতিটি প্রভাত-সন্ধ্যা আলোর তুলিতে এঁকে ক'রে যাবে পূর্ণ মনোরম,
দিব্যজ্যোতি দিবে আনি দূর করি সীমাহীন তমোরাশি! প্রচণ্ড নির্মম
যন্ত্র-সভ্যতার বৃদ্ধি-বিস্তারের পথ রুদ্ধ করি বিবেকানন্দের বাণী
শুনাইবে দিকে দিকে জীবনেরে করিতে নবীন আনন্দের ঊর্ধ্বস্তরে ঃ
আবির্ভাব লাগি তব ভারতের নারীশক্তি দিবারাত্রি ডাকিবে ঈশ্বরে!

তুমি হবে কালজয়ী দেবতার শুচিস্মিতা অর্ঘ্যসম চির-অনিন্দিতা,
বোধির অতীতালোকে ভূমার সন্ধান লভি তুমি হবে মানস-দুহিতা
স্বামীজীর নিবেদিতা, রামকৃষ্ণ-সারদার বিশ্বোত্তীর্ণ লীলা-উদ্‌গাতা,
নিখিলের মহত্তম মহাকাব্য-নায়কের আনুকূল্যে হবে লোকমাতা
কোনদিন করোনি কল্পনা। তুমি ছিলে সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্যানে রত,

কেদারবাহিনী-ধারা রুদ্ধ করি হৃদয়ের গঙ্গোত্রী-গুহায়। ব্যথাহত
সংসারের বিপর্যয়ে তুমি ছিলে লণ্ডনের একপ্রান্তে শবরীর সম
যেন কার প্রতীক্ষায়! তারি স্পর্শ পেয়ে কিগো কর্মভার নিলে সর্বোত্তম
হিন্দু-সভ্যতার আদর্শের অর্চনায় ছিলে শ্রান্তিহীন, জ্ঞানভক্তি লয়ে,
মন্ত্রসিদ্ধা হ'লে তপস্বিনী, পূর্বাকাশ-তীরে শুকতারাটির মতো হয়ে।

আত্মার বিদ্যুদ্দীপে বীর সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ লভি দেখেছিলে মায়া
মহামায়ারূপে আপনারে করেছ প্রকাশ ; ধরণীতে জাগে আলোছায়া
জন্মমৃত্যু মাঝখানে। যৌবন-মধ্যাহ্নে তব জীবনেরে দিয়ে গেলে ডালি,
ভারতের মুক্তি-তরে। উদগ্র সাধনা তব শ্মশানের বক্ষে চিতা জ্বালি।
ভক্তিবিশ্বাসের ধারা করেছ যে বহমান, রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা
কণ্ঠে বরি তপস্বিনী নিবেদিতা বৈরাগ্যের সাজায়েছ ত্যাগপুষ্প-ডালা
গুরুবন্দনার অনুরাগে। দৈবদত্ত মন্ত্রের সাধন তুমি আজীবন
ক'রে গেলে, শিক্ষা দিলে অগণিত মানুষেরে, নারীশক্তি করি উদ্বোধন,
গড়েছ যে প্রবুদ্ধ ভারত, জীবে সেবা করেছ যে শিবজ্ঞানে অবিরল।
দর্শনে মননে জ্ঞানে, ধ্যানে আর ধারণায় শুভকর্মে চিত্ত-শতদল
অহরহ ফুটেছে তোমার ; অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা তব ঃ বহ্নিবীজে উপাসনা
ক'রে গেছ মানুষের উজ্জীবন-তরে, স্বর্ণরেণু ক'রে গেছ ধূলিকণা।

অজ্ঞতার অন্ধকারে যারা ছিল অন্তঃপুরে অর্ধমৃত অশ্রুজলে ভাসি,
অত্যাচারে লাঞ্ছনায় অসহায় মৌন মূক, তাহাদের মুখে তুমি হাসি
ফুটায়েছ রাত্রিদিন, তোমার দরদী চিত্ত সর্বচিত্তে লভিয়াছে ঠাঁই,
তুমি আজ বহুদূরে জ্যোতির্ময়ী নিবেদিতা, শ্রদ্ধাভক্তি তোমারে জানাই।

'তব চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'আমরা মনে বদ্ধ, মনে মুক্ত।' কথাটা লাখ কথার এক কথা। মুক্তি আমরা সবাই চাই। ভূমার মধ্যে মুক্তি, অনন্তের মধ্যে মুক্তি। জেনে অথবা না জেনে বৃহতের মধ্যে এই মুক্তিকে অন্বেষণ করা কেন? কারণ 'ভূমৈব সুখম্'। ভূমার মধ্যে আমাদের প্রাণের আরাম, অসীমের মধ্যে আমাদের আত্মার তৃপ্তি। মানুষের চির-কালের স্বভাবই তো আনন্দের পিছনে ধাওয়া। দুঃখের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে স্বেচ্ছায় কামনা করা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। আনন্দকে চাই বলেই অনন্তকে আমরা এমন গভীর ক'রে কামনা করি। অল্পের মধ্যে আমাদের কখনই সুখ নেই। হ্যাভেলক এলিসের (Havelock Ellis) 'The New Spirit' বইখানির উপ-সংহারে লেখক এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন:

It is the infinite for which we hunger, and we ride gladly on every little wave that promises to bear us towards it. —আমাদের ক্ষুধা অসীমের জন্যে। যা-কিছুর মধ্যে এই অনন্তকে পাওয়ার সম্ভাবনা, তাকেই আমাদের চিত্ত সানন্দে আশ্রয় করে

অল্পের মধ্যে আমাদের সুখ নেই, সুখ ভূমার মধ্যে—পশ্চিমের আর একজন মনীষীর কণ্ঠেও এই ঋষিবাক্যেরই প্রতিধ্বনি। আমি রাসেলের (Bertrand Russel) কথা বলছি। 'Principles of Social Reconstruction'-এর শেষ অধ্যায়ে দেখতে পাচ্ছি:

The world has need of a Philosophy, or a religion, which will promote life. But in order to promote life, it is necessary to value something other than mere life. Life devoted only to life is animal, without any real human value, incapable of preserving men permanently from weariness and the feeling that all is vanity. If life is to be fully human, it must serve some end which seems, in some sense, outside human life, some end which is impersonal and above mankind, such as God or truth or beauty.—আমরা সবাই বাঁচিতে চাই বিপুল প্রাণের মধ্যে। প্রাণকে আমরা কে না কামনা করি? কিন্তু এই প্রাণের আস্বাদন শুধু জীবনধারণের একটা জান্তব ব্যাপারের মধ্যে নেই। কেবলমাত্র বাঁচার জন্যে বাঁচাতে সুখ কোথায়? জীবনকে আনন্দময় ক'রে তুলতে হ'লে এমন-কিছু চাই, যা সর্বধ্বংসী কালের করাল দংষ্ট্রাকে অতিক্রম ক'রে আছে, যা দুদিনে ফুরিয়ে যায় না, যা নিত্য। এই নিত্যের সংস্পর্শে এলে তবেই আমরা নিজেদের মধ্যে এমন একটা শক্তিকে এবং শাশ্বত শান্তিকে অনুভব করি, যাকে আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের কোন ব্যর্থতাই নষ্ট করতে পারে না। ঈশ্বর, সত্য অথবা সৌন্দর্য এমন কিছুকে আমাদের দরকার, যা নৈর্ব্যক্তিক, যা মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের সমস্ত জান্তব প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে আছে।

আমরা অনন্তের কাঙাল, কেবলমাত্র জৈব প্রয়োজন-তৃপ্তির তাগিদে বেঁচে থাকার মধ্যে জানোয়ারের সুখ থাকতে পারে, মানুষের নেই; এই সাদা কথাটা বুঝতে পারলে অনেক দুঃখের হাত থেকে সত্যিই আমরা বাঁচতে

পারি। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নায়ক শচীশের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি পরম জ্ঞানের কথা বলেছেন: 'তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ-কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।' অনুরূপ কথা আছে কবির 'Religion of Man'-এর মধ্যে: The abiding cause of all misery is not so much in the lack of life's furniture as in the obscurity of life's significance. 'অসতো মা সদ্গময়', Lead us from the unreal to reality—এ প্রার্থনা যাঁদের কণ্ঠ থেকে একদা উৎসারিত হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা। তাঁরা বুঝেছিলেন—যা সত্য, যা কালের নাগালের বাহিরে, যা চিরন্তন, তারই মধ্যে আমাদের যথার্থ আনন্দ। যম লোভনীয় অনেক কিছু দিয়ে নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করে-ছিলেন। নচিকেতা বললেন: রূপসী নারী, শতবর্ষ পরমায়ু, সসাগরা ধরণীর রাজমুকুট সমস্তই 'শ্বোভাবাঃ' অর্থাৎ কাল থাকবে কি থাকবে না। নচিকেতা জ্ঞানী ছিলেন বলেই প্রলোভনকে এমন ক'রে জয় করতে পারলেন। জ্ঞানের মূল কথাটি হ'ল আমরা জেনে বা না জেনে আনন্দকেই খুঁজছি আর এই আনন্দ এমনকিছুর মধ্যে যা দুদিনেই ফুরিয়ে যায় না, যার মধ্যে বাজছে অনন্তের সুর।

কিন্তু 'অনিত্যমসুখং লোকম্'—এই সত্যকে বুঝলেই কি আমরা প্রবৃত্তির বন্ধনকে কাটিয়ে উঠতে পারি? কামিনী, কাঞ্চন, খ্যাতি—এদের প্রতি আসক্তি আমাদের মজ্জাগত। মায়া দৈবী—শয়তানের সৃষ্টি নয়। 'যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।' এই জন্যে মানুষের চেষ্টায় মায়াকে অতিক্রম করা এমন দুঃসাধ্য! শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথা: 'বন্ধন আর মুক্তি দুয়ের কর্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ; আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত।'

এমন যে দৈবী মায়া—একে জয় করা সত্যিই কঠিন। এমন কাজ করা উচিত নয়—এই কর্তব্যবোধের বেত উঁচিয়ে উদ্দাম কোন প্রবৃত্তিকে শাসনে আনতে আমরা হিমসিম খেয়ে যাই। শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রবৃত্তিই জয়লাভ করে। নিজের সঙ্গে নিজের এই নিদারুণ সংগ্রামের একটা প্রাঞ্জল ছবি এঁকেছেন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক রোমাঁ রলাঁ তাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' (John Christopher) উপন্যাসে। যে বন্ধু ক্রিস্তফকে দুর্দিনের অন্ধকারে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা ক'রল, তারই পত্নীর সঙ্গে সে ব্যভিচারে লিপ্ত! দুঃসহ আত্মগ্লানিতে ভারাক্রান্ত ক্রিস্তফের জীবন! কিন্তু এমন শক্তি নেই যে, বন্ধুর গৃহ ত্যাগ ক'রে পালিয়ে যায়। প্রবৃত্তির ভারে বুদ্ধিও তার ভেঙে পড়বার মুখে। ইচ্ছার মধ্যেও কোন জোর নেই। হঠাৎ করুণা এসে তার ইচ্ছাশক্তির পঙ্গুত্ব ঘুচিয়ে দিলো। জানালা দিয়ে ক্রিস্তফ দেখলে বন্ধুপত্নী স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে চলেছে। কিন্তু ঝোড়ো কাকের মতো অ্যানার একী মূর্তি! গর্বিতা অ্যানার সোজা মেরুদণ্ড কে যেন নুইয়ে দিয়েছে! মাথা আগের মতো উন্নত নয়! গায়ের রঙ হলুদবর্ণ। সেই চেহারার দিকে চেয়ে ক্রিস্তফের মনে হ'ল: 'আমার কাছ থেকে ওকে বাঁচাব আমি।' মনে হতেই ক্রিস্তফের মনে পালিয়ে যাবার জোর এল। রাতের অন্ধকারে ক্রিস্তফ পালালো। পালিয়ে গিয়ে গভীর রাত্রে এক সরাইখানায় আশ্রয় নিল।

কিন্তু পালিয়েই কি নিস্তার আছে? সরাইখানায় বাকী রাত্রি ক্রিস্তফের মনকে জুড়ে রইল বন্ধুপত্নীর স্মৃতি। তার পরদিনও

মনের মধ্যে শুধু একই চিন্তা : অ্যানা, অ্যানা। দিন সন্ধ্যার দিকে যতই গড়িয়ে যেতে লাগলো, ক্রিস্তফের বিরহবেদনা ততই দুঃসহ হয়ে উঠল। অ্যানাকে হারিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব। ক্রিস্তফের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে!

রাতের অন্ধকারে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে ফিরে যায় বন্ধুর বাড়িতে প্রিয়তমার সঙ্গে মিলবার জন্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জড়তাকে কাটিয়ে উঠল। বুদ্ধিহারা সম্বিত ফিরে পেল। সর্বনাশের তীর থেকে মুক্তির মধ্যে ফিরে আসার সে কাহিনী এখানে বলবার প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট—নারী-মায়াকে অতিক্রম করা বড় কঠিন। কাঞ্চন এবং খ্যাতির কামনাকেও। 'মেছুনী ফুলের বিছানায় ঘুমাতে পারে না, আঁশটে গন্ধ তার চাই।' ঠাকুরের এ উপমার জুড়ি নেই। অভ্যাস এমনই জিনিস। 'মুখ দিয়ে রক্ত দর্ দর্ ক'রে পড়ে; তবুও সেই কাঁটা-ঘাসই খাবে, ছাড়বে না।' উটের দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটা চমৎকার উপমা।

ঈশ্বরের মধ্যে আমাদের যে অনির্বচনীয় আনন্দ রয়েছে—সে আনন্দ কোন মতেই সহজলভ্য নয়। প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্তির মধ্যে আমাদের যে আনন্দ—তাকে জয় ক'রে নিতে হয় সাধনার দ্বারা। সে আনন্দ কেবল তপস্যার দ্বারাই লভ্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গীতাভাষ্যের মধ্যে লিখেছেন : This happiness does not depend on outward things, but on ourselves alone and on the flowering of what is best and most inward within us. But it is not at first our normal possession; it has to be conquered by self-discipline, a labour of the soul, a high and arduous endeavour.

এই তপস্যার কথা ঠাকুরও কি বারংবার বলেননি? "শুধু 'তিনি আছেন' ব'লে বসে থাকলে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চার ফেলো, গভীর জল থেকে মাছ আসবে আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে।"

'তখন আনন্দ হবে।' প্রথমটায় কোন আনন্দ নেই। অজগর সাপের মতো যে-সংসার এতকাল পাকে পাকে জড়িয়ে আছে জীবনকে, তাকে ত্যাগ ক'রব বললেই কি ত্যাগ করা যায়? অথচ সে আনন্দলোকে পৌঁছাতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'সাধন চাই; নির্জনে বাস চাই।' কিন্তু নির্জনে বাস তো সহজ নয়।

'যারে ফেলিয়ে এসেছি, মনে করি, তারে
ফিরে দেখে আসি শেষবার,
ওই কাঁদিছে সে যেন এলায়ে আকুল
কেশভার।
যারা গৃহছায়ে বসি' সজল নয়ন
মুখ মনে পড়ে সে-সবার।'*

ঈশ্বরের আনন্দলোকে উপনীত হবার পথে আসল মারাত্মক বাধা মানসিক বাধা। চিত্তকে ঈশ্বরচিন্তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে পারলে তবেই তো সেই অনির্বচনীয় আনন্দের অধিকারী হওয়া যাবে। কিন্তু

'বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
এসো এসো সুরে করুণ মিনতি-মাখা।'*

শ্রীরামকৃষ্ণ তো আমাদের কখনও বলেননি গাছের মতো মাটি আঁকড়ে স্থাণু হয়ে থাকতে। তাঁর কণ্ঠে 'এগিয়ে পড়'—এই বাণীই আমরা শুনেছি। কিন্তু এগিয়ে পড়তে গেলেই পিছনে ফেলে-আসা প্রিয়জনেরা

* রবীন্দ্রনাথ

'দেয় চরণে বাঁধিয়া প্রেম-বাহুঘেরা
অশ্রুকোমল শিকলি।'
তখন 'হায় মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত,
মিছে মনে হয় সকলি।'

বেজির লেজে যে থান ইঁট বাঁধা! তাই কুলুঙ্গীতে উঠতে চায়, কিন্তু পড়ে পড়ে যায়।—উপমা শ্রীরামকৃষ্ণের।

একদিকে পথের ডাক আর একদিকে ঘরের ডাক—এ দুয়ের দ্বন্দ্বে প্রথমটা মনে হয়—জীবন যায় যায়; যাদের ফেলে এসেছি তাদের ছেড়ে থাকতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। 'পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে, মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে।' কিন্তু পিছনে ফেরার বাসনাকে শেষ পর্যন্ত যদি জয় করা যায়, তখন ঝড়ের শেষে নিশ্চয়ই শরতের সোনালি প্রভাত, বিষের জ্বালার অবসান অমৃতকে আস্বাদ করার আনন্দে, সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুল ফোটার সার্থকতা।

মোটকথা চালাকির দ্বারা কিছু হবার জো নেই। 'তুঁহু তুঁহু ব'লে তবেই নিস্তার, তবেই মুক্তি।' মাথাটাকে তাঁর চরণতলে নত ক'রে দিতে হবে, সকল অহঙ্কার ডুবিয়ে দিতে হবে চোখের জলে। নিরহঙ্কার হ'তে পারলে তবেই এই জন্মেই জন্মান্তর! কিন্তু জীবনে এই সত্যের উপলব্ধি আসে অনেক ঘা খেয়ে। বাছুর প্রথমটায় 'হাম্বা হাম্বা' করে। অবশেষে তার নাড়িভুঁড়িগুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার হয়। তখন ধুনবার সময় 'তুহুঁ, তুহুঁ' বলে। লজ্জা, দুঃখ, ক্ষোভ এরা লাঙ্গলের ফালের মতো। হৃদয়কে দীর্ণবিদীর্ণ ক'রে দেয়। তখন ভাঙা রক্তাক্ত হৃদয়ের সেই রন্ধ্রপথে আসে নবজীবনের প্রবাহ। পোড়ো জমি ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়—নব বসন্তের পুষ্পসম্ভারে।

র‍্যঁলার 'জঁা ক্রিস্তফে'র নায়ক ব্যভিচারের পঙ্কস্নানের মধ্য দিয়ে গিয়ে যখন একেবারে ভেঙে পড়বার মুখে, তার জীবন যখন বজ্রাহত তরুর মতো, দিগন্তে যখন কোন আশ্রয় নেই, আলো নেই, আশা নেই, তখনই সে বুঝতে পারলো মানুষের অহঙ্কার কত শূন্যগর্ভ; নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা নিয়ে গর্ব করবার মতো এমন মূঢ়তা আর নেই। আঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রিস্তফের চৈতন্যোদয়ের বর্ণনা যেখানে আছে, সেখানে লেখক মন্তব্য করেছেন: He understood now. He understood the vanity of his pride, the vanity of human pride, under the terrible hand of the forces which moves the worlds. No man is surely master of himself.—সেই পরমাশক্তি, যা অনন্তশূন্যে লক্ষকোটি সূর্য-তারা-চাঁদকে অবহেলায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—ঐ শক্তির কাছে মানুষের গর্ব করা নিতান্তই বালসুলভ চপলতা। এই উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিস্তফ পুরাতন আমিটাকে বর্জন ক'রে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন ক'রে দিয়েছে। He had left Christopher and gone over to God.

কিন্তু এ-কথা সত্যি নয় যে, নিরহঙ্কার হওয়া মানে নিস্তেজ হওয়া, ঈশ্বরই সব ক'রে দেবেন ব'লে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা। ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা মানে এমন নয় যে, 'চিঁড়ের ফলার' হয়ে যেতে হবে; ঠাকুর যেমন বলতেন, 'আঁট নেই, জোর নেই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ করছে।' ঠাকুর সেই চাষীর উপমা দিয়ে বার বার বলতেন: 'খুব রোক না হ'লে চাষীর যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বরলাভ হয় না।' কল্যাণের পথে—সে কল্যাণ ঐহিক হোক অথবা পারলৌকিক হোক—হচ্ছে, হবে এই গয়ংগচ্ছ ভাবের মতো সাংঘাতিক শত্রু আর নেই।

এ-কথা যেন মনে না করি, ভাগবত-শক্তি আমার চাহিদামাত্র সব আমার জন্যে ক'রে

দেবেন; তাঁর করুণার ধারা নেমে আসার জন্যে আমার দিক দিয়ে যেন কোন শর্ত পালনের দরকার নেই! আমি যদি আমার এক দিকটাকে খুলে রাখি সত্যের দিকে এবং আর এক দিকটায় মনের দরজা-জানালাগুলি দিয়ে ভিতরে আসতে দিই যত রাজ্যের পঙ্কিল কামনাকে—ঈশ্বরের করুণা নিশ্চয়ই পাব না। মন্দির সদাসর্বদা রাখতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যদি হৃদয়-আসনে তাঁকে বসাতে চাই। ঈশ্বর ঠিকই আমার সমস্ত বোঝা তুলে নেবেন—আমি যদি শুধু একটা কাজ করতে পারি। কি সেই কাজ? ষোল আনা মন দিয়ে তাঁর স্মরণ আর মনন। অনন্যমনা হয়ে তাঁকে চিন্তা করতে পারলে তিনি এসে আমাদের বোঝা নিশ্চয়ই তুলে নেন—'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন: 'তাঁকে চিন্তা যত করবে ততই সংসারে সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে।' সাধন-ভজন হচ্ছে মনটাকে তাঁতে লাগিয়ে রাখা। নির্জনবাসে মন বিক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা কম। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ 'নির্জনে বাস চাই'—এই কথা বারংবার বলতেন।

কামিনী-কাঞ্চনে যে আসক্তি যায় না—এর মূলে তো মানসিক বাধা। মন যদি তাঁর পাদপদ্মে লগ্ন থাকে, বিষয়-চিন্তা পাত্তাই পাবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, 'বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তা হ'লে আর অন্ধকারে যায় না।' উইলিয়াম জেমস্ তাঁর 'The Will' প্রবন্ধে ঠিকই বলেছেন: The whole drama is a mental drama. The whole difficulty is a mental difficulty, a difficulty with an object of our thought. ধ্যেয় বস্তুর চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই মনের মধ্যে ঠাঁই পাবে না। 'তুমি ছাড়া আর কেহ না রবে।' 'দুস্‌রা না কোঈ'।

মনের সামনে ধ্যেয় বস্তুর চিন্তাকে অনির্বাণ রাখতে হবে—যেন নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখা। এই হচ্ছে সাধন, এই হচ্ছে সিদ্ধি। জেমসের ভাষায়: Consent to the ideas undivided presence, this is effort's sole achievement. সাধনার সিদ্ধি ধ্যেয় বস্তুর চিন্তাকে নিয়ত চেতনায় দেদীপ্যমান রাখা। জেমস্ বলছেন: To sustain a representation, to think, is, in short, the only moral act, for the impulsive and the obstructed, for sane and lunatics alike.—দীর্ঘকাল ধরে একটা ধারণাকে মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারা, অনেকক্ষণ ধরে একটা বিষয় ভাবতে পারা—এই হচ্ছে একমাত্র নৈতিক কাজ—পাগল এবং প্রকৃতিস্থ সকলের পক্ষেই। 'The Imitation of Christ'-এর লেখক Thomas a Kempis যেমন বলেছেন: আগুনের মধ্যে লোহা রাখলে সে লোহা তেতে লাল হয়ে ওঠে। মরচে তাতে থাকতেই পারে না। তেমনি যে মানুষ ঈশ্বরে সমস্ত মন সঁপে দিয়েছে, তার সমস্ত জড়তা চলে যায়, সে নূতন মানুষে রূপান্তরিত হয়।

প্রথম শ্রেণীর সমস্ত সাধকের, সমস্ত দার্শনিকের একই কথা অর্থাৎ 'অস্বাভাবিক অলৌকিক কিছু কখনো খুঁজো না, উহাদিগকে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়েও যেন স্পর্শ ক'রো না—তোমাদের আত্মা দিবারাত্র অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় তোমাদের হৃদয়-সিংহাসনবাসী সেই প্রিয়তমের পাদপদ্মে গিয়ে সংলগ্ন হ'তে থাকুক। বাকি যা কিছু অর্থাৎ দেহ ও অন্য যা কিছু তাদের যা হবার হোকগে।' (পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ), নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো তাঁর পাদপদ্মে মনকে যুক্ত রাখতে পারা—তা হলেই কেল্লা ফতে। কর্ম করতে হবে, ভিতরের এবং বাহিরের সমস্ত বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে তাঁকে নিয়ত চেতনায় রেখে। 'মামনুস্মর যুধ্য চ'। নিত্যাভিযুক্তানাং—to be at every moment in union with Him. (Aurobindo)—এই হ'ল সাধনার প্রথম এবং শেষ কথা। কাপড় রাঙানো সহজ; তাঁর রঙে মনকে রাঙানোই শক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার এই মন-রাঙানোর কথাই ব'লে গেছেন। The whole drama is a mental drama.

আরতি নয়, অরাতি-জয়

শ্রীনবগোপাল সিংহ

থামিয়ে তোদের মিষ্টি বাঁশী, অট্টহাসি শোন্ রে মা'র,
ঢাকের রবে ঢাকিসনে আর ক্ষিপ্ত অসির ঝনৎকার।
মায়ের তূণে অস্ত্র কি কি—
গুপ্ত আছে দেখিসনি কি ?
এই তো রণরঙ্গিণী মা'র সত্যিকারের অলঙ্কার।

মায়ের পূজায় দেখাসনে আর বিজলী-বাতির ঝলকানি,
দেখ্‌না কেমন ঝিলিক হানে মা'র হাতে ত্রিশূলখানি ?
ত্রিনয়নে বহ্নি জ্বলে,
দৃপ্ত পদে অসুর দলে
এ রূপ দেখে সংজ্ঞা হারায় শঙ্কাহরণ শূলপাণি।

দশ হাতে যার দশ প্রহরণ, ভুজেতে ভুজঙ্গ যার,
সিংহ যাহার অঙ্গ বহে, এই কি বিধি তার পূজার ?
শক্তি যে চাই শক্তি পাশে,
কর রে পূজা এ বিশ্বাসে
দুর্বলেরই অশ্রুতে কি মন গলে বীরাঙ্গনার ?

পুষ্পে, ফলে, বিল্বদলে গলবে না রে মায়ের প্রাণ,
রক্ত জবার চেয়ে বরং রক্তে-ডোবা পদ্ম আন।
এ নহে দুর্বলের ত্রাতা,
এ মাতা যে বীরের মাতা,
মায়ের কৃপা লাভ করে যে সত্যিকারের শক্তিমান্।

গৃহাঙ্গণে এবারে নয়, রণাঙ্গনে নামবে মা,
মণ্ডপেতে মন্ত্র জ'পে মায়ের পূজা জমবে না।
প্রদীপে মা'র আরতি নয়,
অস্ত্রে এবার অরাতি-জয়,
শক্তিপূজায় শক্তি শুধু ভক্তিতে মা গলবে না।

সাংখ্য- ও যোগ-দর্শন

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

আস্তিক [বেদের প্রামাণ্য-স্বীকর্তৃ] দর্শনের মধ্যে ছয়টি দর্শন প্রাচ্যদর্শনে প্রসিদ্ধ। যথা: সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত। এই ছয়টি দর্শনের মধ্যে পূর্বমীমাংসা ব্যতীত অপর পাঁচটি দর্শনের মূলই প্রধানতঃ উপনিষৎ। ইহাদের মধ্যে সাংখ্য ও যোগ; ন্যায় ও বৈশেষিক এবং পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত ইহাদের দুই দুইটিকে সমান তন্ত্র বলে। অর্থাৎ সাংখ্য ও যোগ দর্শনের প্রমাণ ও প্রমেয়ের মধ্যে বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। এইরূপ ন্যায় ও বৈশেষিকের মধ্যে সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। মীমাংসা ও বেদান্তের মধ্যে প্রধানভাবে বেদোপজীব্যত্ব রূপ সাদৃশ্য আছে।

যদিও উক্ত ছয়টি দর্শনে মুক্তির স্বরূপ ও তাহার উপায়বিষয়ে মতভেদ বর্তমান, তথাপি মুক্তিই সকল দর্শনের চরম লক্ষ্য। কাহারও কাহারও মতে বৈশেষিক দর্শন প্রাচীনতম। আবার অনেকের মতে সাংখ্যদর্শনই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। যোগদর্শন অপেক্ষা সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনত্ব অধিকাংশ বিদ্বানের মত। কিন্তু যোগসূত্রভাষ্যের তত্ত্ববৈশারদী ও বার্তিক প্রভৃতি ব্যাখ্যা দেখিলে যোগদর্শনেরই প্রাচীনত্ব বুঝা যায়। 'হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।' (যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য) অর্থাৎ পুরাতন হিরণ্যগর্ভই যোগের বক্তা, অন্য কেহ নহে। যাহা হউক দেবহূতির পুত্র আদি-বিদ্বান্ কপিলই মনুষ্যলোকে প্রথমে সাংখ্য-শাস্ত্রের উপদেশ দেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে —মহামুনি কপিল ভগবানের অবতার। তিনি জ্ঞানাদিসম্পন্ন হইয়াই কর্দমের ঔরসে দেবহূতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ-পূর্বক প্রথমে স্বীয় জননীকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন। অবশ্য ভাগবতে যে সাংখ্যতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের মতভেদ বিদ্যমান।

বর্তমানে প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের দুইটি মূল গ্রন্থ বিদ্যমান। একটি ঈশ্বরকৃষ্ণ-বিরচিত **সাংখ্যকারিকা** আর একটি **সাংখ্য-প্রবচনসূত্র**। অনেকে বলেন সাংখ্যপ্রবচন-সূত্রগ্রন্থটি কপিলসূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে উহা কপিলের রচিত নহে। তাহার কারণ উক্ত সূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, 'সাংখ্য-শাস্ত্রটি কালরূপী অর্কের দ্বারা ভক্ষিত, তাহা আমি নিজ বাক্যের দ্বারা পূরণ করিতেছি।' আরও কথা এই যে, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার শঙ্কর সাংখ্যমত-খণ্ডনে সাংখ্যকারিকাকেই অবলম্বন করিয়াছেন, কোথাও সাংখ্যসূত্রের উল্লেখ করেন নাই। ষড়্‌দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যকারিকারই টীকা (তত্ত্বকৌমুদী) করিয়াছেন, সাংখ্যসূত্রের টীকা করেন নাই। শঙ্করাচার্যের পরম-গুরু গৌড়পাদও সাংখ্যকারিকার ভাষ্য করিয়াছেন। অতএব সাংখ্যসূত্রটি বিজ্ঞান-ভিক্ষুরই কল্পিত ইত্যাদি। অপরপক্ষে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন—এই সাংখ্যপ্রবচনসূত্রই সাক্ষাৎ কপিলকৃত বলিয়া প্রামাণিক। সাংখ্যকারিকাটি ঈশ্বরকৃষ্ণের রচিত—ইহা সর্ববাদিসম্মত। সুতরাং সাংখ্যসূত্রই সাংখ্য-দর্শনের মূল।

আমরা এই বিবাদে কোন পক্ষ-বিশেষকে

অবলম্বন না করিয়া উক্ত উভয়গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া সাংখ্যের পদার্থগুলি সংক্ষেপে বলিয়া যাইব। বর্তমানে সাংখ্যদর্শনে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রচলিত। যথা:

১। ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত সাংখ্যকারিকার গৌড়পাদভাষ্য।

২। ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত সাংখ্যকারিকার মাঠরবৃত্তি।

৩। ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত সাংখ্যকারিকার বাচস্পতিকৃত তত্ত্বকৌমুদী।

৪। উক্ত সাংখ্যকারিকা অবলম্বনে যুক্তিদীপিকা নামক টীকা। (এই ব্যাখ্যা প্রাচীন, গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না।)

৫। উক্ত সাংখ্যকারিকার শঙ্করাচার্য-কৃত জয়মঙ্গলা টীকা। (অবশ্য এই শঙ্করাচার্য মূল শঙ্করাচার্য কিনা নিশ্চয় নাই।)

৬। বাচস্পতি-কৃত তত্ত্বকৌমুদীর উপর তারানাথ তর্কবাচস্পতি-কৃত কৌমুদীবৃত্তি।

৭। তত্ত্বকৌমুদীর উপর বালরাম উদাসীন-কৃত বিদ্বত্তোষিণী টীকা।

৮। তত্ত্বকৌমুদীর উপর কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন-কৃত আবরণবারিণী টীকা।

৯। তত্ত্বকৌমুদীর উপর পঞ্চানন তর্করত্ন-কৃত পূর্ণিমা টীকা।

তত্ত্বকৌমুদীর উপর বংশীবদন-কৃত টীকা ইত্যাদি।

১১। সাংখ্যসূত্র বা কপিলসূত্রের অনিরুদ্ধভট্ট-কৃত সাংখ্যসূত্রবৃত্তি।

১২। সাংখ্যসূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য।

১৩। গৌড়পাদভাষ্যের নারায়ণ-কৃত চন্দ্রিকা।

১৪। সাংখ্যসার—বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত স্বতন্ত্র গ্রন্থ।

১৫। সাংখ্যতত্ত্বালোক— হরিহরানন্দ আরণ্যক-কৃত স্বতন্ত্র গ্রন্থ।

এতদ্ব্যতীত বর্তমানে অন্যান্য বহু টীকা-গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। যোগদর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থের মধ্যে—

১। পতঞ্জলি কৃত সূত্র।

২। ব্যাস-কৃত উক্ত সূত্রের ভাষ্য।

৩। বাচস্পতি-কৃত ব্যাসভাষ্যের তত্ত্ববৈশারদী নামক টীকা।

৪। বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ব্যাসভাষ্যের যোগবার্তিক

৫। রামানন্দ সরস্বতী-কৃত যোগমণিপ্রভা।

৬। ভোজরাজ-কৃত রাজমার্তণ্ড বা ভোজবৃত্তি।

৭। বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত স্বতন্ত্র যোগসারসংগ্রহ।

৮। নাগেশভট্ট-কৃত সূত্রভাষ্যবৃত্তি নামক ব্যাখ্যা।

৯। বালরাম উদাসীন-কৃত তত্ত্ববৈশারদীর অল্পবিবরণ।

১০। শঙ্করাচার্য-কৃত ভাষ্যবিবরণ।

১১। রাঘবানন্দ-কৃত তত্ত্ববৈশারদীর পাতঞ্জলরহস্য।

১২। হরিহরানন্দ আরণ্যক-কৃত ভাষ্যের ভাস্বতী টীকা।

১৩। হরিহরানন্দ আরণ্যক-কৃত সটীক যোগকারিকা (স্বতন্ত্র)।

১৪। অনন্ত-রচিত যোগচন্দ্রিকা।

১৫। আনন্দশিষ্য-কৃত যোগসুধাকর।

১৬। উদয়শঙ্কর-কৃত যোগবৃত্তিসংগ্রহ।

১৭। উমাপতি ত্রিপাঠী-কৃত যোগসূত্রবৃত্তি।

১৮। ক্ষেমানন্দ দীক্ষিত-কৃত ন্যায়রত্নাকর।

১৯। গণেশ দীক্ষিত-কৃত পাতঞ্জলবৃত্তি।

২০। জ্ঞানানন্দ-কৃত যোগসূত্রবৃত্তি।

২১। নারায়ণভিক্ষু-কৃত যোগসূত্র-গূঢ়ার্থ-দ্যোতিকা।

২২। ভবদেব-কৃত পাতঞ্জলীয় অভিনব-ভাষ্য।

২৩। ভবদেব কৃত যোগসূত্রবৃত্তি-টিপ্পনী।

২৪। মহাদেব-প্রণীত যোগসূত্রবৃত্তি।

২৫। রামানুজ-কৃত যোগসূত্রভাষ্য।

২৬। বৃন্দাবনশুক্ল-রচিত যোগসূত্রবৃত্তি।

২৭। শিবশঙ্কর-কৃত যোগবৃত্তি।

২৮। সদাশিব-কৃত পাতঞ্জলসূত্রবৃত্তি।

২৯। শ্রীধরানন্দ-কৃত পাতঞ্জলরহস্যপ্রকাশ।

৩০। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য—পৃথক্ প্রাচীন গ্রন্থ।

এতদ্ব্যতীত বহু প্রাচীন স্বতন্ত্র গ্রন্থ—যেমন শিবসংহিতা, যোগরহস্য, যোগোপদেশ ইত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান এবং বর্তমানে যোগদর্শন অবলম্বনে বহু টীকাদি-গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। এই যোগদর্শনের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সাংখ্য-দর্শন জানা আবশ্যক। সাংখ্যদর্শনের সহিত যোগদর্শনের অনেকাংশে মিল রহিয়াছে।

সাংখ্যদর্শনে—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই তিনটি প্রমাণই স্বীকৃত।

যোগদর্শনেও ঐ তিনটি প্রমাণ।

সাংখ্য ও যোগ উভয়েই বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রমাণ এবং চিৎপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিবৃত্তি অথবা বুদ্ধিবৃত্ত্যু-পরক্ত চৈতন্যকে প্রমা বলে।

এই জন্য উভয়মতে ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ অনধিগত অবাধিত অসন্দিগ্ধ ঘটাদি বিষয়াকার অপ্রকাশমান বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও চিৎপ্রকাশমান তাদৃশ বৃত্তিকে প্রমা বলে।

এইরূপ ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান-জন্য বহ্ন্যাদি অনুমেয়াকার অপ্রকাশমান বুদ্ধিবৃত্তিকে অনুমান প্রমাণ এবং প্রকাশমান তাদৃশ বৃত্তিকে অনুমিতি প্রমা বলে।

দোষবান্ পুরুষের অনুচ্চারিত বাক্য-জন্য তদর্থবিষয়ক অপ্রকাশমান বুদ্ধিবৃত্তিকে আগম প্রমাণ ও প্রকাশমান তাদৃশবৃত্তিকে শাব্দ প্রমা বলে।

সাংখ্যমতে ২৫টি প্রমেয়। যথা: মূল-প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত, মন ও দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ স্থূলভূত ও পুরুষ। পুরুষ বলিতে আত্মা বা জীবাত্মা বুঝিতে হইবে। সাংখ্যমতে জীবাত্মাতিরিক্ত নিত্য ঈশ্বর বা পরমাত্মা অসিদ্ধ। এইজন্য কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বর সাংখ্যবাদ বলে। অবশ্য বিজ্ঞানভিক্ষু নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। সাংখ্যমতে জন্য ঈশ্বর স্বীকার করা হয়। যাঁহারা এই জন্মে উপাসনাদি দ্বারা বিশেষ শক্তি লাভ করেন, তাঁহারাই পরজন্মে ঐশ্বর্যসম্পন্ন হইয়া আবির্ভূত হন। তাঁহাদিগকে হিরণ্যগর্ভ, কল্পনিয়ামক বা আধিকারিক পুরুষ বলে। তাঁহাদের মধ্যে সকলের শক্তি সমান নয়। সাংখ্যমতে জীবাত্মা অনন্ত; প্রত্যেক শরীরভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন। এক আত্মা হইলে একজনের জন্ম বা মৃত্যুতে সকলের জন্ম বা মৃত্যুর আপত্তি হইবে। একজন প্রবৃত্ত হইলে সকলের প্রবৃত্তি ও একজন নিবৃত্ত হইলে সকলের নিবৃত্তির প্রসঙ্গ হইবে। পৃথিবীতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দেখা যায়। সেই জন্য প্রত্যেক শরীরভেদে আত্মার ভেদ অবশ্য স্বীকার্য। এই পুরুষ বা আত্মা আনন্দ-স্বরূপ নহে, কিন্তু নিত্য ও চৈতন্যস্বরূপ। আনন্দ বা সুখ ও দুঃখাদি প্রকৃতির ধর্ম। পুরুষ নির্বিকার, কূটস্থ, নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ। এইজন্য জগৎসৃষ্টিকার্যে পুরুষ কারণ নহে। প্রকৃতিই পুরুষের সন্নিধান-মাত্রে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করে। পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী হইলে পুরুষের নিত্যতা ও প্রকৃতির নিত্যতা-

বশতঃ সর্বদা সৃষ্টি হউক অর্থাৎ প্রলয় না হউক —এই আপত্তি হইতে পারে না। প্রকৃতির কোন স্বার্থ নাই, কিন্তু পুরুষের জন্যই সে প্রবৃত্তিমতী হয়। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গরূপ প্রয়োজন সম্পাদন করাই প্রকৃতির কার্য। এইহেতু প্রকৃতি একজন পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সম্পাদন করিয়া যেমন সেই পুরুষকে আর ভোগ করায় না, সেইরূপ পুরুষের বা জীবের ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্ট-বশতই প্রকৃতি পুরুষের জন্ম, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সম্পাদন করে। এই অদৃষ্ট বা ধর্মাধর্মরূপ সংযোগই প্রকৃতির সৃষ্টির নিমিত্ত। সকল জীবের ধর্মাধর্মরূপ কর্ম যখন ভোগকার্যে শ্রান্ত হইয়া কিছুকাল বিশ্রামোন্মুখ হয়, তখনই প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য হইতে বিরত হইয়া সাম্যাবস্থারূপ প্রলয় ঘটায়। প্রকৃতির সাম্যাবস্থাই প্রলয় ও বৈষম্যাবস্থাই সৃষ্টি। এই প্রকৃতি এক, পরিণামী, নিত্য, অচেতন, স্বতন্ত্র। বেদান্তমতের ন্যায় ইহা ব্রহ্মাশ্রিত পরতন্ত্র নহে।

এক মহাপ্রলয়ের অবসানে অদৃষ্টবান্ হিরণ্যগর্ভাদিরূপ পুরুষের অথবা অন্য ব্রহ্মাণ্ড-স্থিত অদৃষ্টবান্ পুরুষের সংযোগে প্রকৃতির ক্ষোভ হয়। তখন প্রকৃতি মহৎ তত্ত্বরূপে পরিণত হয়। এই মহৎ বা বুদ্ধিই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। ক্রমে মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র সৃষ্ট হয়। পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চভূত সৃষ্ট হয়। পরে তাহা হইতে ভূরাদি লোক, জীব-শরীর, খাদ্য পানীয় ইত্যাদি সৃষ্ট হয়। সাংখ্যের এই পঞ্চবিংশতি প্রমেয়কেই তত্ত্ব বা পদার্থ বলে। সুতরাং সাংখ্য পঞ্চবিংশতিতত্ত্ববাদী। সাংখ্যেরা বলেন, ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু বুদ্ধিমান্ বা বিবেকী ব্যক্তির প্রবৃত্তি স্বার্থবশতঃ বা করুণাবশতঃ হইয়া থাকে। এই দুই হেতু ছাড়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অন্যপ্রকারে প্রবৃত্তি হয় না। ঈশ্বর নিজের স্বার্থের জন্য জগৎ সৃষ্টি করেন—ইহা বলা যায় না। কারণ ঈশ্বর পরিপূর্ণ, আপ্তকাম, তাঁহার কোন স্বার্থ নাই। তাঁহার স্বার্থ থাকিলে তিনি আর ঈশ্বর হইতে পারেন না। আর জীবের প্রতি করুণাবশতঃ তিনি সৃষ্টি করেন—ইহাও হইতে পারে না। যেহেতু ঈশ্বর যখন স্বতন্ত্র তখন করুণাবশতঃ সৃষ্টি করিলে সকল জীবকে তিনি সুখীই সৃষ্টি করিতেন, দুঃখী সৃষ্টি করিতেন না। অথচ জগতে কত বৈষম্য দেখা যাইতেছে। সুতরাং ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ সিদ্ধ হইতে পারে না। অচেতন প্রকৃতি জীবের পাপ পুণ্য কর্মকে অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করে বলিয়া জগতে সুখী ও দুঃখী জীব সম্ভব হইতে পারে। প্রকৃতির জড়ত্ববশতঃ ঈশ্বর-পক্ষের দোষের আপত্তি হয় না।

গুরুর নিকট হইতে এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, মননের দ্বারা আত্মা ও অনাত্মার বিবেক অবধারণপূর্বক নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান ও সমাধির অভ্যাসের দ্বারা আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিলেই জীবের মুক্তি সম্পন্ন হয়। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক বা অবিদ্যাই বন্ধনের মূল কারণ। এই অবিদ্যা হইতেই রাগদ্বেষাদিবশতঃ জীব কর্ম করে। কর্মের ফলে জন্ম হয়। জন্মিলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। এই দুঃখই অর্থাৎ দুঃখের সম্বন্ধই পুরুষের বন্ধন। এই দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা তিরোভাবই সাংখ্যমতে মুক্তির স্বরূপ। দুঃখ বুদ্ধির ধর্ম, পুরুষের নহে। সুতরাং দুঃখের নিবৃত্তি বা তিরোভাবও বুদ্ধির ধর্ম। ফলতঃ বন্ধন বা মুক্তি বুদ্ধিরই ধর্ম। পুরুষ কূটস্থ, নির্বিকার

চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু বুদ্ধি দর্পণের মতো স্বচ্ছ বলিয়া পুরুষের সন্নিধানে বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। চেতনের প্রতিবিম্ব চেতনের মতো হয়। তাহার ফলে বুদ্ধির কর্তৃত্ব, সুখ দুঃখ প্রভৃতি ধর্ম প্রতিবিম্ব দ্বারা পুরুষে আরোপিত হয়। সেইজন্য পুরুষ নিজেকে সুখী, দুঃখী, বদ্ধ ইত্যাদি মনে করে—আর বুদ্ধি নিজেকে চেতন মনে করে। আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে অর্থাৎ আমি চৈতন্যস্বরূপ; আমি কর্তা নহি, আমাতে ক্রিয়া নাই—আমি প্রকৃতি বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন এইরূপ বিবেক সাক্ষাৎকার হইলে অবিবেক নিবৃত্ত হইয়া যায়। অবিবেক নিবৃত্ত হইলে বুদ্ধি প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। তখন আর বুদ্ধির অভাবে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে না। ফলতঃ পুরুষ স্বরূপে স্থিত হয়েন। অবশ্য এই আত্মসাক্ষাৎকারও বুদ্ধিরই বৃত্তি। বুদ্ধি লয় হইয়া গেলে ঐ সাক্ষাৎকাররূপ বৃত্তিও নষ্ট হইয়া যায়। তখন পুরুষ যাহা, তাহাই থাকেন। বুদ্ধি লীন হইলে শরীরও প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। তখন পুরুষের কৈবল্য-মুক্তি হয়। এই যে আত্মসাক্ষাৎকারের কথা বলা হইল, তাহা সম্পন্ন হওয়া মাত্রই শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি লীন হইয়া যায় না, কিন্তু প্রারব্ধবশতঃ কিছুকাল শরীরাদি থাকে। সেই অবস্থাই 'জীবন্মুক্তি' অবস্থা। জীবন্মুক্তি-অবস্থাতে প্রারব্ধবশতঃ উপদেশাদি-দান সম্ভব হয়। একটি চাকা ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিবামাত্রই চাকার ঘোরা বন্ধ হইয়া যায় না, কিন্তু সেই চাকার বেগ সংস্কারবশতঃ কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বন্ধ হয়। সেইরূপ যে প্রারব্ধ কর্মের ফলে জ্ঞানীর শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞানলাভ হইবার পরেও তাহার সংস্কারবশতঃ কিছুকাল শরীর থাকিয়া প্রারব্ধভোগ-ক্ষয়ে শরীর প্রভৃতি নিজ নিজ প্রকৃতিতে লীন হইয়া গেলে অর্থাৎ মৃত্যু হইলে জ্ঞানী নিজস্বরূপে অবস্থানরূপ কৈবল্য-মুক্তি লাভ করেন। ইহাই সাংখ্যমতে সংক্ষেপে সাধনক্রম। সাংখ্য-দর্শনে ধ্যান, সমাধি আত্ম-সাক্ষাৎকারে অপেক্ষিত হইলেও উক্ত শাস্ত্র বিচার-প্রধান বলিয়া যোগদর্শন হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। এই জন্য কথিত আছে—'নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্।'

(ক্রমশঃ)

জোয়ার

শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার দে

অদ্ভুত জোয়ার,
আগুনের ঢেলা পাথর চলেছে ভেসে;
কোথা এর আদি
কোথাই বা শেষ;
শুধু চলা আর চলা,
অসীম অশেষ!

মেঘনার মোহনার মতো,
প্রবাহের
পাড় নেই কোন দিকে:
শুধু অজানার মুখে
মাটির ভেলায় চলি ভেসে,
দিগন্ত পাবার আশে
প্রতিক্ষণ চক্র এঁকে এঁকে।

থেকে থেকে
স্রোতের ঝাপটা লেগে,
কঙ্কাল ভেসে আসে পাশে,
কভু আসে পদ্মের কলি,
বিধাতারে বলি
বিচিত্র তোমার সৃষ্টি;
পুলকে বিস্ময়ে জাগে
শিহরণ শিরায় শিরায়;
শুধু চলি, আর ভেসে চলি
গ্রহ, নীহারিকা
তারায় তারায়।

শ্রীজ্ঞানেশ্বরের 'অমৃতানুভব'

[চতুর্থ প্রকরণ—জ্ঞানাজ্ঞান-ভেদ-কথন]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

এখন নিদ্রার নাশ হইলে যেমন জাগৃতিই থাকে, তেমনি অজ্ঞানকে নাশ করিয়া কেবল জ্ঞানই ভেদশূন্যভাবে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ১

কিংবা দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িলেও দর্পণ ছাড়িয়া দ্রষ্টা আপন মুখের ঐক্যবোধ আপনিই উপভোগ করে। ২

জ্ঞান যে-কোন প্রকারেই হউক না কেন, জগতের সহিত আত্মার ঐক্য সম্পাদন করে—(এ-কথা বলিলে) ছুরি ছুরিকে খোঁচায়—এইরূপ হয়। ৩

গুটিপোকা যেমন রেশমের গুটির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া নিজেরই সঙ্কট সাধন করে। কিংবা চোর যেমন (চুরি করা দ্রব্যের) মোটের মধ্যে নিজে প্রবেশ করিয়া চোরাই মাল সমেত ধরা পড়ে। ৪

অগ্নি যেমন কর্পূরকে জ্বালাইতে গিয়া নিজেকেই জ্বালাইয়া দেয়, অজ্ঞানকে নাশ করিয়া জ্ঞান তেমনি হয় (নিজেকে নাশ করে)। ৫

অজ্ঞানের আধার নষ্ট হইলে জ্ঞানের অধিক বিস্তার হয়, তখন নিজেরই (জ্ঞানের) নাশ হয়। ৬

দীপের বাতি নিবিবার সময় যে উৎকর্ষ লাভ করে (অধিক জ্বলিয়া উঠে), তাহা কেবল আপনাকে নাশ করিবার জন্যই। ৭

স্তনের উঠা কিংবা পড়া কে জানে? কিংবা জুঁই মল্লিকা ফুলের ফোটা বা শুকাইয়া যাওয়া কে জানে? ৮

তরঙ্গের রূপ-গ্রহণই তাহার নাশ, কিংবা বীজের উৎপত্তি (অঙ্কুরোদ্গম)-ই তাহার অন্ত। ৯

তেমনি অজ্ঞানকে গ্রাস করিয়া জ্ঞান ততক্ষণই বাড়িতে থাকে, যতক্ষণ না নিঃশেষে আপনার নাশ সম্পন্ন করে। ১০

কল্পান্তের জল বাড়িয়া যেমন স্থল জল দুইই ডুবাইয়া দেয়, আর কিছুই থাকে না। ১১

কিংবা সূর্যমণ্ডল যখন বিশ্ব হইতেও বাড়িয়া যায়, তখন প্রকাশ ও অন্ধকার বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া কেবল তাহাই (সূর্যপ্রকাশ) হয়। ১২

অথবা নিদ্রার নাশ হইলে (তৎসম্বন্ধীয় বা তৎসাপেক্ষ) জাগৃতিও চলিয়া যায় (আমি জাগ্রত হইলাম—এই ভাবও চলিয়া যায়) এবং কেবল (স্বরূপভূত) জাগৃতিই থাকে। ১৩

তেমনি অজ্ঞানকে নাশ করিয়া জ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করে (এবং তাহারও নাশ হয়); জ্ঞানাজ্ঞান গ্রাস করিয়া (শুদ্ধ, স্বরূপভূত) জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে। ১৪

চন্দ্রের মূল স্বরূপ পূর্ণিমাতেও পূর্ণ হয় না, অমাবস্যায়ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না—সেই চন্দ্রের স্বরূপভূত কলা যেমন তাহাতে নিত্য অবস্থান করে। ১৫

কিংবা অন্য তেজের দ্বারা আবৃত করা যায় না, বা কোন প্রকার তম বা অন্ধকারে লিপ্ত হয় না এমন সূর্যের উপমা শুধু সূর্যই হয়। ১৬

তেমনি জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত করা যায়,

বা অজ্ঞানের দ্বারা মলিন (দূষিত) হয়—শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান এরূপ নহে, ইহা (জ্ঞানাজ্ঞান-বিবর্জিত) শুধু জ্ঞানমাত্র। ১৭

পরন্তু যে জ্ঞানমাত্র শুদ্ধজ্ঞান, তাহা কি আপনার স্বরূপ জানিতে পারে? চক্ষুর তারকা কি আপনাকে দেখিতে পায়? ১৮

আকাশ কি আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে? অগ্নি কি আপনাকে জ্বালায়? কেহ কি নিজে নিজের মাথার উপর চড়িতে পারে? ১৯

দৃষ্টি কি আপনাকে দেখিতে পায়? স্বাদ কি আপনার স্বাদ আপনি চাখিতে পারে? নাদ কি আপনার ধ্বনি আপনি শুনিতে পায়? ২০

সূর্য কি আপনাকে প্রকাশিত করে? ফল কি আপনাকে ফল দেয়? গন্ধ কি আপনার গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারে? ২১

তেমনি (স্বরূপভূত) জ্ঞান আপনি আপনাকে জানিতে পারে না (তাহাই বুঝিয়া রাখ); সুতরাং এই জ্ঞান জ্ঞাতৃত্ব বিনাই কেবল জ্ঞান মাত্র। ২২

আর (শুদ্ধ) জ্ঞানের যদি জ্ঞাতৃত্ব থাকে তবে কি ঐ জ্ঞান অজ্ঞান হইতে পারে না? ২৩

তেমনি যাহাকে তেজ বলে, তাহা নিশ্চয়ই অন্ধকার নহে,—পরন্তু তেজকে 'ইহা তেজ' বলিলেই কি তখন তেজ হয়? ২৪

তেমনি যাঁহার 'হওয়া' বা 'না হওয়া' এ-দুটি ধর্মই নাই, তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলিলে তিনি মিথ্যাই হইয়া যান—এরূপ মনে হয়। ২৫

সর্বথা 'কিছুই নাই' এই যদি ব্যবস্থা (স্থিতি) হয়, তবে 'নাই' এই জ্ঞানই বা কোথা হইতে হইবে? ২৬

'কিছুই নাই' ইহা শূন্যবাদীদের সিদ্ধান্ত, ইহাতে কোনও সত্তা (সিদ্ধান্ত) সিদ্ধ হয়? বস্তুর উপর শূন্যত্বের বৃথা আরোপ হয়। ২৭

দীপ নির্বাপিত করিলে যে নির্বাণ করে, সেই যদি নির্বাপিত হয়, তবে 'দীপ নাই' এই জ্ঞান কাহার হইবে? ২৮

কিংবা নিদ্রা আসিলে নিদ্রিত পুরুষ যদি প্রাণ হারায়, তবে 'নিদ্রা ভালই হইল' এই জ্ঞান কাহার হইবে? ২৯

ঘট থাকিলে ঘটত্বের জ্ঞান হয়, ঘট ভাঙিলে তাহার ভাঙিবার আভাস হয়,—মূলতঃ ঘটই যদি না থাকে, তবে 'ঘট নাই' ইহা কে বলিবে? ৩০

(সুতরাং) তেমনি (জ্ঞানরূপ আত্মা) 'আছে' কিংবা 'নাই' ('অস্তিত্ব' ও 'নাস্তিত্ব') কিছুই দেখে না—এই আত্মজ্ঞান 'অস্তিত্ব' 'নাস্তিত্ব' বিনাই বিদ্যমান। ৩১

(পূর্বপক্ষ) পরন্তু এই শুদ্ধ পরমাত্মা অপরের কিংবা আপনার নিজের বিষয় হইবার যোগ্য নহে, সুতরাং ইহাই তাহার শূন্যত্বের (নাস্তিত্বের) কারণ। ৩২

(দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তর) একজন অরণ্যে নিদ্রিত হইল, তাহাকে অন্য কেহই দেখিল না,—এবং তাহারও নিজের কোন স্মরণ থাকিল না। ৩৩

পরন্তু সে জীবিত নাই, এরূপ নহে—সেইরূপ (শুদ্ধস্বরূপ পরমাত্মাও) শুদ্ধ অস্তিত্ব মাত্র—ইহা 'আছে' কিংবা 'নাই' এরূপ বলা সহ্য করিতে পারে না। ৩৪

দৃষ্টি যদি ঘুরিয়া আপনাকে দেখিতে চায়, তবে তাহার 'দৃষ্টিত্ব' চলিয়া যায়। পরন্তু তাহা নাই—এরূপ নহে, কারণ মূলতঃ উহার জ্ঞাতৃত্ব থাকে (অন্য বিষয় দেখিতে পারে)। ৩৫

কিংবা আঁধারের মধ্যে যদি কোন কৃষ্ণবর্ণ

পুরুষ থাকে, তবে সে নিজে আপনাকে কিংবা অন্য কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না—তথাপি 'আমি আছি' এই জ্ঞান তাহার পূর্ণ মাত্রায় থাকে। ৩৬

তেমনি পরমাত্মার 'থাকা' বা 'না থাকা'—ইহার কোনটাই মানুষের ন্যায় প্রমাণ করা যায় না। শুদ্ধ পরমাত্মা নিজে যেমন আছেন, তেমনই আছেন। ৩৭

নির্মল আকাশের ব্যাপ্তি যদি (অন্য বস্তু-সংযোগে) বিগড়াইয়া গিয়াছে দেখা যায়, তবে আকাশ স্ব-স্বরূপে তেমনই থাকে, অন্য লোকের কাছেই শুধু তেমন দেখা যায় না। ৩৮

কিংবা পুষ্করিণীর স্বচ্ছজলের নির্মলত্ব নষ্ট হইলেও জল-হিসাবে তাহা ঠিকই থাকে, শুধু অন্য লোকে দেখিতে পায় না। ৩৯

তেমনি আত্মস্বরূপের দিকে দেখিলে আত্মা 'অস্তিত্ব' 'নাস্তিত্ব' ছাড়িয়াই স্ব-স্বরূপে স্বয়ংসিদ্ধ। ৪০

নিদ্রা টুটিলেই কিছুকাল জাগৃতির জ্ঞান (আমি জাগিয়াছি—এই জ্ঞান) থাকে; তাহার পর পূর্ণ জাগৃতির অবস্থায় নিদ্রা বা জাগৃতি হইতে ভিন্ন এক জাগ্রত অবস্থা আসে—তখন নিদ্রা বা জাগৃতির ভানই থাকে না। ৪১

ভূমির উপর ঘট বসাইলে ভূমি সকুম্ভতা প্রাপ্ত হয় (ঘটযুক্ত হয়), ঘট সরাইয়া নিলে ভূমি ঘটহীন হয় (নিকুম্ভতা প্রাপ্ত হয়)। ৪২

পরন্তু এ-দুটি ধর্মই ভূমির অঙ্গ স্পর্শ করে না; ভূমি ভূমিই থাকে, শুদ্ধ যে (জ্ঞানস্বরূপ) আত্মা, তাহা তেমনি দোষশূন্য শুদ্ধস্বরূপ। ৪৩

ইতি চতুর্থ প্রকরণ সমাপ্ত।

নিবেদন

শ্রীভবতোষ শতপথী

এবার এনেছি মা রক্তজবা!
অনেক আদরের দেশাতি ফুল!
হৃদয় ভেঙে ভেঙে, দগ্ধ ধূপ—
তাও কি তোর পূজা হবে গো ভুল!

ক্লান্ত কারাগারে—দীর্ঘশ্বাসে—
জ্বেলেছি বেদনার দীপ্ত শিখা!
শুভ্র সত্তার শঙ্খরবে—
মন্ত্র পাঠ করি: ভাগ্যলেখা!

অন্ধ অনাদরে পড়েছি পিছে—
মানবরূপে আয়: মাটির ঘরে!
জীবন-জর্জর! বেত্রাঘাতে—
মৃত্যু-লাঞ্ছনা! আমাকে ঘিরে!!

উগ্র অধিকারে—ব্যগ্র পাপ!
জীর্ণ জনতার—কণ্ঠস্বর!
মৌন মানবতা: বাক্যবাণ!
প্রহার হানে—হীন শক্তিধর!!

তবে কি অমৃত অলীক স্তব!
কবির কল্পনা! অবাস্তব!
সমূহ সৃষ্টির দৃষ্টরূপ!
সবই কি মতিভ্রম! অসম্ভব!

কানন-কান্তার—সাগর-নদী—
চন্দ্র-সূর্যের রাত্রিদিন!
তবে কি একাধারে—মিথ্যা সব!
বিঘ্ন-বঞ্চনা! যুক্তিহীন!!

ঐ যে দিকে দিকে—অট্টহাসে
রক্তলোভাতুর পার্শ্বচর!
কালের গ্রাসে—কাঁদে কাতর জীব
দুঃখহরা দেবী! রক্ষা কর!!

জনগণের উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীঅমৃতকুমার বিশ্বাস

প্রাচীন ভারত-চিত্ত জাগতিক ভোগৈশ্বর্যকেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব'লে গ্রহণ করেনি। শুধু তাই নয়, বোধ হয় বাহ্য ভোগবাদকে জীবনে প্রধান স্থানও দেয়নি, বরং যেন তাকে অন্য কোন লক্ষ্যবস্তুকে পাবার উপায়স্বরূপ উপকরণরূপেই গ্রহণ করেছে বরণ করেছে। তাই তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকারও করেনি এবং ব্যাবহারিক জীবনে একমাত্র রূপেও দেখেনি। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলিতে। সহজ উপলব্ধির জন্যে দুটো দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

রাজা অশোক—দিগ্বিজয়ী বীর, সারা ভারত জুড়ে তাঁর রাজত্ব, সাম্রাজ্য। ভোগ ও ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা না থাকলে এত বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না—এ খুব সত্যি। তেমনি এই জড় জগতের মোহকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন এবং ভালভাবেই ছিন্ন করেছিলেন। ধর্মচিন্তা এবং অধ্যাত্মভাব দ্বারা তিনি তাঁর রাজকার্যকে সরল এবং সেখানে মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ-পর্যন্ত যাঁরা দেশহিত এবং জগৎ-হিত, প্রজাহিত এবং মানবহিত এ দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ও সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন, রাজা অশোকের নাম তাঁদের শীর্ষে। সত্যি কথা বলতে কি, 'দেবানাং পিয় পিয়দশি' রাজা অশোক ছাড়া ভগবান্ বুদ্ধের জগৎ-জোড়া প্রভাব কল্পনা করাই যায় না। বুদ্ধের প্রেম ও মৈত্রীর বাণীর সার্থক রূপায়ণের প্রথম দৃঢ় এবং ব্যাপক প্রয়াস অশোকের জাবনে। তিনিই তো যথার্থ রাজর্ষি।

আর একজন—পুষ্যভূতি বংশের রাজা হর্ষবর্ধন। তাঁর আবির্ভাব-কাল অশোকের ন'শ বছর পরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে। সেই সময়ে তিনি ছিলেন উত্তর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি। অশোকের মতোই কোন সম্প্রদায়-বিশেষের ওপর তিনি কোনরকম অত্যাচার করেননি; আর একই ভাবে প্রজাহিতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। একদিকে দিগ্বিজয়া বীর আর একদিকে পরম ধার্মিক প্রজাপালক। তিনিও রাজর্ষি। ঐতিহাসিক যুগের এই দুই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পাশ্চাত্য দৃষ্টি অনুযায়ী যাঁদের জীবনে ধর্মভাব অধ্যাত্ম-চিন্তার রেশ দেখা না গেলেও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, যাঁদের জীবন রাজনীতি লোক-নীতির কুটিলতায় ভরপুর, ভারতে দেখি সেই ভূপতিবৃন্দও অধ্যাত্মকে অস্বীকার করতে পারেননি। আর এই প্রকার রাজারাই ভারতে প্রাধান্য পেয়েছেন লোকমানসে এবং আদর্শ নরপতিরূপে সমাজে তাঁরাই স্বীকৃত।

এই-ই ভারতের শাশ্বত রূপ, বৈশিষ্ট্য, সম্পদ্। পার্থিব ভোগসুখকে এদেশ বড় ব'লে মনে করে না। তা যে করে না, তার আর এক প্রমাণ সাধারণে প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য—'সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল'। সুখের চেয়ে শান্তিকেই মঙ্গলময় ব'লে জেনেছে ভারত। সুখানুসন্ধানের শেস নেই, নিরন্তর ভোগ-কামনার পরিসমাপ্তি নেই। একান্ত পার্থিব ঐশ্বর্য-সুখ দীনতাকে দূর করতে পারে না; না ব্যক্তিদীনতা, না সমাজদীনতা। জড় প্রকৃতির অবিরাম আরাধনায় পশ্চিম দুনিয়া

আজ বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী, আমাদের কল্পনার অতীত। মার্কিন মুলুকে কেউ নাকি নতুন মোটর গাড়ি ছ-মাসের বেশি চড়ে না; জার্মানিতে নাকি ঘরে ঘরে টেলিভিশন। কিন্তু একের তুলনায় অন্য সমাজ বিশেষ অংশে দীন। সেই রকম ব্যক্তি-বিশেষে কেউ আবার প্রতিবেশী অপেক্ষা কম সুখী। সুখের তাই বহু তারতম্য আছে। ফলে হীন প্রতিযোগিতা। যে কেউ অপ্রমত্ত ভাবে চিন্তা করলেই এর সারবত্তা বুঝতে পারবেন। পাশ্চাত্য ভাব থেকে আজ আর আমরা মুক্ত নই, বিশেষ শহুরে লোক। নিয়তই আমাদের দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব বোধ ঘটছে এই যন্ত্রযুগে। স্বায়ত্তে থাক আর না থাক, সুখের সামগ্রীকে ঘরে আনতেই হবে, যেমন করেই হোক। নইলে মান বাঁচে না, ভদ্রতা রক্ষা হয় না। এতে জীবন অযথা ভারবহুল হয়ে ওঠে।

অপরপক্ষে শান্তিকামী জীবন পার্থিব দৈন্য সম্পূর্ণ এড়াতে না পারলেও তার মালিন্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। শান্তিময় জীবনের কোন শ্রেণী-ভেদ নেই। সে জীবন সহজ সরল অনায়াস-সাধ্য। জীবন সেখানে ভার নয়, আনন্দময় বলেই লঘু। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে তাই এখানে সহজ আদানপ্রদানই মুখ্য; সহ-যোগিতার ভাবই প্রকট।

ব্রাহ্মণই তাই এই সমাজের আদর্শ, মুখ্য। বাহুল্যবর্জিত পার্থিব কোন বৃত্তিশূন্য ত্যাগময় ক্ষমাশীল এবং নিরন্তর সামুহিক কল্যাণ-চিন্তাই ব্রাহ্মণের জীবন। অধ্যয়ন-অধ্যাপনাও তাঁর অন্যতম শীল। এই ত্যাগময় স্বার্থশূন্য লোক-সেবার জন্যই তিনি সমাজের পূজ্য, লোকগণের প্রণম্য। যে মুহূর্তে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করা হয়, তখনই তাঁর জীবনকে তাঁর ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করি। আর শ্রেষ্ঠ ব'লে মানি বলেই তা আমার আদর্শ এবং অনুকরণযোগ্য। অবচেতন মনের এই সংবেদনশীলতা ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হবার সোপান, এবং বাহ্য সংস্কারাবলী সেই সোপানের রেলিং। তাই স্বামী বিবেকা-নন্দ বলেন—সকলকেই ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করাই ভারতের লক্ষ্য। আদিতে সবাই ব্রাহ্মণই ছিল, সবাই কালে ব্রাহ্মণই হবে।[১] ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম কাউকে ব্রাহ্মণ করে না। নানারূপ ব্রহ্মণ্য সংস্কার তার সহজসাধ্য হয়ে ওঠে, কারণ সেই পরিবেশেই তার লালন-পালন হয়; বংশানুক্রমে ব্রহ্মণ্য-গুণাবলী আয়ত্ত করা তার সহজ হয়, করেও। কিন্তু তা যদি না হয়, তবে আর কেবল জন্মগুণেই কেউ ব্রাহ্মণ নয়।[২] কারণ এই সত্যপালক সদ্‌গুণাবলী সতত অনুশীলনের এবং মননের দ্বারাই স্বভাবে পরিণত হয়। স্বভাবগুণেই মানুষ ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল হয়, জন্মে নয়। এই সমাজ-কল্যাণকর বিশেষ গুণাবলী যাতে নষ্ট না হয়ে আদর্শরূপে সমাজে বিরাজ করে, তারই জন্যে সমাজে ব্রাহ্মণের এত সম্মান পূজা প্রতিপত্তির ব্যবস্থা, আবার অন্যদিকে তাকে অন্নচিন্তা থেকে মুক্তিদান। যাতে যে-কেউই এই গুণান্বিত, তার সেবা থেকে সমাজ বঞ্চিত না হয়।

এইভাবে স্বভাব এবং প্রবণতা অনুযায়ী মানুষের বর্ণ এবং জাতি নির্ণীত হয়; এবং স্বামীজীর মতে এখন একমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রেই এর প্রচলন অন্তরীণ হয়ে রয়েছে। জ্যোতিষেই একমাত্র ধ্রুব জাতি নির্ণয় হয়। বর্তমান যে জাতিপ্রথা এ ভারতীয় গুণগত জাতির বিকার-মাত্র এবং অজ্ঞানতার বশে জনসাধারণ একেই

---

১ একবর্ণমিদং পূর্বং বিশ্বমাসীদ্ যুধিষ্ঠির।
কর্মক্রিয়াবিশেষেণ চতুর্বর্ণং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥—মহাভারত

২ জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন কর্তৃক 'Religion and Society' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

শাশ্বত ব'লে জেনেছে, এই ধর্ম ব'লে মানছে। এর মাধ্যমে কত অন্যায়, কত অবিচার, কত অত্যাচার স্থান পেয়েছে, তা চিন্তাও করে না লোকে। স্বাধীন চিন্তাই লোপ পেয়েছে, মঙ্গলদৃষ্টিই নষ্ট হয়েছে দেশের দীর্ঘ দিনের তন্দ্রায়। তাই শাস্ত্রবাক্যও বিকৃত-ভাবে ব্যাখ্যাত হয় দেশে এবং লোকেও বাহবা দেয়; লোকবুদ্ধি এমনি ভাবেই আচ্ছন্ন! ভুলেও চিন্তা করি না অনাদি কালের এই সমাজ নানা সংঘাত নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসেছে। সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে সে সমাজকে বহু সময়ে এমন নিয়মের শাসনে চলতে হয়েছে, যা কখনই চিরাগত হ'তে পারে না। ব্যক্তি-জীবনে যেমন বিশেষ সময়ে বিশেষ নিয়ম মেনে জীবনরক্ষা করতে হয়; সমাজ-জীবনেও তেমনি কালভেদে যুগভেদে বিশেষ নিয়ম বিশেষ শাসনের প্রবর্তন হয়েছে। শাস্ত্রকারদের মধ্যে যে মতভেদ ছিল (আছে), তার কারণ তাঁরা স্বাধীন চিন্তাশীল এবং মননশীল ছিলেন; আর বিভিন্ন সময়ের সমাজের প্রতিফলন তাঁদের চিন্তার ওপরে পড়েছে। তাই দেখা যায়, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত আবার শাস্ত্রবিরুদ্ধও বটে; সমুদ্রযাত্রা কখনও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, আবার শাস্ত্রানুমোদিত; ব্রহ্মণ্য সম্পর্কে কোথাও গুণের মাহাত্ম্য-বর্ণন, আবার কোথাও কুলের দোহাইয়ে শাস্ত্র উল্লসিত

আসল কথা—শাস্ত্র থেকে কী গ্রহণ ক'রব এবং কী বর্জন ক'রব, তা আমাদের নিজেদেরকেই ঠিক করতে হবে। কিন্তু তার নীতি (criterion) কি! সেটা হ'ল যা সমষ্টির (সামূহিক) কল্যাণপ্রদ, 'বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায়'। এরই ওপর স্বামীজী জোর দিয়েছেন। পুঁথিবদ্ধ প্রাচীন যা কিছু আছে, তাই যে শাস্ত্র ব'লে মানতে হবে, তা নয়। তাতে তা হ'লে পদে পদে হোঁচট খেতে হবে। বর্তমান সমস্যার যুগোপযোগী বিধান যদি কোন প্রাচীন শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তবে সেই হবে শাস্ত্র। না পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই। কতকগুলি শাশ্বত সত্য আছে, যেগুলি বেদে বিধৃত। তার ওপর ভিত্তি ক'রে নিজেদের মঙ্গলবুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে স্বাধীন বিচার দিয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে সমস্যার যে সমাধান আমরা ক'রে নেব, তাই হবে তখন শাস্ত্র। সেই জন্যেই সেই যুগপুরুষ বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন—বেদই প্রকৃত ধর্মগ্রন্থ, নিত্য শাস্ত্র ও ধ্রুব এবং তার একমাত্র যথার্থ টীকা গীতা। আর যা কিছু—তা যতক্ষণ বেদকে অমান্য করছে না, ততক্ষণ গ্রাহ্য। অন্যথায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য।[৩]

স্বামী বিবেকানন্দের কর্মের মধ্যেও এই চিন্তার সঙ্গতি বেশ লক্ষ্য করা যায়। যাতে শাস্ত্রের নিত্য সত্যসমূহের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সমাজে সেই স্রোতঃপ্রবাহ সৃষ্টি হয়—সেই দিকেই ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক। পুনরায় বর্ণাশ্রম-নির্ভর সমাজ-প্রতিষ্ঠার জন্যে সমাজে মুক্তির আবহ সৃষ্টির জন্যে তিনি মঠে অব্রাহ্মণ অনুপনীতকেও উপবীত দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। দ্বিজ-সংস্কার আবার আনতে হবে। গুণই যখন মানুষের বিচার-দণ্ড[৪] তখন তাকে অস্বীকার করা পাতকের কাজ এবং তা করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধও হবে—বলাই বাহুল্য। দেশের ঐতিহ্যও তাই ই সমর্থন করে। মহাভারত-রামায়ণের যুগে অধিকাংশ প্রখ্যাত

৩ Complete Works Vol. III Pp. 245 and 173.

৪ সত্ত্বাধিকো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্তু রজোধিকঃ।
তমোধিকো ভবেদ্ বৈশ্যো গুণসাম্যস্তু শূদ্রতঃ॥

—সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন কর্তৃক 'Religion acd Society' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

ঋষি জন্ম এবং কুলপরিচয়ের দ্বারা মর্যাদা লাভ করেননি; না সমসাময়িক যুগে, না উত্তর-পুরুষের চিত্তে। ব্যাসদেব, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, দ্রোণ, কৃপ, পরশুরাম এবং আরও অনেক চরিত্র তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু ষোড়শ শতকে স্মার্ত রঘুনন্দন এক কাণ্ড ক'রে বসলেন। বললেন: কলিতে বাস দুই জাতির—কেবল ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের। হঠাৎ খেয়ালের বশে এত বড় একজন পণ্ডিত এমন উক্তি করলেন এবং ব্যবস্থা দিলেন—তা তো নয়। কারণ একটা অবশ্যই আছে। সেটা ছিল মুসলমান গৌরবের যুগ। দু-তিনশ বছর আগে থেকেই তার শুরু। স্বদেশের ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যাদের হাতে শাসনদণ্ড এবং ধনোৎপাদনের ক্ষমতা তারা স্বস্থানচ্যুত; তারা সর্বপ্রকার প্রাধান্য এবং অগ্রাধিকার বঞ্চিত। মুসলমান শাসন তখনও পর্যন্ত বিদেশী শাসনরূপেই এদেশে পরিগণিত। ইংরেজ আগমনের পূর্বে দুই সমাজ পরস্পরের খুব কাছে আসার আকর্ষণ অনুভব করেনি। দুই একজন প্রজাহিতৈষী সুলতানের আমল ছাড়া দুই সমাজের মধ্যে সন্দেহ ঈর্ষা বিদ্বেষ বিশেষরূপেই বিদ্যমান ছিল। আর বিজিত সমাজ হিসেবে বিজেতার দৃঢ় মন্থর প্রভাব হিন্দু-সমাজ এড়াতে পারেনি। ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়গুলি সহজেই সেই অবস্থায় সংস্কারভ্রষ্ট হয়ে বসেছিল। অনুলোম ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদানের কোন বাধা নেই। ফলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যও বিকৃত হবার উপক্রম। তবে তো হিন্দুর হিন্দুত্বই যায়। হিন্দু সমাজকে বাঁচাতে তা হ'লে ব্রাহ্মণকে বাঁধতেই হবে, ব্রাহ্মণেতর জাতির সংস্পর্শ এবং তার সংমিশ্রণ ব্রাহ্মণের বন্ধ করতেই হবে। যদিচ চারবর্ণেই ব্রাহ্মণ কন্যারত্ন সন্ধান করতে পারে, কোন কোন শাস্ত্রে শূদ্র-বর্ণে ব্রাহ্মণের বিবাহ নিষিদ্ধ এবং কালে তা সামাজিক রীতি হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়গুলিকে শূদ্র-সম্প্রদায়ভুক্ত ঘোষণা করলে ব্রাহ্মণরক্ষা পায়, হিন্দুত্বও রক্ষা হয়। মনে হয়, এই রকমই কোন বিচারধারা স্মৃতিকারকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

যদি এই-ই সত্যি হয়, তবে সেই সমাজ-রক্ষকের আশা ছিল—কালে ব্রাহ্মণ আবার তাঁর রক্ষিত ধন-সম্পদ্ ব্রহ্মণ্য সংস্কার অন্যান্য বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতরণ করবে। তিন-শ বছর পরে খৃষ্টীয় উনিশ শতকে তা হ'লে ব'লব সেই মহাপণ্ডিতের আশা কামনা পূর্ণ হয়েছে। জন্ম-সংস্কারে কর্ম-সংস্কারে যথার্থ ব্রাহ্মণ সেই সাধকশ্রেষ্ঠ—যিনি জীবিতকালেই মানব-সমাজে অবতাররূপে পূজিত, তিনি শেষ পর্যন্ত একজন অব্রাহ্মণকেই* তাঁর সঞ্চিত সম্পদ্ সমর্পণ ক'রে প্রধান শিষ্যত্বে বরণ করলেন। এর পরেও কি আমরা অবুঝ হব!

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় এক রকমের সমাজ-আন্দোলন শুরু হয়। সম্প্রদায়-বিশেষ বিভিন্ন বর্ণে উন্নীত অথবা চিহ্নিত হ'তে চান—কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ বা ক্ষত্রিয় এই রকম। এবং এর জন্যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে প্রচার করতে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দেরই স্বপ্নানুযায়ী এ শুরু হয়েছে এবং আজও চলছে। কেউ যদি উন্নতি চায়, শুদ্ধি চায়, ওপরে উঠতে চায়,

---

*প্রার্থনা, লেখককে কেউ ভুল বুঝবেন না। পূর্বাশ্রমের বর্ণ-কৌলিন্য সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজস্ব মত এবং অপরাপর লেখকের মত বর্তমান লেখকের পরিচিত। স্বামীজীর অনুজ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এ আন্দোলনের স্বরূপ বুঝতে পারেননি বলেই মনে হয়। দ্রষ্টব্য: 'ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি' (পৃঃ ২৮)।

সে তো ভাল কথা। সে ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করাই উচিত। এতে আমাদের গোসা হওয়া উচিত নয়। জাতি-বিসর্জন (বর্ণ-পরিবর্তন) যদি অন্যায়, তবে জাতি-চ্যুতিও অন্যায়। যে যুক্তিতে ঊর্ধ্বগতি ন্যায়সম্মত নয়, সেই একই যুক্তিতে নিম্নগতিও নিয়ম-বিরুদ্ধ। তবে তো গতি-ই রুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু এই জাতিই যে জীবন—সে-কথা ভুললে চলবে না।

যাঁরা এর পরেও এ সমাজ-আন্দোলনকে সুনজরে দেখতে পারেন না, অন্যায় ব'লে মনে করেন, তাঁদের তবে রবীন্দ্রনাথের এ আন্দোলন-সমর্থনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ-বিষয়ে তিনি স্থিরবুদ্ধি ছিলেন এবং ভারি সুন্দর উপায়ে অনবদ্য ভঙ্গিতে এ যজ্ঞকে আশীর্বাদ করেছেন এবং যজ্ঞ-বিরোধীদের শাসনও করেছেন।

'আজ যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগিয়া থাকে, যদি আমাদের সমাজকে পৈতৃক গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াই মহত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকি, তবে তো আমাদের আনন্দের দিন। আমরা ফিরিঙ্গি হইতে চাই না, আমরা দ্বিজ হইতে চাই। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহাতে যাঁহারা বাধা দিয়া অনর্থক কলহ করিতে বসেন, তর্কের ধূলায় ইহার সুদূরব্যাপী সফলতা যাঁহারা না দেখিতে পান, বৃহৎভাবের মহত্ত্বের কাছে আপনাদের ক্ষুদ্র পাণ্ডিত্যের ব্যর্থ বাদবিবাদ যাঁহারা লজ্জার সহিত নিরস্ত না করেন, তাঁহারা যে সমাজের আশ্রয়ে মানুষ হইয়াছেন সেই সমাজেরই শত্রু।'

—ব্রাহ্মণ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ববিজয়ী বিপ্লবী তুমি

শ্রীমতী নলিনীবালা বসু

গুরুপদ-রজে মাখি লয়ে তনু কে তুমি দাঁড়ালে আসি?
তোমার উদয়ে প্রকাশে আলোক—দূরে গেল তমোরাশি
তোমার বিশাল নয়নে ঝলিছে জ্ঞান ও প্রেমের আলো—
মানুষেরে তুমি হে নরদেবতা, এত কী বেসেছো ভালো?
বিশ্বের অণু-পরমাণু মাঝে নিরখিলে ভগবান্
চণ্ডাল মুচি মেথরের লাগি' ব্যথিত তোমার প্রাণ!
বিশ্ববিজয়ী বিপ্লবী তুমি—তুমি চির-সন্ন্যাসী—
কত দীন-তাপী চরণে তোমার মুক্তি লভিল আসি!
প্রতি জীব মাঝে নিরখিয়া শিব সেবা দিলে সবাকার
শিব সুন্দর! চির-ভাস্বর! তোমারে নমস্কার!

স্বামীজীর সন্নিধানে

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী আত্মানন্দ

স্বামী আত্মানন্দের পূর্বনাম ছিল গোবিন্দপ্রসাদ শুকুল (শুক্ল)। মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ-বংশে সম্ভবতঃ ১৮৬৮ খৃঃ তাঁহার জন্ম হয়। মধ্যভারতে তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের আদি নিবাস ছিল। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার স্বাভাবিকভাবেই পাইয়াছিলেন।

কলিকাতা রিপন কলেজে তিনি বি-এ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। খগেন (স্বামী বিমলানন্দ) যে ছাত্রদলের নেতা, গোবিন্দচন্দ্রও ছিলেন সেই দলভুক্ত। কলেজে পাঠকালে তিনি খগেনের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বিষয় জানিতে পারেন। কলিকাতায় প্রথমে তিনি অন্য কোথাও থাকিতেন, পরে খগেনদের বাড়িতেই থাকিতেন। এই সময় সুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ) প্রভৃতির সহিতও তাঁহার পরিচয় ঘটে।

স্বামীজী পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের কিছু পূর্বে ১৮৯৬ খৃঃ গোবিন্দচন্দ্র আলমবাজার মঠে যোগদান করেন। তখনকার সামাজিক প্রথানুযায়ী তিনি অল্পবয়সে বিবাহিত হন। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য, ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা তাঁহাকে সংসারত্যাগে বাধ্য করিয়াছিল। ১৮৯৮ খৃঃ শেষে বা '৯৯-এর প্রথমে তিনি স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করিয়া 'আত্মানন্দ' নামে অভিহিত হন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে 'শুকুল মহারাজ' নামেই তিনি পরিচিত।

নিজের সন্ন্যাসের কথায় স্বামী আত্মানন্দ বলিয়াছিলেন: ছেলেবেলা থেকেই আমার অজীর্ণ রোগ; রোগে ভুগে ভুগে শেষে মনে হ'ল এই শরীর দ্বারা জীবনের উন্নতির কোন আশা নেই। যদি মহৎ কোন কাজে শরীরটা পাত করতে পারি, তাই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে চলে এলাম। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি, সাধু হ'তে এসেছ?' আমি করজোড়ে উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে না, সাধু হবার উপযোগী শরীর মন কোনটাই আমার নেই। এই পচা শরীরটা আপনাদের সেবায় লাগিয়ে পাত ক'রে দিতে পারি তো পরজন্মে অবশ্যই ভাল শরীর হবে—এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছি।' আমার কথা শুনে স্বামীজী বললেন, 'That's right', জোরে দু-তিন বার উচ্চারিত স্বামীজীর 'That's right' কথাটি আজও আমার কানে বাজছে! স্বামীজী কালবিলম্ব না ক'রে পরদিনই আমাকে সন্ন্যাস দিলেন।

গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া অসীম উদ্যমের সহিত কাজ করিলে দুরূহ বিষয়েও অল্পসময়ে পারদর্শিতা-লাভ সম্ভব, স্বামী আত্মানন্দের জীবনের একটি ঘটনা হইতে তাহা জানা যায়। একদিন স্বামীজী মঠে গান গাহিতে গাহিতে তাঁহাকে বলিলেন, 'শুকুল, তবলা বাজা তো।' শিষ্য বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, 'জানি না।' স্বামীজী ধমক দিয়া বলিলেন, 'জানিস্ নে কিরে, শিখেনে।' ইহাতে স্বামী আত্মানন্দের তবলা-শিক্ষার আগ্রহ হয় এবং কিছুদিনের মধ্যে উক্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া তিনি নিপুণ তবলা-বাদক হইয়াছিলেন।

একবার স্বামীজী তাঁহার তরুণ শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম ও যোগের কোন্‌টায় কে অনার্স নেবে?' কেহ বলিলেন, 'ভক্তিতে'; কেহ বলিলেন, 'ভক্তি ও

জ্ঞানে ডবল অনার্স'; কেহ চাহিলেন, 'ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মে ট্রিপল অনার্স।'

শিষ্যদের মধ্যে স্বামী আত্মানন্দ স্বভাবতই গম্ভীর ও অল্পভাষী, তিনি নীরব। অন্য এক গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শুকুল মহারাজ, কিসে অনার্স নেবে?' এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন স্বামীজী স্বয়ং—'ও সবটাতেই আছে।' বস্তুতঃ আত্মানন্দ ছিলেন একাধারে ভক্ত, জ্ঞানী, কর্মী ও যোগী—যেন গুরুর সাক্ষাৎ প্রতিবিম্ব।

১৮৯৯ খৃঃ কলিকাতায় প্লেগ-মহামারীর সময় স্বামী সদানন্দের সহায়করূপে আত্মানন্দ সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। উভয় গুরুভ্রাতা যেভাবে আর্ত-নারায়ণের সেবা করিয়াছিলেন, তাহা মিশনের সেবাকার্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল আদর্শ হইয়া আছে।

স্বামী আত্মানন্দের গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ছিল। গীতা উপনিষৎ ও বেদান্তসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ ও অগাধ পাণ্ডিত্য থাকায় স্বামীজী তাঁহাকে বেলুড় মঠের শাস্ত্রাধ্যাপনা-কার্যে নিযুক্ত করেন। এই ক্লাসে আত্মানন্দের গুরুভ্রাতাগণও উপস্থিত থাকিতেন।

স্বামীজীর মহাসমাধিলাভের পর আত্মানন্দ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন, তিনি বলিতেন, 'স্বামীজীর দেহত্যাগের পর আর সংসারে থাকার মোহ রইল না। শরীর থাক আর যাক—এই সঙ্কল্প নিয়ে, আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে যেখানে সেখানে পড়ে থাকতাম। ঘরে ঢুকতাম না, কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হ'ত না, খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে উঠত না, সর্বদা স্বামীজীর ভাবে তন্ময় হয়ে থাকতাম।'

স্বামী আত্মানন্দ স্বামীজীর গ্রন্থাবলী আদ্যোপান্ত ২৪ বার পড়িয়াছিলেন; শুধু পড়া নয়, স্বামীজীর তেজোগর্ভ বাণীগুলির উপর গভীর ধ্যান করিতেন ও বলিতেন, 'স্বামীজীর শিববাক্য একটিও মিথ্যা হবার নয়, তিনি যা যা ব'লে গেছেন, কালে সব সত্যি হবে। তাঁর বাণী জাগরণের বাণী—মোহনিদ্রা ভাঙাবার বাণী। স্বামীজীর বাণী শুনলে যে শুয়ে আছে, সে উঠে পড়বে; যে বসে আছে, তার দাঁড়াতে ইচ্ছা হবে; যে দাঁড়িয়ে আছে, তার ছুটতে ইচ্ছা করবে।'

আত্মানন্দ কিছুকাল 'উদ্বোধন' পত্রিকার কার্যে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সহকারী ছিলেন। ১৯০৩ খৃঃ তিনি বেলুড় মঠের ট্রাস্টী নির্বাচিত হন। ১৯০৪ খৃঃ তিনি মাদ্রাজ মঠে প্রেরিত হন, কিছুদিন পর বাঙ্গালোর মঠের কার্যভার গ্রহণ করেন, তখন এই মঠের প্রাথমিক অবস্থা। তিনি ছয় বৎসর এখানে থাকিয়া আশ্রমটিকে স্থায়ী রূপ দেন, তাঁহার সময়েই আশ্রমের নিজস্ব জমি পাওয়া যায়। বাঙ্গালোরে স্বামী বিমলানন্দ ও বোধানন্দ কিছুকাল তাঁহার সহকর্মী ছিলেন। স্বাস্থ্যহানির জন্য ১৯০৯ খৃঃ আত্মানন্দকে বাঙ্গালোর ত্যাগ করিতে হয়। কিছুদিন পর তাঁহাকে আমেরিকা পাঠাইবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তিনি আমেরিকা যাইতে রাজী হন নাই।

১৯১০ খৃঃ শ্রীশ্রীমায়ের সহিত তিনি রামেশ্বর-তীর্থে গমন করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া বায়ু-পরিবর্তনের জন্য তিনি সম্বলপুর গিয়া সেখানে আড়াই বৎসর কাল অবস্থান করেন। স্বামী আত্মানন্দ ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন ১৯২০ হইতে ১৯২৩ খৃঃ পর্যন্ত তিন বৎসর। সর্বত্রই তাঁহার অনাড়ম্বর ও কঠোর সন্ন্যাস-জীবন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

১৯২৩ খৃঃ বেলুড় মঠ হইতে তিনি বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গমন করেন—উদ্দেশ্য বার্ধক্যে কাশীবাস। কাশীতেই ১২ই অক্টোবর, ১৯২৩ খৃঃ প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে স্বামী আত্মানন্দ নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া মহাপ্রয়াণ করেন। পরদিন প্রাতে তাঁহার দেহ মণিকর্ণিকা-ঘাটে গঙ্গায় সলিল-সমাধি দেওয়া হয়।

প্রমদাদাস মিত্র

প্রমদাদাস মিত্র ছিলেন কাশীর জমিদার। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য, ধর্মানুরাগ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের উপর বিশ্বাস ও ভক্তির জন্য স্বামীজী তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখিত একটি স্তবে বেদান্ত-জ্ঞানের সহিত তাঁহার অপূর্ব ভক্তি-বিশ্বাস প্রকটিত হইয়াছে। স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় পূর্বেই হইয়াছিল এবং এই সূত্রেই তিনি স্বামীজীর কথা জানিতে পারেন।

স্বামীজী দ্বিতীয়বার যখন কাশী যান, তখন প্রমদাবাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে প্রগাঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন।

পরিব্রাজক-অবস্থায় নানাস্থান হইতে বিভিন্ন সময়ে স্বামীজী প্রমদা-বাবুকে পত্র লিখিয়াছিলেন, কতকগুলি পত্রে শাস্ত্রের অনেক জটিল ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামীজীর পত্রাবলীতে ১২ই অগস্ট, ১৮৮৮ হইতে ৪ঠা জুন, ১৮৯০ খৃঃ মধ্যে প্রমদা-বাবুকে লিখিত ৩২ খানি পত্র পাওয়া যায়।

গুরুভ্রাতাগণ যাহাতে ভালভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন, সেইজন্য স্বামীজী প্রমদা-বাবুর নিকট হইতে পাণিনি ব্যাকরণ ও বৈদিক গ্রন্থ মঠে ধার করিয়া আনেন। মঠ তখন বরাহনগরে ১৮৮৮ খৃঃ। তখন মঠের সামান্য পুস্তক কিনিবার অর্থও ছিল না! স্বামীজী সেই সময় প্রমদা-বাবুকে লেখেন: বঙ্গদেশে বেদশাস্ত্রের একেবারে অপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদ-সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার অভিলাষ।…এ মঠে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবী এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির অভাব নাই। গুরুর কৃপায় তাঁহারা অল্প দিনেই 'অষ্টাধ্যায়ী' অভ্যাস করিয়া বেদশাস্ত্র বঙ্গদেশে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন ভরসা করি।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের পূত দেহভস্ম সমাহিত করিবার জন্য তখন পর্যন্ত একখণ্ড জমি যোগাড় না হওয়ায় স্বামীজী ব্যাকুল হইয়া প্রমদা-বাবুকে অর্থ-সংগ্রহের জন্য লেখেন।

১৮৯০ খৃঃ স্বামীজী কাশীতে প্রমদা-বাবুর বাড়িতে কয়েকদিন অবস্থান করেন—সঙ্গে ছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। স্বামীজী এই সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রমদা-বাবুর সহিত শাস্ত্রালোচনায় কাটাইতেন। স্বামীজীর মন দেবতাত্মা হিমালয় দর্শনে উন্মুখ হওয়ায় বেশি দিন রহিলেন না।

একবার প্রমদা-বাবুর বাটীতে অবস্থান-কালে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-শিষ্য বলরামবাবুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া স্বামীজী রোদন করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া প্রমদা-বাবু তাঁহাকে বলেন, 'আপনি সন্ন্যাসী হয়ে এত শোকাকুল কেন? সন্ন্যাসীর পক্ষে শোক-প্রকাশ করা অনুচিত।' স্বামীজী এই কথার উত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'যে সন্ন্যাসে হৃদয় পাষাণ করতে উপদেশ দেয়, আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না।'

অন্য এক সময় স্বামীজী প্রমদা-বাবুর নিকট বিদায়-গ্রহণের সময় বলেন, 'এর পর যখন পুনরায় এখানে আসবো, তার পূর্বেই দেখবেন বোমার মতো লোকসমাজের উপর ফেটে পড়েছি।' সত্যই স্বামীজী এই তীর্থ-স্থানে ততদিন পর্যন্ত আসেন নাই, যতদিন না তিনি ভারতীয় ঋষিদের শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করিয়া পৃথিবীকে নূতন চিন্তাধারায় আলোড়িত করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক-অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণের অনেকেই প্রমদা-বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

১৮৯৭ খৃঃ ৩০শে মে আলমোড়া হইতে লিখিত পত্রে স্বামীজী প্রমদা-বাবুকে সাংসারিক শোকে সান্ত্বনা দিতেছেন। স্বামীজী যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন প্রমদা-বাবু তাঁহাকে গীতার একখণ্ড অনুবাদ প্রেরণ করেন, পুস্তকের মলাটে মাত্র এক ছত্র তাঁহার হস্তলিপি ছিল। এই পত্রেই স্বামীজী উক্ত পুস্তকের প্রাপ্তিস্বীকার করেন। স্বামীজী এই পত্রেই জানান যে, তিনি শুনিয়াছেন—প্রমদা-বাবু 'গৌরচর্ম-বিশিষ্ট হিন্দুধর্ম-প্রচারকেরই বন্ধু ··· কালা আদামী তাঁহার নিকট হেয়।'

ইহাতে বুঝা যায়, প্রমদা-বাবু স্বামীজীর সমুদ্রযাত্রায় ও বিদেশে তাঁহার অবস্থানে নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, এ-কথা স্বামীজীর কর্ণেও পৌঁছিয়াছিল। সে-সময়ের গোঁড়া হিন্দুর পক্ষে এইরূপই স্বাভাবিক ছিল!

বালগঙ্গাধর তিলক

বালগঙ্গাধর তিলক প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত। মহারাষ্ট্র-দেশবাসী এই মনীষী সমসাময়িক রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। পরিব্রাজক-জীবনে তিলকের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়।

১৮৯২ খৃঃ জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে বোম্বাই-এ পৌঁছিয়া সেখানে কয়েক সপ্তাহ অবস্থানের পর স্বামীজী পুনা রওনা হইলেন। তিলক বোম্বাই হইতে ট্রেনে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় পুনা যাইতেছিলেন। বোম্বাই ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে স্বামীজী ট্রেনে উঠিলেন। সেই গাড়িতে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক ছিলেন। স্বামীজীকে দেখিয়া তাঁহারা ইংরেজীতে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসীদের দ্বারাই ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, স্বামীজী ইংরেজী জানেন না, সেইজন্য খুব স্বাধীনভাবে সন্ন্যাসীদের সমালোচনায় মুখর হইয়াছিলেন, আর তিলক সন্ন্যাসীর পক্ষ লইয়া তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিতেছিলেন।

স্বামীজী প্রথমে চুপ করিয়া তাঁহাদের বাদ-প্রতিবাদ শুনিতেছিলেন, শেষে তাঁহাদের কথায় যখন যোগ দিলেন, তখন সকলে স্বামীজীর অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিলক স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পুনায় নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। স্বামীজী তিলকের আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহার গৃহে ৮।১০ দিন ছিলেন। তিলক স্বামীজীর নাম জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীজী বলেন, 'আমি সন্ন্যাসী, এই আমার পরিচয়।' তিলককে স্বামীজী তাঁহার কোন নাম বলেন নাই।

পুনায় অবস্থানকালে স্বামীজী অদ্বৈতবাদ ও বেদান্ত সম্বন্ধেই বেশী প্রসঙ্গ করিতেন। শাস্ত্রজ্ঞ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তিলকের সহিত বহু বিষয়ে আলাপ করিয়া স্বামীজী বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বলেন: মহারাষ্ট্র দেশে পরদা-প্রথার তেমন প্রচলন নাই, সমাজের উচ্চস্তরের কিছুসংখ্যক বিধবা মহিলা যদি এখানে বৌদ্ধ যুগের মতো ধর্মপ্রচারে ও আধ্যাত্মিক ভাব-বিস্তারে জীবন উৎসর্গ করেন, তবে খুব ভাল হয়।

তিলক স্বামীজী-সম্বন্ধে স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন: এই সময় স্বামীজীর সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না। একখানি মৃগচর্ম, একটি বা দুইটি ধুতি এবং একটি কমণ্ডলু—এই ছিল তাঁহার সম্বল। কেহ হয়তো তাঁহার গন্তব্যস্থানের জন্য একখানি টিকিট কিনিয়া দিতেন।

হীরাবাগ ডেকান ক্লাবে সাপ্তাহিক সভা

হইত। তিলক এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন। একটি সভায় স্বামীজী তিলকের সহিত যান। কাশীনাথ গোবিন্দনাথ নামে একজন পণ্ডিত দার্শনিক-তত্ত্ব বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা দেন। স্বামীজী উঠিয়া অনর্গল ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়া ঐ বিষয়ের অন্য দিক সরলভাবে পরিস্ফুট করেন। উপস্থিত সকলেরই তাঁহার ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মে।

আমেরিকায় স্বামীজীর বিজয়বার্তা যখন তিলকের কানে আসিল, তখন তিলক স্বামীজীকে পত্র লিখিয়া জানিতে চান, তিনিই তাঁহার গৃহের সেই অতিথি সন্ন্যাসী কিনা। স্বামীজী ইহার এক মর্মস্পর্শী উত্তর দেন। কিন্তু ১৮৯৭ খৃঃ 'কেশরী' মকদ্দমা শেষ হইলে অন্য সব চিঠিপত্রের সঙ্গে সম্ভবতঃ ইহাও নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছিল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে তিলক যখন কলিকাতা আসেন, তখন বেলুড়মঠে স্বামীজীর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। অত্যন্ত হৃদ্যতার সহিত আতিথ্য প্রদর্শন করিয়া এই সময় স্বামীজী কৌতুক করিয়া তাঁহাকে বলেন, 'সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে আপনি যদি বাংলায় আমার কাজ করেন, আর আমি যদি মহারাষ্ট্রে কাজ চালাতে থাকি, তবে খুব ভাল হয়, কারণ কোন লোক বিদেশে যতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, নিজের দেশে ততটা পারে না।'

মহীশূরের মহারাজা

১৮৯২ খৃঃ স্বামীজী বোম্বাই প্রদেশের বেলগাঁও হইতে মহীশূর রাজ্যে বাঙ্গালোরে যান। উচ্চপদস্থ ও শিক্ষিত লোকদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছায় কয়েকদিন তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তিনি মহাশূর-রাজ্যের দেওয়ান স্যর কে. শেষাদ্রি আয়ারের সহিত পরিচিত হইলেন। বুদ্ধিমান্ শেষাদ্রি বুঝিতে পারিলেন, এই যুবা সন্ন্যাসীর মধ্যে এমন এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ও ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে, যাহা ভবিষ্যতে এ দেশের ইতিহাসে স্থায়ী রেখাপাত করিবে। স্বামীজী এই রাজপুরুষের অতিথি হইয়া ৩।৪ সপ্তাহ অবস্থান করেন।

শেষাদ্রি আয়ার স্বামীজীকে মহীশূরে লইয়া গিয়া মহীশূর-রাজ শ্রীচামরেন্দ্র ওয়াডিয়ারের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। গৈরিক বসন-পরিহিত স্বামীজী যখন মহারাজার সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার রাজসুলভ ভাবভঙ্গী দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। স্বামীজীর বিদ্যাবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্মবিষয়ে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, কথাবার্তা ও চালচলন —সবই যেন মহারাজার হৃদয় হরণ করিল। মহারাজা স্বামীজীর বাসের জন্য রাজপ্রাসাদে কতকগুলি কক্ষ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং প্রায়ই বহুক্ষণ ধরিয়া ধর্ম ও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলাপ করিতেন ও তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

ক্রমে স্বামীজীর সহিত মহারাজার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। একদিন মহারাজা সপার্ষদ সভাগৃহে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীজী, আমার সভাসদ্‌গণের সম্বন্ধে আপনার মত কি?' স্বামীজী উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, আমার মনে হয়, আপনার অন্তঃকরণ ভাল, তবে সর্বদা আপনি চাটুকার দ্বারা বেষ্টিত এবং সভাসদ্‌রা সর্বত্র একরূপ।' মহারাজা এই নির্ভীক উত্তর শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'না স্বামীজী, আমার দেওয়ান অন্ততঃ ঐরূপ

নয়। দেওয়ান বুদ্ধিমান্ ও বিশ্বাসী।' স্বামীজী বলিলেন, 'কিন্তু মহারাজ, দেওয়ানেরা রাজাকে লুণ্ঠন করে।' মহারাজা আলোচ্য বিষয় পরিবর্তন করিলেন এবং স্বামীজীকে তাঁহার নিজের ঘরে ডাকিয়া বলিলেন, 'স্বামীজী, অত্যন্ত সরলতা সব সময় নিরাপদ নয়। আপনি যেরূপ স্পষ্টবাদী, তাতে আমার ভয় হয়, পাছে আপনার জীবনে কোন আশঙ্কা ঘটে। আপনি আমার সভাসদ্‌গণের সম্মুখে যেরূপ বলেছেন, এরূপ বলতে থাকলে হয়তো কেউ আপনাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে পারে।'

স্বামীজী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, 'কি! আপনি কি ভাবেন, প্রকৃত সন্ন্যাসী প্রাণভয়ে সত্য বলতে কুণ্ঠিত বা ভীত হয়? মনে করুন, আপনারই পুত্র যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে—আপনি কিরূপ লোক? আমি কি ব'লব যে, আপনি সর্বগুণাধার, আপনার মধ্যে যে-যে গুণ নেই, ভয়ে ব'লব, সেই-সব গুণ আছে? মিথ্যা ব'লব? মহারাজ! তোষামোদ চাটুকারদের ব্যবসায়, সন্ন্যাসীর নয়। সত্য-কথনই সন্ন্যাসীর কর্তব্য। সত্যই আমার তপস্যা। সামান্য জড়দেহের অনিষ্ট-আশঙ্কায় সত্য ত্যাগ ক'রব?'

মহারাজার সম্মুখে ঐরূপ বলিলেও স্বামীজী তাঁহার অসাক্ষাতে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন, তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা বলিতেন। স্বামীজীর স্বভাবই ছিল এইরূপ—যাহার যে দোষ বা দুর্বলতা থাকিত, তাহার সম্মুখেই প্রকাশ করিয়া বলিতেন, কিন্তু তাহার অগোচরে অপরের নিকট তাহার দোষত্রুটি অগ্রাহ্য করিয়া গুণের প্রশংসাই করিতেন।

স্বামীজীকে মহীশূররাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন তিনি স্বামীজীর পাদপূজা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু এমন প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে উক্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল।

মহীশূর রাজসভায় স্বামীজীর সহিত অস্ট্রিয়াদেশবাসী একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের ইওরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলোচনা হয়। সেই ব্যক্তি ও সভাস্থ সকলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ সঙ্গীতে স্বামীজীর অদ্ভুত জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হন। আর একদিন রাজ-প্রাসাদে জনৈক তড়িৎতত্ত্ববিদের সহিত তড়িৎ সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথাবার্তা হইয়াছিল। এক্ষেত্রেও সে ব্যক্তি তড়িৎ বিষয়ে নিজে একজন বিশেষজ্ঞ হইয়াও স্বামীজীর এই বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন।

একদিন প্রধান অমাত্যের সভাপতিত্বে রাজপ্রাসাদে বেদান্তদর্শন আলোচনার জন্য একটি বৃহৎ পণ্ডিতসভা আহূত হয়। এই সভায় স্বামীজীও আমন্ত্রিত হন। পণ্ডিতগণের বলা শেষ হইলে স্বামীজী হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বেদান্তের প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া কার্যক্ষেত্রে তাহার উপযোগিতা নির্দেশ করিলেন।

সভাস্থ সকলে তাঁহার চিন্তার মৌলিকতা ও দৃষ্টির প্রসারতা দেখিয়া চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া রহিলেন। সকলেই বুঝিলেন, স্বামীজীর নিকট বেদান্ত কতকগুলি মতবাদের সমষ্টি নহে, উহা তাঁহার জীবনে অনুভূত সত্য—তাঁহার প্রাণের বস্তু।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজা বলিলেন, 'স্বামীজী, আমার দ্বারা আপনার কি কাজ হ'তে পারে? আপনার জন্য কিছু করতে পারলে সন্তুষ্ট হতাম, আপনি তো কিছুই গ্রহণ করবেন না।'

স্বামীজী সাক্ষাৎভাবে কোন উত্তর না দিয়া জলন্ত ভাষায় তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। তিনি ভারতের অবস্থার প্রতি মহারাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইলেন, ভারতের আছে শুধু তাহার দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা, কিন্তু ভারতের অভাব—বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতি। প্রয়োজন—কৃষি শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি। ভারতবাসীর দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে। ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান পাশ্চাত্য জগৎকে দান করাই সর্বোত্তম কার্য। স্বামীজী বলিলেন, তিনি স্বয়ং পাশ্চত্যবাসীদিগের নিকট বেদান্ত-ধর্ম প্রচার করিতে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

স্বামীজীর বাগ্মিতায় মুগ্ধ মহারাজা তাঁহার পাশ্চাত্য দেশে গমনের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কয়েক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীজী প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আমি এখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারিনি। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভ্রমণ ক'রে পরিব্রাজক-ব্রত উদ্‌যাপিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন কার্যে হস্তক্ষেপ ক'রব না।'

সেই দিন হইতে মহীশূর-রাজ ও তাঁহার প্রধানমন্ত্রীর ধারণা হইল—এই মহাপুরুষ ভারতের উদ্ধারের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

স্বামীজী বিদায়-গ্রহণের প্রস্তাব করিলে মহারাজা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলিলেন, 'স্বামীজী, আমার নিকট আপনার ব্যক্তিত্বের একটি স্মৃতিচিহ্ন রাখতে চাই; যদি অনুমতি দেন, তবে ফনোগ্রাফে আপনার কণ্ঠস্বরের একটা রেকর্ড তুলে রাখি। আপনার প্রাণোন্মাদিনী ভাষায় দু-চার কথা বলুন, যেন চিরদিন আপনার কথা আমার কানে বাজতে থাকে।' স্বামীজী সম্মত হইলে রেকর্ড তোলা হইল। আজ পর্যন্ত মহীশূরের রাজপ্রাসাদে সেই রেকর্ড সযত্নে রক্ষিত আছে, তবে বহুদিন হইল তাহা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বিদায়ের দিন মহারাজা বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপহার দিতে উদ্যত হইলে স্বামীজী বলিলেন, 'যদি সত্য কিছু দিতে চান, তবে ধাতু-সম্পর্ক-বিহীন একটি হুঁকা দিতে পারেন, কাজে লাগিবে মহারাজ! বহুমূল্য উপহার নিয়ে কোথায় রাখব? কি ক'রব? আমি সন্ন্যাসী। প্রতিজ্ঞা করেছি, পরিব্রাজক-অবস্থায় অর্থ স্পর্শ বা কোন কিছু সঞ্চয় ক'রব না।' মহারাজা অগত্যা স্বামীজীকে বিচিত্র কারুকার্য-খচিত গোলাপকাঠের একটি হুঁকা উপহার দেন। বিদায়কালে মহারাজ স্বামীজীর চরণযুগল ধারণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন।

প্রধানমন্ত্রী স্বামীজীর সঙ্গে একতাড়া নোট দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্বামীজী উহা লইতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, 'যদি আমার জন্য কিছু করিতে এতই ইচ্ছা, তবে কোচিনের একখানি টিকিট কিনে দিন। আমি রামেশ্বর চলেছি, ২।৪ দিন কোচিনে থাকতে পারি।' প্রধান মন্ত্রী যখন বুঝিলেন, স্বামীজী আর বেশী কিছু করিতে দিবেন না, তখন তিনি তাঁহাকে কোচিন পর্যন্ত একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দিলেন ও কোচিন রাজ্যের দেওয়ান শঙ্করিয়ার নিকট তাঁহার একখানি পরিচয়-পত্র দিলেন।

পার্থিব মান-যশ ও ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষাহীন স্বামীজী অমল চরিত্রের প্রভাবে রাজাধিরাজ হইতে দীন দরিদ্র পর্যন্ত সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন।

মিসেস ওলি বুল

নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালা-বাদক মিঃ ওলি বুলের স্ত্রী মিসেস ওলি বুল। তাঁহার নিজের নাম সারা (Sarah)। শিকাগো ধর্মমহাসভার পরে তিনি স্বামীজীর সংস্পর্শে আসেন। মিসেস ওলি বুল স্বামীজীর বিশিষ্ট ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে পরিগণিত হন। বহু পত্রে স্বামীজী তাঁহাকে 'মা' বা 'ধীরামাতা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। বেলুড় মঠ স্থাপনের সময় তিনি স্বামীজীকে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন এবং ভারতে ও পাশ্চাত্যে নানাভাবে তাঁহার কাজে সহায়তা করেন।

১৮৯৪ খৃঃ শেষ ভাগে বোস্টনে স্বামীজী শ্রীমতী ওলি বুলের অতিথি হইয়াছিলেন। বোস্টন শহরের উপকণ্ঠে কেম্ব্রিজের মহিলাগণের নিকট 'ভারতীয় হিন্দু নারীর আদর্শ' সম্বন্ধে স্বামীজী যে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দেন, তাহা শ্রীমতী বুলের সনির্বন্ধ অনুরোধেই। বক্তৃতাটি স্বদেশানুরাগ-ব্যঞ্জক ও গভীর-ভাবপূর্ণ। ইহাতে তিনি ভারতীয় নারীজাতির চরিত্র-বল ও মাতৃত্বের মহিমময় আদর্শের প্রভূত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, পাশ্চাত্যে ভারতায় নারীদিগের হীনাবস্থা সম্বন্ধে যে-সকল গল্প প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ কল্পিত ও ভিত্তিহীন।

এই বক্তৃতা-শ্রবণে সভার বিদুষী শ্রোত্রী-মণ্ডলী এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, পরবর্তী খৃষ্টম্যাসের সময় স্বামীজীর অজ্ঞাতসারে মেরী মাতার ক্রোড়ে শিশু যিশুর একটি সুন্দর ছবির সহিত একখানি পত্র তাঁহার জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

এই চিঠির সারাংশ: মাতা মেরী খৃষ্টম্যাসে পৃথিবীকে তাঁহার পুত্র দান করিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে আমরা আনন্দ করি ও তাঁহাকে স্মরণ করি। আমরা আপনার পুত্রকে আমাদের মধ্যে পাইয়া আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। তিনি মানব-কল্যাণে যাহা কিছু করিতেছেন, তাহা সবই আপনার গৌরব। ভারতীয় মাতৃত্বের আদর্শ বলিতে গিয়া তিনি আমাদিগকে ইহা জানাইয়াছেন। মাতঃ, আপনি আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। আপনার পুত্রের মধ্যে আপনার জীবন ও কর্মের পরিচয় আমরা পাইতেছি।

স্বামীজীর বক্তৃতা সম্বন্ধে শ্রীমতী বুল যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ: বেদ, সংস্কৃত সাহিত্য ও নাটক হইতে তিনি ভারতীয় নারীর আদর্শ উদ্ধৃত করিলেন এবং বর্তমান কালের যে-সকল রীতি-নীতি ভারতীয় নারীজাতির উন্নতির অনুকূল ও সহায়ক তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি নিজের জননীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, জননীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও পূত চরিত্র উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়াতেই তিনি সন্ন্যাস-জীবনের অধিকারী হইয়াছেন এবং জীবনে যাহা কিছু সৎকার্য করিয়াছেন, সমস্তই সেই জননীর কৃপা-প্রভাবে।

স্বামীজী বেলুড়ে মঠ স্থাপন করার জন্য জমি ক্রয় করেন। তাঁহার বিদেশী শিষ্যদের এবং প্রধানতঃ মিস মূলারের অর্থে এই জমি-ক্রয় সম্ভব হয়। যাহা হউক এই অর্থে জমি ক্রীত হইলেও মঠ তৈয়ারী করা সম্ভব হয় নাই। ইহা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। কিছু দিন পরে স্বামীজী শ্রীমতী ওলি বুলের নিকট হইতে দান-স্বরূপ বহু অর্থ পান। তাঁহার অর্থে পুরাতন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও সন্ন্যাসীদের বাসস্থান প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সাহায্য হওয়ায় স্বামীজী নিশ্চিন্ত হন।

স্বামীজীর পত্রাবলীর মধ্যে ওলি বুলকে লিখিত ৪৭ খানি পত্র পাওয়া যায়। অন্যকে

লিখিত বহু পত্রেও স্বামীজী শ্রীমতী বুলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

৮ই ফেব্রুআরি ১৮৯৮ খৃঃ জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গে 'ধীরামাতা' ভারতে আসিয়া বেলুড় মঠে বাস করেন। স্বামীজীর সহিত তিনি আলমোড়া ও কাশ্মীর ভ্রমণ করেন। তৎপরে দেশে চলিয়া যান।

১৯০০ খৃঃ অগস্ট হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বামীজী যখন প্যারিসে ছিলেন, তখন ধীরামাতার গৃহে অতিথি-রূপে অবস্থান করেন।

গুডউইন

মিঃ জে. জে. গুডউইন স্বামীজীর একজন প্রিয় অনুগত ইংরেজ শিষ্য। স্বামীজীর বহু বক্তৃতা তিনি সাঙ্কেতিক লিপিতে লিখিয়া রাখেন, সেই জন্যই ঐগুলি পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। স্বামীজী বলিতেন, 'Faithful Goodwin'—বিশ্বস্ত গুডউইন।

আমেরিকার শিষ্য ও বন্ধুরা স্বামীজীর বক্তৃতা সাঙ্কেতিক লিপিতে রক্ষা করার জন্য পরপর দুইজন সঙ্কেত-লিপিকার নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁহারা স্বামীজীর বক্তৃতা অনুসরণ করিতে অক্ষম হওয়ায় ১৮৯৫ খৃঃ শেষ ভাগে বহু চেষ্টার পর গুডউইনকে প্রথমে বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সুফল পাওয়া যায়। নিউইয়র্কে স্বামীজীর সহিত গুডউইনের প্রথম পরিচয় ঘটে। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়া এবং তাঁহার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া গুডউইন বিনা-বেতনেই কাজ করিতে থাকেন। স্বামীজীকে দেখার পর হইতেই গুডউইন সংসারের সকল আকর্ষণ ত্যাগ করেন। স্বামীজী তাঁহার অতীত জীবনের বহু ঘটনা বলেন, ফলে গুডউইনের মধ্যে এমন নৈতিক বিপ্লব হয় যে, তাঁহার সমগ্র জীবনই ইহার পর পরিবর্তিত হইয়া যায়। তিনি স্বামীজীর একজন উৎসাহী শিষ্যে পরিণত হন, এমন কি আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় স্বামীজীর সেবা পর্যন্ত করিতেন ও সেবা করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন এবং কিরূপে গুরুর পরিচর্যা সুষ্ঠুভাবে করা যায়, সে-বিষয়ে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন।

একান্ত অনুগত শিষ্য গুডউইন স্বামীজীর বক্তৃতা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেন। 'কর্মযোগ', 'জ্ঞানযোগ', 'ভক্তিযোগ' প্রভৃতি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

আমেরিকায় ইওরোপে ও ভারতে স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া গুডউইন তাঁহার বক্তৃতাসমূহ লিখিতেন। তিনি বহুভাবে স্বামীজীর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। আমেরিকার পাদ্রীরা স্বামীজীর বিজয় অভিযান দেখিয়া ঈর্ষাবশতঃ চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিলে গুডউইন স্বামীজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া পাদ্রীদের মিথ্যা দোষারোপের উপযুক্ত উত্তর দিয়াছিলেন এবং এবং একটি সভায় স্বামীজীর পরিচয় দিবার সময় হিন্দুধর্মের খুব প্রশংসা করেন।

১৮৯৬ খৃঃ স্বামীজী যখন ইংলণ্ড হইতে দেশে ফিরেন, তখন গুডউইন তাঁহার সঙ্গে ভারতে আসেন। গুডউইন সে-সময় ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া স্বামীজীর সেক্রেটারি এবং সেবক হিসাবে কাজ করিতেছিলেন। লণ্ডন ত্যাগের সময় স্বামীজীকে যে বিদায়-ভাষণ দেওয়া হয়, তাহা মিস্টার স্টার্ডি ও গুডউইন উভয়ে মিলিতভাবে রচনা করেন এবং স্বামীজীর অনুরাগী বন্ধুগণকে তাঁহারাই সভায় উপস্থিত হইতে নিমন্ত্রণ করেন।

ভারতে স্বামীজীর সঙ্গে গুডউইন বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন এবং এই সময়ের অধিকাংশ সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। কাশ্মীর ও জম্মু ভ্রমণের সময়ও গুডউইন স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন। গুডউইন সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন এবং নিরামিষাশী ছিলেন।

প্রচারকার্যে সাহায্য করিবার জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত গুডউইন মাদ্রাজে প্রেরিত হন। দক্ষিণ ভারতেই তাঁহার দেহাবসান হয়। গুডউইনের মৃত্যুতে স্বামীজী বলেন, 'আমার ডান হাত গেল, এই ক্ষতি অপরিমেয়।' ১৮৯৮ খৃঃ গুডউইনের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতাকে স্বামীজী যে পত্র দেন, তাহার সারাংশ :

গুডউইনের নিকট 'আমার ঋণ কখনও শোধ হবার নয়। যাঁরা মনে করেন যে, আমার চিন্তার দ্বারা জগৎ কিছু উপকৃত হয়েছে, তাঁদের জানা উচিত, ইহার প্রতিটি বাক্য গুডউইনের অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের দ্বারাই প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। গুডউইনের মধ্যে দেখেছি—ইস্পাতের ন্যায় দৃঢ় একজন বন্ধু, কদাপি হ্রাস পাইনি যার ভক্তি এরূপ ভক্তিমান্ শিষ্য একজন এবং এমন একজন কর্মী যে শ্রান্তি কাকে বলে জানত না। যে অল্প কয়েকজন লোক পৃথিবীতে অপরের জন্য বেঁচে থাকে, তার দেহত্যাগে এমন একজন মানুষের অভাব হ'ল।'

এই পত্রের সঙ্গে স্বামীজী 'Requiescat in Pace'—'শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম' নামে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠান। কবিতাটির কয়েক ছত্রের অনুবাদ :

সার্থক তোমার সেবা, পরিপূর্ণ তব আত্মদান,
অপার্থিব প্রেমপূর্ণ হৃদয়েতে হোক তব স্থান ;
মধুময় তব স্মৃতি দেশকাল দিয়াছে মিলায়ে,
বেদীতলে পুষ্পসম রেখে গেলে সৌরভ বিছায়ে।

স্বামী প্রকাশানন্দ

স্বামী প্রকাশানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী।

স্বামীজী বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আলমবাজার মঠে ১৮৯৭ খৃঃ যে চারজনকে প্রথম সন্ন্যাস দেন, সুশীলচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ) ভ্রাতা। কলেজে পাঠকালে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (স্বামী বিমলানন্দ) নেতৃত্বে যে যুবকদল আদর্শ জীবন-গঠনে কৃত-সঙ্কল্প হন, তিনি তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৮৭৪ খৃঃ কলিকাতার সার্পেন্টাইন লেনে ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আশুতোষ চক্রবর্তীর পুত্ররূপে সুশীলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সুশীল বাল্যকালে গৃহের ধর্মভাবের মধ্যে লালিত-পালিত হন। মাতৃক্রোড়েই মিষ্টভাষী সুদর্শন বালকের প্রাথমিক ধর্মশিক্ষা লাভ হয়। তাঁহার সুশীল নামটি সার্থক হইয়াছিল। অসৎ বালকেরা তাঁহার কাছে যাইতে সাহস করিত না।

আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে স্বামীজীর সুখ্যাতি ও অভূতপূর্ব সাফল্যের সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে ছাত্রসমাজের মধ্যে উন্মাদনা ও জাগরণের সাড়া পড়ে। কলেজের ছাত্র সুশীল ও তাঁহার বন্ধুগণ আগ্রহ-সহকারে ঐ সকল সংবাদ পাঠ ও আলোচনা করিতেন এবং পরম প্রেরণা পাইতেন। স্বামীজীর যুগোপযোগী ভাবধারা সুশীলের চিত্ত অধিকার করিল, তিনি স্বামীজীকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভাবে জীবন গঠন করিতে লাগিলেন। সুশীল বুঝিলেন, স্বামীজীই এই পতিত ও পরাধীন জাতির উদ্ধারকর্তা, তিনিই এই যুগের আচার্য। নিজের ও স্বদেশের মুক্তির জন্য এবং জগতের হিতার্থে আত্মদান করিতে স্বামীজী যে মর্মস্পর্শী আহ্বান করিলেন,

তাহা শুনিয়া সুশীল স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

১৮৯০ খৃঃ হইতেই সুশীলচন্দ্র বরাহনগর মঠে নিয়মিতভাবে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যগণের সঙ্গ করিতেন। তাঁহাদের নিকট ঠাকুরের জীবন-কথা শুনিবার এবং মঠের পূজা, ধর্মপ্রসঙ্গ ও কীর্তনাদিতে যোগ দিবার সুযোগ পাইতেন। ১৮৯৬ খৃঃ যখন তিনি বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার মনে প্রবল বৈরাগ্যের সঞ্চার হওয়ায় তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং পরবর্তী বৎসর স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসলাভে ধন্য হন।

স্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া তরুণ সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ তাঁহার ভাবধারা ও শিক্ষায় জীবন গঠন করিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত ঐকান্তিকতার ফলে অচিরেই সঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট কর্মী হইয়া উঠিলেন। ১৮৯৮ খৃঃ স্বামীজী তাঁহাকে স্বামী বিরজানন্দের সহিত পূর্ববঙ্গে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন; ঢাকায় এই তরুণ সন্ন্যাসীদের বক্তৃতা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। স্থানীয় আগ্রহশীল জনসাধারণ এই ভাষণে এতদূর মুগ্ধ হন যে, তাঁহারা এক সমিতি গঠন করিয়া নিয়মিত ধর্মালোচনার ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে তাঁহারা উভয়ে সাধু নাগ মহাশয়ের গৃহে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৮৯৯-১৯০১ খৃঃ পর্যন্ত স্বামী প্রকাশানন্দ 'উদ্বোধন' পত্রিকার পরিচালনাদি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের একটি ঘটনা তাঁহার তীর্থ-ভ্রমণ; গুরুভ্রাতা স্বামী বোধানন্দের সঙ্গে তিনি কেদারনাথ, বদ্রীনারায়ণ ও অন্যান্য তীর্থ দর্শন করেন। ১৯০২ খৃঃ শেষার্ধ হইতে ১৯০৬ খৃঃ পর্যন্ত মায়াবতীতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদনা-কার্যে তিনি সহকারী ছিলেন।

১৯০৬ খৃঃ এপ্রিল মাসে স্বামী প্রকাশানন্দ সানফ্রান্সিস্কো হিন্দু মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সহকারী-রূপে আমেরিকায় প্রেরিত হন। ১৯১৫ খৃঃ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের দেহত্যাগ হইলে স্বামী প্রকাশানন্দ হিন্দু মন্দিরের অধ্যক্ষ হন। আমেরিকায় ওরিগন, ওয়াশিংটন এবং ক্যালিফোর্নিয়ার নানা স্থানে তিনি বেদান্ত প্রচার করিতেন। স্বামী প্রকাশানন্দ সুপুরুষ, সুবক্তা ও অত্যন্ত উদারচেতা ছিলেন। যেখানে তিনি যাইতেন ও বক্তৃতা দিতেন, সেখানে বহু লোক বেদান্ত শ্রবণে ও অধ্যয়নে আগ্রহান্বিত হইত। আমেরিকার জনসাধারণ তাঁহার নিকট ধর্ম-সাধনায় সাহায্য পাইয়া পরম শান্তি লাভ করিত।

যখন তিনি ভারতে ছিলেন, স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'বাবা, ঠাকুরের কাজের জন্য আমি প্রাণপাত করছি, তোমার জীবনও সেই কার্যে উৎসর্গ কর ও বিসর্জন দাও। আরও অনেকে ঠাকুরের কাজে জীবন আহুতি দেবে। সকলের মিলিত আত্মোৎসর্গে এই মহৎ কাজ সম্পন্ন হবে।' স্বামী প্রকাশানন্দ গুরুবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।

১৯২৭ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুআরি সানফ্রান্সিস্কোতে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব-প্রচারে উৎসর্গীকৃত এই আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন চিরদিন প্রচারব্রতীদের নিকট অনুপ্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবে।

বিবেকানন্দ-পরিচয়

শ্রীমতী বিজয়া দাশগুপ্ত

মাত্র ৩৯ বৎসর (১৮৬৩-১৯০২ খৃ:) বয়সের মধ্যে দশ বৎসর—১৮৯৩ থেকে ১৯০২ খৃ: পর্যন্তই স্বামীজীর পার্থিব কর্মকাল। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই অত্যল্পকালে অনতিবিস্তৃত রচনা, পত্র ও বক্তৃতাবলীতে আমরা তাঁর যে পরিচয় লাভ করি, তা বিরাট ও বিচিত্র। এই বহুধাব্যাপ্ত বিচিত্র পরিচয়ের মধ্য থেকে তাঁর আদর্শের একটি স্বরূপ নির্ণয় করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ বিবেকানন্দের কর্মকাল—যখন ভারতবর্ষ বৃটিশ-শাসিত এবং ভারতবাসী প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্বন্দ্বে একান্ত বিচলিত। সেই দিগ্‌ভ্রান্তির কালে ভারতবাসীর হৃদয়ে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনে বিবেকানন্দের বাণী ও পরিকল্পনার কতখানি প্রভাব ছিল, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তা অনুভব করা যায়। তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এমন লোক অল্পই ছিলেন, যাঁরা বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধের দ্বারা প্রভাবিত হননি। প্রচলিত অর্থে তিনি রাজনৈতিক ছিলেন না, কিন্তু পরবর্তীকালের বিখ্যাত একাধিক রাজনৈতিক নেতা বিবেকানন্দের প্রভাব-স্পৃষ্ট। তাঁর স্বদেশ-প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করবার জন্য তাঁর একটিমাত্র বক্তৃতাংশের উল্লেখ এখানে ক'রব :

Do you feel that millions and millions of the descendents of gods and of sages have become next-door neighbours to brutes? Do you feel that millions are starving to-day, and millions have been starving for ages? Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud? Does it make you restless? Does it make you sleepless? Has it gone into your blood, coursing through your veins, becoming consonant with your heart-beats? Has it made you almost mad? Are you seized with that one idea of the misery, of ruin, and have you forgotten all about your name, your fame, your wives, your children, your property, even your own bodies? Have you done that? That is the first step to become a patriot—the very first step.

শিক্ষা-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের উক্তি ও রচনা-সমূহ আলোচনা করলে দেখা যায়, শিক্ষা-সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা ও অভিমত তদ্বিষয়ে গভীর জ্ঞান- ও চিন্তাপ্রসূত। 'Education is the manifestation of perfection already in man'—তাঁর এই বিখ্যাত উক্তির মধ্যে শিক্ষার মূলতত্ত্ব নিহিত। অন্তর্নিহিত পূর্ণতা বলতে কী বোঝায়, তার যথার্থ বিকাশ কিভাবে সম্ভব, সে-কথা তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকেই পরিশীলিত করে না; হৃদয়ের প্রসার, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ও মানবিকতা-বোধ যথার্থ শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল। প্রকৃত শিক্ষা আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগায়, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস মানুষকে শক্তিশালী করে। আমাদের দেশে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অপূর্ণতা ও ব্যর্থতার কারণ—আমরা শিক্ষার মূলতত্ত্ব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন। শিক্ষাদর্শ, শিক্ষক, ধর্ম-বিজ্ঞান-সাহিত্য-কারিগরি বিদ্যা প্রভৃতি বিভাগীয় শিক্ষার প্রয়োজন, জনশিক্ষা,

স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অর্ধশতাব্দী-কালেরও পূর্বে বিবেকানন্দ যে মত ব্যক্ত করেছেন, বর্তমান কালের ছাত্র-অসন্তোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতা এবং শিক্ষকের আদর্শচ্যুতি প্রভৃতি মৌল সমস্যায় তার থেকে সুস্পষ্ট সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব।

উল্লিখিত দুটি বৃহৎ পরিচয় ছাড়াও আমরা বিবেকানন্দকে জানি সমাজ-সংস্কারক, নবযুগের প্রবর্তক, শক্তিধর বাগ্মী, প্রেরণাময় লেখক ও সংঘসংগঠকরূপে। বর্ণাশ্রম-ধর্মের নামে অস্পৃশ্যতার কুসংস্কার—যাকে তিনি 'ছুঁৎমার্গ' ব'লে অভিহিত করেছেন—দূরীকরণে তাঁর বলিষ্ঠ সংগ্রাম ঘোষণার ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর যে বক্তা-রূপ প্রথম উদ্ঘাটিত হয়, বিদেশে প্রায় প্রত্যহ এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত পর্যটনের কালে প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁর সেই রূপের পরিচয় আমরা পাই। বিবেকানন্দকে কখনও সাহিত্যিক গোষ্ঠীভুক্ত করা হয় না, সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য বা বৃত্তিও ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দের বক্তব্যের বাহন তাঁর গদ্য-ভাষা বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারে একটি বিশিষ্ট অননুকরণীয় সংযোজন ব'লে ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করি না। তাঁর কাব্যরচনা কাব্যোৎ-কর্ষের বিচারে হয় তো উচ্চস্থান লাভ করে না, কিন্তু গভীর হৃদয়াবেগের সরল, বিশুদ্ধ ও চাতুর্যহীন অভিব্যক্তির জন্য তাঁর কয়েকটি কবিতাকে প্রভাতের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা হয়। বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দের দান স্বদেশের সমগ্র অস্তিত্বে অঙ্গীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশের বিংশশতকীয় নবজাগরণে বিবেকানন্দের প্রভাব ব্যাপক। শুধু বাংলাদেশের নয়, ইতিহাস-বেত্তার মতে বিবেকানন্দ বর্তমানে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান রূপকার। সংগঠক বিবেকানন্দের পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশন। তার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এই পটভূমিকায় মূল প্রশ্ন বিবেচনার সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। বিবেকানন্দের বিভিন্ন রূপের যে পরিচয় আমরা পেলাম, তাদের সমন্বয়-সাধক মূল যোগসূত্রটি কি? অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁকে এত ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আলোচনা করতে হয়েছে, এত বিরাট কর্মসূচী কার্যে পরিণত করতে হয়েছে যে, আপাতদৃষ্টিতে তাঁর বহু কথায় অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, তাঁর অনেক উক্তি পরস্পরবিরোধী ব'লে মনে হয়। এই কারণে ইদানীং বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর উদ্ধৃতির যথেচ্ছ ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার একটি সংস্কৃতিপত্রে বলা হয়েছে: 'স্বামীজী দার্শনিক সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা—তিনি ছিলেন একজন মহান্ দেশপ্রেমিক...।' এই কথার সমর্থনে তাঁরই একাধিক উক্তি উপস্থিত করা খুব কঠিন নয়। স্বদেশের দুর্দশায় বিগলিত-প্রাণ বিবেকানন্দ বার বার নিজের মুক্তিকে তুচ্ছ ব'লে ঘোষণা করেছেন। এমন কি ধর্ম অপেক্ষা বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেও আমরা তাঁর উক্তির সমর্থন পেতে পারি—'বিজ্ঞান ও ধর্ম দুই-ই আমাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে চায়। ধর্ম হইল কেবল অধিকতর পুরাতন এবং আমাদের এই কুসংস্কার আছে যে, উহা অধিকতর পবিত্র।' বাংলাদেশের কোন এক সাহিত্য-পত্রে বলা হয়েছে: প্রচলিত অর্থে ধর্ম ও ঈশ্বরকে বিবেকানন্দ গ্রহণ করেননি।

তাঁর কাছে সর্বপ্রথমে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে মানুষ—তার পরে ভগবান্।

এই জাতীয় উক্তিকে ভ্রমাত্মক বলা চলে না; কিন্তু এর থেকে অনুভব করা যায় যে, কুসংস্কার- ও দারিদ্র্য-পীড়িত ভারতবর্ষের ব্যাধি নিরাময়ের জন্য বিবেকানন্দ যে পথ নির্দেশ করেছেন, তাঁকেও আমরা সেই পথের পথিক ব'লে ভাবতে আরম্ভ করেছি; চিকিৎসক ও রোগীকে সমপর্যায়ভুক্ত করেছি; তাঁর উক্তির উদ্দেশ্য-নির্ণয়ে, তাঁর সত্তার সামগ্রিকতা-নিরূপণে আমাদের দৃষ্টি অসমর্থ।

বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিচিত্র ভাষায় জাতির সহস্র সমস্যা সম্পর্কে বিবেকানন্দ তাঁর জীবন-কালে যা কিছু ব'লে গিয়েছেন, তার থেকে যদি আমরা ধরে নিই যে, তাঁর দেশপ্রেম, দরিদ্রপ্রীতি, সমাজচেতনা, শিক্ষাচিন্তা ইত্যাদি ধর্মনিরপেক্ষ, তা হ'লে আমাদের বিবেকানন্দ-পরিচয় যথার্থ হবে ব'লে মনে হয় না। বর্তমান দশকের ধর্মচেতনা-শূন্যতা বা আমাদের ব্যক্তিগত মতবাদ অনুযায়ী বিবেকানন্দকে আমরা গড়তে পারি না। যে ভাবেই হোক না কেন, সার্বিক সংস্কারমুক্ত হৃদয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের আন্তরিক অনুধ্যান করলে দেখা যাবে, আধ্যাত্মিকতা বিবেকানন্দ-সত্তার মূল উপাদান। মানবজাতির উদ্দেশ্যে তাঁর সমগ্র বাণী অধ্যাত্মচেতনা-প্রসূত, তাঁর সমস্ত কর্মের মূলে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। স্বামী বিবেকানন্দ দেশপ্রেমিক, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ, সমাজ-সংস্কারক—এ-কথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু তাঁর যে পরিচয় ভিন্ন তাঁর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, সেই পরিচয় হ'ল—তিনি সন্ন্যাসী, তিনি ভারতবর্ষের অদ্বৈত বেদান্তবাদের সর্বাধুনিক প্রবক্তা। বিবেকানন্দের প্রথম পরিচয় তিনি দার্শনিক, কর্মযোগী, ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক; সমাজসংস্কারক ইত্যাদি তাঁর দ্বিতীয় পরিচয়। আধ্যাত্মিকতার মূল সূত্রকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেই তিনি—পরাধীন, মূর্খ, দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষকে উন্নত করতে চেয়েছেন। দাক্ষিণাত্যে একাধিক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন: 'সকল জাতিরই এক একটি প্রধান আদর্শ আছে—তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূলভিত্তিস্বরূপ, কাহারও কাহারও বা সামাজিক উন্নতি···কাহারও বা অন্য কিছু জাতীয় জীবনের ভিত্তি। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—একমাত্র ধর্ম। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড—উহারই উপর আমাদের জাতীয় জীবনরূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত।'

অন্যত্র বলেছেন: 'ধর্মই ভারতের পক্ষে স্বল্পতম বাধার পথ। এই ধর্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।'

'সমগ্র মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে শান্তিপ্রিয় হিন্দুরও কিছু দিবার আছে—আধ্যাত্মিক আলোকই জগৎকে ভারতের দান।'

মনে রাখতে হবে—'ধর্ম'-শব্দে তিনি ধর্মের শক্তিদায়ক কল্যাণকর মূল ভাবকেই বুঝিয়েছেন, প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান বা কুসংস্কারকে তিনি কখনও ধর্ম-সংজ্ঞায় অভিহিত করেননি। কলম্বোয় এক বক্তৃতায় তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন: ভারতীয় ধর্মের প্রভাব বলিতে ভারতীয় ধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ ···লক্ষ্য করিতেছি। উহার বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা শত শত শতাব্দীর সামাজিক আবশ্যকতায় যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৌণ বিষয়

উহার সহিত জড়িত হইয়াছে, বিভিন্ন প্রথা, দেশাচার ও সামাজিক কল্যাণবিষয়ক খুঁটিনাটি বিচার প্রকৃতপক্ষে 'ধর্ম'-সংজ্ঞার অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশকেই তিনি ধর্ম-সংজ্ঞা দিয়েছেন: 'যে ভাবধারা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে, তাহাই ধর্ম।' তাঁর শিক্ষার সংজ্ঞা থেকেও লক্ষ্য করা যায়, তাঁর শিক্ষাদর্শের সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনার সুস্পষ্ট যোগ রয়েছে। শিক্ষা ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর বক্তব্যকে ভারতীয় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা ভ্রমাত্মক ব'লে মনে হয়।

ব্যক্তিগতভাবে বিবেকানন্দ যদি তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক মননরূপ বিভাজকের দ্বারা নিজেকে বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতেন এবং শুধুমাত্র তাঁর মতানুরাগী জন-সমষ্টির অধ্যাত্মচেতনার বিকাশে নিয়োজিত থাকতেন, তা হলেও বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হিসাবে বিবেকানন্দের পরিচয় কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'ত না। প্রকৃতপক্ষে জীবনে আদর্শের রূপায়ণ ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে সেই আদর্শ-সঞ্চারে সহায়তা করা সৎব্যক্তির পক্ষে তার সামগ্রিক কর্তব্যপালন ব'লে জগতে বিবেচিত হয়। বিবেকানন্দ তদ্ভিন্ন অন্য কিছু যে করেছেন, তার কারণ তিনি পলাতক-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন না, তৎকালে স্বদেশের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে তিনি আত্ম সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন এবং মূলতঃ ধর্মের নবীন ভাষ্যকাররূপে ধর্মকে জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সর্বপ্রধান শক্তি ব'লে প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন: 'আমাদিগকে দেখিতে হইবে—কিরূপে এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে...গার্হস্থ্য জীবনে কার্যে পরিণত করা যায়। কারণ, যদি ধর্ম মানুষের সর্বাবস্থায় তাহাকে সহায়তা করিতে না পারে, তবে উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই—উহা কেবল কতকগুলি ব্যক্তির জন্য মতবাদ মাত্র।'

বিবেকানন্দ শেখালেন, জীবনের সর্বস্তরে আধ্যাত্মিকতাকে অনুস্যূত করা যায়, কারণ সেটি কোন সম্প্রদায়-বিশেষের সম্পত্তি নয়; শেখালেন, মানুষের সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টায় ধর্ম অবিরুদ্ধ-ভাবে যুক্ত হ'তে পারে, দেশকাল-নির্বিশেষে যে-কোন মানুষ তার কর্মকে যোগে রূপান্তরিত করতে পারে। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথায় তিনি আশ্চর্য সুন্দর ভাবে জানালেন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা কী, কিভাবে জীবনে তার অনুশীলন সম্ভব: Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divine within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control, or philosophy—by one or more, or all of these—and be free. This is the whole of religion. Doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details. বিবেকানন্দের স্বাদেশিকতা, শিক্ষাচিন্তা, সমাজ-সংস্কার, আন্তর্জাতিকতা ইত্যাদি তাঁর যথার্থ পরিচয় জ্ঞাপন করবে, যদি সেই সমগ্র পরিচয় তাঁর ধর্মচেতনতার মূল সূত্র থেকে বিচ্যুত না হয়।

কবিকর্ণপূর গোস্বামীর জীবনের একটি নূতন দিক্

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

কবিকর্ণপূর ও তাঁর পুত্র কবিচন্দ্র বঙ্গীয় সংস্কৃত সাহিত্যগগনে অন্যতম উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন উত্তর জীবনে কবিকর্ণপূর আখ্যায় নিখিল ভারতবন্দ্য কবির সম্মান-লাভে ধন্য হন। নদীয়া জেলার কাঞ্চনপল্লী গ্রামে ১৫২৪ খৃঃ তিনি জন্মপরিগ্রহ করেন।

তিনি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক নাটক ১৫৪৩ খৃঃ রচনা করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। ক্রমে ক্রমে তিনি 'বৃহৎকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, 'চমৎকারচন্দ্রিকা', 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা', 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' এবং অপূর্ব সংস্কৃত-অলঙ্কার-গ্রন্থ 'অলঙ্কারকৌস্তুভ' রচনা করেন। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি[1], পুনা[2] প্রভৃতি স্থানে তাঁর রচিত 'বর্ণপ্রকাশ' নামক কোষগ্রন্থও সংরক্ষিত আছে। এই গ্রন্থ তিনি রচনা করেন অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধরের নিমিত্ত।

এসিয়াটিক সোসাইটি এবং পুনা ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইন্স্টিটিউটে কবিকর্ণপূরের এক অপূর্ব গ্রন্থ আছে। সংক্ষেপে এই গ্রন্থের নাম 'পারসীক-প্রকাশ'; পূর্ণ নাম 'সংস্কৃত'-পারসীক-পদপ্রকাশ'। গ্রন্থে কবি নিজের পারস্য ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেছেন, এবং কেবল শব্দের প্রতিশব্দ উল্লেখ নয়, উভয় ভাষার কারক, বিভক্তি, তুলনামূলক ল-কারার্থ নির্ণয় প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে করেছেন।

'সংস্কৃত-পারসীক-পদপ্রকাশ'গ্রন্থের প্রারম্ভের শ্লোকে তিনি প্রণতি জানিয়েছেন ভগবান্ শিবকে—

পরিপূরিতভক্তভাবকাশাং
নবকাশাদপি দৃশ্যতামুপেতাম্।
প্রমথেশতনুং সিতাংশুভব্যা-
মশুভব্যাহতিহেতুমাশ্রয়ামি ॥

—অর্থাৎ যিনি ভক্তগণের সকল আশা পূর্ণ করেন, যাঁর শুভ্র তনু শরৎকালের নববিকশিত কাশপুষ্পসমূহের থেকেও সুন্দরতর, চন্দ্রের থেকেও পরম মনোহর—সদাশিবকে অশুভ দূরীকরণের নিমিত্ত শরণরূপে গ্রহণ করি।

দ্বিতীয় শ্লোকে কবিকর্ণপূর গোস্বামী গ্রন্থপ্রণয়নের কারণরূপে বলছেন যে, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নির্দেশক্রমে তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করছেন—

শ্রীমজ্ জহাঁগীরমহীমহেন্দ্র-
প্রসাদমাসাদ্য নিদেশরূপম্।
করোত্যদঃ 'সংস্কৃত-পারসীক-
পদ-প্রকাশং' কবিকর্ণপূরঃ।

এবং তাঁর উদ্দেশ্যও কবি নিজেই সুব্যক্ত করেছেন—

যাঁরা সংস্কৃত জানেন—তাঁরা পারসী ভাষা শিখবেন; পারসী ভাষা যাঁরা জানেন, তাঁরা সংস্কৃত শিখবেন; এবং উভয় ভাষাই যাঁরা জানেন না, তাঁরা উভয় ভাষাই শিখবেন, সেজন্য অবশ্য এই গ্রন্থ সকলের পাঠ্য—

'সংস্কৃতোক্তিবিদি পারসাজ্ঞতা
পারসীবিদি চ সংস্কৃতজ্ঞতা।
তদ্দ্বয়াবিদি চ তদ্দ্বয়জ্ঞতা
জায়তেঽত্র তদধীয়তামিদম্ ॥'

১ ইণ্ডিয়া ৩১০৭ ২ কথাবটে, ৩২১

এবং গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতায় (৫২৮ শ্লোক-সংখ্যা) কবি বলছেন :

ইতি শ্রীকর্ণপূরেণ কবিনা কৃতিনা কৃতঃ।
ভাষাসংগ্রহসারোঽয়ং তনোতু বিদুষাং মুদম্॥

কবিকর্ণপূরের এই গ্রন্থে সর্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, সময়ের দিক থেকে পরমানন্দ সেন জাহাঙ্গীরের সময়ের লোক নিঃসন্দেহ; কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে এত বড় একটি গ্রন্থে—প্রণতি বিজ্ঞাপন প্রারম্ভে করলেনই না, কোথাও কিছুই বললেন না -এটি কি ক'রে হ'ল? আর তাঁর এই গ্রন্থ নাথ-সম্প্রদায়ের আকর্ষণের কারণ কেন হ'ল? ফলতঃ নেপালের মৃগস্থলী—গোরক্ষ-পীঠেই এই গ্রন্থের পুঁথি সমাদরে রক্ষিত আছে। এবং এই গ্রন্থের স্তুতিপূর্বক নরহরিনাথ যোগী বলেছেন :

বৈদীভাষার্ষভাষা দনুজকুলগিরঃ সিদ্ধগন্ধর্বভাষা
দৈবীভাষাদ্যভাষা ফণিগণভণিতিঃ-
সিদ্ধসাধ্যোদ্যভাষাঃ।
রৌষী শার্মণ্যভাষা সলিলচরগিরশ্চীন-
জাপানভাষা-
স্তর্কী-পারস্যভাষা পশুশকুনিগিরো
ভান্তি গোরক্ষভাসা॥

অর্থাৎ নাথযোগীরা গোরক্ষনাথের পীঠে এই বলেই এ গ্রন্থকে সমাদর করছেন যে, যেমন সংস্কৃত ও পারস্যভাষা, তেমনি অন্য ভাষাও গোরক্ষনাথের কৃপাপ্রাপ্ত এবং ফলতঃ সর্বভাষাজননী সংস্কৃত ভাষার জয় হোক।

দ্বিতীয়তঃ কবিকর্ণপূর জাহাঙ্গীরের অনুজ্ঞা কিভাবে কখন পেলেন—এও গবেষণার বিষয়। গোরক্ষনাথের গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ, অর্থাৎ গোরখবিজয়ের 'মোছন্দর'—বাঙালী ছিলেন, নিঃসন্দেহ। গোরখনাথও কামরূপে মৎস্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকল্পে কিয়ৎ-কাল অবস্থিতি করেছিলেন—এও সত্য। মুসলমানগণের বঙ্গদেশে আগমনের পূর্ব থেকেই বঙ্গদেশ নাথযোগীদের ভাবধারায় পরিপ্লাবিত। মহাপ্রভুর পরবর্তী যুগেও ঐ সাধনার ধারা বঙ্গদেশে মুছে যায়নি। এই সাধনমার্গের অনুরাগিবৃন্দের সঙ্গে কবিকর্ণপূর হয়তো কোন নিকট সম্পর্কে এসেছিলেন।

আজ সেই সুদিন এসেছে, যখন কবিকর্ণ-পূরের পরিবার বিশেষতঃ তাঁর পুত্র কবিচন্দ্র-বিষয়ে বিশেষ গবেষণা প্রয়োজন। কবিচন্দ্র পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। ঐ যুগে রচিত সংস্কৃত কোষকাব্যসমূহে কবিচন্দ্রের অনেক কবিতা সমুদ্ধৃত আছে।

মায়ের খড়্গ

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবগণ প্রার্থনা করিতেছেন :

অসুরাসৃগ্‌বসাপঙ্কচর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্॥

—হে চণ্ডিকে, আপনার হস্তস্থিত উজ্জ্বল এবং অসুরগণের রক্ত- ও বসা-লিপ্ত খড়্গ আমাদের কল্যাণ বিধান করুক; আমরা আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ঐ খড়্গ দেখিয়াই দেবীকে—

'অসুরে কয় ভয়ঙ্করী
আর ভক্তে ভায় অভয়া বলে।'

কারণ ঐ খড়্গ দ্বারাই তো মা ভক্তের বিপদ নাশ করেন।

রোমাঁ রলাঁর বইয়ে আছে, স্বামীজী ঐ অভয়ার খড়্গের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতেও ভীত হইতেন না।

মায়ের সেই খড়্গ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলায় কিভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল, আজ তাহা মনে পড়িতেছে। যেদিন মায়ের দর্শনের বিলম্ব দেখিয়া তিনি মায়ের খড়্গ লইয়া নিজেরই জীবনান্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেদিন

সেই পাষাণী কালীই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে জীবন্ত হইয়া দেখা দিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন এবং নিজ খড়্গ ফিরাইয়া লইয়া আবার নিজ ভবতারিণী মূর্তির মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছিলেন। এই দিন তো মা ছেলেকে রক্ষা করিলেন।

আবার অন্যদিনের কথাও মনে পড়িতেছে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের মায়ের অনুমতি লইয়া তোতাপুরীর কাছে অদ্বৈতসাধনায় রত হইয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই সাকার ব্রহ্মময়ীর রূপটিকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম হইতেছেন না। সকল চেষ্টাই যখন বিফল হইল, তখন তোতাপুরী আদেশ করিলেন, 'মায়ের হাত হইতে খড়্গখানিকে লইয়া ঐ মনোময়ী ভবতারিণী-মূর্তিকে দ্বিধা করিয়া ফেল।' সেদিন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মবিনাশের জন্য ঐ খড়্গকে প্রয়োগ করেন নাই। যে রূপ তাঁহার রূপাতীতকে উপলব্ধি করিবার পথে প্রবল প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই রূপের নাশের জন্যই ভবতারিণীর খড়্গ দ্বারাই ভবতারিণীর রূপের পরপারে যাইবার পথ আবিষ্কার করিলেন, রূপাতীত রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে বলিতেন, মহামায়া দ্বার ছাড়িয়া না দিলে তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, ঐ খড়্গাই ভক্তের প্রতি মহামায়ার দয়া।

গীতার মঙ্গলাচরণে মধুসূদন সরস্বতী যে বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে'—কৃষ্ণের পরে অপর কোন তত্ত্বকে আমি জানি না, তাহার অর্থ এই নয়—কৃষ্ণের পর অন্য কোন তত্ত্ব নাই। প্রকৃত বক্তব্য হইল এই যে, নামরূপের রাজ্যে থাকিয়া জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ বজায় রাখিয়া যতদূর যাওয়া যায়, তাহার শেষ সীমা হইল ঐ বংশীবিভূষিতকর কৃষ্ণ। তাহার পরে যাহা আছে, তাহা কেহ জানিতে পারে না, তাহাই ভূমা বা ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের বেলাও নাম-রূপের রাজ্যের চরমতত্ত্ব ভবতারিণীর রূপকে বিনাশ করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সহায় মায়ের খড়্গ।

উপনিষদ্ যে বলেন, হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ বা স্বরূপটি আবৃত রহিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় তাহারও প্রণালীটি লক্ষিত হইতেছে। ঐ হিরণ্ময় পাত্র বলিতে আমরা কি বুঝিব? ঐ যে ভবতারিণীর মূর্তিটি যাহা মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিকে ধারণ করিয়াছিল, তাহাকেই হিরণ্ময় পাত্র বলিব।

উপনিষদ্ বলেন, 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। এই 'বিভাতি' শব্দটি হইতেই বুঝিতে পারি, সব কিছু রূপই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, তাহার কারণ সেই রূপাতীতের আলোকেই তাহাদিগের প্রকাশকে সম্ভব করিয়াছে। অন্ধকারে তো কিছুই দেখা যায় না, সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভবতারিণীর রূপটিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তা নিশ্চয়ই অন্ধকার ছিল না, অর্থাৎ হিরণ্ময় ছিল। সব রূপই হিরণ্ময় ঐ একই কারণে 'সর্বমিদং বিভাতি'।

এইবার বুঝিব যে, ঐ রূপসকল পাত্র কেন? ঐ রূপের অন্তরালে যে রূপাতীত রহিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে আমার অজ্ঞানকে ধারণ করে বলিয়া সব রূপই অজ্ঞানের আধার বা পাত্র হয়। প্রাচীন সত্য মৃত্তিকা, তাহাকে না জানাইয়া ঘটাদি যে-সব রূপে অজ্ঞান আমার মনে অসত্যে সত্য-প্রতীতি ঘটায়, তাহাই হিরণ্ময় পাত্র। উপনিষদেও ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন, সূর্যদেব যেন ঐ পাত্রটির অপসারণ করান। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণও তো মহা-মায়ার কৃপার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ঐ কৃপাই মায়ের হাতের খড়্গ।

মা এসেছে ঘরে ঘরে !

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

মা এসেছে, আয় কে তোরা
দেখবি ছুটে আয় !
মায়ের রূপের প্লাবনে আজ
ভুবন ভেসে যায় !
রূপ ভরেছে দিকে দিকে,
দেখ্ চেয়ে দেখ্ অনিমিখে,
রূপ ভরেছে জলে স্থলে
নভো-নীলিমায় !
মা এসেছে ঘরে ঘরে
দেখবি ছুটে আয় !

নানা রঙের ফুল ফুটেছে
মায়ের চরণ ঘিরে,
কমল-আসন পাতা রে আজ
স্বচ্ছ দীঘির নীরে !
কাশের বনে শুভ্র-হাসি,
উঠেছে আজ সমুদ্ভাসি,
অপরাজিতার মাল্য মায়ের
কণ্ঠে শোভা পায় !
মা এসেছে ঘরে ঘরে
দেখবি ছুটে আয় !

জবাতে আজ অলক্ত-রাগ
মায়ের চরণ-পাতে,
শিউলি ফুলের লাজ ছেয়েছে
ধরার আঙিনাতে !
তৃণে তৃণে শিশির 'পরে,
মায়ের তনুর দ্যুতি ঝরে,
মায়ের স্নেহ উছলে পড়ে
নদীর কিনারায় !
মা এসেছে ঘরে ঘরে
দেখবি ছুটে আয় !

বন্দনা-গান গায় কোয়েলা
দিগন্তরে ঘুরে,
শ্যামার শিসের স্বনন ওঠে
মাঙ্গলিকের সুরে !
শুভ্র মেঘের শঙ্খ-ধ্বনি,
আকাশ-পথে ওঠে রণি',
মা এসেছে—সেই বারতা
কানে পঁহুছায় !
মা এসেছে ঘরে ঘরে
দেখবি ছুটে আয় !

মায়ের প্রাণের পরশ বুলায়
আকাশের অই রবি,
সারা ভুবন তাই হয়েছে
মায়ের প্রতিচ্ছবি !
জড়ের মাঝে জাগে চেতন,
সব হ'ল তাই সোনার বরণ,
অধরা আজ দিল ধরা
ধরার সীমানায় !
মা এসেছে ঘরে ঘরে
দেখবি ছুটে আয় !

মায়ের ডাকে জাগ তোরা আজ,
হৃদয় দে রে খুলে,
বুকের যত নিবিড় ব্যথা
যা তোরা আজ ভুলে !
মা এসেছে, আর কি রে ভয়,
মা আমাদের করুণালয়,
শুভ-আশিস্ নে চেয়ে নে
লোট্‌রে মায়ের পায় !
মা এসেছে ঘরে ধরে—
দেখবি ছুটে আয় !

সমালোচনা

বীরবাণী (পরিবর্ধিত শতবার্ষিকী-সংস্করণ) —স্বামী বিবেকানন্দ। প্রকাশক : শ্রীপ্রকাশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক বিবেকানন্দ সোসাইটি, ২১ বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা ৬ পৃষ্ঠা ১০৬ ; মূল্য টাকা ১'৫০ ; শোভন সংস্করণ (শক্ত মলাটে) মূল্য টাকা ২'৫০।

বীরবাণীর বর্তমান ষোড়শ সংস্করণটি স্বামীজীর শতবার্ষিকী-সংস্করণরূপে প্রকাশিত। গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করিবার জন্য স্বামীজীর মূল রচনাগুলিকে (১) সানুবাদ সংস্কৃত স্তোত্র, (২) ভজন—বাংলা ও হিন্দী, (৩) বাংলা কবিতা ও (৪) ইংরেজী কবিতা—এই চারটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ; (৫) অনুবাদগুলি শেষের দিকে পৃথক্‌ভাবে সন্নিবেশিত।

এই সংস্করণে সংস্কৃত ৪টি স্তোত্র, ভজন ৩টি, বাংলা কবিতা ৬টি, ইংরেজী কবিতা ১৪টি এবং ১৩টি কবিতানুবাদ স্থান পাইয়াছে। অনেক-গুলি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ নূতন এবং 'The Cup' কবিতাটির একটি নূতন অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 'বীরবাণীর' এই উভয় সংস্করণই আশা করি, জনগণের বিশেষ সমাদর লাভ করিবে। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে কণ্ঠে 'বীরবাণী' ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া বলিষ্ঠ চরিত্র গঠনে সহায়ক হোক—ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। শোভন সংস্করণটি উপহার ও পুরস্কার দানের যোগ্য, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

Doctrines of Srikantha. Vols, 1 & 2, অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত। প্রাচ্যবাণী, ৩ ফেডারেশন স্ট্রীট কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩০৯+৪৮০ ; মূল্য ২০৲+৩২৲=৫২৲ বাহান্ন টাকা।

শৈব-বেদান্ত বৈষ্ণব-বেদান্তের ন্যায় জনপ্রিয় ও সুপ্রসিদ্ধ নয়। সেজন্য শৈব-বেদান্তের মুখ্য প্রপঞ্চক শ্রীকণ্ঠের মতবাদ- ও ভাষ্য-বিষয়ক এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থদ্বয় সকলের নিকটই বিশেষ সমাদৃত হবে।

প্রথম খণ্ডে বেদান্তের মূল তত্ত্ব 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে নানা দিক থেকে মৌলিক আলোচনা এবং ব্রহ্ম-কারণবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সাতটি প্রধান আপত্তি খণ্ডন করা হয়েছে সুনিপুণভাবে। ভারতীয় দর্শনের স্তম্ভ-স্বরূপ কর্মবাদ সম্বন্ধে এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অভিনব প্রপঞ্চনা অন্যত্র কোথাও নেই।

দ্বিতীয় খণ্ডে দুষ্প্রাপ্য শ্রীকণ্ঠ-ভাষ্যের মূলানুগ সুন্দর ইংরাজী অনুবাদও সুধীসমাজে সমাদৃত হবে সমান। এই গ্রন্থের অনুবাদ ইতঃপূর্বে কোনও ভাষাতেই প্রকাশিত হয়নি।

'গবেষণা' যে কেবল পুরাতন কথারই নূতনভাবে পুনরুক্তিমাত্র নয়, কিন্তু মৌলিক চিন্তা ও প্রপঞ্চনা, ডক্টর চৌধুরী তা পুনরায় প্রমাণিত ক'রে সকলেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। এই গ্রন্থদ্বয় প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে সুসমৃদ্ধ করবে সুনিশ্চিত।

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা—শ্রীতামসরঞ্জন রায়। প্রকাশক : জেনারেল প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃষ্ঠা ১৭০ ; মূল্য ৪৲।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীর শুভ লগ্নে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য আদর্শবাদী এক শিক্ষাব্রতী এই পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তাগুলিকে এর আগে মাদ্রাজের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅবিনাশিলিঙ্গম্ ইংরেজীতে স্তবকে স্তবকে সংগ্রহ করেন। ঠিক এই ধরনের একটি পুস্তক উদ্বোধন কার্যালয় থেকেও প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পুস্তকে বৈশিষ্ট্য আছে, যদিও শ্রীযুক্ত রায় স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তাগুলি প্রধানত: এই পুস্তক-দুটি থেকেই সংগ্রহ করেছেন, এটি কেবলমাত্র সংগ্রহ-গ্রন্থ নয়। লেখক চেষ্টা করেছেন, স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তাগুলির একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়ার, ক্ষেত্রবিশেষে আবার দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ্‌দের শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার মিল খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন দিক আলোচনা করতে গেলে সেই ব্যক্তির জীবনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শের সম্বন্ধে কিছু জাবনী থাকা অন্তত: প্রয়োজন। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা-প্রসঙ্গে স্বামীজীর জীবন ও তাঁর আদর্শের কিছুটা পরিচয় পাওয়ার জন্য পুস্তকের প্রথম ভাগে তাঁর জীবন ও দর্শন সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়ার ফলে স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তাকে বুঝতে সুবিধা হয়েছে।

শিক্ষা-প্রসঙ্গে যে-কয়েকটি অধ্যায় আছে, তার প্রথমটিতে শিক্ষার সংজ্ঞা, শিক্ষাদর্শন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী-প্রসঙ্গ, শিক্ষার মাধ্যম, পদ্ধতি, পরিবেশ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এর প্রতিটির উপরই এক একটি বড় অধ্যায় হ'তে পারে। কিন্তু একটি অধ্যায়েই সমস্ত বিষয়গুলি থাকার ফলে শিক্ষাবিদ্ স্বামীজীর স্বরূপটি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে ধর্ম-শিক্ষার কথা। স্বামীজীর কথাই ছিল—'Religion is the core of education.' ধর্মই শিক্ষার মর্মকথা। এই অধ্যায়ে লেখক শিক্ষায় ধর্মের স্থান প্রসঙ্গে দেশবিদেশের শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তার সংযোজন করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর উক্তিও খুব সূক্ষ্মভাবেই স্থাপন করেছেন।

ভারতের জীবন যেমন কুটীরে, তেমনি সমাজের অবহেলিত নারী-জাতির মধ্যেও। এদের উভয়ের কথাই স্বামীজী তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছেন, এদের উন্নতির জন্য নানাভাবে নানা কথা বলেছেন। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তায়ও এদের বিশেষ স্থান আছে। লেখক তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা-প্রসঙ্গে' ও 'জনশিক্ষা-প্রসঙ্গে' অধ্যায়ে এর বিস্তৃত হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছেন।

সর্বশেষে বলা যায়, এই স্বল্প-পরিসর পুস্তকে যদিও স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার সব দিক তুলে ধরা সম্ভব হয়নি, তবুও যাঁরা স্বামীজীকে কেবলমাত্র ধর্মগুরু, স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসী বা মুক্তিকামী সন্ন্যাসী ব'লে জানেন, তাঁদের কাছে এই পুস্তক স্বামীজীর চরিত্রের আর একটি দিক তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা (তৃতীয় ষট্‌ক—শ্রীধর স্বামীর টীকা-সহ): স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনুদিত ; প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, ২১১এ, গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়, জেলা হাওড়া। পৃষ্ঠা ৩৩৬ ; মূল্য ৫৲

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে গীতার শেষ ছয়টি অধ্যায় স্থান পাইয়াছে; ইহাতে প্রথম ও

দ্বিতীয় ষট্‌কের ন্যায় মূল শ্লোক, অন্বয় ও অনুবাদ এবং শ্রীধরস্বামীর সুবোধিনী টীকা ও অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শঙ্করাচার্য-কৃত ভাষ্য ও অন্যান্য টীকার বহু উদ্ধৃতি যথাস্থানে সন্নিবেশিত। পরিশিষ্টে শব্দকোষ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ও মহানারায়ণ উপনিষদের ভূমিকা এবং তত্ত্বানুসন্ধান-ভূমিকা সংযোজিত তিনটি খণ্ডে তিনটি ষট্‌ক প্রকাশিত হইয়া গীতা-গ্রন্থের শ্রীধর-লিখিত 'সুবোধিনী টীকা' সমাপ্ত হইল। বঙ্গভাষাভাষী পাঠকগণের একটি বহুদিনের অভাব দূরীভূত হইল।

জাতীয় সমন্বয়ে স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী সুন্দরানন্দ। প্রকাশক: শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক বিবেকানন্দ সোসাইটি ২১ বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ২০৫; মূল্য ৩৲।

স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত আলোচ্য পুস্তকটির নূতন সংস্করণ অভিনন্দনযোগ্য, বর্তমান জাতীয় সঙ্কটে স্বামীজীর অমর বাণীর নিত্য স্মরণ ও অনুধ্যান বিশেষ প্রয়োজন।

বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয়: স্বামী বিবেকানন্দ—জাতীয় জাগরণে, ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্যে, জাতীয় জীবনে বেদান্ত-প্রয়োগে, শূদ্রযুগের অভ্যুদয়ে, সমাজ-সংস্কারে, ত্যাগ-মাহাত্ম্য-ঘোষণায়, রজোগুণের উদ্দীপনায়, 'অহিংসা'-ব্যাখ্যায়, পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক ভেদ-নিরসনে, নর-নারায়ণ-সেবায়, বন্ধন-মুক্তির মহত্ত্ব-কীর্তনে, স্বদেশ-প্রেমের মর্মস্পর্শী বাণী-প্রচারে।

যুগোপযোগী বিষয়ে স্বামীজীর চিন্তাধারা অবলম্বনে চিন্তাশীল লেখকের সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি নূতন আলোক-সম্পাত দ্বারা বিভিন্ন সমস্যা-সমাধানে সহায়তা করিবে। গ্রন্থটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

সারদা-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গীতি—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। প্রকাশক: স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল, বর্ধমান। পৃষ্ঠা ১০৭; শতবার্ষিকী বর্ষে মূল্য ১৲।

স্বামীজীর জন্ম-শতবর্ষে প্রকাশিত আলোচ্য পুস্তকটি একখানি উল্লেখযোগ্য গানের বই। উচ্চাঙ্গের গায়ক ও সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে লেখকের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, তাঁহার লিখিত গান ভক্ত-সমাজে সুপরিচিত। ভাব ভাষা ও ছন্দের সমন্বয়ে রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে লিখিত আলোচ্য পুস্তকের গানগুলি সুর-লয়-তান সহকারে গীত হইলে ভক্তবৃন্দের প্রাণে ভক্তির মন্দাকিনী-ধারা সঞ্চারিত হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শুভ জন্মতিথি আগামী ২১শে অগ্রহায়ণ, ৭ই ডিসেম্বর শনিবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠান সহকারে উদ্‌যাপিত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠ ঃ যথাযোগ্য ভাব-গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গা-দেবীর উপাসনা বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা-মতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজার কয়দিনই আকাশ প্রায় সর্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকে, অষ্টমী ও নবমীর দিন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তথাপি মঠে পূজা ও প্রতিমা দর্শনের জন্য লোক-সমাগমের বিরাম ছিল না। ২৯শে সেপ্টেম্বর মহাষ্টমীর দিন ৭,০০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন; অন্য দুইদিনও বহু ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। মহাষ্টমীর দিন পূর্বাহ্ণে কুমারী-পূজার সময় এবং সন্ধ্যায় সন্ধি-পূজাকালে সর্বাপেক্ষা বেশী ভিড় হয়। শত শত ভক্ত শ্রীশ্রীদুর্গা দেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। শ্রীশ্রীবিজয়া-দশমীর আনন্দোৎসবও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

শাখাকেন্দ্রে ঃ আসানসোল, করিমগঞ্জ, কামারপুকুর, কাঁথি, জয়রামবাটী, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বালিয়াটি, বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, শিলচর, শিলং, শ্রীহট্ট, সোনার গাঁ ও হবিগঞ্জ আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বেলুড় মঠে জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর জ্যোতির্মঠের (বদরিকাশ্রম) শঙ্করাচার্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শান্তানন্দজী মহারাজ সপার্ষদ বেলুড় মঠে আগমন করিয়া রাত্রিবাস করেন। পরদিন প্রাতঃকালে মাননীয় অতিথিবৃন্দ মঠ পরিদর্শন করেন।

শতবার্ষিকী সংবাদ

জামসেদপুর ঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ৮ই সেপ্টেম্বর বিহারের রাজ্যপাল শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির সুসজ্জিত ভবনে এক অতি মনোহর প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন এবং জন্ম-শতবার্ষিক উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। মূল উৎসব আগামী ডিসেম্বরে পক্ষাধিক কালব্যাপী পালন করা হইবে।

প্রদর্শনীটির তিনটি বিভাগ ছিল; প্রথমতঃ স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের হস্তশিল্প ও কলাবিদ্যার নিদর্শন। প্রধানতঃ উক্ত সোসাইটি-পরিচালিত বিদ্যালয়-সমূহেরই ছাত্রছাত্রী দ্বারা এই সকল নির্মিত। দ্বিতীয় বিভাগে স্বামীজীর জীবন ও বাণী চিত্রে বুঝানো হইয়াছে। তৃতীয় বিভাগে স্বামীজীর জীবনের প্রধান ঘটনাবলী ৩০টি মডেলের দ্বারা দেখানো হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের কৃতিত্ব আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের। প্রদর্শনীটি এতই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, উহা ৮ই হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলা রাখার কথা ছিল, কিন্তু জনসাধারণের সনির্বন্ধ অনুরোধে সময় বৃদ্ধি করিয়া ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলা রাখিতে হয়।

বিহার-রাজ্যপাল সোসাইটি-প্রাঙ্গণে এক ভাবগম্ভীর ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে জামসেদপুরের দুই সহস্রাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে প্রায় সার্ধ একঘণ্টা কালব্যাপী এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। এই ভাষণে শ্রীআয়েঙ্গার স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া বলেন, স্বামীজী ভারতের

তথা প্রাচ্যের শাশ্বত ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জামসেদপুর শতবার্ষিক কর্মসূচীতে একটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রের জন্য দুইটি বৃত্তি-ব্যবস্থার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

রেঙ্গুন-সংবাদ

গত ২৭শে অগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ বিমানযোগে রেঙ্গুনে গমন করেন, তাঁহার সঙ্গে যান স্বামী দয়ানন্দ।

রেঙ্গুন সেবাশ্রম ও সোসাইটির সাধুবৃন্দ ও ২৫০ জন ভক্ত তাঁহাদিগকে সংবর্ধনা করিবার জন্য বিমান-ঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন।

পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ রেঙ্গুন সেবাশ্রমে অবস্থান করেন এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। ৩০শে অগস্ট তিনি স্বামী দয়ানন্দজীর সহিত পেগুর প্যাগোডা ও শ্রীবুদ্ধের প্রসিদ্ধ শয়ান মূর্তি দর্শন করেন।

১লা সেপ্টেম্বর শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ রেঙ্গুন সেবাশ্রমে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী স্মারক ভবনের পূর্বদিকের পরিবর্ধিত অংশের উদ্বোধন করেন। এখানে দুইটি ওয়ার্ডে পুরুষদের জন্য ২২টি এবং শিশুদের জন্য ২০টি শয্যা থাকিবে। পূজ্যপাদ মহারাজ শতবার্ষিকী স্মারক ভবনের পশ্চিম দিকে নির্মীয়মাণ অংশের স্মৃতি-ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন। এই অনুষ্ঠানে ৫০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কার্যবিবরণী

টাকী : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৬১-৬২ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্রমের পরিচালনায় আছে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, তিনটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি ছাত্রাবাস ও একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়। একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় নিকটবর্তী কিশোর-নগরে অবস্থিত, বাকীগুলি আশ্রম-ভূমিতে অবস্থিত।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ৫৫ জন ছাত্র ছিল,—তন্মধ্যে ৫ জন বিনা খরচে।

উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৩৫৫। আশ্রম-প্রাঙ্গণে অবস্থিত বালক ও বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৬০ ও ১২৫। দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৫৪,০৬৩ রোগী চিকিৎসিত হয়।

সর্বসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব-প্রচারের উদ্দেশ্যে সাময়িক উৎসবাদির যথাযথভাবে আয়োজন করা হয়। ২৯ জন বালক ও ৬ জন শিক্ষকের একটি দল শিক্ষামূলক ভ্রমণ উপলক্ষে কানপুর, লখনৌ, আগ্রা, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি পরিদর্শন করে।

বিশাখাপত্তনম্ : রামকৃষ্ণ আশ্রম বঙ্গোপসাগরের মনোরম উপকূলে ১৯৩৮ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আশ্রমের ১৯৬১-৬২ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশ: আশ্রমে নিত্যপূজা এবং একাদশীতে রামনাম-সঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি গ্রন্থাগার পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৮,৩৩০; পাঠাগারে ৬টি সংবাদপত্র এবং ২০টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। সারদা শিশু-বিদ্যালয়ে ২৪৪টি শিশু পড়ে এবং ৯ জন শিক্ষক শিক্ষাদান-কার্যে নিযুক্ত আছেন। শিশুদের লাইব্রেরিতে সচিত্র পুস্তক রাখা হইয়াছে। শিশুশিক্ষার জন্য শ্রুতি-চাক্ষুষী (audio-visual) শিক্ষার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

শ্যামলাতাল : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল '৬১—মার্চ '৬২) প্রকাশিত হইয়াছে। ৪,৯৪৪ ফুট উচ্চে হিমালয়ের সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশে সেবাশ্রমটি ১৯১৪ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫ মাইলের মধ্যে কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় না থাকায় প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই এই সেবাশ্রমটি অসহায় ও দরিদ্র পার্বতীয়দের একমাত্র চিকিৎসার স্থান

সেবাশ্রমে দুইটি বিভাগ : বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ। অন্তর্বিভাগে ১২টি শয্যা (bed) আছে। এ পর্যন্ত উভয় বিভাগে মোট ২,১১,২৪৭ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৮,৪৫৬ (নূতন ৭,০৬৯) ; অন্তর্বিভাগে ১৭৭ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

পশু-চিকিৎসালয় : গৃহপালিত মূক প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য এই বিভাগটি ১৯৩৯ খৃঃ খোলা হয়। এ পর্যন্ত ৫৫,২১২ পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে। অস্ত্র-চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে ১,৮৭৪ পশু চিকিৎসিত হয়।

কনখল : সেবাশ্রমটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে হরিদ্বারের নিকটে অবস্থিত। ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। ১৯০১ খৃঃ স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের ৬১তম বর্ষের (এপ্রিল, '৬১—মার্চ, '৬২) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে

আলোচ্য বর্ষে ৫০টি শয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে ১,৪৪১ রোগী ভরতি হয় এবং ১,২৭২ রোগী আরোগ্য লাভ করে।

বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৮৬,৭৮০ (নূতন ২০,৮১৮); অস্ত্র-চিকিৎসা ৭৭৯, দন্তচিকিৎসা ৩৪০, চক্ষুকর্ণাদি চিকিৎসা ১,৮১৫ ইলেক্‌ট্রো-থেরাপি চিকিৎসা ৬০৮। ল্যাবরেটরিতে ৩,৫৪৫ নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা ৪,২৪৫ ; পাঠাগারে ৫টি সংবাদপত্র এবং ৩২টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি) নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১ টার সময় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ এবং বুধবার রাত্রি ৮ টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বক্তৃতা দেন।

মার্চ, '৬৩ : স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ; ভারতের পথ ; বাহিরে কিছুই নাই, সবই অন্তরে ; একাগ্রতার পদ্ধতি ; জীবাত্মার দুঃখের রাত্রি ; বেদান্তে যুক্তি ও অনুভূতির স্থান ; মরিবার পূর্বে যাহা আমাদের অবশ্যই করা উচিত ; শ্রীরামকৃষ্ণ : গৃহীদিগের প্রতি তাঁহার উপদেশ ; দিব্যজ্ঞান ও সত্যের সংযোগ।

এপ্রিল : স্বামী বিবেকানন্দের মানুষ তৈরীর ধর্ম ; প্রতিটি দিন কিভাবে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করা যায় ? দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া পূর্ণতা ; 'পুনরভ্যুত্থান ও জীবন—আমিই' ; কেন আমরা জন্মগ্রহণ করি ? বেদান্তই পাশ্চাত্য জগৎকে সর্বাপেক্ষা উত্তম বস্তু দিতে পারে ; শঙ্করাচার্য ও তাঁহার অদ্বৈতবাদ ; সচেতন মনের গুরুত্ব।

মে : স্বপ্নের অর্থ কি ? সাধন-জীবনের প্রস্তুতি ; বুদ্ধ ও বেদান্ত ; চরিত্র ও ঈশ্বর-দর্শন ; শান্তি কোথায় ? কেন আমাদের অহংকার আছে ? কিভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে

হয়? অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা; স্বামী বিবেকানন্দের অসমাপ্ত কার্যক্রম।

জুন: আমরা ঈশ্বরকে দর্শন করি, কিন্তু তাঁহাকে জানি না; বেদান্তের সমাধি ও বৌদ্ধমতে নির্বাণ; ইন্দ্রিয়ানুভূতি, যুক্তি ও আনন্দপ্রদ দর্শন; শরীর এবং মনের যৌগিক শিক্ষা; বুদ্ধ ও বর্তমান মানুষ; তোমার আত্মা কিরূপ পুরাতন? অতীন্দ্রিয় দর্শনে সত্য; বাক্য ও চিন্তা যেখান হইতে ফিরিয়া আসে; শক্তির জাগরণ।

পুরাতন মন্দিরে প্রতি রবিবার রাত্রি ৮ টায় ধ্যান এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের ক্লাস করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। নূতন মন্দিরে প্রতিদিন পূজা হয়; বেদীর সম্মুখের হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে বেদান্ত-অধ্যাপনা

আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশের অন্তর্গত সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) বিবেকানন্দ-কুটিরে চতুর্থ গ্রীষ্মকালীন বেদান্ত-অধ্যাপনা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১১ই হইতে ২৪শে অগস্ট দুই সপ্তাহ যাবৎ প্রতিদিন সকাল ১০টা হইতে দুই ঘণ্টা স্বামী নিখিলানন্দ মুণ্ডকোপনিষৎ ব্যাখ্যা করেন। গড়ে ২৪ জন ছাত্র এই ক্লাসে যোগদান করেন।

সন্ধ্যায় প্রার্থনা-গৃহে (যে ঘরটিতে স্বামীজী ১৮৯৫ খৃঃ গ্রীষ্মকালে ছিলেন) ছাত্রগণ সমবেত-ভাবে প্রার্থনায় যোগ দিতেন এবং ধ্যানাভ্যাস করিতেন। এই সব ছাত্র দূর দূর অঞ্চলের অধিবাসী, একজন দূরবর্তী হাওয়াই দ্বীপ হইতে আসিয়াছিলেন। সহস্রদ্বীপোদ্যানে প্রতি বৎসর এই ধরনের বেদান্ত-অধ্যাপনায় মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

বিবিধ সংবাদ

স্বামীজীর শতবার্ষিকী

রামেশ্বরম্: গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন রামনাথস্বামী মন্দিরের প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-সৌধের আবরণ উন্মোচন-কালে সকলকে ধর্ম-সম্পর্কে সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর অনুশীলন করিতে আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন: স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম বলিতে বুঝিতেন—অনুভূতি, অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং মানবজাতির সেবা। স্বামীজী শুধু আধ্যাত্মিক গুরুই ছিলেন না, সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন, ঈশ্বরের নামে অসাম্য ও অবিচার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

শ্রীরাজেশ্বর সেতুপতি (তাঁহার পরলোক-গত পিতা ভাস্কর সেতুপতিই মুখ্যতঃ শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীকে যোগ দিতে উৎসাহিত ও সাহায্য করেন) রাষ্ট্রপতিকে সংবর্ধনা জানান।

আজমীর: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে রাজস্থানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও স্কুল-কলেজে স্বামীজীর শত-বার্ষিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা ও ভজনাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামীজীর চিত্র-সংবলিত বাণী সহস্র সহস্র সংখ্যায় বিতরিত হইয়াছে। এই পর্যায়ে মোট ৩৯টি স্থানে উৎসবের আয়োজন করা হয়।

গয়া: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ৮ই সেপ্টেম্বর স্থানীয় টাউন-হলে মগধ

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহতী সভায় ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তা স্বামীজীর সর্বতোমুখী প্রতিভার বিষয় সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। পরদিন মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা আয়োজিত হয়।

২২শে সেপ্টেম্বর আশ্রমে ষোড়শোপচারে পূজা, চণ্ডীপাঠ ও ভজন হয়। প্রায় ১৫০০ ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বদরপুর (কাছাড়): শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৯শে হইতে ২১শে এপ্রিল স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব শোভাযাত্রা, পূজাপাঠ, ভজন-কীর্তন, ছায়া-চিত্র-প্রদর্শন, ধর্মমূলক যাত্রাভিনয়, ব্যায়াম-প্রদর্শনী, প্রসাদ-বিতরণ, কবিগান প্রভৃতির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ধর্মসভায় শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম, শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। স্বামী শিবরামানন্দ পাঠাগার ও হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন।

ব্যাঁটরা (হাওড়া): অনাথবন্ধু সমিতির উদ্যোগে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর স্বামীজীর শত-বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক মহতী সভায় স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে সময়োপযোগী মনোজ্ঞ আলোচনা করেন শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, শ্রীহরিপদ ভারতী এবং স্বামী জীবানন্দ। উৎসবের অঙ্গ-হিসাবে পূজাপাঠ ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কার্যবিবরণী

চেতলা: শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডপের বার্ষিক (১৯৬১-৬২) কার্যবিবরণীতে প্রকাশ: আলোচ্য বর্ষে এখানে পূজা, শাস্ত্রপাঠ, ধর্মালোচনা, উৎসব ও নরনারায়ণ-সেবা নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। হোমিও-প্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৮,৬২৩ (নূতন ৫,৪১০) রোগী চিকিৎসিত হয়। এই মণ্ডপের ফলতা শাখা আশ্রমটি ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

বারাসত (২৪ পরগনা): রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের বার্ষিক (১৯৬০-৬২) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষ-গুলিতে মন্দিরে নিয়মিত পূজাপাঠ, সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাপুরুষ মহারাজের উৎসব বিশেষ আয়োজন সহকারে উদ্‌যাপিত হয়। আশ্রম কর্তৃক একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার পরিচালিত হইতেছে এবং দরিদ্র রোগীদিগকে ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে।

ইন্দোনেশীয় ভাষায় স্বামীজীর রচনাবলী

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলী ইন্দোনেশীয় ভাষায় অনুবাদ অনুমোদন করিয়াছেন এবং উহার ভূমিকা লিখিয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া আন্তারা সংবাদ সরবরাহ সংস্থা এক সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। —এ. এফ. পি

ভ্রম-সংশোধন

আশ্বিন-সংখ্যার (১) ৪৬৯ পৃঃ প্রথম পঙ্‌ক্তিতে '১৮৮২' স্থলে '১৮৬২' পড়িবেন।

(২) ৪৬৬ পৃঃ প্রথম কলমের শেষ দিকে 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্রের' স্থলে 'মুকুন্দমালাস্তোত্রের' পড়িবেন।



মাতৃসঙ্গীত

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বাগেশ্রী—একতাল

স্বরলিপি : অধ্যক্ষ শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী

ঠাকুর আমার মা এনেছে দেখ্‌বি যদি আয়।
এমন স্নেহময়ী মা তো কেউ দেখেনি হায়॥
যে মাকে রামকৃষ্ণ নিজে জবা-বিল্বদলে পুজে,
(তাঁর) সাধনা সব সাঙ্গ ক'রে, নমি' রাঙা পায়॥
লক্ষ কোটি মা'র প্রাণে যাঁর স্নেহের কণা বয়।
সেই মা আজি নিজেই বিলায় স্নেহ বিশ্বময়॥
মায়ের নামে ডেকেছে বান, মা-নামে নাচে ভগবান্‌।
মায়ের নামে ডেকেছে বান—মুক্ত হ'ল লক্ষ পরাণ।
(আজি) স্নেহের মন্দাকিনী কিরে—নামিল ধরায়।

০ ১ + ৩
I মর্সা ধর্সা ণধা। ধা ধপা মা I মা ধা ধা। পধা ণর্সা ণধা I
ঠা০ কু০ ০র আ মা০ র মা ০ এ নে০ ০০ ছে০

মা জ্ঞা জ্ঞা। া জ্ঞা রা I রা া জ্ঞরা। সা া া I
দে খ্‌ বি ০ য দি আ ০ ০০ য় ০ ০

সরা সরা সা। ণা ধা ণা I সা সা মজ্ঞা। রা সা া I
এ০ ম০ ন স্নে হ ০ ম য়ী ০০ মা তো ০

মা ধা ধা। মধা ণর্সা ণা I র্র্সা া া। া া া I II
কে উ দে খে০ ০ নি হা০ ০ ০ য় ০ ০

II{ ধা মা মা। ধা ধা ণা I ধা র্সা র্সা। ণা র্র্সা া I
যে ০ মা কে রা ম কৃ ষ্‌ ণ নি জে০ ০

সর্রা র্সর্রা র্সা। ণা ধা ণা I র্সর্রা র্সা র্মজ্ঞা। র্রজ্ঞা র্রা সা} I
জ০ বা০ ০ বি ০ ল্ব দ০ লে ০০ পূ০ জে০ ০

র্সা র্সা র্মজ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞর্রা র্সা I র্সা র্রা র্সা। ণর্সা ণর্সা া I
সা ধ ০০ না সং ব সা ঙ্ গ কং রে০ ০

মা ধা া। মধা ণর্সা ণা I র্সা া া। া া া I II
ন মি ০ রা০ ০০ ঙা পা ০ ০ য়্ ০ ০

০ ১ + ৩
I সা া সা। সমা মা মা I সা মা সা। মা মা জ্ঞা I
ল ০ ক্ষ কো০ টি ০ মা র প্রা ণে ধাঁ র

জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা মা I রা া জ্ঞরা। সা া া I
স্নে হে র ক ণা ০ ব ০ ০০ য় ০ ০

ণ্া ণ্া সা। মা মা মা I মা ধা ধা। র্সণা ধা ধা I
সে ই মা আ জি ০ নি জে ই বি০ লা য়

মা মপা ধপা। জ্ঞা া মা I রা া জ্ঞরা। সা া া I II
স্নে হ০ ০০ বি ০ শ্ব ম ০ ০০ য় ০ ০

০ ১ + ৩
I{ ধা মা মা। ধা ধা া I ধা র্সা া। ণা র্রর্সা র্সা I
মা য়ে র না মে ০ ডে কে ০ ছে বা ন

ণা র্রা র্সা। ণা ধা ণা I র্সা র্মা র্জ্ঞা। র্রা র্সা র্সা }I
মা ০ না মে ০ না চে ০ ভ গ বা ন

{ ধা মা মা। ধা ধা া I ধা র্সা া। ণা র্সা র্সা I
মা য়ে র না মে ০ ডে কে ০ ছে বা ন

র্সা র্মা র্মা। র্জ্ঞা র্জ্ঞর্রা র্সা I র্সা র্রা র্সর্রর্সা। (ণর্সা ণর্সা া)} পর্সা ণর্সা মমা
মু ক্ ত হ লো০ ০ ল ০ ক্ষ০০ প০ রা০ ণ প০ রাণআজি

মা ধা ধা। মধা ণর্সা ণধা I মা জ্ঞা মা। রা সা া I
স্নে হে র ম০ ০ন্ দা০ কি নী ০ কি রে ০

সা সমা া। জ্ঞা রা জ্ঞা I রা া া। সা া া I
না মি০ ০ ল ০ ধ রা ০ ০ য় ০ ০

সা সা মা। মধা ণর্সা ণা I র্রর্সা া া। া া া I
না মি ০ ল০ ০০ ধ রা০ ০ ০ য় ০ ০

মা মধা ধা। ধণা র্সা র্সা I ধণা র্সর্রা র্জ্ঞর্রা। র্সণা ধ ম I II II
না মি০ ০ ল০ ০ ধ রা০ ০০ ০০ ০০ ০ য়

কথাপ্রসঙ্গে

'ঘুমন্ত লিভিয়াথান'

বিরাট ভারতীয় জনতা সম্বন্ধে স্বামীজী 'Sleeping leviathan' (স্লীপিং লিভিয়াথান = ঘুমন্ত জলজন্তু) কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন একাধিকবার—কখনও আশায়, কখনও হতাশায়। কথাটির সুগভীর তাৎপর্য বোধ হয় আজও নির্ণীত হয় নাই, হইলে ভারতীয় জনগণ আজও 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' আচ্ছন্ন থাকিত না। মাঝে মাঝে তাহার ঘুম ভাঙিয়াছে, কিন্তু আবার গভীর ঘুমে সে ডুবিয়া গিয়াছে—যেমন যায় সেই পৌরাণিক লিভিয়াথান! সে বিরাট, সে ভয়াবহ, কিন্তু তার সাড়া জাগে না, সাড়া জাগিতে তার লাগে অবিশ্বাস্য দীর্ঘ সময়।

হিব্রুপুরাণে বর্ণিত লিভিয়াথান (levyathan) বিরাট কুম্ভীরাকৃতি। একদা ইহা ছিল মিশরের প্রতীক, পরবর্তী কালের হিব্রু লেখকগণ বর্ণনা করিয়াছেন, গ্রহণকালে লিভিয়াথানই চন্দ্র-সূর্যকে গ্রাস করে। গ্রীকো-রোমান পুরাণে লিভিয়াথান বলিতে বিরাট জলদানবকেই (Sea-monster) বুঝায়, মাঝে মাঝে সে জল হইতে উঠিয়া স্থলভাগে ধ্বংসের সূচনা করে, তারপর আবার জলেই ফিরিয়া যায়। তাহার শক্তি রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে পৌরাণিক কথাটি আছে, কিন্তু তাহার অর্থের বিবর্তন ঘটিয়াছে। বিরাটকায় জলজন্তু 'লিভিয়াথান', তিমি অথবা তিমিঙ্গিলই এখন বোধ হয় তাহার বংশধর। সে আর আজ জল হইতে উঠে না। চন্দ্র-সূর্যও গ্রাস করে না, তবে জলযাত্রীদের জীবন বিপন্ন করিতে পারে। শোনা যায়—একবার এক জাহাজের যাত্রিদল সমুদ্রমধ্যে বিরাট প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া তাহাতে অবতরণ করে এবং রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া তাহারই উপর অগ্নি সংযোগ করে—প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে খাদ্যদ্রব্য যখন প্রায় প্রস্তুত, তখন প্রস্তরখণ্ডটি হুস করিয়া ডুবিয়া গেল। যাত্রিদল বিপন্ন হইয়া মধ্যসমুদ্রে ভাসিতে লাগিল—কোনক্রমে জীবন লইয়া জাহাজে উঠিল। পরে নাবিকগণ বুঝিলেন—ইনিই ঘুমন্ত লিভিয়াথান!

ভারতীয় জনতাকে স্বামীজী 'ঘুমন্ত লিভিয়াথান' বলিয়াছেন কোন অর্থে? ভারতীয় জনতা কি জলদানবের মতো ক্ষতিকারক, অথবা শুধু মহাশক্তিধর—এই অর্থে? মহাশক্তি তাহাতে সুপ্ত আছে, একদিন উহা জাগিবে—এই অর্থই মনে হয় সমীচীন। বর্তমানের অবস্থা অসাড় প্রতিক্রিয়াহীন অথবা অতি-বিলম্বে সামান্য একটু সাড়া জাগে, অতি সামান্য প্রতিক্রিয়ার পর সে আবার ঘুমাইয়া পড়ে। জলজন্তুর মতো তাহার রক্ত শীতল, জলজন্তুর মতো তাহার প্রতিক্রিয়া মন্থর। তামোগুণের মূর্ত প্রতীক ভারতায় জনতা। নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ—ইহাই তো তমোগুণের লক্ষণ।

সুদীর্ঘ পরিব্রাজক-জীবনে স্বামীজীর ভারত-ভ্রমণ নবযুগের ভারত-দর্শন। স্বামীজী দেখিয়াছেন—ভারত মৃত নয়, নিদ্রিত। এই সুসমাচারই তিনি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন: ভারত মরে নাই—ভারতাত্মা মরিতে পারে না, ভারতীয় জনতা নিদ্রিত। শীঘ্রই তাহার ঘুম ভাঙিবে। 'সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া', ঘুম এখনই ভাঙিতেছে—ধীরে ধীরে ভাঙিতেছে। যখন সম্পূর্ণভাবে যুগযুগব্যাপী নিদ্রা অপগত হইবে, তখন এই জাতি তাহার স্বাধিকার-

বোধে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিশ্বসভায় তাহার যথাযোগ্য স্থান সে অর্জন করিয়া লইবে।—এই আশার বাণী স্বামীজী শুনাইয়া গিয়াছেন। ক্রান্তদর্শী দৃষ্টি লইয়া তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন—কেন এই মহান্ জাতি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কতদিন ঘুমাইতেছে, কিভাবে ইহার ঘুম ভাঙিবে! জাগরণের ঋষির সেই দর্শন আমরা কিঞ্চিৎ অনুধ্যান করি :

'এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে ব্যাস শুক জনকাদিও বর্তমান ছিলেন। বৌদ্ধদের পর হ'তে ধর্মটা একেবারে অনাদৃত হ'ল; খালি মোক্ষমার্গ ই প্রধান হ'ল।

ফল কথা, এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনেছ, ওটা ঐ 'ধর্মে'র অভাব। যদি দেশসুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে তো ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হ'লে ত্যাগ হয় না। আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে।

হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে 'ধর্মের' চেয়ে মোক্ষটা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐ খানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত ক'রে ফেললে আর কি?'

স্বামীজীর এই বিশ্লেষণে দেখা যায়—সাধারণ-পক্ষে ক্রিয়াপর ধর্মকেই তিনি আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। এই 'ধর্ম' চতুর্বর্গের প্রথম সোপান। এই ধর্মের ভিত্তির উপরই দণ্ডায়মান সমাজ সংসার—সবকিছু! এই ধর্ম সংস্থাপন করিতেই যুগে যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হন।

ব্যক্তিগতভাবে ভগবান্ বুদ্ধকে অসীম শ্রদ্ধা করিলেও নির্বাণ বা মোক্ষের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার জন্য স্বামীজী বৌদ্ধধর্মকেই দায়ী করিয়াছেন ভারতের অধঃপতনের জন্য। স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ক্ষত্রিয়েরাই প্রকৃত নেতা ছিলেন। দলে দলে তাঁহারাই বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। সংস্কার ও ধর্মান্তর করণের উৎসাহে সংস্কৃত ভাষা উপেক্ষিত হইয়া লোক-প্রচলিত ভাষা সমূহের চর্চা প্রবল হইয়াছিল। আর অধিকাংশ ক্ষত্রিয়ই বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃত শিক্ষার বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।'

বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের দিক দিয়া সুবিধা হইলেও ভারতের সংহতির দিক দিয়া ক্ষতি হইয়াছিল, এবং আজও আমরা শতধা-বিচ্ছিন্ন দুর্বল এক মহাজাতি, কিছুতেই এক হইতে পারিতেছি না; কিছুতেই শক্তিসংগ্রহ করিতে পারিতেছি না।

এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্বলতা ও অনৈক্যের জন্যই ভারত যে-কোন আক্রমণকারীর পদানত হইয়াছে। ভারতের একাংশ যখন পরাধীন হইয়াছে, অন্য অংশে তখন কোন সাড়া বা প্রতিক্রিয়া জাগে নাই, যখন সামান্য চেতনা জাগিয়াছে—তখন আর কোন উপায় নাই। ধীরে ধীরে সমগ্র দেশ পদানত হইয়াছে। এই ইতিহাসই বারংবার পুনরাবৃত্ত হইয়াছে, কি মধ্যযুগে, কি আধুনিক যুগে! কিন্তু চিরকালই কি এইভাবে চলিবে? কিভাবে প্রতিরোধ সম্ভব? —সমাজ-সংস্কার দ্বারা জাতীয় ঐক্য আসে নাই, রাজনীতিক আন্দোলনের ফলে জাতির মধ্যে অধিকতর অনৈক্যই দেখা দিয়াছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র প্রাচ্যের জলবায়ুতে কতটা সহ্য হইবে, দেশে-বিদেশে আজ তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে, ফল বিশেষ আশাপ্রদ নহে।

ভারতের স্থায়ী উন্নতির জন্য স্বামীজী ভারতের জনগণের উন্নতির উপরই জোর দিতে বলিয়াছেন। কারণ তাঁহার মতে ভারতের অবনতি ও পরাধীনতার মূল কারণ জনগণকে

অবহেলা করা। জাতির চরম মুহূর্তে দেখা গেল—জনগণ নিশ্চেষ্ট, অসাড়, অশিক্ষিত। যে পথে পতন হইয়াছে—তাহার বিপরীতেই উত্থান সুনিশ্চয়। কুমারিকা অন্তরীপে ধ্যানমগ্ন বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ভাবেই প্রকটিত হইয়াছিল।

তাই দেখা যায়, সমাজ-মুখী বিবেকানন্দ ঘোষণা করিলেন: ওঠ জাগো, ঘুমের সময় শেষ হইয়াছে। দীর্ঘকাল আমরা ঘুমাইয়াছি, আর নয়। অভ্রান্তভাবে তিনি বলিলেন: ধর্মই ভারতের প্রাণ, আর জনগণের অবহেলাই আমাদের জাতীয় মহাপাপ। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা করিয়াছি সহস্র বৎসরের পরাধীনতা দ্বারা; আর নয়। এবার জাতিকে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে—স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জনগণের উন্নয়ন করিতে হইবে—তাহাদের নিজ নিজ ধর্মভাবে আঘাত না করিয়া। উদার ধর্মভাবের সহিত আধুনিক বিজ্ঞান—ইহাই স্বামীজী-রচিত জনশিক্ষার পাঠ্যসূচী।

গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে বহুবিধ উন্নয়ন-প্রচেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি স্বামীজীর নির্দিষ্ট পথে কিছুটা অগ্রসর হইয়া সহজতর অন্য পথে নামিয়া গিয়াছে, জাতীয় উন্নতির নামে রাজনীতিক আন্দোলন অনেক সময় গণ-আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করিয়াছে, মনে হইয়াছে—এই বুঝি ভারতের জনতা জাগিয়া উঠিল। পরে দেখা গিয়াছে—জাগে নাই, ঘুমাইয়াই সে পাশ ফিরিয়াছে, আবার গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে। বার বার স্বামীজী বলিয়াছেন ভারতের প্রাণ ধর্মে, ধর্মের তন্ত্রীতে ধ্বনি তুলিতে পারিলেই ভারত জাগিয়া উঠিবে, এবং এবার যে উঠিবে বহুকাল জাগ্রত থাকিয়া জগতের কল্যাণ করিবে।

ভারতীয় সমাজে জনগণ বলিতে আজ শূদ্রকেই বুঝায়, সমাজের নিম্নস্তরে—সমাজবৃক্ষের মূলে তাহারা শ্রমিক বা কৃষক। কিন্তু প্রশ্ন উঠে, উচ্চস্তরে কে বা কাহারা আছে? কেহই নাই, যাহারা আছে বলিয়া মনে হইতেছে, তাহারা শূন্যে বিলীয়মান! মূলে জলসেচনের অভাবে বৃক্ষ আজ স্থাণুতে পরিণত, ফল ফুল দূরের কথা—পত্র পর্যন্ত তিরোহিত।

এই বিরাট বৃক্ষকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে মূলে জলসেচন দ্বারা। মূলে সেচন বলিতে স্বামীজী বুঝিতেন—জনগণের যুগোপযোগী শিক্ষা। যে শিক্ষা সহায়ে তাহারা দুটি অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিবে এবং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইবে। এ জন্যই তিনি চাহিতেন বিজ্ঞানের সহিত বেদান্ত-শিক্ষা। তথাকথিত লোকাচারমূলক ধর্ম বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশী করিয়াছে, ঐগুলি তাহাদিগকে দুর্বল করিয়াছে, আত্ম-বিশ্বাসহীন করিয়াছে, ঐগুলি তাহাদের অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া পঙ্গু করিয়াছে। যথার্থ আত্মভিত্তিক শিক্ষা জনগণকে শক্ত সবল করিবে, আত্মনির্ভর করিবে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষার আর প্রয়োজন নাই, বা ইহাই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য। অধ্যাত্মভিত্তিক শিক্ষা যে মুষ্টিমেয় সংসারত্যাগীর জন্য, তাহা নহে। সমষ্টি-মুক্তির জন্য, সমষ্টি-কল্যাণের জন্য সকল শিক্ষার ভিত্তি আত্মার উপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, কারণ একমাত্র আত্মাই সত্য ও সনাতন; এবং সত্যই মঙ্গলের নিদান, সনাতনই দেশকালের ঊর্ধ্বে।

অদ্বৈত বেদান্তের এই আত্মতত্ত্ব কি ভাবে জনশিক্ষার পাঠ্যসূচীতে আসিতে পারে, এবং কেনই বা ইহা প্রয়োজন, এ-কথা স্বামীজী বহু-বার বহুভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শেষতঃ

বলিয়াছেন, বেদান্ত আমরা আবিষ্কার করিয়াছি, কিন্তু উহারা (পাশ্চাত্য) কাজে লাগাইয়াছে। আমরা অদ্বৈততত্ত্ব লইয়া তর্কবিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করি, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ! কিন্তু কার্যতঃ বলি, 'দূরমপসর রে চণ্ডাল'—তাই আমাদের এই দুর্গতি। আমাদের কাজে ও কথায় মিল নাই, আমাদের ভাবের ঘরে চুরি। কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষ এমন শিক্ষা পায়, যাহার ফলে সে মনে করে, 'আমি সব করিতে পারি'। বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধানে কত সাধক মৃত্যুর মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে অকুতোভয়ে। স্বামীজীর মতে এই অকুতোভয়তাই বেদান্ত।

কতবার তিনি আইরিশ উদ্‌বাস্তু প্যাটের কথা বলিয়াছেন। হতাশার প্রতিমূর্তি প্যাট নিউইয়র্কের রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তিন দিনে সে ঘাড় উঁচু করিয়া চলিতে শেখে, চতুর্থ দিনে সে পুরা 'মানুষ' হইয়া যায়—চারিদিকের অনুকূল পরিবেশে সকলের উৎসাহে তাহার ভিতরের 'ব্রহ্ম' জাগিয়া উঠেন।

ইহাই কার্যকারী বেদান্ত।

বেদান্ত বা উপনিষদই ভারতের প্রাণধর্ম। বুদ্ধ চাহিয়াছিলেন, উহা জনগণের মধ্যেও সঞ্চারিত করিতে, জনগণ উহা ধরিতে পারে পারে নাই। শঙ্কর-প্রচারিত বেদান্ত শুধু বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্‌দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। স্বামীজী বলিতেছেন, আবার উহা জনগণের মধ্যে দিবার চেষ্টা হইতেছে—এবার অন্যভাবে। এবার জনগণ উহা গ্রহণ করিবে, সময় হইয়াছে।

ঋষির দৃষ্টি লইয়া স্বামীজী দেখিয়াছেন, যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, সেদিন হইতে সত্যযুগের সূত্রপাত। সত্যযুগ বা স্বর্ণযুগ সাম্য ও সমন্বয়ের যুগ, সামঞ্জস্যের যুগ, বিরোধ-বিদ্বেষ অবসানের যুগ। অসাম্যমূলক প্রতিযোগিতা থাকিবে না; জাতিতে জাতিতে বিরোধ, ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ অতীতের বস্তুতে পরিণত হইবে। ইহা সম্ভব। যদি সমগ্র পৃথিবীর জনগণ তাহাদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া একযোগে কাজ করে, তবে কোন শক্তি নাই, তাহাদের দাবাইয়া রাখে।

জনগণের এই মহান্ অভ্যুত্থান লক্ষ্য করিয়াই স্বামীজী নবভারতের জয়গান গাহিয়া গিয়াছেন: ···নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে, বেরুক মুদির দোকান থেকে ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোড়-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে। নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে। আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না, এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি; এত প্রীতি, এত ভালবাসা এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত খাটা, এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম !! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। কিভাবে উহা বর্তমানে রূপায়িত হইবে? সে সম্বন্ধে স্বামীজী বলিতেছেন:

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা।
কালো হ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী ॥

আমার সমধর্মা কেহ আছে, বা কালে উৎপন্ন হইবে। কাল অনন্ত, পৃথিবীও বিপুল! আজ না হয় কাল এ কার্য নিশ্চয় কেহ সম্পন্ন করিবে।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী

কেন্দ্রীয় কমিটি বিজ্ঞাপিত সমাপ্তি-অনুষ্ঠানের কার্যসূচী

স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সমাপ্তি-উৎসবের অনুষ্ঠান ১৫. ১২. ১৯৬৩ আরম্ভ হইবে এবং ১৫. ১. ১৯৬৪ শেষ হইবে।

১.	শোভাযাত্রা	১৫ই ডিসেম্বর, রবিবার
২	প্রদর্শনী (একমাস যাবৎ)	১৬ই „ হইতে
৩.	নিখিল ভারত ছাত্র-সম্মেলন (৩ দিন)	১৯শে „ „
৪.	„ „ সঙ্গীত-সম্মেলন („)	২২শে „ „
৫.	„ „ মহিলা-সম্মেলন („)	২৬শে „ „
৬.	ধর্ম-মহাসভা (সপ্তাহব্যাপী)	৩০শে „ „ ৫ই জানুআরি, ১৯৬৪ পর্যন্ত
৭.	প্রদর্শনীর সহিত আনন্দানুষ্ঠান	৬ই হইতে ১৫ই জানুআরি

স্থানঃ পার্ক সার্কাস ময়দান।

শোভাযাত্রা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিক কমিটির উদ্যোগে ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার যে শোভাযাত্রা বাহির হইবে, তাহার একটি অংশ দক্ষিণ কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্ক হইতে এবং অপর অংশ উত্তর কলিকাতার দেশবন্ধু পার্ক হইতে বাহির হইবে। প্রথমটি রাসবিহারী এভেন্যু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড দিয়া আসিয়া কলিকাতা ময়দানে উপস্থিত হইবে। দ্বিতীয়টি শ্যামবাজারের মোড় হইয়া কর্নওয়ালিস স্ট্রীট (বর্তমানে বিধান সরণি) দিয়া বিবেকানন্দ রোড ধরিয়া চিত্তরঞ্জন এভেন্যু দিয়া অগ্রসর হইবে। উভয় শোভাযাত্রা আনুমানিক বেলা ১২ টায় যাত্রা শুরু করিবে এবং ময়দানে বেলা ৪টার সময় মিলিত হইবে। তৎপরে ময়দানে মনুমেন্টের পাদদেশে আয়োজিত বিরাট জনসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর বাণী ও জীবন-দর্শন অবলম্বনে ভাষণ দিবেন।

জানাই প্রণাম

শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার বসু

আজি হ'তে শত বর্ষ স্মৃতির ফলকে
স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস সদাই ঝলকে ;
হে বীর বিবেকানন্দ যুগের দেবতা,
আদিগন্ত প্রসারিত তোমার বারতা,
করিয়াছে সমুজ্জ্বল। উচ্ছল ধারায়
প্রাণের প্রবাহ তব সর্বলোকে ধায়—
অমৃতের বাণী লয়ে। তোমার পরশে
হয় সঞ্জীবিত, শিহরণ জাগিল হরষে,
আকাশে বাতাসে আর তারায় তারায়,
আসমুদ্র হিমাচলে। গঙ্গোত্রী-ধারায়,
পৃথিবীর কোণে কোণে আনিলে প্লাবন,
চূর্ণ করি মানুষের সঙ্কীর্ণ বাঁধন।
তমসা বিদীর্ণ করি সত্যের আলোক—
এক সূত্রে গাঁথা সব দ্যুলোক ভূলোক।
ওঠো, জাগো তবে আজ জীব-শিব হেরি
সবার মাঝারে। অখণ্ড চৈতন্য ঘেরি
রয় চরাচরে ; উদয়াস্ত জীবনেতে
প্রতি দণ্ড পল, ধুয়ে দাও সিঞ্চনেতে
প্রেম সুধা দিয়ে।
অমৃতের পুত্র তুমি,
জ্ঞানেরে মথন করি পুণ্য করি ভূমি,
দিলে যে অমৃত, সে অমৃত পান করি
পাইল শকতি। বিশ্বজন নিল ভরি
প্রাণপাত্রে ; পূরবের দিক্‌চক্রবালে
তোমার উদয়, ছিন্ন করি তমোজালে
হানিয়া আঘাত। পশ্চিমের দম্ভদ্বার
চূর্ণ করি, মহাবীর কর একাকার।

সত্যের সারথি তুমি চালাইলে রথ
বিশ্বজয় লাগি ; সিদ্ধ হ'ল মনোরথ
হে প্রেমসুন্দর ! জীবনে জীবনে তাই
বাজাইলে প্রেমশঙ্খ, আজও ভোলে নাই
বিশ্বের মানব। নিগূঢ় জীবন রসে
পরিপূর্ণ হিয়া তাই উঠিল হরষে—
তোমার কল্যাণ-মন্ত্রে। পূরব-পশ্চিমে
ওঠে মহা আলোড়ন ধ্বনিল সঘনে
বেদের অমরবাণী জ্ঞানের আলোকে
জ্ঞান, কর্ম, ভক্তিতত্ত্ব পশে লোকে লোকে।
ভারত-গৌরব তুমি, বঙ্গের ভূষণ
যুগে যুগে হে স্বামীজী রবে চিরন্তন
মানব-হৃদয়ে। শতবর্ষ-পূজা আজ
হইবে উজ্জ্বলতম ওহে মহারাজ।
তোমার আদর্শ সাথে হবে আগুয়ান
মিলিবে মানবযাত্রী হয়ে মহীয়ান্
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে। সে শুভ লগন
আসে আজ ধরণীতে। করিয়া স্মরণ-
হবে সবার উদয় ; ভক্তি ভরে তাই,
তোমার চরণে কোটী প্রণাম জানাই।

শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটি পত্র

[স্বামী শান্তানন্দকে লিখিত]

শ্রীশ্রীহরিঃ সহায় জয়রামবাটী

৫, ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৮।২।১৬

পরম শুভাশীর্বাদ,

পরে বাবাজীবন খগেন, তোমার পত্র পাইলাম। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। তারককে, জিতেনকে, চন্দ্রকে আমার আশীর্বাদ দিবে। এখানের কুশল। তোমরা ভাল আছ শুনে সুখী হইলাম। আর কি লিখিব। আমি অমনি ভাল আছি। ইতি—

তোমাদের মাতা।

শ্রীশ্রীহরিঃ জয়রামবাটী

২০শে আষাঢ় (৪।৭।১৭)

পরম আশীর্বাদ,

পরে বাবাজীবন খগেন, তোমার অনেকদিন পরে পত্র পাইয়া সন্তোষ হইলাম। তুমি সমস্ত দর্শন করিয়াছ শুনে সুখী হইলাম। তাঁকে ডাকবে। তিনিই তোমাদের ভক্তি (দিবেন) এবং রক্ষে করবেন। আমার শরীর একপ্রকার ভাল আছে। রাধুর খুব অসুখ হইয়াছিল, উপস্থিত ভাল আছে। ওখানের ভক্তদের সকলকে আমার আশীর্বাদ দিবে। এখানের মঙ্গল। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। তোমাদের কুশল মধ্যে মধ্যে দিবে। ইতি—

তোমাদের মাতা

জয় মা জয়রামবাটী

কল্যাণবরেষু ২৪।৯।১৭

বাবাজীবন, তোমার পত্রে সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। আমি ও রাধু ভাল আছি। তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমার ভাল মতন দর্শন হইবে। আশ্রমের ছেলেদের আমার স্নেহাশীর্বাদ দিও। ইতি—আশীর্বাদিকা

তোমার মা

[জনৈক ভক্তকে লিখিত]

শ্রীগুরুঃ শরণম্ জয়রামবাটী

কল্যাণবরেষু ১৬ই আষাঢ়

বাবাজীবন, তোমার পত্র ও প্রেরিত টাকা পাঁচটি পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আশীর্বাদ জানিবে এবং বৌমা ও ছেলেদিগকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে। আমি উপস্থিত ভাল আছি এবং বাটীর সকলে ভাল আছে। সম্ভবতঃ ৺দুর্গাপূজার পর কলিকাতা যাইতে পারি। মালা যখন ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তখন মালা জপ নাই বা করিলে। মনে মনেই জপ করিবে। আশা করি তোমাদের কুশল। ইতি—

আশীর্বাদিকা

তোমার মাতাঠাকুরাণী

ওঁ রামকৃষ্ণো জয়তি

পরম শুভাশীর্বাদ বাবাজীবন, তোমার পত্রখানি বহুদিন পরে আজ পাইলাম ও পরম আনন্দ লাভ করিলাম।...তুমি এত ভাবনা করিও না। জগতের গতি একমাত্র তিনি, তাঁহাকে মনের সহিত ডাক, তিনি সর্বদা রক্ষা করিবেন,...তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে ও সকলকে জানাইবে। আমার শরীর তত ভাল নাই, কারণ বাতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি; সেজন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না। বাড়ির সকলে উপস্থিত ভাল আছেন। ইতি—

তোমার মঙ্গলময়ী মাতৃদেবী

সন ১৩১৬ সাল, ২৬শে মাঘ।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি ১৯১৩ খৃঃ জয়রামবাটীতে। শিলং হইতে আগত দুই তিন জন ভক্তের সহিত গরুর গাড়ি চড়িয়া বিষ্ণুপুর হইতে রওনা হইলাম। জয়রাম-বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি গিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়া একটু বেলা হইয়াছে। সংবাদ পাইবামাত্র মা ডাকিয়া পাঠাইলেন। সকলে প্রণাম করিয়া উঠিলে আমাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে ছেলেটি গো, কেন এসেছে?'

আমার বয়স তখন তের চৌদ্দ। পরিচয় শুনিয়া বলিলেন, 'তাই তো ভাবছিলুম, এ মুখ যেন আমার চেনা। বৌ-মায়ের মুখের সঙ্গে খুব মিল আছে, ঠিক এক-রকম।'

বৌমা—অর্থাৎ আমার দিদি। তিনি পূর্বেই শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। সকলের দেখাদেখি আমিও প্রণাম করিলাম। চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইলেন এবং মাথায় গায়ে হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। শিলং-এর ভক্তদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, পরদিন তাহাদের দীক্ষা হইবে।

দীক্ষাপ্রার্থী ভক্তেরা পরদিন প্রভাতেই স্নানার্থে ও ফুল সংগ্রহার্থে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমিও ইত্যবসরে বাহির হইয়া পড়িলাম জয়রামবাটী গ্রামটি ঘুরিয়া দেখিবার জন্য।

বেলা প্রায় ৯টা। জয়রামবাটীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একজন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, 'তুমি এখানে কি ক'রছ? মা ডাকছেন, শীগগির এস।' তাহার সহিত গিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। দেখিলাম—ভক্তদিগকে দীক্ষাদান শেষ করিয়া বোধহয় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। নিকটে যাইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বাবা, তুমি মন্ত্র নেবে?'

অপ্রত্যাশিত এই আহ্বানে আমি বিস্মিত হইলাম। দীক্ষা লইবার কোন কল্পনা আমার ছিল না। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা পাওয়া যে আমার পক্ষে সম্ভব, তাহাও আমার ধারণাতীত ছিল। আমি জয়রামবাটি গিয়াছিলাম শ্রীশ্রীমা কেমন—তাহা দেখিবার জন্য। তাই অপ্রত্যাশিত আহ্বানে আশ্চর্য ও উৎফুল্ল হইলাম। মুখে কথা ফুটিল না। বুক কাঁপিতে লাগিল।

আমাকে নির্বাক্ দেখিয়া মা বলিলেন, 'যাও, শীগগির স্নান ক'রে এসো। আমি অপেক্ষা ক'রব।'

নিকটেই কলুপুকুরে একটা ডুব দিয়া আসিলাম। মায়ের কাছে গিয়া দেখি, দক্ষিণ-মুখো পূজার ঘরে পূজার আসনে মা বসিয়া আছেন। পাশের একটি আসনে আমাকে বসিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর আমার জন্য নির্ণীত মন্ত্রটি কয়েকবার উচ্চারণ করিয়া আঙুলে গণনা রাখিবার পদ্ধতিটি দেখাইয়া দিলেন। আমি ঠিকমত বুঝিয়াছি কিনা—বোধহয় সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য আমাকে জপ করিতে বলিলেন। আমার মন্ত্রোচ্চারণ ও অঙ্গুলি-গণনা নির্ভুল হইয়াছে দেখিয়া খুশী হইয়া বলিলেন, 'ঠিক হয়েছে। এইটি আর মনে থাকবে না? খুব থাকবে।'

কয়েকটি ফল হাতে দিয়া বলিলেন,

'ওগুলি আমার হাতে দাও। দক্ষিণা দিতে হয়।' আদেশ পালন করিলে বলিলেন, 'এখন পা ছুঁয়ে প্রণাম কর।' আবেগে শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেই বলিলেন, 'একটু দাঁড়াও।'

ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে শিকায় ঝুলানো হাঁড়ি হইতে দুইটি মোয়া বাহির করিয়া স্বয়ং দাঁতে কাটিয়া একটু খাইলেন। তাহার পর ঐ মোয়া-দুটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে খেয়ে নাও।'

এই আমার প্রথমবার দীক্ষা। আমার কিশোর-জীবনের অভাবনীয় ঘটনা। অহেতুকী কৃপার কথা শুনিয়াছি,—ইহা কি তাই? কাচ কুড়াইতে গিয়া পরশমণি পাইলাম। কোন অনুরোধ বা প্রার্থনা করিতে হইল না। করুণাময়ী জননী কৃপা করিয়া ডাকিয়া দীক্ষা দান করিলেন।

* * *

প্রায় পাঁচ বৎসর পরের কথা। ১৯১৯ খৃঃ জানুআরি মাস। শ্রীশ্রীমা কলিকাতা হইতে জয়রামবাটী যাইতেছেন। বিষ্ণুপুরে প্রিয় ভক্ত সুরেশবাবুর বাড়িতে কয়েক দিন বিশ্রাম করিবেন। সঙ্গে কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী।

সংবাদ পাইয়া স্নানান্তে কিছু ফুল সংগ্রহ করিয়া রওনা হইলাম। বাড়ির দরজায় আসিয়া প্রবেশ-পথে বাধা পাইলাম। একজন ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'আজ আর হবে না। মা বড় ক্লান্ত।' কাকুতি মিনতি করিলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জোর করিয়া ঢুকিতে গেলাম, পারিলাম না। হাতে মাতৃপূজার জন্য অঞ্জলি-ভরা ফুল, চোখে জল! চাহিয়া দেখি—সকলের চোখে কৌতুক, মুখে চাপা হাসি। একজন সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নাম কি তোর? পড়াশুনা ছেড়ে কেন এসেছিস এখানে?' আরও কত প্রশ্ন। যথাযথ উত্তর দিলাম। নিজেকে নিতান্ত অসহায় ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। ঠিক এই সময়ে কে একজন আসিয়া বলিলেন, 'অমূল্য কার নাম? কোথায় ছেলেটি? মা ডাকছেন।'

যিনি আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত চলিলাম মাতৃ-সন্দর্শনে। চোখ মুছিয়া লইলাম। ঢুকিয়াই দেখি ডান দিকের ঘরে চৌকির উপরে বসিয়া জগজ্জননী মা। পা-দুখানি মেঝেতে নামানো। পা-দুটি একটু ফ্যাকাশে ও শীর্ণ। নীল শিরাগুলি দেখা যাইতেছে। মুখ দেখিয়া মনে হইল, বড় রোগা হইয়া গিয়াছেন। মায়ের পশ্চাতে চৌকির এক পাশে রাধু শুইয়া আছে। বোধ হইল অসুস্থ।

মায়ের পায়ের উপরে ফুলগুলি রাখিয়া প্রণাম করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মা বোধহয় মনের কথা বুঝিলেন। বলিলেন, 'কাছে এস বাবা, কিছু বলবে?'

মা চৌকির উপরে বসিয়া। মায়ের পায়ের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া আমি আমার মনের কথাগুলি বলিলাম। শুনিয়া প্রসন্ন মুখে মা কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। ঘরের মধ্যে যে দু-এক জন ছিলেন, তাঁহাদিগকে একটু বাহিরে যাইতে বলিয়া আমাকে বলিলেন, 'আজ অপর একটি মন্ত্র দিচ্ছি তোমাকে, মন দিয়ে শোন। এই মন্ত্রটি এখন জপ করবে। আগেরটি দ্বাদশবার জপলেই হবে।' এই বলিয়া মৃদুস্বরে মন্ত্রটি কয়েকবার উচ্চারণ করিলেন।

এই মহামন্ত্র কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র আমার সারা অন্তর অপূর্ব পুলকে ভরিয়া উঠিল। মনে হইল—এই মন্ত্রটির জন্য বহু জন্ম ধরিয়া আমি প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। যে ফুলগুলি দিয়া শ্রীশ্রীমায়ের চরণ পূজা করিয়াছিলাম, সেগুলি কুড়াইয়া লইলাম।

বাহিরে আসিতেই সেই ব্রহ্মচারীটি—যিনি আমার প্রবেশ পথে বাধা দিয়াছিলেন—তিনি পুনরায় আমাকে টানিয়া লইয়া গেলেন সেই সন্ন্যাসীর কাছে। দেখিলাম—সেই গম্ভীর-প্রকৃতি সন্ন্যাসীর চোখে করুণা, মুখে মৃদু হাসি। ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি আমাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

সাংখ্য- ও যোগ-দর্শন

(পূর্বানুবৃত্তি)

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

সাংখ্যের তত্ত্ব ও সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মতই প্রায় যোগদর্শনের তত্ত্ব ও সৃষ্টি প্রভৃতির প্রক্রিয়া। এই যোগদর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য যোগ। চিত্তবৃত্তির নিরোধকে 'যোগ' বলে। সেই যোগ সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে দুই প্রকার। এই যোগের অপর নাম 'সমাধি'। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির নিরোধ হয়, কিন্তু সাত্ত্বিক বৃত্তি থাকে। যে সমাধিতে ধ্যেয় বিষয় সম্যক্ প্রজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ সাক্ষাৎকার হয়, তাহাকে 'সম্প্রজ্ঞাত সমাধি' বলে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। অথবা বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতারূপ বিশেষাকারে সাক্ষাৎকার বা প্রজ্ঞা সম্যক্‌রূপে এই সমাধিতে থাকে বলিয়া ইহার নাম 'সম্প্রজ্ঞাত'। এই জন্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চার প্রকার—বিতর্কানুগত, বিচারানুগত, আনন্দানুগত ও অস্মিতানুগত।

সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধ যে সমাধিতে হয়, তাহাকে 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি' বলে। যে সমাধিতে কিছুই জানা যায় না অর্থাৎ কোন বৃত্তি থাকে না, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেই মুখ্য 'রাজযোগ' বলে। 'হঠযোগ-প্রদীপিকা'র টীকাকার ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন—'রাজযোগশ্চ সর্ববৃত্তিনিরোধ-লক্ষণোঽসম্প্রজ্ঞাতযোগঃ।' এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভের জন্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবশ্যক বলিয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে গৌণ ভাবে 'রাজযোগ' বলে। প্রাণায়ামকে রাজযোগ বলে না। উহা রাজযোগের উপায়-মাত্র বা যোগাঙ্গ। 'প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা' এই যোগসূত্র লক্ষ্য করিলেও তাহা বুঝা যায়। সূত্রের অর্থ—প্রাণবায়ুর রেচন-পূর্বক কুম্ভকের দ্বারা চিত্তপ্রসন্নতা লাভ-পূর্বক সমাধি-সিদ্ধি হয়। এই জন্য যোগদর্শনে সমাধির প্রাধান্য, প্রাণায়ামের প্রাধান্য নাই। সেই সমাধি প্রাণায়াম ব্যতিরেকেও যে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা যোগদর্শনের প্রথম পাদে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে। যেমন স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞান অবলম্বনে বা বীতরাগচিত্তাবলম্বনে বা বিশোকাজ্যোতি-ষ্মতী বা যথাভিমত ধ্যান বা প্রচ্ছর্দনবিধারণ ইত্যাদি বিকল্পের দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধিক্রমে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়।

প্রথমে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দুই প্রকার বলা হইয়াছে যথা : ভবপ্রত্যয় ও উপায়প্রত্যয়। ভবপ্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির দ্বারা কৈবল্য মুক্তি হয় না, এইজন্য তাহা হেয় বলিয়া উপায়-প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা পরে বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও প্রজ্ঞারূপ বিবেকপূর্বক উপায়-প্রত্যয় নামক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়।

আবার শ্রদ্ধা বীর্য প্রভৃতি সাধন-সম্পন্ন যোগিগণকে মৃদু উপায়, মধ্য উপায় ও অধিমাত্র উপায় এবং ইহাদের প্রত্যেককে আবার মৃদু সংবেগ, মধ্যসংবেগ ও তীব্র সংবেগ এই তিন ভাগে মোট নয় প্রকার ভাগ করিয়া—মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র ও অধিমাত্রতীব্র—এই তীব্র বৈরাগ্য-যুক্ত তিন প্রকার যোগীর শীঘ্র সমাধিলাভ হয়—ইহা বলিয়া এই শেষোক্ত তিনজনের মধ্যে অধি-মাত্রোপায় তীব্রসংবেগ যোগীর সর্বাপেক্ষা শীঘ্র সমাধিলাভ হয়, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

পরে এই তীব্রবৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তিরই সমাধি লাভ হয় অর্থাৎ তীব্রবৈরাগ্যের দ্বারাই আসন্নতম সমাধি-সিদ্ধি হয় অথবা অন্য কোন উপায় আছে?—এই আশঙ্কার উত্তরে 'ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা' অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষের দ্বারা মন্দবৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিরও আসন্নতম (অসম্প্রজ্ঞাত) সমাধি লাভ ও তাহার ফল সিদ্ধ হয়—ইহা স্পষ্টভাবে যোগসূত্রে প্রথম পাদে বলা হইয়াছে। 'যোগবার্তিকে' এই সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

সুতরাং প্রাণায়াম ব্যতিরেকে রাজযোগ সিদ্ধ হয় না—ইহা যোগসূত্রকারের অভিপ্রায় নহে। তবে যে দ্বিতীয় পাদে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি রূপ অষ্ট যোগাঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যুত্থিতচিত্ত সাধকের জন্য। অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা উত্তম অধিকারী, যাঁহাদের চিত্ত বাহ্য বিষয় হইতে বিরত, যাঁহারা অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্, তাঁহারা প্রথমপাদোক্ত যে-কোন একটি উপায় অবলম্বন করিয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধিক্রমে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিবেন। কিন্তু যাঁহারা কথঞ্চিৎ ব্যুত্থিত-চিত্ত অথচ মুক্তি-লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষাবান্ এইরূপ মধ্যম অধিকারীর জন্য দ্বিতীয় পাদে যম, নিয়ম প্রভৃতি অষ্ট প্রকার যোগাঙ্গের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আর যাঁহারা আরও ব্যুত্থিতচিত্ত, অধম অধিকারী তাঁহাদের জন্য সেই দ্বিতীয় পাদে তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান-রূপ ক্রিয়াযোগের কথা বলা হইয়াছে। অবশ্য প্রথমপাদোক্ত—'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা' [যোগসূত্র ১।২৩] ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দে ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষ বুঝানো হইয়াছে। কারণ উহা সাক্ষাৎ সমাধি-লাভের উপায় এবং উত্তম অধিকারীর জন্য। আর দ্বিতীয়পাদোক্ত ক্রিয়াযোগরূপ যে ঈশ্বর-প্রণিধান তাহা গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগ—ইহা বুঝিতে হইবে। আরও কথা এই—প্রাণায়াম যে সমাধি-লাভের জন্য যোগসূত্র-কারের মতে অবশ্য অপেক্ষিত নহে, তাহা 'ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্বেভ্যঃ' [যোগসূত্র ৩।৭] অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিন যোগাঙ্গ, পূর্বোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহাররূপ পঞ্চ যোগাঙ্গ হইতে সমাধি (অঙ্গী) লাভের অন্তরঙ্গ উপায়—এই উক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয়। এই সূত্রের বার্তিকে বিজ্ঞান-ভিক্ষু গরুড়পুরাণের বচন উঠাইয়া দেখাইয়াছেন যে, আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগের (সমাধির) সাধক নহে। যথা:

আসনস্থানবিধয়ো ন যোগস্য প্রসাধকাঃ।
বিলম্বজননাঃ সর্বে বিস্তরাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
শিশুপালঃ সিদ্ধিমাপ স্মরণাভ্যাসগৌরবাৎ॥

—আসন, স্থান প্রভৃতি বিধি যোগের সাধক নহে। উহারা বরং সমাধিলাভে বিলম্ব উৎপাদন করে। এই সব আসন-প্রাণায়ামাদি—নানা শাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে কীর্তিত হইয়াছে। শিশুপাল (শত্রুভাবে হইলেও) প্রবল ঈশ্বর-স্মরণের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

আরও কথা এই যে, প্রাণায়াম—হঠযোগে অবশ্য অপেক্ষিত, রাজযোগে অপেক্ষিত নহে। কারণ হঠযোগ বলিতে—'হ' অর্থাৎ সূর্য এবং 'ঠ' অর্থাৎ চন্দ্র এই দুই-এর যোগ অর্থাৎ প্রাণ ও অপানের যোগ। এই প্রাণাপানের যোগ কুম্ভক ব্যতিরেকে হইতে পারে না। আর রাজযোগ স্বরূপতঃ সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ঐ সমাধি হঠযোগের দ্বারাও লাভ হয় অর্থাৎ কুম্ভকের দ্বারা লাভ হয়। হঠযোগ স্বয়ংসিদ্ধ যোগ নহে—অর্থাৎ হঠযোগের দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ হয় না, কিন্তু রাজ-যোগের দ্বারা হঠযোগ মুক্তির কারণ। ইহা

'হঠযোগ-প্রদীপিকা', 'গোরক্ষসংহিতা' প্রভৃতি হঠযোগ-গ্রন্থে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। যথা :

হঠং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হঠঃ।
ন সিধ্যতি ততো যুগ্মমানিষ্পত্তেঃ সমভ্যসেৎ ॥
—হঠযোগ-প্রদীপিকা ২।৭৬

—হঠযোগ ব্যতিরেকে রাজযোগ সিদ্ধ হয় না। আবার রাজযোগ ব্যতিরেকে হঠযোগ মুক্তির কারণ হয় না। অতএব সিদ্ধি পর্যন্ত উভয়যোগ অভ্যাস করিবে। এই বিষয়ে আরও বহু প্রমাণ আছে। বিস্তারভয়ে তাহা উল্লিখিত হইল না। মোট কথা রাজযোগ বা যোগদর্শনে সমাধির কথাই প্রধানভাবে বলা হইয়াছে এবং সেই সমাধি (সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত) নানা উপায়ে লাভ হইতে পারে, ইহাও যোগসূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

যোগ-দর্শনে নিত্য-ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে। অবশ্য তাঁহাদের মতে ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতি- ও লয়-কর্তা নহে। সাংখ্যের মতই যোগদর্শনে প্রকৃতি জগৎসৃষ্ট্যাদিকর্ত্রী, আর ঈশ্বর সেই সৃষ্ট্যাদিতে নিমিত্ত-মাত্র। 'নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।' এই সূত্রের বার্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন : প্রকৃতিই স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট্যাদি করে ; ঈশ্বর, কর্ম প্রভৃতি নিমিত্ত-মাত্র। মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা থাকে। প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থারূপ সৃষ্টির প্রতিবন্ধক যে সাম্যাবস্থা, ঈশ্বর সেই সাম্যাবস্থারূপ আবরণকে ভগ্ন করিয়া উদ্বোধক-মাত্র হন। ঈশ্বর করুণাবশতঃ জীবের উদ্ধারের জন্য তাহাকে ধর্ম ও জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া গুরু হইলেও আদি-গুরু নহেন। ঈশ্বর ব্রহ্মাদিরও গুরু। এই ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। এই ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষ দ্বারা ক্ষিপ্র সমাধি-লাভ ও তাহার ফল মুক্তিপ্রাপ্তি হইয়া যায়। সাংখ্যের ন্যায় যোগদর্শনেও আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তির স্বরূপ এবং এই মুক্তি—জীবন্মুক্তি ও কৈবল্যমুক্তি ভেদে দুই প্রকার। সাংখ্য—জ্ঞান-প্রধান, যোগ—সমাধি-প্রধান। যোগদর্শন-মতে চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ—এই পাঁচ প্রকার অবস্থা। প্রথম তিন প্রকার অবস্থায় যোগ সিদ্ধ হয় না। একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থাতেই যোগ সিদ্ধ হয়। অতএব মুমুক্ষু একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিই যোগশাস্ত্রের অধিকারী। উক্ত অধিকারী যদি উত্তম হন, তাহা হইলে তিনি গুরুর নিকট হইতে যোগ-শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া মনন করিবেন। তারপর যে-কোন গুরূপদিষ্ট উপায় অবলম্বন-পূর্বক সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস করিবেন। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অথবা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির দৃঢ় অবস্থায় আত্মানাত্ম-বিবেক সাক্ষাৎকার অর্থাৎ আমি প্রকৃতি নহি, আমি শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ নিত্য বুদ্ধ, কূটস্থ, অধিকারী—এইরূপ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ জ্ঞান হইলেই তখন যোগী জীবন্মুক্ত হইয়া যান। কিন্তু ঐ আত্মজ্ঞানের দ্বারা সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম ক্ষয় হইলেও প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হয় না। এইজন্য আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারবান্ যোগী অত্যন্ত বৈরাগ্য-বশতঃ প্রারব্ধকেও লোপ করিয়া দিতে কৃত সংকল্প হইয়া পরবৈরাগ্য অর্থাৎ আত্মানাত্ম-বিবেক সাক্ষাৎকারের প্রসন্নতা বা দৃঢ়তার দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস করেন। পরবৈরাগ্যই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি-লাভের একমাত্র উপায়। এই পরবৈরাগ্য জ্ঞানের প্রসন্নতামাত্র অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠা, আর কিছু নহে—ইহা যোগ-ভাষ্যকার পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন। আর সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতেই যে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়, তাহা বাচস্পতিমিশ্র এবং বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহাদের ব্যাখ্যাতে উল্লেখ

করিয়াছেন। এইভাবে আত্মতত্ত্বজ্ঞ যোগী অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া প্রথম প্রথম ব্যুত্থান-সংস্কার-বশতঃ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া কিছু কিছু (অতি অল্প) প্রারব্ধভোগ করেন। ক্রমশঃ অভ্যাসের দৃঢ়তা যতই বাড়িতে থাকে অর্থাৎ নিরোধ-সংস্কারের বৃদ্ধিতে ততই সমাধিকাল দীর্ঘ, দীর্ঘতর হইতে থাকে। পরে অভ্যাসের দৃঢ়তার চরমে যখন যোগী চরম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা লাভ করেন, তখন তিনি নিজে তো দূরের কথা, অপরেও তাঁহাকে ব্যুত্থিত করিতে পারেন না। সেই অবস্থায় যোগীর চিত্ত চিরকালের মতো প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায় এবং তাঁহার সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয় শরীরও সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিতে লীন হয়। তখন যোগী স্ব-স্বরূপাবস্থারূপ কৈবল্য-মুক্তি লাভ করেন। জ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধ নষ্ট হয় না, কিন্তু একমাত্র যোগের দ্বারাই প্রারব্ধও নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া যোগের উৎকর্ষ যোগদর্শনে কীর্তিত হইয়াছে। 'নাস্তি সাংখ্য-সমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্।'

শ্রীভগবান্ গীতাতেও বলিয়াছেন:

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী
জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী
তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন॥

যোগের শ্রেষ্ঠতার আরও কারণ এই যে—যোগ হইতে আত্মজ্ঞান হয় এবং যোগ হইতে প্রারব্ধও নষ্ট হয়। সম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে আত্মজ্ঞান হয়। আর অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে কৈবল্যমুক্তি অতিশীঘ্র হয়। এই জন্য যোগকে জ্ঞানের কারণ ও জ্ঞান-জন্য বলা হয়। অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি জ্ঞানের জনক আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, জ্ঞান-জন্য। মধ্যম অধিকারী যোগশাস্ত্র শ্রবণ-মননের সঙ্গে সঙ্গে অথবা শ্রবণ-মননপূর্বক ক্রমে ক্রমে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানপূর্বক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার লাভপূর্বক ক্রমে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিবেন।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটিকে যোগের অঙ্গ বলা হইয়াছে। এখানে যম হইতে ধ্যান পর্যন্ত সাতটি যোগের অঙ্গ হয়; সমাধি কিরূপে যোগের অঙ্গ হয়? কারণ যোগ বলিতে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত—এই উভয় প্রকার সমাধিকে বুঝানো হইয়া থাকে। তাহা হইলে এই যোগের অঙ্গরূপ সমাধিটিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা যায় না। কারণ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিটি অঙ্গী; আর সেইই অঙ্গ হইতে পারে না। যদি বলা যায়, এখানে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিটি অঙ্গী আর যোগাঙ্গ অর্থাৎ তাহার অঙ্গ হইতেছে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহাও বলা যায় না। কারণ—যোগসূত্রের ভাষ্যে প্রথমেই সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত এই উভয়কেই যোগ বলিয়াছেন। সুতরাং সেই সম্প্রজ্ঞাত আবার যোগের অঙ্গ হইতে পারে না। এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন যে, অঙ্গরূপ সমাধি হইতেছে—সাক্ষাৎকারশূন্য একাগ্রচিত্ত; আর অঙ্গী যোগ অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতেছে—সাক্ষাৎকার-যুক্ত একাগ্রচিত্ত। তাৎপর্য এই যে, ধ্যানের পরিপকতাক্রমে যখন প্রথম প্রথম সমাধি হয়, তখন সেই সমাধিতে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেও বিশেষভাবে সাক্ষাৎকার হয় না, সামান্য ভাবেই হয়। এইজন্য উহাকে প্রায় সাক্ষাৎকার বলা যায় না। ঐ সমাধিকেই যোগের অঙ্গ বলা হইয়াছে। এই সমাধির দৃঢ়তা দ্বারা পরে যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়, তাহাতে ধ্যেয় বস্তুর

বিশেষভাবে সাক্ষাৎকার হয়। উহা অঙ্গী-রূপ যোগ। আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি তো অঙ্গী বটেই। যোগদর্শনে যে বিভূতিগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যোগের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যোগসাধনা করিতে করিতে ঐগুলি যোগীর স্বতই উদ্ভূত হয়, তাহাতে যোগের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ায় যাহাতে যোগী দৃঢ়ভাবে সাধনে প্রবৃত্ত হয়—তাহারই জন্য উহার বর্ণনা। সাংখ্যে শব্দকে বর্ণাত্মক সুতরাং অনিত্য বলা হইয়াছে। কিন্তু যোগ-দর্শনে শব্দকে বর্ণাতিরিক্ত নিত্য স্ফোট-স্বরূপ বলা হইয়াছে। যোগের তত্ত্ব ২৬ প্রকার। যেহেতু সাংখ্যের অপেক্ষা যোগ ঈশ্বররূপ অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। যোগসূত্রে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির নাম সমাপত্তি বলা হইয়াছে। যোগসূত্র [১।৪১।৪২]। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি যদি গ্রহীতা অর্থাৎ আত্মাকে অবলম্বন না করিয়া গ্রাহ্য অনাত্মাকে অবলম্বন করিয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে সবীজ সমাধি বলে অর্থাৎ দুঃখের জনক সংস্কাররূপ বীজ তাহাতে থাকে। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিমাত্রই সবীজ। কারণ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির দ্বারা জ্ঞান-সংস্কার নষ্ট হয় না। আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ব্যুত্থানসংস্কার এবং প্রজ্ঞা-সংস্কার সমস্তই নিরুদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া তাহাকে নির্বীজ সমাধি বলে। এই যোগ বা সমাধিকে রাজযোগ বলার আর একটি হেতু এই যে—ইহা যোগসমূহের রাজা। কেন যোগসমূহের রাজা, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। (যেহেতু ইহাতে আত্মজ্ঞান তো হয়ই, পরন্তু প্রারব্ধও নষ্ট হয়)। আচার্য শঙ্কর বেদান্ত-দর্শনে যোগের তত্ত্ব খণ্ডন করিলেও যোগের খণ্ডন করেন নাই। প্রত্যুত ইহার আত্মজ্ঞানে প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। সমস্ত দর্শনে সমস্ত সাধকে সকল যোগে এই চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের আবশ্যকতা একবাক্যে অপরিহার্য। কর্মযোগেও ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় অল্পবিস্তর চিত্তবৃত্তির নিরোধ স্বীকৃত। ভক্তিযোগে তো কথাই নাই। জ্ঞানযোগে—যদিও 'বিবরণ'ানুসারী ও অন্যান্য একজীববাদী কোন কোন বেদান্তী আত্মজ্ঞানের প্রতি যোগের কারণতা স্বীকার করেন নাই, তথাপি বিপরীত ভাবনারূপ প্রতিবন্ধক নিবৃত্তির জন্য নিদিধ্যাসনরূপ যোগের উপযোগিতা মধ্যম অধিকারীর পক্ষে স্বীকৃত। তাছাড়া বেদান্তবিচার করিতে গেলেও একাগ্রতা আবশ্যক। সুতরাং তাহাতেও যোগের অন্তর্ভাব থাকে। বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য সকল (চার্বাক ব্যতীত) দার্শনিক—এই যোগের উপযোগিতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। এইসব কারণেও ইহাকে 'রাজযোগ' বলা যুক্তিযুক্তই। যোগমতে শব্দ হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। অবশ্য 'বিবরণা'নুসারী প্রভৃতি কোন কোন বৈদান্তিক ব্যতীত কেহই শব্দ হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান স্বীকার করেন না। যোগদর্শনের বার্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষু যোগকে অন্যথা-খ্যাতিবাদী বলিয়াছেন, কিন্তু বাচস্পতির টীকা হইতে তাহা বুঝা যায় না।

লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য

আমাদের ভাষা ও সাহিত্য হাজার বৎসরের প্রাচীন বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। সে-ভাষার মাধ্যমে প্রথমে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা, (১) প্রাচীন সাহিত্য, যাহা পুরাণাদি শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, (২) লোকসাহিত্য, যাহা লৌকিক ধর্মমূলক। সুতরাং তাৎকালিক সাহিত্যে ধর্মবিষয়ক প্রসঙ্গ-ব্যতীত আর কিছুই ছিল না এবং তাহা পদ্যেই নিবদ্ধ ছিল। বলা বাহুল্য, বহুকাল পর্যন্ত এ-দেশের লোকের ধারণা ছিল যে, সাহিত্যে ধর্মবিষয়ক প্রসঙ্গ-ব্যতীত অন্য কিছু পরিবেশিত হইতে পারে না। আমরা তাই পদ্যময় ধর্মপ্রধান সাহিত্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। বিগত হাজার বৎসরের সাহিত্য-প্রচেষ্টার ক্রম-পরিণতিতে আমাদের বর্তমান বিশাল ভাষা ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বর্তমান অবস্থায় আমাদের সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান-লাভে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের ভাষা ও সাহিত্য বহুদিন পর্যন্ত বিরাট সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আদর্শ ও ঐতিহ্যের বাহক ছিল, আধুনিক সাহিত্যেও সে-পরিচয় দুর্লভ নহে। দুঃখের বিষয় আমাদের সাহিত্য-সমালোচকগণের নিকট আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের সে সনাতন রূপটি প্রতিফলিত হয় বলিয়া মনে হয় না। এ যুগের বহুজনের ধারণা—আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের বয়ঃক্রম দেড়শত বৎসরের অধিক নহে এবং বর্তমান শতকেই ইহার বিকাশ ও পরিণতি। বলা বাহুল্য, ইহা দ্বারা শুধু তাঁহাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পায় না, এতদ্দ্বারা তাঁহারা আমাদের জাতীয় ভাবধারার ধারাবাহিকতাও অস্বীকার করিয়া থাকেন। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, অতীতের মগ্ন চেতনা এবং ঐতিহ্যের উপরই বর্তমানের প্রতিষ্ঠা; ইহা অস্বীকার করিলে বাস্তবকে অস্বীকার করা হয়। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পারম্পর্য-ভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের অস্তিত্ব অসম্ভব।

আমাদের ভাষা ও সাহিত্য সহস্র বৎসরের প্রাচীন হইলেও প্রথমার্ধের পর ইহার একটি স্থূল অথচ অনুভূতিগম্য রূপ আমরা পাই। তারপর 'মনসা-মঙ্গল' রচয়িতা বিজয়গুপ্ত হইতে অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের সময় পর্যন্ত লোকসাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান কাল। এই যুগেই লোকসাহিত্যের উপাদান প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হয়। মঙ্গলকাব্য-সমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—বৈষ্ণব, পৌরাণিক ও লৌকিক। ইহাদের মধ্যে লৌকিক মঙ্গলেরই প্রথম সৃষ্টি হয়, তৎপর পৌরাণিক ও বৈষ্ণব মঙ্গলের যুগপৎ প্রাদুর্ভাব। লোকসাহিত্য তথা মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির পূর্বে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতাদি গ্রন্থের অনুবাদ এ-দেশীয় লোকের একমাত্র পাঠ্য বস্তু ছিল। এই সকল অনুবাদেই আমাদের সাহিত্যের সূচনা। ইহার পর লৌকিক ও পৌরাণিক আখ্যানাশ্রয়ী মঙ্গলকাব্যসমূহ এবং পদাবলী-সাহিত্য রচনার দ্বারা সাহিত্য-সৃষ্টির আরম্ভ। ঐ সকল মঙ্গলকাব্যে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সহিতই আমরা কেবল

পরিচিত হই তাহা নহে, তাহাতে আমাদের জাতীয় জীবনের নিত্যকালের যে বৈশিষ্ট্য, তাহার সন্ধানও আমরা পাইয়া থাকি। ঐ সকল কাব্যে সুন্দর ও সুসঙ্গত জাতীয় চরিত্র-সৃষ্টির প্রয়াস দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। যদিও সে-সকল মঙ্গলকাব্যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং রস-বৈচিত্র্য তেমন লক্ষণীয় নহে, তথাপি কবিগণ তাঁহাদের স্ব-স্ব কল্পনা-চাতুর্যে তাঁহাদের নিপুণ তুলিকায় কেবল দেবতার লীলামাহাত্ম্যই চিত্রিত করেন নাই, তাৎকালিক সামাজিক চরিত্রসমূহও তাঁহাদের কাব্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সে-সকল চরিত্রকে অমরত্ব দান করিয়াছে। ঐ সকল চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া আমরা প্রাচীনের সহিত আধুনিকের যোগসূত্র রচনা করিতে পারি এবং সুদূর অতীতেও বর্তমানের পদ-সঞ্চারণ অনুভব করিয়া থাকি।

মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে মনসামঙ্গলই প্রাচীন এবং অধিকতর লোকপ্রিয়। বহু কবি 'মনসার গান' রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মনসামঙ্গলের সতী বেহুলার অপূর্ব সতীত্ব-কাহিনী ভারতীয় যে-কোন সাহিত্যের গৌরবের বস্তু। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন অপূর্ব কাহিনী বাংলাভাষা ভিন্ন অন্য কোন দেশীয় ভাষায় প্রচারিত হয় নাই, যদিও বিহার রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে বেহুলার কাহিনী গীত ও শ্রুত হইয়া থাকে। কোন কবি সংস্কৃত ভাষায়ও এই অপূর্ব সতী-চরিত্র অঙ্কিত করেন নাই, নচেৎ ঐ ভাষার মাধ্যমে বহুপূর্বে অন্য প্রাদেশিক ভাষাতেও ইহা রূপান্তরিত হইতে পারিত। চাঁদ-বেনের দৃঢ়তা, মনসার প্রতিজ্ঞা, সর্বোপরি সতী বেহুলার ত্যাগ ও পতিপ্রেম 'মনসা-পুরাণ'কে অপূর্ব শ্রীতে মণ্ডিত করিয়াছে। বেহুলার চরিত্র মানব-সমাজের আদর্শ হইলেও দেবতা-সমাজে সে আদর্শ দুর্লভ। দেবতা ও মানুষে মনসালীলা সংঘটিত হইয়াছে। দেবতার সঙ্গে মানুষের সংশ্রব অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে এইভাবে জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। এই সার্থক রূপই মনসামঙ্গলের লোকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। বিষয়-মাহাত্ম্যে এবং কাব্যগুণে ও মনসামঙ্গল অতুলনীয়।

রাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের সঙ্গে আমাদের সামাজিক অভ্যুদয় ও পরিবর্তন কি ভাবে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আমরা মঙ্গলকাব্য-সমূহের আলোচনা ও অনুশীলন দ্বারা নিরাকরণ করিতে পারি। বাঙালী সমাজের বৈশিষ্ট্যের প্রমাণস্বরূপ ঐ সকল মঙ্গলকাব্য আজও পল্লীবাসিগণের আনন্দের উৎসস্বরূপ। পদাবলী-সাহিত্য, মনসাপুরাণ এবং চণ্ডীমঙ্গল আমাদের সাহিত্যের স্তম্ভস্বরূপ কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ এবং কাশীরামদাসের মহাভারত আমাদের সাহিত্যের অন্যতম বিরাট স্তম্ভ। ঐ সকল বিরাট স্তম্ভের উপরই আমাদের বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বিজাতীয় সংশ্রব এবং অনুকরণ তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সেই ভিত্তি-মূল হইতে দূরে রাখিলেও আমাদের সরল পল্লীবাসিগণ আজও সে-সকল স্তম্ভের সংস্পর্শ ত্যাগ করে নাই। বলিতে কি বর্তমান বাংলাসাহিত্যের বিশালতা ও মনোহারিতা এ যাবৎকাল তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। আজও পল্লীমায়ের আকাশ-বাতাস শ্যাম-শ্যামার গানে মুখরিত, তাই বুঝি 'কানু ছাড়া গীত নাই, মা ছাড়া বুলি নাই'। বেহুলার পতি-শোকে আজও পল্লীবাসী অশ্রুমোচন করিয়া থাকে। সুমধুর রামায়ণী কথা এবং অমৃতসমান মহাভারতীয় উপাখ্যান সহস্রবার

আবৃত্তি ও শ্রবণ করিয়াও পুণ্যলোভাতুর পল্লীজনের তৃপ্তি হয় না। সে অনাবিল আনন্দ কৃত্রিম নাগরিক জীবনের স্বপ্নেরও অতীত। এই সকল অনুধাবন করিলে ইহা বোধগম্য হয় যে, আমাদের আধুনিক সাহিত্য যেন আগন্তুকের ন্যায় আসিয়া আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তিমূল ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমাদের শতকরা নব্বই জনই পল্লীবাসী, সুতরাং ঐ নব্বই জনের চিন্তা ও ভাবধারার সঙ্গে সংযোগ-স্থাপন ও তাহার রক্ষা অত্যাবশ্যক। ইহাদের সঙ্গে আমাদের বর্তমান সাহিত্য অন্য দেশ ও সমাজের সঙ্গে সংশ্রব-রক্ষার অনুকূল হইলেও ইহা পল্লীবাসী জনের সঙ্গে যোগসূত্র-স্থাপনে তেমন সহায় হইতেছে না। ইহা যদিও অস্বীকার করা যায় না যে, কেহ কেহ সে যোগসূত্র রক্ষায় উদ্যোগী হইয়াছেন, তথাপি যথার্থ নিষ্ঠার এবং সাধনার অভাবে সে প্রচেষ্টা পল্লীজীবনের উপর আশানুরূপ প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হইতেছে না। এজন্য পল্লীবাসীকে অনুদার ও রক্ষণশীল বলিয়া অনুযোগ দিলে আমাদের দোষ স্খালন হইবে না, আমাদের ত্রুটি সম্বন্ধেও সতর্ক হইতে হইবে। আমাদের মনে হয়, পল্লীবাসিগণের সহজাত ধর্ম ও প্রকৃতিই পৃথক্। অন্যান্য দেশীয়েরা যে-ভাবে এবং যে-ধারায় চিন্তা করিয়া থাকেন, আমাদের পল্লীজনেরা সে ভাব ও চিন্তাধারায় অভ্যস্ত নয়। আমাদের পল্লীবাসিগণ ঐহিকতার সঙ্গে আত্মিক সংযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করিয়া থাকে। দৈনন্দিন জীবনে সে আত্মিক সংযোগের ব্যত্যয় বা ব্যাঘাত ঘটিলে তাহাদের বিভ্রান্তি ঘটে। ইহাকে রোগ বলিলেও বলা যাইতে পারে, তবে ইহা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি বলিয়াই গণ্য, ইহাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আমাদের সাহিত্য যতদিন না সে সংযোগ-সাধনে সমর্থ হইয়াছে, ততদিন আমাদের যাবতীয় সাহিত্য-কর্ম সার্থক হইবে না, অর্থাৎ তাহা দ্বারা সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যে সাহিত্য দশাংশের নবাংশকে রহিত করিয়া চলে, তাহা যথার্থ সাহিত্য-পদবাচ্য হইতে পারে না।

লোকসাহিত্যের ন্যায় লোকসঙ্গীতেরও জনপ্রিয়তা অপরিসীম, ইহা পল্লীজীবনের আনন্দের অন্যতম উৎস। বিভিন্ন রসের লোক-সঙ্গীতসমূহ পল্লীজীবনের সুখে দুঃখে, হর্ষে বিষাদে, আশায় নৈরাশ্যে, ক্লান্তিতে ভ্রান্তিতে ও শ্রান্তিতে পরম আশ্রয়। এগুলি বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের যথার্থ আলেখ্য বহন করিতেছে। লোকসঙ্গীত সাধারণতঃ বাউল-ধর্মীয় অধ্যাত্ম-ভাবসম্পন্ন। কোন কোন সঙ্গীত আদিরসাত্মক মনে হইলেও সে-সকলে আধ্যাত্মিক ভাব প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান রহিয়াছে। লোকসঙ্গীতের শান্ত, করুণ, বাৎসল্য বা মধুর রসই প্রধান। এগুলির ভাব ও ভাষা সহজ, সরল এবং স্বতঃস্ফূর্ত। এই গুলিত পল্লী-প্রাণের যথার্থ অভিব্যক্তি বর্তমান রহিয়াছে। এগুলি অকৃত্রিম আনন্দের আকর এবং লোকসাহিত্যের ন্যায় বাঙালীর জাতীয় সম্পদ।

বর্তমানে আমাদের দেশে সঙ্গীতের বিভিন্ন রূপে চর্চা ও অনুশীলন হইয়া তাহা সাধারণ্যে পরিবেশিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা লোক-শিক্ষায় এবং লোকের মনোরঞ্জনে কতদূর সমর্থ তাহা চিন্তনীয়। সঙ্গীত আমাদের শিল্পজ্ঞান জন্মাইবে, রুচি মার্জিত করিবে এবং আনন্দদান করিবে—ইহাই বাঞ্ছনীয়; ইহার রুচিবিকার অথবা কর্ণপীড়ার কারণ হওয়া উচিত নহে। এই প্রসঙ্গে তথাকথিত

আধুনিক সঙ্গীতের সুর ভাব ও ভাষার অভিনবত্ব লক্ষণীয়। সঙ্গীতের অনুশীলন এবং পরিবেশন সম্বন্ধে সঙ্গীত-সমালোচকগণের মন্তব্য যথেষ্ট উৎসাহ-ব্যঞ্জক নহে এবং শ্রোতৃ-সাধারণও পরিবেশিত সঙ্গীতে সন্তুষ্ট নয়, ইহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, সঙ্গীত-বিষয়ে লোকসঙ্গীতেরও একটি স্থান রহিয়াছে। ইহা একাধারে আনন্দবিষয়ক এবং কৃষ্টির বাহক। বারমাসের তের-পার্বণে বাংলা-পল্লী-মায়ের অঙ্গন মুখরিত। এক পার্বণ শেষ না হইতেই অন্য পার্বণের উদ্যোগ। ষড়্‌ঋতুর আবর্তনে প্রকৃতির বিভিন্ন বিচিত্র রূপের বিকাশ। সেই বিকাশের সঙ্গে উৎসবেরও তদনুসারী বিভিন্ন বিচিত্র রূপ। সঙ্গীত ও নৃত্যই এ-সকল উৎসবের বিশিষ্ট অঙ্গ। প্রতি পার্বণে ইহারও আবার বিভিন্ন রূপ ও ভঙ্গী। এ-সকল উৎসবই পল্লী-প্রাণের সঞ্জীবনী সুধা। সেই সুধায় সিঞ্চিত হইয়া পল্লীজীবন নিরবধিকালের প্রবাহে ধাবিত হইতেছে। কবে কোন্ দূর অতীতে কোন্ খ্যাত বা অখ্যাত কবি-কুলের স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠ হইতে সে সঙ্গীত-লহরী একদা বিনিঃসৃত হইয়া লোক-পরম্পরায় আজও সে-ধারা বহিয়া চলিয়াছে, কবে কোন্ অখ্যাত শিল্পীর ধ্যানে নৃত্যের সুঠাম ও ললিত ছন্দ প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল এবং কোন্ দূর অতীতে তাহার প্রকাশ ও বিকাশ—এ-সকল ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্মৃত অতীতের পল্লীমায়ের সে-সকল উল্লাসী দুলাল কবি ও শিল্পীকে নমস্কার।

শ্রাবণের উচ্ছল নদী-প্রবাহে দিবাশেষে নৌকাবাহীর করুণকণ্ঠে গান, 'বল কি সন্ধানে যাই সেখানে রে, আমার বন্ধু যেখানে', অথবা 'মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না, সারা জীবন বাইলাম বৈঠা রে, নৌকা ভাইট্যায় বইত উজায় না' ইত্যাদি মনে কি গভীর ভাবের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কৃষক বা শ্রমিক 'তুষিতে আপন প্রাণ' নিজ মনে যে গান গাহিয়া থাকে, তাহাতে তাহারই কেবল শ্রম অপনোদন হয় না, সে গান তাহার পার্শ্ববর্তী শ্রোতৃমণ্ডলীরও আনন্দবিধান করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণের অভিমত এই যে, সঙ্গীতেও নাকি শস্যের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন হয়। সুষম সঙ্গীতে হিংস্র প্রাণীরাও হিংসা বিস্মৃত হয়। সঙ্গীতের মাহাত্ম্যে ঘোর পাষণ্ডেরও পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয়। মহাপ্রভুর লীলায় জগাই-মাধাই পাষণ্ডের উদ্ধারে মধুর কীর্তনের মাহাত্ম্যই ঘোষণা করে। মনসা-মঙ্গলের কবি ও গায়ক দ্বিজবংশীদাস করুণকণ্ঠে মনসার গান গাহিয়া দস্যু কেনারামের উদ্যত খড়্গ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এ-সকল করুণ এবং মধুর রসাশ্রিত সঙ্গীত পল্লী-সঙ্গীতেরই অন্তর্গত।

শারদপ্রভাতে বঙ্গ বধূগণ শারদলক্ষ্মীর আগমনী গাহিয়া বাৎসল্যরসের অবতারণা করিয়া থাকেন। বৎসর শেষে কন্যা পার্বতীর স্বামী-গৃহ হইতে পিতৃগৃহে আগমন প্রতিগৃহে স্নেহপুত্তলী কন্যার শ্বশ্রূগৃহ হইতে মাতৃসকাশে আগমনের ন্যায় কত মধুর—কত সুন্দর! সেই মাধুর্য আগমনী-সঙ্গীতে মূর্ত রূপ ধারণ করিয়া থাকে। এমনিভাবে হেমন্তপ্রত্যূষে পল্লী-লক্ষ্মীগণের গোষ্ঠলীলাকীর্তন বাৎসল্য ও মধুর রসের সৃষ্টি করিয়া থাকে। মনে হয়, প্রভাতে মা-নন্দরাণী ক্ষুদ্র মনোহর শিখিচূড়া মস্তকে বাঁধিয়া দিয়া বাল-গোপালকে বিচিত্রবাসে সজ্জিত করিতেছেন, সর-নবনী চন্দ্রবদনে দিয়া সস্নেহ চুম্বনে বলিতেছেন, 'যাও বাছা, যাও গোঠে—কর গো-চারণ।' দূরে শিঙ্গাম্বরে

শ্রীদাম-সুদাম আদি সখাগণ, 'আয় আয়, আয়রে কানাই' বলিয়া ডাকিতেছে। অদূরে শ্যামলী ধবলী লালী গাভীগণ দাঁড়াইয়া আছে। দক্ষিণ করে পাঁচনি, বাম করে বেণু, পৃষ্ঠে শিঙ্গাসহ গোপালগণ সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম গোষ্ঠে চলিয়াছেন। স্নেহপুত্তলীগণ দৃষ্টিপথ বহির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত মা-যশোদা মা-রোহিণীর আকুল সস্নেহ দৃষ্টি সে-পথে নিবদ্ধ রহিয়াছে। কানাই বলাই বেণু বাজাইয়া চলিয়াছেন, ধেনুগণ পুচ্ছ তুলিয়া ছুটিয়াছে, গোষ্ঠ-ভূমি শত শত বেণু-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, শত শত রাখাল বালক নিজ নিজ ধেনুসহ গোষ্ঠে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সচ্ছন্দ শ্যামল শষ্পগ্রাসে ধেনুগণ ব্যস্ত হইয়াছে। গোচারণ-ছলে সখায় সখায় ক্রীড়াকৌতুক, জননী-দত্ত সর-নবনীতে সখাসখ্যের প্রীতি-ভোজন, কি অনাবিল সখ্যরসের অভিনয়!

দিবাবসানে বালগোপালের গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গীত আরও কত মধুর! পল্লীর শান্ত স্নিগ্ধ গোধূলির ধূসর সন্ধ্যায় সান্ধ্য আরতির সেই মধুর সঙ্গীত কি গম্ভীর ভাবের সৃষ্টি করে। গোপাল গো-চারণ-শ্রমে ক্লান্ত, প্রতীক্ষমাণা স্নেহময়ী জননীর সন্তান-চর্যার সস্নেহ ব্যাকুলতা সঙ্গীতের মধ্য দিয়া মূর্তিমতী হইয়া উঠে। মনে হয়, যেন প্রতিগৃহে মা-নন্দরানী পুত্ররূপে বাল-গোপালকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। পল্লীর ধূসর সন্ধ্যার ম্লানচ্ছটায় সেই সঙ্গীত বাৎসল্য রসসিক্ত হইয়া কি অভিনবভাবে মনকে অভিভূত করে! স্নেহময়ী বঙ্গজননীর স্নেহার্দ্র হৃদয়ের ইহাই নিত্যকার স্নেহাভিনয়, ইহাই রাখাল বালকগণের নিত্যকার গোষ্ঠ-লীলা। বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্য অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর—এই পঞ্চবিধ রসভূয়িষ্ঠ মহাজন-পদাবলী বাঙালীর শুষ্ক হৃদয়ে ভাবের বন্যা বহিয়া আনে।

লোকসাহিত্যের বহুতর প্রসঙ্গের মধ্যে মাত্র পদাবলী-সাহিত্য ও মনসা-মঙ্গল এবং লোকসঙ্গীতের সামান্য উল্লেখমাত্র করা গেল।

শ্রীজ্ঞানেশ্বরের 'অমৃতানুভব'

পঞ্চম প্রকরণ—সচ্চিদানন্দ-পদত্রয়-বিবরণ]

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন

[সকল ধর্ম-বিবর্জিত পরমাত্মাকে শ্রুতিতে সৎরূপে, চিৎরূপে ও আনন্দরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—ইহাতে পরমাত্মার মধ্যে 'স্বগতভেদ' আছে এইরূপ দেখাইতে পারে। এই প্রকরণে তাহার নিরসন করা হইয়াছে।]

'সৎ' 'চিৎ' ও 'আনন্দ' এই তিনটি শব্দ তিনটি বিরুদ্ধ ধর্ম—অর্থাৎ 'অসৎ' 'জড়' ও 'দুঃখ' ইহাদের নিরাকরণের জন্যই প্রয়োগ করা হইয়াছে [অথবা, পরমাত্মার মধ্যে যেমন অসৎ, জড় ও দুঃখের একান্ত অভাব, তেমনি তৎ-সাপেক্ষ 'সৎ' 'চিৎ' ও 'আনন্দ' এ তিনটির কল্পনাও পৃথক্‌ভাবে নাই] —যেমন বিষ বিষত্বের জন্য নিজের পক্ষে বিষ নহে। ১

কান্তি, কাঠিন্য ও কনকত্ব এই তিনটি মিলিয়া স্বর্ণ যেমন এক, কিংবা দ্রবত্ব, মিষ্টত্ব ও অমৃতত্ব মিলিয়াই যেমন অমৃত (দুগ্ধ)। ২

উজ্জ্বলতা সুগন্ধ ও কোমলতা এই তিনটি পৃথক্‌ভাবে কর্পূরের মধ্যে নাই, পরন্তু (মলিনতা দুর্গন্ধ ও কাঠিন্যভাবের বিরোধী হইয়া) মিলিতভাবে ইহারা এক কর্পূরের মধ্যে মূর্তিমান্। ৩

অঙ্গের উজ্জ্বলতা—সেই উজ্জ্বলতাই কোমলতা; আর এই দুটিই মিলিয়া পরিমল-মাত্র যে কর্পূর। ৪

এইভাবে আপন বিরোধীভাবকে নিরাকরণ করিয়া এই তিনটি ধর্ম এক পরিমলমাত্র কর্পূরের মধ্যে পর্যবসিত;—তেমনিভাবে, সত্তাদি পদেরও (আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের মধ্যে) লয় হইয়াছে। ৫

সহজ বিচার করিলে 'সৎ' 'চিৎ' ও 'আনন্দ' এই তিনটি পদ ভিন্ন দেখাইলেও শব্দাতীত আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা ইহাদের সংজ্ঞার লোপ করিয়াছেন। ৬

(বস্তুর) সত্তা আনন্দ ও জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, জ্ঞানও সত্তা ও আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে,—যেমন অমৃত হইতে তাহার মাধুর্য পৃথক্ করা যায় না। ৭

শুক্লপক্ষের (চন্দ্রের) ষোল কলা দিন দিন বাড়িতে থাকে, পরন্তু চন্দ্র স্ব-স্বরূপেই পরিপূর্ণ। ৮

বিন্দুরূপে (মেঘ হইতে) জল পড়ে, বিন্দু-রূপেই গণিত হয়, পরন্তু যেখানে পড়ে সেখানে ইহা জল ভিন্ন কি অন্য কিছু? ৯

তেমনি 'অসতের' নিরাকরণের জন্যই শ্রুতিতে 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ, 'জড়ের' সমাপ্তির জন্যই 'চিদ্' রূপের প্রযোগ। ১০

দুঃখের নাশেই সুখ হয়, তেমনি দুঃখের সর্বনাশ করিবার জন্যই প্রভুর নিঃশ্বাস (বেদ) 'সুখ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছে। ১১

এইভাবে 'সদাদি' (তিন) পদ তাহাদের প্রতিযোগী (বিরুদ্ধ) 'অসদাদি' তিন পদের নাশ করিল, এবং তাহাদের নাশের সহিত 'সদাদি' পদেরও লোপ হইল। ১২

এইভাবে 'সচ্চিদানন্দ'—এই শব্দত্রয়ের বিরুদ্ধ অর্থাৎ 'অসৎ' 'জড়' ও 'দুঃখ' রূপের কল্পনার নিরসনের জন্যই 'সচ্চিদানন্দ' 'আত্মা' এই শব্দের প্রয়োগ (শ্রুতিতে) হইয়াছে—ইহা পরমার্থতঃ ব্রহ্মের বাচক নহে। ১৩

সূর্যের প্রকাশে যাবতীয় জড় পদার্থ প্রকাশিত হয়, সেই জড়পদার্থ কি সূর্যকে প্রকাশিত করিতে পারে? ১৪

তেমনি যাঁহার (পরমাত্মার) তেজে বাণী সর্ব জড়পদার্থ (বাচ্য) প্রকাশিত করে, সেই বাণী কি (স্বয়ং প্রকাশ) পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে? ১৫

পরমাত্মার প্রমেয়ত্ব নাই, সুতরাং তিনি কাহারও বিষয় নন, যিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহার আবার প্রমাণ কি? ১৬

পরিচ্ছিন্ন প্রমেয় বস্তুই প্রমাণ-সাপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ পরমাত্মবস্তু সম্বন্ধে প্রমাণত্বের কথাই উঠে না। ১৭

এইভাবে আত্মবস্তুকে জানিতে গেলে বস্তুই তত্ত্বতঃ 'জ্ঞান'-রূপ, সুতরাং এখানে 'জ্ঞেয়' ও 'জ্ঞাতা এই ভেদ কোথায়? ১৮

এইজন্য 'সৎ' 'চিৎ' ও 'সুখ' (সচ্চিদানন্দ) এই শব্দ বস্তুবাচক নহে,--ইহাই সর্ববিচারের সার। ১৯

এইভাবে (শ্রুতিতে) 'সচ্চিদানন্দ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে; পরন্তু দ্রষ্টা যখন আপন স্বরূপ-বোধের সম্মুখীন হয়—অর্থাৎ দ্রষ্টারূপ প্রমাতার যখন আপন যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান হয় —(তখন 'সচ্চিদানন্দ' পদের নিবৃত্তি হয়)। ২০

যখন মেঘ বর্ষণ করিয়া শেষ হয়, সমুদ্রে মিশিয়া নদীর প্রবাহের অন্ত হয়, প্রাপ্য বস্তু দেখাইয়া অন্বেষণ শেষ হয়; ২১

ফল প্রসব করিয়া ফুল শুকাইয়া যায়, রস তৈয়ারী হইলে ফলের নাশ হয়। আর সেই রস তৃপ্তি প্রদান করিয়া ফুরাইয়া যায়। ২২

অগ্নিতে আহুতি দিয়া (অগ্নিহোত্রীর) হাত পশ্চাতে সরিয়া আসে, কিংবা সুখ উৎপন্ন করিয়া গীত বন্ধ হয়। ২৩

অথবা মুখকে মুখ দেখাইয়া যেমন দর্পণের কাজ শেষ হয়, কিংবা নিদ্রিত পুরুষকে জাগাইয়া যেমন জাগরণকারী চলিয়া যায়। ২৪

তেমনি 'সচ্চিদানন্দ' এই তিন পদ জ্ঞাতাকে আপন শুদ্ধ পরমাত্মস্বরূপ দেখাইয়া মৌনের মার্গ অবলম্বন করে অর্থাৎ শব্দ বন্ধ হয়। ২৫

(ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য) যাহা যাহা বলা হয়, তিনি তাহা নহেন। ব্রহ্মস্বরূপ শব্দের বিষয় নয়, যেমন ছায়ার দ্বারা নিজের পরিমাপ করা যায় না। ২৬

যে এইরূপ (ছায়ার উপর) মাপ করিতে যায়, তাহার দেহের স্মৃতি ফিরিয়া আসিলে সে লজ্জিত হইয়া তখন মাপ লওয়া বন্ধ করে; (অর্থাৎ ছায়া দ্বারা নিজের দৈর্ঘ্য মাপ করিতে যাওয়া যেমন নিরর্থক, তেমনি পরব্রহ্মকে শব্দদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না)। ২৭

তেমনি স্বভাবতই পরমাত্মার 'সৎ' ভাব আছে, 'অসৎ' ভাবের লেশ মাত্র নাই, তথাপি যাহা নিত্য 'সৎ', তাহার 'সৎ' ভাব কি শব্দ দ্বারা বলা যায়? ২৮

আর 'অচিৎ' অর্থাৎ জড়ের নিবৃত্তি করিয়া যে চিন্মাত্র দশা (চিৎপ্রকাশ) আসে—এখন যাহা চিন্মাত্রস্বরূপ (অর্থাৎ যেখানে জড়ের সংস্কারই নাই), তাহাকে কি 'চিন্মাত্র' এরূপ কোন শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা যায়? ২৯

জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রা নাই, জাগৃতির স্মরণও নাই—তখন জাগৃতি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত, তেমনি চিন্মাত্রস্বরূপে (চৈতন্যরূপ সহজ-স্থিতিতে) 'চিন্মাত্র' এই বোধ কি করিয়া সম্ভব হয়? ৩০

এমনি, কেবল সুখ (আনন্দ)-ই যাঁহার স্বরূপ, যাঁহাতে দুঃখের লেশমাত্র নাই, সেই সুখের মাপ কি 'সুখ' শব্দের দ্বারা করা যায়? ৩১

সুতরাং সৎ' 'অসৎ'-কল্পনার সহিত নাশ প্রাপ্ত হইলে 'চিৎ' 'অচিৎ'কে লইয়া অস্ত গেলে

'সুখের' সহিত 'অসুখ' চলিয়া গেলে, আপেক্ষিক কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। ৩২

এখন দ্বন্দ্বের (ভেদের) মিথ্যাভাস বা বিক্ষেপ, আর তাহার কারণ অজ্ঞানের আবরণ —তাহার নাশ হইলে একমাত্র সুখই স্ব-স্বরূপে থাকে। ৩৩

এখন যাহা একস্বরূপ, তাহাকে গণনা (মাপ) করিতে গেলে দ্বৈতভাবে আসে, সুতরাং ইহাকে মাপ করা যায় না,—এইভাবে ইহা একস্বরূপ। ৩৪

তেমনি সুখের স্থিতি হইতে বাহিরে আসিয়া সেই সুখ-স্মৃতির জন্য সুখানুভব হয়, পরন্তু যাহা সুখ-স্বরূপ—নিরুপাধিক স্বয়ংসিদ্ধ—তাহার অনুভব কে করিবে? ৩৫

প্রকৃতি (মায়া) যখন কোন পুরুষকে দংশন (মায়ায় মোহিত) করে, তখন সেই পুরুষ মোহাবিষ্ট হইয়া আচরণ করে; পরন্তু, শুধু দংশন থাকিলে কাহাকে দংশন করিবে? কেই বা মোহাবিষ্ট হইবে?

অথবা প্রকৃতি-দেবী, ডঙ্কা-দেবীর মন্দিরে ডঙ্কা বাজিলে দেবী প্রতিমার অঙ্গে অবতীর্ণ হন; শুধু ডঙ্কা থাকিলে (অর্থাৎ প্রতিমা না থাকিলে) দেবীর কোথায় আগমন হইবে? ৩৬

তেমনি পরমাত্মা স্বয়ং সুখ-স্বরূপ, তিনি সুখী নন, আর সুখ নাই—ইহারও অর্থাৎ সুখের অভাবেরও জ্ঞান নাই। ৩৭

দর্পণে মুখ না দেখিলে সেই মুখের সমুখ বিমুখ-পনা থাকে না, মুখ স্ব-স্বরূপেই থাকে;— তেমনি সুখ দুঃখাতীত যিনি, কেবল আনন্দ স্বরূপ (তিনিই পরমাত্মা)। ৩৮

সর্ব শ্রুতিসিদ্ধান্তের অজ্ঞানমূলক চাতুর্য ছাড়িয়া যে পরমাত্মা আপন হাত গুটাইয়া স্ব-স্বরূপেই আছেন; (ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে শ্রুত্যাদি শাস্ত্র যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহা মায়িক— অজ্ঞান-জনিত; (ব্রহ্মবস্তু সেই সব সিদ্ধান্ত হইতে দূরে, আর তাহারাও ব্রহ্মস্বরূপের নাগাল পায় না)। ৩৯

ইক্ষু উৎপন্ন হইবার পূর্বে তাহার যে রস, তাহার মধুরতা যেমন সেই রসই জানে। ৪০

কিংবা বীণা তৈয়ারী করিবার পূর্বে যে নাদ তাহা শ্রবণ গোচর নহে, পরন্তু সেই নাদকে নাদই জানে। ৪১

অথবা পুষ্পের গর্ভে মকরন্দ প্রকট হইবার পূর্বে তাহা ভোগ করিবার জন্য পুষ্পকেই ভ্রমর হইতে হয়। ৪২

অথবা পক্কান্ন প্রস্তুত করিবার পূর্বে তাহার মিষ্টত্ব কিরূপ তাহা মিষ্টত্বই জানে, অন্যে বুঝিতে পারে না। ৪৩

তেমনি মূল সুখ (আত্মানন্দ) আপন সুখত্ব উপভোগ করিতে লজ্জা পায়, তাহা অপরের ভোগ্য হইবে কিরূপে? ৪৪

দিবসে দ্বিপ্রহরের আকাশে চাঁদ থাকে, পরন্তু চন্দ্রমাই তাহা জানে। ৪৫

রূপ না থাকিতে লাবণ্য, শরীর না হইতেই তারুণ্য, (সৎকর্মের) ক্রিয়া না হইতেই পুণ্য কিরূপে হয়? ৪৬

মনের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় নাই, সেই অবস্থায় কামনা যদি প্রকট হয় (তবেই ব্রহ্মবস্তুকে শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা যায়)। ৪৭

কিংবা ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্র হইতে যতক্ষণ না নাদের সৃষ্টি হয় (সৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হয়) ততক্ষণ নাদের স্থিতি নাদই জানে। ৪৮

অথবা কাষ্ঠের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াই যেমন অগ্নি আপন কেবল (শুদ্ধ) স্বরূপেই থাকে। ৪৯

দর্পণ বিনাই যাহার আপন মুখের জ্ঞান হয়, সেই এই (ব্রহ্মের অস্তিত্বের) রহস্য বুঝিতে পারে। ৫০

বীজ বপন করিবার পূর্বে শস্য যেমন শস্য রাখিবার পাত্রে বীজ অবস্থায় থাকে, আমার

(ব্রহ্ম-সম্বন্ধে) কথাও তেমনি গুপ্ত অথচ স্পষ্ট। ৫১

এইভাবে বিশেষ বা সামান্য ভাব চৈতন্যকে স্পর্শ করে না, পরন্তু সামান্য-বিশেষ-ভাব-রহিত ব্রহ্মবস্তু নিরন্তর নিজ স্থিতিতে অনন্যভাবে বর্তমান। ৫২

এখন ইহার পর যদি কিছু বলিতে হয়, তাহার অর্থ এই যে, এই স্থিতিতে মৌন শুদ্ধ নিঃশেষভাবে নাশপ্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ মৌনাবলম্বন বা কিছু না বলাই উত্তম বলা)। ৫৩

এইভাবে প্রত্যক্ষাদি* প্রমাণ আপনার অপ্রামাণ্যই প্রমাণ করে, দৃষ্টান্ত উপমাসাপেক্ষ বলিয়া তাহা দ্বারাও ব্রহ্মবস্তু দেখানো যায় না; (দৃষ্টান্তও শপথ করিয়া জবাব দিল)। ৫৪

উপপত্তি (যুক্তি) আপন অনুপপত্তি ঘটাইল (এবং নাশপ্রাপ্ত হইল); আর 'লক্ষণে'র পঙ্‌ক্তিকে পঙ্‌ক্তিই উঠিয়া গেল!

[ব্রহ্মবস্তুর বিচারকালে সর্বপ্রকারের যুক্তি যুক্তিহীন হইল। 'লক্ষণ' তিন প্রকারের 'জহৎ', 'অজহৎ' ও 'জহদজহৎ' তাহাদেরও এই দশা হইল।] ৫৫

যোগাদি নানা উপায় এখানে পশ্চাৎপদ হইয়া ব্যর্থ হইল; প্রতাতি 'প্রত্যয়' দেখানো ছাড়িল। ৫৬

এখানে বিচার পরমাত্মস্বরূপের নির্ধারণ করিতে গিয়া নিশ্চিতভাবে মরিল, এবং মরিয়া আপনাকে সার্থক করিল; সঙ্কটকালে বীর যোদ্ধা যেমন আপন প্রাণ দিয়া প্রভুর সঙ্কট দূর করে। ৫৭

অথবা বোধবৃত্তি বোধরূপ ব্রহ্মের সম্মুখে লজ্জিত হইয়া আপনার নাশ করিল; অনুভব একা পড়িয়া পঙ্গু হইল। ৫৮

অভ্রের এক খণ্ড লইয়া তাহার ভাঁজ আলাদা করিলে যেমন তাহার অঙ্গের হানি হয়। ৫৯

কিংবা কদলীবৃক্ষের ভিতরের শাঁস (অন্তভাগ) গরমে তাহার বহিরাবরণ অর্থাৎ উপরের খোসা যদি ফেলিতে থাকে, তবে তাহাকে কিরূপে খাড়া রাখিবে? ৬০

তেমনি অনুভাব্য অনুভাবিক (যে অনুভব করে) ও অনুভব এই ত্রিপুটীর নাশ হইলে পরস্পরের সহিত কি সম্বন্ধ থাকিবে? ৬১

যে অবস্থায় অনুভবের এই দশা হয়, সেখানে অক্ষরের (শব্দের) পঙ্‌ক্তি দ্বারা কি হইবে? (বর্ণনা করা যায় না)। ৬২

যে স্বরূপের সম্মুখে পরা বাণীর নাশ হয়, যেখানে নাদের স্ফুরণ হয় না,—সেই পরমাত্ম বস্তুকে কি মুখে বর্ণনা করা যায়? ৬৩

নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবার পর জাগরণের কি দরকার? আহারে তৃপ্ত হইলে কি রন্ধন করিতে বসিতে হয়? ৬৪

সূর্যোদয় হইলে দীপ নিদ্রা যায় (নিস্তেজ হয়); ক্ষেতের শস্য পাকিলে কি ক্ষেতে লাঙল দিতে হয়? ৬৫

সুতরাং বন্ধমোক্ষের নিমিত্ত (জ্ঞানাজ্ঞান) নাই, কার্য শেষ হইয়াছে; এরূপ যদি হয়, তবে কৌতুক (শব্দদ্বারা) যদি নিরূপণ করিতে ইচ্ছা হয়; ৬৬

আর নিজের বা অপরের (স্ব-স্বরূপ সম্বন্ধে) যদি বিস্মৃতি আসিয়া যায়, তবে সেই বস্তু সম্বন্ধে শব্দই স্মৃতি আনয়ন করে। ৬৭

শব্দ বিস্মৃত বস্তুর স্মৃতি আনয়ন করে; স্মারক-হিসাবে শব্দের এই কীর্তি যদি জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, তবে ইহাই শব্দের মহত্ত্ব, ইহার অধিক কোনও মহত্ত্ব নাই। ৬৮

পঞ্চম প্রকরণ সমাপ্ত

* প্রত্যক্ষ, উপমা, অনুমান ও শব্দ।

স্বামীজীর সন্নিধানে

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী কল্যাণানন্দ

স্বামীজীর যে কয়জন সন্ন্যাসী শিষ্য সাক্ষাৎ-ভাবে আর্ত-নারায়ণ-সেবাব্রতকে জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বামী কল্যাণানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। কনখলে (হরিদ্বার) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম কল্যাণানন্দের অক্ষয় কীর্তি। ১৯০২ হইতে ১৯৩৭ খৃঃ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৬ বৎসর তিনি এই তীর্থে একনিষ্ঠভাবে সেবাকার্যে ব্রতী ছিলেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সেবাকার্যের জন্য ১৯১১ খৃঃ তিনি দরবার-পদক প্রাপ্ত হন। স্বামীজী-প্রবর্তিত সেবাধর্ম কল্যাণানন্দের জীবনে মূর্ত হইয়াছিল।

পূর্বাশ্রমে কল্যাণানন্দের নাম ছিল দক্ষিণা-রঞ্জন গুহ। বরিশাল জেলার অন্তর্গত উজির-পুরের সন্নিকট হাসুয়া গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। উমেশচন্দ্র গুহের একমাত্র পুত্ররূপে তিনি ১৮৭৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি পিতৃহীন হন। বানারীপাড়া হাই স্কুলে তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত পড়েন। ২৪ বৎসর বয়সে ১৮৯৮ খৃঃ দক্ষিণারঞ্জন রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন, মঠ তখন বেলুড় গ্রামে ভাড়াটিয়া বাড়িতে ছিল।

বাল্যকাল হইতেই দক্ষিণারঞ্জন আর্তের সেবায় আনন্দ পাইতেন। মঠে যোগদান করার পর তিনি বেলুড় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে যাইয়া আর্ত ও রুগ্নদের সেবায় প্রীতি ও নিষ্ঠা সহকারে নিযুক্ত হইতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলা-পার্ষদ স্বামী যোগানন্দ যখন কলিকাতায় অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত, তখন ব্রহ্মচারী দক্ষিণারঞ্জন প্রায় মাসাবধি তাঁহার সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

১৮৯৯ খৃঃ জুনমাসে দ্বিতীয় বার স্বামীজী আমেরিকা যাত্রার পূর্বে দক্ষিণারঞ্জনকে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করেন এবং 'কল্যাণানন্দ' নাম দেন। তাঁহার এই নাম অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়াছিল।

সন্ন্যাসদানের পূর্বে স্বামীজী তাঁহার আন্তরিকতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলেন, 'আমার এখন টাকার দরকার, আমি যদি তোকে চা-বাগানে কুলি-রূপে বিক্রি করি, তাতে তুই রাজী আছিস্?' শিষ্য গুরুকে সর্বান্তঃকরণে সম্মতি জানাইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিতেন, 'কল্যাণানন্দ সত্যই তাই করেছে, নিজেকে স্বামীজীর কাছে বিক্রয় ক'রে দিয়েছে।'

১৮৯৯ খৃঃ স্বামী কল্যাণানন্দ বেলুড় মঠ হইতে তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইয়া কাশীধামে যান। সেখানে কেদারনাথ মৌলিকের (পরে স্বামী অচলানন্দ) আতিথ্য গ্রহণ করেন। কল্যাণানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া কেদারনাথ ও তাঁহার বন্ধুবর্গের সেবাধর্মের ভাব জাগ্রত হয়।

১৯০০ খৃঃ ডিসেম্বরে স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন কল্যাণানন্দ রাজপুতানায় ছিলেন; গুরুদর্শন-মানসে তিনি বেলুড় মঠে আসেন। স্বামীজীর অসুস্থ অবস্থায় কল্যাণানন্দ প্রাণপণ

সেবা করেন। স্বামীজী কল্যাণানন্দকে বরফ আনিতে বলেন। কল্যাণানন্দ অবিলম্বে কলিকাতা গিয়া প্রায় আধমণ বরফ নিজেই বহন করিয়া বেলুড় মঠে আনেন। স্বামীজী শিষ্যের সেবানুরাগ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে, যখন কল্যাণানন্দ পরমহংসত্ব লাভ ক'রে ধন্য হবে।' গুরুবাক্য শিষ্যের জীবনে সত্য হইয়াছিল।

স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল কাশী, হরিদ্বার, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯০ খৃঃ পরিব্রাজক অবস্থায় হৃষীকেশে স্বামীজী অসুস্থ হইয়া পড়েন, তখন এই পুণ্য তীর্থে সাধু-সন্তদের পীড়িত অবস্থায় কষ্টভোগ তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেন। বেলুড় মঠে অবস্থান-কালে স্বামীজী হরিদ্বার ও নিকটবর্তী স্থানের সাধুদের অসহায় অবস্থার কথা জানাইয়া কল্যাণানন্দকে আদেশ করেন, 'বৎস, তুমি কি হরিদ্বার ও হৃষীকেশের অসুস্থ সন্ন্যাসীদের জন্য কিছু সেবার ব্যবস্থা করতে পারো? যখন তারা অসুস্থ হয়, তখন দেখার কেউ থাকে না। যাও তাদের সেবা ক'রে ধন্য হও।' শিষ্য গুরুবাক্য শিরোধার্য করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গুরু-আজ্ঞা পালন করিয়া যান।

কনখল সেবাশ্রমে স্বামীজীর শিষ্য নিশ্চয়ানন্দ কল্যাণানন্দের সহকর্মী ছিলেন। উভয় গুরু-ভ্রাতার আর্ত-সেবাকার্য শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনে আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। 'কথামৃত'-কার মাস্টার মহাশয় এই গুরুভ্রাতৃদ্বয়কে অভিন্নাত্মা দেববৈদ্য অশ্বিনাকুমারদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করিতেন।

১৯৩৭ খৃঃ ২১শে অক্টোবর স্বামী কল্যাণানন্দ প্রায় ৩৬ বৎসর একযোগে আর্তসেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়া ঈপ্সিত ধামে মহাপ্রয়াণ করেন।

আলোয়ারের মহারাজা

১৮৯১ খৃঃ ফেব্রুআরির প্রথম ভাগে একদিন প্রাতঃকালে স্বামীজী আলোয়ার স্টেশনে অবতরণ করেন। কয়েকদিন পরে আলোয়ার-মহারাজের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী সংবাদ পান যে, শহরে একজন বড় সাধু আসিয়াছেন। শুনিবামাত্র তিনি স্বামীজীকে অতি সমাদরে নিজের গৃহে আমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপের পর বুঝিতে পারিলেন, এই মহাপুরুষের প্রভাবে আলোয়ার-মহারাজের পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন মতিগতির পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। এই ভাবিয়া তিনি মহারাজাকে সংবাদ দিলেন, 'একজন সাধু এখানে আসিয়াছেন, তিনি ইংরেজীতে অসাধারণ পণ্ডিত।'

মহারাজা মঙ্গল সিং তখন ঐ স্থান হইতে দুই-তিন মাইল দূরে একটি নিভৃত প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। দেওয়ানজীর পত্র পাইয়া তিনি পরদিন শহরে আগমন করিলেন ও একেবারে দেওয়ানজীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীকে দর্শন ও শ্রদ্ধা-সহকারে প্রণাম করিয়া সাদরে নিজ সম্মুখে উপবেশন করাইলেন।

মহারাজার প্রথম কথা হইল—'আচ্ছা স্বামীজী, শুনছি আপনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তা আপনি তো সহজেই অনেক টাকা উপার্জন করতে পারেন। তা না ক'রে ভিক্ষা ক'রে বেড়ান কেন?' স্বামীজী উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, আপনি বলতে পারেন, আপনি রাজকার্য অবহেলা ক'রে কেবল সাহেবদের সঙ্গে খানা খেয়ে আর শিকার ক'রে বেড়ান কেন?' উপস্থিত সকলে স্বামীজীর কথার ভঙ্গীতে চঞ্চল হইয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'সাধুর একি দুঃসাহস! কে জানে

এঁর কপালে আজ কি আছে!' মহারাজা কিন্তু স্বামীজীর কথা ধীরভাবে শুনিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর দিলেন, 'কেন আমি ঐরূপ করি, বলতে পারিনে, তবে হ্যাঁ, ঐরূপ করতে আমার ভাল লাগে, তা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।'

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, 'বেশ! আমারও সেই রকম ভাল লাগে ব'লে ফকিরের বেশে ঘুরে বেড়াই।'

বাক্যালাপের পর মহারাজা বুঝিতে পারিলেন, এই কৃতবিদ্য সন্ন্যাসী কেবল মাত্র সুপণ্ডিত নন, নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী। কৌতূহলবশেই হোক, আর প্রকৃত সত্য জানিবার আগ্রহেই হোক মহারাজা প্রশ্ন করিলেন, 'দেখুন বাবাজী! এই যে সকলে মূর্তিপূজা করে, এতে আমার মোটেই বিশ্বাস নেই, এর জন্য আমার কি দুর্গতি হবে?'

মহারাজাকে হাসিতে দেখিয়া স্বামীজী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 'মহারাজ কি আমার সঙ্গে রহস্য করছেন?'

মহারাজার মুখমণ্ডল সহসা গম্ভীর হইল, তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন, 'না—না স্বামীজী, মোটেই নয়। বাস্তবিকই আমি কাঠ মাটি পাথর বা ধাতুর মূর্তিগুলিকে সাধারণ লোকের মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতে পারিনে। মূর্তিপূজায় আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই। এতে কি পরকালে আমার শাস্তি হবে?'

স্বামীজী বলিলেন, 'নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী উপাসনা করলে পরকালে শাস্তি হবে কেন? মূর্তিপূজায় আপনার বিশ্বাস নেই—মন্দ কি? যার যেমন বিশ্বাস।'

স্বামীজীর উত্তর শুনিয়া উপস্থিত সকলেই বিস্ময়ের সহিত ভাবিতে লাগিলেন, যাঁহাকে তাহারা শ্রীশ্রীবিহারীজীর মন্দিরে দেব-বিগ্রহের সম্মুখে ভজন গাহিতে গাহিতে ভাবাবেশে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়াছেন, তিনি কেন মূর্তিপূজার সমর্থনকল্পে যুক্তি প্রদর্শন করিলেন না?

সম্মুখের দেওয়ালে আলোয়ার-মহারাজের একখানা ছবি টাঙানো ছিল। হঠাৎ তাহার উপর নজর পড়ায় স্বামীজী ছবিটি নামাইতে বলিলেন। ছবিটি নামানো হইলে স্বামীজী বলিলেন, 'এই ছবিটির ওপর কেউ থুথু ফেলতে পারেন?' সকলে নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছেন, 'আজ না জানি কী অঘটন ঘটে!' দেওয়ান বাহাদুর বলিলেন, 'আপনি বলেন কি, স্বামীজী? মহারাজার প্রতিকৃতির উপর আমরা থুথু ফেলতে পারি?' স্বামীজী বলিলেন, 'মহারাজার ছবি হোক, তাতে কি এসে যায়? এতে তো আর মহারাজা স্বয়ং উপস্থিত নেই! এর ভেতর মহারাজা কোথায়? এ তো কাপড়ের ওপর রঙ মাখানো! এ তো মহারাজার মতো নড়তে চড়তে বা কথা বলতে পারে না। বুঝেছি, এটি মহারাজার প্রতিকৃতি ব'লে আপনারা এটিকে শ্রদ্ধা করেন। ঠিক তেমনি কাঠ-পাথরের মূর্তি ভগবান্ না হলেও, তা দেখলে ভক্তদের ভগবানের কথাই মনে পড়ে, তাই তারা মূর্তিকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে। কেউ বলে না—হে কাঠ, হে ধাতু! আমি তোমার পূজা করছি, তুমি প্রসন্ন হও একই অনন্ত ভাবময় ভগবান্, যিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, ভক্তেরা তাঁকেই নিজ নিজ ভাবানুযায়ী নানা ভাবে উপাসনা ক'রে থাকে।'

কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখ-মণ্ডল এক দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মহারাজা মঙ্গল সিং কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া যুক্ত-করে বলিলেন, 'স্বামীজী, আপনার কৃপায় মূর্তি-পূজা সম্বন্ধে অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করলাম

আমার একটা দারুণ ভুল ভেঙে গেল। আজ আপনি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন।'

স্বামীজীর পদধূলি গ্রহণপূর্বক মহারাজা বলিলেন, 'স্বামীজী, কৃপা ক'রে আমাকে আশীর্বাদ করুন।' স্বামীজী স্নিগ্ধ হাস্যে কল্যাণ বর্ষণ করিয়া বলিলেন, 'একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত আর কে কৃপা করতে পারে, মহারাজা? আপনি সরলভাবে তাঁর শরণাগত হোন, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে কৃপা করবেন।'

স্বামীজী চলিয়া যাওয়ার পর মহারাজা মঙ্গল সিং অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন. পরে দেওয়ানজীকে বলিলেন, 'আমি এরূপ মহাত্মা আর দেখিনি! এঁকে দিনকয়েক আপনার বাড়িতে রাখুন।' দেওয়ানজী বলিলেন, 'এই অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা সন্ন্যাসী কোন প্রকার অনুরোধ শুনবেন কি না সন্দেহ, তবে চেষ্টার ক্রটি ক'রব না।'

দেওয়ান বাহাদুরের আগ্রহাতিশয্যে স্বামীজী তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু কথা হইল, সর্বদা সকল অবস্থায় নির্বিচারে সকলেই যেন সাক্ষাৎকারের সুযোগ পায়, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য করা চলিবে না। দেওয়ানজী আনন্দের সহিত স্বামীজীর প্রস্তাবে সম্মত হইলে স্বামীজী তাঁহার গৃহে কিছুদিন অবস্থান করেন।

ভগিনী নিবেদিতা

যে মহীয়সী মহিলা স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহার সার্থক 'নিবেদিতা' নামটি ভারতীয় জন-মানসে চির-ভাস্বর হইয়া আছে। ত্যাগ ও সেবার জ্বলন্ত বিগ্রহ এই আইরিশ মহিলার পূর্ব নাম ছিল মিস্ মার্গারেট ই. নোব্‌ল্। ১৮৬৭ খৃঃ উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে মিস্ নোব্‌লের জন্ম হয়, তাঁহার পিতা স্যামুয়েল নোব্‌ল্ একজন প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্মযাজক ছিলেন, মিস্ নোব্‌ল্ ছিলেন মাতাপিতার চতুর্থ সন্তান। অল্পবয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

কলেজ-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মিস্ নোব্‌ল্ শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। বহু স্থানে শিক্ষকতা করিয়া শেষে তিনি লণ্ডনে আসিয়া ১৮৯৫ খৃঃ শরৎকালে উইম্বলডনে তাঁহার নিজের 'রাস্কিন স্কুল' খোলেন। শিক্ষকতার কাজে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি 'সিসেম' ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সভ্যা ছিলেন। আধুনিক জগতের সকল প্রকার মতামত ও চিন্তাপ্রবাহের সহিত তাঁহার সম্যক্ পরিচয় ছিল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান নগরী মার্গারেটের রাজনৈতিক সাহিত্যিক ও শিক্ষণ-বিষয়ক বহুমুখী সুপ্ত বাসনা কার্যে পরিণত করার অবাধ সুযোগ আনিয়া দিল। তাঁহার যুক্তিবাদী অথচ ভাবপ্রবণ চিত্ত বিভিন্ন ধর্মের তথ্যসংগ্রহে উৎসুক হইয়াছিল। অধিকন্তু জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত তাঁহাকে আরও বেশী করিয়া ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তিনি বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলন করিতে থাকেন।

১৮৯৫ খৃঃ সেপ্টেম্বরে স্বামীজী আমেরিকা ত্যাগ করিয়া লণ্ডনে পৌঁছান। লণ্ডনে যাইবার পূর্বে স্বামীজীর মনে ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিজিত জাতির একজন প্রচারককে কিভাবে গ্রহণ করিবে, এ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ ছিল, কিন্তু ইংলণ্ডে পৌঁছিবামাত্র তাঁহার সে সন্দেহ দূর হইল, এবং শীঘ্রই তাঁহার যশোগানে ইংলণ্ডের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। লণ্ডনে আগমনের একমাসের মধ্যে স্বামীজী লণ্ডনবাসীর চিত্তের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিলেন

এই সময়েই মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল্ স্বামীজীর দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার ধর্মোপদেশের উদারতা ও দার্শনিক যুক্তির নূতনত্বে বিস্মিত হন। স্বামীজীর কথাগুলি মার্গারেটের নিকট নূতন ও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইল, তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনিয়াও সব ধারণা করিতে পারিলেন না। বাস্তবিক স্বামীজী অতি সরলভাবে বুঝাইলেও বেদান্ত-বাক্যের যথাযথ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা বৈদেশিকের পক্ষে সহজ নয়, বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্রে অধিকার না থাকিলে তন্মধ্যে প্রবেশ লাভ করা দুরূহ। নোব্‌ল্ স্বামীজীর কথাগুলি গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং স্বামীজীকে মনে মনে গুরুর আসনে বসাইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামীজীকে প্রথম দর্শনের এই বৃত্তান্ত 'The Master as I saw Him'—'স্বামীজীকে যেমন দেখিয়াছি' নামক গ্রন্থে অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

স্বামীজী দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যাওয়ার পর ১৮৯৬ খৃঃ মার্গারেট স্বামীজীর আদর্শে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প করেন এবং তাঁহার কাজের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন।

১৮৯৮ খৃঃ ২৮শে জানুআরি মার্গারেট নোব্‌ল্ কলিকাতা পৌঁছিলেন, স্বামীজীর শিক্ষায় তাঁহার অতীত জীবন ভুলিয়া একেবারে নূতন ভাবে ভারতীয় আদর্শে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। আচারে ব্যবহারে এবং চিন্তায় তিনি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় নারীতে পরিণত হইলেন। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, ভারতে এখন এমন নারী নাই, যিনি ভারতীয় নারীজাতির উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, সেইজন্য বিদেশের নারী এই কাজে ব্রতী হইয়া ভারতে একদল নারী-কর্মী প্রস্তুত করিবেন।

১৮৯৮ খৃঃ ১৭ই মার্চ মার্গারেট শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে প্রথম দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তাঁহার আশীর্বাদলাভে ধন্যা হন। ২৫শে মার্চ ১৮৯৮ খৃঃ মার্গারেটকে স্বামীজী আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত করিয়া 'নিবেদিতা' নামে অভিহিত করেন।

এই বৎসর ও পর বৎসর কলিকাতার প্লেগ-মহামারীতে নিবেদিতার প্রাণপণ সেবা-শুশ্রূষা তাঁহাকে কলিকাতাবাসীর নিকট বড়ই আপনার করিয়া লয়।

স্বামীজীর সহিত উত্তর ভারত ও কাশ্মীর ভ্রমণ নিবেদিতার ধর্মজীবন-গঠনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে অপূর্ব ভাষায় তাহা বিবৃত হইয়াছে

১৮৯৮ খৃঃ ১২ই নভেম্বর শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন নিবেদিতা ভারতীয় আদর্শে স্ত্রীশিক্ষাদানের জন্য বাগবাজার বোসপাড়া লেনে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয় আজও তাঁহার পুণ্য স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া ঈপ্সিত আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

ইহার পর ভারতে নারীশিক্ষার জন্য অর্থ-সংগ্রহে স্বামীজীর সহিত নিবেদিতা ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যান।

নিবেদিতা স্বামীজীর ভাব অতি সহজেই বুঝিতেন। এত সুন্দরভাবে বিশেষ করিয়া বিদেশীয়দের মধ্যে অন্য কেহ বুঝিয়াছেন কিনা তাহা বলা কঠিন। এই মহা বুদ্ধিমতী ও তপস্বিনী মহিলার সহিত স্বামীজীর কী অলৌকিক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল, তাহা সাধারণ মানুষ তাহার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি দিয়া কোনরূপেই ধারণা করিতে পারিবে না।

১৯০০ খৃঃ ২২শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী নিবেদিতাকে 'A Benediction' কবিতায় যে আশীর্বাদ করেন, তাহার অনুবাদ :

বীরের সঙ্কল্প আর মায়ের হৃদয়,
দক্ষিণের সমীরণ—মৃদু মধুময়,
আর্যবেদী 'পরে দীপ্ত মুক্ত হোমানলে
যে পুণ্য সৌন্দর্য আর যে শৌর্য বিরাজে—
সকলই তোমার হোক, আরো, আরো কিছু
স্বপ্নেও ভাবেনি যাহা অতীতের কেহ।
ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
তুমি হও বন্ধু, দাসী, গুরু—একাধারে।

গুরুর এই আশীর্বাদ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল।

নিবেদিতা অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। 'The Master as I saw Him,' 'Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda', 'Web of Indian Life,' 'Craddle Tales of Hinduism' প্রভৃতি গ্রন্থে তাহা পরিস্ফুট।

ভারতের তৎকালীন দেশসেবক, কর্মী, কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, কলাবিদ্ এবং সকল স্তরের চিন্তাশীল নরনারী নিবেদিতার নিকট প্রভূত প্রেরণা পাইয়াছিলেন।

আচার্য জগদীশ বসু, শ্রীঅরবিন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ সরকার প্রভৃতির সহিত নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এবং ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে নিবেদিতা চির-স্মরণীয়া হইয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চরণে নিবেদিতা এই মহীয়সী মহিলা ভারতের জন্য তিলে তিলে নিজের দেহপাত করিয়া দার্জিলিঙে আচার্য জগদীশচন্দ্রের গৃহে ১৩ই অক্টোবর ১৯১১ খৃঃ মহাপ্রয়াণ করেন।

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার

১৮৯৬ খৃঃ ১৫ই এপ্রিল স্বামীজী নিউইয়র্ক হইতে দ্বিতীয়বার লণ্ডনে রওনা হন। এইবার লণ্ডনে অবস্থানকালে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রাচ্যভাষাভিজ্ঞ ম্যাক্সমুলারের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎকার। ১৮৯৬ খৃঃ ২৮শে মে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের বিশেষ আমন্ত্রণে স্বামীজী তাঁহার গৃহে গমন করেন। এই সুখকর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে স্বামীজী ৬ই জুন 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় লেখেন :

কী অসাধারণ ব্যক্তি এই ম্যাক্সমুলার! কয়েকদিন পূর্বে আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। আমার বলা উচিত যে, আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়াছিলাম, কারণ যে-কোন ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসেন, তিনি নারী বা পুরুষ হউন, যে-কোন সম্প্রদায় মতবাদ বা জাতিরই হউন, তাঁহার সহিত দেখা করা আমি তীর্থ-গমনের ন্যায় মনে করি।

বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে ধর্মমতের হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কি শক্তিতে হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ম্যাক্সমুলার প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জানিতে পারেন এবং তদবধি তিনি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হন এবং তাঁহার জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে চর্চা করিতে আরম্ভ করেন।

স্বামীজী ম্যাক্সমুলারকে বলেন, 'অধ্যাপক মহাশয়, আজকাল হাজার হাজার লোক শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করে।' অধ্যাপক উত্তর দিলেন, 'এরূপ ব্যক্তিকে যদি পূজা না করবে, তো কাকে করবে?'

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার যেন সহৃদয়তার মূর্তি-বিশেষ। তিনি মিঃ স্টার্ডি ও স্বামীজীকে তাঁহার

সহিত জলযোগের নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাদিগকে অক্সফোর্ডের কলেজ ও বোডলিয়ান পুস্তকাগার দেখাইলেন। রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত তাঁহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি আমাদের এত যত্ন করছেন কেন?' অধ্যাপক উত্তর দিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যের সহিত তো আর প্রত্যহ দেখা হয় না।' স্বামীজী ইহার পূর্বে এইরূপ কথা কোথাও শোনেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ম্যাক্সমূলারের অগাধ ভক্তি ছিল, তিনি তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার-রূপে বিশ্বাস করিতেন।

সত্তর বৎসর বয়স হইলেও অধ্যাপকের স্থির প্রসন্ন মুখমণ্ডল, শিশুসুলভ মসৃণ ললাট, মুখের প্রতিটি রেখা গভীর আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক। তাঁহার মহানুভব স্ত্রী তাঁহার জীবনের উপযুক্ত সঙ্গিনী। অধ্যাপকের উদ্যানের পুষ্পবৃক্ষ, নিস্তব্ধভাব, নির্মল আকাশ—সমুদয় মিলিয়া কল্পনায় স্বামীজীর মনে ভারতের প্রাচীন গৌরব-যুগের একটি সুন্দর ছবি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! স্বামীজীর স্মরণে আসিল ব্রহ্মর্ষি বানপ্রস্থী বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর কথা।

স্বামীজী অধ্যাপককে ভাষাতত্ত্ববিদ্ বা পণ্ডিতরূপে দেখিলেন না, দেখিলেন যেন কোন আত্মা দিন দিন ব্রহ্মের সহিত নিজ একত্ব অনুভব করিতেছেন, যেন কোন হৃদয় অনন্তের সহিত এক হইবার জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে অপরে শুষ্ক অপ্রয়োজনীয় তত্ত্বসমূহের বিচার-রূপ মরুতে দিশাহারা হইতেছে, সেখানে তিনি এক অমৃত-কূপ খনন করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ধ্বনি যেন উপনিষদের সেই সুরে সেই তালে ধ্বনিত হইতেছে, 'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্, অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ'—সেই এক আত্মাকে জানো, অন্য বাক্য ত্যাগ কর।

ভারতের উপর অধ্যাপকের কী অসাধারণ অনুরাগ! এই মনীষী অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া ভারতীয় চিন্তারাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, পরম আগ্রহ সহকারে সংস্কৃত সাহিত্যের অরণ্যে আলো-ছায়ার বিনিময় পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবধারা তাঁহার হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার সর্বাঙ্গে রঙ ধরাইয়াছে!

স্বামীজী অধ্যাপককে বলিলেন, 'আপনি কবে ভারতে আসছেন? ভারতবাসীর পূর্বপুরুষগণের চিন্তারাশি আপনি যথার্থভাবে লোকসমক্ষে প্রকাশ করেছেন, সুতরাং ভারতের সকলে আপনার শুভাগমনে আনন্দিত হবে।'

বৃদ্ধ ঋষির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার চোখে জল আসিল, তিনি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, 'তা হ'লে আমি আর ফিরব না, ওখানেই আমার শেষকৃত্য করতে হবে।'

ম্যাক্সমূলার স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনারা শ্রীরামকৃষ্ণকে জগতের নিকট পরিচিত করবার কি চেষ্টা করছেন?' অধ্যাপক শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আরও বেশী জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বিস্তৃত বিবরণ পাইলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি বড় জীবনী লিখিতে পারেন। ইহা শুনিয়া স্বামীজী স্বামী সারদানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব উপকরণ সংগ্রহ করিবার ভার প্রদান করেন। এই উপকরণ সংগৃহীত হইলে ম্যাক্সমূলারকে দেওয়া হয় এবং তিনি তদবলম্বনে 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশাবলী' নামক একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করেন।

১৮৯৬ খৃঃ অগস্ট সংখ্যার 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় ম্যাক্সমূলার-লিখিত 'A Real Mahatman'—'একজন প্রকৃত মহাত্মা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং 'Ramakrishna : His Life and Sayings' (First Edition) প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ খৃঃ নভেম্বরে।

সংস্কৃত ভাষাবিদ্ প্রসিদ্ধ জার্মান অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থ-সাহায্যে ঋগ্বেদ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত 'Sacred Books of the East' (পঞ্চাশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) গ্রন্থমালার তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

স্বামীজী ও ম্যাক্সমূলার গভীর বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উভয়ে উভয়ের খবরাখবর রাখিতেন।

ঋগ্বেদ-প্রকাশ-প্রসঙ্গে ম্যাক্সমূলার-সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তিঃ 'আচার্য সায়নই নিজের ভাষ্য নিজে উদ্ধার করতে ম্যাক্সমূলার-রূপে পুনরায় জন্মেছেন। আমার অনেক দিন থেকেই এই ধারণা, ম্যাক্সমূলারকে দেখে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এমন অধ্যবসায়ী, এমন বেদবেদান্তসিদ্ধ পণ্ডিত ভারতেও দেখা যায় না।...ম্যাক্সমূলার নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বৎসর কাল কেবল manuscript (পাণ্ডুলিপি) লিখছেন, তারপর ছাপতে ২০ বৎসর লেগেছে। ৪৫ বৎসর একখানা বই নিয়ে এইরূপ লেগে পড়ে থাকা সামান্য মানুষের কার্য নয়। সাধে কি বলি, তিনি আচার্য সায়ন!'

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

১৮৯৭ খৃঃ ফেব্রুআরি মাস; তিন চার দিন হইল স্বামীজী প্রথমবার পাশ্চাত্য হইতে ভারতে ফিরিবার পর কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। বহুকাল পরে তাঁহার পুণ্যদর্শন লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজের গৃহে স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া কৃতার্থ মনে করিতেছেন। বাগবাজারের রাজবল্লভ পাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে স্বামীজীর নিমন্ত্রণ হইয়াছে। সংবাদ পাইয়া বহু ভক্ত তাঁহার বাটীতে সমাগত হইয়াছেন। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লোকমুখে সংবাদ পাইয়া মুখুজ্যে মহাশয়ের বাড়িতে বেলা প্রায় ২।। টার সময় উপস্থিত হইলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের লোক, ইহার পূর্বে স্বামীজীকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই।

শরচ্চন্দ্র উপস্থিত হইবামাত্র স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে স্বামীজীর নিকট লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। স্বামীজী মঠে আসিয়া শরচ্চন্দ্র-রচিত একটি 'শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র' পাঠ করিয়া ইতঃপূর্বেই তাঁহার বিষয় শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহার সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগরিষ্ঠ নাগ-মহাশয়ের কাছে তাঁহার যাতায়াত আছে—ইহাও স্বামীজী জানিয়াছিলেন।

শরচ্চন্দ্র স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী তাঁহাকে সংস্কৃতে সম্ভাষণ করিয়া নাগ-মহাশয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং নাগ-মহাশয়ের অমানুষিক ত্যাগ, উদ্দাম ভগবদনুরাগ ও দীনতার বিষয় উল্লেখ করিতে করিতে বলিলেন :

'বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতাঃ, মধুকর ত্বং খলু কৃতী।'

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া নাগ-মহাশয়কে লিখিয়া জানাইতে শরচ্চন্দ্রকে আদেশ করিলেন।

পরে বহুলোকের ভিড়ে আলাপ করিবার সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া, শরচ্চন্দ্রকে পশ্চিম দিকের ছোট ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া 'বিবেকচূড়ামণি'র এই শ্লোকটি বলিলেন :

মা ভৈষ্ট বিদ্বন্ তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যুপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি ॥

—'হে বিদ্বন্। ভয় পাইও না, তোমার বিনাশ নাই; সংসার-সাগর পার হইবার উপায় আছে। যে পথ অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ-সত্ত্ব যোগিগণ এই সংসার-সাগর পার হইয়াছেন, সেই পথ আমি নির্দেশ করিয়া দিতেছি।'

স্বামীজী তাঁহাকে আচার্য শঙ্করের 'বিবেক-চূড়ামণি' গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

শরচ্চন্দ্র কথাগুলি শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, স্বামীজী তাঁহাকে ঐ রূপে মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণের জন্য সঙ্কেত করিতেছেন।

১৮৯৭ খৃঃ মে মাসে স্বামীজী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। দীক্ষার পূর্বে স্বামীজী তাঁহাকে বলেন, 'আমি তোকে যখন যে কাজ করতে ব'লব, তখনি তা যথাসাধ্য করবি তো? যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে বা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে তোর মঙ্গল হবে বুঝে তাই করতে বলি, তা হ'লে তাও অবিচারে করতে পারবি তো?'

শরচ্চন্দ্র নতশিরে সম্মতি জানাইলে স্বামীজী তাঁহাকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করেন।

শরৎবাবুর সংস্কৃত সাহিত্যে এবং শাস্ত্রাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার সহিত স্বামীজী মাঝে মাঝে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিতেন এবং তাঁহাকে সংস্কৃতে পত্র লিখিতেন। স্বামীজীর পত্রাবলীতে শরচ্চন্দ্রকে দেবভাষায় লিখিত বেদান্তের উচ্চ ভাবপূর্ণ দুইখানি মূল্যবান্ পত্র পাওয়া যায়।

শরৎবাবু ছিলেন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। স্বামীজী কখনও কখনও তাঁহাকে সস্নেহে 'বাঙ্গাল' বলিয়া ডাকিতেন, শরৎবাবু ইহাতে গৌরব অনুভব করিতেন।

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ শরচ্চন্দ্রের ব্রাহ্মণ-সংস্কার অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাঁহার আচার-আচরণে সর্বদা ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হইত। স্বামীজীর পীড়াপীড়িতে শরৎবাবু ভগিনী নিবেদিতার সহিত এক টেবিলে আহার করেন। নিবেদিতার স্পর্শ-করা জল স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে দেন। পরে রহস্যচ্ছলে স্বামীজী উপস্থিত সকলকে বলেন, 'শুনেছেন, আজ এই ভট্‌চাজ বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টিটা না হয় খেলি, তাতে তত এসে যায় না, কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি ক'রে খেলি?'

এই গৃহী শিষ্যের সহিত স্বামীজী বহু বিষয়ে আলোচনা করেন। এইগুলি 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্বামীজীর ভাবধারা বুঝিবার জন্য এই গ্রন্থ বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে ধর্ম দর্শন আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে স্বামীজীর অনেক কথা আছে, আবার ভারতকে পুনরায় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ভারতবাসীর কি কর্তব্য, তাহাও সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থের জন্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী অমর হইয়া আছেন, তাঁহার অপর একখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক 'সাধু নাগ-মহাশয়'। শরচ্চন্দ্র শ্রীরাম-কৃষ্ণ ও তাঁহার লীলাপার্ষদগণের উদ্দেশে সংস্কৃতে স্তব রচনা করিয়াছেন।

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ

স্বামীজীর মর্মস্পর্শী আহ্বানে যে কয়জন যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ-পূর্বক সেবাধর্মে জীবন উৎসর্গ করেন, স্বামী নিশ্চয়ানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। নিশ্চয়ানন্দ ছিলেন অকৃত্রিম গুরুভক্তি ও নরনারায়ণ-সেবার উজ্জ্বল আদর্শ। জ্ঞানীরা বিচারের দ্বারা, ভক্তেরা ভজন দ্বারা, যোগীরা ধ্যানের দ্বারা যে পরম পদ লাভ করেন, নিশ্চয়ানন্দ স্বামীজী-প্রবর্তিত নরনারায়ণ-সেবা দ্বারা তাহা লাভ করিয়াছিলেন। কনখলে (হরিদ্বার) যে বিরাট প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম-রূপে সাধুসন্ত ও তীর্থযাত্রীদের অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা ও প্রশংসা লাভ করিতেছে, তাহা সম্ভব হইয়াছে স্বামীজীর দুই শিষ্য কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম, গুরুভক্তি ও একনিষ্ঠ সাধনায়।

স্বামী নিশ্চয়ানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম সুরজ-রাও, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে তিনি রাওজী নামে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৬৫।৬৬ খৃঃ মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত দক্ষিণ কানাড়ায় জানজিরা নামক স্থানের নিকট একটি গ্রামে ক্ষত্রিয়-বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জন্মস্থান মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজের সংযোগ-স্থলে বলিয়া তিনি উভয় প্রদেশের ভাষাই জানিতেন। সাধুজীবনে তিনি বাংলা বলিতে শিখিয়াছিলেন। ছাত্র-জীবনে অল্প লেখাপড়া করিয়াই অবস্থা-বৈগুণ্যে তাঁহাকে সৈন্যবিভাগে চাকরি গ্রহণ করিতে হয়। সৈন্যদলের সঙ্গে তিনি নানাস্থানে ঘুরিতে বাধ্য হন এবং কিছুকাল ব্রহ্মদেশে থাকেন। ব্রহ্মদেশ হইতে তিনি শ্যাম ও আন্দামান ভ্রমণ করেন, জিব্রাল্টার এবং মাল্টায়ও যান।

রাওজীর পল্টন যখন রায়পুরে ছিল, তখন স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত ঘটনাক্রমে রাওজীর দেখা হয়। তাঁহার নিকট রাওজী প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর কথা শোনেন। এই সাক্ষাৎকারের ফলে রাওজীর মনে পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং পত্রিকায় স্বামীজীর পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারের সংবাদ পড়িয়া স্বামীজীকে দেখিবার বাসনা হয়।

১৮৯৭ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে স্বামীজী যখন মাদ্রাজে পৌঁছিলেন, তখন রাওজী মাদ্রাজেরই অনতিদূরে ছিলেন। ট্রেনে স্বামীজীর মাদ্রাজে যাওয়ার খবর পাইয়া রাওজী বহু দর্শনার্থীর সহিত মাদ্রাজের অদূরে একটি ছোট স্টেশনে উপস্থিত হন। কিন্তু ট্রেন সেখানে থামিবে না জানিয়া দর্শনপ্রার্থীরা রেল-লাইনের উপর শুইয়া পড়ে, ফলে ট্রেন থামিতে বাধ্য হয়। রাওজী অন্যান্য দর্শনার্থীর সহিত স্বামীজীর সামান্য দর্শন লাভ করেন। কিন্তু ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, পদব্রজে মাদ্রাজ রওনা হইলেন। বহু কষ্টে মাদ্রাজে সমুদ্রোপকূলবর্তী ক্যাসল কার্নন ভবনে উপস্থিত হন।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর স্বামীজীর দর্শন লাভ হইল। রাওজী স্বামীজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণের ইচ্ছা ও স্বামীজীর সঙ্গে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু স্বামীজী রাওজীকে তখন নিরস্ত করিয়া পরে কলিকাতা যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলেন। অগত্যা স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লইয়াই রাওজী গৃহে ফিরিলেন।

রাওজী বহু চেষ্টায় পল্টনের চাকরি ত্যাগ করেন। এই জন্য তাঁহাকে উন্মত্ততার ভান করিতে হয় ও বহু নির্যাতন সহ্য করিতে হয়, কারণ স্বেচ্ছায় সরকারী সৈন্যবিভাগের কর্ম ত্যাগ করা চলে না। চাকরি হইতে অব্যাহতি পাইয়া রাওজী দীনভাবে কলিকাতা বেলুড় মঠে আসিয়া স্বামীজীর ঘরের পার্শ্বে জোড়হস্তে

দাঁড়াইয়া থাকেন। স্বামীজীর শরীর তখন অসুস্থ, তিনি আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন। স্বামীজীর নিকট খবর গেল, একটি মারাঠী যুবক দর্শনপ্রার্থী। স্বামীজী দর্শনার্থীকে স্নান ও আহার করিতে নির্দেশ দিয়া বিশ্রামান্তে দেখা হইবে জানাইলেন। স্বামীজীর নির্দেশ শুনিয়া রাওজী বলিলেন, স্বামীজীকে প্রণাম না করিয়া তিনি স্নানাহার করিবেন না, অনেক দূর দেশ হইতে স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, তিনি স্নানাহারের প্রত্যাশী নন।

রাওজীর এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জানিয়া স্বামীজী তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। রাওজী প্রণামান্তে স্বামীজীর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি সাধু হ'তে চাও? তোমার ইচ্ছা কি?' রাওজী করজোড়ে উত্তর দিলেন, 'আপনার দাস হ'তে চাই। অন্য কোন ইচ্ছা নাই!'

এখন হইতে রাওজী বেলুড় মঠে বাস করিতে লাগিলেন, মঠে অবস্থানকালে তিনি প্রধানতঃ ঠাকুর-ঘরের কাজ ও গুরুসেবা করিতেন। ১৯০১খৃঃ স্বামীজী তাঁহাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেন, নাম হয় 'নিশ্চয়ানন্দ'।

সৈন্যবিভাগে কাজ করার দরুন রাওজীর নিয়মানুবর্তিতা ও বিনা-বিচারে আদেশ পালনের অভ্যাস পূর্বাপর বিশেষ লক্ষণীয় ছিল। একবার তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর গ্রামের নিকটবর্তী আড়িয়াদহ হইতে বেলুড় মঠে একটি গাভী আনিতে পাঠানো হয়। নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইতে হইবে, কারণ বালিতে তখন গঙ্গার পুল ছিল না। মাঝ গঙ্গায় আসিয়া ভয় পাইয়া গাভাটি জলে লাফাইয়া পড়িল। নিশ্চয়ানন্দ গাভীর সহিত জলে লাফাইয়া পড়িলেন এবং গাভীটিকে তীরের নিকটে লইয়া যাইতে লাগিলেন। গুরুর আদেশ ছিল: গরুর দড়ি ধরে রাখবে, তাহলে আর পালাতে পারবে না।' রাওজী গঙ্গাগর্ভেও দড়িটা হস্তচ্যুত করেন নাই। অতি কষ্টে গাভীসহ তীরে উঠিয়া অন্যদের সাহায্যে গাভী লইয়া মঠে পৌঁছান। স্বামীজী এই সংবাদ শুনিয়া বলেন, 'তুমি মূর্খের মতো কেন গরুর জন্য জীবনটা দিতে গিয়েছিলে?' রাওজী বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, 'আপনি আমাকে গরু আনতে পাঠিয়েছিলেন, গরুটি ফেলে কেমন ক'রে আসি।' গুরুবাক্য পালনে দৃঢ় নিশ্চয়তা দেখিয়া স্বামীজী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

বেলুড় মঠে থাকিয়া রাওজী শ্রীগুরুর সেবাধিকার পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। স্বামীজীর মহাসমাধি-লাভের পর নিশ্চয়ানন্দ তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া ১৯০৩ খৃঃ কুম্ভমেলার সময় হরিদ্বারে উপস্থিত হন এবং স্বামী কল্যাণানন্দের সহকর্মিরূপে কনখল সেবাশ্রমে যোগ দিয়া সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। উভয় গুরুভ্রাতা ছত্রে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন এবং রোগীদের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ প্রত্যহ সকালে ঔষধের বাক্স লইয়া হাঁটিয়া হৃষীকেশ যাইতেন, সেখানে সাধুদের কুঠিয়ায় কুঠিয়ায় ঘুরিয়া রোগীদের চিকিৎসা করিয়া ছত্রে ভিক্ষা দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া পুনরায় পদব্রজে কনখলে আসিতেন। এই দীর্ঘ পথ পদব্রজে প্রত্যহ যাওয়া-আসা তাঁহার নিত্যকার কাজ ছিল। কৈলাস-মঠের মোহন্ত ধনরাজগিরি পরে কৈলাস-মঠে তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। নিশ্চয়ানন্দের জামা-কাপড় ও জুতা এত ছিন্ন বা মলিন থাকিত যে, অনেক সময় লোকে তাঁহাকে দীন

ভিখারী মনে করিত। তিনি পাদুকা ব্যবহার করিতেন না, খালি পায়েই কনখল হইতে হৃষীকেশ যাতায়াত করিতেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ছুটি কাহাকে বলে জানিতেন না।

স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'দেখ নিশ্চয়! সাধু হয়ে অপরের গলগ্রহ হওয়া উচিত নয়। কারও অন্নগ্রহণ করলে প্রতিদান দিতে হয়। সমস্ত দেশ অপরের উপর নির্ভর ক'রে পঙ্গু হয়ে গেছে। তুমি কখনও কারও উপর নির্ভর ক'রো না। অন্য কিছু না পারো, মাটির কলসী নিয়ে রাস্তার ধারে তৃষ্ণার্তদের জল দেবে, তাতেও কিছু সৎ কাজ হবে। নিষ্ক্রিয় হয়ে পরান্ন ভোজন করা পাপ।'

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ গুরুবাক্য শিরোধার্য করিয়া জীবনে রূপায়িত করেন এবং বর্তমান সাধুসমাজে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করেন।

হরিদ্বারের সাধু-সন্ন্যাসীরা জনহিতকর কাজ —বিশেষ করিয়া আর্তসেবার কাজ সন্ন্যাসীর অকরণীয় ভাবিতেন এবং এইজন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের 'ভাঙ্গী সাধু' বলিতেন, কিন্তু স্বামী কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দের প্রাণপাত করিয়া সাক্ষাৎ নারায়ণজ্ঞানে রোগীদের সেবা দেখিয়া তাঁহাদের সেই ভাব দূর হয়; পরিবর্তে শুভেচ্ছা ও প্রশংসা বর্ষিত হইতে থাকে।

সেবাধর্মের মূর্তবিগ্রহ একনিষ্ঠার সাধক নিশ্চয়ানন্দ প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে ১৯৩৪ খৃঃ ২২শে অক্টোবর কনখল সেবাশ্রমে নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া শাশ্বত শান্তি লাভ করেন।

আত্মবিশ্বাস

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি—কঠোপনিষদ্

(ভাবানুবাদ)

অনেকের মধ্যে আমি একক, অগ্রণী,
অনেকের মধ্যে আমি হয়তো দ্বিতীয়,
কখনো বা মধ্যম। কিন্তু তবু আমি অতৃতীয়
চিরকাল। তাহলে কী ভয় এই যমের সরণী
পার হয়ে স্বর্গে চলে যেতে ?
এমন কি প্রয়োজন রয়েছে পিতার
যম সন্নিধানে গিয়ে আমিই ক'রব প্রসাধিত ?
বেশ, হবে তাই হোক।
বীতশোক এখন আমার
হৃদয় চেতনা ; আমি যাব
যমালয়ে পিতৃদান-রূপে।
নিশ্চিত পরম পুণ্য পাব সেই সহজ স্বরূপে
নিবেদিত আত্মারপ্রত্যয়। ফিরে পাব
আনন্দিত আত্মার মহান্
অধিকার ; জীবনে যৌবনে
মানুষের প্রার্থিত যে চূড়ান্ত দিব্য ফলশ্রুতি।
যৌবনের আকাঙ্ক্ষাকে যে দেবে সম্মান
প্রাণান্তরে ফিরে পাব—জীবনে মরণে
অনিন্দিত চৈতন্যের দ্যুতি।
আমি তো অধম নই, সাধারণ সহজে অর্পিত
সুলভ জীবতা মাত্র ; যাবই তাহলে
দেখব অর্জিত মুখ এই পিতৃপ্রত্যয়ের জলে।
দুরূহ যৌবন তবে স্বর্গে সমর্পিত
হোক আজ ; প্রাণ পরিপূর্ণ হোক
প্রশ্নের কল্লোলে

জনগণের উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীঅমৃতকুমার বিশ্বাস

চাতুর্বর্ণ্য-নির্ভর সমাজই স্বামীজী গড়তে চেয়েছিলেন, কারণ তাই আদর্শ (model)[১], অতিরিক্ত আর প্রয়োজন হয় না। মনুও পঞ্চম বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। কাজেই আজ যে অগণিত 'জাতি'র অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, তা সব রকম অকল্যাণের উৎস। আজ 'বর্ণ' আর 'জাতি' সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু মূলে তা নয়। বর্ণ গুণগত, জাতি কুলগত। দীর্ঘদিনের কর্ষণে বংশ-পরম্পরায় গুণ অনেক সময় বংশগত হয়। তখন বর্ণবিভাগ আর 'জাতি'বিভাগ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা হয় না। অনেক সমাজ-বিজ্ঞানী আছেন, যাঁরা মনে করেন ব্রাহ্মণেতর বহু 'জাতি' মূলতঃ ভারতের আদিবাসী অনার্য আর ব্রাহ্মণাদি কতিপয় 'জাতি' খাঁটি আর্য। এঁদের এই অহমিকা সমাজে বিদ্বেষের বিষ ছাড়া আর কিছু উৎপাদন করে না। সে-কথা স্বতন্ত্র। এই সমাজ-বিজ্ঞানীরা অস্বীকার করেননি যে, এইসব তথা-কথিত অনার্য 'জাতি' বর্ণ-ব্যবস্থায় আর্যী-করণ নামক ভারতীয় নিত্য পদ্ধতির মধ্যে পড়ে উন্নীত হচ্ছে। এর সাক্ষ্য আবার দেশীয় নানা পুরাণও দিচ্ছে। বিভিন্ন 'জাতি'র সংমিশ্রণ ও আদানপ্রদান দর্শিয়ে বহু 'জাতি'র উৎপত্তির উৎস প্রমাণ করছে। মূল উদ্দেশ্য সেই একই। আর্য-সভ্যতা আর্য-সংস্কৃতির বিস্তার। সকলকে আর্য-সংস্কৃতি-আবেষ্টনীর মধ্যে গ্রহণ করা। এ-কথা বিস্মৃত হয়ে অনেকে আর্য-অনার্য-তারতম্যের তর্ক তুলে অনর্থ উপস্থিত করেন। তাঁরা আরও ভুলে যান, মধ্যযুগে প্রয়োজনের তাগিদে বহু ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করা হয় যজ্ঞের দ্বারা। আজ আর কেহই নিখুঁত আর্যত্বের দোহাই দিতে পারে না, না কোন বংশ, না কোন জাতি—দেশী অথবা বিদেশী। তবুও এ 'আর্য' শব্দ জগতে এমন এক গৌরবজনক অভিধা পেয়েছে যে, যে যখনই সু-উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে, সে তখনই এই আর্য-গোঁড়ামির নজির উপস্থিত করছে।[২] নিজেকে 'আর্য' পূর্বপুরুষের একমাত্র সত্যধারক এবং সংস্কৃতির বাহকরূপে জাহির করছে। একে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না। আর্য যেন সর্ব-গৌরবের এবং মর্যাদার চিহ্ন; অনার্য যেন সকল অগৌরবের—অমর্যাদার। লোকের এই মনোভাব স্বামী বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন। আর্য-অনার্য-দ্বন্দ্ব, অনার্য-অমর্যাদা নিরসনের জন্যে অননু-করণীয় ভঙ্গীতে তিনি বললেন, বিপুল শূদ্র-

১ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রঃ নাস্তি তু পঞ্চমঃ—মনু।

২ আর্যদের আদি উৎপত্তিস্থল মধ্য-এশিয়া। উরাল পর্বতে (দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে), অষ্ট্রিয়া বাল্টিক-অঞ্চল প্রভৃতি রূপে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পণ্ডিত প্রচার করেছেন। বলা বাহুল্য, পণ্ডিতগণ নিজের কোলে ঝোল টানতে প্রয়াস পেয়েছেন, তার কারণ এ মতগুলির জন্ম ঐতিহাসিক গরজে। তাই দেখা যায়, আজ যখন রাশিয়া (সেদিন পর্যন্তও সে ইওরোপীর সমাজে নিতান্ত অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল) বিশ্বের বিশেষ শক্তিশালী দেশসমূহের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে, সেও তখন দেশের এবং জাতির আর্য-ঐতিহ্য প্রকাশের গরজ অনুভব ক'রল। সম্প্রতি রুশ পণ্ডিত 'আবিষ্কার' করেছেন, আর্যদের আদি-নিবাস কৃষ্ণসাগর-উপকূলে। অঞ্চলটি রাশিয়ার অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য :-সোভিয়েত দেশ (বাংলা) মে-জুন, ১৯৬২ সংখ্যাদ্বয়।

সম্প্রদায় যদি সবাই অনার্য হ'ত তো মুহূর্তেই মুষ্টিমেয় 'আর্যবাবা'দের চাটনি ক'রে ফেলত। আর্য-বোধ ও আর্য-গৌরব দানের জন্য জনসাধারণকে ডেকে তিনি ঘোষণা করলেন, যাদেরই গোত্র আছে, তারাই আর্য। রবীন্দ্রনাথও বিবেকানন্দের এই আর্য-অনার্য-দ্বন্দ্ব-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত মূলতঃ সমর্থন করেন। এ-বিষয়ে কবির 'পূর্ব ও পশ্চিম' নামক নিবন্ধ ও অন্যান্য সমাজচিন্তা-বিষয়ক রচনাবলী দ্রষ্টব্য।

সত্যই আজ আর্য-অনার্য মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। আর এও মনে রাখতে হবে, অনার্য বলতে কোন একটা জাতিকে বুঝায় না। বহু বিভিন্ন প্রকারের জাতির অবদানে আজ ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে। ইতিহাসে কোন দিন আর্য-অনার্যের তর্কের কোন সুরাহা হবে ব'লে মনে হয় না, বা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন দেশকল্যাণকর পথ ও মত গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কর। সহজ কল্যাণ-বুদ্ধি তাই-ই বলে, আর এর দ্বারা ঐতিহাসিক বোধও ক্ষুণ্ণ হয় না। তবেই কাউকে আর্য, অসৎ জাতি ব'লে অবজ্ঞা করা বা ঘৃণা করা শুধু অশোভন নয়, গালি পাড়ার আগে যদি আমরা নিজের ঠিকুজি ইত্যাদি সম্যক্ জানি, তাহলে দেখব সেখানেও বিস্তর সংশয়। কয়েক পুরুষের সংবাদে যদি এ-বিষয়ে অনার্য-শূদ্র-মিশ্রণ না বুঝি, তবে চলে যেতে হবে একেবারে মূলে, গোত্রে। সেখানে হয়তো দেখব, গোত্র-প্রতিষ্ঠাতার উৎপত্তিতেই গোল।[৩]

কিন্তু গোল বাধে আবার সংস্কৃত গ্রন্থগুলি নিয়ে আর কিছু শব্দ নিয়ে—যার প্রচলন সুপ্রাচীন শ্রুতির যুগেও ছিল, আবার এখনও আমরা ব্যবহার করি। দোষ কি প্রকৃতই গ্রন্থ এবং শব্দের, না আমাদের বিচার-বুদ্ধির? শ্রুতির 'ব্রাহ্মণ' আর কলির 'ব্রাহ্মণে'র অর্থ এক নয়। কিন্তু আমরা আমাদের বর্তমান অর্থ এবং প্রচলিত ধারণা নিয়ে এই প্রকার শব্দের জ্ঞান শ্রুতি থেকে বা প্রাচীন গ্রন্থ থেকে আহরণ করতে যাই। আর তার ফলে আমরা বেদের 'পুরুষসূক্তে' লক্ষ্য করি ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের উৎপত্তি মাহাত্ম্য ও মর্যাদা-অমর্যাদা। ওতে যে রূপকচ্ছলে চার বর্ণের পরস্পর নির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং ওগুলি যে প্রতীক, সে উপলব্ধি হয় না। অপ্রমত্ত মনের অভাবই এর কারণ। শ্রীঅরবিন্দ চমৎকার বলেছেন যে, আমরা নিজেদের মন পূর্বপুরুষদের মধ্যে দেখি।[৪] ভাবি, তাঁরাও নিশ্চয়ই এই হাস্যকর, সম্পূর্ণ অসম্ভবকে ঘটনা ব'লে মানতেন। যে যার নিজের মতো জগৎকে দেখে! নিজে চোর তো জগৎও চোর; আর চোরের পিতৃপরিচয়ঃ অবশ্যই চোর হ'তে হবে। সুতরাং আজ যে ব্রাহ্মণ, তার পূর্বপুরুষগণ সবাই সকল সময়েই ব্রাহ্মণ ছিলেন, আর শূদ্র—শূদ্রই। কিন্তু তা তো নয়। তা যদি হ'ত তো পরিবর্তনকে অস্বীকার করতে হয়, আর পরিবর্তনকে অস্বীকার করা মানেই জগৎকে অস্বীকার করা। পণ্ডিতগণও বিস্মিত হয়েছেন ব্রাহ্মণ ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্চর্য নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করে।[৫] এতে অবাক্ হবার কিছু নেই, রক্ত-বিশুদ্ধতা বা অমিশ্রণ কোথাও নেই। সুতরাং প্রচলিত

---

৩ সহজ উপলব্ধির জন্যে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত 'ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি' দ্রষ্টব্য। কোষগ্রন্থ মহাভারত ইত্যাদি।

৪ 'We read always our own mentality into that of these ancient forefathers'—Sri Aurobindo in The Human Cycle, পৃঃ ৮।

৫ বাঙালীর ইতিহাস —শ্রীনীহাররঞ্জন রায়।

'জাতিভেদ' ও তৎসম্বন্ধী বাদ-বিচার, মনে রাখতে হবে, আবহমান কালের নয়, অতএব অনিত্য; সর্বদেশে এ সমান নয়, অতএব আঞ্চলিক ও অসর্বজনীন (not-universal); কাজেই এর উদ্ভব ধর্মীয় নয়, সামাজিক। এই কারণেই স্বামীজী বললেন, বুদ্ধ থেকে রাম-মোহন একই ভুল করেছেন 'জাতিভেদ' ধর্মের অঙ্গ মনে ক'রে; 'জাতিভেদ' (Casteism) দানাবদ্ধ সামাজিক প্রথা ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্মের সঙ্গে এর প্রকৃত কোন সম্বন্ধ নেই।[৬]

তবুও অজ্ঞ লোক জাতিবিচার ধর্মীয় অঙ্গরূপেই দেখে। আর তার কারণও আছে। ধর্ম দুইরূপে এদেশে পালিত হয়ে থাকে। এক—সাধু-সন্ন্যাসীরা, যাঁরা মঠবাসী হয়ে তপশ্চর্যার দ্বারা ঈশ্বরোপলব্ধির উপায় খোঁজেন। এঁদের পথ প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম-অনুভূতির চিন্তা। সুতরাং এঁদের ধর্মাচরণ সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম-ভিত্তিক। যখন আমরা বলি, 'ও-সব ধর্ম-কর্ম সাধু-সন্ন্যাসীদের ব্যাপার'—তখন এই অর্থেই বলি। এই সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে কোন জাতিবিচার নেই। কারণ তাঁরা সমাজ-বহির্ভূত। গৃহীরা ধর্মপালন করে নানারূপ অনুষ্ঠানের মধ্যে স্থূল পদ্ধতিতে। অনুষ্ঠান-প্রধান এই ধর্মাচরণও অধ্যাত্মমূলক তবে অপ্রত্যক্ষ। আজও বহুলোক জবাবে বলে, 'প্রভুর কৃপায়,' 'গোঁসাইজীর দয়ায়' বা 'আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে'। মানুষ যে নিমিত্তমাত্র—এই যে ভাব, এই-ই অধ্যাত্ম-চেতনার ভিত্তি এবং লক্ষণ। যাক, এই অনুষ্ঠানসমূহ সংসারী লোকের দ্বারা হয় বলেই এতে দেশাচার লোকাচার প্রভৃতি সমাজবিধি স্থান পায়। তাহলে বুঝা যায়—কেন লোকে 'জাতিভেদ'কে ধর্মীয় ব'লে মনে করে আর তাদের ভুলটা কোথায়। আহার্য দেহ গঠন করে ব'লে কি আহার্যই দেহ? অনুষ্ঠানাদি ধর্ম-লাভের উপায়, সোপান। অনুষ্ঠানই ধর্ম নয়। অনুষ্ঠান রক্ষার জন্যে যে দেশাচার লোকাচার মান্য করা হয়, তাহলে তাও ধর্ম হ'তে পারে না। কিন্তু অনুষ্ঠানের জন্যে এগুলি আসে, আর তারই ফলে—জাতি-বিচার, অনুষ্ঠান, ধর্ম—সব একাকার হয়ে যায়।

এদিকে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মতো মনীষিবৃন্দ[৭] দেখি কখনই ইওরোপ-আগত আর্য-মত গ্রহণ করতে পারছেন না। আবার পণ্ডিতগণের মধ্যেও দেখি আর্য আর অনার্য নিয়ে ইতিহাসে তুমুল তর্ক। দেখে শুনে দুটো সম্ভাব্য সূত্র মনে আসে এ-সম্পর্কে।

(১) ভারতে 'আর্য' শব্দের উৎস কোন নবাগত বিশেষ নরগোষ্ঠী নয়। এর অর্থ সভ্য ভদ্র মার্জিত ইত্যাদি।[৮] যেমন আমরা বলে থাকি কারও সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে 'বেশ ভদ্র', 'সভ্য'—সেই রকম। আর তারই বিপরীত—অনার্য; আর এর সমার্থসূচক অন্যান্য শব্দ—দস্যু, দাস, অসুর প্রভৃতি। প্রাচীন সংস্কৃত বহু গ্রন্থে কাব্যে এবং শাস্ত্রেও শব্দগুলি জাতিবাচক অর্থে প্রযুক্ত না হয়ে গুণবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ-ও দেখা গেছে—একজন আর্য আর একজনকে অনার্য, দস্যু ইত্যাদি নামে গালি পাড়ছে। আমরাও তো ভদ্রসম্প্রদায় কারও ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হলে ব'লে থাকি 'অভদ্র'! তাহলে

৬ Letters—Swami Vivekananda

৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড—পৃঃ ৩৩৩ (আবরণ); স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পৃঃ ১০৭; ভারতীয় আর্যরা বিদেশী নন এঁদের বিশ্বাস।

৮ মৌলিক অর্থ—'বিশ্বস্ত জন'

ভদ্রসমাজভুক্ত অনেকে যেমন আচার-ব্যবহারে অন্যথা দেখালে পতিত হন বা অভদ্র হন, তেমনি আর্য-সমাজভুক্ত পতিত যারা, তারা 'অনার্য' নামে কথিত। আর্য-সংস্কার জীবন-চর্যায় অটুট না রাখতে পারার দরুন কিছু-সংখ্যক আর্য-সম্প্রদায় থেকে বিতাড়িত হ'তে পারেন, আধুনিক কালের শোধন (Purging)। অথবা কালক্রমে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে দুই দলের উদ্ভব হওয়ায় একদল আর একদলের দ্বারা বিতাড়িত হলেন। এই মতভেদ তো যুগে যুগে আছে। বর্তমান রাজনীতিতে এরূপ দেখা যায়।

(২) আর্য যদি জাতিবাচক শব্দ হয়, তবে এই নরগোষ্ঠীর একটা আদি-নিবাস অবশ্যই আছে। 'এ-সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, আর্যদের প্রাচীনতম অবদান ঋগ্বেদে কোথাও পূর্বতন কোন পিতৃভূমি সম্বন্ধে সঙ্কেত পর্যন্ত নেই। হিমালয় ভিন্ন অন্য কোন অঞ্চলের সঙ্গে পূর্ব-পুরুষের পুণ্যস্মৃতি জড়িত হয়ে নেই।'[৯] আর শুধু এ-কথা মনে করলে ভুল করা হবে যে, কোন বিদেশী পণ্ডিতই ভারতকে আর্যদের আদি নিবাস ব'লে মনে করেননি। কার্যতঃ কোন কোন জার্মান পণ্ডিত, যেমন আইকস্টেডট্[১০] সিদ্ধান্ত করেছেন, হিন্দুকুশই বৈদিক আর্যের পূর্বপুরুষদের বাসস্থল। আর এটি প্রাচীন ভারতেরই অংশ। অনেক পণ্ডিত ভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে অনুমান করেছেন—প্রাচীন ইরানী এবং ভারতীয় আর্য মূলতঃ একই জাতি। কিন্তু তার দ্বারা এ প্রমাণ হয় না যে, আর্যেরা ইরান থেকে এসেছে। বিপরীতটা অর্থাৎ ভারত থেকে আর্যেরা ছড়িয়ে পড়েছে—এ চিন্তা কল্পনা আমাদের মগজে আসে না কেন? অসম্ভব। অসম্ভব বলেই যদি সে চিন্তা থেকে নিবৃত্ত হই, তবে কেন বুঝতে চেষ্টা করিনা যে, যেখানে আর্যদের যত প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ সেই অঞ্চল আর্যদের আদি-উৎপত্তিস্থল-রূপে ঘোষিত হচ্ছে। আর যে মতে আর্যেরা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে আগমন করেছে, তা খৃঃ পূঃ ১৪০০-র কাছাকাছি এক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ঋগ্বেদের কাল খৃঃ পূঃ ৩০০০-২৫০০ বৎসর। 'উইণ্টারনিজের এই মত অদ্যাবধি গ্রাহ্য' (ভারতের ইতিহাস—ডঃ সিংহ ও বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৯)। কোন্‌টা প্রাচীন? অর্বাচীন কি প্রাচীনের আদিপুরুষ? অতএব যতদিন পর্যন্ত না কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় যে, আর্যগণ ভারতে অন্য কোন দেশ থেকে এসেছেন, এ-বিষয়ে নীরব থাকাই ভাল। আর ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্টতা ইওরোপীয় বা অন্যান্য সভ্যতা থেকে তার বিভিন্নতাই ভারতীয় আর্যের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের—প্রত্যেকের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-নামক ও-বিষয়ক প্রবন্ধ ও বিচার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় আর্য সম্ভবতঃ ইওরোপীয় আর্য, ইহা ধারণাতীত। ভারতীয় আর্যের মৌলিক অর্থ—'বিশ্বস্ত জন', আগেই উল্লিখিত হয়েছে। কেউ কেউ আবার এ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আর্যদের সম্পর্কে অন্য কিছু সন্দেহাতীত ভাবে জানা না গেলেও এ ঠিক যে, তারা শ্বেতবর্ণ জাতি ছিল।[১১] কিন্তু ঋগ্বেদেই বহু কৃষ্ণবর্ণ ঋষির

৯ ভারতবর্ষের ইতিহাস—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬

১০ Swami Vivekananda—Patriot-Prophet, Dr. B. N. Datta—P. 351

১১ ভারতের ইতিহাস—ডঃ সিংহ ও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭;

উল্লেখ আছে, আর যদি 'দাস', 'দস্যু', 'অনার্য' প্রভৃতি শব্দ কেবলমাত্র শত্রুদের সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েও থাকে তবুও মনে রাখতে হবে—অনেক ঋগ্বেদ-মন্ত্রদ্রষ্টা এইসব দাসবংশোদ্ভূত। তবেই —যে আর্য কৃষ্টি এবং ভাব আমরা পাচ্ছি, তা কেবলমাত্র আর্য-জাতি-সঞ্জাত নয় এবং ভারতে আর্য-অনার্য মিলিত প্রয়াসে যে সংস্কৃতি ও সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে, যে-কোন কারণেই হোক, তা আর্য আখ্যা পেয়েছে এবং শ্রেষ্ঠ অভিধা লাভ করেছে। ফলে হয় তার দ্বারা সকলকে প্রভাবিত করার চেষ্টা অথবা সকলের অর্থাৎ অন্যান্য ভারতস্থ জাতির তার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা চলছে। সে কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে প্রচারিত হয়েছে—সকলকে উন্নীত করা। সকলকে আর্যের সমান করাই ভারতীয় বৈশিষ্ট্য।

তাহলে 'এক' অথবা 'দুই' যে-কোন সূত্রই গ্রাহ্য হোক না কেন, বর্তমান ভারতে কোম-গত যে বহু বিচিত্র 'জাতি' রয়েছে, ক্রমশঃ তাদের সেই কোম-পরিচয় অপসারিত হয়ে আর্য পরিচয় লাভ করতে আর্য বর্ণবিভাগে প্রবেশ লাভ করে। প্রথমে শূদ্র অর্থাৎ একজাতি[১২] এবং অন্য তিন বর্ণের পরিচর্যা অর্থাৎ তার মাধ্যমে দ্বিজ-সংস্কারের পরিচয় এবং পরে অধিকার লাভ করলে ক্ষেত্র-বিশেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি বর্ণে উন্নীত হবে। এইভাবেই ভারতীয় আর্য সভ্যতা ব্যাপ্তিলাভ করছে লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি ধীরে মন্থর গতিতে। আর তাকে সেই সমাজ আন্দোলনকে সেই আর্যীকরণ যজ্ঞকে ত্বরান্বিত ক'রে মহাভারত মহামিলন সাধন করবার জন্য স্বামীজী চাতুর্বর্ণ্য-ভিত্তিক সমাজ গড়তে অধিকতর সক্রিয় হ'তে বলেছেন। নিজে তার উদ্বোধনও ক'রে গেছেন তাঁর নিজেরই প্রতিষ্ঠিত মঠে অনুপবীতকে উপবীত প্রদান করে। এই জন্যেই শূদ্রকে তিনি অপেক্ষমাণ আর্য বা নব-আর্য অভিহিত করেছেন কোন কোন স্থলে।[১৩] কিন্তু এর প্রয়োজন হয় না। মনু তো স্পষ্টই পঞ্চম কোন বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করছেন না আর্য সম্প্রদায়ের মধ্যে। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রয় ছাড়া বাকী যদি সব শূদ্র হয়, তবে ভারতীয় মাত্রেই আর্য। তবুও এ যুগের লোককে যুগোপযোগী করেই বুঝাতে হবে। তবেই দেশের উদ্ধার। মনুর যুগ তো বহুকাল আগেই শেষ হয়েছে; আর শাস্ত্র-ধৃত যে ব্যবস্থা দেখা যায়, তা বিশেষ কালের দেশাচার, লোকাচার বৈ তো নয়। লোকাচারের উপযোগিতা কালে পালটায়; সমাজের পরিবর্তন হয়। পুরাতন শাস্ত্রও কাজে-কাজেই অচল। নূতন সমাজের জন্যে নূতন বিধির আবশ্যক, তাই নূতন ভাবের ধারণার প্রবর্তনা।

১২ কিন্তু বেদে নাকি 'সর্বে বর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ' ছিল। দ্রষ্টব্য -'ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি'—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। পৃঃ ৩২

১৩ Waiting Aryas—Aryas in novitiate. Complete Works. Vol. IV. P. 242-248.

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা

[পূর্বানুবৃত্তি]

তৃতীয় পর্ব—উনবিংশ শতাব্দী

(ভারতের জাগরণ)

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

(১)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতেতিহাসে সর্বপ্রধান ঘটনা ভারতের জাগরণ এবং এ ঘটনার বা কাহিনীর একজন প্রধান নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ। সুতরাং সমসাময়িক এ ঘটনাকে স্বামীজীর ইতিহাস-চেতনার দর্পণে প্রতিবিম্বিত ক'রে দেখবার প্রচেষ্টায় তাঁকে ও তাঁর কর্মধারাকে যতটা সম্ভব আড়ালে রাখতে হবে। বর্তমান লেখকের সঙ্কট সহজেই অনুমেয়। এ বিরাট ও জটিল বিষয়টি যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণিত হচ্ছে।

ভারতে বৃটিশ রাজত্বের ইতিহাসে এ-যুগ ইংরেজের সর্বময় প্রাধান্য-স্থাপনের যুগ। আবার এ যুগই রেনেশাঁসে বা ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্জন্মের যুগ, যার গুরুত্ব সমধিক। স্বামীজীর ভাষায় 'আমাদের সৌভাগ্যবশতই হউক বা দুর্ভাগ্য-ক্রমেই হউক, ইংরেজ ভারত জয় করিল। অবশ্য পরদেশ-বিজয় মাত্রেই মন্দ, বৈদেশিক শাসন নিশ্চয়ই অশুভ। তবে অশুভের মধ্য দিয়াও কখন কখন শুভ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইংরেজের ভারত-বিজয়ে এই শুভ ফল হইয়াছে। ইংলণ্ড ও সমগ্র ইওরোপ সভ্যতার জন্য গ্রীসের নিকট ঋণী, ইওরোপের সব কিছুর মধ্যে গ্রীসই যেন কথা কহিতেছে।··· ইওরোপের বিজ্ঞান, শিল্প—সর্বত্র গ্রীসের ছায়া। আজ ভারতক্ষেত্রে সেই প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন হিন্দু একত্র মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের ফলে ধীরে ও নিঃশব্দে একটা পরিবর্তন আসিতেছে। আমরা চতুর্দিকে যে উদার জীবনপ্রদ পুনরুত্থানের আন্দোলন দেখিতেছি, তাহা এই সব বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের ফল। মানব-জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রশস্ততর হইতেছে।' (আমাদের উপস্থিত কর্তব্য—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৫)।

উপরের উদ্ধৃতিটুকু ভারতের জাগরণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বঙ্গদেশের যে রেনেশাঁস (সংস্কৃতির পুনর্জন্ম) আন্দোলনের স্তরে স্তরে ভারতের 'উদার জীবনপ্রদ (জাতীয়) পুনরুত্থান' বিন্যস্ত হয়ে রয়েছে, তার ভিত্তি নির্মাণ করেছিল এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার। এবং আধুনিক ইওরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ইটালীয় রেনেশাঁসের ক্রোড়ে, যে রেনেশাঁসের প্রাণস্বরূপ প্রাচীন গ্রীসের (হেলেনীয়) সভ্যতার পুনরাবিষ্কৃত গৌরবময় ঐতিহ্য। বস্তুতঃ ইওরোপের আধুনিকতার পথে প্রথম পদক্ষেপ ঐ ইটালি দেশের ফ্লোরেন্স নগরীর রেনেশাঁসের মাধ্যমে আর ভারতের আধুনিকতার এবং জাতীয়তার জন্মকথা রয়েছে বঙ্গদেশের তথা ভারতের

প্রাণকেন্দ্র কলকাতার রেনেশাঁসে এই দুটি বিরাট ঘটনার যোগসূত্র ভারতে ইংরেজ-শাসন। স্বামীজী এ ইঙ্গিতই দিয়েছেন উপরের উদ্ধৃতিতে। '…গ্রীক মন—যা ইওরোপীয় জাতির বহির্মুখ শক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে, তার সঙ্গে হিন্দু মন মিলিত হ'লে ভারতের পক্ষে আদর্শ সমাজ হবে।' (বাণী ও রচনা—৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৬)। উনবিংশ শতাব্দীতে যে নানাবিধ সমাজ-সংস্কারের কর্মসূচী নিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নেতৃবর্গ অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার সমীচীনতা বা যাথার্থ্য নিরূপণে স্বামীজী এই সূত্রটি দিয়েছেন পূর্ব-পশ্চিম-মিলনের তাৎপর্য এ উক্তিটিতে প্রকাশ। সে-কথা পরে আলোচ্য। এখানে লক্ষণীয় শুধু এটুকু যে, অশুভ ইংরেজ-শাসনের শুভ ইঙ্গিত আমাদের ইংরেজী-শিক্ষার কত গভীরে স্বামীজী অনুসন্ধান করেছেন।

ইংরেজী-শিক্ষার সূচনা এদেশে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, যখন কলকাতার কয়েকজন প্রভাব-শালী হিন্দু ভদ্রলোকের উৎসাহে ঘড়ি-নির্মাতা স্বনামধন্য ডেভিড হেয়ারের আনুকূল্যে এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হাইড্ ইস্ট সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারের কোন উদ্যোগ এর পশ্চাতে নেই। ১৮৫৫ খৃঃ হিন্দু কলেজ পরিণত হ'ল বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজে সরকারের অনুমোদনে। ১৮১৭ খৃঃ থেকে ১৮৫৫ খৃঃ পর্যন্ত যে যুগ, তার মধ্যে আরও দুটি তারিখ উল্লেখযোগ্য। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক ভারতের জন্মদাতা রামমোহন তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে একখানি লিপি প্রেরণ করেছিলেন। সরকারী অর্থে কলকাতায় প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সে লিপিতে রামমোহন দাবি করেছিলেন যে, ইংরেজীকে বাহন ক'রে পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞান বিতরণের জন্য উক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে। ১৮৩৫ খৃঃ অর্থাৎ রামমোহন রায়ের মৃত্যুর দু বছর পরে গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এবং তাঁর আইন সচিব মেকলে সাহেব—ভারতের উচ্চশিক্ষার বাহন হবে ইংরেজী, সরকারের শিক্ষাখাতে ধার্য অর্থব্যয় করা হবে ইংরেজী-শিক্ষার জন্য এবং পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হবে ভারতীয়দের কাছে—এই ত্রিবিধ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, বোম্বাইএ শিক্ষাসমাজ (ইংরেজী-শিক্ষার জন্য) স্থাপিত হয় ১৮১৫ খৃঃ এবং মাদ্রাজে টমাস্ মনরোর চেষ্টায় ১৮২২ খৃঃ। কিন্তু অনুসন্ধান ও শিক্ষাসংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ ব্যতীত কার্যক্ষেত্রে কলকাতার আগে অন্যত্র কিছু হয়নি।

হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে রামমোহন ছিলেন কিনা (স্মরণীয়—রামমোহন কলকাতায় আসেন ১৮১৫ খৃঃ উক্ত কলেজ-প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় শুরু হয় ১৮১৬ খৃঃ) এ নিয়ে মত-দ্বৈধ আছে। ডক্টর মজুমদার তাঁর 'Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ প্রকাশ ক'রে প্রাসঙ্গিক দলিল-পত্রের উল্লেখ করেছেন। রামমোহনের কোন প্রত্যক্ষ অবদান হিন্দু-কলেজের পশ্চাতে থাকুক বা নাই থাকুক, এ সিদ্ধান্ত সন্দেহাতীত ও সর্বজনগ্রাহ্য যে, ইংরেজী-শিক্ষা-প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর একক প্রচেষ্টা অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর এ্যাংলো হিন্দু বিদ্যালয়টি, যা পরবর্তী কালে পূর্ণ মিত্রের বিদ্যালয় বা ইণ্ডিয়ান একাডেমি নামে পরিচিত হয়েছিল—সেটি স্মরণীয়। দ্বারকানাথ-পুত্র, রবীন্দ্রনাথের পিতা ব্রাহ্মধর্ম-প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্র-

নাথ এ বিদ্যালয়েই ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

সুতরাং এ ধারণা আমাদের ভ্রমাত্মক যে, কেরানীগোষ্ঠী সৃষ্টির প্রয়োজনে কোম্পানির সরকার ভারতে ইংরেজী-শিক্ষা প্রবর্তন করেন। এদেশে ইংরেজী-শিক্ষার আকুলতা ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনের নিমিত্ত। এবং এ অনুশীলনের মাধ্যমেই বিচার ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথ অনুসন্ধান করেছেন তৎকালীন যুবকবৃন্দ, সংখ্যা তাঁদের যতই অল্প হোক না কেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি হিসেবে জানা যায় যে, হিন্দু কলেজে ছাত্রসংখ্যা তখন চারশ'র উপরে, ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা তৎকালীন পরিবেশেও কলকাতার সমাজকে কম নাড়া দেয়নি।

কিন্তু এর প্রতিক্রিয়াও কম তীব্র হ'ল না। ফিরিঙ্গী মনীষী অধ্যাপক ডিরোজিওর কথা এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। বাংলার রেনেশাঁসে তাঁর অবদান নির্ণয় করতে আমাদের খানিকটা বিভ্রান্তি এসে পড়ে। বদ্ধমূল সংস্কার, চিরাচরিত সমাজ-ব্যবস্থা, লৌকিক ধর্মাচরণ এবং স্বদেশের ঐতিহ্য—এ-সকলকে চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'রে যে 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায় কলকাতায় গড়ে উঠেছিল, তার গুরু ও পথ-প্রদর্শক ডিরোজিও এবং তাঁর শিক্ষাদর্শ। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে মাত্র তিন বছর অধ্যাপনা করেছিলেন। বিবেক ও যুক্তির উপর অতিরিক্ত মূল্যদানের ফলে কলেজের হিন্দু যুবকেরা নাস্তিক বা কালাপাহাড় হয়ে উঠছে এবং এরা সবাই ডিরোজিও-ভক্ত—এ তীব্র অভিযোগের ফলে ডিরোজিও কলেজের স্বার্থে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তখন তাঁর ২২ কি ২৩ বছর বয়স, তারপর তিনি আর বেশী দিন বাঁচেননি। আশ্চর্য প্রতিভাধর তরুণ এই ডিরোজিও, যাঁর কথা আমরা আজ সন্তোষজনকভাবে জানতে পেরেছি বর্তমান বাংলার বিশিষ্ট অধ্যাপক-ঐতিহাসিক সুশোভন সরকারের মূল্যবান্ প্রবন্ধ পাঠ ক'রে (Derozio and Young Bengal—Studies in the Bengal Renaissance Edited by A. C. Gupta)। মাত্র তিন বছরের অধ্যাপনায় ছাত্রসমাজে এ প্রভাব-বিস্তারের কাহিনী প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়, যদিও এ ঐতিহাসিক সত্য। ডিরোজিওর পিতৃকুল পর্তুগীজ, মাতৃকুল ভারতীয়। কিন্তু এই কবি ও দার্শনিক তরুণ মনেপ্রাণে ছিলেন ভারতীয়, ভারত-বন্দনার সঙ্গীত (অবশ্য ইংরেজীতে) তাঁর কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। একদা প্রাচীন এথেন্স নগরীতে মহাপ্রাজ্ঞ সক্রেটিস গ্রীক যুবকদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন—এই অভিযোগে কারারুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন হেমলক বিষ পান ক'রে। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় নব-জীবনের স্পন্দনের সূত্রপাতে ত্রস্ত রক্ষণশীল সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ দাবিতে এই প্রাজ্ঞ তরুণকেও সরে যেতে হয়েছিল প্রায় অনুরূপভাবে। সক্রেটিসের আবেদন বিবেকের কাছে, যুক্তির কাছে, শাস্ত্রের কাছে নয়, ডিরোজিওরও তাই।

কিন্তু তবু ডিরোজিও সক্রেটিস্ নন, কলকাতাও এথেন্স নয়। সক্রেটিসের অমরত্ব ডিরোজিও লাভ করেননি। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে (দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী) কেউ প্লেটো এবং এরিস্টট্‌ল্ ছিলেন না। আর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, এদেশের নিজস্বতা (genius) যে ধর্ম—যা কোন ধর্মমত নয়, যার বেদান্তভিত্তিক গতি-

শীলতা ও আধ্যাত্মিকতার কথা স্বামীজী বারবার বলেছেন, যে-ধর্ম সকল ধর্মমতকে সমান শ্রদ্ধা দেখাতে পারে, তার সংবাদ বাংলার এই ফিরিঙ্গী যুবক বোধ হয় পাননি, পাওয়া সম্ভবও ছিল না তাঁর পক্ষে। তাঁর শিক্ষার সকল আদর্শ ছিল ইওরোপের ভাবধারায় নিহিত।

সুতরাং 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায় পশ্চিমের প্রথম আলোর প্রাখর্যে ঝলসানো পথে চলতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। জন্মভূমি সম্বন্ধে একটা হীনম্মন্যতা এদের গ্রাস করলে। স্বামীজী এ পথের যাত্রীদের কথা স্মরণে রেখেই 'বর্তমান ভারত'-এ বলেছেন, 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা…এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?' কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল 'Reformed Hindu' নামে যে ব্যঙ্গকবিতায় এদের চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তা খানিকটা অতিরঞ্জিত হলেও একেবারে ভিত্তিহীন নয়। ভারতীয় জন্ম ও জীবনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে এরা নকল সাহেব সেজে যেভাবে মোসাহেবি ক'রত, তা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নানা গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাবের বিকৃতি বাংলার শিক্ষিত সমাজে দীর্ঘকাল দৃষ্ট হয়েছিল। অধ্যাপক সরকার তাঁর প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন যে, ভারতের নবজাগরণের কাহিনীতে ডিরোজিও এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' একটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায়-মাত্র। সমন্বয়প্রাণ শাশ্বত ভারতের যে-সকল মহান্ ঐশ্বর্য তৎকালীন (ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে) শিক্ষিত ভারতের কাছে পুনরাবিষ্কৃত হচ্ছিল এবং প্রধানতঃ প্রিন্সেপ, ম্যাক্সমূলার, কানিংহাম রিজ্ ডেভিস্ প্রমুখ ইওরোপীয় ভারততত্ত্ব-বিদ্‌দের অক্লান্ত গবেষণা ও অসীম অনুরাগের ফলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের শ্লাঘ্য ঘটনাবলীর দৃঢ়ভিত্তির উপর সেগুলি যুক্তি ও বিচারের সঙ্গে যেভাবে সংস্থাপিত হচ্ছিল এবং বাংলা সাহিত্য যে অপূর্ব সমৃদ্ধি ও গৌরবে ভূষিত হচ্ছিল, তাতে ক'রে নবজাগ্রত বাংলার ও ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী ধীরে ধীরে বদলাতে লাগলো, হীনম্মন্যতা দূর হ'তে লাগলো। স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হ'ল ভারত, পশ্চিমের দানকে অস্বীকার ক'রে নয়, তাকে নিজস্ব সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে নিয়ে। এ আশ্চর্য কাহিনীর বলিষ্ঠ প্রারম্ভিকা—রামমোহনের জীবন-দর্শনে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই, পরিণতি—স্বামী বিবেকানন্দের কার্যকর বেদান্ত-নির্ঘোষে এবং স্বদেশ-মন্ত্র উচ্চারণে, যে মন্ত্র তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের উপসংহারকে অসীম মর্যাদায় বিভূষিত ক'রে রেখেছে। নিজস্বতালুপ্ত সমন্বয়-শূন্য 'ইয়ং বেঙ্গল' সৌখিন জলচরের মতো ভারতের ডাঙায় আর বেশীদিন বেঁচে রইল না। কিন্তু এদের চিন্তাধারার প্রভাব পরবর্তী কালের দেশনেতাদের মধ্যেও কখন কখন দেখা গেছে।

অধ্যাপক সরকার বলেছেন, 'ইয়ং বেঙ্গলের' যুক্তিবাদ এবং বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ঐহিক জীবনের দেনাপাওনাকে গ্রহণ করবার প্রবণতাকে ছাপিয়ে উঠল ভারতীয় ঐতিহ্যবাদ (traditionalism), অতীত-প্রীতি এবং ধর্মাশ্রয়ী আদর্শ এবং এতে ক'রে ভারতের আধুনিক জাতীয় জীবনে কতটা সমৃদ্ধি এসেছে, সেটা গভীর সন্দেহের বিষয়। অধ্যাপক সরকারের উপর অসীম শ্রদ্ধা রেখেও ব'লব যে, যেখানে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, ঠিক সেখানেই এই সন্ধান মিলবে যে, সর্বগ্রাসী ইওরোপীয় আধিপত্যে দীর্ঘকাল থেকেও ভারত কেন আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ প্রভৃতি উপনিবেশগুলির মতো বৃহত্তর

ইওরোপে পরিণত না হয়ে ভারতই রয়ে গেছে।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপনিবেশিক শক্তি ইংরেজের শাসনাধীনে থেকে ভারত যে খড়কুঠোর মতো জড়বাদী পশ্চিমের সর্বগ্রাসী বেনো-জলে ভেসে গেল না, তার প্রধান কারণ এই ঐতিহ্যবাদ এবং ধর্মাশ্রয়ী আদর্শ। অথচ ইওরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে সে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছে। সেক্‌সপীয়র, মিলটন, বার্ক, হিউম, মিল, বেন্থাম, ইমার্স ন, হেগেল, নিউটন, ফ্যারাডে প্রমুখ নাট্যকার, কবি, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী তার সমগ্র চিত্তলোকে পরম আপন জনের মতো আনাগোনা করেছেন।

'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'— 'প্লেটো আর কপিল একসঙ্গে গান ধরেছে। সোলন আর মনু গলা ধরাধরি ক'রে দাঁড়িয়েছে। হোমারের মৃদঙ্গের সঙ্গে বাল্মীকির বীণা বেজে উঠেছে। হিরোডটাস্ আর ব্যাস, সক্রেটিস ও বুদ্ধ, একিলিস্ ও ভীষ্ম, প্যান্‌থিয়ন আর পুরাণ এক হয়ে গেল।' (দ্বিজেন্দ্রলাল—'চন্দ্রগুপ্ত')

এটা কি ভারতের দুর্ভাগ্য, এ কি মানব সভ্যতার দৈন্য ?

ভারত-ভাগ্যবিধাতার অসীম করুণায় ইয়ং বেঙ্গলের পাশাপাশি রচিত হয়েছিল সেই বৃহৎ পটভূমিকা, যাতে সন্নিবদ্ধ হয়ে ভারতীয় জাগরণ ভারতেরই পুনরুত্থানে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। এ পটভূমিকা একটি মহাজীবন। পশ্চিমের যুক্তিবাদ ও বিচারবুদ্ধির নির্ভেজাল মালমশলা দিয়ে সমৃদ্ধ ভারতীয় সত্তার এক অপূর্ব বিকাশ এই মহাজীবন। তিনিই 'ভারত-পথিক' রামমোহন। প্রত্যেক জাতির একটা নিজস্বতা (genius) আছে, যা যুগযুগান্ত ধরে ইতিহাসের বন্ধুর পথ বেয়ে এসেও নিশ্চিহ্ন হয় না, পরিবর্তিত পরিবেশে নূতন ক'রে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারতের নিজস্বতা ধর্ম, ইতিহাস-চেতনার কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে স্বামীজী এ মূলধনটি নবভারতের সিংহদ্বারে রেখে গেছেন। বর্তমান লেখক এই বলিষ্ঠ কর্ণধারের নিরাপদ আশ্রয়ে ধর্মের সুদৃঢ় সুসম্বদ্ধ অর্ণব-তরীতে আরোহণের এতটুকু স্থান ক'রে নিয়ে ভারতেতিহাস-সাগরকিনারে পর্যটন করতে করতে এ কথাই বলতে প্রয়াস পেয়েছে যে, এ ইতিহাসে যত কিছু পেছুটান, তা ধর্ম নয়, ধর্মহীনতাজনিত আত্মবিলুপ্তি।

রামমোহনের বিরাট কর্মযোগে সমন্বয়ী ধর্মের নূতন যে ভিত্তি জড়বাদের সঙ্গত দাবির সঙ্গে খাপ খাইয়ে স্থাপিত হয়েছিল, পশ্চাদপসরণ ও অগ্রগমনের অভিনব দোলায় দোল খেতে খেতে সেই ধর্ম এ জাতির জাগরণের প্রধান কথা হয়ে রয়েছে। রামমোহন উদ্ধার করলেন বেদান্তকে, পরিবেশন করলেন মাতৃভাষায় তাকে অনুবাদ ক'রে প্রত্যেকের ঘরে। ইংরেজী শিক্ষার পরম পক্ষপাতী রামমোহন বেদান্ত-শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন বেদান্ত-কলেজ। অতীত ও বর্তমান যুক্ত হ'ল সমন্বয়-বাদী রামমোহনে। ধর্মের আধ্যাত্মিক ভিত্তি থেকে স্খলিত হয়ে কুৎসিত আচার-ব্যবহার- ও বিলাস-ব্যভিচার-সর্বস্ব পৌত্তলিকতায় পরিণত যে তৎকালীন লৌকিক ধর্ম, তাকে প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন রামমোহন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক রামমোহন নিজে বলেছেন যে, তিনি হিন্দু ধর্মকে কখনও আক্রমণ করেননি। 'উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষদিগের আচরণের ও যে-সকল শাস্ত্রকে

তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদনুসারে তাঁহারা চলেন বলিয়া স্বীকার পান, তাহার মতবিরুদ্ধ।' সামাজিক দুর্নীতি, কুসংস্কার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে তিনি বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করলেন। বেদান্ত মন্থন ক'রে তিনি হিন্দুর ব্রহ্মবাদ বা একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠা করলেন, আশ্চর্য মনীষার দ্বারা ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের একেশ্বরবাদের সঙ্গে সমঞ্জসীভূত করলেন বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদকে। কত আঘাত এসেছে গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজের হাত থেকে, প্রাণ-নাশের চেষ্টাও চলেছে। ধর্মের আলোতে জ্যোতির্ময় এই পুরুষ একা চলেছেন সত্যপথে। সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম—সকল ক্ষেত্রেই এই পথিকৃৎ সংস্কারের পথ জীবন দিয়ে রচনা ক'রে গেলেন। ভারতের জাগরণের উৎস যে বাংলার রেনেশাঁস, তা তাৎপর্যময় হয়ে উঠল তাঁর কর্মধারায় জন্মলাভ ক'রে। এই রেনেশাঁসের গতি ও পরিণতি ধর্মকে বাহন ক'রে, ইওরোপের রেনেশাঁসের মতো ধর্ম-জিজ্ঞাসাকে এড়িয়ে নয়। বিচিত্র ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে সমাজ-সংস্কারকে কর্মসূচী ক'রে, স্বাধিকার-বোধকে জাগ্রত করেছে এই রেনেশাঁস। এবং এ স্বাধিকার-বোধই রচনা করেছে বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা-আন্দোলনের বেদী। আন্দোলনের বিচিত্র ধারায় ষোলবছর আগে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের দোরে এসেছে। আচার্য যদুনাথ সত্যই বলেছেন যে, বাংলার রেনেসাঁস ইটালীয় রেনেসাঁস থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ, আরও বেশী সুদূর-প্রসারী। (History of Bengal-Vol II—Concluding Remarks)

উপরের এই মন্তব্য যত সহজে কথার মালায় গাঁথা সম্ভব হ'ল, আসল ব্যাপারটা কিন্তু তত সহজ নয়। সমাজ-সংস্কারের কথাই বলা যাক। ভারতের উন্নততর অঞ্চলে (যথা বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ) ইংরেজী শিক্ষার ফল পাওয়া গেল, যখন বিভিন্ন সংস্থা ও নেতৃবর্গ ভারতীয় সমাজের কুসংস্কার, দুর্নীতি ও অসাম্য দূর ক'রে সমাজকে উন্নত ও আলোকপ্রাপ্ত করতে সরকারী আনুকূল্যে নানা কর্মসূচী দান করলেন। বস্তুতঃ জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস সৃষ্টির (১৮৮৫) পরেও অন্ততঃ কুড়ি বৎসর কাল ব্যাপক অর্থে এই সমাজ-সংস্কারই মডারেট (নরমপন্থী) কংগ্রেস নেতাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য-রূপে পরিগণিত ছিল। কিন্তু এই সংস্কারের কর্মসূচী বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল হীনম্মন্যতা-প্রসূত, সঙ্গে যুক্ত ছিল উপর থেকে নীচুস্তরের মানুষদের একটু করুণা করার ভাব, ভারতীয় মৌল বিধিব্যবস্থায় একটা অশ্রদ্ধা। অথবা সংস্কারের ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ, বৃহত্তর সমাজকে উপেক্ষা ক'রে মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের মানুষদের প্রয়োজন অনুসারে বিন্যস্ত। স্বামীজীর ভাষায় এ ছিল ইওরোপীয় আদর্শে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার সংহার-প্রচেষ্টা, সংস্কার নয় এবং তা ভারতকে অগ্রসর হ'তে সাহায্য করেনি।

স্বামীজীর ভাষাতেই বলি। 'তোমাদের সংস্কার মানে তো বিধবার বিয়ে আর স্ত্রী-স্বাধীনতা, ঐ রকম আর কিছু। তোমাদের দু-এক বর্ণের (উচ্চবর্ণের) সংস্কারের কথা বলছো তো দু-চার জনের সংস্কার হ'ল, তাতে সমস্ত জাতটার কি আসে যায়? এটা সংস্কার না স্বার্থপরতা? ·· তোমাদের মুখে সংস্কারের কথা যা শুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলিই অধিকাংশ গরীব-সাধারণের স্পর্শই করবে না। তোমরা যা চাও, তা তাদের আছে।' (বাণী ও রচনা-৯ খণ্ড-পৃঃ ৪২০) বিদ্যাসাগর মশায়ের বিধবাবিবাহ-সংস্কার ও সরকারের সাহায্যে

আইন-প্রণয়নের ব্যাপারটাকে স্বামীজী অন্যত্র তীব্রতর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। সত্যই এটা উচ্চবর্ণের মুষ্টিমেয় লোকদেরই সামাজিক সমস্যা, এবং তা থেকেও কঠিন সমস্যা, কুমারী কন্যার বিবাহ দেওয়া। সমাজের নিচু স্তরের কোটি কোটি মানুষের সমাজে এটা কোন সমস্যাই নয়। তদুপরি আমরা জানি, আইন করা সত্ত্বেও বিধবাবিবাহ স্বাভাবিক কারণেই উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে জনপ্রিয় হয়নি। আবার কাগজে-কলমে আন্দোলন ক'রে এবং পরবর্তীকালে আইন প্রণয়ন করেও বাল্যবিবাহ বন্ধ করা যায়নি। শিক্ষার আলো যখন সমাজের সকল স্তরে প্রবেশের পথ পায়, তখনই সামাজিক ব্যাধির নিরাময় হয়, সমীচীন নীতি গৃহীত হয়। স্বামীজী তাই ব্যাপক শিক্ষার উপর অত্যধিক জোর দিয়েছেন, আলো জেলে দেবার ভার প্রথম নিতে বলেছেন সংস্কারকদের।

তিনি বলছেন : 'কেবল কতকগুলি কাল্পনিক সংস্কারে…বৃথা শক্তিক্ষয় না ক'রে আমাদের উচিত, একেবারে মূল থেকে প্রতিকারের চেষ্টা করা। এর জন্য লোকদের শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান ক'রে নিতে পারে।' (বাণী ও রচনা—৯ খণ্ড পৃঃ ৪৬০)।

শিক্ষার অপূর্ব সংজ্ঞা স্বামীজী বেদান্তকে ভিত্তি করেই দিয়েছেন। সকলকে বলতে হবে —তুমি অমৃতের সন্তান, তোমার মধ্যে পূর্ণতা ঘুমিয়ে আছে, একে জাগাও শিক্ষার সোনার কাঠির পরশে। 'Education is the manifestation of the perfection already in man.' পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা দুই পরিবেশন করতে হবে সকল স্তরের মানুষের কাছে—অবশ্য অধিকার ভেদের প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু কেউ ছোট নয়—এ বোধ সৃষ্টি করতেই শিক্ষা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা-লাভকে স্বামীজী শিক্ষা বলেননি। যাঁরা উচ্চশিক্ষা-লাভের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা অবজ্ঞা-মিশ্রিত করুণার চোখে তাকান অজ্ঞ বা অশিক্ষিত মানুষের দিকে। এটা অপরাধ—ব্যক্তিগত ও সমাজগত। সংস্কার তাই ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হয়। মনীষী মহারাষ্ট্রনেতা বিচারক রানাডে ছিলেন তৎকালীন মহারাষ্ট্র সমাজের শিরোমণি। বাংলার ব্রাহ্মসমাজের প্রেরণায় তিনি বোম্বাইএ প্রার্থনা-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সমাজ-সংস্কারের নানা কর্মসূচীকে তিনি স্বাধিকার-লাভের প্রথম পাদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর মতে সে কর্মসূচী গঠনমূলক ছিল না, তাতে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিশেষ ক'রে ভারতীয় সমাজের চিরবরেণ্য সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উপর অশ্রদ্ধামিশ্রিত কটাক্ষ ছিল। রানাডে বাৎসরিক 'সামাজিক সম্মেলনের' সভাপতিরূপে যে ভাষণ দিয়ে তাঁর সংস্কারের কর্মসূচী দেশের সামনে রেখেছিলেন, তার তীব্র সমালোচনা ক'রে ১৯০০ খৃঃ ডিসেম্বর মাসের প্রবুদ্ধ ভারতে স্বামীজী সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। (বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড পৃঃ ৩৯৬)।

আগে শিক্ষা, তারপর সংস্কার—এ-কথার তাৎপর্য বোঝাতে স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে নানা কথা বলেছেন। 'দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন

যতই রাজনৈতিক আন্দোলন করা হোক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না। দেশের সর্বসাধারণকে তাহাদের অধিকার প্রদান করিলেই বর্তমান ভারতের সমস্যাগুলির সমাধান হইবে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতের ধর্মই শ্রেষ্ঠ, অথচ দেশের সাধারণকে কেবল কতগুলি ভুয়া জিনিস দিয়া চিরকাল ভুলাইয়া রাখিয়াছি। অফুরন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত থাকিতেও আমরা তাহাদিগকে নালার জল মাত্র পান করিতে দিয়াছি'—(বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৯)। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে ভারতে অন্যত্র মানব-সভ্যতার স্তর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বামীজী সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রনীতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা বর্তমান যুগকে বলেছেন শূদ্রযুগ, গণ-অভ্যুত্থানের যুগ। তাই বারবার সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন চিরন্তন সুযোগ-সুবিধার অধিকারী উচ্চবর্ণের মানুষদের উদ্দেশে। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে এ সাবধান-বাণীর তীক্ষ্ণ গভীরতা মর্মভেদী। 'তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপার সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে··· তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি।— অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।'

উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগরণের পট-ভূমিকায় যখন বাগাড়ম্বরে দেশপ্রেম জাহির করা হচ্ছিল, উচ্চবর্ণের সমাজসংস্কার যখন কায়েমী স্বার্থ-সংরক্ষণের নামান্তরে পরিণত হচ্ছিল, তখনই এ ভৎর্সনার বাণী প্রেরণ করেছিলেন স্বামীজী। কিন্তু স্বামীজীর উক্তি বর্তমানে আরও বেশী প্রযোজ্য যখন গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সমাজতন্ত্রী ধাঁচে আমরা দেশ-গঠনে অগ্রসর হচ্ছি। ভয় হয়, আজও আমরা চালাকি দ্বারা মহৎ কার্য করতে চলেছি। কিন্তু সে-কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রশ্ন এই—স্বামীজীর মতে কে তবে সত্যিকার সংস্কারক? স্বামীজীর ভাষাতেই তার উত্তর দিচ্ছি: তাঁরা (শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রমুখ সাধুসন্তগণ) সর্বদা গঠনই করেছিলেন, তাঁরা যে দেশ-কাল অনুসারে সমাজ গঠন করেছিলেন, সেই হ'ল আমাদের কার্য-প্রণালীর বিশেষত্ব। আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ ইওরোপীয় ধ্বংসমূলক সংস্কার চালাতে চেষ্টা করেন, এতে কারও উপকার হয়নি, হবে না। কেবল একজন মাত্র আধুনিক সংস্কারক গঠনমূলক ছিলেন—রাজা রামমোহন রায়। হিন্দুজাতি বরাবরই বেদান্তের আদর্শ কার্যে পরিণত করার চেষ্টা ক'রে চলেছে। সৌভাগ্যই হোক আর দুর্ভাগ্যই হোক, সব অবস্থায় বেদান্তের এই আদর্শকে কার্যে পরিণত করার প্রাণপণ চেষ্টাই ভারতীয় জীবনের সমগ্র ইতিহাস। যখনই এমন কোন সংস্কারক-সম্প্রদায় বা ধর্ম উঠেছে, যারা বেদান্তের আদর্শ ছেড়ে দিয়েছে, তারা তৎক্ষণাৎ একেবারে মুছে গেছে (বাণী ও রচনা—৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৮)। রবীন্দ্রনাথ এ-কথাটি একটু অন্যভাবে বলেছেন তাঁর অনন্য 'গোরা' গ্রন্থে। ভারতবর্ষের পরিবর্তন ভারতবর্ষের পথেই হওয়া চাই, হঠাৎ ইংরেজী ইতিহাসের পথ ধরলে আগাগোড়া সমস্ত পণ্ড ও নিরর্থক হয়ে যাবে।

এ সকল মন্তব্য উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-

আন্দোলন সম্বন্ধে একমাত্র সত্য ব'লে কেউ কেউ হয়তো নির্বিচারে গ্রহণ করবেন না। কিন্তু রামমোহন সম্বন্ধে স্বামীজী যা বলেছেন, তা রামমোহন চরিত্রের অসামান্য নির্দেশিকা-রূপে নির্দ্বিধায় সকলে মেনে নেবেন। শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্যের সঙ্গে একাসনে স্বামীজী বসিয়েছেন সংস্কারক রামমোহনকে, যাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল বেদান্ত। আর একস্থানে রামমোহনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন স্বামীজী এই ব'লে, '…আমাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর জাতিদের সহিত নিজেদের তুলনা করি নাই। …যে দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেইদিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে। সেই দিন হইতে ভারতের ইতিহাস অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ভারত এখন ক্রমবর্ধমান গতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে।… মহাবন্যা আসিতেছে, আর কেহই উহার গতি-রোধ করিতে পারিবে না'। (বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩-২১৪)। ভারতের নবজাগরণের প্রথম মন্ত্রদ্রষ্টা বৈদান্তিক রামমোহন—স্বামীজীর উপলব্ধ সত্যের আলোতে আরও ভাস্বর হয়ে আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন। (ক্রমশঃ)

মাতৃবন্দনা

শ্রীভবতোষ শতপথী

মৃত্যুনীল কালরাত্রি : জ্বলন্ত চিন্তার জটাজাল,
অন্তর-বাহির স্তব্ধ—অবরুদ্ধ ঘন অন্ধকার ;
কষ্ট-ক্লিষ্ট কল্পনায় খণ্ডখণ্ড পুঞ্জিত জঞ্জাল—
রৌরব-যন্ত্রণা-বিদ্ধ পৃথিবীর বীভৎস চিৎকার !
দুর্জয় দানব-শক্তি অহর্নিশি অগ্নিবাণ হানে,
কোথায় অমৃতময়ী ? দানব-দলনি, কোন্‌খানে ?

ক্ষুধায় অবশ অঙ্গ, চিররুগ্ন : শৌর্য-বীর্যহীন,
দিনগত আয়ুক্ষয় : অকাল-মৃত্যুর পূর্বাভাস ;
দুর্বহ জীবন-ভার, ভিক্ষাবৃত্তি : অতি অর্বাচীন—
লাঞ্ছনা-গঞ্জনা যত : নিষ্করুণ রূঢ় উপহাস ;
কোথায় কল্যাণময়ী, ফিরে আয়—দুঃসহ দুর্দিনে—
অন্নপূর্ণা, অন্ন দে মা, অগণিত নিরন্ন সন্তানে।

ছেড়ে আয়, ধ্যান-মগ্ন ধূর্জটির মঙ্গল-কৈলাস—
কোটি-কোটি সন্তানের অমঙ্গল : আকুল আহ্বান ;
শোকে-দুঃখে ম্রিয়মাণ : নিত্য নব, নব সর্বনাশ—
সততার অপমৃত্যু : মিথ্যার গৌরব-অভিযান ;
একাক্ষরা মাতৃনাম, মহামন্ত্র : পাথেয় সম্বল—
ফিরে আয় স্নেহময়ী, সৃষ্টি-স্থিতি যায় রসাতল !!

সমালোচনা

বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত ও ভ্রম-নিরাস : শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ৩২৯ ; মূল্য টাকা ৬'৫০।

বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের প্রথম জীবনীকার বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের এই অমূল্য গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশ সাম্প্রতিক সাহিত্যজগতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আশৈশব সহচররূপে অগ্রজের সেবায় আত্মনিয়োগকারী শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনকাহিনী যত প্রত্যক্ষভাবে জেনেছিলেন, পরবর্তী জীবনীকারেরা কেউ ততটা সৌভাগ্যের অধিকারী নন। আশ্চর্য এই, এত কাছাকাছি থেকেও শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের ছটায় আচ্ছন্নদৃষ্টি হয়ে পড়েননি। তাঁর 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' পড়ে বিদ্যাসাগরকে 'মহৎ' মনে হয় ঠিকই, কিন্তু কোথাও অতিমানব মনে হয় না।

'বিদ্যাসাগর'কে বাঙালী-সমাজের ব্যতিক্রম হিসাবে দেখার একটা প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে এদেশে প্রচলিত। সাম্প্রতিক কালে এমনও কেউ কেউ বলেছেন যে, বিদ্যাসাগরের মানবিকতাবোধও নাকি এদেশী কিছু নয়, সম্পূর্ণ য়ুরোপীয় আমদানী। অথচ শম্ভুচরণের 'জীবনীগ্রন্থখানি পড়লে, যে পিতৃমাতৃকুলে এবং যে পিতামাতার ঘরে বিদ্যাসাগরের জন্ম—সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব কিছুমাত্র আকস্মিক ব'লে মনে হয় না। বাঙালী ব্রাহ্মণ-পরিবারের সুচিরপোষিত শুদ্ধাচার, মানবকল্যাণবোধ, বিদ্যানুরাগ ও তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির সঙ্গে য়ুরোপীয় আধুনিকতার মিশ্রণ ঘটলেও বিদ্যাসাগরের কর্মসাধনা যে বিদেশী দৃষ্টান্তের ফল—এ-কথা মনে করবার কোন কারণই নেই। আর তাঁর অতুলন মানবপ্রীতি, অফুরান বেদনাশ্রু—এ জিনিস তো কোন বৈদেশিক শিক্ষার দান নয়, এই স্বধর্ম নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন।

অপার হৃদয়াবেগ, অটুট সঙ্কল্প ও আমরণ সংগ্রাম-এসব দিক দিয়েই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের তুলনা চলে। কিন্তু বেদান্ত ও সন্ন্যাস—বিবেকানন্দের জীবনে আরও ব্যাপ্ত একটি পটভূমি এনে দিয়েছিল। অন্নবস্ত্রসংস্থানের জীবনসত্যকে আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করাতেই ভারতীয় সাধনার পূর্ণতা। বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের সুতীব্র হতাশা কি আমাদের সেই কথাই মনে করিয়ে দেয় না?

যথার্থ জীবনী যেমনটি হওয়া উচিত, সেই বিচারে শম্ভুচরণের জীবনী বিষয়নিষ্ঠ। কিন্তু সাহিত্যগুণের দিক থেকে হয়তো পরবর্তীকালের জীবনী (বিশেষতঃ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর') আমাদের মনোহরণ করে। কিন্তু বিদ্যাসাগর-সম্বন্ধে কোন কাল্পনিক মতবাদ-সৃষ্টির পূর্বযুগে তাঁর নিজস্ব ঐতিহ্যের পটভূমিতে বিদ্যাসাগরকে যাঁরা দেখতে চান, তাঁদের পক্ষে শম্ভুচরণের এই জীবনীগ্রন্থ অপরিহার্য বিবেচিত হবে।

শম্ভুচরণের জীবনীগ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায়—'বিদ্যাসাগর' নামে যে সুবৃহৎ জীবনীগ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তার অনেকগুলি তথ্যগত ভ্রান্তিসম্বন্ধে

অঙ্গুলিসঙ্কেত ক'রে শম্ভুচরণ 'ভ্রমনিরাস' গ্রন্থটি রচনা করেন। এই দুটি গ্রন্থকে একত্র মুদ্রিত ক'রে 'বুকল্যাণ্ড' পাঠকদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। মূল্যবান্ ভূমিকাতে শ্রীসনৎ গুপ্ত নিপুণ তথ্যসমাবেশের দ্বারা আলোচ্য গ্রন্থের তাৎপর্য বৃদ্ধি করেছেন।

ভারতবর্ষের যে ক-জন মহাপুরুষ বিশ্ব-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় আসনের অধিকারী, বিদ্যাসাগর তাঁদের অন্যতম ; তাই তাঁর প্রথম জীবনীকার শম্ভুচন্দ্র সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন। এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের জন্য আমরা প্রকাশককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, সেইসঙ্গে পরবর্তী সংস্করণে ছাপার ভুল সম্বন্ধে আরও সজাগ হ'তে অনুরোধ করি। **—প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী : মণি বাগচী। সুতপা প্রকাশনী, কলিকাতা ২৩। পৃষ্ঠা ১১২ ; মূল্য ৩৲।

আলোচ্য গ্রন্থখানির তিন-চতুর্থাংশ জীবনী এবং বাকী অংশে বিবেকানন্দ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। স্বামীজীর জীবন অসংখ্য ঘটনা ও সংঘাতের ইতিহাস। সেই জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা গ্রন্থখানিতে যথাযথ স্থান পেয়েছে। আবির্ভাব-লগ্নে যেমন দেশ ও কালের ইঙ্গিত আছে, তেমনি ক্ষুদ্র পরিবারে হলেও পিতার মৃত্যুর পর স্বামীজীর অসহায়তা, ঈশ্বরলাভের জন্যে ব্যাকুলতা পরিব্রাজক-জীবনের অভিজ্ঞতা, বিদেশে যোদ্ধার ভূমিকা এবং মঠ-মিশন গড়ার ইতিহাসও বিবৃত হয়েছে।

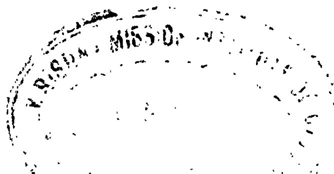
তথাপি জীবনীগ্রন্থে জীবনাংশের ফাঁকে ফাঁকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠা প্রয়োজন। তার জন্যে জীবন-কাহিনী শেষ ক'রে চরিত্র আলোচনা করলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হয় এবং জীবনী-অংশ ভারাক্রান্ত হয়, বিশেষতঃ ছোটদের জন্যে লেখা হ'লে। তাই এ গ্রন্থের শেষাংশ পরিশিষ্ট ব'লে গণ্য হ'তে পারে। গ্রন্থখানির ৩৩ পৃষ্ঠায় ষোল থেকে আঠারো পঙ্‌ক্তির দুটি বাক্যের পূর্বাপর অর্থের অসঙ্গতি চোখে প'ড়ল, পরবর্তী সংস্করণে তা থাকবে না—আশা করি। বীরেশ্বর 'বিলে'তে পরিণত হয়েছিল—জানি, 'বীরু' নাম এই প্রথম শুনলাম (পৃঃ ১১)।

গ্রন্থখানি সুলিখিত এবং লেখক স্বামীজীর ছোটবেলা ও কিশোর-জীবনের ঘটনা বেশ ভালভাবে তুলে ধরেছেন। বইটি ছোটদের হলেও বড়দের পড়ার মতো, তবে পৃষ্ঠাসংখ্যার তুলনায় পুস্তকের মূল্য কিছু বেশীই মনে হয়।

—অনন্তকুমার রাণা

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২১শে পৌষ (৬. ১. ৬৪) সোমবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ ১০২তম জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও অন্যত্র উদ্‌যাপিত হইবে।



শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামীজীর শতবার্ষিকী

বরাহনগর ঃ গত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ১৭ই অক্টোবর হইতে ২০শে অক্টোবর পর্যন্ত স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের প্রত্যুষে মাঙ্গলিক শান্তিপাঠ ও উষা-কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের প্রারম্ভ সূচিত হয়। সকালে বিশেষ পূজা হোম ও তৎসঙ্গে স্বামীজীর প্রিয় ভজন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল। এই দিন সকালে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদের মিলন-সভায় শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু সভাপতিত্ব করেন। প্রায় ৫০০ ভক্ত এই দিন বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। দ্বিপ্রহরে কালীকীর্তন হয়। বৈকালে প্রশস্তি-পাঠের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। তৎপরে স্বামী সাধনানন্দ ও শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র স্বামীজীর জীবনাদর্শ অবলম্বনে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

১৮ই অক্টোবর স্বামী ওঁকারানন্দ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবনদর্শন এবং বর্তমান সমাজে তাহার উপযোগিতা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন। রাত্রে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়।

১৯শে বৈকালের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন ডক্টর কালিদাস নাগ, বক্তৃতা দেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, ধ্যানাত্মানন্দ ও শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। তৎপূর্বে স্বামী বোধাত্মানন্দ উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে 'ভক্তহরিদাস' যাত্রাভিনয় হয়।

২০শে অক্টোবর প্রত্যুষে স্বামীজীর ১২½ ফুট উচ্চ পরিব্রাজক-মূর্তি সুসজ্জিত রথে করিয়া একটি শোভাযাত্রা কাশীপুর উদ্যানবাটী হইতে দক্ষিণেশ্বর মন্দির পর্যন্ত পরিচালিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে পতাকা ও ব্যাণ্ডবাদ্যসহ প্রায় ২,০০০ নরনারী এই শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। রাত্রে সঙ্গীত ও কথকতার মাধ্যমে স্বামীজীর ভাবধারা পরিবেশন করা হয়। এই দিনই বৈকালে একটি শিল্প- ও শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাধিকারিক শ্রীভবতোষ দত্ত। প্রদর্শনীতে স্বামীজীর বিভিন্ন চিত্রাবলী, এই শিক্ষায়তনের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিভাগের নানাবিধ পরীক্ষা, বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যাদি এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-বিভাগের দ্রব্যাদি দেখানো হয়।

বিবিধ সংবাদ

শতবার্ষিকী সংবাদ

রামেশ্বর ঃ দক্ষিণ ভারতের তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র ৺রামেশ্বর মন্দিরে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর মহাসমারোহে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের পৌরোহিত্যে স্বামীজার শতবার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৮৯৭ খৃঃ আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর এই পুণ্যস্থানে স্বামীজা 'তীর্থমাহাত্ম্য ও প্রকৃত উপাসনা' সম্বন্ধে যে বিখ্যাত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, মাদ্রাজ স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কমিটির অনুরোধে ৺রামেশ্বর মন্দিরের কর্তৃপক্ষ তাঁহার মূল ইংরেজী ও তামিল অনুবাদ দুইখানি বৃহৎ শিলাখণ্ডে খোদিত করান এবং রাষ্ট্রপতি উহার আবরণ

উন্মোচন করেন। ঐ দিন প্রাতে মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম হয়। মন্দিরের পুরোহিতরাও ৺রামেশ্বরের বিশেষ পূজা ও অভিষেক করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ মন্দিরের বারান্দায় যেখানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে সুসজ্জিত মঞ্চে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন সকালে মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রীবিষ্ণুরাম মেধীর সভাপতিত্বে স্বামীজী-সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত মনোজ্ঞ অভিভাষণে বলেন : 'শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চ অধ্যাত্মিক ভাবে এবং শিবজ্ঞানে জীব-সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত স্বামী বিবেকানন্দ জনসাধারণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁর হৃদয় ছিল বিশাল, জ্ঞান সুগভীর এবং অন্তর্দৃষ্টি ছিল অতি তীক্ষ্ণ। জনগণের দুঃখদুর্দশা উপেক্ষা করিয়া যারা ভগবানের পূজা করে, তারা নিজেদেরই ঠকায়।'

মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম্ ঐ উপলক্ষে মন্দির কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক সঙ্কলিত স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী সর্বজ্ঞানন্দ তামিলে ভাষণ দেন এবং সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

৺রামেশ্বরের মন্দির ও গ্রামটি পত্রপুষ্পে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং মাদ্রাজ ও মাদুরার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ঐ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

লেনিনগ্রাদ: গত ১০ই মে সোভিয়েট ভারতীয় সাংস্কৃতিক সোসাইটির শাখা এবং লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত স্বামীজীর শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয় :

১. ভারতের আন্তর্জাতিকতা ও স্বামী বিবেকানন্দের কর্মধারা।

২. বিবেকানন্দের মানবতাবাদ।

৩. ভারতের মহান্ সন্তান—স্বামী বিবেকানন্দ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও ছাত্রগণ সংস্কৃতে মঙ্গলাচরণ, বিবেকানন্দ-স্তোত্র ও কবিতা পাঠ করেন।

ইটালি: রোমে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২৩শে মার্চ রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফানো (Fano) 'পাশ্চাত্যে ভারতীয় চিন্তার—বিশেষতঃ বিবেকানন্দ-ভাবধারার গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। স্বামী নিত্যবোধানন্দ 'পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় বিবেকানন্দের দান' সম্বন্ধে বলেন। স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

ওয়াশিংটন: গত ৪ঠা অক্টোবর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে স্মিথসোনিয়ান (Smithsonian) ইনস্টিটিউশন-হলে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আমেরিকার বিশিষ্ট নাগরিকগণ এবং বহুসংখ্যক ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী বি. কে. নেহরু উদ্বোধন-ভাষণ দেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর গ্রেসন কার্ক (Grayson Kirk) তাঁহার ভাষণে 'বর্তমান জগতে বিবেকানন্দ-ভাবধারার গুরুত্ব এমং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে বলেন। নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। ভজন ও স্বামীজী-বিষয়ক সঙ্গীত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবীর দেহত্যাগ

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের অধ্যক্ষা শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী গত ২৭শে কার্তিক (১৪ই নভেম্বর) বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২ টায় তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন ও শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীগৌরীমায়ের দেহত্যাগের পর দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত উক্ত আশ্রমের কার্যাদি পরিচালনা করেন। তিনি অনেক দীক্ষিত শিষ্য-শিষ্যা রাখিয়া গিয়াছেন। এই উপলক্ষে গত ২৬শে নভেম্বর শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোমাদি হইয়াছিল। তাঁহার পূত আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে মিলিত হউক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

পরলোকে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের প্রাক্তন ডিমনস্ট্রেটার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত গত ১৩ই অক্টোবর রাত্রি ৭টা ৪০ মিঃ সময়ে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৮৮৬ খৃঃ ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত কুমোর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯১১ খৃঃ বরিশাল কলেজে তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কার্য গ্রহণ করেন এবং দেশ-বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত এই কার্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। তিনি বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ও জীবনের ৪০ বৎসরের অধিককাল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে দরিদ্র ও আর্তনারায়ণের সেবায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অনাড়ম্বর ও অমায়িক জীবন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। মহেন্দ্রবাবু মঠের বহু প্রাচীন সাধুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার দেহ-মুক্ত আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

নিবেদন

আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনে'র নূতন (৬৬ তম) বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক স্পষ্টাক্ষরে পুরা নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সহ বার্ষিক চাঁদা ৫'৫০ (পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা) ১৫ই পৌষের মধ্যে উদ্বোধন-কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি.-তে কাগজ পাঠাইবার অতিরিক্ত ডাক-খরচ বাঁচিয়া যায় ও অযথা বিলম্ব হয় না। মনি অর্ডারে টাকা পাঠাইলে কুপনে **গ্রাহক-সংখ্যা** অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন।

অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ রবিবার—৩টা হইতে ৫টা। অন্যান্য দিন সকাল ৭-৩০ মিঃ হইতে ১০-৩০ মিঃ এবং বিকাল ২-৩০ মিঃ হইতে ৫ টা।

কার্যাধ্যক্ষ
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা ৩

ভ্রম-সংশোধন

গত আশ্বিন-সংখ্যায় ৪৯৯ পৃঃ ৩২ পঙ্ক্তিতে 'অগস্ট' স্থলে 'অক্টোবর' পড়িবেন।
„ কার্তিক-সংখ্যায় ৫৮৮ „ ২৭ „ ১৪ই স্থলে ২১শে পড়িবেন।
„ „ „ ৫৯২ „ ১২ „ 'বিবেকানন্দ' স্থলে 'শিবানন্দ' পড়িবেন।



বিবেকানন্দপঞ্চকম্

শ্রীমৎস্বামিরামকৃষ্ণানন্দ-বিরচিতম্

অনিত্যদৃশ্যেষু বিবিচ্য নিত্যং তস্মিন্ সমাধত্তে ইহ স্ম লীলয়া।
বিবেকবৈরাগ্যবিশুদ্ধচিত্তং যোঽসৌ বিবেকী তমহং নমামি ॥ ১

বিবেকজানন্দনিমগ্নচিত্তং বিবেকদানৈকবিনোদশীলং।
বিবেকভাসা কমনীয়কান্তিং বিবেকিনং তং সততং নমামি ॥ ২

ঋতঞ্চ বিজ্ঞানমধিশ্রয়দ্ যৎ নিরন্তরং চাদিমধ্যান্তহীনম্।
সুখং সুরূপং প্রকরোতি যস্য আনন্দমূর্তিং তমহং নমামি ॥ ৩

সূর্যো যথান্ধং হি তমো নিহন্তি বিষ্ণুর্যথা দুষ্টজনান্ ছিনত্তি।
তথৈব যস্যাখিলনেত্রলোভং রূপং ত্রিতাপং বিমুখাকরোতি ॥ ৪

তং দেশিকেন্দ্রং পরমং পবিত্রং বিশ্বস্য পালং মধুরং যতীন্দ্রম্।
হিতায় নৃণাং নরমূর্তিমন্তং বিবেক-আনন্দমহং নমামি ॥ ৫

এই জগতে অনিত্য বস্তুসমূহ হইতে নিত্যবস্তুকে পৃথক্ করিয়া যে বিবেকী লীলাচ্ছলে সেই নিত্যবস্তুতে বিবেক- ও বৈরাগ্য-প্রভাবে পবিত্রচিত্তকে সমাহিত করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।১

বিবেকসম্ভূত আনন্দে যাঁহার চিত্ত নিমগ্ন, যিনি বিবেকদানেই আনন্দিত, বিবেক-জ্যোতিতে সুন্দর-রূপশালী, সেই বিবেকীকে আমি সর্বদা নমস্কার করি।২

যাঁহার স্বরূপ সত্য ও বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া নিরবকাশ নিত্য সুখ প্রদান করে, সেই আনন্দস্বরূপ মূর্তিধারীকে আমি নমস্কার করি।৩

সূর্য যেরূপ গভীর অন্ধকার নিঃশেষে নাশ করেন, বিষ্ণু যেরূপ দুর্বৃত্তদিগকে বিনাশ করেন, সেইরূপে যাঁহার অখিল-নয়ন-লোভনীয় রূপ ত্রিতাপ বিদূরিত করে।৪

নরহিতার্থ অবতীর্ণ এই আচার্যপ্রবর, পরম পবিত্র, জগৎপালক, আনন্দময়, যোগিশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দকে আমি নমস্কার করি।৫

কথাপ্রসঙ্গে

'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'

স্বামীজীর কথা আমরা অনেক সময় উদ্ধৃত করি, এবং নিজ নিজ সুবিধামত তাহার ব্যাখ্যাও করিয়া থাকি। অবশ্য ইহাতে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়, হয়তো উচিতও নয়। কারণ মহৎ ভাব যে যতটুকু বোঝে, যেভাবে ব্যবহার করে, সেটুকুই ভাল, মনের বর্তমান অবস্থায় হয়তো ঐ ব্যক্তির পক্ষে উহাতেই কল্যাণ। মনের পরবর্তী স্তরে উন্নত অর্থ আপনা হইতেই তাহার নিকট প্রতিভাত হইবে।

'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ' এমন একটি বাক্য, যাহার বহুতর ব্যাখ্যা এবং বিস্তার আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। এখানে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, স্বামীজী কি পরিবেশে কি অর্থে কোথায় উহার ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, এটি স্বামীজীর একটি বাংলা লেখার মধ্যেই পাওয়া যায়—লেখাটিও একটি বিশেষ লেখা। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রস্তাবনা-রূপে ১৮৯৮ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী 'বর্তমান সমস্যা' নাম দিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। স্বামীজীর মনে প্রতিভাত 'বর্তমান' অবশ্য এখনও অতীত হইয়া যায় নাই, এবং শীঘ্র হইবার আশঙ্কাও নাই; অতএব এই 'বর্তমান সমস্যা' প্রকৃতপক্ষে এ যুগের প্রধান সমস্যা, এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বুঝিতে হইবে স্বামীজীর ধ্যানসিদ্ধ মনে প্রতিভাত এই কথাটির তাৎপর্য কি!

'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ' কোন স্বদেশ-প্রেমিক বা স্বজাতিপ্রেমিকের উক্তি নয়, ইহা প্রকৃতপক্ষে একজন শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক—একজন বাস্তব বিশ্বপ্রেমিকের উক্তি।

ইহা এমন একজনের উক্তি, যাঁহাকে বিধাতা-নির্দেশে পরিব্রাজকের বেশে আসমুদ্র-হিমাচল ভারত পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে; ইহা এমন একজনের উক্তি, যাঁহাকে যুগ-প্রয়োজনে খোলা চোখ ও খোলা মন লইয়া বর্তমান সভ্য পৃথিবীর অলিগলি ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। তিনি মানুষের বর্তমান সভ্যতার দুর্বলতা দেখিয়াছেন, তিনি চিরন্তন মানুষের শক্তির উৎসের সন্ধান জানিয়াছেন, তিনি উদাত্ত কণ্ঠে নিদ্রিত প্রাচ্যকে জাগ্রত করিয়াছেন, বজ্রকণ্ঠে উন্মত্ত পাশ্চাত্যকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, এবং শান্ত মধুর কণ্ঠে উভয়কে আহ্বান করিয়াছেন—মিলিতভাবে এক পূর্ণাঙ্গ নবতর আধ্যাত্মিক সভ্যতা গড়িয়া তুলিবার জন্য।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে উভয়ের দোষ ও গুণ সম্বন্ধে তিনি সচেতন। তাঁহার বিশ্লেষণে প্রাচ্য তমোগুণে নিমজ্জমান, তবে শীঘ্রই জাগিয়া উঠিবে, আর উঠিবে কেন—উঠিতেছে, জগতের রঙ্গমঞ্চে তাহার অংশ অভিনয় করিবার জন্য প্রস্তুত। আর পাশ্চাত্য অতিমাত্রায় রজোগুণের প্রাবল্যে অশান্ত, চঞ্চল - শ্রান্তিহীন শান্তিহীন ভোগের শেষ সীমায় উপনীত, ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। সে যদি উন্নততর আধ্যাত্মিক জীবনের পথ গ্রহণ করিতে না পারে, তাহার ধ্বংস অনিবার্য। বিজ্ঞান, যন্ত্র, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, কূটনীতি—কিছুই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আর প্রাচ্য—সে যদি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের মোহে পতিত হয়, পাশ্চাত্যের ভুল হইতে যদি শিক্ষা লাভ না করে, সে যদি পাশ্চাত্যের গত

কয়েক শতাব্দীর জীবনের পুনরভিনয় করে, তবে তাহার এ জাগরণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

দুয়ের কোনটিই হইবে না—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনের ইহাই তাৎপর্য। ঘন-তমিস্রার পর এ এক নূতন সূর্যোদয়, জড়বাদের মহারণ্যে রুদ্ধগতির পর মানবজাতির এ এক নূতন পথে যাত্রা শুরু, যন্ত্রের উপর মানুষের জয়যাত্রা, জড়ের উপর চৈতন্যের বিজয়াভিযান—ইহাই আগামী যুগের সভ্যতার বিশেষ-সূচী।

ইহারই জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান জানাইতেছেন স্বামীজী এবং ইঙ্গিত করিয়াছেন —'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ', এ-কথা যেমন এক সৌভাগ্যের সূচনা করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিরাট দায়িত্বও আসিয়া পড়িতেছে আগামী যুগের ভারতবাসীর উপর, তাহার জন্য এখন হইতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়—এক এক সময় এক এক প্রকারের সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছে এবং তাহার কেন্দ্রও তদনুরূপ হইয়াছে। ভারতে দাক্ষিণাত্য ও সিন্ধুগাঙ্গেয় উপত্যকা একাধিকবার সভ্যজগতের কেন্দ্র হইয়াছে—সে আজ অতীতের ইতিহাসে বিলীন —সে আজ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়, হয় শিলা-প্রস্তরে—নয় পুঁথি বা তাম্রলেখে। তারপর পৃথিবীর সভ্যতার কেন্দ্র কত স্থান পরিবর্তন করিয়াছে—কখন নীলনদীর তীরে, কখন গ্রীস-রোমে, কখন টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের তীরে। প্যারিস-বার্লিন, লণ্ডন-নিউইয়র্কের পালাও বুঝি ঐ শেষ হইয়া যায়! মস্কো-পিকিং-এ সভ্যতার আর এক অঙ্কের অভিনয় শুরু হইয়াছে! এর পরই কি ভারতের যুগ-অভিনয় শুরু হইবে? এর পরই কি ভারতবর্ষ বিশ্বজীবনের কেন্দ্র হইতে চলিয়াছে?

ভারতবর্ষের বিশেষ অংশটি কি?—বিশ্ব-ইতিহাস-পর্যালোচনায় দেখা যায়—মানবজাতি পর্যায়ক্রমে ভোগ ও ত্যাগের পথে চলিয়াছে—কখন ইন্দ্রিয়গত জগতের রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ চরম ভাবে ভোগ করিতেছে—তখনই জড়বাদের উন্নতি, সভ্যতার সেই পর্যায়ের কেন্দ্রগুলি সমৃদ্ধ নগরীতে শিল্পবাণিজ্যের ভোগে মুখর, মদির। আবার কিছুদিন পরে দেখা যায়, বহির্মুখী মানুষ অবসন্ন—এক অতীন্দ্রিয় সুখের সন্ধান করিতেছে, সে সন্ধান মিলিয়াছে অরণ্যে মরুতে পাহাড়ে পর্বতে। ধীরে ধীরে এক ত্যাগীর সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিক সভ্যতা। এই উভয়ের টানাপোড়েনেই মানুষের ইতিহাস রচিত হইয়াছে।

গত চারশত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে বিজ্ঞান ও যুক্তির জয়যাত্রা। আনুষঙ্গিক ভাবে আসিয়াছে শিল্পভিত্তিক বাণিজ্য ও ভোগ-ভিত্তিক জীবন। তাহারই সমবায়ে গড়িয়া উঠিয়াছে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা, যাহার মূলসুর ভোগবাদ বা জড়বাদ, তাহার ফলে বাড়িয়াছে প্রতিযোগিতা, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ এবং যুদ্ধাতঙ্ক ও যুদ্ধোদ্যম। এতটুকু জমির জন্য, সামান্য শিল্পবাণিজ্য-বিস্তারের জন্য জাতীয় স্বার্থরক্ষার নামে সমগ্র জাতি যুদ্ধশিবিরে বাস করিবে—ইহা কখন আদর্শ পরিস্থিতি নয়, ইহাকে সভ্যতা বলা চলে কি না, তাহাও আজ বিবেচ্য। ভারতে এ বিচারের সিদ্ধান্ত বহু পূর্বেই হইয়া গিয়াছে—একবার কুরুক্ষেত্রে আর একবার কলিঙ্গের যুদ্ধক্ষেত্রে।

তাই যুদ্ধবিহীন উন্নততর ভবিষ্যৎ সভ্যতা-রচনার কেন্দ্র ভারতবর্ষ! ভারতের অভিজ্ঞতা, ভারতীয় জনগণের সহিষ্ণুতা, ভারতের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিই ভারতকে আগামী

যুগের নবতর মানব-সভ্যতার উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে।

স্বামীজী তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন: একটি পরিপূর্ণ সভ্যতার জন্য পৃথিবী অপেক্ষা করিতেছে—এবং সে সভ্যতা ভারত হইতেই প্রসারিত হইবে। সে সভ্যতা মূলতঃ আধ্যাত্মিক, কিন্তু তাহাতে মানুষের সর্ববিধ উন্নতির সুযোগ থাকিবে।

বাস্তবতঃ বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার বলে—কিন্তু প্রধানতঃ ধ্যানলব্ধ দৃষ্টিতে স্বামীজী বুঝিয়াছেন, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন যুগ আসিতেছে—জড়বাদের পর স্বাভাবিক নিয়মেই আগামী সভ্যতার বিশেষত্ব হইবে আধ্যাত্মিক উন্নতি। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বগুণের দ্বারা—ধ্যান-জ্ঞানের দ্বারাই উহা সম্ভব হইবে এবং ভারতও শুধু আধ্যাত্মিকতা লইয়া, ইহবিমুখ হইয়া দারিদ্র্যে ও দুঃখে কাল যাপন করিবে না। জড়বিজ্ঞান-প্রসূত ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে বন্টিত হইবে, এবং ভারতের অধ্যাত্মবিজ্ঞানও মানুষের পশুত্ব বিনষ্ট করিয়া তাহাকে যথার্থ মানব-পদবীতে সমারূঢ় করিবে। এই উভয়বিধ উন্নতির সামঞ্জস্য বিধানের কেন্দ্র হইবে ভারতবর্ষ।

স্বামীজী

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

একটি প্রাণ—
শত প্রাণে আলো একা জ্বেলে দিল
হ'ল নাকো নির্বাণ।

একটি তারা—
দিগ্‌ভ্রান্ত জনে পথ দেখাইল
হয়ে শুকতারা।

একটি বাণী—
তাপিত পরাণে অমৃত ঢালিল
'রামকৃষ্ণ' ধ্বনি।

শতাব্দীর বিবেকানন্দ

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

জন্মদিন হ'তে এসে শতাব্দীর স্বর্ণিল শিখরে,
জীবনের কাছ থেকে সে তো নেয় বিজয়ী সম্মান ;
প্রণম্য প্রসন্ন সত্তা আজ দেয় দুর্লভ সন্ধান
আবার নূতন ক'রে আলোকের, রাত্রির শিয়রে।
সমস্ত জড়তা ভেঙে জাগে তাই পৃথিবীর ঘরে
উচ্চারিত শপথের সেই বাণী, সে সুন্দর গান :
স্থৈর্যের প্রশান্তি-ভরা সে-প্রাণের যে-নৈবেদ্য-দান,
তাই আজ সহস্রের অন্তরকে জাতিস্মর করে।
প্রিয়দর্শী অবয়বে রূপ দেয় জ্যোতির মণ্ডল,
দীপ্তির সচ্ছল হাতে অবিনাশী তমোঘ্ন প্রত্যয়ে ;
সময়ের বিস্তৃতিতে আত্মার উজ্জ্বল শতদল
ফুটিয়ে সে রেখে গেছে অমলিন আনন্দ-সঞ্চয়ে।
নিখিলের আত্মীয়তা প্রসারিত শতাব্দীর মনে,
ভরে যাক সব কিছু সে-আত্মার আলোর প্লাবনে।

স্বামীজী বিবেকানন্দ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৌরুষঘন সত্যসদন স্বামীজী বিবেকানন্দ
অগ্নিগর্ভ বজ্রভাষ মুক্ত সকল বন্ধ।
তিমিরাবৃত সুপ্তজীবনে
রুদ্র বিষাণ বাজায়ে সঘনে
ডাক দিয়েছিলে—ওঠ ওরে ওঠ
জাগরে কপট অন্ধ।
বলেছিলে তুমি মরে সেই জন
মরিতে যে ভয়ে সারা ;
দুঃখের বুকে দুঃখ হানিলে
ভেঙে পড়ে তার কারা।
ধর্ম ধর্ম করিস বাহিরে
মর্মের মাঝে দেখ না চাহিরে
কর্মের রূপে বিশ্বকর্মা
অমৃত-নিস্যন্দ।

শ্রীমৎস্বামিবিবেকানন্দ-গুণকীর্তনম্

অধ্যাপক-শ্রীজিতেন্দ্রনাথশাস্ত্রি-বিরচিতম্

আনন্দোঽসি বিবেকোঽসি সন্ন্যাসি-প্রবরো ভবান্।
বেদান্ত-দর্শনে নিষ্ণঃ পটুর্বাগ্মী বিচক্ষণঃ॥
শ্রীরামকৃষ্ণভক্তোঽসি স্বধর্মনিরতঃ সুধীঃ।
উজ্জ্বলপ্রতিভাদীপ্তঃ সৌম্যকান্তিঃ সুদর্শনঃ॥
দুঃখদারিদ্র্যপিষ্টানাং বান্ধবো দেশবাসিনাম্।
বিশ্বজনীনবৃত্তিস্তে সর্বমানসহারিণী॥
বিশ্বধর্মসভায়াং হি পাশ্চাত্যজগতীতলে।
মাহাত্ম্যং হিন্দুধর্মস্য প্রকটীকৃতবানসি॥
ভারতীয়জনানাং ত্বং পরং গৌরব-কারণম্।
যুষ্মদর্থং বয়ং সর্বে ধন্যা মন্যামহে হৃদি॥
শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যায় পুণ্যাত্মনে যশস্বতে।
বিবেকানন্দ-বন্দ্যায় নরেন্দ্রায় নমো নমঃ॥

আশীর্বাদঃ

[১৯০০ খ্রীষ্টাব্দীয়-সেপ্টেম্বর-মাসস্য দ্বাবিংশদিবসে প্রদত্তঃ নিবেদিতায়ৈ স্বামিবিবেকানন্দস্যাশীর্বাদঃ* আংগ্লভাষাত্মক-পদ্যতঃ ডক্টর-শ্রীযতীন্দ্রবিমল-চতুর্ধুরীণেনানূদিতঃ।

মাতুর্মমত্বমথ বীরজনস্য চিত্তং
যা মাধুরী মলয়পর্বতগন্ধবাহে।
নির্বাধকার্চিরনলস্য যদার্যবেদ্যাং
পুণ্যোজ্জ্বলং জ্বলনমীক্ষণলোভনীয়ম্॥
যচ্চাপ্যতীতমহতাং মনসাপ্যগম্যং—
এতানি সন্তু নিখিলানি তবৈব ভদ্রে!
আগামিভারতভুবো ভবিনাং জনানাং
দাসী সখী প্রভুরপি স্বয়মেব ভূয়াঃ॥

* 'Benediction' কবিতা: 'Mother's heart and hero's will etc.'

বিবেকানন্দ-সঙ্গীত

শিবরঞ্জনী—তেওরা

কথা ও সুর—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

স্বরলিপি—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার নাথ, বি এ. সঙ্গীত-বিশারদ

কে এ জ্যোতিষ্মান্ সঁপিলা পরাণ হে যুগদেবতা ! তোমারি চরণে।
জিনি' কোটি শশী তাঁর রূপরাশি, কিবা দেবহাসি খেলে শ্রীবদনে ॥
রঘুপতি-সনে মারুতির সম
বাসুদেব-সাথে পার্থ প্রতিম
কে এ মহারথী অমিত-বিক্রম, যাঁর জয়গান উঠিল ভুবনে ॥
স্বার্থ-কলহ-তমসাবৃত আর্ত ধরণী মাঝে
কোটি ভাস্কর-প্রভায় কাহার প্রেমের মূরতি রাজে ?
শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীরূপ ধরি'
এলে কি গো তুমি ধরা আলো করি' ?
বিবেকানন্দ ! চরণে তোমারি দাও গো শরণ অশরণ জনে ॥

	+			২		৩			+			২		৩	
II{	সা	ঋা	জ্ঞা	পা	জ্ঞা	পা	। I	ধা	র্ধসা	র্ধসা	ধা	পা	জ্ঞঋা	সা I
	কে	এ	জ্যো	তি	০	ষ্মা	ন্	সঁ	পি	লা	প	০	রা	ণ

+			২		৩		+			২		৩	
সা	ঋা	জ্ঞা	জ্ঞপা	পজ্ঞা	জ্ঞা	ঋসা I	সঋা	ঋসা	সধা	ধসা	ধসা	সা	। }I
হে	যু	গ	দে	০	ব	তা	তো	মা	রি	চ	র	ণে	০

+			২		৩		+			২		৩	
সঋা	সজ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	।	জ্ঞা	জ্ঞঋমা I	সা	ঋা	ঋা	জ্ঞা	ঋা	সা	সা I
জি	নি	কো	টি	০	শ	শী	তাঁ	র	রূ	প	০	রা	শি

+			২		৩		+			২		৩	
সা	ঋা	ঋা	জ্ঞা	পা	জ্ঞা	জ্ঞঋসা I	ঋা	সা	সা	ধ্সা	ধ্সা	সা	।]
কি	বা	দে	ব	০	হা	সি	খে	লে	শ্রী	ব	দ	নে	০

+			২		৩		+			২		৩	
জ্ঞা	পা	জ্ঞা	পা	।	পা	। I	ধর্সা	র্ধসা	র্ধসা	ধপা	পা	পা	পা
র	ঘু	প	তি	০	স	নে	মা	রু	তি	০	র	স	ম

\+ ২ ৩ + ২ ৩
পা ধা র্সা র্রা । র্রা র্রা I র্রা । জ্ঞা সা জ্ঞা র্রজ্ঞা র্সর্রা I
বা সু দে ব ০ সা থে পা ০ র্থ প্র ০ তি ম

\+ ২ ৩ + ২ ৩
র্রর্সা র্রর্সা র্সা ধা । পা পা I ধপা ধপা পা জ্ঞা রা সা সা I
কে এ ম হা ০ র থী অ মি ত বি ০ ক্র ম

\+ ২ ৩ + ২ ৩
সা রা জ্ঞা পা জ্ঞা জ্ঞা রসা I রসা সা সা ধ্সা ধ্সা সা । II
যাঁ র জ য় ০ গা ন উ ঠি ল ভু ব নে ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
II জ্ঞা পা জ্ঞা পা পা পা । I ধা র্সা ধা র্সা । ধা পা I
স্বা ০ র্থ ক ল হ ০ ত ম সা ০ ০ বৃ ত

\+ ২ ৩ + ২ ৩
পা ধা র্সা র্রা র্রা র্রা র্জ্ঞা I র্সা । র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা র্সা র্রা I
আ ০ র্ত ধ র ণী ০ মা ০ ০ ঝে ০ ০ ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
র্রা । র্সা ধা । পা পা I ধা পা ধপা জ্ঞা জ্ঞা রা সা I
কো ০ টি ভা ০ স্ক র প্র ভা য় কা ০ হা র

\+ ২ ৩ + ২ ৩
সা রা জ্ঞা পা জ্ঞা জ্ঞরা সা I ধসা ধসা সা সা । । । I
প্রে মে র মূ র তি ০ রা জে ০ ০ ০ ০ ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
পা ধা র্সা ধা র্সা র্সা । I ধা র্সা র্সা র্সা । র্সা । I
শ্রী রা ম কৃ ০ ষ্ণ ০ বা ণী রূ প ০ ধ রি

\+ ২ ৩ + ২ ৩
পা ধা র্সা র্রা । র্রা র্রা I র্রা র্রা র্জ্ঞা র্সর্রা র্সর্রা র্রা র্রা I
এ লে কি গো ০ তু মি ধ রা আ লো ০ ক রি

\+ ২ ৩ + ২ ৩
র্রর্সা র্রর্সা র্সা ধা । পা । I ধপা ধপা পা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞরা সা I
বি বে কা ন ০ ন্দ ০ চ র ণে তো মা রি ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
সা রা জ্ঞা পা পজ্ঞা জ্ঞরা সা I রা রা সা ধ্ সা সা সা II
দা ও গো শ র ণ ০ অ শ র ণ ০ জ নে

বিঃ দ্রঃ—প্রত্যেক কলির শেষে অস্থায়ীতে ফিরে যাওয়ার আগে আর ৭ মাত্রা দীর্ঘ ক'রে গাইলে ভাল হবে।

বাল-গোপালের কাহিনী [১]

স্বামী বিবেকানন্দ

একদিন শীতের অপরাহ্নে, পাঠশালায় যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'তে গোপাল নামে একটি ব্রাহ্মণ-বালক তার মাকে ডেকে ব'লল, 'মা, বনের পথ দিয়ে একা একা পাঠশালায় যেতে আমার বড় ভয় করে। অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে হয় চাকর, না-হয় আর কেউ আসে। পাঠশালায় পৌঁছে দেবার জন্যও আসে, আবার বাড়ি নিয়ে যেতেও আসে। আমায় কেন কেউ সঙ্গে ক'রে বাড়ি নিয়ে আসে না, মা?'

একটি গ্রাম্য-পাঠশালার ছাত্র গোপাল। সকালে-বিকালে তার পাঠশালা ব'সত। বিকালের ছুটির পর, শীতের দিনে, বাড়ি আসতে আসতে পথেই সন্ধ্যা হয়ে যেত। তাছাড়া পাঠশালার পথটিও নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে গিয়েছে। কাজেই অন্ধকারে একলাটি ঐ পথে আসতে গোপালের ভয় ক'রত।

গোপালের মা বিধবা। শৈশবেই তার পিতার মৃত্যু হয়েছিল। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের মতো অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, যজন-যাজন নিয়েই গোপালের বাবার দিন কাটত, সংসারের সুখ-সমৃদ্ধির দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। আবার তাঁর মৃত্যুর পর দুঃখিনী বিধবা তার মা যেন বিষয়-ব্যাপার থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছিলেন, যদিও সে-সবের সঙ্গে যোগাযোগ কোনদিনই তাঁর বেশী ছিল না। তখন ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে, নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্যান-উপাসনা, যম-নিয়ম প্রভৃতি পালন ক'রে চরম-মুক্তিদাতা যে মৃত্যু, তারই জন্য ধৈর্য সহকারে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। অন্তরে আশা ছিল—মৃত্যুর পরপারে, অন্তহীন জীবনের পথে, যিনি তাঁর ভালো-মন্দের সাথী, সুখ-দুঃখের অংশভাগী সেই দয়িতের সঙ্গে আবার মিলিত হবেন।...

নিজের একটি পর্ণকুটিরেই তিনি বাস করতেন। তাঁর স্বামী যখন বেঁচে ছিলেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-হিসাবে একখণ্ড ধানজমি কেউ তাঁকে দান করেছিল। সে-জমিতে যে ধান উৎপন্ন হ'ত—বিধবার প্রয়োজনের পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট। এ-ছাড়া, কুটিরটিকে ঘিরে আরও কিছু জমি ছিল। সেখানে বাঁশ-ঝাড় ছিল, কয়েকটি নারকেল গাছ ছিল, আর ছিল দু-চারটি আম ও লিচুর চারা। গ্রামবাসীদের সাহায্যে সেগুলি থেকেও প্রচুর ফলমূল পাওয়া যেত। এরও উপর আর যা লাগত, তার জন্য প্রতিদিন অনেকটা সময় তিনি চরকায় সুতা কাটতেন।...

প্রভাতের প্রথম স্বর্ণ-কিরণ তালগাছের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিফলিত হবার বহুপূর্বে তিনি ঘুম থেকে উঠতেন। তখনও প্রভাতী পাখির কল-কাকলি শুরু হ'ত না। একটি সামান্য মাদুর আর তার উপর বিছানো একখানা কম্বল—এই ছিল তাঁর শয্যা। সেই দীন শয্যাটিতে বসে অতি প্রত্যুষ থেকে তিনি নামগান আরম্ভ করতেন। পুণ্যশ্লোকা নারীদের পূত চরিতকথা কীর্তন করতেন, ঋষিদের প্রণাম জানাতেন, আর জপ করতেন। জপ করতেন মানুষের পরমাশ্রয় নারায়ণের নাম, করুণাময় মহাদেবের নাম, আর জগত্তারিণী তারাদেবীর নাম।

১ Story of Boy Gopala: অনুবাদক: শ্রীতামসরঞ্জন রায়।

সর্বোপরি অন্তরের সর্ব-আকুতি নিবেদন করতেন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর দেবতা—শ্রীকৃষ্ণের কাছে, যিনি করুণায় বিগলিত হয়ে মানুষের শিক্ষার জন্য, ত্রাণের জন্য বাল-গোপালমূর্তিতে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে প্রার্থনার ফলে তাঁর অন্তরের এক বিচিত্র আনন্দানুভূতি জেগে উঠত। মনে হ'ত তিনি যেন নিজ স্বামীর সহিত একত্র হয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার বাঞ্ছিত পথে আরও একটি দিন এগিয়ে গেলেন।

কুটিরের অনতিদূরে ছিল একটি নদী। দিবারম্ভের পূর্বেই সেই নদীতে তাঁর স্নান হয়ে যেত। স্নানকালে তাঁর প্রার্থনা ছিল—'হে দেবতা, নদীর নির্মলজলে স্নান ক'রে দেহটি আমার যেমন পবিত্র হ'ল—স্নিগ্ধ হ'ল, তোমার করুণায় আমার অন্তরটিও যেন তেমনি পবিত্র—তেমনি স্নিগ্ধ হয়ে যায়।'

তারপর সদ্যোধৌত শুদ্ধ একটি শ্বেতবস্ত্র পরিধান ক'রে তিনি পুষ্প-চয়ন করতেন, সুগন্ধ চন্দন প্রস্তুত করতেন বৃত্তাকৃতি চন্দন-পাটায়, এবং তুলসীপত্র আহরণ ক'রে পূজার উদ্দেশ্যে ছোট ঠাকুরঘরটিতে প্রবেশ করতেন। সে ঘরে তাঁর বাল-গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি রেশমী চন্দ্রাতপের নীচে, সুদৃশ্য দারু-নির্মিত সিংহাসনে, ভেলভেটের কোমল গদির উপরে, প্রায় পুষ্পাবৃত অবস্থায় থাকত শ্রীকৃষ্ণের সেই ধাতুনির্মিত বাল-গোপাল মূর্তিটি।

মায়ের প্রাণ শ্রীভগবান্‌কে পুত্ররূপে কল্পনা করেই শুধু তৃপ্তিলাভ ক'রত। তাঁর স্বামী জীবিতকালে কতদিন কতবার বেদোক্ত সেই নিরাকার, নিরবয়ব, নৈর্ব্যক্তিক দেবতার বর্ণনা তাঁকে শুনিয়েছেন। সর্ব-অন্তর দিয়ে সে-সব অনবদ্য কথা তিনি শ্রবণ করতেন, অকুণ্ঠচিত্তে ধ্রুব সত্য ব'লে সেগুলি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু হায়! শিক্ষাহীন ও শক্তিহীন এক নারীর পক্ষে সে বিরাটকে ধারণা করা কিরূপে সম্ভব? তাছাড়া শাস্ত্রে তো এ-কথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে—যে যে-ভাবে আমাকে ভজনা করে, সে সে-ভাবেই আমাকে লাভ ক'রে থাকে। মানুষ যুগে যুগে আমারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ ক'রে থাকে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্বশঃ॥

এবং ঐ ভাবটিতেই তাঁর অন্তর ভরে যেত, অতিরিক্ত আর কিছু প্রার্থনীয় ছিল না।

এইভাবেই কাটছিল তাঁর জীবন। হৃদয়ের সকল ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেম বাল-গোপাল শ্রীকৃষ্ণে তিনি সমর্পণ করেছিলেন এবং সে সমর্পণটি বিশেষভাবে তাঁর ক্ষুদ্র ধাতু-বিগ্রহটিকে ঘিরেই নিয়ত লূতা-তন্তুর মতো আবর্তিত হ'ত। তাছাড়া ভগবানের এ-বাণীটিও তার শোনা ছিল—

'রক্তমাংসের তৈরী মানুষকে তুমি যেমন সেবা করো, আমাকেও তেমনি প্রেম পবিত্রতা দিয়ে সেবা কর। আমি সেই সেবা গ্রহণ ক'রব।'

সুতরাং সেবাই তিনি করতেন; যে-ভাবে নিজ প্রভুকে মানুষ সেবা করে, যে-ভাবে সেবা করে গুরুকে, সর্বোপরি তাঁর নয়নের নিধি পুত্রকে, একমাত্র সন্তানকে তিনি যেভাবে সেবা করতেন—শ্রীকৃষ্ণকেও তেমনিভাবেই সেবা করতেন। প্রতিদিন ধাতুমূর্তিটিকে তিনি স্নান করাতেন, সাজাতেন, ধূপধুনা দিতেন তার সামনে। কিন্তু ভোগ বা নৈবেদ্য? হায়, দরিদ্র বিধবার সে সামর্থ্য কোথায়? দুঃখে তাঁর চোখে জল আসত, আর সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ

করতেন স্বামীর কাছে শোনা সেই শাস্ত্রবচন, ভগবানের সেই অভয়-উক্তি—পত্র, পুষ্প, ফল, জল—ভক্তির সঙ্গে যে আমাকে যা-কিছু দান করে, আমি তাই গ্রহণ ক'রে থাকি।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

সুতরাং তাঁর প্রার্থনা ছিল এই মন্ত্রে: হে দেবতা, এই বিপুলা পৃথিবীতে কত বিচিত্র কুসুম তোমারই প্রীতির জন্য নিয়ত ফুটে উঠছে, তবু আমার তুচ্ছ বনফুল ক-টি তুমি গ্রহণ কর। তুমি বিশাল বিশ্বের অন্নদাতা, তথাপি আমার সামান্য ফলের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। আমি শক্তিহীন, শিক্ষাহীন। তুমিই আমার দেবতা, আমার প্রাণের রাখাল, আমার পুত্র। তুমি কৃপা ক'রে আমার পূজা-অর্চনা সার্থক কর, আমার প্রেম কামনাহীন কর।...

পূজার ফল ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে সে ফলও তুমিই গ্রহণ কর। আমাকে দাও প্রেম, শুধু প্রেম—যে-প্রেম অন্য কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখে না, প্রেম ভিন্ন আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না।

হয়তো হঠাৎ কোনদিন গ্রামের বাউল-বৈরাগী মায়ের ক্ষুদ্র আঙিনায় এসে দাঁড়ায় এবং প্রভাতী সুরে গান ধরে—

শোনরে মানুষ ভাই, প্রেমের কথা কয়ে যাই
(আমি) জ্ঞানের ডাকে ভয় করিনে—প্রেমের ডাকে করি ভয়,
আমার আসন কাঁপে
প্রেমের ডাকে, প্রেমাশ্রুতে হই উদয়।
নিত্যমুক্ত যেই ভগবান্ নিরবয়ব ব্রহ্ম যেই,
প্রেমের দায়ে নররূপে
তারি খেলা দেখতে পাই; তারি লীলা জানতে পাই।
বৃন্দাবনের কুঞ্জছায়ে জ্ঞানের কিবা প্রকাশ ছিল?
রাখাল বালক গোপ-বালিকা শাস্ত্র কবে পড়েছিল?
কিন্তু তারা প্রেমিক ছিল, ছিল ভালবাসায় ভরা,
তাইতো তাদের প্রেমের পাশে আমি চির রইনু ধরা।

এমনি ক'রে তাঁর মাতৃহৃদয় যেন ভাগবত-সত্তার মধ্যেই নিজের পুত্রটিকে লাভ করেছিল এবং দেব-গোপালের নামানুসারে পুত্রের নামও তিনি রেখেছিলেন—গোপাল। তাকে অবলম্বন করেই এ-জগতের বুকে নিজের মনটিকে ধরে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। নতুবা পার্থিব-বন্ধনহীন তাঁর মন মুহুর্মুহুঃ জাগতিক সবকিছুর উর্ধ্বে ধাবিত হ'ত। এ মাটির পৃথিবীতে তাঁর যে প্রাত্যহিক জীবন, তা ছিল যেন অনেকটা কলের মতো, নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মতো। বস্তুতঃ তাঁর চলা-ফেরা, তাঁর চিন্তা সুখ, এক কথায় তাঁর সমগ্রজীবনটুকু কি ঐ ক্ষুদ্র বালকটিকে ঘিরেই আবর্তিত ছিল না? হ্যাঁ, তাই ছিল।

বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, আর তিনি তাঁর মাতৃহৃদয়ে সকল কোমলতা দিয়ে ঐ শিশুর জীবনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করেছেন। আজ সে পাঠশালায় যাবার মতো বড়

হয়েছে, পাঠশালায় সে যাবে। তাই ছাত্রজীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সংগ্রহ করবার জন্য মার কত দীর্ঘদিনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম!

প্রয়োজন অবশ্য খুব বেশী ছিল না। যে-দেশে মাটির প্রদীপে একছটাক তেল ঢেলে আর একটা কাপড়ের সলতে লাগিয়ে আলো জেলে প্রফুল্ল চিত্তে মানুষ বিদ্যাচর্চায় দিন কাটায়, যেখানে ঘাসের তৈরী একটি মাদুর ভিন্ন আর কোন আসবাব-পত্রেরই প্রয়োজন হয় না, সে-দেশের ছাত্রজীবনের প্রয়োজন খুব বেশী হবার কথাও নয়। তবুও সামান্য যে দু-চারটি জিনিসের প্রয়োজন ছিল, তা সংগ্রহ করতেই দরিদ্র বিধবাকে বহুদিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

দিনের পর দিন চরকায় সুতা কেটে গোপালের জন্য একখানা পরবার কাপড় এবং একখানা গায়ে দেবার চাদর তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। সংগ্রহ করতে হয়েছিল মাদুর-জাতীয় ছোট একটি আসন, যার উপর দোয়াত, খাগের কলম প্রভৃতি রেখে গোপাল লিখবে এবং পরে যেটিকে গুটিয়ে বগলদাবা ক'রে পাঠশালায় যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবে, আর ফিরবার সময় সঙ্গে নিয়ে আসবে।

তারপর যে-শুভদিনটিতে গোপালের বিদ্যারম্ভ হ'ল, সে প্রথম অ, আ লিখতে চেষ্টা ক'রল—সে-দিনটি দুঃখিনী মায়ের কাছে যে কী আনন্দের দিন ছিল, তা মা ভিন্ন অন্যের পক্ষে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আজ? আজ তাঁর মনে একটি গভীর বিষাদের ছায়া পড়েছে। বনপথ দিয়ে একা যেতে-আসতে গোপাল ভয় পাচ্ছে, কে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে? এর আগে কোনদিন নিজের বৈধব্যের নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য এমন ক'রে তিনি ভাবেননি, অনুভব করেননি। মুহূর্তের জন্য চতুর্দিক যেন অন্ধকারে ঢেকে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে প'ড়ল ভগবানের সেই চিরন্তন আশ্বাসবাণী—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

একান্তভাবে -অনন্যচিত্ত হয়ে যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করে, আমি তার সকল ভার স্বয়ং বহন ক'রে থাকি। আর তাঁর বিশ্বাসী মন ঐ আশ্বাস-বাণীতেই একটি আশ্রয় খুঁজে পেল।…

তারপর চোখের জল মুছে ছেলেকে বললেন—'ভয় কি বাবা! ঐ বনে আমার আর একটি ছেলে থাকে, তারও নাম গোপাল। সে তোমার বড় ভাই। বনভূমির অন্ধকার পথে যখন তুমি ভয় পাবে, তখন তোমার দাদাকে ডেকো।'

বিশ্বাসী মায়ের পুত্র গোপাল। সেও তাই সকল অন্তর দিয়েই মার কথা বিশ্বাস ক'রল।…

তারপর সেদিন অপরাহ্নে—পাঠশালা থেকে ফেরবার পথে অরণ্যভূমির নিবিড়তায় ভয় পেয়েই মায়ের নির্দেশ অনুসারে বালক তার বনের ভাইটিকে ডাক দিল—'গোপাল-দাদা, তুমি কি এখানে আছ? মা বলেছেন, তুমি এই বনে থাকো; বলেছেন, তোমাকে ডাকতে। একলাটি আমার বড় ভয় করছে, ভাই!'

তখন দূর বনান্তরাল থেকে শব্দ ভেসে এল—'ভয় নেই ভাই, এই তো আমি রয়েছি। ভয় কিসের, তুমি বাড়ি যাও।'

সেদিন থেকে, এমনি ক'রে দিনের পর দিন গোপাল তার বনের দাদাকে ডাকে, আর একই স্বর শুনতে পায়। বাড়ি এসে মাকে সে-সব কথা সে বলে, আর মা বিস্ময়ে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে শোনেন সে কাহিনী। তারপর একদিন মা তাকে বললেন—'বাবা, এর পর যখন তোমার রাখাল দাদার সঙ্গে কথা হবে, তখন তাকে বলো সে যেন তোমাকে দেখা দেয়।'···

পরদিন যথাকালে বনপথে যাবার সময় গোপাল তার ভাইকে ডাক দিল এবং পূর্বের মতো উত্তরও এল বন থেকে। কিন্তু এবার মার কথা-মত গোপাল তার দাদাকে দেখা দেবার জন্য একান্ত অনুরোধ ক'রল। ব'লল, 'গোপাল দাদা, তোমাকে তো কোনদিন আমি দেখিনি। আজ আমাকে দেখা দাও।'

তখন উত্তর শোনা গেল, 'ভাই, এখন বড় ব্যস্ত আছি। আজ আমি আসতে পারব না।' কিন্তু গোপাল ছাড়বে না, সে বার বার কাতরভাবে অনুরোধ করতে লাগলো। তখন অকস্মাৎ বনের ছায়াচ্ছন্ন প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এল বনের রাখাল। পরনে গোপালকের বেশ, মাথায় ছোট্ট মুকুট—তাতে বসানো শিখিপুচ্ছ, হাতে বাঁশের বাঁশী।

দুইটি বালকই তখন মহাখুশী। একসঙ্গে তারা খেলা ক'রল, গাছে উঠল, ফল কুড়ালো, ফুল কুড়ালো—বনের গোপাল আর দুঃখিনী মায়ের গোপাল - দু-টি ভাই। খেলতে খেলতে পাঠশালার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে এল এবং গোপাল একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাঠশালার পথে চলে গেল।

সেদিন তার পাঠ প্রায় ভুল হয়ে গেছে। সমগ্র অন্তর উৎসুক হয়ে রয়েছে কেবল বনে ফিরে রাখাল দাদার সঙ্গে আবার খেলা করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায়।···

এইভাবে কয়েকমাস সময় কেটে গেল। দিনের পর দিন সন্তানের বিচিত্র কাহিনী শুনতেন মা, আর ভগবানের অপার করুণার কথা চিন্তা ক'রে নিজের দৈন্য বৈধব্য প্রভৃতি সব কিছু ভুলে যেতেন। দুঃখকে মনে মনে গ্রহণ করতেন ভগবানের অনন্ত আশীর্বাদ ব'লে।

এরপর পাঠশালার গুরুমশায়ের গৃহে একটি শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের দিন এল। সে-কালে গ্রাম্য-পাঠশালার পণ্ডিতগণ একাই অনেকগুলি ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতেন। নির্ধারিত বেতন হিসাবেও তাঁরা বিশেষ কিছু গ্রহণ করতেন না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকর্ম উপস্থিত হ'লে ছাত্রেরা নানা উপঢৌকন দিত শিক্ষককে এবং সে-সবের উপর তাঁরা অনেকাংশে নির্ভরও করতেন।

কাজেই গোপালের গুরুমশায়ও ছাত্রদের কাছে অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপঢৌকনের জন্য অনুরোধ জানালেন এবং প্রত্যেক ছাত্র সাধ্যমত সে অনুরোধ রক্ষাও ক'রল। কেউ দিল অর্থ, কেউ দিল অন্য কোন দ্রব্য-সামগ্রী। কিন্তু দুঃখিনী বিধবার পুত্র গোপাল? হায়, উপঢৌকনের সামগ্রী সে কোথায় পাবে? তাই অন্য পড়ুয়ারা একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে—কে কি দেবে, তার বিবরণ গোপালকে শুনিয়ে শুনিয়ে ব'লে বেড়াতে লাগলো।

সে রাত্রে মনে গভীর দুঃখ নিয়ে গোপাল মাকে সব কথা ব'লল। ব'লল, 'গুরুমশায়ের জন্য কিছু দিতেই হবে।' কিন্তু মায়ের তো কোন সম্বলই নেই, কি দেবেন তিনি?

অবশেষে তিনি স্থির করলেন, যা চিরদিন ক'রে এসেছেন জীবনের সর্বাবস্থায়, আজও তাই করবেন, রাখালরূপী শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করবেন। তাঁর কাছেই চাইবেন, যদি কিছু

প্রয়োজন হয়। সুতরাং ছেলেকে বললেন, সে যেন তার বনের রাখাল-দাদার কাছে গুরুমশায়ের জন্য কিছু চেয়ে নেয়।

পরদিন বনের পথে রাখাল-দাদার সঙ্গে যথানিয়মে গোপালের দেখা হ'ল, দুজনে কিছুক্ষণ খেলাধুলাও ক'রল। তারপর বিদায় নেবার কালে গোপাল তার দুঃখের কথা জানালো রাখাল-দাদাকে, অনুরোধ ক'রল গুরুমশায়কে দেবার মতো কিছু উপহার সে যেন তাকে দেয়।

রাখাল ব'লল, 'ভাই গোপাল, আমি সামান্য বনের রাখাল। মাঠে মাঠে গোরু চরাই। আমার তো টাকা-পয়সা নেই, ভাই। তবে তোমার রাখাল দাদার উপহারস্বরূপ এই ছোট ক্ষীরের বাটিটি তুমি নাও, এইটি তোমার গুরুমশায়কে উপহার দিও।'

গোপালের তখন আনন্দ আর ধরে না। একে তো গুরুমশায়ের জন্য কিছু উপহার হাতে পেয়েই সে খুশী, তার উপর সে-উপহার এসেছে রাখাল-দাদার কাছ থেকে। অতি দ্রুত সে পাঠশালায় চলে গেল। পাঠশালার অন্যান্য ছাত্রেরা তখন সার দিয়ে দাঁড়িয়ে এক এক ক'রে গুরুমশায়ের হাতে তাদের উপহার তুলে দিচ্ছে। গোপালও কম্পিতবক্ষে সারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রের হাতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ভাল ভাল উপহার ছিল, সুতরাং পিতৃহীন দরিদ্র বালকের তুচ্ছ উপহারের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখল না।

সে-তাচ্ছিল্যে গোপাল যেন দমে গেল, দুঃখে তার চোখে জল এল। অবশেষে হঠাৎ গুরুমশায়ের চোখ প'ড়ল তার দিকে। তিনি তখন তার হাত থেকে ক্ষীরের পাত্রটি নিয়ে অন্য একটি বৃহৎ পাত্রে ঢেলে দিলেন। কিন্তু একি! মুহূর্তে সে শূন্যপাত্র আবার ক্ষীরে পূর্ণ হয়ে গেল! আবার ঢাললেন, আবারও পূর্ণ হ'ল। এমনি যতবার তিনি ঢালেন, ততবারই পাত্রটি মুহূর্তে ভরে ওঠে!

উপস্থিত সকলে তো একেবারে স্তম্ভিত। গুরুমশায় তখন দু-হাতে গোপালকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, 'এ-পাত্র তুই কোথায় পেলি, বাবা?'

গোপাল তখন পণ্ডিতমশায়ের কাছে তার বনের রাখাল-দাদার কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনা ক'রল। কেমন ক'রে সে তাঁকে প্রতিদিন ডাকে এবং সাড়া পায়; কেমন ক'রে প্রতিদিন দু-জনে তারা খেলা করে এবং কেমন ক'রে ঐ ক্ষীরের ছোট পাত্রটিও রাখাল-দাদার হাত থেকেই সে পেয়েছে।

সব কথা শুনে গুরুমশায় তখনই তার সঙ্গে বনে গিয়ে সেই অদ্ভুত রাখাল-বালককে দেখতে চাইলেন এবং গোপালও মহানন্দে তাঁকে নিয়ে চ'লল। বনস্থলীতে গিয়ে অন্যদিনের মতো আজও সে তার দাদাকে ডাকলো, কিন্তু সেদিন কোন উত্তর শোনা গেল না। গোপাল বার বার ডাকতে লাগলো, তবু কোন জবাব এল না। তখন অতি করুণ স্বরে গোপাল ব'লল, 'রাখাল-দাদা, আজ তুমি আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছ না? তুমি উত্তর না দিলে এঁরা যে মনে করবেন, আমি মিথ্যা কথা বলছি।'

তখন অতিদূর বনপ্রদেশ থেকে একটি স্বর ভেসে এল—এক অশরীরী শব্দ, কে যেন বলছে, 'ভাই, তোমার আর মায়ের ভক্তি-বিশ্বাসের টানেই আমি তোমার কাছে যাই। কিন্তু তোমার গুরুমশায়ের এখনও অনেক দেরি, তাঁকে ব'লো সে-কথা।'

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা

[পূর্বানুবৃত্তি—তৃতীয় পর্ব ; উনবিংশ শতাব্দী ভারতের জাগরণ]

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

রামমোহনের জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র ক'রে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে অগোণে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ গড়ে উঠল, যার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে রয়েছেন যথাক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঋষি রাজনারায়ণ বসু, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, এবং আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসু প্রমুখ আদি নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ। এ-সবই উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা; বাংলার ব্রাহ্মসমাজ তার নানাবিধ কার্যধারার মধ্য দিয়ে এ দেশের জাতীয়তাবাদকে অঙ্কুরিত করেছে, পরিপোষণ করেছে, এ-দেশের বিরাট হিন্দুসমাজের তৎকালীন দুর্গতিতে একমাত্র ভরসাস্থল কলকাতার ইংরেজী-জানা পশ্চিমের আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে আত্ম-বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে। বাংলার তথা সমগ্র ভারতের মহামানবত্রয়—রবীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ এবং অরবিন্দকে এই সমাজই প্রথম আশ্রয় দিয়েছিল।

তবুও বলতে হবে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সমগ্র ভাবে রামমোহন আবদ্ধ নন। বস্তুতঃ রাম-মোহনের জীবনদর্শন উপলব্ধি করতে পেরে-ছিলেন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি। রামমোহন নিজে যা কখনও করেননি এবং করতে চাননি, শেষ পর্যন্ত তাই করলে বা করতে বাধ্য হ'ল ব্রাহ্মসমাজ। হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিক ধর্মজ্ঞানে বর্জন করা হ'ল। বিরাট ব্যাপক হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ব্রাহ্মসমাজ, আবদ্ধ হ'ল শহরাঞ্চলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কয়েকটি পরিবারের গণ্ডির মধ্যে। এর জন্য কতটা দায়ী গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ আর কতটা দায়ী ব্রাহ্মসমাজ নিজে—সে আলোচনা অবান্তর। শুধু এটুকু ব'লব যে, এ বিচ্ছিন্নতা ব্রাহ্মসমাজের ঔদার্যকে ব্যাহত করেছিল, রামমোহনের বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে সমাজ থেকে সমন্বয়ের সূত্র গিয়েছিল হারিয়ে।

ব্রাহ্মসমাজের আবেদন জনমানসে কোন রেখাপাতই করতে পারেননি। যেখানে সত্যিকার ভারতবর্ষ রয়েছে, সেই কোটি কোটি সাধারণ মানুষের যে পল্লী-অঞ্চল, সেখানে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত সংস্কার মানে দাঁড়ালো ধ্বংস-সাধন। হিন্দুর জাতিভেদ, তার ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি, অসংখ্য দেবদেবী-পূজা, তাদের মধ্যে কালক্রমে বহু দুর্নীতি প্রবেশ করলেও একেবারে অর্থহীন জঞ্জালে পরিণত হয়নি। পুরুষানুক্রমে চলে-আসা ব্রত নিয়ম পূজা পার্বণাদি হিন্দুসমাজ যে মস্তিষ্কের শত আবেদনে, যুক্তির সহস্র জাল-বিস্তারেও ছাড়বে না। ব্রাহ্মসমাজ হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করতে না পেরে অবজ্ঞা-ও অশ্রদ্ধা-মিশ্রিত করুণার চোখে বাংলার তথা ভারতের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীকে দেখতে লাগলো। ব্রাহ্মসমাজ এভাবে গণ্ডিবদ্ধ তথা-কথিত আলোক-প্রাপ্তদের সমাজে পরিণত হ'ল। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসে ('গোরা') এই ব্রাহ্মদেরই চিত্র এঁকেছেন: পানুবাবু নিজে বাঙালী হয়েও 'পাউরুটি চিবোতে চিবোতে' যখন চরম অবজ্ঞা ও শ্রদ্ধাহীনতা

প্রকাশ করছিল, তখন গোরা আশ্চর্য শান্ত কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলেছিল, 'মিথ্যা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ এবং স্বজাতির মিথ্যা নিন্দার মত পাপ অল্পই আছে।' কিন্তু তাতে পানুবাবু নিবৃত্ত তো হলই না, গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে আরও কটুভাষা প্রয়োগ করতে লাগলো স্বজাতি-নিন্দায়।—'পানুবাবুদের ব্রাহ্মসমাজে' মনে প্রাণে খাঁটি ব্রাহ্ম পরম উদার ও শ্রদ্ধাবান্ 'পরেশবাবুর' তাই কোন স্থান হ'ল না।

একদা স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ধর্মের কী সম্বন্ধ? স্বামীজী উত্তরে বলেছিলেন, 'ক্রিয়াকাণ্ড হচ্ছে কিণ্ডার-গার্টেন বিদ্যালয়। জগতে এখন যে অবস্থা তাতে ওটি এখনও পুরাপুরি আবশ্যক। তবে লোককে নূতন নূতন অনুষ্ঠান দিতে হবে! কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তির উচিত, এই কাজের ভার লওয়া।...আমার মূলমন্ত্র বিনাশ নয়। বর্তমান ক্রিয়াকাণ্ড থেকে নূতন নূতন ক্রিয়া-কাণ্ড করতে হবে' (বাণী ও রচনা—৯ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৭) লক্ষণীয় স্বামীজী নিষ্প্রাণ খোলসে পরিণত ক্রিয়াকাণ্ডগুলিকে আঁকড়ে থাকার গোঁড়ামিকে তীব্র নিন্দা করেছেন। কুম্ভকোনম্ বক্তৃতায় (বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৪) স্বামীজী আরও বিশদভাবে বলেছেন সংস্কার কাকে বলে। 'বিগত প্রায় একশত বৎসর যাবৎ আমাদের দেশ সমাজসংস্কারকগণে ও তাঁহাদের নানাবিধ সমাজসংস্কার-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে। এই সংস্কারকগণের চরিত্রের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। ...কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এই শতবর্ষব্যাপী সমাজসংস্কার-আন্দোলনের ফলে সমগ্রদেশে কোন শুভফল হয় নাই। বক্তৃতামঞ্চ হইতে সহস্র সহস্র বক্তৃতা হইয়া গেছে—হিন্দুজাতি ও হিন্দুসভ্যতার মস্তকে অজস্র অভিশাপ ও নিন্দাবাদ বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সমাজের বাস্তবিক কোন উপকার হয় নাই। ...ইহার কারণ বাহির করা শক্ত নহে। নিন্দাবাদ ও গালিবর্ষণই ইহার কারণ।... আমাদের অধিকাংশ আধুনিক সংস্কার পাশ্চাত্য কার্যপ্রণালীর বিচারশূন্য অনুকরণ-মাত্র।...এই জন্য আমি কোন সংস্কার চাহি না। আমার আদর্শ—জাতীয় সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিণতি।...তোমাদের নিকট ইহাই বক্তব্য যে, তোমরা সকল মানুষের একত্ব ও মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব—এই বৈদান্তিক আদর্শ উত্তরোত্তর উপলব্ধি করিতে থাকে।...এখন আমাদের জাতীয় আচার-ব্যবহারে যে-সকল পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে, সেগুলিও তাঁহারা (অর্থাৎ আমাদের প্রাচীন স্মৃতিকারেরা) যথার্থই বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন।...আমাদের হয় সম্মুখে, নয় পশ্চাতে যাইতে হইবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রাচীন কালে বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন...। আমাদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষাও মহত্তর কর্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন পশ্চাতে হটিয়া গিয়া অবনত হওয়া কিরূপে সম্ভব?...পশ্চাতে হটিলে জাতির অধঃপতন হইবে, মৃত্যু হইবে। অতএব অগ্রসর হও, মহত্তর কর্মসমূহের অনুষ্ঠান কর।' আলোক-প্রাপ্ত সমাজের মাত্রাধিক পশ্চিম-প্রীতি এবং রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের অত্যধিক অতীত-প্রীতি —উভয়কেই বিদ্রূপ সমালোচনার বাণে বিদ্ধ করেছেন স্বামীজী।

বৈদান্তিক রামমোহনের উত্তরাধিকারের দাবি নিয়েও ব্রাহ্মসমাজ পারেনি এভাবে সংস্কার-কার্যে অগ্রসর হ'তে। পারেনি প্রতি-ক্রিয়াশীল সঙ্কীর্ণমনা গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজও, যে সমাজ আধ্যাত্মিক ভূমি থেকে বিচ্যুত

লৌকিক ধর্মের খুঁটিনাটি আচার-উপচারের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে একটা প্রাচীনত্ব আরোপ ক'রে সদম্ভে জাহির ক'রত, পাঁজির বিধানকে চালাত বেদের বিধান ব'লে। তবে ব্রাহ্মসমাজের কাছে যে-পরিমাণ আশা নিয়ে নূতন ভারত উপস্থিত হয়েছিল, সে আশা অবশ্য গোঁড়া পুরোহিত-তন্ত্র-শাসিত রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কাছে কখনও করেনি।

আশাভঙ্গের মনস্তাপে নূতন ভারত বুঝি নূতন ক'রে আবার ধ্যানে ব'সল, অস্ফুট কণ্ঠে প্রার্থনা জানালো, 'অনাগত বিধাতা স্বাগতম্।' এলেন দুর্গম পল্লী-অঞ্চল থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতার উপকণ্ঠে রামকৃষ্ণ—দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালীর সামান্য পুরোহিত হয়ে। মাদ্রাজে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় (বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৪০) স্বামীজী এদেশের ইতিহাস-স্রষ্টা যুগন্ধর পুরুষদের জীবন-পর্যালোচনার সুযোগে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের আবির্ভাবকে বর্ণনা করেছেন এভাবে :

এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল,…যিনি একাধারে শঙ্করের উজ্জ্বল মেধা ও চৈতন্যের বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যাঁহার হৃদয় ভারতে বা ভারতের বাহিরে দরিদ্র দুর্বল পতিত সকলের জন্য কাঁদিবে, অথচ যাঁহার বিশালবুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করিবে এবং এরূপ বিস্ময়কর সমন্বয়ের দ্বারা হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সার্বভৌম ধর্ম প্রকাশ করিবে। …অদ্ভুত ব্যাপার এই, তাঁহার সমগ্র জীবনের কার্য এমন এক শহরের নিকট অনুষ্ঠিত হয়, যে শহর পাশ্চাত্য-ভাবে উন্মত্ত হইয়াছিল। …পুঁথিগত বিদ্যা তাঁহার কিছুই ছিল না। …কিন্তু প্রত্যেকে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারী পর্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া একজন মহামনীষী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। …ভারতের সকল মহাপুরুষের পূর্ণপ্রকাশ-স্বরূপ যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের…উপদেশ আধুনিক যুগে আমাদের নিকট বিশেষ কল্যাণপ্রদ।

কোটি কোটি অজ্ঞ জনগণের তথাকথিত পৌত্তলিক হিন্দুসমাজের প্রতিভূ হয়ে রামকৃষ্ণ এলেন 'পাশ্চাত্য-ভাবে উন্মত্ত', শিক্ষা ও ধনগর্বে গর্বিত উপর-তলার আলোকপ্রাপ্ত কলকাতার মানুষের কাছে হৃদয়ের আবেদন নিয়ে। হিন্দু পৌত্তলিক নয়, সাকার পূজা আর পৌত্তলিকতা এক কথা নয়—সে বার্তা তাঁর অলোকসামান্য জীবন-সাধনায় প্রত্যক্ষ হয়ে ফুটে উঠেছে। মৃন্ময়ী ভবতারিণী মূর্তি কত সহজে চিন্ময় ব্রহ্মে বিলীন হয়ে গেল তাঁর ধ্যান-নেত্রের সম্মুখে। সমশ্রদ্ধায় ব্রহ্মকে পূজা করলেন তিনি মন্দিরে, মসজিদে আর গির্জায়। উপলব্ধ সত্য পরিবেশন করলেন—'যত মত তত পথ'। 'বহুসাধকের বহু সাধনার ধারা' তাঁরই সাধনায় মূর্ত হ'ল, তাই তো তিনি স্বদেশ-আত্মার ঘনীভূত সাধনা-মূর্তি। যে লৌকিক ধর্ম আচার-উপাচার-সর্বস্ব হয়েছিল, তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক ভূমির উপর। পৌত্তলিকতার অপবাদে বা অপরাধে কোটি কোটি জনগণকে পশ্চাতে ফেলে আলোকপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় নরনারী নিজেরা এগিয়ে যাবার ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়াস করছিলেন। এ প্রয়াস ব্যর্থ হ'ল। 'পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' 'ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ মূর্তিটা সবার কাছে তুলে ধরো, লোক তা হ'লে পাগল হয়ে যাবে।' 'তখন কি দ্বারে দ্বারে চাঁদা সেধে বেড়াতে হবে। প্রাণ দেবার জন্য ঠেলাঠেলি পড়ে যাবে।' ১৩১৪ সালের (১৯০৮ খৃঃ) প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত ধারা-

বাহিক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ গোরার মুখে এ-কথা তুলে দিয়েছেন। স্বামীজীর মানসকন্যা ও উত্তরসাধিকা ভগিনী নিবেদিতা তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ। আইরিশ মহিলা মিস নোব্‌ল্‌ ভারতবর্ষের ক্রোড়ে নবজন্মলাভে ধন্যা 'লোকমাতা' নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথের গোরাও তার অজ্ঞাতে আইরিশ পিতামাতার সন্তান। কিন্তু ভারতমাতার প্রতীক মা-আনন্দময়ীর ক্রোড়ে লালিত পালিত, ভারতীয় সত্তার একটি বলিষ্ঠ বিকাশ এই 'গোরা' খাঁটি ব্রাহ্মণ। স্বামীজী সমাজসংস্কার ও দেশপ্রেমের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, এবং কর্মক্ষেত্রে 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' এই নীতির যে পরিচয় দান করেছেন, তারই আশ্চর্য প্রতিধ্বনি দেখতে পাই গোরার জীবনাদর্শে ও কর্মধারায়। বিনয় সুচরিতাকে গোরার পরিচয় দিতে গিয়ে বলছে, 'গোরা যে হিন্দুসমাজের সমস্তই অসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারছে, তার কারণ, সে খুব একটা বড়ো জায়গা থেকে ভারতবর্ষকে দেখছে। তার কাছে ভারতবর্ষের ছোট-বড়ো সমস্তই একটা মহৎ ঐক্যের মধ্যে—একটা বৃহৎ সঙ্গীতের মধ্যে মিলে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। সে রকম ক'রে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ব'লে ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো ক'রে বিদেশী আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে তার প্রতি কেবলই অবিচার করি।'

'এ বড়ো জায়গাটাই' বেদান্তধর্ম, যদিও রবীন্দ্রনাথ তা খুলে বলেননি, গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুসমাজ তো দূরের কথা, ব্রাহ্মসমাজের কানেও ভারতের এই ঐকতান অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, তার কারণ রামমোহনের আদর্শ তখন প্রায় লুপ্ত। ইংরেজী-জানা শহরবাসী আর সাকার-পূজায় অনুরাগী ও ক্রিয়াকাণ্ডে অনুরক্ত দরিদ্র, মূর্খ কিন্তু সারল্যের ও বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি পল্লীবাসীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছে। শহরের যারা গোঁড়া হিন্দুসমাজের ও প্রতিমাপূজার ধ্বজাধারী—যারা সংখ্যায় ও শক্তিতে ব্রাহ্মদের চেয়ে বেশি, তাদের শক্তি অপচিত হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্ধকূপে ঘুরপাক খেতে খেতে। শহরের এই দুটি সমাজ পরস্পর পরস্পরকে তীব্র অশালীন ভাষায় আক্রমণ ক'রে চলেছে। মুখে তারা যাই বলুক না কেন, পল্লীসমাজের সঙ্গে শহুরে হিন্দুসমাজের প্রধানদেরও ব্যবধান কম দুস্তর ছিল না। শিক্ষিত ভারতবাসীর চিত্তলোকে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে গেল। প্রেম নেই, ঔদার্য নেই, নেই কোন জাতীয় বাঁধন। জাগরণের বাণী, একতার বাণী হারিয়ে যাচ্ছে। অথবা আড়ালে নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে একটা মহৎ বিকাশের আশায় দিন গুনছে কি?

এই পটভূমিকায় রামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের তাৎপর্য বুঝতে হবে। বুঝতে হবে কেমন ক'রে বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে লৌকিক ধর্মের সাকার-পূজা যুক্ত হ'ল রামকৃষ্ণজীবনসূত্রে। কলকাতার অভিজাত সমাজে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথশাস্ত্রী-প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তদের গৃহে বা উপাসনা-মন্দিরে তিনি পিছিয়ে-পড়া কোটি কোটি জনগণের স্বীকৃতির দাবি নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর অলৌকিক শুদ্ধ অপাপবিদ্ধতা, শিশুসুলভ সারল্য সর্বোপরি ভগবৎপ্রেম তথা মানবপ্রেমের পরাকাষ্ঠা সহজ গ্রাম্য ভাষায় ও ভাবে সমুদ্রের গভীরতা নিয়ে রেখাপাত করলে সকল শ্রেণীর মনীষী ও যুক্তিবাদী, ভক্ত ও নাস্তিক্যবাদীর অন্তরে। দক্ষিণেশ্বরের তীর্থীভূত মন্দির-প্রাঙ্গণে দর্শনার্থীর ভিড়

ক্রমবর্ধমান। এলেন দলে দলে শিক্ষিত তরুণেরা, বৃহত্তর কল্যাণের আহ্বানে ঘরকে পর ক'রে। ভারতীয় সত্তার এই নির্মল বিকাশের জ্যোতির্ময় মহিমা তাঁদের অন্তরকে উদ্ভাসিত করলে। নীরব কিন্তু সুদূরপ্রসারী এই বিপ্লবের শেষ অধ্যায় ১৮৮১ খৃঃ সেই মহালগ্নে সূচিত হ'ল, যখন যুক্তিবাদী, অতৃপ্ত চিত্ত, ইংরেজী-শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ এক পরম জিজ্ঞাসা নিয়ে এলেন। দর্শন করলেন গ্রাম্য নিরক্ষর পুরোহিত-বেশী এই যুগন্ধর আচার্যের জীবন-চর্যায় নবজাগরণের জীবন্ত রূপ। বৈদান্তিক নরেন্দ্রনাথের সকল জিজ্ঞাসার উত্তর মিলে গেল। শাশ্বত ভারতের দাবি নতমস্তকে স্বীকার ক'রে নিয়ে পশ্চিমের প্রভাবে সঞ্জাত নূতন ভারত বিবেকানন্দে সার্থক জীবন খুঁজে পেল। রামকৃষ্ণ-সূত্রের জীবন্ত ভাষ্য এই বিশ্বপরিব্রাজক ভারতীয় সন্ন্যাসী উন্নত জড়বাদী পশ্চিমের দানকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দান ক'রে মিলনের বাণী, একতার বাণী, মুক্তির বাণী প্রচার করলেন বেদান্ত-নির্ঘোষে।

'মদীয় আচার্যদেব' গ্রন্থে (বাণী ও রচনা—৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৫) স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে বলছেন : 'অন্যান্য আচার্য বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, সেগুলি তাঁহাদের নিজ নিজ নামে পরিচিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই মহান্ আচার্য নিজের জন্য কিছুই দাবি করেন নাই। তিনি কোন ধর্মের উপর কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই। কারণ তিনি সত্যসত্যই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ঐ ধর্মগুলি এক সনাতন ধর্মেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।' প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বহুবার বলেছেন একই কথা—'যদি আমি কোথাও সত্য ও ধর্মসম্বন্ধে একটি মাত্র কথাও বলিয়া থাকি, তাহা আমার গুরুদেবের, আর ভুল-ভ্রান্তিগুলি আমার।'

ভারতীয় জাগরণ ও মুক্তি-প্রচেষ্টার ইতিহাসে বিবেকানন্দের ভূমিকা আলাদা একটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। এখানে শুধু এটুকুই লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ভারতের নব-জাগরণের মহান্ ঋত্বিক্ রামকৃষ্ণের ভাব-সম্প্রসারণ মূর্ত হ'ল বিবেকানন্দে; রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিলনেই ভারতের এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য ভারত-ভাগ্যবিধাতার ইঙ্গিতে বিকাশের পরিপূর্ণতা লাভ করেন।

একদা বেদান্তকে ভিত্তি ক'রে আধুনিক ভারতের আবাহন-সঙ্গীত গেয়েছিলেন ভারত-পথিক রামমোহন। পরবর্তীকালের নানা ভাব ও ঘটনার এলোমেলো স্রোতে সে সঙ্গীতের সুর অস্পষ্ট হয়ে ভেসে যাচ্ছিল। রামমোহনের পৌত্তলিকতাকে আক্রমণ হিন্দু-ধর্মকেই আক্রমণ ব'লে গ্রহণ ক'রে ব্রাহ্মসমাজ তাঁর বেদান্তভিত্তিক সমন্বয়-সাধনাকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তনের জন্য অবশ্য শুধু ব্রাহ্ম-সমাজকে দায়ী করলে অন্যায় করা হবে। তৎকালীন শক্তিশালী গোঁড়া হিন্দুসমাজের প্রতিক্রিয়া ও রক্ষণশীলতার মাত্রাধিক্য ব্রাহ্মকে খ্রীষ্টান থেকে আলাদা ক'রে দেখত না, প্রতিপদে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করতে হয়েছে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মদের। হীন আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে গেলে অনেক সময় দৃষ্টির স্বচ্ছতা হারিয়ে যায়, রক্ষা পাওয়াটাই জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্রাহ্ম-সমাজ বোধহয় তাই দেখতে পায়নি যে, সাকার-পূজা আর পৌত্তলিকতা এক নয় এবং মূর্তিপূজাতেই ভক্তিতত্ত্বের একটি চরম পরিণতি আছে। আমাদের দেশে মূর্তিতে মানুষের কল্পনা গ্রীস বা রোমের মতো শুধু সৌন্দর্যবোধকে আশ্রয়

ক'রে গড়ে ওঠেনি, তা জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। কৃষ্ণ-রাধাই হোক বা হর-পার্বতীই হোক, তার মধ্যে মানুষের চিরন্তন তত্ত্বজ্ঞানের রূপ রয়েছে।'—রবীন্দ্রনাথ গোরাকে দিয়ে এ গভীর তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন ব্রাহ্মসমাজের সুচরিতাকে। চৈতন্য, রামপ্রসাদ এবং রামকৃষ্ণে এ তত্ত্বেরই আশ্চর্য বিকাশ হয়েছিল।

এভাবে বর্তমান যুগের জড়বাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিচিত্র পরিবেশে রামকৃষ্ণ-জীবনে বেদান্ত মূর্ত হ'ল। রামমোহনের মেধা আর রামকৃষ্ণের হৃদয়—ভারতীয় জাগরণের পূর্ণরূপ, ভারতের জাতীয়তার সার্থক মূর্তি এ-দুয়ের সংযোগে বিকশিত। এ জাগরণের—এ বিরাট সম্ভাবনার মহান্ দূত স্বয়ং বিবেকানন্দ, যিনি মেধালব্ধ শুষ্ক জ্ঞানকে হৃদয়ের উপলব্ধ সত্যের দ্বারা সঞ্জীবিত ক'রে বলিষ্ঠ ভারতমন্ত্র রচনা করলেন, তুলে ধরলেন মহাশক্তি দ্বারা ত্যাগ ও সেবার সনাতন পতাকা।

অতএব রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ রামমোহনের ভাবধারারও সম্প্রসারণ। রামমোহনের পূর্ণতা ব্রাহ্মসমাজে নয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে। কথাটা আরও একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

১৮২৮ খৃঃ রামমোহন যে ব্রহ্মসভা স্থাপন করেন, দু-বছর পরে তার ট্রাস্ট্-লিপিতে তিনি যার যার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসকে ত্যাগ না করেই এখানে সকল ধর্মের মূলসত্য একেশ্বরবাদ-উপাসনায় যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানান। হিন্দু তৎকালীন লৌকিক ধর্ম পৌত্তলিকতায় পর্যবসিত, তাই তা রামমোহনের সমন্বয়-আদর্শের পরিপন্থী। কিন্তু রামমোহন হিন্দু-সমাজ থেকে কখনও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি, আমৃত্যু তিনি ব্রাহ্মণ, যদিও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-শাসিত ধর্মকর্মের তিনি আপসহীন সমালোচক। অসামান্য যুক্তিবাদী মনীষা ও বেদান্তভিত্তিক দৃঢ়তা তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব ক'রে তুলেছিল। তবুও এর মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা ছিল। তৎকালীন পশ্চাৎপদ ভেদবিভেদগ্রস্ত সমাজের অন্ধ তামসিকতা আর ভারতের প্রথম 'আধুনিক' পুরুষ রামমোহনের অসামান্য আলোকদীপ্তি —এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করা অসম্ভব বলেই বোধহয় এ অসম্পূর্ণতা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পটভূমিকায় রামমোহন স্বভাবতই অনন্য। তারপর ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল ব্রাহ্মসমাজ—ভারতীয় ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং রামমোহনের জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র ক'রে। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ আলাদা হয়ে গেল বৃহৎ হিন্দু সমাজ থেকে। এ-কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। রামমোহনের অসম্পূর্ণতা ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে আরও ব্যাপক হয়ে বিচ্ছিন্নতাকে বয়ে নিয়ে এল সাকার-পূজা আর পৌত্তলিকতা-ব্রাহ্মদের কাছে অভিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ বর্জিত হ'ল, সমন্বয়ের সূত্রটি আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

এলেন রামকৃষ্ণ। লৌকিক ধর্মে প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রহ্মকে, আধ্যাত্মিকতার হারানো সুর ফিরিয়ে আনলেন হিন্দুর সাকার-পূজার মধ্যে। 'স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্তি' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সীমার মাঝে অসীম তার আপন সুর বাজাতে লাগলো'। নিচুস্তরের দুর্গত মানুষের জন্য দয়া বা অনুকম্পা দেখাবার লোক উঁচুস্তরের সমাজসংস্কারকদের মধ্যে যে ছিল না, তা নয়, কিন্তু 'জীবে প্রেম ঢেলে দেবার—জীবকে শিব-রূপে' অর্চনা করবার প্রত্যক্ষ অনুভূতি রামকৃষ্ণের মধ্যেই এযুগে প্রথম বিকশিত হ'ল। 'আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।' এখানেই বৈদান্তিক স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর

জীবনের মূল প্রেরণা খুঁজে পেলেন। 'মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী' সবাই জীবরূপে শিব, 'বহুরূপে একই ঈশ্বর'। রবীন্দ্রনাথ সাকার-নিরাকারের এই আনাগোনা, এই জানা-শোনাকে গানের সুরে অপূর্বভাবে প্রকাশ করলেন :

'সাকার ডুবিয়া মরে নিরাকারে চুপে,
নিরাকার ফুটে ওঠে সাকারের রূপে।'

ধর্মের ভিত্তিতে ভারতের একতার সাধনা এখানেই তাৎপর্যময়। যুগন্ধর রামকৃষ্ণের জীবন তার সূত্রস্বরূপ, স্বামীজী তার ভাষ্য। যে হীনম্মন্যতাবোধ রামমোহনোত্তর যুগে ভারতের সংস্কারক ও নেতৃবর্গের কর্মধারাকে পঙ্গু ক'রে রেখেছিল, রামকৃষ্ণ-সাগর ও বিবেকানন্দ-স্রোতস্বিনীর অপূর্ব সঙ্গমস্থানে সে হীনম্মন্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে ডুবে গেল। ভারতের জাতীয় জাগরণের যে উন্মেষ বৈদান্তিক রামমোহনের কর্মসূচীতে, তারই পূর্ণ রূপায়ণ ব্যাবহারিক বৈদান্তিক (Practical Vedantist) বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ কর্মযোগে—যা রামকৃষ্ণ জীবন-দর্শনে সন্নিবদ্ধ। এই জাগরণের পট-ভূমিতেই আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ, ধর্মের বাঁধনে দৃঢ়বদ্ধ, সমন্বয়ের সূত্রে একতাবদ্ধ এই জাতি এক অপূর্ব উন্মাদনায় আপসহীন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মহাশক্তিধর ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে, স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় সর্বস্ব পণ করেছে, ভারতমাতার পূজায় ভক্তিচন্দনে পবিত্রীকৃত জীবনকে উৎসর্গ করেছে। কিন্তু এ-সব বিংশ শতাব্দীর কাহিনী।

এখানে বক্তব্য শুধু এটুকু যে, ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সংযোগ যতদিন বিবেকনন্দ-বর্ণিত ধর্মের সঙ্গে, ততদিনই এ মুক্তির আন্দোলন। যুগে যুগে ভারত এ মুক্তির প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছে। 'ধর্মের মূল মন্ত্রই তো মুক্তি, যার প্রকৃত অর্থ দৈহিক মানসিক আধ্যাত্মিক সব রকম স্বাধীনতা।' এই মন্ত্র রূপায়ণের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ অধিনায়কত্বে ১৮৯৭ খৃঃ জন্ম নিয়েছিল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, যা বিশেষ মতবাদের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ কোন ধর্মসম্প্রদায় নয়, যা নবজাগ্রত সমন্বয়ী ভারতের সামগ্রিক আদর্শের ধারক ও বাহক। এ ভাবে বাংলার রেনেশাঁস বিচিত্র গতিতে প্রবাহিত হয়ে, পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে ভারতীয় ধর্মের আশ্রয়ে বিপুল ও প্রবল জাতীয় মহাজাগরণের সম্ভাবনা নিয়ে অবশেষে বিকশিত হ'ল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীতে। উত্তরকালে বাংলার তথা ভারতের মুক্তি-প্রচেষ্টায় মহাবিপ্লবী দার্শনিক অরবিন্দ শক্তির ও মুক্তির এই মন্ত্রকেই প্রতিষ্ঠা করেন ; তাঁর পাশে প্রেরণাদাত্রীর কল্যাণীমূর্তিতে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'।

অপরদিকে বিংশশতাব্দীর স্বাধীনতা-আন্দোলন যখনই ধর্মের মিলনভূমি থেকে স্খলিত হয়ে নিছক রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে, তখনই একতায় গোঁজামিল দিতে এসেছে প্যাকট্ (চুক্তি), আপস-রক্ষা আর ব্যবস্থাপক সভার আসন-ভাগাভাগির কর্মসূচী। এ ভাবে একতা বজায় রাখার রাজনৈতিক প্রয়াস দারুণ অনৈক্যে ভেঙে পড়েছে। ক্ষণিক উত্তেজনায় মানুষ বড় কাজ করতে পারে, কিন্তু উত্তেজনা থেমে গেলে আসে নানা প্রতিক্রিয়া, আসে উদ্যমহীনতা ও দুর্বলতা—চালাকির আবরণে গাঢাকা দিয়ে। মানুষকে ও তার সমাজকে যা সম্পদে ও বিপদে উত্তেজনায় ও শান্ত অবস্থায় খাড়া রাখতে পারে, তা হচ্ছে ধর্ম। সে ধর্ম হারিয়ে গিয়েছিল

শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনে, এবং তজ্জনিত দুর্গতির ভয়াবহ জের দ্বিখণ্ডিত ভারত স্বাধীনতার পরে টেনে চলেছে।

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনায় ভারতের 'জিনিয়াস' বা নিজস্বতা-রূপে এ ধর্মই প্রগতিশীল কর্ম-চাঞ্চল্যের বাহনরূপে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত। সে চেতনায় তৎকালীন রাজনীতির কথাও অনুপস্থিত নয়। কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৫ খৃঃ। দীর্ঘকাল পর্যন্ত কংগ্রেস ছিল উদারচরিত্র মডারেট বা নরমপন্থী বৃটিশরাজভক্ত নেতৃবর্গের সংস্থা। ভাল কাজ বা তার প্রচেষ্টা তৎকালীন কংগ্রেসের মাধ্যমে এ দেশের জাতি-গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে কম হয়নি, যদিও তার 'আবেদন-নিবেদন' নীতি পরবর্তীকালে সমগ্র দেশের জাগ্রত কর্মচঞ্চল মানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। স্বামীজী কংগ্রেসের এ শুভ প্রচেষ্টাটুকুর প্রশংসাই করেছেন। 'আমি যে ও-বিষয়ে (কংগ্রেসের আন্দোলন) বিশেষ মন দিয়াছি, বলিতে পারি না। আমার কার্যক্ষেত্র অন্যবিভাগে। কিন্তু আমি ওই আন্দোলন দ্বারা ভবিষ্যতে বিশেষ শুভফল লাভের সম্ভাবনা আছে, মনে করি এবং অন্তরের সহিত তাহার সিদ্ধি কামনা করি' (বাণী ও রচনা—৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪১)।

পরন্তু হিন্দু-মুস্লিম সমস্যা—পরবর্তীকালে যা আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা-প্রাপ্তিকে কলুষিত করেছে, তার সমাধানের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত স্বামীজীর বৈদান্তিক মানসে অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছিল। একাধিক স্থানে এ মিলনের গুরুত্ব ও পথনির্দেশ স্বামীজীর বাণীতে রয়েছে। স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতের হিন্দু-মুসলমান বড়ো কাছাকাছি রয়েছে, এবং এ কাছাকাছি থাকাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিদান ক'রে, ধর্মের যেখানে অভিন্নতা, সেখানেই একে সুবিন্যস্ত ক'রে অর্থপূর্ণ ক'রে তুলতে হবে। 'শিক্ষিত মুসলমানদের সঙ্গে সুফিদের সঙ্গে হিন্দুদের সহজ প্রভেদ করা যায় না।...... তাহাদের চিন্তাপ্রণালী আমাদের দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুরঞ্জিত হইয়াছে' (বাণী ও রচনা—৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৫)। ১৮৯৮ খৃঃ মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে লিখিত স্বামীজীর লিপিখানি এ-বিষয়ে একখানা অসামান্য দলিল (বাণী ও রচনা—৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮)। হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ে বা মিলনে ভারতীয় জাতি বা নেশনের একটি উজ্জ্বল ছবি এখানে ফুটে উঠেছে। 'আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ—এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই —বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।' কিন্তু যে ভারতীয় জাগরণ আলোচিত হ'ল, তার মধ্যে ইতিহাসের অমোঘ নিয়তির বিধানেই বুঝি এ আশা স্ফুরিত হয়নি। শিক্ষার হেরফেরে এবং এ-দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে তার প্রসারের অগ্রপশ্চাৎ গতির জন্য, সর্বোপরি ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের সার্থক বিভেদনীতির ফলস্বরূপ আমরা পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনে স্বামীজীর দেওয়া সূত্রটি হারিয়ে ফেললাম। এর জন্য শুধু মুসলমানকে দায়ী করলে অবিচার করা হবে। ভারতীয় জাগরণের যে মন্ত্র প্রাণ পেয়েছিল রামকৃষ্ণের সাধনায় ও স্বামীজীর কর্মযোগে, তাকে রাজনীতিতে সার্থকভাবে রূপদানে অসমর্থ হয়েছিলেন আমাদের রাজনীতিক দেশপ্রেমিক-গণ। ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাদের রাজনীতি জোড়াতালি ও আসন ভাগাভাগির নীতিতে (বা দুর্নীতিতে) পরিণত হ'ল। ইংরেজের ভেদনীতি ও পক্ষপাতিত্বের চাতুর্য হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতি ও বিভিন্ন মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মিলনের দুর্বল সূত্রগুলি

ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিল। দুই সম্প্রদায়ের ভুল বোঝাবুঝি পরিণত হ'ল নিষ্ঠুর রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, যার পৌনঃপুনিকতা বৈদান্তিক বিবেকানন্দের আশাকে আকাশ-কুসুমে পরিণত ক'রল।

শুধু কি তাই? সমগ্রভাবেই হারিয়ে ফেলেছি আমরা ঐ জীবন দিয়ে গড়া বেদান্তের সূত্রগুলি। আবার আমরা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি—কি সমাজ-জীবনে, কি রাষ্ট্রজীবনে। ধর্মের মিলনভূমি থেকে স্খলিত হয়ে ঐহিক দেনাপাওনার উপর জোরের মাত্রাধিক্য আরোপ ক'রে অন্ধ স্বার্থপরতার কুৎসিত প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছি। মনে ও মুখে 'আসমান জমিন ফারাক' হয়েছে। একদা রামমোহন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনে জীবনলাভ ক'রে জাগ্রত ভারত তার স্বপ্ন ও সাধনা নিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিল, বর্তমান ভারতের ধর্মচ্যুত দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতির নাগপাশ, সমাজের বুকে কালোবাজারের বিষাক্ত নিঃশ্বাস—একি আজ তার যাত্রাপথকে রুদ্ধ ক'রে দেবে? কোথায় সেই পথপ্রদর্শক, কতদূরে সেই 'জনগণমন-অধিনায়ক,' যার উদার অভ্যুদয়ে, নির্মল প্রকাশে আবার যাত্রাপথের তমসা কেটে যাবে, উদ্ভাসিত হবে এ পথের সুদূর বিস্তৃতি?

ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতাত্মার এই প্রশ্নই আজ কল্যাণকৃৎ-এর অন্তরকে উদ্বেল ক'রে তুলেছে।

Sprit Of India

Behind and before this analytical keenness, covering it as a velvet sheath, was the other great mental peculiarity of the race—poetic insight. Its religion, its philosophy, its history, its ethics, its politics were all inlaid in a flower-bed of poetic imagery—the miracle of language which was called Sanskrit, or 'perfected', lending itself to expressing and manipulating them better than any other tongue······This analytical power and the boldness of poetical visions which urged it onward are the two internal causes in the make-up of the Hindu race. They together formed, as it were, the keynote to the national character. (—Historical Evolution of India)

—*Swami Vivekananda*

বিবেকানন্দ

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

কার অংশে জন্ম তব   ভাবে বিশ্ববাসী
শঙ্কর অথবা বুদ্ধ   হে বীর সন্ন্যাসী !
রাজপুত্র রাজ্য ত্যজি   নিবিড় নিশাতে
নামিয়া এলেন পথে   জীবেরে শুনাতে—
জরা-মৃত্যুময় দেহী   জীবন মরণ-
পথে চলে কর্মসূত্রে ;   লও ত্রিশরণ।
হেরে বিশ্ব ধ্যানমূর্তি   প্রজ্ঞা পারমিতা,
ইঙ্গিতে করুণা মৈত্রী   উপেক্ষা মুদিতা।
অথবা শঙ্কর-অংশে   শিবোহম্ গাহি'
হের বিশ্ব ব্রহ্মময়   অন্য কিছু নাহি।
কিংবা উমানাথ   ভস্ম-অস্থি-মাল্যধারী
কভু গৃহী কভু যোগী   শ্মশান-বিহারী
বিশ্বেশ্বর বীরেশ্বর   শিব কাশীধামে
তাঁহার কি বরপুত্র   বীরেশ্বর নামে !

গৈরিক উষ্ণীষ শিরে,   কণ্ঠে নিলে ভরি',
বিশ্বের শাশ্বত বাণী   যুগ যুগ ধরি'
প্রাচ্য রেখেছিল বুকে   অমৃত সমান।
'শোনো সবে—জানো,   ওই পুরুষ মহান্,
তিমির-বিদার রূপ   আদিত্য-বরণ।
যাঁহারে জানিলে নাহি   জীবন মরণ
যাঁহারে লভিলে নাহি, নাহি ক্ষয় ভয় ;
লভিবে অমৃত-লোক অক্ষয় অভয়।'
সে বাণী বহিয়া আসে যুগ-যুগান্তরে,
কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, শঙ্করে,
রামকৃষ্ণে—নানা কণ্ঠে।   মিলি কণ্ঠে তব
কহিল বিশ্বেরে, লও অমৃত-বৈভব।
হে সন্ন্যাসী, মহাকাল হ'তে কালান্তর,—
তোমাতে মিলিল যেন সাগরে সাগর !

লেনিনগ্রাদের চিঠি

[স্বামীজীর শতবার্ষিকী-সম্পর্কিত]

শ্রীমতী অরুণা দেবী হালদার

১২. ২. ৬৩

শ্রীচরণেষু

…এদেশে আমাদের দেশের খবর খুব কম পাই। তবুও মাঝে মাঝে দেশের কাগজ পাই। দেশের বিঘ্নে বিপদে সম্পদে এমন ক'রে যে মন টানে, তা বিদেশে না এলে বুঝতে পারতাম না। সম্প্রতি ডাক-এডিশন 'অমৃত বাজারে'র একটি copy পেয়েছিলাম, তাতে দেখলাম স্বামীজীর শতবার্ষিকীর পূর্ণ বিবরণ। তাতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের ছবিও দেখলাম। অতীতের বহুবিধ স্মৃতি ও শ্রদ্ধা মনকে আলোড়িত ক'রে তুলল।

স্বামীজী-সম্পর্কে আমার এই সামান্য রচনাটুকু আপনার কাছে পাঠালাম—এটিই আমার তাঁকে প্রণাম করা। আজ এই দুর্দিনে সমস্ত বিশ্বের মানুষ তাঁকে স্মরণ করুক—তাঁর আদর্শবাদের দ্বারা প্রেরণাপ্রাপ্ত হ'ক—এই আমার একান্ত প্রার্থনা।…

১৭. ৫. ৬৩

…আমি কিছুদিন পূর্বে (মানে প্রায় ৩ মাস পূর্বে) আপনাকে পত্র দিয়েছিলাম, সে সময় ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে স্বামীজীর শতবার্ষিকী হচ্ছিল। তার কিছু কিছু খবর আমি এখানে প্রাপ্ত ভারতীয় সংবাদপত্রে পেয়েছিলাম। আর সেই সময়েই অত্যন্ত আনন্দ সহকারে আপনাকে পত্র দিয়েছিলাম—স্বামীজী-সম্বন্ধে একটি স্ব-রচিত প্রণাম পাঠিয়েছিলাম।…

সম্প্রতি গত শুক্রবার (১০ই মে) এইখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর শতবার্ষিকী প্রতিপালিত হ'ল। এখান থেকে আমাকে বলতে বলা হয়। আমি ছাড়াও আর একজন ভারতীয় Trainee-র ভাষণ ছিল। আমি ১৯৬২-র জানুআরির মাঝামাঝি এখানে আসি—আগামী জানুআরির ঠিক ঐ সময় ফিরে যাব। আসার সময় একটি ক্যালেণ্ডার ভারত থেকে আনি—তাতে স্বামীজীর চিত্র ছিল। ঐ চিত্রটি এখানকার কর্তৃপক্ষকে দিলে তাঁরা তা থেকে ফটো করান ও কার্ডেও তাই ছাপানো হয়। সেই কার্ডও পাঠালাম। অনেক কষ্টে এখানকার পাব্লিক লাইব্রেরিতে স্বামীজীর ৬ খণ্ড গ্রন্থাবলীও পেলাম। দীর্ঘকাল পরে নূতন ক'রে ভালমত পড়ার সুযোগ পেয়ে ধন্য হলাম—সে-সব গ্রন্থ। এই দূর বিদেশে সেদিন বিকালবেলা (২০।২৫ জন এখানকার ভারতীয়ও ছিলেন) স্বামীজী-সম্বন্ধে এদেশের লোককে বলতে গিয়ে বারে বারেই অনেক পুরানো কথা স্মৃতির অন্তর থেকে বাহির হয়ে আসছিল।

জীবনের মধ্য থেকে আবার নূতন ক'রে একটা সত্যকেই অনুভব করলাম—সবচেয়ে সত্য মানুষ। সেই মানুষকে যাঁরা ভালবেসেছেন—যাঁরা সেই মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয় দিয়ে অনুভব ক'রে জীবন ভালভাবে সুগঠিত করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের জানবার বা তাঁদের বোঝবার জন্য কোনও প্রোপাগাণ্ডার দরকার হয় না। সত্য সর্বকালেই স্বয়ংপ্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৯-এ তাঁর লেখা (জাপানী কবি নোগুচিকে) একটি পত্রেও এই কথাটি বলেছিলেন। যা সত্যই ভাল আর যা সত্যই মন্দ, তা বোঝাবার প্রয়োজন হয় না। সেইদিন বিকালবেলা—এই দেশের মানুষের কাছে আর একবার তাই স্বামীজী-সম্বন্ধে বলতে চেষ্টা করলাম।

এতদিন আমার ধারণা ছিল আপনার কাছে আমার পত্র পৌঁছেছে। এখন দেখলাম তা যায়নি। সুতরাং পুরানো পত্রশুদ্ধ আবার নূতন পত্র লিখে পাঠালাম। আমার ভাষণটির একটি খসড়া পাঠালাম এই সঙ্গে। এখান থেকে এ-সব লেখা পাঠানো বড় শক্ত। ভারতে গিয়ে পরে যদি সুযোগ পাই, তবে লেখাটি বার করবার ইচ্ছা থাকল।···এখানে এখন বসন্তকাল; ঠাণ্ডা আমাদের দেশের শীতকালের মতো। যখন শীত থাকে, তখন ২৮-৩০ সেন্টিগ্রেড ঠাণ্ডা পড়ে।

আজ তাহলে আমি এইখানে শেষ করি। শতকোটি সভক্তি প্রণাম নিবেদনান্তর—

ইতি—স্নেহাবনতা

অরুণা

২৮. ৭. ৬৩

এবারও যখন এই দেশে স্বামীজীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল, আর তাতে বলার জন্য অনুরুদ্ধ হলাম, তখন মনে হ'ল যে স্বামীজীর চিন্তাধারা আমার কত আপনার। এই দূর প্রবাসে বার বার মনে হয়েছে, ভারতবর্ষের মানুষ আমি, এ আমার সৌভাগ্য। আর, স্বামীজীর লেখা নূতন ক'রে পড়তে পড়তে বুঝলাম যে, ভারত ও ভারতবাসী আমার কত প্রিয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ও দেশকে যাঁদের আলোকে আবিষ্কার করতে পেরেছি, তাঁদের মধ্যে একজন স্বামীজী, অন্যজন রবীন্দ্রনাথ। জীবন-পথ তাঁদের ভিন্ন ছিল—কিন্তু সম্ভবতঃ ভিন্ন ছিল না তাঁদের জীবন-দর্শন। দেশ তাঁদের গণ্ডিবদ্ধ করেনি—বিদেশ তাঁদের আত্মীয় ব'লে জেনেছে। আবার উক্ত মনীষার সংযুক্ত একটা ধারাই যেন দেখতে পাই ভগিনী নিবেদিতার চরিত্রে। অবশ্য এ-কথা আমার নিজের মনে হয় ব'লে লিখলাম।···

গত বৎসর জুলাইএ মস্কোতে আন্তর্জাতিক শান্তি-সম্মেলনে আমার স্বামীর সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলাম। সারা পৃথিবীর মনীষী, চিন্তানায়ক, রাজনীতিবিদ্, সামাজিক কর্মী, শিক্ষক ও নানা প্রতিষ্ঠানের মানুষ প্রায় ২,০০০ মতো এসেছিলেন। এ বৎসর জুলাইএ সেখানেই হ'ল আন্তর্জাতিক মহিলা-সম্মেলন। সেটিতেও যোগদানের সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রায় ১,৫০০ মতো সমস্ত পৃথিবীর দেশ থেকে মহিলা প্রতিনিধি এসেছিলেন। দুটি ক্ষেত্রেই আমার ধনতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক এবং অনুন্নত নানা দেশের প্রতিনিধির বিচার-বিবেচনা শোনার ও কিছু নিজে যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাতে মনে হ'ল—পৃথিবীর মানুষ আজকের দিনে কেহই আর সত্যসত্যই যুদ্ধ চায় না। কিন্তু এই না-চাওয়ার ইচ্ছার প্রধান প্রতিবন্ধক হ'ল মানুষের লোভ আর সততার অভাব। আজকের পৃথিবীতে বড় দরকার নির্লোভ দায়িত্বশীল সৎ মানুষের, তার সংখ্যা যত বেশী হবে—পৃথিবীর শান্তি ততই

স্থায়ী হবে। কিন্তু কেমন ক'রে তা হবে, বুঝতে পারি না। গণতন্ত্রী ধনতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রী সকল দেশেই ভাল ও মন্দ—দুই মিলিয়েই মানুষের সংখ্যা। ভালর সংখ্যা কোনটাতে যে বর্তমানে বাড়ছে বা বাড়বে—এমন অবস্থা কোথাও দেখি না। তবুও রবীন্দ্রনাথের কথা মেনে ভাবতে চেষ্টা করি, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'—আর বুদ্ধির সাহায্যেই মানুষ উত্তরোত্তর মনুষ্যত্ববান্ হয়ে উঠবে। এ-কথা, বিশেষ ক'রে আমাদের ভারতীয় চিত্তে না উঠে পারে না। কয়েকমাস পূর্বে আমি 'ভারতের প্রাথমিক পরিচয়' সম্বন্ধে কিছু পড়াচ্ছিলাম—এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমায় কিছুটা বাংলাও পড়াতে হয়। ৪টি চীনা ছাত্রও আছে, ৪টি রুশীয়। আমি বলেছিলাম -'ভারতের পরিচয় শস্ত্রে নয়—শাস্ত্রে, যুদ্ধে নয়—বুদ্ধিতে, বিজ্ঞানে নয়—জ্ঞানে।'

স্বামীজীর Photo-দুটি পেয়ে অনুগৃহীত হলাম। এখানে পূর্বে কোনও Photo পাওয়া যাচ্ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে আমার কাছে একটি ক্যালেণ্ডারে যে ছবিটি ছিল, সেটি দিয়েই কার্ডের ছবি ছাপার ব্যবস্থা করা হয়। স্বামীজীর এ ছবিতে মাথায় চুল আছে। চিঠির Stampটি পাওয়াতেও খুব উপকৃত হলাম—এটি এখানে কারুকে উপহার দিতে পারব। আমার লেখা আপনার ভাল লেগেছে জেনে আনন্দিত হলাম। আমার ইচ্ছাই ছিল এখানকার ভাষণটি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবার ; পারলে পরে তা পাঠাব। আমার সামান্য বুদ্ধিতে যুগাবতার ভারতাত্মা স্বামীজীর কতটুকু পরিচয় দিতে পারব ? যদি নাও পারি—ঐ চেষ্টাটুকুই আমার লাভ।

এখানে এখন গরম। তার মানে, আমাদের দেশের অল্প শীতের মতো। সমস্ত শীতকাল এখানে Tinned Vegetables ছাড়া সবজি ফল কিছুই পাওয়া যেত না। আমাদের মতো নিরামিষাশীর পক্ষে এদেশে টিকে থাকা খুব কষ্ট। ·· সব শুদ্ধ জড়িয়ে ভাল-মন্দ মিলিয়ে বহু রকম Experience হ'ল এবং বিচিত্র মানুষের পরিচয় পেলাম। এতে ক'রে মনে হয়েছে, মানবচরিত্র সকল দেশেই এক, ভালমন্দ-মিশ্রিত। এদেশে এখন ভারতীয় ছাত্র ও Trainee সুপ্রচুর—এক এই লেনিনগ্রাদেই সবশুদ্ধ প্রায় ৭০।৮০ মতো আছেন—পরিচয় ও আসা-যাওয়া অনেকের সাথেই আছে। বিশেষ ক'রে এ বাড়িটাকে দেশের ছেলেরা প্রায় নিজের বাড়ি ভাবে—এটি আমার পক্ষেও আনন্দ ও আশ্বাসের বিষয়।···

বিদেশে দেখছি যে, ভারতবর্ষকে লোকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চোখেই দেখেন—আমি প্রার্থনা করি, যেন আমরা—ভারতীয়রা নিজেদের আচরণে তা সর্বদা রক্ষা করি। ইতি—

প্রণতা

স্নেহার্থিনী অরুণা

পয়লা জানুআরি

স্বামী ধীরেশানন্দ

দুর্বার কালের অপ্রতিহত গতি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ অতিক্রম করিয়া নববর্ষে পদার্পণ করিল। মানবের সীমিত ক্ষুদ্র জীবন-নদীর আর একটি বর্ষ-বুদ্বুদ অনাদি অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইল। জীবন-যাত্রার পথে শত আশা-নিরাশা, দুঃখ-দৈন্য, ভাল-মন্দ, এবং অগণিত অফুরন্ত ও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাসমূহ আপন বক্ষে ধারণ করিয়া আর একটি বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল।

কিন্তু সত্যই কি একটি বৎসর নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল? বিচার-দৃষ্টিতে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সীমারেখা দুর্লক্ষ্য ও কাল্পনিক। বর্তমান ক্ষণমধ্যে অতীত হইয়া যায় ও ভবিষ্যৎ বর্তমানের রূপ ধারণ করিতে না করিতেই ভূতকালে পর্যবসিত হইয়া পড়ে। নিমেষ-মধ্যে হস্তস্থিত কাল যেন কোথায় অপস্রিয়মান, অদৃশ্য হইয়া যায়! তাই কালের কোন নিয়ত রূপ নাই। কিন্তু মানুষ ব্যাবহারিক জগতে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির গতিবিধি সহায়ে দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর - এইরূপে কাল গণনা করিয়া থাকে। এই কাল ক্ষয়িষ্ণু কাল। মানুষ, পিতৃ ও দেবগণের বিভিন্ন কাল গণনা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

অনন্তকাল পড়িয়া রহিয়াছে সেইকালের সঙ্কুচিত চিত্রপটে কোথায় কি অঙ্কিত আছে, তাহা কে জানে? কাল যে চিত্রটি উন্মোচিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিতেছেন, আমরা তাহাই দেখিতেছি, দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি। কিন্তু আমরা ভাবি না, আরও কত বিচিত্র দৃশ্য উহাতে গুপ্ত হইয়া আছে, কালে উহা প্রকাশ পাইবে।

জগদ্রূপ রঙ্গমঞ্চে ভগবানের কালশক্তি নৃত্যশিক্ষক। কাল সংসারে সকলকেই স্ব স্ব কর্মানুযায়ী নাচাইতেছেন। কাল জগতের নিয়ামক। কালে অরণ্য জনপদে ও জনপদ অরণ্যে পরিণত হয়। কালে চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব পর্যন্ত লয় পান। এই কাল – যাহার সঙ্গে আমরা নিত্য পরিচিত, ইহা শ্রীভগবানেরই একটি বিভূতি। গীতামুখে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'কালঃ কলয়তামহম্' (১০।৩০)—কালগণনাকারিগণের মধ্যে কাল-রূপী আমি। ইহা তাঁহার অপ্রধান, গৌণ, ব্যাবহারিক রূপ। এই কাল আয়ুক্ষয়ে ক্ষয় হয়। কিন্তু এতদূর্ধ্বে আর একটি কাল আছে, যাহা শ্রীভগবানের পারমার্থিক রূপ, উহা নিত্য কাল। গীতামুখে তিনি—'অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ' (১০।৩৩)—আমিই অক্ষয় কাল—এইরূপ কথনপূর্বক সেই নিত্য কালরূপেরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

অনিত্য খণ্ড-কাল 'আগমাপায়ী'। উহা বিগত হইয়া নিত্য অনন্ত কালসহ আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়। কিন্তু মোহবশতঃ আমরা কালরূপী শ্রীভগবানের বাস্তব রূপটি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি না। ক্ষুদ্র কাল-সম্বন্ধ তুচ্ছ পার্থিব বিষয়সমূহ লইয়াই ভুলিয়া থাকি। তাই আজ এই নববর্ষের প্রারম্ভে আমাদের ভাবিবার অবকাশ আসিয়াছে যে,

একটি একটি করিয়া ক্ষণ, দিন, মাস, বৎসর ব্যতীত হইয়া গেল, কিন্তু আমরা কোথায় চলিয়াছি? যে পথে আমরা জীবনযাত্রা শুরু করিয়াছিলাম, তাহার কতদূর অগ্রসর হইয়াছি? চিত্তে শান্তিলাভ কতটা হইয়াছে? কতগুলি প্রতিবন্ধক এখনও আছে?—আজ এইরূপ হিসাব-নিকাশ করিবার দিন। যদি উদ্দেশ্যলাভে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে না পারিয়া কেবল দ্বেষ, হিংসা, কলহ, স্বার্থপরতাতে ও নাম, প্রতিষ্ঠালাভের ব্যর্থ প্রয়াসেই বিগত বৎসর ব্যতীত হইয়া থাকে—তবে আজ সেজন্য দুঃখ করিবার দিন। কারণ বৃথাই জীবনের একটি অমূল্য বৎসর বিনষ্ট হইয়া গেল।

এক প্রৌঢ়া বড় আনন্দের সহিত সাধু-মহাত্মা ও গরীব-দুঃখীদের মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেছিল। এক সাধু এরূপ করার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধা উত্তর দিল—'মহারাজ! আজ বড় আনন্দের দিন। আজ আমার প্রিয়তম পুত্রের ষোড়শ জন্মতিথি। তাই আমি আজ মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেছি।' এ-কথা শুনিয়া সাধুটির মন চিন্তাক্রান্ত ও দৃষ্টি বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল। হঠাৎ এইরূপ ভাবান্তর হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সাধু বলিলেন, —'মাতাজী! কি আশ্চর্য! বস্তুতঃ যেখানে শোক ও দুঃখ অনুভব করা উচিত, সেখানে তুমি আনন্দ করিতেছ? তোমার প্রিয় পুত্রের নির্দিষ্ট পরমায়ুর আর একটি বৎসর কালকর্তৃক অপহৃত হইল। মৃত্যু সন্নিকট হইল—ইহা কেন বুঝিতেছ না?'—সাধুর এই কথা প্রৌঢ়া বুঝিল না, বুঝিতে চাহিল না। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া জগতের কেহ ভাবে না, মাতাও পূর্বে ভাবেন নাই। প্রতিটি বৎসর বিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের মৃত্যু সন্নিকট হইতেছে—এ-কথা তিনি ভাবিতে চাহিলেন না। দেহভোগৈকসর্বস্ব জগতে এ-কথা কেহ ভাবিতে চায় না।

কিন্তু মুমুক্ষুদের কথা স্বতন্ত্র। সদা মৃত্যু-চিন্তন তাহাদের বিষয়-বৈরাগ্যের জনক ও সংরক্ষক। তাই মুমুক্ষু সাধকের পক্ষে আজ সাংবৎসরিক হিসাব-নিকাশের দিন। কিন্তু অতীতের অসফলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুমুক্ষু নৈরাশ্যসাগরে মজ্জমান হন না, বরং সম্মুখে অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ নববর্ষের আগমনে পুলকিতচিত্তে তাহাকে অভ্যর্থনা-করত কায়মনোবাক্যে মোক্ষসাধন জ্ঞানসম্পাদনে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সচেষ্ট হন। এইরূপে অতীতের অনবধানতা ও অসফলতাই সচেতন মুমুক্ষু সাধকের ভাবী কল্যাণের সুদৃঢ় বুনিয়াদ হইয়া থাকে। সুতরাং সাধকের জীবনে নৈরাশ্যের অবকাশ কোথায়? জীবনের একটি বৎসর অপসৃত হইলে মৃত্যু নিকটবর্তী হইল, এইরূপ ভাবিয়া সাধক তাঁহার সাধনায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন।

কল্যাণঘনমূর্তি শ্রীভগবানের অপার কৃপা-রাশিও সাবহিত সাধককে স্ব-স্বরূপে উন্নীত করিবার জন্য সদা উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সেই দৃষ্টিতেও আজ একটি বিশেষ আনন্দের দিন। কারণ যে ঐশী করুণাশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত-গতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেহাবলম্বনে কোন কোন ভাগ্যবানের প্রতি কালবিশেষে প্রকটিত হইয়া তাহাদিগের জন্মমৃত্যুবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিত, আজ এই নববর্ষের দিনে (১লা জানুআরি, ১৮৮৬) উহা শতধা বিচ্ছুরিত হইয়া আত্ম-প্রকাশকরত নির্বিশেষে অকাতরে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ১৮৮৬ খৃঃ সমবেত সকলের প্রতি অভয়দান করিয়াছিল।

'তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক'—

যুগাবতারের সেই অমোঘ আশীর্বাদ কেবল সেই দিনটিতে সমবেত ভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়াই উচ্চারিত হয় নাই, উহা সুদূর-প্রসারী ভাবিকালের অগণিত অনাগত ভক্ত-গণের উদ্দেশ্যেও বর্ষিত হইয়াছিল। আজ শ্রীপ্রভুর এই বাণীটিই বিশেষ করিয়া স্মরণ-পূর্বক আনন্দের দিন। কারণ—

—যখন জীবনসংগ্রামে শত ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছেদে মুহ্যমান হইয়া চতুর্দিকে নৈরাশ্যের অন্ধকারে আমরা দিশাহারা হইয়া পড়িব—তখন 'তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক'—তাঁহার এই বাণী সকলকে আশার আলোক প্রদর্শন করিবে।

—যখন চিত্তরূপ অরণ্য দুরন্ত ইন্দ্রিয়রূপ হিংস্র শ্বাপদকুলের যথেচ্ছ দুর্বার আক্রমণে ত্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে—তখন তাঁহার এই বাণী সকলের চিত্তে অনন্ত শক্তি ও সাহস প্রদান করিবে।

—যখন অনবধানতা ও অসাফল্য প্রতি পদে পদে আমাদিগকে বিপথগামী করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে তখন করুণাময় শ্রীপ্রভুর এই আশিস্-বাণী আমাদের পথের নির্দেশ প্রদান করিবে।

—যখন অধ্যাত্মজীবনের শতবিঘ্নসঙ্কুল বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে গিয়া স্খলিতপদে আমরা সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িব ও মহামোহ-অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকার যখন জীবনের দিক্‌চক্রবাল সমাচ্ছন্নকরত আমাদিগকে নিতান্ত বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিবে—তখন যুগাবতারের এই অমোঘ অভয় আশ্বাসবাণী আমাদের দৃষ্টি লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্টকরত সর্ব প্রতিকূল অবস্থা হইতে আমাদিগকে সমুদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে।

'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু'—

—তিনি আমাদের সকলকে সন্মার্গপ্রবৃত্তির অনুকূল শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

'দেখিলাম শিয়রে তোমায়'—

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

সেদিন অনেক রাত, অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে যায়,
জাগিয়া বসিতে আমি দেখিলাম শিয়রে তোমায়।
তোমার সুন্দর মুখ জ্যোতিপূর্ণ, জলে ভরা আঁখি!
কী আনন্দ জাগিল আমার! প্রাণ ভরে উঠিলাম ডাকি—
ঠাকুর! এসেছ তুমি? পূর্ণ করি জীবনের আশা,
এসেছ শিয়রে মোর মূর্ত করি স্বপনের ভাষা।
তারপর কত কথা, সঙ্গোপনে ধীরে অতি ধীরে,
আজ কিছু মনে নাই, শুধু আছে স্মৃতিটুকু ঘিরে
আবেশেতে ভরা প্রাণ, সেদিনের অপূর্ব সঞ্চয়,
জীবনে কি গান এল? এল ভাব ভাষার প্রণয়?
তোমারে চেয়েছি আমি দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি কত
তোমার বাণীর মালা তাই গেঁথে রেখেছি সতত;
এঁকেছি হৃদয়ে যারে, সেই ছবি ফুটিল কি শেষে?
তাই দেখা দিলে প্রভু, আমার ঘুমের মাঝে এসে?

জনগণের উদ্‌বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীঅমৃতকুমার বিশ্বাস

(৩)

সবাই যদি নিজেকে আর্যসন্তান মনে করে, আর কেউ যদি তাতে বাদ না সাধে, তবেই কোন গোল থাকে না। কিন্তু পরাধীন সমাজে লোকবুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন থাকে। বহির্বিশ্বের ব্যাপক ক্ষেত্রে আপন আপন প্রতিপত্তি- ও মহিমা-বিস্তারের পথ রুদ্ধ হয়। কাজেই স্বীয় সমাজের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ পরিসরে চলে নিজ প্রতিপত্তি- ও প্রভাব-বিস্তার; নইলে পূর্ব মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠা-জাত 'অহং' বজায় থাকে না। আর তারই ফলে দেখা যায়, পরাধীন দেশগুলিতে উচ্চ অভিজাত জনের তদ্দেশীয় অপেক্ষাকৃত নিম্ন অনভিজাত এবং অজ্ঞ লোকজনের ওপর নানারূপ অবিচার অত্যাচার নানা অছিলায়। যুক্তির অভাব শয়তানেরও কোনদিন হয় না। আর অজ্ঞ মূঢ় লোক দেশের সমাজের উচ্চে অবস্থিত লোকের কথাই মানতে বাধ্য হয়। এবং অমুক্ত সমাজে স্বাধীন চিন্তার অভাব-হেতু কুযুক্তি, কুমত একবার প্রতিষ্ঠিত হ'লে তাই-ই মুখে মুখে ঘোরে ফেরে। সেই কুমতের হেতু-সন্ধান চলে না, কোনরূপ যাচাইও হয় না। সকলপ্রকার উদ্যোগহীনতা, বুদ্ধি-দীনতা, চিন্তা-শৈথিল্য বদ্ধ সমাজের বৈশিষ্ট্য; কারণ বীর্যই সেখানে অপহৃত। 'মগজ-ধোলাই' তো সেখানেই উত্তমরূপে চলে, যেখানে লোক-সম্প্রদায় বিচার-শক্তিহীন হয়ে অসহায়। সেখানে স্বার্থ কায়েম করার জন্যে বিদেশী প্রভু করে দেশী উচ্চ সম্প্রদায়ের মগজ-ধোলাই; যাদের সাহায্য ব্যতীত এই বিরাট দেশ-শাসন-শোষণ সম্ভব নয়, তাদের স্ববশে রাখবার উপায়। আর গোলামির মূল্যস্বরূপ কিছু পুরস্কার—প্রশংসা, খেতাব, সরকারী চাকরি ইত্যাদি বিতরণ। গোলামের কাছে গোলামিই ধ্রুব। যে নিজে স্বাধীন নয়, সে অপরকেও স্বাধীনতা দিতে চায় না। দাস অপরের কাছেও দাসত্বই চায়।[১] পরস্পরের অসাক্ষাতে পরস্পরকে তারা অকথ্য গালি পাড়ে, অভিসম্পাত করে। স্বভাব-আনুগত্যের সেখানে বড়ই অভাব; জীবিকার দায় সেখানে তাদের বাঁধে। অসহায় দুর্বল প্রবলের অবিচার অত্যাচার মাথা পেতে নেয় নেহাৎ প্রাণের দায়ে। সবল সেখানে আপন প্রভুত্ব বজায় রাখতে যে-পথ আশ্রয় করে, ক্রমশই তা দুর্বলকে পেষণ করে। উচ্চ-নীচে, বড়-ছোটয় এইভাবেই আমাদের বিদ্বেষ-বিষ চক্রাকারে ঘুরছে। এইভাবেই আমরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন। জাতি-কৌলিন্যের উগ্রতা জাতি বিদ্বেষ সৃষ্টি ক'রে প্রকৃত স্বদেশ-চেতনার

---

১ তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ—'আমাদের সমাজে সর্বত্র অধস্তনের নিকট উচ্চতনের দাবির একেবারে সীমা নাই। স্তরে স্তরে প্রভুত্বের ভার পড়িয়া দাসত্ব এবং ভয় আমাদের মজ্জার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। আমাদের আজন্মকালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে; তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি। সেই আমাদের প্রতি মুহূর্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় অসম্মানের মূল নিহিত রহিয়াছে।' (অপমানের প্রতিকার—পৃষ্ঠা ৪১৭, ১০ম খণ্ড, রবীন্দ্ররচনাবলী)

পথ রুদ্ধ করেছে। তাই বড় বড় প্রচেষ্টা উদ্যোগ, যা স্বদেশ-সেবার নামে করা হয়েছে, কিছুকাল পরে তা হয় স্তিমিত হয়ে পড়েছে, নয় সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থ-সিদ্ধির কৌশল হয়েছে। এগুলি দেশের সর্ব স্তরকে, সকল শ্রেণীকে, আপামর জনসাধারণকে স্পর্শ করেনি। অভিজাত-নেতৃসম্প্রদায়ের কেউ কেউ যখন ইংরেজকে ভারস্বরূপ বুঝলেন, তখন সেই ভার-মোচনের জন্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ-প্রচার শুরু করলেন। হয়তো ভাবলেন—এই-ই ভারত-মুক্তির পথ। চিন্তাও করলেন না, (আর রবার অবসর কোথায়, কারণ গণজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো নেই) যে, নিজেরাই এদিকে দেশের অগণিত অজ্ঞান জনসমষ্টির কাছে ভার-স্বরূপ। ইংরেজের সামগ্রিক অত্যাচার ও শোষণ দেশের লোককে বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু তা উপলব্ধি করবার অবসর কোথায় অজ্ঞান অশিক্ষিত 'নীচ' জাতিগুলোর! তারা তো দেখে ইংরেজের শাসন-শোষণ, ইংরেজের অত্যাচার-অবিচার দেশের বড়ো লোকদের, ভদ্রলোকদের, 'উচ্চ' জাতিগুলোর মাধ্যমে চলছে। আবার ইংরেজ যেখানে নেই, যেখানে ইংরেজের প্রবেশাধিকার নেই, সেখানেও শোষণ এবং অবিচার-অত্যাচারের প্রভু এঁরাই। এটাই তো তাদের কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে—জ্বলন্ত সত্য। জন্মে দেখছে, বাঁচার মূল্য সংগ্রহকালে দেখছে, মরণেও[২] দেখছে।

স্বদেশ-বৎসল সন্ন্যাসীর কাছে এই মূঢ়তা প্রকট হ'ল। তিনি দেখলেন যতদিন পূর্বাগত অসার-ভিত্তিক এ ভেদ-বুদ্ধিজাত অযথা কৌলিন্য-জ্ঞান বজায় থাকবে, ততদিন দেশ এবং জাতি মুক্তির সন্ধান পাবে না। স্বদেশের সামগ্রিক রূপ, মহাজাতির সমষ্টি-রূপ কার চোখে পড়ে! সব-ই তো খণ্ডরূপে প্রতিভাত হয়। ঐক্য যেখানে স্বভাব-জাত নয়, ঐক্যের শক্তি সেখানে আশা করা যায় কি? স্ব-স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে, স্বামীজী তাই সকলকে ডেকে বললেন, ভারতে ইংরেজ-ভারতে সকলেই শূদ্র। এ যেন ষোড়শ শতকীয় বিধানের স্বাভাবিক পরিণতি। ভারতের ব্রহ্মণ্য-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শক্তি অপহৃত। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার আদর্শ তার ইংরেজ; সেই ইংরেজই শাসনদণ্ড পরিচালনা করে; আবার তাদেরই হাতে বাণিজ্য-অধিকার, ধনোৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ-ভার। তবে কোথায় রইল সেই দ্বিজত্ব-গরিমা। অযথা বড়াই-এ লাভ কি? পরাধীন ভারতে দাসত্ব সকলেই করছে; অতএব শূদ্রবর্ণেই সকলের অবস্থিতি। গুণ এবং কর্ম যদি বর্ণের চিহ্ন হয়, তবে 'ভারত-বাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব।'

এই চিন্তা, স্বামীজীর আশা, যদি অভিজাত সম্প্রদায়ের অহংকার ধূলিসাৎ ক'রে, অনভিজাত শ্রেণীর সন্দেহ দূর ক'রে পরস্পরকে নিকটে টানে, পরস্পরকে অবস্থা-সাম্যে একতাবদ্ধ করে কোন উচ্চতর লক্ষ্য-সাধনের ক্ষেত্রে। যদি বা অভিজাতবর্গের চিত্তের ওপর এ বিচার দাগ কাটে, জনসাধারণের মনে তার আঁচড়ও পড়েনি। কেন-না এতে তো তাদের অবস্থার পরিবর্তনের কোন ভরসার লক্ষণ নেই। তাদের অবস্থা তো যে-কে সে-ই। কেউ কেউ উল্লসিত হলেও হ'তে পারে, বিশেষতঃ যারা স্বীয় হীনত্বে মুহ্যমান হয়ে অপরের হীনদশায় স্বস্তি বোধ করে। কিন্তু সে অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং কোন সমাজেই এই স্বভাববিশিষ্ট লোকের সংখ্যা

২ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অভাগীর স্বর্গ' নামক গল্পে এর অন্যতম চিত্র পাওয়া যাবে।

অধিক হয় না। কাজেই অগণিত নিপীড়িত প্রাকৃতজনের মনোগত ভাব বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হৃদয়ঙ্গম করলেন। বুঝলেন, আসল পীড়া কোথায়। কুলগত অনপনেয় 'জাতিত্বে'র অসম্মানের বোঝা হইতে মুক্তির উপায় তারা চায়। তাই ভাবী যুগের ছবি তুলে ধরলেন দেশের সমক্ষে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ভবিষ্যৎ শূদ্রকুলের 'প্রোলিটারিয়েট'দের—সর্বহারাদের। জগতের মনুষ্য-ইতিহাসের প্রবেশ-দ্বার উন্মোচন ক'রে তিনি আমাদের দেখালেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—এই চার বর্ণ-সম্প্রদায় পর্যায়ক্রমে ভূমণ্ডলে আধিপত্য লাভ করে। প্রতিযুগেরই বিশেষ বিশেষ গুণও আছে, দোষও আছে। কিন্তু সবযুগেই যে সম্প্রদায়ই, যে বর্ণই শাসন করুক না কেন, তার আসল শক্তি প্রজানির্ভর। যে মুহূর্তে শাসক-সম্প্রদায় দীর্ঘকালপ্রসূত আপন শ্রেষ্ঠত্ব-অভিমানে আপনাকে এই জনসাধারণ থেকে বিশ্লিষ্ট করে, সেই মুহূর্তেই তার পতন। সব দেশই তার সাক্ষ্য বহন করছে। কোথাও কিছু কম, কোথাও বেশী। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাদের প্রভুত্বের যুগ প্রত্যক্ষ করেছে। ভারতে ক্ষত্রিয়রা দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারেনি, ফলে দেশীয় বৈশ্য-কুলের অভ্যুদয় হয়নি। পুরোহিত-তন্ত্র, রাজতন্ত্র, এদের পর এখন চলছে বৈশ্যতন্ত্র, 'ক্যাপিটালিজ্‌ম্'। এর উদ্ভব ইওরোপে, তাই পতন-বীজও ইওরোপেই উপ্ত হচ্ছে—শূদ্রতন্ত্র, 'ডিমোক্র্যাসি'। কিন্তু ইওরোপে 'শূদ্র'দের, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নেই। কেন-না ইওরোপে গুণগত জাতি বিদ্যমান। শূদ্রজাতিকুলে যখনই কোন অসাধারণ প্রতিভার উদয় হচ্ছে, তখনই তাকে শূদ্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলে নেওয়া হচ্ছে। ফলে তার প্রতিভা, ক্ষমতা, বুদ্ধি ধন, যা কিছু তার মূল কুলের শূদ্রজাতির কল্যাণে নিয়োজিত না হয়ে অপর 'জাতি'র স্বার্থেই ব্যয়িত হচ্ছে। প্রাচীন ভারতেও এই প্রথা ছিল। আর উচ্চ সমাজের যত অপদার্থ সব পতিত হচ্ছে শূদ্র-সমাজের মধ্যে। এই কারণে আজও সমাজরূপে কুলরূপে শূদ্রের কোন উচ্চাবস্থা-প্রাপ্তি হয়নি—না ভারতে, না ইওরোপে। কিন্তু আশা আছে ভবিষ্যতে, আর সে আশা ভারতেই। ভারতেই এখন একমাত্র 'জন্মগত' জাতি-প্রথা বর্তমান। এখানে যিনি যত প্রতিভাধর, ক্ষমতাশালী, বিত্তবান্, জ্ঞানবান্ হোন না কেন এবং যতই বিভিন্ন খেতাব পান না কেন, প্রকৃতপক্ষে স্বসমাজ স্বীয়কুল ত্যাগ করবার উপায় বা অধিকার তাঁর নেই। আর সেই কারণেই তাঁর নিজের যা কিছু, তা সেই সমাজের জন্যেই উৎসর্গীকৃত। এই ভাবেই ভারতে শূদ্রের উন্নতি শুরু হয়েছে এবং তা কেবলমাত্র ভারতেই সম্ভব। তাই স্বামীজী বললেন—'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'। কতদিন আর 'মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক, আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?'

এতদিন যে এর উদ্‌বোধন হয়নি, তার কারণ লোকে অনুভব করেনি যে, 'সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার।' 'সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহু-বলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ।' এই প্রাকৃত জন তৎ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকে এতদিন কেবল অপরাপর সম্প্রদায়ের শক্তি, প্রভাব এবং বৈভবের যোগান দিয়েছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ক'রে। যে নিজেকে বঞ্চনা করে, তাকে বঞ্চনা করা অপরের সহজসাধ্য। আত্ম-

মর্যাদা-বোধ যার নেই, অপরে তাকে সম্মান দেয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এদের বঞ্চনা, শোষণ এবং উপেক্ষায় শূদ্রকুলের তাই তন্দ্রা-ভঙ্গ হয়েছে। আজ অনৈক্যের হেতু দূর ক'রে পরস্পরের বিচ্ছিন্নতা-পাপ নাশ ক'রে জনসাধারণ সংহত শক্তির পরিচয় বহন করতে উদ্যত—সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে উন্মুখ।

এরা যদি প্রকৃতই সঙ্ঘশক্তির পরিচয় দিতে পারে, তবেই ভারতের পুনরভ্যুত্থান সম্ভব। এদেরই ওপর ভবিষ্যৎ ভারত নির্ভর করছে। কেন-না, 'এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে। আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নেই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম !!'

শূদ্র-উদ্ধারের পথ তাহলে আপন হীন-চেতনায় একান্ত মুহ্যমান না হয়ে নীচ সঙ্কীর্ণ স্ব-স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, যেখানে যথার্থ স্বাভাবিক স্বার্থ তাকে বড়ো ক'রে তুলে একতাবদ্ধ হওয়ার পথ অনুসন্ধান করা। জগতের গতিও সেইদিকে—একত্ব-অনুভূতি। আপাত-বিচ্ছিন্ন এবং জটিল ঘটনা-বাহুল্যের মধ্যেও কিছু কিছু মূল সুর মানব-ইতিহাসে আছে। দিকে দিকে আজ শতধা-বিচ্ছিন্ন এবং মনুষ্য-শোষিত প্রজাসাধারণ ঐক্যবদ্ধ এবং জাগরিত হচ্ছে। জাগরণ এবং ঐক্যশক্তি তাদের বিপথগামী হ'তে পারে। 'জাতি'-বৈরিতার দ্বারা, 'শ্রেণী'-বিদ্বেষের দ্বারা তারা উত্তেজিত হ'তে পারে। আবহমানকালের শোষণ, উৎপীড়ন, অবজ্ঞা, ঘৃণা, অবিচার, অত্যাচার প্রভৃতি তাদের প্রতিশোধ-পরায়ণ ক'রে তুলতে পারে, বিশেষ যখন তারা নিজ-শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। এই আশঙ্কা স্বামীজীর মনে এসেছে। ভ্রাতৃ-কলহ, গৃহ-দ্বন্দ্ব ভারতকে অধিকতর দুর্বল ক'রে তুলবে। সেই কারণে জন-সাধারণের সদ্‌বুদ্ধি জাগাবার দিকে লক্ষ্য রেখে আত্ম-বিশ্লেষণী বিচারধারা নির্দেশ ক'রে তিনি বললেন : তাদের দুর্দশার জন্যে দায়ী তারাই, এ-কথা যেন তারা মনে রাখে। শক্তির মূলে শিক্ষা। তারা কেন শিক্ষাকে অবহেলা করেছে ? এতদিন তারা সজাগ হয়নি কেন ? সংস্কৃত-চর্চা থেকে নিজেদের তারা বঞ্চিত করেছে। অপরের কথা কেন তারা শুনেছে ? নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে তো কেউ তাদের বাধা দেয়নি। তারা যদি সংস্কৃত-চর্চা ক'রে নিজেদের চিনতে পারত, তাহলে এই ঘোর দুর্দশার জীবন তাদের কাটাতে হ'ত না। সংস্কৃত-চর্চায় অবহেলা ক'রে, অপরের ওপর সে ভার চাপিয়ে তারা জীবনকে অনায়াস-লভ্য ক'রে তুলতে চেয়েছিল, নিশ্চিন্ত হ'তে চেয়েছিল। এ তার-ই প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ।

অতএব হীন প্রতিশোধ-চিন্তা, ভ্রাতৃ-হনন চিন্তা ত্যাগ ক'রে নিজের শক্তিকে অকারণ অপব্যয় থেকে রক্ষা ক'রে কোন উচ্চতর কল্যাণে নিয়োজিত করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

জগতে 'সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু'। সকলেই চায় নিজ সমাজের, নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার ও বিস্তার। এ-কাজ সহজ হয়, যদি যারা এ সংস্কৃতি গ্রহণ করবে, তারা জানে এর মাহাত্ম্য-স্বরূপ, আর যাদের কাছ থেকে গ্রহণ করবে, তারা হয় শক্তিশালী, বীর্যবান্। কেন-না জগতে শক্তিলাভই শ্রেষ্ঠ

লাভ। ইওরোপ শক্তির একরূপ চর্চা করেছে; সেই জড়-শক্তির একান্ত আরাধনায় জগৎ আজ ধ্বংসোন্মুখ। (ধর্মকে অবহেলা ক'রে টেনে নামাতে নামাতে ইওরোপ জগতের মধ্যে ধর্মকে হারিয়ে বসেছে; ভারত ধর্মকেই পরমারাধ্য ভেবে ওপরে তুলতে তুলতে ব্রহ্মের মধ্যে জগৎকে হারিয়েছে। পাশ্চাত্য ধর্মকে—অধ্যাত্মকে যেমন আপনার ক'রে নিতে পারেনি, প্রাচ্যও তেমনি কর্মকে—অধিভূতকে নিজস্ব ক'রে তুলতে পারেনি। ইওরোপ যেমন খ্রীষ্টকে ভুলেছে, ভারতও তেমনি কৃষ্ণকে ভুল বুঝেছে। ফলে প্রত্যেকে নিজ গণ্ডিতে একান্তভাবে আবদ্ধ—কেউ-ই পরিণতি লাভ করেনি বা প্রাচীনকালে করলেও বর্তমানে তার অভাব। নবযুগে প্রয়োজন ধর্ম ও কর্মের সমন্বয়,[৩] কল্যাণকে সামনে রেখে পার্থিব ঋদ্ধি। এ দায়িত্ব ভারতবাসীর। কেন-না—যা কঠিন, সেই অধ্যাত্ম-বোধ তার আছে। তার পক্ষে পাশ্চাত্য ঋদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ ক'রে ইহজগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগতের মাঝে সেতু রচনা করা অন্যদের অপেক্ষা সহজসাধ্য।)

স্বামীজী তাই বললেন, পৃথিবীকে মুক্তির জন্যে ভারতের মুখাপেক্ষী হ'তে হবে। ভারতকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হ'লে শক্তি অর্জন করতে হবে। শক্তিহীনের কথা কেউ কানে তোলে না, কারণ শক্তিহীন কখনও শক্তিলাভের উপায় জানাতে পারে না। নিপীড়িত পৃথিবীর মনুষ্য-সমাজ ভারতের জন্যেই অপেক্ষা ক'রে আছে[৪]। অতএব এখন শক্তিই মুখ্য।

অপরাপর বাদ-বিসংবাদ তাই স্থগিত রেখে এই শক্তিচর্চার দিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে হবে। আর শিক্ষাই শক্তির মূল। শিক্ষা সকলপ্রকার অজ্ঞানকে দূর ক'রে জ্ঞান-লাভে সহায়তা করে। অতএব স্বার্থ-ঐক্য-জনিত যে সংহতি-বোধ জনসাধারণ লাভ করেছে, তাকে স্থায়ী করতে হ'লে, পাকা করতে হ'লে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করতেই হবে। ভারতীয় আপামর জনসাধারণ শিক্ষিত হয়ে উঠলে, জ্ঞানলাভ করলে, শক্তি সঞ্চয় করলে স্বীয় স্বরূপ—ভারত-সত্তা তাদের উপলব্ধি হবে। এইজন্যে শিক্ষাবিস্তারের ওপর স্বামীজী এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'সেবা'-ধর্মের মুখ্য অঙ্গ 'শিক্ষা-বিস্তার', তাও বলেছেন। 'হৃত ব্যক্তিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষাদানকেই নিম্নশ্রেণীর জনগণের একমাত্র সেবা বুঝিতে হইবে।'[৫]

অতএব পরমর্ষি বিবেকানন্দ-চিন্তিত জন-শিক্ষার মূল লক্ষ্য হ'ল দেশের জন-গণের ব্যক্তিত্বের পুনরুদ্ধার। বর্তমান সমাজে মানুষের মর্যাদা অস্বীকৃত, মানুষের মনুষ্যত্ব অবমানিত ও ব্যক্তিত্ব অবহেলিত নানা ক্ষেত্রে। এ সমাজে তাই মৌলিকতার একান্ত অভাব। আর এই মৌলিকতার অভাবই ভারতের দুর্দশার অন্যতম কারণ। লোকজন এই শিক্ষায় পেয়েছে দীর্ঘদিন ধরে যে তাদের জন্ম-কর্মের হেতু—উপরিস্থ লোকজনের সুখের যোগান দেওয়া এবং তার জন্যে জীবনপাত করা। তাতেই

৩ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—শ্রীঅরবিন্দ। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ একমত। আমাদের মনে রাখতে হবে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন স্বামীজীর শিষ্যকল্প। 'শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা' (নীরদবরণ-রচিত) দেখুন। আর বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী লেখক Romain Rollandও শ্রীঅরবিন্দকে স্বামীজীর চিন্তার উত্তরসাধক ব'লে অভিহিত করেছেন।

৪ এ বিশ্বাস পশ্চিমেরও আছে। এর প্রমাণ রোমাঁ রোলাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চরিত ও বিশ্বে ভারতীয় অধ্যাত্ম-আদর্শের ক্রমবর্ধমান প্রচার ও গ্রহণ।

৫ শিক্ষা—স্বামী বিবেকানন্দ—পৃঃ ৯৪

তাদের অমৃত-লাভ। স্তরে স্তরে এই ভাব জাতীয় জীবনে প্রকট। অতএব সেখানে বাধ্যতা, আনুগত্য আর দাসত্বে কোন পার্থক্য বা তারতম্য হয় না। দাস-বৃত্তি-নির্ভর সমাজে মৌলিকতার উন্মেষ হয় না। যে সমাজে গৃহী প্রভু গৃহস্থ চাকরের মনুষ্যত্বকে ধর্ষণ করে, কর্তৃপক্ষ কর্মচারীর স্বাতন্ত্র্যকে দলন করে, আর উচ্চনীচ-নির্বিশেষে সহচর সহচরের স্বকীয়তা অসহ্য জ্ঞান করে, সে সমাজ সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বলা চলে—সেখানে লোকে স্বাধীনতার মূল্য বোঝেও না, দেয়ও না। স্বাধীনতা জিনিসটা লোককে বিপদের দিনে তাই বার বার বুঝাতে হয়। স্বাধীনতা-রক্ষাই সেখানে দায়স্বরূপ। কেন-না ইওরোপের 'ভার্চু (Virtue) সেখানে নেই, যাকে উল্লেখ করেছেন, বীরত্ব, পৌরুষ, নির্ভীকতা ও বীর্যরূপে।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার এক মাত্র পথ—মানুষকে যথার্থ স্বাধীন মানুষরূপে শিক্ষিত ক'রে তোলা। প্রতিটি ব্যক্তি যাতে এই বোধে জাগ্রত থাকে যে, নিজেই অনন্ত শক্তির আধার—তার মধ্যেই রয়েছে সেই ঐশী শক্তির অংশ, যার বলে জগতে অতি-মানবের সৃষ্টি হয়েছে যুগে যুগে। সে নিজে যদি এই উপলব্ধিতে সচেতন হয় আর সেই শক্তির বিকাশের সাধনায় আন্তরিক প্রয়াস পায়, তবে তারও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সেই অন্তর্নিহিত শক্তির (যে নামেই তাকে অভিহিত করা হোক না কেন) পূর্ণ বিকাশ-সাধনের চেষ্টাই হ'ল শিক্ষা। এই চেষ্টা ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত উভয়তঃ। পরস্পরের সহযোগিতার ভিত্তিতে এই চেষ্টা সহজতর হয়ে ওঠে। কাউকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা নয়, কারও উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টির চেষ্টা নয়, সাধ্য ও সুযোগমত সকলের উন্নত হবার প্রয়াসে সাহায্য করা কেবল দেশের এবং জাতির নয়, সাধারণভাবে মনুষ্যত্বের সেবা করা। জনগণের মধ্যে এই ধারণার প্রচার—মুক্ত সমাজ-সৃষ্টির পরিবেশ গড়ে তুলবে

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। স্বাধীনতা-লাভের পর এই বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। জাতি-গঠনে আত্মনিয়োগকারীদের প্রতি স্বামীজীর একটি বিশেষ উপদেশ আছে। দেশের পুনর্গঠন এবং সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে নানা মত ও নানা পদ্ধতি আছে। জনসাধারণের ওপর কোন মত এবং পথ জোর ক'রে না চাপানোই ভাল। শুভাশুভ-বিচারে জনগণের অংশ-গ্রহণের সুযোগ না দিয়ে কোন বিষয় তাদের ওপর বলপূর্বক চাপানো—তা উপদ্রবেরই সামিল, যতই কেন তা কল্যাণকর মনে হোক। সে-ক্ষেত্রে লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজসাধ্য তো হয়-ই না, বরং পথ কণ্টকিত হয়। তার প্রথম ও প্রধান কারণ সেই কাজে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক সহযোগিতার পথ রুদ্ধ থাকে। তাই স্বামীজী এক্ষেত্রে প্রথমে জনমত-সৃষ্টির ওপর জোর দিয়েছেন। যাদের উদ্দেশ্যে সংস্কারাদি, তাদের কাছে যেন তা সহজে গ্রহণীয় হয়[৬]। এতে কাজের অগ্রগতি হয়তো মন্থর, কিন্তু ঈপ্সিত পরিণতি নিশ্চিত এবং পাকা। তাই যে কাজের লক্ষ্য জনসাধারণ, সেখানে যতদিন সার্থক জনমতের সৃষ্টি না হয়, ততদিন সাগ্রহে অপেক্ষা করতেই হবে। এ গণতন্ত্রের অন্যতম লক্ষণ এবং ভিত্তি—এ-কথা আমরা যেন ভুলে না যাই।

কায়মনোবাক্যে যদি গণতন্ত্রই আমাদের আদর্শ হয়—কী সমাজ জীবনে, কী রাষ্ট্র-জীবনে—তবে জাতিগঠন-কার্যে এই বিবেক-বাণীর অবারিত অনুগমন মহাপথের দ্বার উন্মুক্ত করবে। সেই পথে সর্বশ্রেণীর জনগণ ভারত-অভিপ্রায় সিদ্ধ করবে।

[সমাপ্ত]

---

৬ পত্রাবলী—'বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৪

স্বামীজীর সন্নিধানে

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী অচলানন্দ

স্বামী অচলানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম কেদারনাথ মৌলিক, পিতার নাম শম্ভুচরণ মৌলিক। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। স্বামীজী বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার ভাবধারায় আকৃষ্ট হইয়া যে কয়জন যুবক দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকে জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া কঠোর সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেন, কেদারনাথ তাঁহাদের অন্যতম। স্বামী অচলানন্দ 'কেদার বাবা' নামে পরিচিত ছিলেন।

কলিকাতা হইতে আসিয়া চারুচন্দ্র (পরে স্বামী শুভানন্দ) যখন কাশীতে উপস্থিত হইলেন, তখন কেদারনাথের সহিত পরিচিত হন। এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এই সময় কেদারনাথ পুলিস-বিভাগের কর্মচারী এবং পদোন্নতির অভিলাষী, কিন্তু অবিবাহিত। কেদারনাথের গৃহে যত ধর্মালোচনা ধ্যানধারণা প্রভৃতি চলিতে লাগিল, যুবকগণের হৃদয়ে ততই বৈরাগ্য তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল।

১৮৯৮ খৃঃ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ শুদ্ধানন্দের সহিত কাশীতে বংশীদত্তের বাগানে মাধুকরী করিয়া তপস্যারত ছিলেন। চারুচন্দ্রের সহিত স্বামী শুদ্ধানন্দের সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দ চারুচন্দ্রের বন্ধুদের আলোচনা-সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। কেদারনাথের হৃদয়ে যাঁহারা ধর্মভাব উদ্দীপিত করেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের সান্নিধ্যলাভে কেদারনাথের হৃদয়ে সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প উদিত হইল। ১৮৯৯ খৃঃ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কাশী ত্যাগ করিয়া হরিদ্বারে চলিয়া যান, কেদারনাথের বৈরাগ্য এত প্রবল আকার ধারণ করিল যে, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া এই বৎসরের শেষভাগে একদিন হরিদ্বারে নিরঞ্জন মহারাজের চরণ-প্রান্তে উপনীত হইলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ খুব প্রীত হইলেন এবং নানাভাবে তাঁহার ধর্মজীবন গঠন করিতে লাগিলেন।

১৯০০ খৃঃ কেদারনাথ জয়রামবাটী ও কামারপুকুর দর্শন করিয়া আসেন এবং প্রভূত প্রেরণা লাভ করেন। ইহার পরে তিনি কাশীতে ক্ষেমেশ্বর-ঘাটে একটি ক্ষুদ্র ঘর ভাড়া করিয়া বাস করিতেন এবং সারাদিন কাশী সেবাশ্রমে রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কিশনগড় দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্যে স্বামী কল্যাণানন্দকে সাহায্য করিতে যান।

১৯০১ খৃঃ স্বামীজী মঠে আছেন জানিয়া এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় সেবাশ্রমের কার্য হইতে অবসর গ্রহণান্তে কেদারনাথ কাশী হইতে শারদীয়া ষষ্ঠীর দিন বেলুড় মঠে আসেন। মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ স্বামীজীর সহিত কেদারনাথের সাক্ষাতের সুযোগ ঘটাইয়া দেন।

এই সময় কেদারনাথ স্বামীজীর সান্নিধ্য ও সেবাধিকার পাইয়া কৃতার্থ হন।

যদিও কেদারনাথের অনুপস্থিতিতে সেবাশ্রমের সেবাকার্যে সমূহ ক্ষতি হইতে লাগিল, —কারণ সেই সময় মাত্র কয়েকজন যুবক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই কার্য চালাইত এবং কাজও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল—তথাপি কেদারনাথ স্বামীজীর পুণ্য সান্নিধ্য-লাভের আনন্দ ও তৃপ্তি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কী এক দুর্বার আকর্ষণে মঠ হইতে কাশী প্রত্যাবর্তন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না!

তিনি মঠেই রহিয়া গেলেন এবং একাদিক্রমে প্রায় নয় মাস স্বামীজীর সেবা করিয়া ও তাঁহার বিশাল হৃদয়ের গভীর প্রেমের আস্বাদ পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া রহিলেন। এই নয় মাসের পুণ্যস্মৃতিতে তিনি সারা জীবন উদ্দীপিত ছিলেন।

১৯০২ খৃঃ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে স্বামীজী কেদারনাথকে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করিয়া 'অচলানন্দ' নাম দেন।

ইহার পরে স্বামী অচলানন্দ কাশী সেবাশ্রমের কাজেই নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার তপস্যাপূত জীবন, ভক্তি-বিশ্বাসে উজ্জ্বল সৌম্য মূর্তি ও সপ্রেম পুণ্যসঙ্গ সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তদিগকে অনুপ্রাণিত করিত। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাশী সেবাশ্রমের উন্নতিকল্পে তাঁহার অপরিসীম আগ্রহ ছিল। অচলানন্দ উত্তরাখণ্ডের তীর্থে তীব্র তপস্যায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন

১৯৩৮ খৃঃ স্বামী অচলানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীগুরু-প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ ও কাশী সেবাশ্রমের জন্য একনিষ্ঠ সাধনা করিয়া তিনি ৭১ বৎসর বয়সে ১৯৪৭ খৃঃ ১১ই মার্চ তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়া এবং অতিপ্রিয় কাশী-সেবাশ্রমেই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া ঈপ্সিতধামে মহাপ্রয়াণ করেন

মিস মুলার

মিস হেনরিয়েটা মুলার স্বামীজীর একজন ইংরেজ মহিলা-ভক্ত। আমেরিকায় সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) ভক্ত ও শিষ্যগণের শিক্ষাদান শেষ করিয়া স্বামীজী ইংলণ্ড যাইবার জন্য প্রস্তুত হন। মিস মুলার স্বামীজীকে তাঁহার অতিথি হইবার আমন্ত্রণ জানান।

মিস মুলারের সহিত স্বামীজীর পরিচয় আমেরিকাতেই হয়। স্বামীজী যখন ইওরোপ ভ্রমণে বাহির হন, মুলারও তাঁহার সঙ্গে যান। মুলারের অনুরোধে আল্পস পর্বতে সেণ্ট বার্নার্ড পাস হইতে কয়েক মাইল দূরে এক নির্জন স্থানে স্বামীজী দুই সপ্তাহ বিশ্রাম করেন।

বেলুড় মঠ স্থাপন-কার্যে মিস মুলারের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। মঠের জমি কিনিবার জন্য তিনি অর্থ সাহায্য করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহার স্মৃতি চিরদিন জড়িত থাকিবে। প্রভূতবিত্তশালিনী মিস মুলার স্বভাবতই ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার মন উদার ও দৃষ্টিভঙ্গী আধ্যাত্মিক ছিল বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। এক সময় মুলার সংসার ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন, কিন্তু স্বামীজী নিষেধ করেন এবং স্বার্থশূন্যভাবে থাকিয়া যতদূর সম্ভব লোককে সাহায্য করিতে বলেন।

ভগিনী নিবেদিতার পূর্বেই মিস মুলার ভারতে আসেন, উদ্দেশ্য ছিল—ভারতে নারী-শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা। স্বামীজী ভগিনী

নিবেদিতাকে আলমোড়া হইতে এক পত্রে লেখেন, মূলারের উপর নিবেদিতা যেন নির্ভর না করেন, তিনি যেন নিজের গায়ে দাঁড়ান। স্বামীজী ছিলেন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মিস মূলার শেষ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে পারিবেন না। মূলারের নানা সদ্‌গুণ ছিল, এই সকল গুণের স্বামীজী প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তাঁহার যে একটু কর্তৃত্বস্পৃহা ছিল, তাহা নিবেদিতার পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর হইবে ভাবিয়া স্বামীজী তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন।

সিস্টার ক্রিস্টীন

ডেট্রয়েট-বাসিনী মিস গ্রীনস্টিডেল-নাম্নী মহিলা পরবর্তী জীবনে সিস্টার ক্রিস্টীন-রূপে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজীর ভারতীয় কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃঃ ২৪শে ফেব্রুআরি আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরে তিনি স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার চিত্ত বেদান্ত-দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

স্বামীজী যখন সহস্রদীপোদ্যানে (Thousand Island Park) অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মিস গ্রানস্টিডেল ও মিসেস ফাঙ্কি ডেট্রয়েট হইতে সেখানে উপস্থিত হন এবং অন্য ভক্তদের সহিত কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া স্বামীজীর উপদেশ লাভ করেন। এই দুইজন সম্পর্কে স্বামীজী বলিতেন, 'এরাই আমার সেই শিষ্যাদ্বয়, যারা আমার সন্ধানে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে শত শত মাইল ভ্রমণ ক'রে উপস্থিত হয়েছিল।'

সিস্টার ক্রিস্টীন স্বামীজী-সম্বন্ধে তাঁহার পুণ্য স্মৃতিকথা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সহস্রদ্বীপোদ্যানে তিনি স্বামীজীর নিকট দীক্ষালাভ করেন।

১৯০০ খৃঃ স্বামীজী দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যান, সঙ্গে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। এই সময় সিস্টার ক্রিস্টীন ইংলণ্ডে গমন করেন—উদ্দেশ্য স্বামীজীর দর্শনলাভ। এই সময়েই নিবেদিতার সহিত ক্রিস্টীনের সখ্য স্থাপিত হয়।

স্বামীজী ক্রিস্টীনের ত্যাগ-বৈরাগ্যের খুব প্রশংসা করিতেন। ৬।৭।১৯০১ তারিখের পত্রে স্বামীজী ক্রিস্টীনকে লিখিয়াছিলেন, 'জগজ্জননীর কাছে আমি তোমাকে সমর্পণ করেছি। তিনি তোমাকে সর্বদা রক্ষা করবেন ও পথ দেখাবেন। আমি নিশ্চিত জানি, কোন অমঙ্গল তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না, কোন বাধা-বিঘ্ন মুহূর্তের জন্যও তোমাকে দমাতে পারবে না।' অবিচলিত ভাব ও স্বামীজীর উপর একান্ত নির্ভরতা ক্রিস্টীনের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। ক্রিস্টীন ছিলেন সদাহাস্যময়ী মধুরভাষিণী ও ধীরস্থির।

দ্বিতীয়বার আমেরিকা আসিয়া স্বামীজী সাতদিন ডেট্রয়েটে ছিলেন। ইহার পর ক্রিস্টীন স্বামী তুরীয়ানন্দের সংস্পর্শে আসেন। স্বামীজীর কাজে আত্মনিয়োগ করা ক্রিস্টীনের একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সময় ও সুযোগ হইল ১৯০২ খৃঃ।

১৯১৪ খৃঃ প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ক্রিস্টীন ভারতে নারীশিক্ষার কাজে নিবেদিতাকে সাহায্য করেন। নিবেদিতার দেহত্যাগের পর তিনি উক্ত কার্যভার গ্রহণ করেন।

১৯৩০ খৃঃ ২৭শে মার্চ আমেরিকায় এই মহীয়সী মহিলার দেহাবসান ঘটে।

স্বামী যোগানন্দ (ডাঃ স্ট্রীট)

স্বামী যোগানন্দের পূর্ব নাম ডাঃ স্ট্রীট। ডাঃ স্ট্রীটের ভোগে অনাসক্তি, ত্যাগে নিষ্ঠা এবং ধর্মজীবন-লাভে ঐকান্তিক ব্যাকুলতা দেখিয়া স্বামীজী তাঁহাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করিয়া 'যোগানন্দ' নাম দেন। স্বামীজীর অতি ভক্তিমান্ শিষ্য হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

ডাঃ স্ট্রীটের সন্ন্যাস-গ্রহণ সম্বন্ধে স্বামীজী নিউইয়র্ক হইতে ১৩ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৬, একটি পত্রে মিঃ স্টার্ডিকে জানাইতেছেন :

'আজ আর একজন সন্ন্যাসীকে তালিকা-ভুক্ত করা হ'ল। এবারের আগন্তুকটি পুরুষ; সে খাঁটি আমেরিকান এবং ধর্মপ্রচারক হিসাবে তার কিছু খ্যাতি আছে। তার নাম ছিল ডাঃ স্ট্রীট; এখন সে যোগানন্দ, কারণ যোগের দিকেই তার সব ঝোঁক।'

স্বামীজীর অপর সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যদের সম্মুখে এই চিত্তাকর্ষক সন্ন্যাস-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পত্রিকায় এ সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল : স্বামীজীর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের উপর তাঁহার প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল, ইহা তাহার একটি আশ্চর্যজনক প্রমাণ। স্বামীজী এক বৎসরের মধ্যে আমেরিকায় যে তিনজনকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই জ্ঞান ভক্তি ও ত্যাগের উজ্জ্বল নিদর্শন। ইহাতে বুঝা যায়, এই পার্থিব ভোগের দেশে অন্ততঃ কয়েক জনের ধারণা হইয়াছে যে, সত্য লাভ করিতে হইলে ত্যাগই একমাত্র পথ।

মহম্মদানন্দ

১৮৯৮ খৃঃ স্বামীজী উত্তর-ভারত সফরে বহির্গত হন এবং ১৩ই মে ভোরে নৈনিতালে পৌঁছান। এই সময় সেখানে স্বামীজীর শিষ্য খেতড়ির মহারাজা শৈলাবাসে ছিলেন। স্বামীজী সানন্দচিত্তে মহারাজার সহিত তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যদের পরিচয় করাইয়া দেন। স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ, স্বরূপানন্দ, মিসেস বুল, আমেরিকার কলিকাতা-স্থিত কনসাল জেনারেলের পত্নী মিসেস প্যাটারসন, ভগিনী নিবেদিতা এবং জোসেফাইন ম্যাকলাউড।

এখানে একজন মুসলমান ভদ্রলোকের সহিত স্বামীজীর আলাপ হয়। তিনি অন্তরে অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি স্বামীজীর অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া বলেন, 'স্বামীজী, যদি ভবিষ্যতে কেউ কখনও আপনাকে অবতার ব'লে ঘোষণা করে, তাহলে মনে রাখবেন, আমি—যে নাকি মুসলমান—সেই-ই প্রথম।' তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস স্বামীজীর অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল।

মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ নূতন তথ্য স্বামীজী তাঁহাকে বলেন। অধিকন্তু বলেন, ঐশ্লামিক দেহ ও বৈদান্তিক মস্তিষ্কের সমন্বয় ঘটিলে ভারতবর্ষ পুনরুজ্জীবিত হইবে ও জগতে সকলের পুরোভাগে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

ক্রমে এই ভদ্রলোক স্বামীজীর একজন বিশেষ ভক্ত হইয়াছিলেন এবং 'মহম্মদানন্দ' নাম গ্রহণপূর্বক নিজেকে স্বামীজীর শিষ্য-মধ্যে গণ্য করিতেন।

স্বামী সোমানন্দ

স্বামী সোমানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল কৃষ্ণমূর্তি নাইডু। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের লোক। স্বামীজী যখন প্রথমবার পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৮৯৮ খৃঃ কাশ্মীরে যান, তখন সেখানে কৃষ্ণমূর্তি স্বামীজীর দর্শন লাভ

করেন। স্বামীজীর অনন্ত ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কৃষ্ণমূর্তি সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি পরে বেলুড়-মঠে আসিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। ১৮৯৯ খৃঃ স্বামীজী কৃষ্ণমূর্তিকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়া 'সোমানন্দ' নাম দেন।

সন্ন্যাস-গ্রহণের কিছুদিন পরে সোমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা-প্রচারের জন্য দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন। মহীশূর-রাজ্যে বাঙ্গালোরে তিনি স্বামী নির্মলানন্দের সহকারী ছিলেন। বাঙ্গালোরে সোমানন্দের প্রধান কার্য ছিল কারাগারে কয়েদীদিগকে নিয়মিত ধর্মোপদেশ দেওয়া। এই কাজে তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। বাঙ্গালোর হইতে মহীশূর-রাজ্যের অন্যান্য স্থানে শাখাকেন্দ্র-স্থাপনের জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করিতে থাকেন। সোমানন্দের জীবন প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যে প্রচার-কার্যেই অতিবাহিত হয়। দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ ছিল। বহু বৎসর অক্লান্তভাবে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিয়া ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৭ খৃঃ সোমানন্দ ৬৫ বৎসর বয়সে মাদ্রাজে দেহত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিত ধামে প্রয়াণ করেন।

জ্ঞান মহারাজ

জ্ঞান মহারাজ ছিলেন স্বামীজীর দীক্ষিত শিষ্য। স্বামীজীর আদেশে তিনি আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিরূপে অতিবাহিত করেন। ১৯০১ খৃঃ তিনি মায়াবতীতে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। এই বৎসরই তিনি স্বামী বিরজানন্দের সঙ্গে পদব্রজে কেদার-বদরী তীর্থ-দর্শনে বহির্গত হন। উভয়ে নিরালম্ব ভাবে তীর্থে তীর্থে যে-ভাবে ভ্রমণ করেন, তাহা সাধুসমাজে তীর্থ-দর্শনের আদর্শরূপে পরিগণিত। এককালে এই-সব তীর্থভ্রমণের কাহিনী জ্ঞান মহারাজ চিত্তাকর্ষক ভাষায় বর্ণনা করিতেন।

তীর্থদর্শনান্তে জ্ঞান মহারাজ মায়াবতীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পরে বেলুড় মঠে আসিয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে কিছুকাল উদ্বোধন কার্যালয়ে থাকিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার কার্যে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং অল্পকাল তিনি উদ্বোধনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

মধুরস্বভাব জ্ঞান মহারাজ ছাত্রদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তিনি একাধারে তাহাদের বন্ধু উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন; যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে স্বামীজীর আদর্শ ও ভাবধারা সঞ্চারিত করিতেন। ইহার ফলে হাওড়ার খুরুট ও ব্যাঁটরায় দুইটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত জ্ঞান মহারাজ স্বামীজীর কথাই বেশী বলিতেন, ছোট ছোট পুস্তকের মাধ্যমে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ প্রচার করিতেন। তাঁহার সরল অনাড়ম্বর জীবন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। দীর্ঘকাল বেলুড় মঠে একভাবে অবস্থান করিয়া তিনি তপস্যাপূত জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। ১৯৬৩ খৃঃ ২২শে মার্চ তাঁহার মহাপ্রয়াণে স্বামীজীর সর্বশেষ শিষ্যের তিরোধান হইয়াছে

সমালোচনা

বিশ্ববিবেক : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শঙ্কর কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক : বাক্-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯। মূল্য—১০৲।

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উৎসবকে স্মরণ ক'রে যে-সব পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি একটি প্রশংসনীয় প্রকাশন। তিনজন কৃতী লেখক এই গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন।

গ্রন্থটির পরিকল্পনা সর্বাগ্রে প্রশংসার যোগ্য। চারিটি মূল অধ্যায়ে সম্পাদকবৃন্দ স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও মনীষার বৈচিত্র্যময় দিক্-গুলি নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। আত্মপরিচয়, প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে বিবেকানন্দের জীবন, মনীষী-সঙ্গমে এবং আধুনিক মননের আলোকে বিবেকানন্দ—এই চারটি বিভাগ। 'আত্মপরিচয়ে' স্বামীজীর পত্রাবলী থেকে সেরা সেরা অংশ সংকলন ক'রে তাঁর অন্তরের গভীর সত্তার পরিচয় উদ্ঘাটন করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বাল্যকাল থেকে মহাসমাধি পর্যন্ত স্বামীজীর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় তাঁর অন্তরঙ্গদের স্মৃতিকথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থের সবচেয়ে মূল্যবান্ সংযোজন 'মনীষী-সঙ্গমে' অধ্যায়টি। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মনীষীর চোখে স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় ও তাঁদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরার জন্য গ্রন্থটি অমূল্য হয়ে উঠেছে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বালগঙ্গাধর তিলক, জগদীশ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি ভারতীয় মনীষীদের বিবেকানন্দ-সম্পর্কে আলোচনা এবং ম্যাক্সমুলার, টলস্টয়, বেশান্ত প্রমুখ বিদেশী মনীষীদের সঙ্গে স্বামীজীর ব্যক্তি-গত পরিচয় বা সম্পর্কের প্রসঙ্গ এখানে স্থান পেয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের আলোচনাও এখানে সংযোজিত হয়েছে। তাছাড়া আছে আধুনিক কালের প্রখ্যাত জননেতাদের বিবেকানন্দ-সম্পর্কে ভাষণ ও রচনার অংশবিশেষ।

গ্রন্থের পরবর্তী বিভাগের নাম দেওয়া হয়েছে 'আধুনিক মননের আলোকে বিবেকা-নন্দ'। এই অধ্যায়ে বর্তমানকালীন লেখক ও প্রবন্ধকারেরা স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও মনীষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের বিষয়-নির্বাচনও প্রশংসনীয় হয়েছে। অবশ্য স্বামীজীর বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা-প্রসঙ্গে বা মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে আরও কয়েকটি রচনা থাকলে আলোচনা সর্বাঙ্গীণ হ'ত। প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধেই মননশীলতার ছাপ আছে। দিলীপকুমার রায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শোভনলাল মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ লেখকেরা স্বামীজীর মনীষার বিভিন্ন দিক্ নিয়ে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। বিবেকানন্দ-রচিত কবিতা নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন প্রণবরঞ্জন ঘোষ; সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কবি-প্রতিভার দিক্ নিয়ে এ-রকম সর্বাঙ্গীণ আলোচনা সম্ভবতঃ আগে হয়নি। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে স্বামীজীর অবদান-সম্পর্কে আলোচনা করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতের

স্বাধীনতা-আন্দোলনে স্বামীজীর দান নিয়ে আলোচনা করেছেন বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তী ও যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। বিবেকানন্দের কঠোর কর্মময় জীবনে যে হাসি ও আনন্দের স্থান কিছুমাত্র গৌণ ছিল না—এ বিষয়টি শঙ্করী প্রসাদ বসু নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। 'বক্তা ও লেখক বিবেকানন্দ' সম্পর্কে ইংরেজীতে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সমগ্র গ্রন্থটিতে একটি মাত্র ইংরেজী রচনা একটু অসঙ্গত ব'লে বোধ হয়। শঙ্কর 'বিবেক-বাণী' নামে একটি ব্যঙ্গাত্মক ক্ষুদ্র নাটিকা লিখেছেন, কিন্তু রচনাটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে ব'লে আমাদের মনে হয় না। শিল্প- ও সঙ্গীত-সম্পর্কে স্বামীজীর মতামতও এই অধ্যায়ে সংগৃহীত হয়েছে।

গ্রন্থটির শেষে আছে সুনীলবিহারী ঘোষ ও বাণী বসু সংকলিত বিবেকানন্দ-গ্রন্থপঞ্জী। এই সংযোজনটির মূল্য অসামান্য, কারণ এ ধরনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ এই প্রথম সম্পাদিত হ'ল। এতে আছে বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী ভাষায় স্বামীজী-রচিত ও স্বামীজী-সম্পর্কিত গ্রন্থের তালিকা। গ্রন্থপঞ্জীর ভূমিকাটি এ-বিষয়ে আরও অনেকখানি আলোকপাত করেছে। পাঠকেরা এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা-বোধ করবেন।

নানা দিক্ থেকে প্রশংসনীয় হলেও গ্রন্থটিতে একটি প্রমাদ-বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন। মনীষা-সঙ্গমে অধ্যায়ের পরিশিষ্ট-রূপে সম্পাদকবৃন্দ (দেশবন্ধু) চিত্তরঞ্জন দাশের একটি রচনা প্রকাশ করেছেন, রচনাটি নাকি তাঁরা পাতিপুকুর বিবেকানন্দ-সঙ্ঘের আনুকূল্যে পেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছেন। কারণ রচনাটি দেশবন্ধুর নয়, ব্রহ্মচারী চিত্তরঞ্জনের এবং ১৩৬২ সালে উদ্বোধন-পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচ্য রচনাটি তারই সামান্য হেরফের।

গ্রন্থটির ছাপা ও প্রচ্ছদপট ভালই বলা চলে, তবে মলাট-বোর্ড এবং বাঁধাই আশানুরূপ নয়। বিবেকানন্দ-অনুরাগী পাঠকদের কাছে এই গ্রন্থটি স্থায়ী সমাদর লাভ করবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

The Vedanta Kesari: Swami Vivekananda Birth Centenary Number, Vol. L, No. 4, August, 1963. D/Crown $\frac{1}{8}$, Pages 208, Price : Rs. 3/- Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras-4.

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম ইংরেজী মুখপত্র 'The Vedanta Kesari'-র স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা পাইয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-পরিচালিত এই ইংরেজী মাসিক পত্রিকাখানি বিগত পঞ্চাশ বছর যাবৎ ভারতের আধ্যাত্মিকতা, কৃষ্টি, সভ্যতা ও শিক্ষার বাহক হইয়া দেশবাসীর সেবা করিয়া আসিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনেকে বিশেষ সংখ্যা বাহির করিয়াছেন ও করিতেছেন। স্বামীজীর বহুমুখী জীবনী ও ভাবধারার বিভিন্ন দিক এইসব বিশেষ সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে, ইহা খুবই শুভলক্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কয়েকজন প্রাচীন সন্ন্যাসী এবং ভারত ও অন্য দেশের কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের সুচিন্তিত ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধ আলোচ্য শতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'Thousand Island Park' ও স্বামীজীর 'Inspired Talks' সম্বন্ধে নূতন তথ্য-সম্বলিত দুইটি প্রবন্ধ এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনের মনোজ্ঞ চিত্র-

সমন্বিত লেখাটি এই সংখ্যার বৈশিষ্ট্য। বহু চিত্র-সমন্বিত এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া সম্পাদক ও প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই মনোরম সংখ্যা-খানি জনসাধারণকে পাঠ করিবার জন্য আমরা অনুরোধ জানাইতেছি। ইহা পাঠ করিলে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন। প্রচ্ছদপটটি আরও সুন্দর হইলে সুখী হইতাম।

জয়যাত্রা (নাটক)—শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (নটরাজ)। প্রকাশক: শ্রীঋতেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ২১, বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ৮৬+২২; মূল্য ২৲।

ভাব ও আদর্শের সংঘাতে যখন বর্তমান যুবশক্তি দিশাহারা, তখন নাটকের মাধ্যমে স্বামীজীর ভাবাদর্শের রূপায়ণ-প্রচেষ্টা অভি-নন্দনযোগ্য। তবে স্থানে স্থানে যে তরল চিত্র অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা আমরা সর্বতোভাবে অনুমোদন করিতে পারি না। ছাত্রসমাজে নূতন ভাবধারা প্রবাহিত করিতে পারিলে ভালোই। বর্তমান ভাঙনের মুখে গঠনমূলক প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। নাটকটির উদ্বোধনের জন্য যে 'মহাবট' কবিতাটি আছে, ভাব ভাষা ও বলিষ্ঠতার জন্য তাহা আবৃত্তির খুবই উপযোগী।

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। প্রকাশক: স্বামী সন্তোষানন্দ, সক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১২৮; মূল্য ১ টাকা ৮০ ন. প.; বোর্ড বাঁধাই ২৲।

বেদান্তের মধ্যেই ধর্মের মূলতত্ত্ব নিহিত। গল্পের মাধ্যমে ধর্মের উচ্চভাব সহজেই জন-সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়। ধর্মের মূল তথ্যসমূহ যাহাতে গল্পচ্ছলে জনসাধারণকে শেখানো যায়, সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার দেশের বিভিন্ন ভাষায় গল্প-পুস্তক-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। উহাতে অংশগ্রহণের জন্য আলোচ্য পুস্তকটি রচিত হয়। সুখের বিষয় বিচারকদের মতে যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় পুস্তকটি ভারত সরকারের পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

'বক ভস্ম করা', 'ধর্মব্যাধ', 'কৃষ্ণার্জুন', 'জনক ও শুকদেব', 'নচিকেতার উপাখ্যান', 'আচার্য শঙ্কর ও চণ্ডাল', 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুভূতি', 'মদালসা', 'দড়ি দেখে সাপ ভাবা', 'চাষীর স্বপ্নকথা', 'ইন্দ্র-বিরোচন', 'জাবাল সত্যকাম', 'যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী' প্রভৃতি গল্প এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

ভূমিকাটি সুলিখিত, আমরা আশা করি জনসাধারণ এই পুস্তক পাঠে-বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন।

পুণ্যতীর্থ ভারত—স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। প্রাপ্তিস্থান—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। পৃষ্ঠা ৩৪৪; মূল্য ১০৲ টাকা

অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার—দুর্বার আকর্ষণ যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষকে অভ্যস্ত পরিবেশের মধ্য থেকে টেনে আনে—পথে, প্রান্তরে, প্রবাসে। মানুষ চায় নূতনত্বের আস্বাদ—চলার পথে নব উন্মাদনা, জীবনকে নানাভাবে উপভোগের প্রেরণা।

আলোচ্য গ্রন্থটি এই চলার পথে এক নব দিগ্‌দর্শন। লেখক স্বামী দিব্যাত্মানন্দ আসমুদ্র হিমাচল পর্যটন ক'রে তাঁর বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা পরিবেশন করেছেন—স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল ভাষায়। জনপদের ভৌগোলিক বিবরণ, স্থানীয় সামাজিক রীতি-নীতি, শিল্প প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ থাকায় ভ্রমণকাহিনীগুলি হয়েছে সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক। ইহা ব্যতীত

সমগ্র ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে আর একটি ভাবধারা অনুস্যূত থাকতে দেখি—তা ভারতের ধর্ম, ভারতের কৃষ্টি। ঐতিহ্যময় ভারতের তীর্থাদির সঙ্গে যে ভারতের সাধনা, ভারতের ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তার বিস্তারিত আলোচনা ভ্রমণকাহিনীকে করেছে সজীব, প্রাণবন্ত। শাস্ত্র, পুরাণ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে তীর্থমাহাত্ম্যের যোগাযোগ-স্থাপন পুস্তকটির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিশেষ ক'রে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির শিল্পকলা যে আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যেরই মূর্তপ্রকাশ, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদ ব্যাখ্যা আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখকের একটি মৌলিক অবদান। তীর্থমাহাত্ম্য জেনে ধর্মভাবে ভাবিত হয়ে তীর্থপর্যটনে বাহির হ'লে যে যথার্থ ফল পাওয়া যায়, তা সর্বজনবিদিত। সুতরাং এদিক দিয়ে এ-জাতীয় ভ্রমণকাহিনীর জন্য লেখক আপামর সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

আলোকচিত্রগুলি গ্রন্থের শোভাবর্ধন করেছে। তবে সেগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হলেই আরও ভাল হ'ত ব'লে মনে হয়। আমরা পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

—অমরেন্দ্রনাথ বসাক

রাস-পঞ্চাধ্যায়ী—শ্রীরামেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকার, ২৫এ দেশপ্রিয় নগর, পালপাড়া, কলিকাতা ৫০; পরিবেশক—ওরিয়েণ্ট্যাল বুক কোম্পানী, ৫৬, সূর্যসেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ১৫৮; মূল্য—২.৫০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯শ অধ্যায় হইতে ৩৩শ অধ্যায় পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য এই পাঁচটি অধ্যায়কে 'রাস-পঞ্চাধ্যায়ী' বলে। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা অতি গভীর ও মাধুর্যময়। মন সম্পূর্ণরূপে কামগন্ধহীন ও বিশুদ্ধ না হইলে এই নিষ্কাম মধুর প্রেমের আস্বাদন ও উপলব্ধি সম্ভব নয়। সাধারণের ইহাতে কোন অধিকার নাই। ইহা অলৌকিক লীলা—যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া ভগবান্ এই লীলা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী তনু; রাসলীলার সময় তিনি কাহারও মতে আট বৎসরের, কাহারও মতে নয় বৎসরের, কাহারও মতে এগার বৎসরের বালক। যোগেশ্বর কৃষ্ণ গোপ-গোপীদের মধ্যে সর্বব্যাপক আত্মাকে দর্শন করিতেন আর তাঁহার দর্শন ও স্পর্শনমাত্রেই গোপীদের ব্রহ্মানুভূতির বিমল আনন্দ হইয়াছিল। ইহাই রাসলীলার তাৎপর্য। প্রকৃতপক্ষে

'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥'

ভাগবত বলিয়াছেন—এই রাসক্রীড়া শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ও পাঠ করিলে ভগবানে পরমা ভক্তি লাভ হয় এবং কামক্রোধাদি রিপুগুলি সমূলে উৎপাটিত হয়। টীকাকার শ্রীধরস্বামী এই লীলাকে 'কামবিজয়' বলিয়াছেন। রাসলীলার এই নিগূঢ় তত্ত্বটি সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার মনে স্পষ্টভাবে ও দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার জন্য গ্রন্থকার শ্রীধরস্বামীর টীকা অনুযায়ী শ্লোকগুলির বিশদ বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ছাপা সুন্দর ও ভুল-প্রমাদহীন হইয়াছে। রাসলীলা-রহস্য জানিবার জন্য শুদ্ধমনে গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আমাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইবে।

—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

শতবার্ষিকী উপলক্ষে নূতন প্রকাশন

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি পাইয়াছি :

সন্দীপন (১৯৬৩)—বিবেকানন্দ-শতবর্ষ-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। প্রকাশক : সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ। পৃষ্ঠা : বাংলা—২৪৭, ইংরেজী—১২৬।

ফাল্গুনী (১৯৬৩)—স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা, রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক বহুমুখী বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা। প্রকাশক : ঐ সম্পাদক। পৃষ্ঠা : বাংলা—১৪৮, ইংরেজী—৬৭, হিন্দী—২৪।

বিবেকানন্দ-স্মরণিকা — প্রকাশক : সাধারণ সম্পাদক, স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব-সমিতি, ৪০ রামকৃষ্ণ রোড, রিশড়া, হুগলি। পৃষ্ঠা ১৩০ ; মূল্য ২৲।

স্বামী বিবেকানন্দ-শতবর্ষ-স্মরণী (১৯৬৩)—প্রকাশক : সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বরাহনগর, কলিকাতা ৩৬। পৃষ্ঠা ১০০।

বিবেকানন্দ-জয়ন্তী-সংখ্যা--প্রকাশক : কুমুদকুমারী সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়, পোঃ ঝাড়গ্রাম, জেলা মেদিনীপুর। পৃষ্ঠা ৯২।

নৈবেদ্য (বিবেকানন্দ-জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে)—প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, গোলাঘাট, বারাকপুর, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৮৭।

চরৈবেতি (১৯৬৩)—স্বামী বিবেকানন্দ-শতবর্ষ-জন্ম-জয়ন্তী প্রকাশনী। প্রকাশক : সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা ৬২

বিদ্যাপীঠ—বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষপূর্তি-সংখ্যা। প্রকাশক : রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর (সাঁওতাল পরগণা) পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)। পৃষ্ঠা ১০৪ + ৪৬।

ত্রয়ী (১৯৬৩)—স্বামী বিবেকানন্দ-জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা। প্রকাশক : অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা : বাংলা—৪৮ ; ইংরেজী—৮২।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকা—প্রকাশক : ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৮।

হামারী মিলন-ভূমি (হিন্দী)—স্বামী বিবেকানন্দ। প্রকাশক : মন্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ-জন্ম-শতবার্ষিকী মহোৎসব-সমিতি, মথুরা-বৃন্দাবন, ইউ. পি.। পৃষ্ঠা ৫৬ ; মূল্য ১৲।

বিবেকানন্দ-বাণী (হিন্দী—পকেট সাইজ)—প্রকাশক : মন্ত্রী, বিবেকানন্দ-জন্ম-শতী-জয়ন্তী সমিতি, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী ১। পৃষ্ঠা ৬৭।

বারাণসী মেঁ স্বামী বিবেকানন্দ (হিন্দী) —প্রকাশক : মন্ত্রী, বিবেকানন্দ-জন্মশতী জয়ন্তী সমিতি, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী ১। পৃষ্ঠা ১৮ ; মূল্য ৭৫ ন. প.।

Swami Vivekananda (A short life and teachings)—Published by the Secretary, Swami Vivekananda Centenary Committee, Shillong, Assam. Pp. 32 ; Price 15 nP.

স্বামী বিবেকানন্দ (সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাণী)—প্রকাশক : সেক্রেটারি, স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটি, রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং। পৃষ্ঠা ২৭ ; মূল্য ১০ ন. প.।

স্বামী বিবেকানন্দ (অসমীয়া ভাষায় সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাণী)—প্রকাশক : সেক্রেটারি, স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকা

কমিটি, রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং। পৃষ্ঠা ৩২; মূল্য ১৫ ন. প.।

কর্মযোগ (অসমীয়া)—স্বামী বিবেকানন্দ। প্রকাশক: সেক্রেটারি, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, শিলং। পৃষ্ঠা ১৫২; মূল্য ১'৫০ ন. প.।

Vivekananda Indake Agana (in Garo language) Published by the Secretary, Ramakrishna Mission, Shillong Pp. 129; Pocket size, Price 40 nP.

Kumne Ula Kren U Vivekananda (in Khasi language)—Published by the Ramakrishna Mission, Shillong. Pp. 96; Pocket size, Price 40 nP.

স্বামী বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ লিখিত ও সঙ্কলিত। প্রকাশক: সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)। পৃষ্ঠা ৪০; মূল্য ২৫ ন. প.।

চিরু বরগলাথু বিবেকানন্দর—ছোটদের বিবেকানন্দ (তামিল ভাষায়)—স্বামী নিরাময়ানন্দ। প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ। পৃষ্ঠা ৭২; মূল্য ৫০ ন.প.।

বালালা বিবেকানন্দুডু (ঐ—তেলুগু ভাষায়)। প্রকাশক: ঐ। পৃষ্ঠা ৫৬। মূল্য ৫০ ন. প.।

বাচিয়াঁ দে বিবেকানন্দ (ঐ—পঞ্জাবী ভাষায়)। প্রকাশক: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নঈ দিল্লী। পৃষ্ঠা ৬২; মূল্য ৮০ ন. প.।

বেদমূর্তি-শ্রীরামকৃষ্ণঃ (সংস্কৃত)—স্বামী অপূর্বানন্দ। প্রকাশক: স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, সেক্রেটারি, স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী, ১৬৩ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ১৪। পৃষ্ঠা ২৯৯; মূল্য ৩৲।

যুগাচার্য বিবেকানন্দ—স্বামী তেজসানন্দ। প্রকাশক: ঐ। পৃষ্ঠা ১৪৩; মূল্য ২'৫০ ন.প.।

যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ (হিন্দী)—স্বামী অপূর্বানন্দ। প্রকাশক: ঐ। পৃষ্ঠা ২৮২; মূল্য ২'৫০ ন.প.

Swami Vivekananda Birth Centenary Souvenir : Published by General Secretary, Sri Sarada Math, Dakshineswar, P. O. Ariadaha, 24 Parganas. Pp. 95.

অভীঃ—স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষজয়ন্তী সংখ্যা। প্রকাশক: সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৮৮ + ৭৭।

বীর বিবেক (কবিতায় স্বামীজীর জীবন-কথা)—শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ। প্রকাশক: শ্রীপ্রশান্ত ঘোষ, ৫২ হালদারপাড়া রোড, কলিকাতা ২৬। পৃষ্ঠা ১১২; মূল্য ৩৲।

গল্পে বিবেকানন্দ—ডাঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত। প্রকাশিকা: শ্রীমতী বাণী সেনগুপ্ত, ৫।২ রায় জে. এন. রায়বাহাদুর রোড, বালি, হাওড়া। পৃষ্ঠা ১৩৮; মূল্য ১'২৫ ন.প.।

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী ও বৈদিক সাধনার বহিরভিযান—শ্রীশ্রীনাথ ভট্টাচার্য। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পঞ্চখণ্ড (জিলা শ্রীহট্ট) হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৬; মূল্য ৬২ ন.প.।

উপদেশামৃত (সংসারীদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী)—প্রেমানন্দ ও এম. আহম্মদ। প্রকাশক: এম. আহম্মদ, প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়, ৩২জি আজিমপুর স্টেট, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৫২; মূল্য ৫০ ন.প.।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-শতক (পকেট সাইজ)—প্রকাশক: কর্ম-সচিব রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কাটিহার, জেলা পূর্ণিয়া, বিহার। পৃষ্ঠা ১৪; মূল্য ১২ ন.প.।

Swami Vivekananda in Germany, 1896—Published by German-Indian Associations, Calcutta. Pp. 12.

Vivekavani—Swami Vivekananda Birth Centenary (1963). Published by: Viveka Sadhane Sangh, Sri Ramkrishna Vidyarthi Mandiram, Gavipuram, Bangalore 19. Pp. 82.

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী

কেন্দ্রীয় কমিটি-বিজ্ঞাপিত সমাপ্তি-অনুষ্ঠানের কার্যসূচী

স্থান ঃ পার্ক সার্কাস ময়দান

		অপরাহ্ণ		সন্ধ্যা ও রাত্রি
১৬ই	ডিসেম্বর '৬৩	প্রদর্শনী উদ্বোধন	...	সবাক্ চিত্র ঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণ'
১৭ই	...		...	যাত্রাভিনয় ঃ 'ঝান্সীর রাণী'
১৮ই	...		...	,, 'চণ্ডীমঙ্গল'
১৯শে	...	ছাত্র-সম্মেলন	...	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
২০শে	...	,,	...	,,
২১শে	...	,,	...	,,
২২শে	...		...	নিখিল ভারত সঙ্গীত-সম্মেলন
২৩শে	...		...	,,
২৪শে	...		...	,,
২৫শে	...	মহিলা-সম্মেলন	...	,,
২৬শে	...	,,	...	স্বামীজীর গীতি-আলেখ্য
২৭শে	...	,,	...	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
২৮শে	...	,,	...	স্বামীজীর লীলাগীতি
২৯শে	...	ধর্মসম্মেলন	...	
৩০শে	...	,,	...	সবাক্ চিত্র ঃ 'স্বামীজী'
৩১শে	...	,,	...	রামায়ণ-গান
১লা জানুআরি, '৬৪		,,	...	'ভারত-বিবেকম্' সংস্কৃত-নাটক
২রা	...	,,	..	'রাণী রাসমণি' অভিনয়
৩রা	...	,,	.	'গুরুশিষ্য-সংবাদ' ,,
৪ঠা	...	,,	.	'মহাউদ্বোধন' ,,
৫ই	...	,,	...	অভিনয়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ : গত ২১শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর) শনিবার শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ ১১১ তম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারা-দিন ব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। নাটমন্দিরে কালীকীর্তন হয়। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ (সভাপতি), নিরাময়ানন্দ ও অজজানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি : কলিকাতা বাগ-বাজার পল্লীর যে বাড়িতে শ্রীশ্রীমা জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন, পুণ্য-স্মৃতিবিজড়িত সেই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব মহা উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা, ভোগরাগ, ভজন ও প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। সহস্র সহস্র ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। ২,০০০ নর-নারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে শ্রীশ্রীকালীকীর্তন হয়।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী

মায়াবতী (হিমালয়) **:** অদ্বৈত আশ্রমের উদ্যোগে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৩১শে মে লোহাঘাটে এবং ১লা জুন চম্পাবতে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। লোহাঘাটে আয়োজিত দুইটি সভায় সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর রামদাস সভাপতিত্ব করেন। চম্পাবতের সভায় লোহাঘাটের মহকুমা-শাসক শ্রীরাজেন্দ্র-কুমার সভাপতি হইয়াছিলেন। স্বামী চিদাত্মানন্দ ও একাত্মানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে ভাষণ দেন।

চণ্ডীগড় : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৭শে জানুআরি হইতে ১১ দিনব্যাপী স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। স্বামীজীর জীবন-কাহিনী, পত্র ও উপদেশাবলী-সমন্বিত পঞ্জাবী ভাষায় একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। ২০শে জানুআরি পঞ্জাবের রাজ্যপাল উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। মাননীয় রাজ্যপাল পুস্তক-প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও স্বামীজীর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

পঞ্জাবের অনেক স্কুল ও কলেজে এবং নিম্নলিখিত স্থানসমূহে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় :

জলন্ধর, ফিরোজপুর, পাঠানকোট, অম্বালা, জিন্দ, ফরিদকোট, নীলোখেরী, কুরুক্ষেত্র (বিশ্ববিদ্যালয়), রোটক, গুরুদাসপুর, গুরগাঁও, ধর্মশালা, সিমলা।

জামতাড়া (সাঁওতাল পরগনা) **:** শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৫ই নভেম্বর শুক্রবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে উক্ত আশ্রমে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্যে ৫০০ দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো হয় এবং তাহাদের মধ্যে ১০৮ খানা নূতন ধুতি ও শাড়ী বিতরণ করা হয়।

স্বামীজী কে—তাহারা জানে না, কিন্তু অনশনক্লিষ্ট অর্ধনগ্ন এই নরনারীগণের মুখের কৃতজ্ঞতা-মিশ্রিত প্রসন্নতায় তাহাদের দুঃখে কষ্টে যে একজন দরদী আছেন, ইহা বেশ প্রকাশ পায়। শতবর্ষপূর্তির নিদর্শনস্বরূপ

সন্ধ্যায় শতপ্রদীপ দানের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

কার্যবিবরণী

কানপুর ঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ১৯২০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা-বিস্তার ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা এই কেন্দ্রের প্রধান কর্মধারা। এপ্রিল '৬২—মার্চ '৬৩ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতিদিন পূজা উপাসনা, রবিবারে ধর্মালোচনা এবং সাময়িক উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

আশ্রম-পরিচালিত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৬০৬ ছাত্র ছিল। ছাত্রদের লেখাপড়া ও স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র—সব দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়।

স্কুল-লাইব্রেরিতে ৬,০০০ বই আছে, ৩,৪১৯ বই পড়িবার জন্য দেওয়া হয়।

চিকিৎসা-বিভাগে মোট ১,৪৮,৬৫৭ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৮০% নারী ও শিশু। অস্ত্র-চিকিৎসা ও ইঞ্জেকশন যথাক্রমে ৫৬৩ ও ১৫,০৯১।

রাঁচি ঃ রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা-আরোগ্য-ভবনের কার্যবিবরণী (এপ্রিল '৬১—মার্চ '৬২) প্রকাশিত হইয়াছে। এই স্যানাটোরিয়ামটি রাঁচি হইতে ১০ মাইল দূরে রাঁচি-চাইবাসা রোডের পার্শ্বে অবস্থিত। স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক পরিবেশে ২,১০০ ফুট উচ্চতায় প্রায় ২৮৯ একর-পরিমিত অরণ্যময় ভূখণ্ডের উপর আরোগ্য-ভবন গড়িয়া উঠিয়াছে। বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন ও জলাধারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এখানে দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগের ফুসফুস-অস্ত্রোপচার-সহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থাদি আছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত আছেন। ইহা ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট যক্ষ্মা-কেন্দ্র।

১৯৫১ খৃঃ ৩২টি শয্যা লইয়া এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়। ১৩টি কেবিন ও ১৩টি কটেজসহ বর্তমানে মোট শয্যা-সংখ্যা ২০৫, তন্মধ্যে ৩২টি ফ্রি। আলোচ্য বর্ষে আরোগ্য-ভবনে মোট ৫৩৬ জন রোগী চিকিৎসিত হয়, ইহার মধ্যে ৩৩৬ রোগী নূতন ভরতি হয়, বাকী ২০০ জন পূর্ব হইতেই ছিল। ৩৪৮ জন আরোগ্য লাভ করিয়া হাসপাতাল হইতে চলিয়া যায় ৮৪ জন রোগী ফ্রি এবং ১৯ জন আংশিক ব্যয়ে চিকিৎসিত হয়।

যক্ষ্মারোগের কবল হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত সুস্থ কয়েকজন আগ্রহশীল ব্যক্তিকে স্যানাটোরিয়ামে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

মাঙ্গালোর ঃ ১৯৪৭ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত মঠ-কেন্দ্রটি ১৯৫১ খৃঃ মঙ্গলাদেবী রোডে অবস্থিত নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এখানে দৈনিক পূজা ভজন ও সাময়িক উৎসবাদি এবং প্রতি সপ্তাহে আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে ধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা আছে। আশ্রম-পরিচালিত গ্রন্থাগারটির জনপ্রিয়তা বর্ধিত হইতেছে, পাঠক-সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে বিবিধ কার্যসূচী রূপায়িত করা হইতেছে, তন্মধ্যে বিদ্যার্থীদিগের জন্য ভবন-নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

রেঙ্গুন : রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি সমগ্র ব্রহ্মদেশে সুপরিচিত। ১৯৬২ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত সোসাইটি-পরিচালিত বিভিন্ন কর্মের পরিচিতি :

সোসাইটির গ্রন্থাগারে ৭টি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ৩৮,৬৯৫ গ্রন্থ আছে। আলোচ্য বর্ষে ৪০,৩৫৮ পুস্তক পঠনার্থে প্রদত্ত হয়। পাঠাগারে ইংরেজী, বাংলা, বর্মী, হিন্দী, গুজরাতী, তামিল, উর্দু ভাষায় ২৮টি দৈনিক ও ১২৫টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়।

গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যার তুলনা :

বর্ষ	১৯৫৮	'৫৯	'৬০	'৬১	'৬২
পাঠক	২২৫	৩২৫			

গীতা, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ও মহাপুরুষ-বাণী অবলম্বনে ৩৪৩টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, শ্রোতৃ-সংখ্যা গড়ে ৩০। ২৯টি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হইয়াছিল। সপ্তাহে তিন দিন বর্মী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণের জন্মদিনগুলি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

জামসেদপুর : বিবেকানন্দ সোসাইটির ৪১তম বর্ষের (এপ্রিল '৬১-মার্চ '৬২) কার্য-বিবরণীতে প্রকাশ : এই কেন্দ্র কর্তৃক ৫টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (২টি বালিকাদের) ৫টি মিডল স্কুল, ২টি উচ্চ প্রাথমিক, ১টি নিম্ন প্রাথমিক—মোট ১৩টি বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে খেলাধূলা ও স্বাস্থ্যচর্চার সুব্যবস্থা আছে। ১৯৬১ খৃঃ বিদ্যালয়গুলিতে মোট ৪,২৯৫ ছাত্র ও ৩,৫৪৪ ছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে।

ছাত্রাবাস-দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে ৩৫ জন (৩ জন ফ্রি) ছাত্র ছিল। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য প্রধান গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৩,১৮০। পাঠাগারে ৩টি দৈনিক, ৪টি সাপ্তাহিক ও ১৭টি মাসিক পত্রিকা লওয়া হইয়াছে। ১১টি স্কুল-লাইব্রেরির মোট পুস্তক-সংখ্যা ১৯,৫৫০।

আলোচ্য বর্ষে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র। কেন্দ্রাধ্যক্ষ : স্বামী নিখিলানন্দ; সহকারী : স্বামী বুধানন্দ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ধ্যান এবং গীতা উপনিষৎ ও শ্রীরাকৃষ্ণ-কথামৃতের ক্লাস যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

জানুআরি, ৬৩ : মৌনের সৃজনী শক্তি, ঈশ্বরানুভূতির সাধনা; স্বামী বিবেকানন্দ : ভারত ও আমেরিকা; মানসিক শক্তি-লাভের উপায়।

ফেব্রুআরি : ইচ্ছশক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায়; শক্তি ও সাহসিকতার অনুশীলন; সংসারের কর্তব্য ও আধ্যাত্মিক জীবন; মন পবিত্র করা।

মার্চ : শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমানের ধর্ম; বিচার করিও না, তোমারও বিচার হইবে; যোগের নীতি; ঈশ্বরে শরণাগতি; দুঃখে প্রার্থনার শক্তি।

এপ্রিল : জগৎকে ভোগ কর, কিন্তু কি ভাবে? মৃত্যুই কি পরিসমাপ্তি? অমরত্ব; ঈশ্বরকৃপা; মানসিক স্থৈর্য কিভাবে লাভ করিতে হয়।

মে : করুণাবতার বুদ্ধ; আমরা কিরূপে ঈশ্বরে মন সন্নিবেশ করিতে পারি; মুক্তিদাতা কে? বীরের পথ—আত্মত্যাগের পথ।

জুন-জুলাই : স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি? ঈশ্বর-সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা; অন্তরের দ্বন্দ্বের সহিত কিভাবে যুঝিতে হইবে? ধর্মমত ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি; ঈশ্বরের করুণা; মানুষ কি বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন অথচ আধ্যাত্মিক হইতে পারে?

বক্তৃতা-সফর

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ আহূত হইয়া নিম্নলিখিত স্থানসমূহে শতবার্ষিক উৎসবে স্বামীজী-সম্বন্ধে ভাষণ দেন (১১ই মে হইতে ২৯শে নভেম্বর পর্যন্ত) :

শিশু পাঠশালা, শোভাবাজার, কলিকাতা ; বড় বাজিতপুর বালিকা-বিদ্যালয় ; এয়ার পোর্ট ক্লাব, দমদম ; রুরকেলা স্কুল-হল ; হিলারি ইনস্টিট্যুট, কলিকাতা ; ডিব্রুগড় ; তিনসুকিয়া ; মার্গারিটা ; ধুলিয়ান ; ডিগবয় ; জয়রামপুর (আসাম) ; মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ; রানীগঞ্জ ; কলিকাতা জি. পি. ও. কম্পাউণ্ড ; রামকৃষ্ণ ইনস্টিট্যুট অব্ কালচার, কলিকাতা ; দুর্গাপুর ; আলমোড়া ; বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম ; নাকতলা রামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রম ; বিবেকানন্দ-হল, বোম্বাই ; প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা ; হুগলি বিবেকানন্দ-হল ; বিশপস্ কলেজ, শ্রীনগর : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা-সদন ; টেগোর মেমারিয়েল হল ; নারায়ণ মঠ ; শীতল বাগ ; কাশ্মীর অনন্তনাগ সরকারী মহাবিদ্যালয় ; হাইকোর্ট লিকুইডেটরস্ অফিস, মিশন রো, কলিকাতা ; বলরাম-মন্দির, কলিকাতা ; ভোলানাথ কলেজ, বালিগঞ্জ ; বাগবাজার বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটি, কলিকাতা ; গয়া টাউন-হল ; মগধ বিশ্ব-বিদ্যালয় ; বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা ; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ; বোম্বাই আশ্রম ; বারাণসী সেবাশ্রম ; চন্দননগর গবর্নমেণ্ট কলেজ ; আসানসোল কলেজ ; অন্নপূর্ণা-মন্দির, কলিকাতা ; নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ; বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ; নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা ; কাশীপুর গানশেল ফাক্টরি ; দেশপ্রাণ শাসমল পার্ক, কলিকাতা ; আজাদ ময়দান, বোম্বাই ; নিউ দিল্লী ; খেতড়ি ; তরুণ ব্যায়াম সমিতি, বাগবাজার ; হাজারিবাগ ; বেলঘরিয়া ; মোগলসরাই ; পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ; অশোকনগর সারদা সেবা-সঙ্ঘ (হাবড়া) ।

স্বামী নৈষ্ঠিকানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্বামী নৈষ্ঠিকানন্দ গত ৬ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৫টা ১০ মিনিটের সময় কালাডি শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈত আশ্রমে ৭১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি রক্তচাপে ভুগিতেছিলেন এবং গত তিন মাস যাবৎ শয্যাশায়ী ছিলেন। ১৯২১ খৃঃ তিনি ত্রিবান্দ্রম আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৩ খৃঃ স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামী নৈষ্ঠিকানন্দ অত্যন্ত সরল ও অমায়িক প্রকৃতির সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

স্বামী মেধানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখিত চিত্তে আরও একজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি। কাশী অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী মেধানন্দ গত ১২ই নভেম্বর বেলা ৮টা ৫০ মিনটের সময় বারাণসীধামে ৭৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়া শ্রীবিশ্বনাথ-চরণে মিলিত হইয়াছেন। ১৯২২ খৃঃ তিনি বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৫৫ খৃঃ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। স্বামী মেধানন্দ স্মৃতিশাস্ত্রে ও পূজাপদ্ধতিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং কঠোর ও নৈষ্ঠিক জীবন যাপন করিতেন।

ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

বিবিধ সংবাদ

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উৎসবের শোভাযাত্রা

স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিক সমাপ্তি-উৎসবের উদ্বোধন-দিবস গত ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিক কমিটির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি এবং স্বামীজীর বিভিন্ন প্রতিকৃতি সহ দুইটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাহির হয়--একটি উত্তর কলিকাতার দেশবন্ধু পার্ক হইতে ও অন্যটি দক্ষিণ কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্ক হইতে। উভয় শোভাযাত্রা বেলা ১টার সময় বাহির হয়। উত্তর কলিকাতার প্রায় দশ সহস্র নর-নারী ও বালক-বালিকার একমাইল-ব্যাপী বর্ণাঢ্য শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা শ্যামবাজারের মোড় হইয়া বিধান সরণি দিয়া বিবেকানন্দ রোড ধরিয়া চিত্তরঞ্জন এভেন্যু দিয়া বেলা ৪টায় ময়দানে মনুমেণ্টের পাদদেশে উপস্থিত হয়। দক্ষিণ কলিকাতার অনুরূপ শোভযাত্রাটিও একই সময়ে বাহির হইয়া রাসবিহারী এভেন্যু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড দিয়া আসিয়া প্রায় একই সময়ে ময়দানে মিলিত হয়। মহা-নগরীর রাজপথ এক অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করে। সুসজ্জিত শোভাযাত্রা-দুইটি যখন রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তখন শত-সহস্রকণ্ঠে স্বামীজীর জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ফেস্টুনে ও পোস্টারে স্বামীজীর তেজোগর্ভ সঞ্জীবনী বাণী-গুলি পথিপার্শ্বস্থ দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। বেদপাঠ, ভজন ও বাগুবাগ্যে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়সমূহের বহুসংখ্যক বিদ্যার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তনের বহু সভ্য-সভ্যা, ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণ উক্ত শোভাযাত্রা-দুইটিতে অংশ গ্রহণ করেন।

মনুমেণ্টের পাদদেশে সমবেত বিরাট জন-সভায় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখো-পাধ্যায় যুবসম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন: স্বামীজীর বাণী যেন ভারতবাসী কার্যে পরিণত করে। স্বামীজীর বাণী উচ্চারণ করিয়া আমরা যেন মনে-প্রাণে বলিতে পারি, 'ভারতবাসী আমার ভাই,' 'ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ

স্বামীজীর শতবার্ষিকী

বাগবাজার: উত্তর কলিকাতা বিবেকানন্দ জন্ম-শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব কমিটির উদ্যোগে নেবুবাগান পল্লীতে (১২।১এ, পশুপতি বোস লেন) গত ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে সপ্তাহব্যাপী স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বামীজীর জীবনালেখ্য-প্রদর্শনী, প্রবন্ধ-ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা, ব্যায়াম-প্রদর্শনী, রামায়ণপাঠ, গীতি-আলেখ্য, 'শ্রীরামকৃষ্ণ'-যাত্রাভিনয়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ভজন, চলচ্চিত্র-প্রদর্শন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

বিভিন্ন দিনের সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅশোক সেন, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি।

জম্মু ও কাশ্মীর: গত ১২ই ও ১৭ই জানুআরি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসদনে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব বিশেষ কার্যসূচী

অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে স্থানীয় সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। উর্দুতে স্বামীজীর বাণীসহ একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত প্রকাশিত হইতেছে।

উত্তর কর্ণাটক: শতবার্ষিক উৎসবের অঙ্গ-হিসাবে স্বামীজীর ভাবপ্রচারের জন্য বক্তৃতা-সফরের আয়োজন করা হয়। গত ৩০শে জুন হইতে ৮ই জুলাই বিভিন্ন স্থানে রোটারি ক্লাব, স্কুল-কলেজ এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত ২৩টি সভায় স্বামী আদিদেবানন্দ ও শাস্ত্রানন্দ বক্তৃতা দেন।

গোয়ালিয়র: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৭ই জানুআরি পূজা ও ভজন-কীর্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গোয়ালিয়রের মহারানী স্বামীজীর প্রতিকৃতি মাল্য ভূষিত করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। গোয়ালিয়র পৌর প্রতিষ্ঠান শহরের একটি প্রসিদ্ধ রাজ-পথের নাম 'বিবেকানন্দ মার্গ' রাখিয়াছেন।

অশোকনগর (হাবড়া): সারদা-সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৮শে নভেম্বর হইতে চার দিন স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব বিশেষ আনন্দ-সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। পূজা, পাঠ, আলোচনা, প্রদর্শনী, ধর্মসভা, ছায়াচিত্র-প্রদর্শন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। বিভিন্ন দিনে বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন।

কানপুর (হাওড়া): সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৪ঠা হইতে ৬ই অক্টোবর স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, স্বামী জীবানন্দ প্রভৃতি।

হাফলং (আসাম): শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির উদ্যোগে গত ১৩ই ও ১৪ই নভেম্বর স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে নব-নির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে পূজা-পাঠ, শোভাযাত্রা, ভজন-কীর্তন ও ধর্মসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজী-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

সাঁকো (বর্ধমান): গত ৯ই ও ১০ই নভেম্বর স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে জন-সাধারণের উদ্যোগে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন-দর্শন আলোচনা করেন। 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

কৈলাসহর (ত্রিপুরা): স্থানীয় বিবেকানন্দ শতবার্ষিক কমিটির ব্যবস্থাপনায় গত ১৭ই হইতে ১৯শে নভেম্বর বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূজা-পাঠ, ভজন, শোভাযাত্রা, ধর্মসভা, চিত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ভব্যানন্দ, স্বাহানন্দ প্রভৃতি।

জাপান: ওসাকা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আকাদামির উদ্যোগে জাপানের বিভিন্ন স্থানে স্বামীজীর শতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ আমন্ত্রিত হইয়া জাপানে গমন করেন এবং নানা স্থানে আয়োজিত সভায় ভাষণ দেন।

খেতড়িতে বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দির

জয়পুর: গত ১৩ নভেম্বর—রাজস্থানের রাজ্যপাল ডক্টর সম্পূর্ণানন্দ খেতড়িতে বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দিরের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই মন্দির রাজস্থানের জনসাধারণের

জন্য তথ্য সরবরাহ ও আধ্যাত্মিক পাঠকেন্দ্র হিসাবে কাজ করিবে।

খেতড়ির রাজা রামকৃষ্ণ মিশনকে স্মৃতি-মন্দিরের ভবনটি দান করিয়াছেন। রাজা অজিত সিং-এর শাসনের সময় স্বামী বিবেকানন্দ এখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই স্মৃতিকে স্মরণীয় করিবার জন্য খেতড়ির রাজা ভবনটি দান করেন।

স্বামীজীর নামে রাজপথ উৎসর্গীকৃত

বোম্বাই: গত ১০ই নভেম্বর মহারাষ্ট্রে স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের সমাপ্তি-অনুষ্ঠানের অংশ-হিসাবে উত্তর বোম্বাই-এর দীর্ঘতম রাজপথটির নাম পরিবর্তন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ রোড রাখা হয়।

উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকীর হোসেন তাঁহার বোম্বাই-এর কার্যসূচীকালে এই রাজপথের নামাঙ্কিত একটি মর্মর-ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন। সংক্ষিপ্ত এক ভাষণে তিনি বলেন যে, স্বামীজীর নামাঙ্কিত এই পথটি এই সহরে আগত মানুষকে তাঁহার বাণী বা শিক্ষার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।

—পি. টি. আই.

রাজস্থানে স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষজয়ন্তী

রাজস্থানের বিভিন্ন জেলায় স্বামী বিবেকানন্দের শতাব্দী জয়ন্তী উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ-শতবর্ষ-জয়ন্তী কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ উৎসবের প্রারম্ভিক ব্যবস্থার জন্য আজমীর, পুষ্কর, জয়পুর ও বিকানীর প্রভৃতি স্থানে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। রাজস্থানের রাজ্যপাল ডক্টর সম্পূর্ণানন্দ গত ১৭ই জানুআরি আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে উৎসবের উদ্বোধন এবং বিবেকানন্দ শতাব্দী স্মারক ছাত্রাবাসের শিলান্যাস করেন। তদবধি নিম্নলিখিত স্থানগুলির বহু স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্বামীজীর উৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে: ১. পুষ্কর, ২. আজমীর, ৩. উদয়পুর, ৪. নাথদ্বারা, ৫. কাঁকরোলি, ৬. জাওয়ার খনি, ৭. জয়পুর, ৮. কিষণগড়, ৯. মেড়তা সিটি, ১০. নাগোর, ১১. শিরোহী, ১২. আবুরোড, ১৩. ভিল্‌ওয়াড়া, ১৪. বিগোদ, ১৫. দুর্গাপুরা, ১৬. ডুঙ্গরপুর, ১৭. মণ্ডলগড়, ১৮. যোধপুর, ১৯. সাগওয়াড়া, ২০. বিকানীর ২১. বেওয়ার। উৎসবের শেষ পর্যায়ে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব্ কালচারের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ যোধপুর, উদয়পুর, আজমীর ও জয়পুরের কয়েকটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেন এবং সভাগুলিতে শ্রোতৃ-মণ্ডলী যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেন।

কার্যবিবরণী

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার: উত্তর কলিকাতার এই জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটির কর্মধারা উত্তরোত্তর ব্যাপক হইতেছে। সেবা, সাহায্য, গ্রন্থাগার- ও চিকিৎসালয়-পরিচালনার মাধ্যমে এই কর্ম রূপায়িত। ৪০তম বর্ষের (১৯৬২ খৃঃ) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১,৩৯,১৪৪ রোগী এবং দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার চেস্ট-ক্লিনিকে ১৮,২৫৫ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। অন্যান্য বিভাগেও পূর্ব বৎসরের ন্যায় সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হয়।

ডাঃ নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি যে, বাগবাজারের বিশিষ্ট চিকিৎসক নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৭শে নভেম্বর প্রত্যুষে তাঁহার নিবেদিতা লেনের বাসভবনে ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। উদ্বোধন কার্যালয় ও নিবেদিতা স্কুলের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু সাধু-ব্রহ্মচারীর তিনি সেবা করিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই অত্যন্ত মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শতবার্ষিকী সমাপ্তিতে বেলুড় মঠের উৎসব-সূচী

২১শে পৌষ, সোমবার (৬ই জানুয়ারী, ১৯৬৪)

প্রত্যূষে		মঙ্গল আরতি, বিশেষ পূজা ও হোম, বেদপাঠ
প্রাতে	৮টা হইতে	কঠোপনিষৎ ব্যাখ্যা, ভজন
	১০টা হইতে	বিবেকানন্দ-সঙ্গীত ও কালীকীর্তন
মধ্যাহ্নে	১২টা হইতে	প্রসাদ বিতরণ
অপরাহ্নে	৩টা হইতে	সভা
রাত্রে		শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজা

২২শে পৌষ, মঙ্গলবার (৭ই জানুয়ারী, ১৯৬৪)

প্রাতে	৮-৩০টা হইতে	বেদপাঠ ও ভজন
অপরাহ্নে	৩টা হইতে	মহাভারত ব্যাখ্যা
সন্ধ্যায়	৬টা হইতে	উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

২৩শে পৌষ, বুধবার (৮ই জানুয়ারী, ১৯৬৪)

প্রাতে	৯টা হইতে	সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সম্মেলন
অপরাহ্নে	৩-৩০টা হইতে	ভজন, কীর্তন ইত্যাদি
সন্ধ্যায়	৬-১৫টা হইতে	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ব্যাখ্যা

২৪শে পৌষ, বৃহস্পতিবার (৯ই জানুয়ারী, ১৯৬৪)

প্রাতে	৮টা হইতে	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ
	৯টা হইতে	দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত
অপরাহ্নে	৩-৩০টা হইতে	ভজন, কীর্তন ইত্যাদি
সন্ধ্যায়	৬-১৫টা হইতে	শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা

২৫শে পৌষ, শুক্রবার (১০ই জানুয়ারী, ১৯৬৪)

প্রাতে	৮টা হইতে	শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ
	৯টা হইতে	কালীকর্তন
অপরাহ্নে	৩-৩০টা হইতে	ভজন, কীর্তন ইত্যাদি
সন্ধ্যায়	৬-১৫টা হইতে	উপনিষৎ ব্যাখ্যা

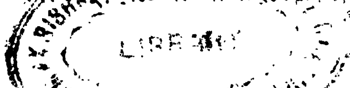
২৬শে পৌষ, শনিবার (১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৪)

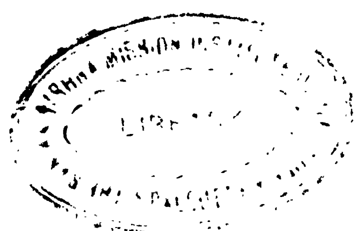
প্রাতে	৮টা হইতে	বেদপাঠ
	৮-৩০টা হইতে	স্বামীজীর গ্রন্থাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা
অপরাহ্নে	৩-৩০টা হইতে	শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভ্য, ভক্ত, বন্ধু ও সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী সম্মেলন
সন্ধ্যায়	৬-১৫টা হইতে	উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

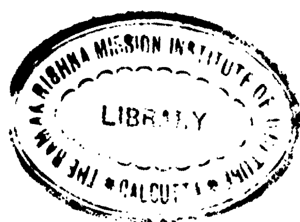
২৭শে পৌষ, রবিবার (১২ই জানুয়ারী, ১৯৬৪)

প্রাতে	৮টা হইতে	শোভাযাত্রা (কাশীপুর উদ্যানবাটী হইতে বেলুড় মঠ)
	৯টা হইতে	বিবেকানন্দলীলাকীর্তন, কালীকীর্তন
মধ্যাহ্নে		প্রসাদ বিতরণ (হাতে হাতে)
অপরাহ্নে	৩টা হইতে	সভা

বিস্তারিত কার্যসূচী সংবাদপত্র মারফৎ জানান হইবে
এবং বেলুড় মঠে পাওয়া যাইবে।








GOPAL BOOK BINDING WORKS
CAL 23